বান্ধব।

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

চতুর্থ খণ্ড।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।

মুন্সি মওলাবক্স প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮৬।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

সূচীপত্র।



মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

৪র্থ খণ্ড।] ১২৮৫। [১ম সংখ্যা।

বান্ধব।

আজি চারি বৎসর হইল বঙ্গীয় পাঠকবর্গের সহিত বান্ধবের পরিচয় ও প্রণয়। পাঠকবর্গ বান্ধবের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী কি না, তাহা আমরা ঠিক জানিতে না পারিলেও, ইহা আমরা বিশিষ্টরূপে অবগত আছি যে, বান্ধব সর্ব্বান্তঃকরণে পাঠকবর্গের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। সুতরাং ঐ শ্রুতিমধুর প্রণয় শব্দটি ব্যবহারে আমাদিগের ভয় কি লজ্জা নাই।

এই চারি বৎসরে বান্ধব কাহাকে কোন বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে সমর্থ না হইয়া থাকিলেও, স্বয়ং অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে। এই চারি বৎসরে আমরা শিখিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষা ইদানীং অতিদরিদ্রা, অতিদীনহীনা দুর্ব্বলা হইলেও ইহার ভবিষ্যৎ নিতান্ত তিমিরাবৃত নহে। যে ভাষায় যমুনা-লহরী নৃত্য করে, মোহনলালের গর্জ্জন, মোহনলালের বিলাপ তরল বহ্নির মত উদ্গীরিত হয়, মুরারিপুরের বিকট সিংহনাদের মধ্যেও অমৃতরস-নিস্যন্দিনী মধুময়ী কথা শ্রুতিকুহরে প্রবেশপথ পায়,—যে ভাষায় প্রতাপের দেবদুর্ল্লভ পবিত্র চরিত্র অঙ্কিত হইতে পারে, এবং ভাষার প্রাণরূপিণী উদ্দীপনা অবলীলায় প্রবাহিত হয়, সে ভাষার ভরসা আছে। আমরা এই সঙ্গে ইহাও শিখিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষার যেমন ভরসা আছে, বাঙ্গালিরও তেমন ভরসা আছে। যে দেশে প্রমোদ-নিদ্রা-মগ্ন ধনীর নিকট আদর নাই, পদস্থের নিকট সম্মান নাই,—দক্ষিণে

বামে কোন দিকেই অবলম্ব নাই, সম্মুখে ও পশ্চাৎ কোন দিকেই তিষ্ঠিবার স্থান নাই ;—যে দেশে পাঠ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত না হইলে প্রবাল মুক্তার ন্যায় অমূল্য রত্নও বিকায় না, উপরিস্থের অনুরোধ কি ঈপ্সিত না হইলে ভারতের তীর্থরাজস্বরূপ রাজস্থানের ইতিবৃত্ত-পাঠে, ঐতিহাসিক কি বিজ্ঞান রহস্যের রসাস্বাদনে, হেমচন্দ্রের অলোক-সাধারণ তেজোরাশির অনুধ্যানে কিংবা হাস্যকুসুমময় কল্পতরুর ছায়াসেবনেও লোকের প্রবৃত্তি জন্মেনা ;—যে দেশে কাঁচ আর কাঞ্চন সমান পদার্থ, ভ্রমর-গুঞ্জন আর ভেকধ্বনিতে সমান তৃপ্তি ;—যে দেশে এক শ্রেণির লোক অর্থের দুর্ব্বহভরে উৎপীড়িত হইয়া পঙ্কে পতিত, আর এক শ্রেণির লোক হা অন্ন বলিয়া অহোরাত্র ব্যতিব্যস্ত ;—যে দেশে মুর্খের নাম রসিক, অজ্ঞের নাম সর্ব্বজ্ঞ ভট্টাচার্য্য, মাতৃভাষায় মুর্খতার নাম পাণ্ডিত্য, পরমুখ-প্রেক্ষিতার নাম পৌরুষ ; যখন সেই দেশেও একটি নিরাশ্রয়া এবং সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীতা ভাষা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, এবং সামান্য একটি সলিল-রেখার ন্যায় প্রথমতঃ প্রবাহিত হইয়া এইক্ষণ তরঙ্গসংকুল মেঘনাদ-নদের ন্যায় ভয়ঙ্কর নিনাদে গর্জ্জন করিতেছে, তখন বুঝিয়াছি যে দুঃখিনী বঙ্গভূমির প্রতি অমৃতময়ী সারস্বতী শক্তির অকৃপা নাই। আমরা আমাদিগের এই শিক্ষালব্ধ উৎসাহের উপর দৃঢ়নির্ভরে কিয়ৎকালের বিশ্রামের পর, পুনরপি প্রীতির ভিখারী হইয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমাদিগের অবসাদজন্য নিদ্রা যে মৃত্যুর প্রতিকৃতি নহে, এবং বান্ধব যে প্রাণসত্ত্বে কখনও প্রতিশ্রুতি এবং পরিগৃহীত ব্রতধর্ম্মহইতে স্খলিত হইবে না, তাঁহারা এইটুকু বিশ্বাস করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব। আর যে সকল সুশিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তি এত কাল বান্ধবকে হস্তাবলম্ব দিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বের মত ইহার প্রতি সদয় রহিলেই আমরা অক্লান্তপদে চলিতে পারিব।

সাহিত্য ও জাতীয় বিকাশ।

প্রথম প্রস্তাব।

সাহিত্য জাতীয় হৃদয়ের আদর্শ,—জাতীয় হৃদয়ের ইতিহাস। যে জাতির হৃদয় যে সময়ে যে ভাবে পরিপূর্ণ কি পরিপ্লুত থাকে, সেই জাতির সেই সময়ের সাহিত্যও সেইভাবে সম্পূর্ণরূপে বিলসিত রহে। মনুষ্যের মন যখন শোকে আকুল, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, অথবা দুঃখে কি দুশ্চিন্তায় অবসন্ন রহে, তাহার মুখচ্ছবি তখন তমসাচ্ছন্ন এবং কণ্ঠধ্বনি বিকৃত হয়,—এবং যখন তাহার হৃদয় আনন্দভরে নৃত্য করে,

চিত্ত নূতন সুখের সুধাময় স্পর্শে প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তাহার চক্ষু তখন সেই আনন্দ ও সেই সুখে হাসিতে থাকে, তাহার কণ্ঠস্বর বসন্ত-মদ-মত্ত কোকিল-কণ্ঠের মাধুরীতে মিশিয়া যায়। মনুষ্যসম্বন্ধে প্রকৃতির এই নিয়ম অনুল্লঙ্ঘনীয়, এবং জাতীয় সাহিত্যও সর্ব্বপ্রকারে এই নিয়মের অধীন। উহাতে কখনও ক্রোধের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন, কখনও অবরুদ্ধ ক্রোধের ততোধিক ভয়ঙ্কর স্তম্ভিত ভাব। কখনও প্রেমের উচ্ছ্বাস, কখনও শোক ও পরিতাপের হৃদয়বিদারী করুণা-নিস্বন, কখনও বীর-গর্ব্ব ও বাহুবল-দর্পের সিংহনাদ, কখনও স্বার্থপরতা ও বনিগৃহৃত্তির সংকোচ ও সাবধানতা। কখনও বিলাসের আলস্য ও আবেশ, কখনও ভয়ের বিকৃত ভক্তি এবং ভক্তির বীভৎস বিকার। ফলতঃ, সাহিত্যকে ইতিহাস না বলিয়া জাতীয় হৃদয়ের চিত্রপট বলাই অধিকতর সঙ্গত। কারণ, ইতিহাসে যাহা না থাকে, অথবা ইতিহাসে যাহা থাকা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, ভাষার সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধমূলক নিয়মানুসারে, সাহিত্যে তাহা আলিখিত হয়,—এবং সাহিত্য, পরিমার্জ্জিত দর্পণের ন্যায়, জাতীয় পরিবর্ত্তনের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বর্ণভেদও আমাদিগের সম্মুখে আনিয়া প্রদর্শন করে। ইতিহাস প্রায়শঃই বাহিরের কথা লইয়া ব্যাপৃত রহে;—সাহিত্যে অন্তরের অন্তরতম কথাও পরিস্ফুট না হইয়া যায় না, এবং জাতিবিশেষের উদয় ও বিলয় সম্পর্কিত যে সকল প্রশ্নের উত্তর করা নিতান্ত কঠিন, সাহিত্য তাহার সদুত্তর দেয়।

ভারতবাসী আর্য্যদিগের শৈশব সময়ের সাহিত্য বেদ। বেদে শিশুর সারল্য, বেদে শিশিরসিক্ত প্রভাতপদ্মের পবিত্র শোভা এবং পবিত্র মাধুর্য্য। বেদ যাঁহাদিগের হৃদয়ের ভাষা ছিল, তাঁহারা মনু কি যাজ্ঞবল্কের ন্যায়, সমাজের অভ্যন্তরীণ ভেদ এবং পরিণামচিন্তা লইয়া বুদ্ধি বিলোড়ন করিতেন না,— কণাদ কি কপিলের ন্যায় তত্ত্বশাস্ত্রের বীজসূত্র লইয়া পদার্থতত্ত্বের অন্তস্তলে নিমজ্জিত রহিতেন না, এবং কালিদাসপ্রমুখ কবিসম্প্রদায়ের ন্যায় কামিনীর বিভ্রম-বিলাস ও লাবণ্যলীলা লইয়াও প্রমত্ত থাকিতেন না। তাঁহারা, প্রাতঃসূর্য্যের উদয়োন্মুখী প্রতিভা দেখিয়া, যাঁহাকে কেহ জানে না, যাঁহাকে কেহ জানিবে না, সেই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তির আনন্দময় অনুভবে, কাননস্থিত বিহঙ্গনিবহের মত, কলকল নাদে প্রকৃতির প্রভাতবন্দনা গান করিতেন;—জলভারপূর্ণ শ্যামল মেঘমালার নবীন-সৌন্দর্য্য-দর্শনে পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেন;—বায়ুর বেগ প্রশমনের জন্য স্তোত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন;—এবং তাঁহাদিগের ক্ষেত্রে যেন শস্য হয়, গাভী যেন দুগ্ধবতী রহে, তরুরাজি যেন ফলে ও ফুলে সুশোভিত হইয়া চক্ষু বিনোদন করে, এই জন্য তাঁহারা দেবতার আরাধনা করিতেন।

তখন রাজা কি রাজকীয় অত্যাচার ছিল না। সাহিত্যে কিরূপে রাজনীতির আবিলতা থাকিবে ? নূতন-গ্রথিত সমাজসংস্থাপনে সর্ব্বপ্রকার অপূর্ণতা থাকিলেও, কোন রূপ অস্বাস্থ্য ছিল না। সাহিত্যে কিরূপে সমাজভঙ্গের ভয় এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিকার থাকিবে ? আর মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের কৃত্রিম ভক্তি এবং কৃত্রিম আসক্তিরও কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং তদানীন্তন সাহিত্যেও কিরূপে কৃত্রিম ভক্তি কিংবা কৃত্রিম আসক্তির কপট স্তুতি স্থান পাইবে ?

আজি সমগ্র ইয়ুরোপ এবং আমেরিকা যাঁহাকে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং জগদ্গুরু বলিয়া পূজা করিতেছে, এবং যাঁহার হৃদয়-কন্দর-নিঃসৃত নির্ম্মল নীতিসুধা আজি প্রায় সমস্ত পৃথিবীতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই নাজরীণ যোগী মহাত্মা খ্রীষ্ট, একটি সুকুমারমতি সহাস্য শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া নিয়া, সম্মুখস্থিত শিষ্যবর্গকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে,—"যাহাদিগের চিত্ত শিশুর মত সরল নহে, স্বর্গরাজ্যে তাহাদিগের অধিকার নাই।" আমরাও বলি, যাহারা সেই বেদভাষী আর্য্যশিশুর ন্যায়, আধ আধ কথায় ঈশ্বরকে ডাকিতে পারে না, এবং প্রকৃতির রূপরাশিতে মোহিত হইয়া প্রকৃতির প্রাণদেবতার ক্রোড়ে শিশুর মত ঝাঁপ দিয়া পড়িতে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের জন্যও ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ-পথ নাই। ধর্ম্মবিষয়ে সেই পুরাতন বৈদিক সাহিত্য এবং এখনকার সুমার্জ্জিত ধর্ম্মশাস্ত্রীয় সাহিত্যে কি প্রভেদ ! এখনকার ধর্ম্মবিষয়ক সাহিত্যের একার্দ্ধ আত্মতত্ত্ব এবং অপরার্দ্ধও হায় ! অন্য এক প্রকারের আত্মতত্ত্ব। ইহার কোথাও স্বাস্থ্যের লক্ষণ, প্রফুল্লতার সমীরসঞ্চার এবং প্রকৃত আনন্দের সংস্পর্শ নাই। ইহাতে ধর্ম্মের সাধনা, ক্লেশকর ঔষধ-সেবন ; এবং ধর্ম্মোপদেশ যার পর নাই কটুকষায়-ঔষধ-বিতরণ। ইহার প্রার্থনায় প্রচ্ছন্ন শ্লেষ, কিংবা বাগ্বিতণ্ডা ; এবং ইহার সর্ব্বত্রই অনুতাপ অথবা অভিসম্পাত, অন্তর্দ্দাহ অথবা পরের প্রতি দ্বেষ। পড়িলে বোধ হয় যে, 'ধার্ম্মিক' মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য এক সৃষ্টিছাড়া জীব। সে কাহারও সুখে সুখী নহে, কাহারও দুঃখেও সে দুঃখী নহে। তাহার সহিত কাহারও কোন বিষয়ে সহানুভূতি নাই। তাহার মুখমণ্ডলে চিরন্তনী অমাবস্যা ; অবোধ বালক বালিকাও ভয়ে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস পায় না। সে সকল বিষয়েই সতত সঙ্কুচিত। সে সঙ্কোচে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারে না, এবং সঙ্কোচে কাহারও সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেও ইচ্ছুক হয় না। তাহার হৃদয় এক অচিন্তনীয় ব্যাধির অধিকরণ। সেখানে আমোদ নাই, উৎসাহ নাই এবং হর্ষের তরল তরঙ্গ নাই। কবিতার কলকণ্ঠ সেখানে পরাজিত হয়, এবং সৌন্দর্য্যের পবিত্র প্রতিমাও পাপের প্রতিকৃতি বলিয়া সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়।

বৈদিক সাহিত্য সর্ব্বাংশেই ইহার বিপরীত। উহার সর্ব্বত্রই নবোদ্গত হৃদয়ের আমোদ, আকাঙ্ক্ষা, উল্লাস ও উৎসব। উহার ধ্যানধারণা গম্ভীর ও মধুর; প্রার্থনা স্বভাবসুন্দর, সরল ও অমায়িক; উপদেশ অভিসম্পাত-শূন্য এবং সাধনা শ্বাসপ্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক ও সুখপ্রদ। ধর্ম্মশাস্ত্রে এইক্ষণ যে বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, বৈদিক সাহিত্যের কুত্রাপি তাহা পরিলক্ষিত হয় না। তখন ধর্ম্মও লোকের গলগ্রহ স্বরূপ ছিল না, এবং যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারাও মূর্ত্তিমান্ রোগ এবং জনসমাজের গলগ্রহ ছিলেন না।

বেদের পর রামায়ণ আর মহাভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমরা কণিকসূত্রের অর্থবিবৃতিতে প্রীতি আর রাজনীতিতে যে পার্থক্য দেখাইয়াছি, রামায়ণ ও মহাভারতেও সেই পার্থক্য। রামায়ণের সময়ে ভারতীয় সভ্যতার প্রেমোচ্ছ্বাস-পরিপ্লাবিত নূতন যৌবন, মহাভারতের সময়ে ভারতীয় সভ্যতার ক্ষতিলাভগণনা-তৎপর প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য। রামায়ণে হৃদয়ের আবেশ, হৃদয়ের আবেগ, এবং রামায়ণের প্রধান-পুরুষ রাম। মহাভারতে বুদ্ধির খর-ধার, বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য এবং মহাভারতের প্রধান-পুরুষ কূট-যুদ্ধ-প্রসিদ্ধ বাসুদেব, অথবা বাসুদেবের করধৃত পুত্তল রাজা যুধিষ্ঠির। আর প্রকৃতিরই বা কি আশ্চর্য্য সহানুভূতি! রামায়ণের কবি, বাল্মীকি; এবং মহাভারতের কবি, ব্যাস। ইতিহাসের দুইটি বিভিন্ন সময়ের ছবি রামায়ণে ও মহাভারতে যেরূপ বিভেদসহকারে চিত্রিত হইয়াছে, শুদ্ধ তাহা তুলনা করিলেই সাহিত্য এবং জাতীয় হৃদয়ের সাময়িক অবস্থাঘটিত পরস্পর সম্বন্ধ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারে।

রামায়ণ এবং মহাভারত এই উভয় কাব্যেই ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার রাজ্য লইয়া বিরোধ। রামায়ণের বিরোধ রাম ও ভরতে, মহাভারতের বিরোধ কৌরব ও পাণ্ডবে। কিন্তু বিরোধের বিচিত্র পার্থক্য একবার চিন্তা কর। রামায়ণের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা এই বলিয়া বিবাদ করিতেছেন যে,—"এই রাজ্য, এই রাজপদ, এই অতুল রাজসম্মান আমার নহে, ইহা তোমার"। মহাভারতের ভ্রাতা স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলিতেছেন যে,—"যত টুকু ভূমি সূচীর সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগে সংলগ্ন রহিতে পারে, তাহাও বিনা যুদ্ধে প্রদান করিব না"। রামচন্দ্র ভ্রাতাকে বিরোধে পরাভব করিয়া তাঁহার হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্য তুলিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং হৃদয়ের আনন্দভরে ভার্য্যাসহ বনবাসী হইলেন। মহাভারতের ভ্রাতা বিরোধে জয়লাভ করিয়া, ভ্রাতার উরুতে গদাঘাত, মস্তকে পদাঘাত এবং অন্তরে ততোধিক ক্লেশকর নিদারুণ বাক্যের আঘাত করিলেন, এবং ভ্রাতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া যজ্ঞ ও দানাদি সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সত্য বটে, ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মের পুত্র,

ধর্ম্মের অবতার এবং সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সত্য বটে, তিনি যুধিষ্ঠিরকে নিয়ত বেদ পাঠ এবং বিপ্রসেবায় নিযুক্ত রাখিয়া, এবং তাঁহাকে আসিধারব্রতে বিজয়ী দেখাইয়া সাধারণের মনে তাঁহার প্রতি এক অসাধারণ ভক্তি জন্মাইয়াছেন। ইহাও সত্য যে যুধিষ্ঠির অকারণ পরদ্রোহ, অকারণ পরপীড়ন, এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও দন্তমাৎসর্য্য প্রভৃতি বহুবিধ দোষহইতে নির্ম্মুক্ত রহিয়া জগতে ধার্ম্মিক নাম পাইবার জন্য বহুল পরিমাণে যোগ্য হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে,রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির এক প্রকৃতির ধার্ম্মিক নহেন, এবং এই উভয় সময়ের ধর্ম্মগত আদর্শও এক ছিল না। ইহাঁদিগের এক জনের ধর্ম্মে কুসুমের সৌরভ, বসন্তের কমনীয় কান্তি, সত্যের স্বচ্ছশোভা, এবং প্রথম বয়সের প্রমত্ত প্রবাহ;—আর এক জনের ধর্ম্মে শীতের সঙ্কোচ, স্বার্থের দুশ্চিন্তা, কৌশল, কাপট্য, কলির প্রারম্ভকালীন প্রদর্শন-প্রিয়তা, এবং বিবিধ কারুকার্য্যের বিচিত্রঘটা। একজনের ধর্ম্মে শক্তি এবং স্বভাবের অপ্রতিহত বিকাশ, —আর একজনের ধর্ম্মে অকালবার্দ্ধক্যের অরুচি এবং অনিচ্ছাকৃত গতি।

ধন্য বাল্মীকি! ধন্য ভারতবর্ষ! আর আজি হতভাগ্য হইলেও ধন্য আমরা যে, যে দেশ রামচন্দ্রের পদরেণু স্পর্শ করিয়াছে, আমরা সেই দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এবং যে গঙ্গা ও গোদাবরী আর্য্যাবর্ত্তের সেই সময়ের সেই আদর্শ-পুরুষ, সেই জাতীয় প্রতিনিধির পাদপ্রান্তে প্রবাহিত হইয়াছে, আমরা আজি সেই পুরাতন গঙ্গা ও গোদাবরীর তরঙ্গমালা দর্শন করিয়া পুরাতন আর্য্য জাতির কীর্ত্তি ও মহিমার তরঙ্গ ধ্যান করিতে পারিতেছি। প্রকৃত মহত্ত্বের ছায়া-পথে কিংবা স্মরণ-পথে অবস্থানও সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে বাল্মীকির সমান,কিংবা কোন কোন বিষয়ে বাল্মীকি হইতেও শ্রেষ্ঠতর কবি জন্মগ্রহণ না করিয়াছেন,এমন নহে। গ্রীকদিগের হোমার, রোমাণদিগের বর্জ্জিল, ফরাশিদিগের কর্ণেল এবং বৃটিশদিগের মিল্‌টন, ইহাঁরা সকলেই মানব জাতির গৌরব-স্থল এবং কবি-সমাজের গুরু বলিয়া পরিচিত। যদি কল্পনার বৈচিত্র্য এবং সৃষ্টি-নৈপুণ্য লইয়া বিচার কর, তাহা হইলে বৃদ্ধ বাল্মীকিকে সেক্ষপীরের সহিত তুলনা-স্থলে আনয়ন করা যায় কিনা, তাহাও সন্দেহের কথা। বাল্মীকির হৃদয়ের স্রোত নিরন্তর একখাতে প্রবাহিত হইয়াছে; শেক্ষপীরের দিব্যশক্তি স্বর্গও নরক, শৈল-শৃঙ্গ ও গভীর তমসাচ্ছন্ন গিরিগুহা, কৈশর ও কেসিয়স, ক্লিওপেট্রা ও দেশদিমোনাপ্রভৃতি অসংখ্য পদার্থ যুগপৎ দর্শন এবং যুগপৎ চিত্র করিয়া জগতের বিস্ময় জন্মাইয়াছে। কিন্তু যেরূপ ভারতের আর্য্যজাতি ভিন্ন আর

কোন জাতির প্রকৃতিতেই রাম চরিত্র বিকশিত হয় নাই, সেইরূপ কি হোমার কি বর্জ্জিল, কি কর্ণেল, কি মিল্টন অথবা কি শেক্ষপীর, বাল্মীকি ভিন্ন কোন দেশের কোন কবিই রাম চরিত্র সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন নাই।

রামচন্দ্র প্রাচীন আর্য্যজাতির প্রাণ,—দয়ার অমৃত প্রস্রবণ, অথচ পৌরুষদর্পের সজীব প্রতিকৃতি। প্রণয়ে তিনি চণ্ডালকেও আলিঙ্গন করিতে পারেন, প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লঙ্কেশ্বরকেও তিনি তৃণ বলিয়া গণনা করেন না। স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনেও তাঁহার যে সুখ, তপোবনের পর্ণকুটীরেও তাঁহার সেই শান্তি। বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী তপস্বীরাও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে উৎসুক রহেন; এবং দাক্ষিণাত্যের অসভ্য,আরণ্য মনুষ্যেরাও তাঁহার কথার মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া আপনা হইতে তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করে। তাঁহার আঘাতে বজ্রের কঠিন দেহ বিদীর্ণ, এবং ক্রোধে বহ্নি-শিখাও ভীত হয়; আবার রাবণের মত ভার্য্যাপহারী ও সর্ব্বনাশকারী শত্রুও যখন কাতরকণ্ঠে তাঁহার শরণ লয়, তিনি তখন করুণরসে দ্রবীভূত হইয়া ধারায় অশ্রুপাত করেন। তাঁহার চিত্ত কৈকেয়ীর প্রতিও ক্রূরভাব পোষণ করিতে পারে না, অথচ কৌশল্যার ক্রন্দন এবং ভরতের অনুনয় বাক্যেও বিগলিত কিংবা সত্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না। যখন রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য বাহুপ্রসারণে উদ্যত, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ পুঞ্জীকৃত পুষ্পরাশির ন্যায় তাঁহার সম্মুখে সমাকীর্ণ, পৃথিবীর সমস্ত রাজমুকুট তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত, তাঁহার প্রশান্ত চিত্তে তখনও অধৈর্য্য কি উদ্বেলতা নাই,—এবং যখন জটাচীর তাঁহার রাজভূষা, দুর্ভাগ্য তাঁহার ক্রীড়াসহচর এবং বৃক্ষ লতা মাত্র তাঁহার পরিচারক, তখনও তাঁহার দৃকৃপাত কি দুঃখ-বোধ নাই। অহো কি মনুষ্যত্ব! কি অলৌকিক মাহাত্ম্য! ভারতীয় কল্পনা সরসীর স্বর্ণকমল,—কি সুন্দর,—কি কঠিন! সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে প্রতিভাত প্রদীপ্ত ভাস্কর! কি উজ্জ্বল! কি মনোহর।

ব্যাসও অসামান্য কবি, এবং সর্ব্বাংশে আর্য্যনামের উপযুক্ত;—পাণ্ডিত্যে অনুপম, মনস্বীতায় অদ্বিতীয় এবং সৃষ্টি বৈচিত্র্যে ও সৃষ্টি-কৌশলে শেক্ষপীরের সমান। তদীয় ভীষ্ম হিমাদ্রির অভ্রভেদী শৃঙ্গের ন্যায় ভারত-সাহিত্যরূপ মহাক্ষেত্রের এক প্রান্তে ভ্রূভঙ্গিশূন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যতকাল ইচ্ছা নিরীক্ষণ কর, সেই পাষাণময়ী মূর্ত্তিতে কখনও প্রতিজ্ঞা পালনে ভয় কিংবা পৌরুষ-ধর্ম্মে অবহেলার লক্ষণ দেখিতে পাইবে না। তাঁহার দ্রোণকর্ণাদি বীরবৃন্দ অদ্যাপি শরীরবদ্ধ বীররসের ন্যায় সকলের মানসনেত্রের সম্মুখীন হইতেছেন। যতকাল ইচ্ছা দেখিতে থাক, হৃদয় কখনও অবসন্ন হইবে না। তাঁহার অভিমন্যু অদ্যাপি রু-

পের ছটা বিকীরণ করিয়া, এবং রূপের সঙ্গে রৌদ্রতেজে বিভূষিত হইয়া, বিস্ময়-বিমুগ্ধ দ্রষ্টৃবর্গের সন্নিধানে বজ্রহস্ত চন্দ্রমার ন্যায় মৃদু মধুর সলীলহাস্যে নৃত্য করিতেছেন,—যতকাল ইচ্ছা চাহিয়া থাক, চক্ষু কখনও ফিরিয়া আসিতে চাহিবে না। কিন্তু কবিকুল চূড়ামণি শেক্ষপীর ত্রিলোকের উপাদেয় সামগ্রী একত্র সংগ্রহ করিয়াও যে কারণে রাম সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, ব্যাসের বহু যত্নের ধন যুধিষ্ঠির-ও সেই কারণেই রামচন্দ্র নহেন।

যুধিষ্ঠির চিররুদ্ধ। তাঁহার প্রকৃতিতে কখনও আবেগ কি আবর্ত্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার গতি জলৌকার মত; তিনি পরস্থান না দেখিয়া কখনও পুর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করেন না। তিনি সময় পাইলে বিরাটকেও শ্লেষ করিতে পারেন, কিন্তু অসময়ে দুঃশাসনকেও কিছু বলিতে চাহেন না। তাঁহার সত্যপরায়ণতা বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে ‘ হত ইতি গজ, ’ অথচ আত্মদৈন্য-জ্ঞাপন এবং অনুতাপ-পরায়ণতায় তিনি ভগবদ্ভক্ত সাধু। তাঁহার সাহস ও বীরত্ব প্রায়ই বীর সান্নিধ্যে ও বিঘ্ন-বিপত্তির সম্মুখে অবসন্ন হইয়া পড়ে; অথচ সাহস ও বীরত্বের অভাব প্রদর্শন করিয়া অন্যকে তিরস্কার করিতে তাঁহার চিত্ত কাতর হয় না, এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি সুকুমার শিশুকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করিতেও তাঁহার মনে গ্লানি জন্মে না। অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় তাঁহারও ক্রোধ আছে। কিন্তু তাঁহার ক্রোধ মেঘের ন্যায় গর্জ্জেনা,অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠে না, এবং অশনির ন্যায় কাহারও মস্তকে সহসা আপতিত হয় না। উহা বিষের ন্যায় ধীরে ধীরে প্রসূত হয়, ধীরে ধীরে কার্য্য করিতে রহে, এবং যাহার প্রতি ক্রোধ, ধীরে ধীরে তাহার সর্ব্বনাশ করে। দুর্য্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ ছিল। কিন্তু যখন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের অত্যাচারে বারণাবতের অভিমুখে পলায়ন করেন, সে ক্রোধ তখন পরিস্ফুট হয় নাই। যখন দুর্য্যোধনের ইঙ্গিতে কুরুসভায় দ্রৌপদীর নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা হয়, সে ক্রোধ তখনও প্রকাশিত হয় নাই। বহুলোক তখন অশ্রুপাত করিয়াছিল,বহুলোক তখন আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, কেবল যুধিষ্ঠিরই প্রস্তরবৎ নিঃশব্দ ও নিশ্চল। কিন্তু বহুদিনান্তে, বহু বর্ষান্তে, যুধিষ্ঠিরের পরিণাম-চিন্তাপরায়ণা, ধীরপদবিক্ষেপিণী, স্থিরা নীতি যখন ফলোন্মুখী হইয়া আসিল,যখন কুরুকুলের সমস্ত সম্পদ্ বিনষ্ট এবং ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত সহায় একে একে সমর শয্যায় শয়ান হইল, সংক্ষেপতঃ শত্রুবল যখন সমূলে উৎপাটিত এবং ভাবী বিপদের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া গেল, তিনি তখন কূপ-জল-মগ্ন দুর্য্যোধনের প্রতি ক্রোধ করিলেন এবং ক্রোধোদ্দীপ্ত বাক্যে তাঁহার মর্ম্মভেদ করিয়া হৃদয়ের চিরপোষিত বৈর-বহ্নিতে আহুতি দিলেন। আর প্রেম? যুধিষ্ঠিরের মত রাজনীতিনিপুণ,

রাজ্য-চিন্তা-নিমজ্জিত,রাজ-পদ-লোলুপ,পরিপক্ক ব্যক্তিও কি কখনও প্রেমের স্বর্গীয় সুধার ভিখারী হয়, এবং প্রেম কাহাকে বলে তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে?

প্রভুত্ববাসনা এবং প্রেম নিত্যবিরোধি। প্রেমের অঙ্কুরে পরার্থলালসা, পল্লবোদ্গমে পরাধীনতা এবং পুষ্পিত সৌরভে পরকীয় উপাসনা। প্রভুত্ববাসনার অঙ্কুরে ও পল্লবে, ফুলে ও ফলে সর্ব্বত্রই পরাভিভবচেষ্টা, পরমর্দ্দন, পরনিগ্রহ। প্রেমিক অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও অন্তরে প্রমত্তযুবা, পর্ব্বতের মত বরীয়ান্ হইলেও প্রীতির বসন্তোচ্ছ্বাসে বাতদুলিত বল্লরী এবং মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ হইলেও প্রাণের অভ্যন্তরে জ্যোৎস্নার ন্যায় শীতল ও আনন্দভরে ঢল ঢল। প্রভুত্বপ্রিয় কঠোর, নির্ম্মম, স্বার্থমাত্র-পরায়ন, এবং যৌবনেও জরাজীর্ণ। ব্যাসের মহাভারতে এবং ব্যাসের সমসাময়িক ভারতে প্রভুত্ব-বাসনার সর্ব্ববিধ প্রতিমূর্ত্তিই প্রত্যক্ষ করিতে পাইবে, রাজনীতির অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত দেখিবে, শত্রুসংহার এবং কার্য্যোদ্ধারের জন্য যে সকল উপদেশ দিতে বর্ত্তমান কালের বিষমার্ক প্রভৃতি রাজপুরুষেরাও ভীত অথবা কুণ্ঠিত হন, ব্যাসাসনের সন্নিহিত হইলে তাহা হইতেও ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়জনক উপদেশ শুনিয়া স্তম্ভিত ও কণ্টকিত হইবে;— তথায় কোন সময়ে কণিকের সহিত আলাপ করিবে, কোন সময়ে ভারত-বিগ্রহের বীজমন্ত্র মহামতি বাসুদেবের কূটলীলা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় রহিবে; কখনও কর্ণ শকুনির মন্ত্রণা শুনিয়া হৃৎকম্পে চমকিয়া উঠিবে, এবং কখনও বা সপ্তরথীর অবৈধ যুদ্ধ অথবা পাণ্ডবশিবিরে অশ্বত্থামার নৈশ আক্রমণ দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে থাকিবে। কিন্তু আদি হইতে অন্ত সমগ্র মহাভারতে কোথাও প্রেমের কুসুমশোভা দেখিতে পাইবে না। প্রভুত্ব ও পদবৈভবলুব্ধ ভারতবর্ষ তখন প্রীতিকে নীরস নির্মাল্য পুষ্প জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়াছিল, ভারতের তদানীন্তন সাহিত্যেও সুতরাং ইহা উপেক্ষিত হইয়াছে।

প্রেমের বিকাশ রামায়ণে অন্যরূপ। যদি কেহ সংসারের দুঃখ-দাহে দগ্ধ হইয়া এবং মনুষ্য চরিত্রে অহরহ বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাইয়া শান্তির জন্য লালায়িত হন, তিনি বাল্মীকির কল্পকাননে প্রবেশ করুন। যদি কেহ পৃথিবীর কুটিল ব্যবহারে ক্লিষ্ট এবং প্রিয় পরিজনের ছলনা ও বঞ্চনায় অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিষয়ে নিরাশ হন, তিনি লোক-পাবনী রামায়ণী গঙ্গায় অবগাহন করুন। ফলতঃ, বাৎসল্য, ভক্তি এবং দাম্পত্যপ্রীতি প্রভৃতি প্রেমের যত প্রকারের মুর্ত্তি অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্য-কল্পনায় প্রতিভাত হইয়াছে, রামায়ণে তাহা স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণে লিখিত রহিয়াছে, এবং জগতের সমস্ত সাহিত্য মধ্যে একমাত্র রামায়ণেই তাহা পুর্ণতা পাইয়াছে।

রামায়ণে অপত্য বাৎসল্য দশরথের, অলৌকিক ও অপূর্ব্ব। রাজা দশরথ বহুবিবাহ প্রভৃতি বহুদোষে লিপ্ত এবং স্ত্রৈণতার জন্য নিন্দনীয় হইয়াও পুত্রের প্রতি ভক্তি এবং পুত্র-বৎসলতার জন্য মনুষ্য-জগতে চিরস্মরণীয় ও ভক্তিভাজন হইয়াছেন। যেমন সূর্য্য-বিরহে সংসার অন্ধকারে রহে, তিনিও রাম-বিরহে সেইরূপ অন্ধকারে রহিতেন। রামকে তিনি শুধু ভাল বাসিতেন না, রামচন্দ্রেই তিনি প্রকৃত জীবিত থাকিতেন। যখন রাম বিশ্বামিত্রের সহিত মিথিলায় গেলেন, তিনি সেই ক্ষণিক বিরহে জীবন্মৃত রহিলেন; এবং যখন রাম কৈকেয়ীর সত্য-পাশে বদ্ধ হইয়া বনবাসী হইলেন, তখন তিনি, যেন কোন অলক্ষিত নিয়মের শাসনে, জীবলীলা সংবরণ করিলেন। এই চিত্র দর্শনীয়। যে জগতে শোকের পরই সুখ-স্পৃহা, এবং সুখস্পৃহার সঙ্গেসঙ্গেই বিস্মৃতি ও বিষয়-তৃষ্ণা,—যে জগতে এক-চক্ষু অশ্রুধারা বর্ষণ করে, আর এক চক্ষু ভোগ্য বস্তুর প্রতি প্রধাবিত হয়, এক হস্ত কপালে আঘাত করে, আর এক হস্ত লাভালাভের অঙ্কপাতে ব্যাপৃত হয়, অধিক আর কি, যে জগতে জনক-জননী-কৃত অপত্যনিগ্রহ এবং অপত্যের প্রতি বঞ্চনারও সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত নিয়ত সম্মুখে পড়ে, সেই জগতে দশরথের এই কবি-জনস্পৃহণীয় আলেখ্য খানি নয়ন ভরিয়া পান করিলেও হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়না।

রামায়ণে যাঁহার নাম ভরত, মহাভারতে তাঁহার নাম দুর্য্যোধন; এবং রামায়ণে যাঁহার নাম লক্ষ্মণ, মহাভারতে তাঁহার নাম অর্জ্জুন। ভরত আর দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃ-প্রেম-গত পার্থক্য সামান্যতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। যে নিতান্ত অন্ধ সেও ইহা বুঝিতে পারিবে যে, ভরত সর্ব্বাংশে রাম-সদৃশ না হইলেও প্রায় দ্বিতীয় এক রাম; এবং রামচন্দ্রের মত ভারতীয় সাহিত্যের আর এক বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ;—শৌর্য্য ও সাহসে অপ্রমেয়, অথচ প্রীতিতে নবনীত-সম, ত্যাগে অকুণ্ঠিত। এই মহাপুরুষ পিতৃসত্যপ্রামাণ্যে সাগরাম্বরা ভারত ভূমির সাম্রাজ্য পদ পাইয়াও ভ্রাতৃস্নেহের নিকট তাহা তৃণ হইতে হীনজ্ঞান করিয়াছেন, এবং যৌবনে যোগী সাজিয়া, মাথায় জটা বান্ধিয়া, ভ্রাতার অন্বেষণে বনে বনে ভিখারীর মত বেড়াইয়াছেন। মহাভারতে ইহাঁর সাদৃশ্য কোথায়? যেখানে ভরত ভ্রাতাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াও অতৃপ্ত, মহাভারতে প্রতিরোধী বীর ভ্রাতার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াও সেখানে অপরিতৃপ্ত। কিন্তু ভরতের ভ্রাতৃভাব যদি পূজনীয়, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভাব যেমন পূজনীয়, তেমনই প্রীতিজনক। আমাদিগের বিবেচনায় মনুষ্য-লোকে ইহার তুলনাস্থল নাই। এসিয়া, আফ্রিকা, ইয়ুরোপ ও আমেরিকা পৃথিবীর এই চারি প্রদেশে শুদ্ধ ভারত ক্ষেত্রে এবং বাল্মীকির সময়েই ইহা সংসারে প্রদর্শিত ও সাহিত্যে অঙ্কিত হইয়াছে। অন্য কোথাও

ইহার ছায়াপাত হয় নাই। সুতরাং হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি যে, এইরূপ অ-লোক-সামান্য ভ্রাতৃভাবের মর্ম্মার্থ পাঠ এবং মাহাত্ম্য অনুভব করিতে সমর্থ হইবে, এমন আমরা প্রত্যাশা করিনা।

প্রীতির প্রাণ আত্মোৎসর্গ। লক্ষ্মণ সেই আত্মোৎসর্গের সজীব প্রতিমূর্ত্তি। লক্ষ্মণ স্ত্রী জানিতেন না, পুত্র জানিতেন না, বিষয় বৈভব, মান অপমান, এবং সংসারের সুখ দুঃখ কিছুই জানিতেন না; তিনি জানিতেন একমাত্র ভ্রাতা;—ভ্রাতাই তাঁহার জীবনের ধ্রুব নক্ষত্র ছিলেন। যখন সত্যের অনুরোধে রাম ও লক্ষ্মণ এই দুই ভ্রাতার বিচ্ছেদ হইল, তাঁহারা উভয়েই তখন সরযুর জলে প্রাণত্যাগ করিলেন। দুই দেহে একপ্রাণ; সেই প্রাণ-রজ্জুর যখন গ্রন্থি চ্ছেদ হইল, দুইটি দেহই তখন ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বীরত্বে লক্ষ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী কে? বুদ্ধির প্রখরতা, প্রকৃতির মহত্ত্ব এবং চরিত্রগৌরবে লক্ষ্মণ কাহার নিকট হীনপ্রভ? কিন্তু ভ্রাতৃ-প্রেম তাঁহার সমস্ত আত্মাকে এমন গ্রাস করিয়া রাখিয়া ছিল যে, তাঁহার আর পৃথগস্তিত্ব ছিল না। তিনি পৃথগস্তিত্ব ভাল বাসিতেন না। তিনি ভক্তিতে আনত এবং প্রীতিতে তদ্গত হইয়া একবারে ভ্রাতৃজীবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যতকাল জীবিত ছিলেন, ততকাল ঐ এক ভাবেই অটল রহিয়াছিলেন।

মহাভারতে এই ভ্রাতৃভাবের অনুকরণ চেষ্টা আছে, কিন্তু অনুকৃতি নাই। কালের পরিবর্ত্তে তখন লোকের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং তখন সকলেই আপনার মান, আপনার গৌরব, আপনার প্রভুত্ব ও পদমর্য্যাদা অক্ষত রাখিয়া ভালবাসিত এবং ভ্রাতৃপ্রেমেও বহুল পরিমাণে রাজনীতির প্রয়োগ করিত। ইহার সহস্র প্রমাণের মধ্যে প্রধান এক প্রমাণ গাণ্ডীবের নিন্দায় যুধিষ্ঠিরের নিগ্রহ। কর্ণভয়ভীত যুধিষ্ঠির কর্ণকে যুদ্ধে অজিত জানিয়া, যেই গাণ্ডীবের নিন্দা করিলেন, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন অমনি অশেষ প্রকারে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলেন। যুধিষ্ঠির যে তাঁহাকে শিশুকাল হইতে সন্তানের ন্যায় লালন পালন করিয়াছেন, ইহা তখন তাঁহার মনে রহিল না। তখন শুধু আত্মগৌরবই তাঁহার মনে রহিল, এবং স্বার্থ-বুদ্ধিই তাঁহার চিত্তকে পরিপ্লুত করিল। পুরাতন সমস্ত কথা হৃদয় হইতে প্রক্ষালিত হইয়া গেল। ব্যাস লিখিয়া গিয়াছেন যে, অর্জ্জুন ক্ষণকাল পরেই ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত প্রায়শ্চিত্তও সর্ব্বথা সেই স্বার্থ-চিন্তার কুটিল কালের উপযুক্ত। ভ্রাতৃলঙ্ঘন পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?—না, আত্মপ্রশংসা)

সায়নবাদ

প্রথম প্রস্তাব।



সায়নবাদ কি ? বোধহয় তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত আছে ; এজন্য বলিয়া দিতেছি, "সায়নবাদ" জ্যোতিষের একটি অঙ্গ। প্রাচীন জ্যোতিষের মধ্যে গ্রহরাজ সূর্য্যের দ্বিবিধ সঞ্চারের কথা লিখিত আছে। সায়ন ও নিরয়ন। এই প্রস্তাবে আমরা পুরাতন জ্যোতিষের সঙ্গে ইয়ুরোরোপীয় ও দেশীয় নবীন জ্যোতিষিক সিদ্ধান্তের প্রভেদ দেখাইব বলিয়া প্রস্তাবটির মস্তকে "সায়নবাদ" মুকুট প্রদান করিলাম।

জ্যোতিঃশাস্ত্র অতি গহন ; তন্মধ্যে সস্বচ্ছন্দ-বিচরণ অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। নূতন জ্যোতিষের প্রচারাবধি পুরাতন জ্যোতিষের প্রতি নব্য সম্প্রদায় হতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, বৃদ্ধেরা অতি অজ্ঞ ছিল। কিন্তু প্রভেদের কারণ কি ? ভ্রমক্রমেও একবার চিন্তা করেন না ; চিন্তা করা আবশ্যকও মনে করেন না। পরন্তু দেশীয় জ্যোতিষের পুনরুন্নতির নিমিত্ত যে চিন্তাকরা আবশ্যক, তাহা সকলেরই স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষের পূর্ব্বাবস্থা ও মূলতত্ত্ব—মধ্যাবস্থা ও তাহার মূলতত্ত্ব,—বর্ত্তমান অবস্থা ও ইহার মূলতত্ত্ব ;—চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যদি আর কিছুকাল এই সকল বিষয়ের চিন্তা না করেন ; তাহা হইলে নিশ্চয়ই এদেশের মহা অনিষ্ট ঘটিবে। তাঁহারা ভ্রমবিলসিত গণনার কুহকে পড়িয়া গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুকালের বিপর্য্যয় করিয়া ফেলিবেন, আর বলিবেন " হায় ! কলিকালের কি প্রভাব ! শীতের সময় শীত নাই, গ্রীষ্মের সময় গ্রীষ্ম নাই, বর্ষার সময় বর্ষা নাই। অকালে বর্ষা, অকালে গ্রীষ্ম ! হবেইত ! না হওয়াই দোষ। হইলে শাস্ত্র সত্য হয়, ইত্যাদি—" অতএব পুরাতন জ্যোতিষের সঙ্গে নূতন জ্যোতিষের যে প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা এবং তাহার মূলানুসন্ধান করা অতীব কর্ত্তব্য।

প্রভেদ আছে, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু কোন্ কোন্ অংশে কি কি প্রকারের প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা হয়ত সকলে জ্ঞাত নহেন। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে একটি তালিকা প্রদান করিতেছি। এতদ্দ্বারা জানিতে পারিবেন যে, প্রাচীন সিদ্ধান্তের সহিত নবীন সিদ্ধান্তের কত প্রভেদ।

তালিকা

প্রাচীন সিদ্ধান্ত।	নবীন সিদ্ধান্ত
১। পৃথিবী স্থির, সূর্য্যাদি গ্রহমণ্ডল তাহাকে বেষ্টন করিতেছে।	১। সূর্য্য স্থির ; পৃথিবী স্বকেন্দ্রক ভ্রমণ দ্বারা তাহাকে পরিক্রমণ করিতেছে।
২। পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন।	২। পৃথিবীর ব্যাস ৮৭০ যোজন।
৩। চন্দ্র বিম্ব ব্যাস ৪৮০ যোজন।	৩। চন্দ্রবিম্ব ব্যাস ২৩৮ যোজন।
৪। সূর্য্য বিম্ব ব্যাস ৬৪০০ যোজন	৪। সূর্য্য বিম্ব ব্যাস ৯৭০০০ যোজন।
৫। চন্দ্র, ভূ-কেন্দ্র হইতে ৫১৫৬৬ পরিমিত যোজনান্তরে আছেন।	৫। চন্দ্র ভূকেন্দ্র হইতে ২৬১৩৪ যোজনান্তরে আছেন।
৬। সূর্য্য ভূ-কেন্দ্র হইতে ৬৮৯৩৭৭ যোজনান্তরে আছেন।	৬। সূর্য্য ভূকেন্দ্র হইতে ১০৪৪২১৫৪ যোজনান্তরে আছেন।

৭। মঙ্গলাদি গ্রহগণের বিম্বমান।

গ্রহ	কলা	বিকলা	গ্রহ	কলা	বিকলা
মঙ্গল	৪	৪৫	মঙ্গল	৬	২৯
বুধ	৬	১৫	বুধ	৬	৪৯
বৃহস্পতি	৭	২০	বৃহস্পতি	৩৬	৭৪
শুক্র	৯	০	শুক্র	১৬	১
শনি	৫	২০	শনি	১৬	২

প্রাচীন সিদ্ধান্ত।	নবীন সিদ্ধান্ত
৮। ভূকেন্দ্র হইতে সূর্য্য যত দূরে, নক্ষত্র সকল তাহার ৬০ গুণ দূরে ; এবং তাহারা সূর্য্যতেজে প্রকাশ পায়।	৮। ভূকেন্দ্র হইতে অসীম অন্তরে, এবং ইহাও নির্ণীত হইয়াছে যে, উহারা ভূকেন্দ্র হইতে সমান অন্তরে নহে ও আপন তেজেই প্রকাশ হয়।
৯। সকল গ্রহেরই যোজনাত্মক গতি তুল্য এবং তাহাদের কক্ষাবৃত্ত স্বরূপ।	৯। গ্রহদিগের যোজনাত্মক গতি বিষম অর্থাৎ সকলের সমান নহে এবং তাহাদের পথ বৃত্তাকার।
১০। এক নিরয়ন সৌর বৎসরে ৩৬৫ দিন, ১৫ ঘটিকা, ৩০ পল।	১০। একনিরয়ন সৌরবর্ষে ৩৬৫।১৫।২২½পল
১১। চন্দ্রের চক্রভোগ কাল ২৭ দিন, ৭ হোরা ৪৩। ১৯.'৩। ১২।সূর্য্যের পরম ক্রান্তি ২৪ অংশ।	১১। চন্দ্রের চক্রভোগ কাল ২৭দিন, ৭ হোরা ১৩।১১-৫৪।১২।সূর্য্যের পরম ক্রান্তি ২৭ অংশ,২৭ কলা।
ইত্যাদি।	ইত্যাদি। *

* ইংরেজী মান বাঙ্গলায় হিসাব করিয়া দেওয়া হইল

নবীন সিদ্ধান্তের সহিত প্রাচীন সিদ্ধান্তের এত প্রভেদ। নিদর্শনের জন্য অত্যল্প সংখ্যক বিষয় প্রদর্শিত হইল। পরন্তু এইরূপ বিষয়ের তারতম্য বা প্রভেদ আছে। প্রভেদ ঘটনার কারণ নানাবিধ। কতক অজ্ঞতা নিবন্ধন ভ্রম, কতক বা রূপক কল্পনা, কতক বা গাণিতিক পরিভাষার বিপর্য্যয়ঘটনা এবং কতক কালপরিবর্ত্তনের ধর্ম্ম। হয়ত পূর্ব্বকালে কথিত প্রকারই ছিল, পরিবর্ত্তিত বর্ত্তমান কালে নব্য সিদ্ধান্তের অনুরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।

জ্যোতির্বিদ্যা কেবল বেধ-মূলক। বেধই জ্যোতির্বিদ্যার জীবন। যদি এখনও চেষ্টা করা যায়, কোন নিপুণ ব্যক্তি যদি এক্ষণ হইতে নানাবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে বেধ নির্ণয় করিয়া প্রাচীন জ্যোতিষের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলেও অন্ততঃ অনেকাংশের বৈগুণ্য সমাধান হইতে পারে। "বেধ-করণ" ক্রিয়ার চর্চ্চা বহুকাল যাবৎ ভারত হইতে উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতেই এত ক্ষতি। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে যখন এদেশে জ্যোতির্বিদ্যার সঞ্চার হয়, তখন যে বেধক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে কিনা প্রথমকার বেধক্রিয়া কতকটা আনুমানিক, এজন্য সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম না হইতেও পারে।

প্রাগুক্ত প্রভেদ সমূহের মধ্যে কতকগুলি কেবল কাল-পরিবর্ত্তনের মাহাত্ম্যেই ঘটিয়াছে, বলা যাইতে পারে। বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিগ্রন্থে এক খণ্ড আছে,

"ইত্থং মাণ্ডব্য! সংক্ষেপাদুক্তং শাস্ত্রং ময়োদিতম্।
বিস্তরস্তো রবিচন্দ্রাদ্যৈর্ভবিষ্যতি যুগে যুগে॥"

হে মাণ্ডব্য! এবম্ভূত জ্যোতির্বিদ্যাটি আমি তোমায় সংক্ষেপে বলিলাম। পরন্তু চন্দ্রসূর্য্যাদির দ্বারা যুগে যুগে ইহার ব্যতিক্রম ঘটনা হইয়া থাকে।

অতএব কত কাল-কালান্ত অতীত হইয়া গিয়াছে, অথচ তাহার বেধ সংস্কার হয় নাই এরূপ হইলে গণনার ব্যতিক্রম না হইবে কেন? সূর্য্যের পরমক্রান্তি, তাহার চক্রভোগ কাল, ইত্যাদি পদার্থত ঠিক না হইবারই কথা। মধ্যে মধ্যে যদি বেধক্রিয়ার দ্বারা নির্ণয় করিয়া পুরাতন গ্রন্থের সংশোধন ও নব নব গ্রন্থের রচনা করা হইত, তাহা হইলে কখনই এত তারতম্য ঘটিত না। ভারতবর্ষে যখন জ্যোতির্বিদ্যার সমূহ উন্নতি, তখন তাঁহারা যে উপদেশটি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, পরভাবী গণক মহাশয়েরা যদি তাহা পালন করিতেন, তাহা হইলে কদাচ বিন্দুবিসর্গেরও ক্রটি হইত না। সেই উপদেশটি এই,—

"যস্মিন্ পক্ষে যত্র কালে যেন দৃগ্গণিতৈক্যকম্।
দৃশ্যতে যেন পক্ষেণ কুর্য্যাৎ তিথ্যাদি নির্ণয়ম্॥"

(এটি শ্রুতি নামে প্রসিদ্ধ।)

যে পক্ষে যে সময়ে যদ্দ্বারা দৃষ্টি ও

গণিতের ঐক্য সাধিত হয়, সেই পক্ষে সেই সময় অনুসারে তিথি আদির নির্ণয় করিবেক।

পরভাবী আচার্য্যেরা যদি পূর্ব্ব ঋষিদিগের এই উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের গ্রন্থ নির্ম্মাণ কালে তৎসাময়িক জ্যোতিঃপদার্থের বেধক্রিয়া, অনুমান ও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা একত্র বা ঐক্য করিয়া তত্তৎগ্রন্থ নির্ম্মাণ করাই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু অনেকে তাহা করেন নাই, কেবল কতকগুলি বাক্য সংগ্রহ করিয়া বাগ্বিচার দ্বারা গ্রন্থ গুলিকে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

যে সময়টিতে দিবামান ও রাত্রিমান তুল্য হয়, তাহাকে বিষুবপাত বলে। সূর্য্যের বিষুব রেখা স্পর্শই এই দিবারাত্রের তুল্যতা ঘটনার কারণ। বিষুব-সঞ্চার অনুসারেই "মহাবিষুব সংক্রান্তি" ও "জলবিষুব সংক্রান্তি" নাম হইয়াছে। অতি পুরাতন কালের কোন এক সময়ে বসন্ত ঋতুর প্রথমার্দ্ধ সমাপ্তি কালে সূর্য্যের বিষুব সঞ্চার হইয়াছিল। দিবামান ও রাত্রিমান তুল্য হইয়াছিল। তদনুসারে তাহার "মহাবিষুব সংক্রান্তি" নাম হয়। কিন্তু এখন তাঁহার অনেক পূর্ব্বে অর্থাৎ চৈত্রমাসের ১০ই তারিখে দিবারাত্রি সমান হইতেছে, তথাপি আমরা সেই বৈশাখ মাসের মহাবিষুব সংক্রান্তিই ধরিয়া আছি। যদিও লগ্নাদি নির্ণয় কালে তাহার শোধন করিয়া লওয়া হইয়া থাকে অর্থাৎ অয়নাংশ করিয়া তাহার সাম্য সম্পাদন করা হয়, তথাপি তাহাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ রীতি বলা যাইতে পারে না। এতদপেক্ষাও শোধনের কোন বিশেষ নিয়ম করা উচিত।

অনেকে বলিতে পারেন, যে গ্রহগতি ও ক্রান্তি প্রভৃতি যেন লড়িয়া গিয়াছে, শোধন করিয়া লইলেই হইল ; কিন্তু এমন কতক গুলি বিষয় আছে, যাহা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা বা ভ্রমের ফল ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। যথা—"পৃথিবী স্থির, সূর্য্যই তৎকেন্দ্রক পরিক্রম করেন, নক্ষত্র সকল স্বয়ং তেজস্বী নহে, সূর্য্যের তেজেই প্রকাশ পায়।" ইত্যাদি।

সত্য বটে, নবীন সিদ্ধান্তটি অনেকাংশে যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু এই সত্য তৎকালীয় কাহারও হৃদয়ে উদিত হয় নাই, এরূপ নির্দ্ধারণ করা যায় না। দ্বি সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। পরন্তু আমাদিগের বিবেচনা হয়, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিদিগের মনেও এই সত্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। কারণ এ সমস্ত কথা এরূপ গভীর ভাবে উল্লিখিত আছে যে, তাহা চলৎপৃথ্বীপক্ষে লইয়া গেলেও যাওয়া যায়। তবে যে তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া পৃথিবী স্থির বলিয়াছিলেন, তাহার অভিপ্রায় বোধহয় এই এবং ইহা সাধু অভিপ্রায় বলিয়াই বোধহয়। যথা,—

পৃথিবী সচলা, ইহা ব্যক্ত না করিলেও ক্ষতি নাই। বরং পৃথিবীর চলবত্তা বর্ণন করাতে ক্ষতি আছে। একটাকে ঘুরাইতে

হইবে, নচেৎ গণনাসিদ্ধি হয় না। সূর্য্য কি পৃথিবী একের ঘূর্ণন কল্পনা করিলেই যখন সমস্ত গণনাসিদ্ধি হয়,তখন অনুমান-গম্য পৃথিবী ঘূর্ণন অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সূর্য্য ঘূর্ণনের বর্ণনা করাই ভাল। ইহাতে গণনার কোন ইতি কর্ত্তব্যতার ক্ষতি নাই, অথচ সাধারণ লোকের সহজ বোধ্য। ইত্যাদি।

ঋষিদিগের অভিপ্রায় যে এইরূপ ছিল, মহাভারতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

" ইমাং মহীং শৈলবনোপপন্নাং
সসাগরগ্রামবিহারযুক্তাম্।
ত্বং শেষ! * * * চলিতাং যথাবৎ,
সংগৃহ্য তিষ্ঠস্ব যথাঽচলা স্যাৎ। "

আদিপর্ব্বের আস্তীক পর্ব্বীয় এই শ্লোকটির ভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হয় যে, ব্যাসের সময়ের ঋষিরা এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ, পৃথিবীর চলবত্ত্বা বুঝিতে পারিয়াও লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই। এই সময়েই পৃথিবীর " অচলা " নাম এবং পৃথিবী স্থির, সূর্য্যাদি গ্রহগণ ভ্রমণশীল, এই প্রকার মতের প্রাবল্য হয়। বহু কালের পর আবার আর্য্যভট্ট বিলুপ্ত মতের পুনঃ প্রচার করেন।

অনেকে বলিতে পারেন, ব্রহ্মা যে শেষ নাগকে সচল পৃথিবী নিশ্চল করিবার জন্য আদেশ করেন, সে নিশ্চলতা অন্যবিধ। পূর্ব্বে বোধ হয় সর্ব্বদাই ভূকম্প হইত, পৃথিবী তাহাতে অস্থির হইতেন। সেই চাঞ্চল্য নিবারণের জন্যই ব্রহ্মা, শেষ নাগকে আদেশ করেন। অদ্যাপি এদেশে ঐরূপ জন প্রবাদ প্রচলিত আছে। এবং এক্ষণ পর্য্যন্তও এদেশীয় অজ্ঞলোকেরা ভূকম্পের সময় বলিয়া থাকে যে, " বাসুকী মাথা বদল করিতেছেন। " অতএব পৃথিবীর প্রকৃত চলবত্ত্বা-জ্ঞান ঋষিদিগের ছিল কিনা সন্দেহ।

যদিও এই আপত্তির প্রকৃত উত্তর করিতে না পারি, তথাপি ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে,এ সম্বন্ধে ঋষিদিগের একেবারেই কিছু জ্ঞান ছিল না এমত নহে। অন্ততঃ চলবত্ত্বা জ্ঞানটি সংশয়ের আকারে ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। কেন না প্রদর্শিত শ্লোকের উত্তরে এবং অন্যান্য স্থলে দেখা গিয়াছে," চলিত " শব্দের পৃষ্ঠে 'নিয়ত" " সদা " প্রভৃতি এক একটি বিশেষণ আছে। কোথাও " আবর্ত্তন " শব্দ আছে। সুতরাং " নিয়ত-চলন " এইরূপ শব্দ দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঘূর্ণনরূপ চলন লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা ঐ সকল কথা লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক এ সকল বিষয়ের বহু আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীই ঘুরুন, আর গ্রহেরাই ঘুরুন, একটি ঘুরিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। কোনটি সত্য তাহা না দেখিলেও হানি নাই। কিন্তু অন্যান্য গণনার অংশগুলি অসত্য হইলেই এদেশের ভয়ানক ক্ষতি।

" গ্রহলাঘব " নামে একখানা জ্যোতিগ্রন্থ আছে, ইহা অনধিক ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে গণেশ দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক রচিত।

গণেশ দৈবজ্ঞ যখন এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন তিনি বেধক্রিয়ার সহিত প্রত্যক্ষ দর্শনের ঐক্য রাখিয়াই করিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত পুস্তকখানি অদ্যাপি নির্দ্দোষ আছে।

রাজা জয়সিংহ বারাণসীতে একটি বেধালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তিনি পুরাতন জ্যোতিগ্রন্থ গুলির সংস্কার করিবার অভিপ্রায় করিয়াই পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। বারাণসীস্থ বেধালয় বা মন্দিরের বর্ণনা দ্বারা পাঠকবর্গের চিত্তরঞ্জনের অভিলাষ রহিল।

শ্রীকালীবর বেদান্ত বাগীশ।

ভারতবর্ষীয় ভাষা।

বৈজ্ঞানিকগণ ভারতবর্ষের যাবতীয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাকে একটি স্বতন্ত্র মহাদেশ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। ভারতে ভূমণ্ডলের প্রত্যেক প্রকৃতি অল্প বা অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তদ্বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা আমাদের বিষয় ও উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। ভারতবর্ষে প্রায় বিংশতি কোটি মানব বাস করে। এই মানবসমূহ অন্যূন ষষ্টি সংখ্যক স্বতন্ত্র জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের সামাজিক ব্যবহারাদি পরস্পর অনৈক্য। ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি মানব বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র ভাষায় কথোপকথন করে। সেই ভাষা সমস্তের উৎপত্তি নির্ণয় করাই উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আর্য্যেরা ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন। আর্য্যদিগের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে নিতান্ত অসভ্যজাতি সমূহ বাস করিত। আর্য্যেরা ভারতভূমে প্রবেশ করিয়া ইহার অসভ্য অধিবাসিনিচয়কে বিদূরিত করেন। তাঁহাদের উৎপাতে উৎপীড়িত হইয়া প্রাচীন অধিবাসিগণ অধিকাংশ দাক্ষিণারণ্য নামক জনহীন অরণ্য মধ্যে, অবশিষ্টেরা দুর্গম হিমাচল আশ্রয়ে প্রস্থান করে। এই অসভ্যজাতিদিগের ভাষা তাহাদের স্বভাবানুগত ছিল। আর্য্যেরা পবিত্র-সলিলা গঙ্গা ও যমুনা নদীদ্বয়ের অন্তর্ভূমে আবাস সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভুবনবিখ্যাত সংস্কৃত ভাষা আর্য্যদিগের সহিত ভারতভূমে প্রবেশ করে। দেব-ভাষা সংস্কৃতমধ্যে বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা এতই প্রাচীন যে, ইহার প্রণেতা কে, তাহা অধুনা নির্ণয় করা অসাধ্য। ইহার প্রাচীনত্ব হেতুই হউক, বা ইহার পবিত্রতা রক্ষা করিবার নিমিত্তই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, হিন্দুগণ বেদকে অপৌরুষেয় ব-

লিয়া থাকেন। যথা ;—

জৈমিনী—১।১।৩২ সূত্রের অষ্টমাধিকরণ

" পৌরুষেয়ং নবা বেদ-
বাক্যং স্যাৎ পৌরুষেয়তা।
কাঠকাদি সমাখ্যানাৎ
বাক্যত্বাচ্চান্যবাক্যবৎ ॥
সামাখ্যাধ্যাপকত্বেন
বাক্যত্বন্ত পরাহতম্।
তৎ কর্ত্রনুপলম্ভেন
স্যাত্ততোহপৌরুষেয়তা ॥"

বেদের ভাষা প্রচলিত সংস্কৃতের সহিত সমান নহে। এই জন্য প্রচলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ অভ্যাস করিলে বেদশাস্ত্রে প্রবেশ করা যায় না। সংস্কৃতের পরেই বা সমকালে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হয় *। সংস্কৃত যেরূপ সুসম্পন্ন, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও কঠিন ভাষা, তাহাতে সতত কথোপকথনে সংস্কৃত ব্যবহার করা সহজ নহে। বোধ হয় এই জন্যই কথোপথন কার্য্য সুনির্ব্বাহিত করিবার নিমিত্ত অন্য ভাষার প্রয়োজন হইয়া উঠে। প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়া সেই প্রয়োজন সংকুলান করে।

সংস্কৃত ভাষা হইতে যে প্রাকৃতের উৎপত্তি, এ সম্বন্ধে বিস্তর অকাট্য প্রমাণ আছে। বররুচি সংস্কৃত ভাষার অতি প্রা-

* কোন কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, প্রাকৃত ভাষাই আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন ভাষা। আমরা এস্থলে তাঁহাদিগের যুক্তিনিচয় প্রকটন করিতেছি।

তাঁহারা বলেন সংস্কৃতের ন্যায় কঠিন ভাষা, কদাচ কথোপকথনের উপযোগী নহে। ইহা কস্মিন্ কালে কথিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কথিত ভাষা স্বতন্ত্র ছিল। সেই ভাষার নাম প্রাকৃত। সেই প্রাকৃত ভাষাকে 'সংস্কৃত' অর্থাৎ বিশুদ্ধ করিয়া কাব্য দর্শনাদি লিখিবার নিমিত্ত যে ভাষা সৃষ্ট হয় তাহার নাম সংস্কৃত। তাঁহারা প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষাদ্বয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের প্রসূতী ও প্রসূতা সম্বন্ধ অনুমান করেন। আমরা পাঠকবৃন্দের গোচরার্থ কয়েকটি প্রাকৃত ও তাহার সংস্কৃত শব্দ নিম্নে লিখিতেছি।

প্রাকৃত	সংস্কৃত
গদ	গত
হত্ত	হস্ত
পচ্চিম	পশ্চিম
লোনম্	লবণম্
থান	স্থান
গাম	গ্রাম
হলদ্দা	হরিদ্রা
মাদরম্	মাতরম্
অগ্গিম্	অগ্নিম্
বাহ্মন	ব্রাহ্মণ
চয়ুথি	চতুর্থী
চয়ুদ্দশী	চতুর্দ্দশী
ছট্টী	ষষ্ঠি
ছণ	ক্ষণ
একত্থ	একস্থ

চীন বৈয়াকরণ। তিনি প্রাকৃতকে সংস্কৃত-সম্ভূতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্থান-ভেদে ও ব্যবহার-ভেদে প্রাকৃতের বিস্তর রূপান্তর হয়। "প্রাকৃত-প্রকাশে" প্রাকৃতের চারি ভাগ উক্ত হইয়াছে। যথা ;— (১) মহারাষ্ট্রীয়, (২) পৈশাচী, (৩) মাগধী, (৪) শৌরসেনী। এই ভাষানিচয় মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা প্রধান প্রাকৃত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাকৃতের দ্বিতীয় রূপান্তর পৈশাচী ভাষা, শৌরসেনী ভাষা হইতে সমুদ্ভূত। বররুচি প্রণীত

মণ্থক	মস্তক
পবিদা	প্রপিতা
অত্তি	অস্তি
	ইত্যাদি

এই তালিকাদৃষ্টে আমাদের বিবেচনায় প্রাকৃত সংস্কৃত-মূলক বলাই যুক্তিযুক্ত। তাঁহারা আরও কহেন, 'প্রকৃতিস্তু চাপরে জনাঃ' এরূপ বিবেচনা না করিয়া "প্রকৃতি" অর্থাৎ স্বভাব "প্রাকৃত" অর্থাৎ চিরাগত বিবেচনা করিলে, প্রাকৃতের প্রাচীনত্ব সমর্থিত হয়। ইত্যাদি রূপ কতকগুলি যুক্তি অবলম্বন করিয়া কোন কোন পণ্ডিত প্রাকৃতকে সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আমরা এ কথার কোন সামঞ্জস্য করিতে পারি না। আমাদের মতে এ সকল যুক্তি অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং পণ্ডিত মণ্ডলীকে ইহার মীমাংসা করিবার ভার দিতেছি।

"প্রাকৃত-প্রকাশ" গ্রন্থের মনোরমাখ্যাত টীকাকার লিখিয়াছেন যে,—

"পিশাচানাম্ ভাষা পৈশাচী। অস্য পৈশাচ্যঃ প্রকৃতিঃ শৌরসেনী।"

পিশাচদিগের ভাষা পৈশাচী। এই পৈশাচীর প্রকৃতি শৌরসেনী।

বররুচির কথা প্রমাণে মাগধী ভাষাও পৈশাচীর ন্যায় শৌরসেনীর প্রকারভেদ এবং শৌরসেনী ভাষা সংস্কৃত হইতে সমুৎপন্ন। বররুচি এই সকল প্রাকৃত মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়কে প্রধান প্রাকৃত এবং তাহাও সংস্কৃত-মূলক বলিয়াছেন। এতাবতা প্রমাণ হইতেছে যে, মহারাষ্ট্রীয় বা প্রধান প্রাকৃত ও শৌরসেনী এই ভাষাদ্বয় সাক্ষাৎ সংস্কৃত-মূলক। মাগধী ভাষাকে সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা শৌরসেনী-মূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভাষা-তত্ত্ব-বিৎ লাসেন বলেন, মাগধী ভাষা আলোচনা করিলে উপলব্ধ হয় যে, ইহাও মহারাষ্ট্রীয় এবং শৌরসেনীর ন্যায় সংস্কৃত-মূলক। লাসেন বলেন পৈশাচী ভাষাও সংস্কৃত সঞ্জাত। তিনি সংস্কৃত বৈয়াকরণগণকে এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন। ফলতঃ এ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর লাসেনের যুক্তি সমধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃতের পতন সময়ে বা সমকালে উক্ত ভাষা চতুষ্টয় জন্ম গ্রহণ করে। তাহাদের সকলই এক মূল-ভাষা সংস্কৃত হইতে সম্ভূত, ইহা মনে করা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। এই চারি ভাষা কথোপকথনের সুবিধা

সাধনার্থ সৃষ্ট হয়। ইহারা যে এককালে বিলক্ষণ চলিত ভাষা হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়, মাগধী ও শৌরসেনী এই ভাষাত্রয়ের নাম প্রমাণ করিতেছে যে, উহারা উক্ত নামধেয় প্রদেশত্রয়ে প্রচলিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবিষ্কর্ত্তা শাক্যসিংহের মাতৃভাষা মাগধী। এ নিমিত্ত মাগধীভাষা বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিসহ বিশেষ উন্নত হইয়া উঠে। মাগধী ভাষায় বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বিরচিত হয়। যখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতময় প্রচলিত হইয়াছিল, মাগধী ভাষাও তৎকালে বহুবিস্তৃত হইয়াছিল। সিংহলে গিয়া মাগধী ভাষা পালি নাম গ্রহণ করে। শৌরসেনী ভাষাও মাগধীর ন্যায় জৈনদিগের ধর্ম্মভাষা।

"প্রাকৃত কল্পতরু" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত চারি ভাষা এবং অর্দ্ধমাগধী ও দাক্ষিণাত্য ভাষা, এই ছয় ভাষার সাধারণ নাম ভাষা। এই ভাষা সমস্তের অপর শ্রেণীর নাম বি-ভাষা। যথা,—

সকারী বা চণ্ডালিকা
সাবরী
আভীরী
দ্রাবিড়ী
উৎকলী।

এই কয় ভাষাও নাটকাদিতে প্রযুক্ত হইয়াছে। এ নিমিত্ত ইহাদিগকে অপভ্রংশ নাম দেওয়া হয় নাই। বিভাষার পরাগত শ্রেণীর নাম অপভ্রংশ। বাঙ্গালা, গুজরাটী প্রভৃতি যে সকল চলিত ভাষা নাটকাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই তাহাদের নাম অপভ্রংশ।

পণ্ডিতবর বীম্‌স্‌ সাহেব নিম্নলিখিত চলিত ভাষাগুলির মূল উল্লিখিতবৎ স্থির করিয়াছেন। যথা,—

১। হিন্দি
২। বাঙ্গালা
৩। পঞ্জাবী
৪। সিন্ধি
৫। মহারাষ্ট্রী
৬। গুজরাটী
৭। নেপালী
৮। উড়িয়া
৯। আসামী।
১০। কাশ্মীরী

এই একাদশ ভাষার সকল গুলিই অধুনা ভারতবর্ষের স্থান বিশেষে চলিত আছে। উক্ত ভাষা সমস্তের ব্যবহারভেদে ও স্থানভেদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রূপান্তর হইয়াছে। প্রত্ন-তত্ত্বানুসন্ধায়ী বীম্‌স্‌ সাহেব গুরুতর পরিশ্রম সহকারে তৎসমস্ত নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি হিন্দি ভাষার নিম্নলিখিত কয় শ্রেণী স্থির করিয়াছেন। যথা ;—

মৈথিলী—(পূর্ণিয়া ও ত্রিহুতের ভাষা)
মগধ—(দক্ষিণ বিহারের ভাষা)
ভোজপুরি—(সাহাবাদ, সারণ, চাম্পারণ, গোরক্ষপুর, প্রাচ্য অযোধ্যা এবং বারাণসীর ভাষা)

কোশলী—(অযোধ্যা এবং রোহিল খণ্ডের ভাষা।)

ব্রজভাষা—(উত্তর দোয়াব, আগ্রা এবং দিল্লীর ভাষা।)

কনোজী—(দক্ষিণ দোয়াবের ভাষা)

রাজপুত ভাষা—(রাজপুতানার ভাষা)

বুঁদেলখণ্ড-ভাষা—(চম্বল হইতে শোন নদী পর্য্যন্ত প্রদেশের ভাষা।)

বীম্‌স-সাহেব বাঙ্গালা ভাষার কোনও প্রকারভেদ লেখেন নাই। তিনি উড়িয়া ও আসামী ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ দুই ভাষাকে বাঙ্গালার রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। এ সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি আছে তাহা বিবৃত করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিতে হয়।

পঞ্জাবীর অনেক প্রশাখা। পঞ্জাবের প্রত্যেক প্রদেশের ভাষায় অল্প বা অধিক পরিমাণে বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়।

সিন্ধীয় ভাষার নিম্ন-লিখিত প্রভেদ আছে।

সিরাই—(উত্তর সিন্ধের ভাষা।)।

বিচোলি—(দক্ষিণ সিন্ধের ভাষা।)।

লারি—(নিম্ন সিন্ধের ভাষা।)

উছ—(মুলতানের ভাষা)

কচ্ছি—(কচ্ছের ভাষা)

মহারাষ্ট্রীয় ভাষার নিম্নলিখিত চারি প্রকার বিভিন্নতা আছে।

কন্‌কানি—(রত্নগিরি এবং সমুদ্র সন্নিহিত স্থানের ভাষা।)

দাক্ষিণা—

গোমন্তকী বা কুদালি—(সাবন্ত বাড়ীর নিকটের ভাষা।)

খান্দেশী—

গুজরাটের তিন স্বতন্ত্র প্রদেশে ত্রিবিধ ভাষা কথিত হয়। ঐ তিন ভাষাই মূল গুজরাটীর প্রশাখা মাত্র। যে তিন স্থানে ভাষার স্বতন্ত্রতা আছে, তাহাদের নাম ;—

সুরত এবং বরোচ

অমেদাবাদ

কাটিওয়ার

বিশুদ্ধ নেপালীকে পার্ব্বত্য বা পাহাড়ী বলে। তাহার যে কয় শাখা আছে, মূলের সহিত তাহাদের প্রভেদ সামান্য। নিম্ন-লিখিত স্থান সমূহের ভাষায় সামান্য বিভিন্নতা আছে।

পাল্পা

কমায়ুন

গাড়ওয়াল

থাক

মহাত্মা বীম্‌স্ পূর্ব্ব-লিখিত ভাষাগুলিকে সংস্কৃত-মূলক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষ প্রচলিত অপর যে সমস্ত ভাবা আছে, তৎসমুদয়কে তিনি জেন্দ, অর্থাৎ প্রাচীন পারস্য-মূলক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বীম্‌স্ সাহেব যে যে রূপান্তরে উক্ত জেন্দ-মূলক ভাষা সমস্ত ভারতবর্ষে চলিত আছে বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। ভোটিয়া বা ভোটান্তা (ভোট-রাজ্যে)
২। লেপ্‌চা (সিকিম রাজ্যে)
৩। চিম্বু } (সোন, কোশী ও অরুণ নদী-মধ্যস্থ স্থানে)
৪। কিরন্তি
৫। মুর্ম্মি (পুর্ব্ব নেপাল)
৬। গরুঙ্গ (ঐ)
৭। নেওয়ার (মধ্য নেপাল)
৮। মগর (ঐ)
৯। ব্রাহ্ম (ঐ)
১০। চিপঙ্গ } (অযোধ্যা। বায়ু—পূর্ব্ব নেপালেও চলিত)
১১। কুসুণ্ড
১২। বায়ু
১৩। সনওয়ার (পশ্চিম নেপাল)
১৪। সর্প (ঐ)
১৫। কনওয়ারি বা মিলচান
১৬। তিবারস্কদ } (কুমাওনের উত্তরে)
১৭। হুন্দেশী
১৮। দারাহি বা দোর্হি
১৯। নেওয়ার }
২০। পাহাড়ী
২১। কাশওয়ার (মধ্য নেপাল)
২২। পাক্ষ
২৩। তক্ষ
২৪। ধীমল (নেপাল ও ভোটের কিয়দংশ)
২৫। মেচী (ঐ)
২৬ বেরো (কাছাড়)
২৭ গারো (গারোপাহাড়)
২৮ অক }
২৯ আবর
৩০ মিসমি } (আসাম সান্নিধ্যে)
৩১ মিরি
৩২ দফ্‌লা

৩৩। খসিয়া (আসামের দক্ষিণ)
৩৪। মিকির (ঐ)
৩৫। নাগা } ঐ (নাগার প্রশাখা)
ক। রেঙ্গমা
খ। অঙ্গামি
গ। লোটা
৩৬। সিঙ্গফো (ঐ)
৩৭। কুকি (চট্টগ্রামের উত্তর)
৩৮। মনিপুরি ভাষা।
৩৯। কোরেঙ্গ ভাষা
৪০। কারেণ ভাষা
৪১। সাঁওতাল
৪২। কোল (চয়বাসা)
৪৩। ভূমিজা (পুরুলিয়া)
৪৪। মণ্ডালি (ছোট নাগপুর)
৪৫। কোলেহান
৪৬। খন্দ (সম্বলপুর)
৪৭। গন্দ
৪৮। উরায়ন (সরগুজা)
৪৯। তেলুগু
৫০। তামিল
৫১। কর্ণাটক
৫২। মলয়ালম্
৫৩। তুলুচু
৫৪। কুর্গ
৫৫। তুদু
৫৬। বুদগড় } নীলগিরিপাহার
৫৭। ইরুলার
৫৮। কোহতর
৫৯। সিংহলীয়

বীম্‌স্ সাহেব-প্রদত্ত ক্রেন্দমূলক ভা-

ষাসমূহের তালিকা উল্লিখিত হইল। "শব্দভাষা চন্দ্রিকা" প্রণেতা লক্ষ্মীধর, পৈশাচী ভাষার যে সমস্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা মহাত্মা বীমস্ কর্ত্তৃক নিরূপিত জেন্দমূলক ভাষা সমূহের স্থানের সহিত প্রায় মিলিতেছে। লক্ষ্মীধর যে সকল স্থানের কথা বলিয়াছেন, অধুনা সে সকল স্থানের নাম ও সীমা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে লক্ষ্মীধরোক্ত পৈশাচী ভাষার স্থান সকলের নাম উল্লেখ করিতেছি।

পাণ্ড্য
কেকয়
বাহ্লীক
সহ্য
নেপাল
কুন্তল
সুদেশ
ভোট
গান্ধার
হৈব
কনোজানা

পাঠকগণ প্রাচীন ভূগোল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে, লক্ষ্মীধর কথিত পৈশাচী ভাষার এই প্রাচীন স্থান সমূহ ও বীম্‌স সাহেব কর্ত্তৃক নির্ণীত জেন্দ-মূলক ভাষা সমস্তের স্থান অধিকাংশই এক। সুতরাং এই দুই তালিকা পর্য্যালোচনা করিয়া উপলব্ধ হইতেছে যে, বীম্‌স্ সাহেব যে সকল ভাষাকে জেন্দ-মূলক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণে তাহা পৈশাচী নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা পৈশাচিক ভাষাকে জেন্দমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না। কারণ সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন যে, পৈশাচী ভাষা সংস্কৃতমূলক। তাঁহারা পৈশাচীকে প্রাকৃতের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রাকৃত যে সংস্কৃতমূলক তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। যথা ;—হেমচন্দ্র—

"প্রাকৃতঃ সংস্কৃতাৎ, তত্র ভবম্ ততঃ আগতম্ বা প্রাকৃতম্।"

"প্রাকৃত সংস্কৃতমূলক, প্রাকৃত সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বা আগত।"

এ সম্বন্ধে অন্য প্রমাণ সংকলনের প্রয়োজন নাই।

ভাষা-তত্ত্ব-বিৎ লাসেন সাহেব বলিয়াছেন যে, পৈশাচী সংস্কৃত হইতে সাক্ষাৎ সমুদ্ভূত। কিন্তু আমরা যতদূর দেখিতেছি তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বীম্‌স্ সাহেবের জেন্দমূলক ভাষা ও সংস্কৃতমূলক পৈশাচী ভাষা এক। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, বীম্‌স্ মহোদয় পৈশাচী ভাষাকেই জেন্দমূলক বলিয়াছেন ; কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোড়ন করিয়া ইহা নিঃশংসয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পৈশাচী সংস্কৃত-মূলক। তবে বীম্‌স্ সাহেব এ কথা কেন বলিতেছেন ? স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে ইহার কারণ অনুমান করা

যাইতে পারে। পৈশাচী ভাষা যখন প্রথমে সংস্কৃত হইতে জন্ম গ্রহণ করে, তখন তাহার প্রকৃতি অবিকল সংস্কৃতের ন্যায় ছিল, তখন শুনিলে তাহা যে সংস্কৃতমূলক একথা নিসংশয়ে বলা যাইত। কিন্তু কালচক্রে সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়। কালচক্রে পৈশাচী-ভাষাও পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল। যে যে স্থানে পৈশাচী ভাষা প্রচলিত হয়, তাহার অধিকাংশ ভারতের সীমাস্থ প্রদেশ। সেই সীমা অতিক্রম করিলেই যে যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, তথায় জেন্দমূলক ভাষা প্রচলিত। অসম্ভব নয় যে, ভারতের সীমান্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশস্থ ব্যক্তিগণ উক্ত বৈদেশিক ব্যক্তিগণের সহিত বহুবিধ সম্বন্ধে বদ্ধ হয়। ক্রমে ঐ জেন্দমূলক ভাষা পৈশাচী ভাষার সহিত বিমিশ্রিত হইতে থাকে। এবং কালক্রমে পৈশাচীভাষা এরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে, এক্ষণে তাহাকে দেখিলে সংস্কৃতমূলক বলিয়া বোধ না হইয়া জেন্দমূলক বলিয়াই অনুমান হয়। দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানদিগের সহিত যখন বঙ্গদেশের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তখন মুসলমানীয় ভাষা এত অধিক পরিমাণে বঙ্গভাষার সহিত বিমিশ্রিত হইয়াছিল যে, বঙ্গভাষাকে প্রায় এক স্বতন্ত্র ভাষার স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। সেইরূপে সংস্কৃতমূলক পৈশাচীর সহিত, জেন্দমূলক অপর ভাষা মিশিয়া যে তাহাকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি!

এ সম্বন্ধে আরও এক কারণ অনুমিত হইতে পারে। সামাজিক ব্যবহার বিষয়ে পৈশাচিকগণ, হিন্দুগণের নিকট হইতে কদাপি সহানুভূতি প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদিগের আনুগত্যও জন্মে নাই। তাহাদের শাস্ত্রভ্রষ্ট আচার ব্যবহার হিন্দুচক্ষে নিতান্ত দূষণীয় হইলেও ভারতের সীমা বহির্ভূত প্রদেশস্থ ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক প্রতিপোষিত হইয়াছিল। এমন কি, পিশাচদিগের কোন কোন ব্যবহার, তাহাদিগের নিকট বিশেষ সমাদরে পরিগৃহীত হয়। এই সকল কারণ বশতঃ তাহাদের সহিত পিশাচদিগের যথেষ্ঠ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ঈদৃশ স্থলে একের ভাষা অপরের সহিত বিশিষ্টরূপে বিমিশ্রিত হওয়া নিতান্তই সম্ভবপর।

এতাবতা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে যে, দেবভাষা সংস্কৃতই ভারতবর্ষের যাবতীয় মৃত বা জীবিত ভাষার মূল-প্রস্রবণ। ভাষা ও ধর্ম্মের ঐক্য মানবসমাজের একতা সংস্থাপনের সর্ব্বপ্রধান কারণ। অধুনা ভারতবর্ষীয় নানাবিধ ভাষা ও আর্য্য হিন্দুধর্ম্মের বহুবিধ প্রকার ভেদ নিবন্ধন আমরা ভারতবাসিগণের এতাদৃশ মানসিক বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া থাকি। অধিক কি, ভাষাগত অতি সামান্য প্রভেদ বশতঃ পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গবাসিগণের মধ্যে খাদ্য খাদক সম্বন্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কথাটি বড় ভাল নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা দারুণ লজ্জা ও ঘৃণার কথা। বঙ্গদেশ মধ্যে ভাষার ত প্র-

ভেদ নাই বলিলেই হয়, একটুকু ধৈর্য্য ও উদারতা সহকারে বিবেচনা করিলে বোধ হইবে, যখন ভারতের সমস্ত ভাষাই এক সাধারণ মূল হইতে সমুৎপন্ন, তখন ভারতবর্ষীয় কোন জাতিই অপর জাতি হইতে ভাষার বিভিন্নতা হেতু জাতান্তররূপে পরিচিত হইতে পারেন না। প্রত্যুত কি আগরওয়ালা (সেতুয়াবাদী) কি মতাস্বীন (বর্গী) কেহই স্বতন্ত্র জাতি নহেন। যদি আমরা তাহা মনে করি, তাহা হইলে আমাদিগের লঘুচিত্ততারই পরিচয় প্রদান করা হয়। আর তাদৃশ সংস্কারের প্রাবল্য হেতুই অদ্য অপর সমস্ত জাতির সহিত আমাদিগের এত পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ভবিষ্যতে উহা আরও বিস্তৃত হইয়া আমাদের যাবতীয় আশা ভরসা একেবারে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবে এবং কালে ভারতের এমন বিষম ব্যাধি উপস্থিত হইবে যে, কোন সুচিকিৎসকই তখন উহার প্রকৃত ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া জীবনদানে সমর্থ হইবেন না।

শ্রীদাঃ—

জীবন প্রভাত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জীবন উষা।

"দেও করতালি, জয় জয় বলি,
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ।
ঐ যে প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে
উদয় অরুণ উষার সহ॥"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ্রীষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই গজনীর অধিপতি মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, ও সেই শতাব্দী শেষ না হইতেই আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ মুসলমানদিগের হস্তগত হয়। সেই বিপুল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমানেরা কএক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিলেন, বিন্ধ্যাচল ও নর্ম্মদাস্বরূপ বিশাল প্রাচীর ও পরিখা পার হইবার সহসা কোন উদ্যম করেন নাই। অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর যুবরাজ আলাউদ্দীন খিলজী অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী সেনা সহিত নর্ম্মদা নদী পার হইলেন ও খন্দেশ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সহসা হিন্দু-রাজধানী দেবগড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবগড়ের রাজা সন্ধির প্রস্তাব করিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজপুত্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল সংগ্রামে হিন্দুসেনা পরাস্ত হইল এবং হিন্দুরাজা বহু অর্থ ও ইলিচপুর প্রদেশ দান করিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন। পরে আলাউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট্ হইলে, তাঁহার সেনা-

পতি মালীক কাফুর তিন বার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন ও নর্ম্মদা তীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করেন। তথাপি আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কেবল দেবগড় ভিন্ন আর সমুদায় প্রদেশ পুনরায় হিন্দুদিগের হস্তগত হইল।

চতুর্দ্দশ খ্রীঃ শতাব্দীতে যখন টোগ্লক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার পুত্র যুনাস পুনরায় দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া সমুদায় তৈলঙ্গ প্রদেশ অধিকার করেন (১৩২৩ খ্রীঃ), পরে মহম্মদ টোগ্লক নাম ধারণ করিয়া স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট্ হইয়া রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগড়ে আনিবার প্রয়াস পান। দেবগড়ের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া দৌলতাবাদ রাখিলেন এবং সমস্ত দিল্লীবাসিদিগকে তথায় যাইবার আদেশ দিলেন। পীড়া ও নানা স্থানে বিদ্রোহ নিবন্ধন যখন এই প্রয়াস নিষ্ফল হইল, তখনও সম্রাট্ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিলেন না। সুতরাং দক্ষিণের হিন্দু ও মুসলমান সকলে বিরক্ত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। তৈলঙ্গ প্রদেশ জয়ের পর সেই স্থানের কতকগুলি হিন্দুনিবাসী বিজয়নগরে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন (খ্রীঃ ১৩৩৫); এবং জফীর খাঁ নামক একজন মুসলমান তৈলঙ্গের রাজার সহায়তায় দিল্লীর সেনাপতি ঊমাদউলমুলককে তুমুল সংগ্রামে পরাভূত করিয়া দৌলতাবাদে একটি স্বতন্ত্র মুসলমানরাজ্য স্থাপন করিলেন (খ্রীঃ ১৩৪৭)। কালক্রমে বিজয়নগর ও দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দুইটি প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল এবং প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাট্গণ দাক্ষিণাত্য হস্তগত করিবার আর কোনও চেষ্টা করেন নাই।

কিন্তু এই বিপদ্ হইতে নিস্তার পাইলেও দক্ষিণে হিন্দু-সাম্রাজ্য বিপৎশূন্য ছিল না। হিন্দুগণ গৃহের মধ্যে দৌলতাবাদস্বরূপ মুসলমান রাজ্যকে স্থান দিয়া ছিলেন। সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও অবনতিশীল, বিজয়ী মুসলমানদিগের জাতীয়জীবন উন্নতিশীল ও প্রবল, সুতরাং একে অন্যের ধ্বংস সাধন করিল। কথিত আছে দৌলতাবাদের প্রথম রাজা জফীর খাঁ পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস ছিলেন, ব্রাহ্মণ বালকের বুদ্ধিবল দেখিয়া তাহাকে স্বাধীন করিয়া দেন। পরে যখন জফীর খাঁ রাজা হইলেন, তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণকে আপন কোষাধ্যক্ষ করেন ও সেই কারণে জফীরের বংশ বাহ্মিনী (ব্রাহ্মণীয়) বংশ বলিয়া খ্যাত। কালক্রমে দৌলতাবাদ রাজ্য বর্দ্ধিতায়তন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইল, এবং একটির স্থানে বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদ নগর নামক তিনটি মুসলমান-রাজ্য হইয়া উঠিল। ১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে বাহ্মিনী বংশ ও দৌলতাবাদ

রাজ্য লোপপ্রাপ্ত হইল, এবং মুসলমান রাজগণ একত্র হইয়া ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দে টেলিকোটা বা রক্ষিত গণ্ডীর যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্য পরাস্ত করিয়া সেই হিন্দু-রাজ্যের লোপ সাধন করিলেন। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-স্বাধীনতা এক প্রকার বিলুপ্ত হইল ও বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটি মুসলমান-রাজ্য প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের হিন্দুরাজগণও ক্রমে বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

১৫৯০ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট্ আকবর পুনরায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য দিল্লীর অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন, ও তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমস্ত খন্দেশ ও আহম্মদনগর রাজ্যের অধিকাংশ দিল্লী সৈন্যের হস্তগত হয়। তাঁহার পৌত্র শাহজিহান ১৬৩৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে সমগ্র আহম্মদনগর রাজ্য অধিকৃত করেন, সুতরাং আখ্যায়িকা বিবৃতকালে দাক্ষিণাত্যে কেবল বিজয়পুর ও গলখন্দ এই দুইটি পরাক্রান্ত স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ছিল।

এই সমস্ত রাজবিপ্লবের মধ্যে দেশীয় লোকদিগের অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমাদিগের জানা আবশ্যক। মুসলমান রাজ্যের অধীনে অর্থাৎ প্রথমে দৌলতাবাদের, পরে আহম্মদনগর, বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বস্তুতঃ মুসলমানদিগের দেশশাসন-কার্য্য অনেকটা মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধিবলেই পরিচালিত হইত। প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি সরকারে, ও প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল, এবং সেই সমস্ত সরকার ও পরগণায় কখন কখন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু অধিক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় কার্য্যকারিগণই কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। মহারাষ্ট্র-দেশ পর্ব্বত-সঙ্কুল, ও সেই সমস্ত পর্ব্বতচূড়ায় অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। মুসলমান সুলতানগণ সেই সকল পর্ব্বত-দুর্গ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত রাখিতে সঙ্কুচিত হইতেন না; কিল্লাদারগণ কখন কখন রাজকোষ হইতে বেতন পাইতেন, কখন বা চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমির জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আয় হইতে দুর্গরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় করিতেন। এই সমস্ত কিল্লাদার ও দেশমুখ ভিন্ন মুসলমান সুলতানদিগের অধীনে অনেক হিন্দু মনসবদার ছিলেন। তাঁহারা শত কি দ্বিশত কি পঞ্চশত কি সহস্র কি তদধিক অশ্বারোহীর সেনাপতি, সুলতানের আদেশমতে সেই সেই পরিমাণ সৈন্য লইয়া যুদ্ধ সময়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন, এবং সৈন্যের বেতন ও আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য এক একটি জায়গীর ভোগ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সেনা শীঘ্রগতিতে ও ত্বরিত যুদ্ধে অদ্বিতীয়, এবং নিজ নিজ সুলতানদিগকে যুদ্ধসময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন; সময়ে সময়ে তাঁহারা আপনামধ্যেও

ঘোরতর বিবাদে লিপ্ত হইতেন। বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে চন্দ্ররাও মোরে দ্বাদশ সহস্র পদাতিকের সেনাপতি ছিলেন এবং সুলতানের আদেশেনীরা ও বার্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। সুলতান পরিতুষ্ট হইয়া সেই দেশ চন্দ্ররাওকে অল্পমাত্র কর ধার্য্য করিয়া জায়গরস্বরূপ দান করেন ও চন্দ্ররাওয়ের সন্ততিগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজা খেতাবে সেই প্রদেশ স্বচ্ছন্দে সুশাসন করেন। এইরূপ রাওনায়েক নিম্বালকর বংশ পুরুষানুক্রমে ফলতন দেশের দেশমুখ হইয়া সেই দেশ শাসন করেন। এইরূপে ঘাটগী বংশ মলওরী প্রদেশে, মনর বংশ সুখর প্রদেশে, ঘরপুরীয় বংশ কাপসী ও মধোল দেশে, ডফে বংশ ঝাটপ্রদেশে ও শবন্ত বংশ ওয়ারিপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়া পুরুষানুক্রমে বিজয়পুরের সুলতানের কার্য্য সাধন করিতে থাকেন, ও সময়ে সময়ে আপনাদিগের মধ্যেই তুমুল সংগ্রাম করিতেন। জ্ঞাতি বিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই; পর্ব্বত-সঙ্কুল কঙ্কণ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালেই স্থানীয় বড় বড় বংশে আত্মবিরোধ দৃষ্ট হইত, ও পর্ব্বতকন্দরে ও উর্ব্বরা উপত্যকায়, সর্ব্বদাই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইত। বহু শোণিতপাত হইলেও সেগুলি কুলক্ষণ নহে, সেগুলি সুলক্ষণ; পরিচালনা দ্বারা আমাদের শরীর যেরূপ সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, সর্ব্বদা কার্য্য ও উপদ্রব ও বিপর্য্যয় দ্বারা জাতীয় বল ও জাতীয় জীবন সেইরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয় জীবন-উষার প্রথম রক্তিমচ্ছটা শিবজীর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বেই ভারত-আকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল।

আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে যাদবরাও ও ভন্‌স্লে নামক দুইটি পরাক্রান্ত বংশ ছিল। সিন্ধুক্ষীরের যাদবরাওয়ের ন্যায় পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রবংশ সমস্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশে আর কোথাও ছিল না, এবং অনেকে বিবেচনা করেন দেবগড়ের প্রাচীন হিন্দুরাজ বংশ হইতেই এই পরাক্রান্ত বংশ উদ্ভূত। ষোড়শ খ্রীঃ শতাব্দীতে লক্ষজী যাদবরাও আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনস্থ একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন; তিনি দশ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি ছিলেন ও প্রশস্ত জায়গীর ভোগ করিতেন। ভন্‌স্লেবংশ যাদবরাওয়ের ন্যায় উন্নত না হইলেও একটি প্রধান ক্ষমতাশালী বংশ ছিল তাহার সন্দেহ নাই। এই স্থানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, যাদবরাওয়ের বংশ হইতে শিবজীর মাতা ও ভন্‌স্লে বংশ হইতে তাঁহার পিতা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

উপন্যাসের প্রারম্ভে দেশের ইতিহাস ও লোকের অবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। বোধ হয় পাঠক ইহাতে বিরক্ত হইবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রঘুনাথজী হাবিলদার।

কাঞ্চন জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ তাহার দিবা পঙ্কজ নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডলযুগ্ম দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে আবরিল কলেবর॥
দুইদিকে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু॥
কাশীরাম দাস।

কঙ্কণপ্রদেশে বর্ষাকালে প্রকৃতি অপরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে; ১৬৬৩ খ্রীঃ অব্দে বসন্তকালেই এক দিন সায়ংসময়ে সেই ঘোর ঘটা ও ভীষণ সৌন্দর্য্য যেন দশ গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সূর্য্য তখনও অস্ত যান নাই অথচ সমস্ত আকাশ দীর্ঘ লম্বী অতি-কৃষ্ণ মেঘরাশিতে আচ্ছন্ন ও চারিদিকে পর্ব্বতশ্রেণী ও অনন্ত অরণ্য দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বতে, উপত্যকায়, অরণ্যমধ্যে, প্রান্তরে, আকাশ বা মে দনীতে শব্দমাত্র নাই, যেন জগৎ অচিরে প্রচণ্ড বাত্যা আসিবে জানিয়া ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। নিকটস্থ পর্ব্বতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথগুলি ঈষৎ দেখা যাইতেছে, দুরস্থ বিশাল পাদপাবৃত পর্ব্বতগুলি কেবল গাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণ স্বরূপ দেখা যাইতেছে, আর বহু নীচে উপত্যকা একেবারে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বত-প্রবাহী জলপ্রপাতগুলি কোথাও রৌপ্যগুচ্ছের ন্যায় দেখা যাইতেছে, কোথাও অন্ধকারে লীন হইয়া কেবল শব্দমাত্রে আপন পরিচয় দিতেছে।

সেই পর্ব্বতপথের উপর দিয়া একমাত্র অশ্বারোহী বেগে অশ্বচালন করিয়া যাইতেছিলেন। অশ্বের সমস্ত শরীর ফেণপূর্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত, ও অশ্বারোহীর বেশ ধূলা ও কর্দ্দমময়, দেখিলেই বোধহয় তিনি অনেক দূর হইতে আসিতেছেন। তাঁহার হস্তে বর্ষা, কোষে অসি; বামহস্তে বল্গা ও বাম বাহুতে ঢাল, শরীর উজ্জ্বল লৌহবর্ম্মাচ্ছাদিত। পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ মহারাষ্ট্রদেশীয়। অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ হইবে, সচরাচর মহারাষ্ট্রীয় দিগের অপেক্ষা তাঁহার অবয়ব উন্নত ও বর্ণ গৌর, কিন্তু পরিশ্রমে বা রৌদ্রের তাপে এই বয়সেই তাঁহার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলবর্ণ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ হইয়াছে ও শরীর সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। যুবকের ললাট উন্নত, চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিঃপরিপূর্ণ, মুখমণ্ডল ঔদার্য্যব্যঞ্জক ও অতিশয় তেজঃপূর্ণ। যুবক অশ্বকে অল্প বিশ্রাম দিবার জন্য লম্ফ দিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, বল্গা বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিলেন, বর্ষা বৃক্ষশাখায় হেলাইয়া রাখিলেন, ও হস্তদ্বারা ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিয়া ও নিবিড় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ উন্নত প্রশস্ত ললাট হইতে পশ্চাৎদিকে সরাইয়া ক্ষণেক আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আকাশের আকৃতি অতি ভয়ানক, অচিরাৎ তুমুল বাত্যা আসিবে তাহার সংশয় নাই। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অনন্ত পর্ব্বত ও পাদপশ্রেণী হইতে গভীর শব্দ উত্থিত হইতেছে, আর দুই একটি স্তিমিত মেঘগর্জ্জন শুনা যাইতেছে। যুবকের শুষ্ক ওষ্ঠে দুই এক বিন্দু বৃষ্টিজলও পতিত হইল। এ যাইবার সময় নহে, আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও অপেক্ষা করা উচিত। যুবকের চিন্তা করিবার সময় ছিল না; তিনি যে কার্য্যে আসিয়াছিলেন তাহাতে বিলম্ব সহে না, তিনি যে প্রভুর কার্য্য করিতেছেন তিনি কোন আপত্তি শুনেন না, যুবকেরও বিলম্ব বা আপত্তি করার অভ্যাস নাই। পুনরায় বর্ষা হস্তে লইয়া লম্ফদিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন। তাঁহার অসি অশ্বপৃষ্ঠে ঝন ঝন করিয়া উঠিল; আর এক মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে পুনরায় তীরবেগে অশ্বচালন করিয়া সেই নিঃশব্দ পর্ব্বত-প্রদেশের সুপ্ত প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়া চলিলেন।

অল্পক্ষণমধ্যেই ভয়ানক বাত্যা আরম্ভ হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুল্লতা চমকিত হইল, ও মেঘের গর্জ্জনে সেই অনন্ত পর্ব্বত-প্রদেশ যেন শত বার শব্দিত হইল। অচিরাৎ কোটীরাক্ষস-বল বিদ্রূপ করিয়া ভীষণ গর্জ্জনে পবন প্রবাহিত হইল, ও যেন সেই অনন্ত পর্ব্বতকেও সমূলে আলোড়িত করিতে লাগিল। এক কালে শত পর্ব্বতের অসংখ্য পাদপশ্রেণী হইতে কর্ণভেদী শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, জলপ্রপাত ও পর্ব্বত-তরঙ্গিণীর জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্যুতালোকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই ঘোর বিপ্লব দৃষ্ট হইতে লাগিল; এবং মধ্যে মধ্যে দূরপ্রতিঘাতী বজ্র শব্দে জগৎ কম্পিত ও স্তব্ধ হইতে লাগিল। ত্বরায় মূষলধারায় বৃষ্টি পড়িয়া পর্ব্বত অরণ্য ও উপত্যকা প্লাবিত করিল এবং জলপ্রপাত ও তরঙ্গিণী সমুদয়কে স্ফীতকায় ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল।

অশ্বারোহী কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ না হইয়া বেগে চলিতে লাগিলেন; সময়ে সময়ে বোধ হইল যেন অশ্ব ও অশ্বারোহী বায়ুবেগে পর্ব্বত হইতে সজোরে নীচে নিক্ষিপ্ত হইবেন; সময়ে সময়ে অন্ধকারে লম্ফ দিয়া জলস্রোত পার হইবার সময়ে উভয়েই সেই কঠিন প্রস্তরের উপর পতিত হইলেন, এবং এক স্থানে বায়ুপীড়িত বৃক্ষশাখার সজোর আঘাতে অশ্বারোহীর উষ্ণীষ ছিন্ন ভিন্ন হইল ও তাঁহার ললাট হইতে দুই এক বিন্দু রুধির পড়িতে লাগিল। তথাপি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে অপেক্ষা করা দুঃসাধ্য, সুতরাং যুবক মুহূর্ত্ত মাত্রও চিন্তা না করিয়া যত দূর সাধ্য সতর্কভাবে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিন চারি দণ্ড মূষলধারায় বৃষ্টি হওয়াতে আকাশ পরিষ্কার

হইতে লাগিল, ও অচিরাৎ বৃষ্টি থামিয়া গেল, এবং অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের আ-লোকে সেই পর্ব্বতরাশি ও নবস্নাত বৃক্ষ সমুহের চমৎকার শোভা দৃষ্ট হইল। যুবক দুর্গে উপস্থিত হইয়া একবার অশ্ব থামা-ইলেন ও সিক্ত কেশগুচ্ছ পুনরায় সুন্দর প্রশস্ত ললাট হইতে অপসৃত করিয়া নিম্ন-দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে শোভা অনির্ব্বচনীয়! পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বত-শ্রেণী, যত দুর দেখা যায় দুই তিন সহস্র হস্ত উন্নত শিখরগুলি ক্রমান্বয়ে দেখা যাই-তেছে ও সেই পর্ব্বতশ্রেণীর পার্শ্বে, ম-স্তকে, চারিদিকে, নবস্নাত নিবিড় হরিদ্বর্ণ অনন্ত পাদপশ্রেণী সূর্য্যালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত শত গুণ স্ফীতকায় হইয়া বর্দ্ধিত গৌরবে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নৃত্য করিতেছে,ও সূর্য্যের সুবর্ণ রশ্মিতে বড় সুন্দর ক্রীড়া করি-তেছে। প্রতি পর্ব্বত ও শিখরের উপর সূর্য্যরশ্মি নানারূপ বর্ণ ধারণ করিয়াছে, স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের উপর রামধনু খেলা করিতেছে; আকাশে প্রকাণ্ড ধনু নানাবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে ও বহুদূরে বা-য়ুদ্বারা মেঘ তাড়িত হইয়া বৃষ্টিরূপে গলিত হইতেছে তাহাও দেখা যাইতেছে।

যুবক ক্ষণমাত্র এই শোভায় মুগ্ধ রহি-লেন; পরে সূর্য্যের দিকে অবলোকন ক-রিয়া শীঘ্র দুর্গের উপর উঠিতে লাগিলেন। অচিরে আপন পরিচয় দিয়া দুর্গপ্রবেশ ক-রিলেন; দ্বারের ভিতর যাইলেন ও প-শ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন সূর্য্য অস্ত হই-তেছে। অমনি ঝন্‌ঝনা শব্দে দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল।

দ্বাররক্ষকগণ দ্বার বদ্ধ করিয়া যুবকের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

“অধিক সকালে পঁহুছেন নাই; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে অদ্য রাত্রি প্রাচীরের বাহিরে অতিবাহিত করিতে হইত।”

যুবক সহাস্যে উত্তর করিলেন “সেই এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই; ভবানীর প্র-সাদে প্রভুর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা রাখিব, অদ্যই কিল্লাদারের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইতে পারিব।”

দ্বাররক্ষক। “কিল্লাদারও আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।”

“তবে চলিলাম” বলিয়া যুবক রা-জগৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন।

অনুমতি পাইয়া যুবক কিল্লাদারের প্রাসাদে যাইলেন এবং সম্যক্ অভিবাদন করিয়া ও নিজ কটিদেশ হইতে বন্ধন খু-লিয়া, কতকগুলি লিপি তাঁহার হস্তে প্র-দান করিলেন। কিল্লাদার মাউলীজা-তীয় একজন শিবজীর বিশ্বস্ত যোদ্ধা; তিনি লিপিগুলি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দূতের দিকে না চাহিয়াই মনোনিবেশ পু-র্ব্বক সেইগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন।

দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধারম্ভ। যু-দ্ধের আধুনিক অবস্থা, কিরূপে কিল্লাদার শিবজীর বিশেষরূপে সহায়তা করিতে

পারেন ও কোন্ বিষয়ে শিবজীর কি কি আদেশ, লিপি পাঠে সমস্ত অবগত হইলেন। অনেকক্ষণ সেই লিপি পাঠ করিয়া কিল্লাদার অবশেষে পত্রবাহকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকের বালকোচিত সরল ও উদার মুখমণ্ডল, ও আনেত্রবিলম্বী গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ, অথচ সুদৃঢ় উন্নত অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট দেখিয়া কিল্লাদার একবার চকিত হইলেন, লিপির দিকে দেখেন আবার বালক বা যুবার দিকে মর্ম্মভেদি তীক্ষ্ণ নয়নদ্বয় উঠাইলেন। অবশেষে বলিলেন "হাবিলদার! তোমার নাম রঘুনাথজী? তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ?"

রঘুনাথজী বিনীতভাবে শির নমাইয়া প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

কিল্লাদার। "তুমি আকৃতি ও বয়সে বালকমাত্র।" (ঈষৎ ক্রোধে রঘুনাথজীর নয়ন ঈষৎ উজ্জ্বল হইল; দেখিয়া কিল্লাদার ধীরে ধীরে বলিলেন) "কিন্তু বিবেচনা করি কার্য্যকালে পরাঙ্মুখ নহ।"

রঘুনাথজী ঈষৎ ক্রোধকম্পিতস্বরে অথচ নম্রভাবে বলিলেন "যত্ন ও চেষ্টা মাত্র মনুষ্যসাধ্য, বোধ হয় তাহাতে প্রভু আমার ক্রটি দেখেন নাই; সিদ্ধি ভবানীর ইচ্ছাধীন।"

কিল্লাদার। "তুমি সিংহগড় হইতে তোরণ দুর্গে এত শীঘ্র আসিলে কিরূপে?"

স্থিরস্বরে যুবক উত্তর করিলেন "প্রভুর নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।"

কিল্লাদার এই উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, তোমার আকৃতিতেই কার্য্যসাধনে তোমার যেরূপ যত্ন তাহার পরিচয় দিতেছে।" রঘুনাথজীর সমস্ত বস্ত্র ও শরীর এখনও সিক্ত ও ললাটের ঈষৎ ক্ষত দেখা যাইতেছিল।

পরে কিল্লাদার সিংহগড়ের ও পুনার সমস্ত অবস্থা এবং মহারাষ্ট্রীয়, মোগল ও রাজপুতসেনার অবস্থা ও সংখ্যা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথজী যতদূর পারিলেন উত্তর দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন "তবে কল্য প্রাতে আমার নিকট আসিও, আমার পত্রাদি প্রস্তুত থাকিবে; আর শিবজীকে আমার নাম করিয়া জানাইও যে তিনি যে তরুণ হাবিলদারকে এই বিষম কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে হাবিলদার কার্য্যের অনুপযুক্ত নহে।" এই প্রশংসা বাক্যে রঘুনাথ মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

রঘুনাথজী বিদায় পাইয়া চলিয়া গেলেন। রঘুনাথকে এরূপ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য এই যে, কিল্লাদার শিবজীকে অতিশয় গূঢ় রাজকীয় সংবাদ ও কতকগুলি গূঢ় মন্ত্রণা পাঠাইবার মানস করিতেছিলেন। সে গুলি সমস্ত লিপিদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, লিপি শত্রুহস্তে পড়িতে পারে। রঘুনাথজীকে সে গুলি বাচনিক বলা যাইতে পারে কি না, অর্থবলে বা

কোন উপায়ে শত্রুর বশবর্ত্তী হইয়া গূঢ় মন্ত্রণা শত্রুর নিকট প্রকাশ করা রঘুনাথের পক্ষে সম্ভব কি না, কিল্লাদার তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন, পরীক্ষা শেস হইল। রঘুনাথ নয়নপথের বহির্ভূত হইলে পর কিল্লাদার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "শিবজী এ বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত, উপযুক্ত কার্য্যে যথার্থই উপযুক্ত লোক পাঠাইয়াছেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরযুবালা।

"—সজনি! ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে, তড়িতলতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচল খসি, আধ বদনে হাসি,
আধই নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আচর ভরি,
তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা, কনয় কটোরা,
অতনু কাঁচল উপাম।
হরি হরি কহ মন, জনু বুঝি ঐছন,
ফাস পসারল কাম॥
দশন মুকুতা পাঁতি, অধর মিলায়ত,
মৃদু মৃদু কহ তাহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অতবে সে দুঃখ রহ,
হেরি হেরি না পূরাল আশা॥
বিদ্যাপতি।

রঘুনাথ কিল্লাদারের নিকট বিদায় পাইয়া ভবানীদেবীর মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এই দুর্গজয়ের অল্পদিন পরই শিবজী ভবানীর একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ও অম্বর দেশীয় অতি উচ্চ কুলোদ্ভব এক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া দেবসেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে এই দেবীর পূজা না দিয়া কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইতেন না। দেবীকে পূজা দেওয়া ও পুরোহিতের নিকট যুদ্ধের ফলাফল জানাই রঘুনাথকে পাঠাইবার অন্যতম উদ্দেশ্য।

রঘুনাথ যৌবনোচিত উল্লাসের সহিত আপন কৃষ্ণকেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে একটি যুদ্ধগীত মৃদুস্বরে গাইতে গাইতে মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিলেন, মন্দিরের নিকটে আসিলে, মন্দিরপার্শ্বস্থ ছাদে সহসা তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি দণ্ডায়মান হইলেন, সহসা তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল! দেখিলেন সেই ছাদে একজন অনুপম লাবণ্যময়ী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা একাকী আসীনা রহিয়াছেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া অস্তাচলের রক্তিমা শোভা অনিমেষে দৃষ্টি করিতেছেন। কন্যার রেশম-বিনিন্দি সুমার্জ্জিত অতিকৃষ্ণ কেশপাশ গণ্ডস্থলে, হস্তোপরি, ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে এবং উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও ভ্রমরনিন্দি চক্ষুর্দ্বয় কিঞ্চিৎ আবৃত করিয়াছে। ভ্রূযুগল যেন তুলিদ্বারা লিখিত, কি সুন্দর বক্রভাবে ললাটের

শোভা সাধন করিতেছে। ওষ্ঠদ্বয় সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ, উন্মত্তপ্রায় হইয়া রঘুনাথ সেই ওষ্ঠদ্বয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। হস্ত ও বাহু সুগোল ও অতিশয় গৌরবর্ণ, ও সুবর্ণের বলয় ও কঙ্কণদ্বারা সুশোভিত। কন্যার ললাটে আকাশের রক্তিমচ্ছটা পতিত হইয়া সেই তপ্তকাঞ্চন বর্ণকে সমধিক উজ্জ্বলতর করিতেছে। কণ্ঠ ও ঈষদুন্নত বক্ষস্থলের উপর একটি কণ্ঠমালা দোদুল্যমান রহিয়াছে। রঘুনাথ! রঘুনাথ! সাবধান! তুমি রাজকার্য্যে আসিয়াছ, তুমি দরিদ্র, একজন সৈন্যমাত্র ও দিকে চাহিও না, ওপথে যাইও না। রঘুনাথ এ সকল বিবেচনা করিতেছিলেন না, তিনি মুগ্ধের ন্যায় অনিমেষ লোচনে সেই সায়ংকালের আকাশপটে অঙ্কিত অনুপম ছবির দিকে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতেছিল, পূর্ব্বে যে ভাব কখনও জানেন নাই, অদ্য সহসা সেই নব ভাবের উদ্রেকে হৃদয় মুহুর্ম্মুহু সবলে আহত হইতেছিল; সময়ে সময়ে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতেছিল। যৌবনপ্রারম্ভের প্রথম প্রেমের উর্দ্দম বেগে তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায়!

যতক্ষণ দেখা গেল, রঘুনাথ প্রস্তরবৎ অচল হইয়া সেই সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সায়ন্তন আকাশের শোভা ক্রমে লীন হইয়া গেল, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া সেই প্রতিমূর্ত্তির উপর পড়িতে লাগিল, রঘুনাথ তখনও দণ্ডায়মান!

সন্ধ্যার সময় কন্যা গৃহে যাইবার জন্য উঠিলেন,—দেখিলেন অনতিদূরে একজন দীর্ঘকায় অতি সুগঠন যুবক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার দিকে অনিমেষ লোচনে দেখিতেছেন। ঈষৎ লজ্জায় কন্যার মুখ রঞ্জিত হইল, তিনি মুখ অবনত করিলেন। আবার চাহিয়া দেখিলেন, যুবক সেইরূপ বক্ষের উপর বামহস্ত স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ যুবকের উন্নত ললাট ও জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় আবৃত করিয়াছে, কে'ষে খড়্গ, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ-বর্শা, ও অনিমেষ লোচনে তখনও তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মুহূর্ত্তের জন্য রমণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ মস্তকে অবগুণ্ঠন দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন রঘুনাথ যেন চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন, ললাট হইতে দুই এক বিন্দু স্বেদ মোচন করিলেন, মন্দিরের পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ও পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে আমরা পুরোহিতের পরিচয় দিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরোহিত অম্বরদেশীয় উচ্চ কুলোদ্ভব রাজপুত ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম জনার্দ্দন দেব। তিনি অম্ব-

রের রাজা প্রসিদ্ধ জয়সিংহের একজন সভাসদ্ ছিলেন, ও শিবজীর বহু অনুরোধে, জয়সিংহের অনুমত্যনুসারে শিবজীর সর্ব্বপ্রথম বিজিত তোরণদুর্গে আগমন করেন। তাঁহার পুত্র কন্যা কেহই ছিল না, সুতরাং সস্ত্রীক এই দুর্গে আসিয়া বহু যত্নে ভবানীর উপাসনা করিতেন ও একটি অপত্য মানসে অনেক যাগযজ্ঞও করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে এই দুর্গে আসিবার দুই তিন বৎসর পরই তাঁহার স্ত্রী একটি কন্যা প্রসব করেন; কিন্তু কন্যা প্রসব করিয়াই তিনি কালগ্রাসে পতিতহন।

জনার্দ্দন কন্যার নাম সরযুবালা রাখিলেন ও একমাত্র অপত্যকে অতি যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে সরযুবালা নিরুপম রূপবতী হইলেন, ও যৌবন-প্রারম্ভে তাঁহার অপূর্ব্ব লাবণ্য ও নব নব সৌন্দর্য্যবিকাশ দেখিয়া দুর্গের সকলেই বিস্মিত হইলেন। সকলেই বলিতেন যে, ভবানী উপাসকের পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহার কন্যাকে এইরূপ দেবতুল্য সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যে বিভূষিত করিয়াছেন। জনার্দ্দনও কন্যার সৌন্দর্য্য ও স্নেহে পরিতুষ্ট হইয়া রাজস্থান হইতে নির্ব্বাসনের দুঃখও বিস্মৃত হইলেন।

দেবালয়ে রঘুনাথ কতকক্ষণ অপেক্ষা করিলে পর জনার্দ্দন দেব মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ হইয়াছে, অবয়ব দীর্ঘ ও এক্ষণও বলিষ্ঠ, চক্ষুর্দ্বয় শান্তিরস-পূর্ণ এবং শ্বেতশ্মশ্রু বিশাল বক্ষঃস্থল আবরণ করিয়াছে। জনার্দ্দনের বর্ণ গৌর, স্কন্ধ হইতে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে! পূজকের পবিত্র শান্তিপূর্ণ মন, ও বালকের ন্যায় সরল হৃদয় জনার্দ্দনের মুখ দেখিলেই বোধগম্য হইত। জনার্দ্দন ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রঘুনাথ সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সংক্ষেপে মিষ্টালাপ করিয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলেন ও জনার্দ্দন শিবজীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথ যতদূর পারিলেন যুদ্ধের বিবরণ বলিলেন, ও শিবজীর প্রণাম জানাইয়া পূজকের হস্তে কএকটি সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন—

"প্রভুর প্রার্থনা যে তিনি এক্ষণে মোগলদিগের সহিত যে তুমুল রণে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে আপনি তাহার জয়ের জন্য ভবানীর নিকট পূজা করিবেন। দেবীর প্রসাদ ভিন্ন মনুষ্য-চেষ্টা বৃথা।"

জনার্দ্দন তাঁহার নৈসর্গিক স্থির গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন "সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য মাদৃশ লোকের চিরকালই যত্ন করা বিধেয়, সেই ধর্ম্মের প্রহরী স্বরূপ শিবজীর বিজয়ের জন্য অবশ্যই পূজা দিব। মহাত্মাকে জানাইও সে বিষয়ে ত্রুটি করিব না।"

রঘুনাথ। "প্রভুর দেবীপদে আর একটি আবেদন আছে। তিনি ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার ফলাফল কথঞ্চিৎ পূর্ব্বে জানিবার আকাঙ্ক্ষা করেন।

ভবাদৃশ দূরদর্শী দৈবজ্ঞ এ বিষয়ে অবশ্যই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারেন।"

জনার্দ্দন ক্ষণেক চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন, পরে পুনরায় আপনার অকম্পিত গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

"রজনীযোগে দেবী-পদে শিবজীর বাসনা জানাইব, কল্য প্রাতে উত্তর জানিতে পারিবে।"

রঘুনাথ ধন্যবাদ করিয়া বিদায় হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে জনার্দ্দন বলিলেন।

"তোমাকে পূর্ব্বে এই দুর্গে দেখি নাই, অদ্য কি প্রথমে এ স্থলে আসিয়াছ?"

রঘু। "অদ্যই আসিয়াছি।"

জনা। "দুর্গে কাহারও সহিত পরিচয় আছে? থাকিবার স্থল আছে?"

রঘু। "পরিচয় নাই, কিন্তু কোন এক স্থানে রজনী অতিবাহিত করিব, কল্য প্রত্যেই চলিয়া যাইব।"

জনা। "কি জন্য অনর্থক ক্লেশ সহ্য করিবে?"

রঘু। "প্রভুর অনুগ্রহে কোন ক্লেশ হইবে না, আমাদের সর্ব্বদাই এরূপে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়।"

যুবকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও সরল উদার স্বভাব দর্শনে জনার্দ্দনের অন্তঃকরণে বাৎসল্যের উদ্রেক হইল, বলিলেন—

"বৎস! যুদ্ধসময়ে ক্লেশ অনিবার্য্য, কিন্তু অদ্য ক্লেশ সহনের কোন আবশ্যকতা নাই। আমার এই দেবালয়ে অবস্থিতি কর, সরযু তোমার খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিবে। পরে রাত্রে বিশ্রাম করিয়া কল্য দেবীর আজ্ঞা শিবজীর নিকট লইয়া যাইবে।"

রঘুনাথজীর বক্ষঃস্থল সহসা স্ফীত হইল, তাঁহার হৃদয়ে যেন কে সজোরে আঘাত করিল। এটি যাতনা না আনন্দের উদ্বেগ? সরযু! সরযু! সে কি সেই সায়ংকালীন আকাশপটে অঙ্কিত মনোহর চিত্র? রজনীর আগমনে আকাশপট হইতে সে চিত্র লীন হইয়াছে, কিন্তু রঘুনাথের হৃদয়-পট হইতে সে আনন্দময়ী মূর্ত্তি কখন—কখন—কখনই লীন হইবে না।

কাল

"নদী আর কাল-গতি একই সমান,"
একই রূপেতে দোঁহে করয়ে পয়াণ।
তটিনীর গতি প্রায়, অমূল্য সময় হায়
ঢালিছে অদৃশ্য ভাবে অনন্তে শরীর;
চলিতেছে চল চল, কে তারে ফিরাবে বল?--
ফিরিবেনা--ফিরাবারে পারে কোন্ বীর?
যেন তটিনীর গতি!--এত অজ্ঞানতা অতি!--
জলেতে ভাসিয়া গেলে অতুল রতন;
যতন করিলে পরে পুনঃ তারে পাই করে--
আবর্ত্তে ঘূরিয়া উঠে আপনি কখন।
কালের তরঙ্গে হায়, যদি কভু ভেসে যায়,

পুনঃ কি কখন তায় পাই করতলে ?
প্রফুল্ল কমল দলে ভাসায়ে দিলাম জলে
ঘূরিতে ঘূরিতে পদ্ম হাসি হাসি চলে,--
তখনি নামিয়া নীরে সাঁতারিয়া নলিনীরে
ফিরায়ে আনিতে পারি প্রয়াস করিলে;--
ফিরে কি ভাসিয়াগেলে কালের সলিলে ?

২

কত রত্ন অগণন—অমূল্য উজ্জ্বল
কাল-স্রোতে গেছে ভেসে অর্ণবে অতল--
অবনীর অলঙ্কার ! ফিরিবে না তারা আর !
এ নহে তটিনী-গতি !--বারেক তা হলে
জীবন করিয়া পণ　　করিতাম দরশন
সাহসে বাঁধিয়া বুক নামি সেই জলে,
ফিরাইতে গতি তার প্রতিজ্ঞার বলে !

৩

এক দিনে কত হয় এক দিনে কত লয়--
সপ্ত দিনে এই তিন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন !
পলকে প্রলয়-জলে কভু বিশ্ব যায় তলে
পলকে প্রকাশে লক্ষ জগৎ নূতন !
তুচ্ছ নহে একপল　ক্ষুদ্র এক বিন্দু জল
দণ্ড দিন যুগ মাস মিশি পলে পল,
বারি বিন্দু বিন্দু সনে মিশি হায় এককক্ষণে
জনমে ভীষণ সিন্ধু অতন্ত অতল !
ক্ষুদ্র দেখি তুচ্ছ ভাব যে হৃদয়ে জ্ঞানাভাব
অনন্ত জগৎ এই অণুকণাময় !
নব শিশু ক্ষুদ্রাকার, কালে ভীম অবতার,
পদ দম্ভে কাঁপে ব্যোম গিরি সমুদয় !
বিচিত্র কালের গতি জ্ঞানিগণ কয়।

৪

উন্নতি কি অবনতি,—সাধনের ফল ;
সভ্যতা ভব্যতা কিবা কালেতে সকল !
কালে শিশু ভীমকায় কালে ভীম শিশু প্রায়
কালেতে মশক ঐরাবত-অবতার,
কালে হয় কালে লয় কালেতে জলের রয়
ঊর্দ্ধগামী !—অবিশ্বাস ? বিচিত্রব্যাপার !
সুরম্য নগরী হায় কালেতে শ্মশান প্রায়
ফেরুপাল হা বিধাতঃ ! ফুকরে গভীর !
ভীষণ অটবীচয়　　কালে রাজধানী হয়
রাজধানী অরণ্যানী ! দরিদ্র ফকির
পৃথিবীর অধিপতি !--প্রবল প্রতাপ অতি,--
ভ্রূকুটি ভঙ্গিতে কাঁপে মেদিনী গগণ !
কালে ইন্দ্র বনবাসী ইন্দ্রাণী দনুজদাসী !--
অন্নাভাবে অন্নপূর্ণা কাতর জীবন !
কালে ভীম মরুস্থল পুষ্পোদ্যান ! ঝল মল
করে কিবা প্রতিপল সাজি চারু সাজে !
সরস সরসী তায়, শতদলে শোভা পায়,
মাধবী বকুল চাঁপা হেমলতা রাজে।
চারিদিকে ফুটে ফুল বিশ্ববাসী প্রেমাকুল
মেদুর মলয় বয় ছুটে পরিমল,
কোকিল পঞ্চম গায় অলি মধুলোভে ধায়
আনন্দ-উৎসব-মত্ত ধরিত্রী সকল।
কালেতে প্রমোদ বন মরুস্থল বিভীষণ
ধূধূ করে বালুময় প্রকাণ্ড প্রান্তর !
দীপ্ত প্রভাকর করে　　প্রচণ্ড মুরতি ধরে
মায়াবিনী মরীচিকা !—শিহরে অন্তর !
প্রবল প্রতাপে তায়, মত্তানিল ছুটে যায়,
উৎপাটিত সন্তাড়িত করি সমুদায় !
মরি কিবা ভীম ভাব !—উচ্ছ্বাসি২ রাব
পাবক-প্লাবনে করি প্লাবিত ধরায় !
গভীর অর্ণবচয় কালে উচ্চ হিমালয়—

কালে হিমালয় বিশ্বগর্ভে নিমগন!
প্রমত্ত পবন ধায় উত্তুঙ্গ তরঙ্গ তায়
ভীম ভাবে ছুটে যায় ছাড়িয়া গর্জ্জন।
কাঁপায়ে মেদিনীব্যোম,শনি শুক্র সূর্য্য সোম,
আছাড়ে আছাড়ে পড়ি নিমগ্ন পাহাড়ে;
আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘূরি ভীমনাদ ছাড়ে!

৫

শতদল-দল-গত যেমন জীবন,
এই বিশ্বে সমুদায় জানিবে তেমন।
সমীরণ সদা বয় কখন সে স্থির নয়
সদাগতি নাম তাই; কুলু কুলু স্বরে,
আপনার মনে হায়! সতত তটিনী ধায়
মিশিছে চলিয়া নিত্য গভীর সাগরে।
অদৃশ্য কালের গতি;--কিন্তু সে চঞ্চল অতি,
জ্ঞানীরে ভুলাতে নারে অজ্ঞানে কুহরে,--
মিশিছে চলিয়া নিত্য কালের প্রান্তরে
উত্তাল তরঙ্গ রাশি, মত্ত ভাবে অট্ট হাসি,
উঠিছে ছুটিছে রঙ্গে পবন-হিল্লোলে,
অতল অনন্তব্যাপী অর্ণবের কোলে;--
সে তরঙ্গ-রঙ্গে হায়! জীব জলবিম্ব প্রায়,
জীবলীলা লীলাচলে মিশাইয়া যায়,
যে জন যথার্থ জ্ঞানী,জ্ঞানে নহে অভিমানী
জীবনের ব্রত সেই সাধে সাধনায়।

(হরিমোহন)

আগ্রা।

এমনও এক সময় হইয়া গিয়াছে, যখন এই আগ্রা ইহার অদূরবর্ত্তিনী যদু-রাজধানী মথুরা পুরীর প্রাঙ্গণস্থ কেলিকানন স্বরূপ শোভমানা ছিল। এমনও সময় আবার অতীত হইয়াছে যখন এস্থান বিশ্বব্যাপক মহাতেজস্বী শাক্যোপাসকদিগের বিহার ভূমি মথুরার দ্বার-বর্ত্মস্থ যাত্রিনিবাস মধ্যে পরিগণিত ছিল। হয়ত কোন দিন ইহাই হুষ্ক, যুষ্ক ও কনিষ্ক প্রভৃতি ইণ্ডুসাইথীয় রাজচক্রবর্ত্তীদিগের প্রতিদিন সেবনীয় মৃগয়াভূমিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আবার এমনও দিন উপস্থিত হইয়াছিল যে, হয় ত সেই দিনে ইহার প্রান্তবর্ত্তী মহাবল পরাক্রান্ত পরমার পরিহার এবং চৌহান বংশীয় রজঃপুতজাতীয় রাজপুরুষেরা ইহাকে আপন আপন দিগ্বিজয় পথের বিশ্রামাবাস করিয়া ব্যবহারে আনিয়াছিলেন। আবার সর্ব্বশেষে ইহার ভাগ্যে এমনও এক সময় আসিয়া যুটিয়াছিল, যখন এই আগ্রা সমস্ত ভারতবর্ষের কেন্দ্রভূমি হইয়া মোগলকুল-তিলক সম্রাট্‌বর আকবরের রাজধানীরূপে পৃথিবীবক্ষে অতুল ঐশ্বর্য্যের আকরভাবে বিরাজ করিতেছিল।

ভারতের ঐতিহাসিক তিমির মধ্যে মুসলমানদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে এ স্থানে কখন কোন্ সময়ে কি ভাবে যে কতকিছু হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহা বর্ত্তমান স-

ময়ে কোনরূপেই অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইতে পারি না। কিন্তু এইটি এক প্রকার নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারি যে, মোগলদিগের সভ্যতা, শিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বল প্রথমে এখান হইতেই তরঙ্গের ন্যায় স্ফীত হইয়া কখন বা হিমালয়োৎসঙ্গে, কখন বা পূর্ব্বঘাটপার্শ্বে, কখন বা পশ্চিমঘাটতটে এবং কখন বা কন্যাকুমারীর অন্তরীপশৃঙ্গে যাইয়া আঘাত করিতেছিল। এইখানেই কোন সময়ে আবুলফজল্, ফয়জী, বীরবল ও মানসিংহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা বৃহস্পতিকক্ষস্থ চন্দ্রচতুষ্টয়ের ন্যায় আকবর পার্শ্বে থাকিয়া কখন বা ইহার দরবারে আম্ নামক গৃহে এবং কখন বা ইহার দরবারে খাস্ নামধেয় ভবনে করে কর সম্মিলন পূর্ব্বক নৃত্য করিয়াছিল। ইহারই ভগ্নাবশেষের অভ্যন্তরীণ কোন এক গৃহপ্রাঙ্গণে বসিয়া মন্ত্রিবর আবুল্‌ফজল্ তাঁহার চিরপ্রসিদ্ধ আইন আকবরির পাণ্ডুলিপি লিখিয়াছিলেন; এবং ইহারই ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ভগ্নগৃহ মস্‌জিদাদির কণ্ঠসমুহকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য কোন দিন সেই প্রসিদ্ধ যবনকবি ফয়জী, আপনার সুললিত কবিতাকুসুমে মালা গ্রন্থন করিয়া আপন হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণ কাল-কুরঙ্গ, সেই সমস্ত ঘটনা ও কথাকে ভূতরাজ্যের স্বপ্নভূমিতে নির্ব্বাসিত করিয়া, ইহাকে আপনার মুখাবলীঢ় তৃণ পত্রের ন্যায় কেবল কতকগুলি চূর্ণীকৃত সমাধিপুঞ্জাবশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। যে দিকে দেখ, সেই দিকেই ভাঙ্গা গোর ও সমাধি মস্‌জিদ। কোন স্থানে কোন প্রসিদ্ধ গৃহশ্রেণীর খান কত ভগ্ন ইস্টক পড়িয়া আছে;—কোথাও বা একটি প্রাচীরাংশ তৃণ গুল্মে রোমাঞ্চিত হইয়া কোন এক নিভৃত স্থানের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া আছে। কোন স্থানে কোন একটি গৃহের বিভগ্ন শরীর ও বিকলাভ্যন্তর, অস্থিমাত্রাবশিষ্ট নৃকপালের মুখাভ্যন্তরের ন্যায় পথপার্শ্বে পড়িয়া রহিয়া পান্থবর্গের দম্ভ ও অহঙ্কারের প্রতি ভ্রূকুটি করিতেছে। কোথাও বা সেই সকল প্রসিদ্ধ লোকদিগের মধ্যে কাহার কাহার দেহাবশিষ্ট রজোমুষ্টি, শকটবর্ত্মের মধ্যপথে পড়িয়া এবং চক্রঘর্ষণে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পথিকজনের শ্মশ্রু ও কপালসমুহকে বিরঞ্জিত করিতেছে। কোথাও আবার কালবিদলিত, সর্ব্বোৎপাটিত এবং শূন্যাবশিষ্ট অট্টালিকা-ভূমিতে স্বভাবজাত কণ্টক সমাকুল বব্বুল তরুর সমাশ্রয়ে, বিজনতা যেন বিনাশ দর্শনে অতি করুণস্বরে পারাবতকণ্ঠে রোদন করিতেছে। বস্তুতঃ যে দিকে চক্ষু এবং কর্ণ ফিরাইবে, সেই দিকেই বোধ হইবে, যেন বিরাটকাল, এক পার্শ্বে আপনার চিরসহচর স্বরূপ বন, বিজনতা, ও শূন্যতা প্রভৃতি প্রেতদলের সহিত বসিয়া অতি গম্ভীরভাবে ভোজনব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে;—আর অপর পার্শ্বে অধিবাসী পাচকেরা গৃহ, অট্টালিকা ও ঘটনাদিরূপ

নূতন নূতন অন্নব্যঞ্জন শাক সূপাদি রন্ধনের ধূম, অগ্নিজ্বালা, কোলাহল ও দণ্ড কটাহ প্রভৃতির খট খট্ শব্দে চক্ষুকর্ণকে অন্ধও বধির করিয়া তুলিতেছে।

যদিও ইহার গত যৌবনশ্রীর সহিত তুলনা করিলে আগ্রা এইক্ষণ কিছুই নহে, তথাপি ইহার প্রাচীন মাহাত্ম্য এবং কালকরের অস্পৃষ্ট---ইহার অন্তর্গত কোন কোন পদার্থ দূর হইতে ভ্রমণকারীদিগকে এখনও আকর্ষণ করিয়া আনে। এখনও ইহা দর্শক বর্গের তীর্থ স্থান বলিয়া গণনীয়। অতএব যদি আমি এখানে মোগল বংশীয় দিগের মহাপীঠ এই আগ্রা নগরের কোন কোন বৃত্তান্ত লিপি বদ্ধ করি, বোধ হয় তাহা পাঠক বর্গের নিতান্ত অপ্রিয়কর অথবা পঠন-ক্লান্তিকর হইবে না। তাঁহারা প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের অর্থাৎ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বর্ত্তমান অবস্থার বহুতর বিষয় সামান্য ভাবে সাঙ্কেতিক রূপে ইহা দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। যেমন কোন একটি মনুষ্য শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার অভ্যান্তরীয় নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ও তৎসহ তদন্তর্গত ব্যাপারাদি অতি সামান্য ভাবে দর্শন করিলেও সামান্যরূপে সমুদয় মনুষ্য শরীরেরই পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, সেইরূপ কোন একটি দেশ কি প্রদেশের কোন একটি কেন্দ্রীভূত নগরকে সামান্যরূপ মনোনিবেশের সহিত দর্শন করিলে, কিংবা তাহার বৃত্তান্ত পাঠ করিলেও সামান্যতঃ সেই সমস্ত ভূখণ্ডের বহুতর বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। আমি অতি দীর্ঘকাল এই নগরে বাস করিয়া আসিতেছি। এই সময়ের মধ্যে, যদিও কোন দিন দেখিবার জন্য অধিক যত্ন করি নাই, তথাপি বিনাযত্নেই এত বিষয় চক্ষে পতিত হইয়াছে যে, তাহা এখন যত্নের সহিত কুড়াইয়া একত্রিত করিতে পারিলে, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত এ সকল স্থান দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে তদ্দ্বারা একটি ছোট খাট কৌতুকাবহ উপহার প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমি এখানে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার স্বদেশীয় পাঠকেরা যদি ইহা পাঠ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও আমোদিত হন, আমি তাহা হইলেই পরিশ্রমসার্থক মনে করিব।

প্রস্তাব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গুটিকত কথা। যদিও প্রকৃত বিষয়ের সহিত তাহার বিশেষ কোন সংশ্রব নাই, তথাপি মনের দুঃখ প্রকাশ জন্য পাঠকবর্গকে গুটিকত কথা বলা আমার যেন আবশ্যক বোধ হইতেছে। পাঠকবর্গ অল্প পরিমাণ অনুধাবনের সহিত ভাবিলেই অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে, আমাদের অন্তঃকরণ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অধিকতর জিজ্ঞাসু এবং অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণ আমাদের দ্বারা আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী ঘটনা কি ব্যাপারাদি পূর্ব্বের ন্যায় তত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষিত হয় না। সকল বিষয়েরই একটু একটু তত্ত্ব জানিতে অনেকেরই ইচ্ছাকরে।

যদিও এই জ্ঞান-ক্ষুধা সম্যক্ রূপে সর্ব্ব সাধারণের অন্তরে এক্ষণ পর্য্যন্তও অধিকার-স্থান পায় নাই, যদিও সাধারণ্যে দারুণ মন্দাগ্নির প্রকোপ এখন অত্যন্ত প্রবলই রহিয়াছে, তথাপি কোন কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে কোন কোন অংশে অতি সামান্য পরিমাণে একটুকু ক্ষুধার বেগ জন্মিয়া উঠিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এটি মৃত আশালতাতে প্রাণ সঞ্চারের কিঞ্চিৎ পরিচয় তাহার সন্দেহ নাই। ইহা যে ইংরেজি শিক্ষা এবং ইংরেজ জাতির প্রকৃতিগত দৃষ্টান্তের উদ্দীপনায় হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এ সকল হইয়াও মধ্যপথে কতকগুলি অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে, পূর্ব্বোক্ত আশালতার অঙ্কুর যেন আর বৃদ্ধি পাইতেছে না। একটু একটু হরিদ্বর্ণ মুখ বাহির করিয়া যেখানকার যাহা, তাহা সেই খানেই আবার বিবর্ণতা পাইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে। এরূপ হইয়া যাওয়ার কএকটি কারণ আছে। তন্মধ্যে প্রধান এবং সর্ব্ব প্রথম এই যে, যাহার ক্ষুধা জন্মিয়াছে তাহার অন্ন নাই, আর যাহার অন্ন আছে, তাহার ক্ষুধা কি কচিমাত্র নাই। অন্নবানেরা অন্নের শয্যা, অন্নের উপাধান, অন্নের পাদুকা এবং অবশেষে অন্নে পথ পর্য্যন্ত বাঁধাইয়া তাহার উপরে প্রত্যহ পদচারণা করিবেন ও তাহাতে মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া অপরের অগম্য করিয়া রাখিবেন; তথাপি নিরন্নদিগের ক্ষুধানল নির্ব্বাপণ জন্য প্রাণান্তেও একটি কপর্দ্দক পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের অন্নরাশি বস্তা বাঁধিয়া বাঁধিয়া আপন হস্তে প্রতিদিন মল-কূপে নিক্ষেপ করিয়া পচাইবেন, তথাপি একটি পয়সা অন্যের ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য ব্যয়িত হইতে দেখিতে পারিবেন না। তাঁহাদের ক্ষুধাও জন্মে না, অন্নের এরূপ দুর্গতিও ঘুচে না। যাঁহার অনেক উদ্দীপক ঔষধি খাওয়াইবার পরে কিঞ্চিৎ জন্মে তাহাও বিকৃত ক্ষুধা;—কাগ এবং বোতল ভাঙ্গা খাইবার ক্ষুধা;—মাটি খাইবার ক্ষুধা। একটিরও অন্ন ব্যঞ্জনের প্রতি অভিরুচি হয় না। ভারতের ভাগ্যে যদি অন্নবন্তদিগের একবার প্রকৃত ক্ষুধা জন্মিত, তাহা হইলে অনেক নিরন্ন তত্ত্ব-ক্ষুধার্ত্ত লোক তাঁহাদের ভোজ সমারোহে আপন আপন উদর পূর্ত্তি করিয়া মহান্ আনন্দ লাভ করিতে পারিত; আর এরূপে মুহ্যমান হইয়া যাইত না। দেশের মুখও অনেক উজ্জ্বল এবং প্রসন্ন দেখাইত। যে সকল লোকের কথা এখানে উল্লিখিত হইল, ইহাঁরা প্রায় সকলেই আপন আপন পিতৃপুরুষদিগের ছল. বল বাহুপার্জ্জিত অন্নে অন্নবন্ত; ইহাঁদিগের আপন বিক্রমোপার্জ্জিত কিছুই নহে,ইহাঁরা যক্ষ নাগের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কেবল পিতামহের স্বর্ণ কলসকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। ইহাতে পুরুষকারের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি পক্ষান্তরে ইহাঁরা এই

অন্নদ্বারা দেশের নানারূপ জ্ঞান-দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা পান, তাহা হইলে ই-হাঁদিগের অনেক পুরুষকারের কথা হইয়া উঠে সন্দেহ নাই। ঝাড় পানসের সঙ্গে ইহাঁদিগের অস্তিত্ব চূর্ণ হইয়া যাইবার আর সম্ভাবনা থাকে না।

নিরন্নদলের মধ্যে অনেকে পাঠশালা রূপ চিকিৎসালয়ে থাকিয়া শিক্ষক বৈ-দ্যের উপদেশ রূপ উদ্দীপক ঔষধ দ্বারা কিছু দিন হইল জ্ঞান-ক্ষুধাকে অত্যন্ত উ-ত্তেজিত করিয়াছিলেন। দেখা গেল যে, তাঁহাদের অনেকেই সেই চিকিৎসালয় ছা-ড়িয়া যখন কিঞ্চিৎ অন্নবস্ত হইয়া উঠিলেন, অমনি এককালে ক্ষুধা রহিত হইয়া শয্যায় পড়িলেন। ভাতের ক্ষুধা আর রহিল না। নানাপ্রকার বিকৃত ক্ষুধা জন্মিতে লাগিল। বোতল ভাঙ্গা, কাগ, ছাই, মাটি ও গো-বরে রুচি জন্মিয়া উঠিল। এইরূপ অবস্থায় উপস্থিত হওয়াতে কোন দলেই পুষ্টি বি-স্তৃত হইতে পারিতেছে না। অন্নবন্তেরা যেরূপ বিকৃত পদার্থ সকলের আহারে এ-কদিকে শুষ্ক হইয়া যাইতেছেন, সেইরূপ নি-রন্নেরা ক্ষুধাসত্ত্বেও অপরদিকে মুহ্যমান হ-ইয়া পড়িতেছেন। এরূপ কেন হইল ? ক্ষুধা থাকে ত অন্ন থাকেনা, অন্ন থাকে ত ক্ষুধা থাকে না। একি অন্নেরই দোষ, না, লো-কের প্রকৃতির দোস ? যদি অন্নের দোষ হইবে, তবে ভিন্নদেশে কেন ভিন্নরূপ দৃষ্ট হয় ? লার্ডরস্, লার্ডওয়েরি প্রভৃতির ক্ষুধা কেন অন্যরূপ ? এই ভারতবর্ষের কাল-চর্ব্বিত বক্ষে এত স্থানে এত কীর্ত্তি চিহ্ন রহিয়াছে এবং সেই সকল চিহ্নের সহিত এত ঐতিহাসিক তত্ত্ব লোকের অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা বশতঃ এতদিকে এতভাবে দৃষ্টিপথের অগোচরে ভূগর্ভে বিলীন হ-ইয়া যাইতেছে যে, যদি তাহা এ দেশীয় ধনিসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ সম্মি-লিত হইয়া আপন পিতৃপুরুষদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপে সেই সকলের চিত্রপট ও তৎসহ তাঁহাদের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত একত্রে এক স্থানে সংগ্রহ করিয়া পুস্তকে নিবদ্ধ করেন, তাহা হইলে সেই পূর্ব্ব পুরুষদিগের সমাধির উপরে একটি অপূর্ব্ব স্বর্ণ স্তম্ভ প্রস্তুত হয়। এবং এই সকল চিহ্ন-চিত্র ও তাহার বৃত্তান্ত সর্ব্বদা অন্তঃকরণে দেশের অনুরাগকে উদ্দীপন করে। সময়ে সেই উদ্দীপনা আবার প্রাণ-বলেও পরিণত হয়। যাঁহারা এই স্তম্ভ প্রস্তুত করেন, তাঁহারাও পৃথিবীতে সর-স্বতীর অধিষ্ঠান কাল পর্য্যন্ত ভারত বাসী-দিগের ভাবি হৃদয়ে জীবিত থাকিতে পারেন। যে দেশে প্রাণ আছে, খুঁ-জিয়া দেখ, সেই দেশেরই প্রতি গৃহে এইরূপ স্মরণ-স্তম্ভ পুস্তকাকারে গ্রন্থাগারে বিগ্রহরূপে অর্চ্চিত হইতেছে। আর যে দেশে ইহা পাদ-দলিত হইয়া স্মরণাগার হইতে অবজ্ঞা ও অবহেলার সম্মার্জ্জনী দ্বারা অপসারিত হইয়াছে, সেই দেশই প্রেত-লোকগত পিতৃ-দেবতাদিগের অবমাননা রূপ পাপে ভাজিয়া পড়িয়া এবং পূর্ব্ব

পুরুষদিগের বলবীর্য্য কীর্ত্তি সাহসাদির উদ্দীপনারূপ তেজে বঞ্চিত হইয়া ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ ও অবশেষে ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কোন একটি সামান্য গ্রামের ইতিবৃত্তও যদি প্রকৃত রূপে লিখিতে হয়, তাহাতেও অনেক পরিশ্রম, সহায়তা, সময়, অনুসন্ধান ও কখন কখন অর্থবিতরণ আবশ্যক করে। বিদেশীয়েরা এবম্প্রকারের কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে আমাদের নিকট হইতে যত সাহায্য এবং সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন, আমরা স্বদেশীয়েরা আপনাদের নিকট হইতে তাহার চতুর্থাংশের একাংশও সহজে পাইতে পারি না। সুতরাং আমরা কাব্য লিখি, কল্পনার আশ্রয় লই, এবং বৃত্তান্ত জগতের সম্মুখীন হইতে, অথবা ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রবেশ করিতে যেরূপ সাহায্য, সম্বল ও উপকরণ সামগ্রীর আবশ্যকতা তাহা না পাইয়া, এবং পাইতে চাহিলে কমল-মধু-মুগ্ধ স্বদেশীয় ধনিসন্তানদিগের নিকট ঘৃণিত, উপেক্ষিত ও সর্ব্বপ্রকারে বিড়ম্বিত হইয়া কাল-কুক্ষি-নিহিত পুরাতন তত্ত্বের অনুসন্ধানে বিরত হই। পুরাতন তত্ত্বের অনুসরণ আমার পক্ষে আরও কষ্টকর। অবস্থার নিপীড়নে আমি যার পর নাই অসহায়। আর, পদমর্য্যাদা এবং প্রতিপত্তি-বিরহে এই আগ্রার অনেক স্থানই আমার অগম্য, অথবা দুরধিগম্য। আমি পাঠকবর্গকে এই হেতু পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি তাঁহাদিগকে যাহা উপহার দিব, তাহা অযত্নলব্ধ এবং ইতিহাসের শৃঙ্খলা-শূন্য।

আগ্রা হিন্দুদের সময়ে কি ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার কোন স্পষ্ট চিহ্নই ইহার শরীরের উপর এক্ষণ বিদ্যমান নাই। কনিংহ্যাম্ প্রভৃতি স্থপতি কারুবিশারদ ব্যক্তিরা ইহার নামের ব্যুৎপত্তি হইতে এবং অন্যান্য লেখকদিগের মত হইতে ও অন্যবিধ কারণ সমস্ত হইতে ইহার নাম ও প্রাচীনত্বের বিষয়ে নানা প্রকার অনুমান করেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ জন্য তাহার কিছুটা এখানে উল্লেখ করা হইল।

টড্ সাহেবের রাজস্থানের পুরাবৃত্তে আগ্রা কোন কালে অগর্ওয়াল্‌বংশীয় সরদারদিগের বাসভূমি ছিল বলিয়া, উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের বংশাবশেষ এখনও নাকি দিল্লীর পশ্চিমে অগরোহা নামক স্থানে, বুন্দেলখণ্ডে, রাজপুতনার কোন কোন অংশে এবং মালোয়াদেশের অগ্গর নামক স্থানে বাস করিতেছে।

কুইন্টস্‌কর্টিয়স্ তাঁহার পুরাবৃত্তে "অগ্রামেশ" নামে যে এক প্রাচীন রাজার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ, আগ্রা, তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান করেন। কেহ বলেন যে, রজঃপুতবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে "অগ্রাজ" নামে কেহ ছিলেন। তিনি অগ্নি হইতে উদ্ভব হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম অগ্রাজ হইয়াছিল। আগ্রা এক সময় তাঁহারই রাজধানী ছিল।

কেহ আবার বলেন, পুরাণে অগ্নিমিত্র নামে যে এক রাজার উল্লেখ আছে, সেই অগ্নিমিত্র শব্দই কালে আকুঞ্চিত ও অপভাষিত হইয়া অগরাজ হইয়া গিয়াছে। অগরাজ এবং অগ্নিমিত্র এক ব্যক্তিরই অভিধান। সুতরাং এস্থানে অগ্নিমিত্র অর্থাৎ অগরাজের রাজধানী ছিল বলিয়াই, ইহার নাম আগ্রা হইয়াছে।

কেহ অনুমান করেন, কাল-প্রসিদ্ধ মথুরার অগ্রবর্ত্তী নগর বলিয়াই ইহার আগ্রা নাম দেওয়া হইয়াছে। অন্য এক সম্প্রদায় বলেন যে, হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে অগর্ শব্দে লবণকুণ্ডকে বুঝায়। আগ্রার মৃত্তিকাতে অনেক স্থানে লবণ উৎপন্ন হয়,এবং ইহার কূপাদির জলও লবণাক্ত। সুতরাং ইহাকে অগর অর্থাৎ লবণকুণ্ড মনে করিয়াই ইহার নাম আগ্রা রাখা হইয়াছে।

আবার ১৮৬৯ সনে এই আগ্রানগরের কোন একটা স্থান খনন করিতে করিতে প্রায় দ্বিসহস্রেরও অধিক রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। তাহার সমুদয় মুদ্রাতেই প্রাচীন পাশ্চাত্য সংস্কৃত অক্ষরে অতি স্পষ্টরূপে "গুহিল শ্রী" নাম অঙ্কিত ছিল। কেহ কেহ ভাবেন যে, এই "গুহিল শ্রী" হয় ত মেওয়ার দেশীয় ঘীলোট বংশের আদিপুরুষ শ্রীগোহাদিত্য অথবা গুহিল হইবেন। ইনি ইংরেজী ৭৫০ অব্দে প্রাদুর্ভূত হন। কিন্তু মুদ্রার কলেবরে যে জাতীয় অক্ষর অঙ্কিত ছিল, তাহা যেন এই কাল হইতেও অনেক প্রাচীন কালের অক্ষর বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং ঐ মুদ্রা যে ঘীলোট বংশীয় শ্রীগুহিলের মুদ্রা, এ বিষয়ে সংশয় থাকে। এদিকে কনিংহ্যাম্ সাহেব গোয়ালিয়রের নিকটে নর্ওয়ার নামক স্থানে "শ্রীগুহিল পতি" নামাঙ্কিত গোটাকত টাকা পান। ঐ টাকাতে যে প্রণালীর অক্ষর সকল অঙ্কিত ছিল, তাহার সহিত আগ্রাতে প্রাপ্ত মুদ্রা সকলের কলেবরস্থ অক্ষর সমুদয়ের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু ইতি মধ্যে আবার সেই প্রদেশের তোর্মনের পুত্র পশুপতির নামাঙ্কিত আরও চারিটি মুদ্রা পাওয়া যায়। এই চারিটি মুদ্রা পাওয়ার পরে, কনিংহ্যাম্ সাহেব এই অনুমান করেন যে, পূর্ব্বোক্ত গুহিলপতিও এই বংশেরই কেহ হইবেন। তোর্মন খ্রীষ্টীয় অব্দের ২৬০ হইতে ২৮৫, এবং পশুপতি ায় ২৮৫ হইতে ৩১০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হন বলিয়া প্রবাদ আছে। এইক্ষণ সর্বেয়র কার্লাইল সাহেব এই ঘটনা দেখিয়া নরওয়ারের শ্রীগুহিল পতি ও আগ্রার গুহিলশ্রীকে এক মনে করেন। এবং এই আগ্রা যে কোন সময়ে সেই শ্রীগুহিল পতির সিংহাসনভূমি ছিল, তাহা সিদ্ধান্ত করেন।

এদিকে আবার আগ্রার দুর্গ হইতে প্রায় ৩ মাইল উপরের দিকে যমুনার দক্ষিণ তটে একটি বাগান ও বাড়ীর কিঞ্চিৎ চিহ্ন পড়িয়া আছে,দেখিতে পাওয়া যায়। লোকেরা ইহাকে রাজা ভোজের বাগান

ও বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই রাজা ভোজ কে, তাঁহার কি বৃত্তান্ত, তাহা এই-ক্ষণ জানিবার কোন উপায় নাই। সর্ব্বেয়র কার্লাইল সাহেব বলেন যে, তিনি নাকি এখানকার কোন বিচক্ষণ লোককে ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রত্যুত্তরে সে ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, ইহা খ্রীষ্টীয় ৬ ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত,মালোয়াদেশীয় রাজা ভোজের বাগান ও বাড়ীর ভগ্নাবশেষ। সাধারণেরা যদিও তাঁহাকে এত বিশেষ করিয়া এবিষয় বলিতে পারিয়া ছিল না বটে, কিন্তু ইহা যে রাজা ভোজের বাড়ী এবং মুসলমানদের আক্রমণকালের পূর্ব্ব হইতেই এখানে আছে, তাহা তিনি সকলের নিকট হইতেই এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে শুনিয়া ছিলেন। যদি এই জনশ্রুতি সত্য হয়, তাহা হইলে আগ্রাতে মুসলমানদের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের এই একমাত্র হিন্দু চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, বলিতে পারা যায়।

অঞ্জনা-পুত্র যে প্রকার সাগরগর্ভ হইতে উত্তোলিত চারিটি প্রস্তরাঙ্কিত অক্ষর দ্বারা কাল-বিলুপ্ত সমগ্র মহানাটক পুস্তক উদ্ধার করিয়াছিলেন, সাহেবদিগের অধ্যবসায় এবং যত্নরূপ আঞ্জনেয়ও সেই প্রকার বিস্মৃতি সাগরস্থ অনিশ্চিততা রূপ অতলস্পর্শ সলিলে নিমজ্জিত ভারতের প্রাচীন ইতিহাসকে কখন বা মৃত্তিকা প্রোথিত মুদ্রাশরীরাঙ্কিত চতুরক্ষর দ্বারা এবং কখন বা ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত কাল নিষ্পিষ্ট মসৃণ ইষ্টক খণ্ড দ্বারা উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প। ধন্য ইহাঁদের যত্ন! ধন্য ইহাঁদের পরিশ্রম! এবং ধন্য ইহাঁদিগের অধ্যবসায়! আমরা শয়ন করিয়া থাকি,পরিহাসে আর গল্পে সময় অতিপাত করি এবং বৈঠকখানায় বসিয়া কখন বা হা, হা, হী, হী, রবে পৃথিবীকে তৃণবৎ উড়াইয়া দেই, তথাপি একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ না যে, আমাদের দ্বারের দুই পার্শ্বে কি ছড়ান রহিয়াছে এবং এই সকল ছড়ান পদার্থচূর্ণ দ্বারাই বা কি বিষয় কতদূর আকৃতিতে আনা যাইতে পারে। আর ইহাঁরা ভিন্নদেশীয় এবং ভিন্ন-শোণিত-শুক্র-জাত হইয়াও কেবল শুষ্ক কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমাদের পতিত গৃহের ভগ্ন ইট্, পাট্কেল এবং মৃত শরীরের অস্থি পঞ্জর ঘাটিয়া আমাদের পরিচয় নিতে এবং আমাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। আমরা পাশাপাশি থাকিয়াও আপন যত্নে কেহ কাহাকে চিনিতে চেষ্টা করিতেছি না।

পাঠকবর্গের সমীপে উপরোল্লিখিত কতিপয় পংক্তিতে আগ্রা নামের উৎপত্তি এবং তাহার ব্যুৎপত্তি হইতে যে যে অনুমান তত্ত্বখণ্ড এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে ও ইহার বক্ষে হিন্দুদিগের যে যে চিহ্নরেখা, ইহার প্রাচীন পরিচয়ের জন্য আজি পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা এক

প্রকার সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, এ পর্য্যন্ত আর কিছু জানা হয় নাই। কিন্তু ইহার পার্শ্ববর্ত্তি স্থানাদিতে সংশয়োৎপাদন করিবার এত বিষয় আছে যে, তাহা অর্থ ব্যয় করিয়া খনন করিলে অনেক নূতন কথা আবিষ্কৃত হইতে পারে। আজি একটি সামান্য লোক, ইফীসস্ খনন করিয়া তাহার গভীর মৃৎকুক্ষি হইতে চূর্ণীকৃত ডায়না দেবীর মন্দিরের সম্পূর্ণ অবয়ব চিত্রিত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতে কি সেরূপ অর্থ নাই যে, ইহার বক্ষে কোন কোন বিলুপ্ত স্থানের বিলুপ্ত কীর্ত্তি সকল সেই রূপে চিত্রিত হইতে পারে? আছে। অনেক তমসান্ধ গর্ত্ত সকলের মধ্যে আজিও রজত কাঞ্চন স্তূপীকৃত হইয়া আছে। কিন্তু তাহার ধারে কাছে একটিও মনুষ্য নাই।

হিন্দুদিগের পরে মুসলমানদিগের কাল। মুসলমানদিগের কীর্ত্তি ইহার বক্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই পুঞ্জে পুঞ্জে বিক্ষিপ্ত আছে। ইহাতে ইহাকে মুসলমানদিগের স্থাপিত নগর বলাই সঙ্গত। লোকেরাও এক প্রকার তাহাই বলিয়া থাকে। সর্ব্বপ্রথমে লোদীবংশীয়েরা এস্থানে আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। সেকেন্দর বিন্ বহল লোদী খৃষ্টীয় ১৫১৫ সনে আগ্রাতে দেহত্যাগ করেন। ইহাঁর সমাধি কোথায় দেওয়া হয়, তাহার কিছু নিশ্চিত নাই। ইনি এই সহরের অভ্যন্তরে বাদল গড় নামক কোন একটি প্রাচীন হিন্দুদুর্গকে সংস্কার করিয়া এখানে বাস করেন। এই বাদলগড় নামক হিন্দু দুর্গ কোন্ খানে ছিল, এখন মৃত্তিকার উপরিভাগ দেখিয়া তাহা জানিবার কোন সুযোগ নাই। সহরের মধ্যে "লোদী খাঁকা টিলা" নামক যে একটা উচ্চ স্থান আছে, কোন কোন লোকে তাহাকেই বাদলগড়ের ভূমি বলিয়া বলে। কেহ বা আকবর নির্ম্মিত বর্ত্তমান দুর্গকে বাদলগড়ের প্রাচীন ভিত্তিভূমির উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বলে। গোয়ালিয়র দুর্গের নিম্ন প্রাচীরকে সেখানে বাদলগড় বলিয়া থাকে। তাহা ১৪৭৫ খৃঃ অব্দে রাজা কল্যাণমল্লের ভ্রাতা বাদল সিংহ দ্বারা রচিত হয়। কনিংহ্যাম সাহেব সেই সূত্রে আগ্রার কালবিলুপ্ত বাদল গড়কেও তাঁহারই রচিত বলিয়া অনুমান করেন। উপরোক্ত "লোদী খাঁকা টিলা" ব্যতীত সহরের পশ্চিমে পাঁচ মাইল অন্তরে সেকেন্দরা নামক স্থানে সেকেন্দর লোদীর প্রাসাদ বাটীর অল্প কিঞ্চিৎ ভগ্নাংশ পতিত আছে। ইহা ব্যতীত লোদী বংশীয়দের আর কোন চিহ্ন এখানে নাই। লোদী খাঁর টিলার বিষয়ে একটুকু সন্দেহ আছে। খাঁ খানন্ লোদী নামে বাবর এবং হুমায়ুনের একজন প্রসিদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এবং খাঁ জাহান লোদী নামে জাহাঙ্গিরেরও এক জন সেনাপতি ছিলেন। এক্ষণ লোদী খাঁয়ের টিলা যে কোন্ লোদীর আবাস বাটী ছিল, তাহা বলা সহজ ব্যাপার নয়। সেকেন্দর লো-

দীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদীও এখানে বাস করেন।

১৫২৬ সনের মে মাসে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজয় করিয়া আগ্রা এবং দিল্লী করস্থ করেন। তাঁহার প্রাসাদবাটী ও উদ্যানাদির ভগ্নাবশেষ অন্য অন্য গৃহাদির ইষ্টক চূর্ণ সংহতি সহ বর্ত্তমান নগরের ঠিক বিপরীত দিকে যমুনার পূর্ব্বতটে রেলওয়ে ষ্টেসন ও ইৎমাদুদ্দৌলার সমাধি মসজিদ হইতে নুনিহাই নামক গ্রাম পর্য্যন্ত স্তূপে স্তূপে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। নুনিহাই গ্রামকে এখনও রেলের গাড়ীর উপর হইতে যেকালে দেখা যায়, যেন একখানি ছোট খাট নগর বলিয়া ভ্রম হয়। উহার মধ্যে এখনও অনেক সমৃদ্ধিশালী লোক বাস করে। বাবরের সময়ে যে, ঐ স্থানেই আগ্রা ছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ৯৩৭ হিজরী সনে বাবরের দেহ পতন হইলে পর, তাঁহার পুত্র হুমায়ুন প্রথমে এখানে অধিবাস করেন। যে সনে বাবরের মৃত্যু হয়, হুমায়ুন সেই সনেই একটি মসজিদ প্রস্তুত করেন। তাহার ভগ্নাংশ আজিও তাজমহলের বিপরীত দিকে যমুনার পর পারে কাচপুরা নামক গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদের গাত্রে হুমায়ুনের নাম ও যে সনে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে সমুদয় লেখা আছে। গ্রাম্য লোকেরা তাহার উৎসঙ্গে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছে এবং কপোত শুক প্রভৃতি পক্ষী সকল তাহার চূর্ণীকৃত মস্তকের কোটরে থাকিয়া পার্শ্ববর্ত্তি শস্য ক্ষেত্র অপহরণে জীবন যাপন করিতেছে। এই মসজিদেরই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে যমুনাতট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ভূমি খণ্ডকে "মাহতাব খাঁকা বাগ" বলে। এখানে এক্ষণ কিছুই নাই। কেবল একদিকে একটি ভগ্ন বুরুজ কিঞ্চিৎ ইষ্টক চূর্ণ লইয়া পতিত রহিয়াছে। এই স্থান সম্বন্ধে একটি সুন্দর ছোট প্রবাদ আছে। মাহতাব খাঁ কোন এক আমিরের পুত্র ছিলেন। তিনি তাজমহলের ন্যায় আর একটি বাড়ী এখানে প্রস্তুত করিবেন বলিয়া উদ্যোগ করেন, এবং ভূমিকে প্রাচীর-বদ্ধ করিয়া লন। সাজিহান তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন যে, যদি তুমি এস্থানে কোন গৃহ প্রস্তুত কর আর সেই গৃহ দেখিতে তাজমহল অপেক্ষা কোন অংশে কুৎসিত হয়, তাহা হইলে এতসুন্দর এই তাজ গৃহের কাছে, ওরূপ একটি কদাকার পদার্থ সর্ব্বদা থাকিলে তাজের শোভার অনেক ব্যাঘাত হইবে। আর যদি তোমার গৃহ তাজগৃহ হইতে সৌন্দর্য্যে উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার তাজের শোভা সমস্ত গ্রাসিত ও বিলুপ্ত হইবে। মাহতাব খাঁ ইহা শুনিয়া বাগান প্রস্তুত করিতে ক্ষান্ত হন। সাজিহান তৎপর এইস্থানে আপনার সমাধির জন্য তাজ মহালের অবিকল অপর একটি উদ্যান ও বাটী প্রস্তুত করিতে মনন করেন এবং তাহা যমুনার উপর দিয়া ম-

র্ম্মর প্রস্তরের সেতু দ্বারা, তাক গৃহের সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বৃত্ত পুত্র অরঙ্গজীব দ্বারা তিনি অকালে কারারুদ্ধ হওয়াতে সে ইচ্ছা তাঁহার অন্তরেই লীন হইয়া যায়। এই মাহতাব্ খাঁর বাগ এবং পূর্ব্বোক্ত হুমায়ুনের মস্জিদের পশ্চিমে যমুনাতট দিয়া বহুদূর ব্যাপিয়া বাবর ও হুমায়ুনের প্রসাদ বাটী ও উদ্যানাদি রচিত ছিল। এক্ষণ তাহার কিছুই নাই। কেবল এখানে সেখানে মৃত্তিকা-স্তূপ ও ইষ্টক খণ্ড সকল ছড়ান রহিয়াছে। বাবর কি হুমায়ুন কাহারই সমাধি এখানে নাই।

মুসলমান বংশের কুবলয় স্বরূপ আকবর ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে আগ্রা এবং দিল্লী অধিকার করেন। অধিকারের পরক্ষণেই তিনি আগ্রাতে আসিয়া বাস করেন নাই। আগ্রা হইতে পশ্চিম দক্ষিণে প্রায় ২৪ মাইল ব্যবধানে ফকির সলিম্-চিস্তির দরগা ফতেহ্ পুর সিকরীতে কিছুদিন বাস করেন। সেখানে সম্রাটের বাসোপযোগী প্রাসাদ বাটী, উদ্যান ও অন্যান্য বহুবিধ অট্টালিকা আজিও দর্শকদিগের নয়ন বিনোদনের জন্য প্রস্তুত আছে। এইস্থানে কিছুকাল বাস করিয়া সেখানে তাঁহার পুত্র সলিমের (জাহাঙ্গিরের) জন্ম হইলে পর প্রায় ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে আগ্রাতে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন। প্রবাদ আছে যে, যখন তিনি আগ্রাতে আসেন তখন কিছুকালের জন্য আগ্রার বর্ত্তমান দুর্গ সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত সহরের দক্ষিণ পশ্চিমে ইদ্গাহ নামক বৃহৎ সমজিদ হইতে সোয়া মাইল ব্যবধানে এবং বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেটি আফিস হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে সুলতানপুর ও খোয়াসপুর নামক গ্রাম দ্বয়ে শিবির সন্নিবেশ করিয়া থাকেন, এবং দুর্গ তাঁহার অধিবাসের উপযুক্ত রূপে সজ্জিত হইলে তাহাতে আসিয়া অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। এই ঘটনা হইতেই পূর্ব্বোক্ত গ্রাম দ্বয় সুলতানপুর ও খাওয়াস্পুর নাম প্রাপ্ত হয়। সুলতানপুর অর্থে সুলতান অর্থাৎ রাজার আপন নগরকে বুঝায় আর খাওয়াসপুর অর্থে খাওয়াস্ অর্থাৎ চাকরদিগের অধিষ্ঠিত স্থানকে বুঝায়। খৃঃ ১৫৭১ অব্দে আগ্রার বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই সময় হইতেই আগ্রা আকবরাবাদ রূপ অপর এক নূতন নাম ধারণ করে। কিন্তু এই নামে বোধ হয় ইহাকে এক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লোক ভিন্ন অপরে তত চিনিতে পারে না। আগ্রাই ইহার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ নাম। ক্রমশঃ

(প্রবাসী।)



বাণীস্তোত্র।

গীতি।

জয় বিদ্যে জগত জননি,
জীবন্মুক্তি-প্রদায়িনি,
কলুষনাশিনি রমে
জয়দে বরদে বাণি ও।
সুখ মোক্ষ তব পদে
করুণাময়ি হে শুভদে
ভকতবৎসলা বালা,
মৃঢ়ে জ্ঞানদায়িনি ও॥

২

বেদমাতা বিশ্বরমে,
কবীশ-মনীষ-প্রিয়তমে,
আগমে নিগমে ব্যক্ত,
মহিমা তোমারি;
অনন্ত উৎসব রঙ্গে
ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে
পুজিছে সদা চরণ কমলে
কল্পনা-কামিনী ও॥

৩

মধুর মলয়ানিলে,
গায় ভ্রমর কোকিলে,
বসন্তে তোমার গুণ,
বসন্তবাসিনি;
আহা কিবা সুখসঙ্গ,
নাহি তাল স্বর ভঙ্গ,
হাসিছে কুসুম, নাচিছে তারা,
খেলিছে তরঙ্গিণী ও॥

৪

সুরাসুর মায়ের বশ,
অক্ষয় মায়ের যশঃ,
ভুবনপুজিত নাম,
পাপ-দুঃখ-হারি;
অপরূপ দেখরে চাহিয়ে,
বসেছে আনন্দে মায়েরে লইয়ে
সারস্বত সুত যত,
মধ্যে বীণাপাণি ও॥

৫

কত যত্ন কত শ্রমে,
শুভ দিনে স্বর্ণভূমে,
পুজিত তোমারে রমে,
নগরে নগরে;
অযোধ্যা অবন্তী পুরী,
মথুরার সে মাধুরী,
হারায়ে কপালদোষে,
ভারত দুঃখিনী ও॥

৬

বাল্মীকি গৌতম ব্যাস,
ভবভূতি কালিদাস,
শঙ্কর, ভাস্কর সুপ্ত
ভারত-শ্মশানে ;
দেহ বর হে বরদে
তোমার পদপ্রসাদে
ভারত পাইবে প্রাণ
মৃতসঞ্জীবনি ও ॥

৭

ছিলে যুগ যুগ ভরি,
ভারতে পবিত্র করি,
ভারতে প্রসন্না সদা,
হ্যাদে গো ভারতি ;
এ গভীর অন্ধকারে,
কৃপা কটাক্ষ বিত’রে,
পতিত ভারতে উদ্ধারহ,
পতিতপাবনি ও ॥

(পথিক)

জীবন প্রভাত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কণ্ঠমালা।

“ মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।”

ভারতচন্দ্র রায়।

রজনী প্রায় এক প্রহর হইলে সরযু-বালা পিতার আদেশে অতিথির খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিলেন, রঘুনাথ আসন গ্রহণ করিলেন, সরযু পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে অদ্যাবধি আহুত ব্যক্তিকে পরিবারের মধ্যে কোন এক জন রমণী আসিয়া ভোজন করাইবার রীতি আছে।

রঘুনাথ বসিলেন, কিন্তু ভোজন দূরে থাক, চিত্ত সংযম করিতে পারিলেন না। শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত আধারে সরযু মিষ্ট সরবৎ আনিয়া দিলেন, রঘুনাথ পাত্রধারিণীর দিকে সোদ্বেগচিত্তে চাহিলেন, যেন তাঁহার জীবন, প্রাণ, দৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়া সেই কন্যার দিকে ধাবমান হইল। চারি চক্ষু মিলন হইল, অমনি সরযুর মুখমণ্ডল লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল, লজ্জাবতী চক্ষু মুদিত করিয়া, মুখ অবনত করিয়া, ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। রঘুনাথও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া অধোবদন হইলেন।

পুনরায় সরযু আর একটি পাত্র আনিলেন, রঘুনাথ বর্ব্বর নহেন, এবার তিনি মুখ অবনত করিয়া রাখিলেন, কেবল সরযুর সুন্দর সুবর্ণ বলয়বিজড়িত হস্ত ও কঙ্কণবিজড়িত সুগোল বাহুমাত্র দেখিতে পাইলেন ; অগত্যা হৃদয় স্ফীত হইল, এ-

কটি দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল। সরযু তাহা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার হস্ত ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল, তিনি ধীরে ধীরে পার্শ্বে সরিয়া গেলেন।

ভোজন সাঙ্গ হইল। রঘুনাথের শয্যা-রচনা হইল, রঘুনাথ দীপ নির্ব্বাণ করিলেন, শয়ন করিলেন না, ঘরের দ্বার ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটন করিয়া নক্ষত্রালোকে ছাদে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

সেই গম্ভীর অন্ধকারে নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অল্পবয়স্ক যোদ্ধা কি চিন্তা করিতেছেন? নিশার ছায়া ক্রমে গভীরতর হইতেছে, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় মনুষ্য, জীব, জন্তু, সমগ্র জগৎ সুপ্ত হইয়াছে, দুর্গে শব্দমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের শব্দ শুনা যাইতেছে ও প্রহরে প্রহরে ঘণ্টারব সেই নিস্তব্ধ দুর্গে ও চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে প্রতিহত হইতেছে। এ গভীর অন্ধকার রজনীতে রঘুনাথ অনিদ্র হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন?

রঘুনাথের জীবনের এই প্রথম গভীর চিন্তা, এই হৃদয়ের প্রথম ভীষণ উদ্বেগ, এ চিন্তা এ উদ্বেগ রজনীর মধ্যে শেষ হইবার নহে, চিরজীবনে কি শেষ হইবে? এত দিন রঘুনাথ বালক ছিলেন, অদ্য যেন সহসা তাঁহার শান্ত, নীল, জীবনাকাশের উপর দিয়া বিদ্যুৎরূপিণী একটি প্রতিমূর্ত্তি সরিয়া গেল, রঘুনাথের নয়ন, হৃদয় ঝল্‌সিয়া গেল, তাঁহার সুপ্ত চিন্তা, উদ্বেগ, ও সহস্র বেগবতী মনোবৃত্তি সহসা জাগরিত হইল। শত সহস্র বার সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি মনে আসিতে লাগিল, সেই আলেখ্য-লিখিত ভ্রুযুগল, সেই ভ্রমর-কৃষ্ণ উজ্জ্বল চক্ষু, সেই পুষ্পনিন্দি মধুময় ওষ্ঠ দুইটি, সেই নিবিড় কেশপাশ, সেই সুগোল বাহুযুগল মনে জাগরিত হইতে লাগিল, আর রঘুনাথ উন্মত্ত হইয়া সেই চিত্রের দিকে দেখিতে লাগিলেন। মস্তক ঘূর্ণিত হইল, শরীর অবসন্ন হইল, কিন্তু হৃদয়ের তৃষা নিবারণ হইল না; পুনঃ পুনঃ নব নব সৌন্দর্য্য মানস-চক্ষুতে উদয় হইতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ অগ্নিদিকে পতঙ্গবৎ সেই সৌন্দর্য্যদিকে হৃদয় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এই আনন্দময়ী কন্যা কি তিনি লাভ করিতে পারিবেন? এই আয়ত স্নেহপূর্ণ নয়ন, এই জবানিন্দি ওষ্ঠ, এই চিত্তহারি অতুল লাবণ্য, রঘুনাথ! কি তোমার হইবে? তুমি একজন সামান্য হাবিলদার মাত্র, জনার্দ্দন অতি উচ্চ কুলোদ্ভব রাজপুত, তাঁহার রূপবতী কন্যা রাজাদিগেরও প্রার্থনীয়া! কিজন্য এরূপ আশায় হৃদয় বৃথা ব্যথিত করিতেছ? রঘুনাথ! এ বৃথা তৃষ্ণায় কেন হৃদয় দগ্ধ করিতেছ? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রাচীরের উপর হস্ত স্থাপন করিয়া তাহার উপর মস্তক স্থাপন করিলেন। ললাটের শিরা স্ফীত হইতে লাগিল। ভাবিলেন "হায়! আমি অকিঞ্চিৎকর বন্ধুহীন সামান্য সৈনিক মাত্র! আমার বংশমর্য্যাদা বিলুপ্ত, আমার নাম

নাই, গৌরব নাই, আমি সরযুর অযোগ্য! কোন রাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তি এই কুসুমটিকে হৃদয়ে ধারণ করিবে, আমি ইহার স্মৃতিমাত্র যাবজ্জীবন বহন করিব; দেশে, বিদেশে, যুদ্ধে, শত্রুশিবিরে, জীবনে, মরণে, বহন করিব। হা বিধাতঃ! কেন আমি সরযুর অযোগ্য হইলাম,—বা অযোগ্য হইয়া কেন এ কুসুমটি দর্শন করিলাম?" তবে কি এ আশা ত্যাগ করিবেন? সে মূর্ত্তি হৃদয় হইতে তিরোহিত করিবেন? সে যে জীবনের অংশ স্বরূপ হইয়াছে; রঘুনাথ দেখিলেন স্বহস্তে হৃদয় উৎপাটন করা সম্ভব, সে মূর্ত্তি অপনয়ন করা দুঃসাধ্য। রঘুনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিলেন।

আবার চিন্তা করিলেন "সেই স্বর্গীয় অপ্সরা কি মুহূর্ত্ত জন্যও আমার জন্য চিন্তা করিয়াছেন? যাঁহার জন্য আমার হৃদয় ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়ের এক কণায়ও কি আমি স্থান পাইয়াছি? যাঁহার জন্য আমার মন ও জীবন ব্যাকুল হইয়াছে, তাঁহার মন মুহূর্ত্তের জন্যও কি এ অকিঞ্চিৎকর সৈনিকের জন্য ধাবমান হয়? যাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য আমি জীবন দিতে উদ্যত, তিনি কি মুহূর্ত্তের জন্যও আমার প্রতি সদয় দৃষ্টি করিয়াছেন? জানি না কিন্তু সরযু! সরযু! আমার হৃদয় জানিলে তুমি আমার উপর বোধ হয় এক মুহূর্ত্তের জন্যও সদয় প্রদান করিতে, অভাগা তাহার অধিক চাহেনা।" আবার অন্ধকার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন।

দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজিল, কিন্তু রঘুনাথের এ বিষম চিন্তা শেষ হইল না। হস্তে গণ্ডস্থাপন করিয়া একাকী নিঃশব্দে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। এই শান্ত রজনীতে তাঁহার হৃদয়ে কি প্রলয়ের ঝটিকা বহিতেছে!

কিন্তু যৌবনকালে আশাই বলবতী হয়, শীঘ্র আমাদের নৈরাশ হয় না, অসাধ্যও আমরা সাধ্য বিবেচনা করি, অসম্ভবও সম্ভব বোধ হয়। রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া, চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতেছিলেন, অনেকক্ষণ পর সহসা দণ্ডায়মান হইলেন, আপন হৃদয়ের উপর উভয় বাহু স্থাপন করিয়া সগর্ব্বে ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, মনে মনে বলিলেন "ভগবন্, সহায় হও, অবশ্য কৃতকার্য্য হইব,যশ, মান, খ্যাতি, মনুষ্যসাধ্য, কি জন্য আমার অসাধ্য হইবে? আমার শরীর কি অন্য অপেক্ষা ক্ষীণ? বাহু কি অন্য অপেক্ষা দুর্ব্বল? যুদ্ধে কি আমি অন্য অপেক্ষা ভীরু? * * "দেখিব এই পণ রাখিতে পারি কি না।" * * "তাহার পর? যদি কৃতকার্য্য হই তাহা হইলে সরযু! আমি তোমার অযোগ্য হইব না; তখন সরযু! তোমাকে গল্পচ্ছলে অদ্যকার এই সকল কথা বলিব, তখন তোমার সুন্দর হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া স্বর্গ-

সুখ তুচ্ছ করিব, তখন স্বহস্তে ঐ সুন্দর কেশ পাশে মুক্তামালা জড়াইয়া দিব,আর ঐ সুন্দর বিম্ববিনিন্দি ওষ্ঠদ্বয়——” রঘুনাথ! রঘুনাথ! উন্মত্ত হইও না।

তখন রঘুনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত-হৃদয়ে শয়ন করিতে আসিলেন। গৃহের ভিতর না যাইয়া সেই ছাদের যেস্থানে পূর্ব্বদিন সরযু বসিয়াছিলেন সেইস্থানে শয়ন করিতে আসিলেন। দেখিলেন—কি দেখিলেন? দেখিলেন একটি কণ্ঠমালা পড়িয়া রহিয়াছে; দুইটি করিয়া মুক্তা, পরে একটি করিয়া পলা,—রঘুনাথ সে মালা চিনিলেন। সেই মালা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সরযু কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন, বোধ হয় অসাবধানতা বশত ঐস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন “ভগবন্ একি আমার আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বলক্ষণ দান করিলেন?” শত সহস্রবার সেই মালা চুম্বন করিয়া পরে পরিধেয় কুর্ত্তীর নীচে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। পরে অচিরাৎ সেই স্থানেই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিন্তু সে নিদ্রা স্বপ্নপূর্ণ,স্বপ্ন সরযু-পূর্ণ।

পরদিন প্রাতে রঘুনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জনার্দ্দন দেবের নিকট ভবানীর আজ্ঞা জানিলেন; “ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধে জয়, স্বধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজয়।” পরে কিল্লাদারের নিকট কতকগুলি লিপি ও যুদ্ধবিষয়ক উপদেশ লইয়া রঘুনাথ যাত্রা করিলেন।

দুর্গ ত্যাগের পূর্ব্বে একবার সরযুর সহিত দেখা করিলেন; সরযু যখন মন্দিরে আসিয়াছেন, ধীরে ধীরে আপনিও তথায় যাইলেন। হৃদয়ের তুমুল উদ্বেগ কথঞ্চিৎ দমন করিয়া ঈষৎ কম্পিতস্বরে বলিলেন—“ভদ্রে! কল্য নিশিযোগে ছাদে এই কণ্ঠমালাটি পাইয়াছি, সেইটি দিতে আসিয়াছি; অপরিচিতের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন ”

এই বিনীতবাক্য শুনিয়া সরযু ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন সেই কমনীয় উদার মুখমণ্ডল, সেই কেশাবৃত উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল কৃষ্ণ নয়নদ্বয়, সেই তরুণ যোদ্ধার উন্নত অবয়ব! সহসা রমণীর শরীর কম্পিত হইল, গৌর মুখমণ্ডল পুনরায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল! সরযু উত্তর দিতে অশক্ত!

সরযুকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন “যদি অনুমতি করেন তবে এই সুন্দর মালাটি উহার অভ্যস্ত স্থানে স্থাপন করিয়া জীবন চরিতার্থ করি।”

সরযু সলজ্জনয়নে একবার রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, উঃ! সে বিশাল আয়ত নয়নের ক্ষণদৃষ্টিতে রঘুনাথের হৃদয় সহস্রধা বিদ্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ রঞ্জিতমুখী লজ্জায় আবার চক্ষু মুদিত করিলেন।

মৌনই সম্মতির লক্ষণ জানিয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন, কন্যার পবিত্র শরীর স্পর্শ করিরিলেন না।

কন্যার শরীর একেবারে রোমাঞ্চিত হইল, ও বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; ধন্যবাদ দিবেন কি তাঁহার কম্পিত ওষ্ঠ হইতে বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

রঘুনাথ সরযুর এই উদ্যম দেখিয়াই আপনাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত বিবেচনা করিলেন। ক্ষণেক পর ঈষৎ খেদযুক্ত স্বরে বলিলেন—"তবে অতিথিকে বিদায় দিন।"

সরযু এবার লজ্জা ও উদ্বেগ সংযম করিয়া ধীরে ধীরে রঘুনাথের দিকে চাহিলেন; আবার ধীরে ধীরে ভুমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া অতি মৃদু অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন, "আপনার নিকট অনুগৃহীত রহিলাম, পুনরায় কি এ দুর্গে আগমন হইবে?"

উ! পিপাসার্ত্ত চাতকের পক্ষে প্রথম বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায়, পথভ্রান্ত পথিকের পক্ষে উষার প্রথম রক্তিমচ্ছটার ন্যায়, সরযুর প্রথমোচ্চারিত এই অমৃত কথাগুলি রঘুনাথের হৃদয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত করিল! তিনি উত্তর করিলেন—

"রমণীরত্ন! আমি পরের দাস,যুদ্ধ আমার ব্যবসায়, পুনরায় কবে আসিতে পারিব, কখনও আসিতে পারিব কি না তা জানি না; কিন্তু যতদিন জীবিত থাকিব, যতদিন এই হৃদয় শুষ্ক না হইবে, ততদিন আপনার সৌজন্য, আপনার যত্ন, আপনার দেবনিন্দিত মুর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইব না। আপনার পিতা এই পথে আসিতেছেন, আমি বিদায় হইলাম, কখন কখন নিরাশ্রয় দরিদ্র সৈনিককে স্মরণ করিবেন।"

সরযু উত্তর দিতে পারিলেন না, রঘুনাথ দেখিলেন সেই আয়ত নয়ন দুইটি ছল্ ছল্ করিতেছে; তাঁহার আপনার নয়নও শুষ্ক ছিল না।

অচিরে দেবালয় হইতে বাহির হইলেন ও অশ্বে আরূঢ় হইয়া দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলেন।

রঘুনাথের অধীনের অশ্বারোহিগণ পূর্ব্ব দিন রঘুনাথের অল্প পরে আসিয়াছিল, সুতরাং প্রাচীরের বাহিরে তাহারা রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিল। তাহারা পুনরায় আপনাদিগের অসমসাহসী ও দুর্দ্দম তেজস্বী হাবিলদারকে পাইয়া হুঙ্কার শব্দ করিয়া উঠিল, কিন্তু সেই সরল বালককে আর পাইল না। তোরণ দুর্গাগমনের দিন হইতে রঘুনাথজীর বালোচিত চপলতা দূর হইল, মনুষ্যের চিন্তা ও প্রতিজ্ঞায় জীবন আচ্ছন্ন হইল।

সেই দিবসেই রঘুনাথজী হাবিলদার সিংহগড় উপস্থিত হইয়া শিবজীকে সমস্ত সংবাদ জানাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শায়েস্তা খাঁ।

"কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন?"

নবীনচন্দ্র সেন।

যদিও কএক বৎসর অবধি শিবজীর ক্ষমতা ও রাজ্য ও দুর্গসংখ্যা দিন দিন

বৃদ্ধি পাইতেছিল, তথাপি ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দের পুর্ব্বে দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে বশীকরণ অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন যত্ন করেন নাই। সেই বৎসর শায়েস্তাখাঁ আমীর উল ওমরা খেতাপ প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হয়েন, ও শিবজীকে একেবারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। শায়েস্তাখাঁ সেই বৎসরেই পুনা ও চাকন দুর্গ ও অন্য কএক স্থান অধিকার করেন, ও পর বৎসর অর্থাৎ এই আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। দিল্লীর-সম্রাটের আদেশানুসারে মাড়ওয়ারের রাজা প্রসিদ্ধনামা যশোবন্ত সিংহও এই বৎসরে (১৬৬৩ খ্রীঃ) বহু সৈন্য লইয়া শায়েস্তাখাঁর সহিত যোগ দিলেন, সুতরাং শিবজীর বিপদের সীমা ছিল না। মোগল ও রাজপুত সৈন্য পুনা নগরের নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল ও শায়েস্তাখাঁ স্বয়ং দাদাজী কানাইদেবের গৃহে অর্থাৎ যে গৃহে শিবজী বাল্যকালে মাতার সহিত বাস করিতেন, সেই গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। শায়েস্তাখাঁ শিবজীর চতুরতা বিশেষরূপে জানিতেন সুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে অনুমতিপত্র বিনা কোন মহারাষ্ট্রীয় পুনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। শিবজী নিকটবর্ত্তী সিংহগড় নামক এক দুর্গে সসৈন্য অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সে সময়ে যুদ্ধব্যবসায়ে অধিক পরিপক হয় নাই, দিল্লীর পুরাতন সেনার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নহে; সুতরাং শিবজী চতুরতা ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা ও হিন্দুরাজ্য বিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না।

চৈত্র মাসের শেষযোগে একদিন সায়ংকালে মোগলসেনাপতি শায়েস্তাখাঁ আপন অমাত্য ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সভায় বসিয়াছেন, ও কিরূপে শিবজীকে জয় করিবেন তাহাই পরামর্শ করিতেছেন। দাদাজী কানাইদেবের বাটীর মধ্যে সভাগৃহেই এই সভা হইয়াছিল। চারিদিকে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে; ও জানালার ভিতর দিয়া সায়ংকালের শীতলবায়ু উদ্যানের পুষ্পগন্ধ বহিয়া আনিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। আকাশ অন্ধকার, কেবল দুই একটি নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, আমির উল ওমরা স্বয়ং ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন—

"তাহাকে পাইলে জয় করিতে কত ক্ষণ?" আনৃওরী নামে একজন চাটুকার বলিল "আমিরের সেনার সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন মহাবাত্যার সম্মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবে অথবা ভীত হইয়া পৃথিবীর ভিতর প্রবেশ করিবে।"

সেনাপতি তুষ্ট হইয়া হাস্য করিলেন।

চাঁদখাঁ নামক একজন প্রাচীন সেনা কএক বৎসর অবধি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল বিক্রম দেখিয়াছিলেন; তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন "আমি বোধ করি তাহাদের উক্ত দুইটি ক্ষমতাই আছে।"

শায়েস্তা খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?"

চাঁদখাঁ নিবেদন করিলেন " গত বৎসর কতিপয় পার্ব্বতীয় মহারাষ্ট্রীয় যখন চাকন দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস অবধি চেষ্টা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দুর্গ জয় করিয়াছে তাহা জঁহাপনার স্মরণ আছে ; একটি দুর্গ হস্তগত করিতে সহস্র মোগলের প্রাণনাশ হইয়াছে। আবার এ বৎসর সর্ব্বস্থানে আমাদের সৈন্য থাকাতেও নিতাইজী আসমান দিয়া আহম্মদনগর ও অরঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইয়া দেশ ছারখার করিয়া আসিয়াছে।

সভাসদ্ সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, শায়েস্তাখাঁ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন—

" চাঁদখার বয়স অধিক হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পর্ব্বত-ইন্দুরকে ভয় করেন। পুর্ব্বে তাঁহার এরূপ ভয় ছিল না।" চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

আন্ওরী সময় বুঝিয়া বলিল " জহাঁপনা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা ইন্দুর বিশেষ, তাহারা যে পর্ব্বতইন্দুরের ন্যায় গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে তাহা আমি অস্বীকার করি না।"

শায়েস্তাখাঁ একটি বড় সুন্দর রহস্য বিবেচনা করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, সুতরাং সভাসদ্ সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল। চাটুকারেরই জয়!

চাঁদখাঁ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অস্পষ্টস্বরে বলিলেন—" ইন্দুরে পুনার ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাহির না হইলে রক্ষা।" শায়েস্তাখাঁ এ বিষয়ে উদ্বেগশূন্য ছিলেন না ; কিন্তু ভয়চিহ্ন সম্বরণ করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—" এখানে দিল্লীর সহস্র সহস্র নখায়ুধ বিড়াল আছে, ইন্দুরে সহসা কিছু করিতে পারিবেন না।" সভাসদ্ সকলেই " কেরামৎ " " কেরামৎ " করিয়া সেনাপতির এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিষয়ে এইরূপ অনেক রহস্য হইলে পর কি প্রণালীতে যুদ্ধ হইবে তাহাই স্থির হইতে লাগিল। চাকন দুর্গ হস্তগত হওয়া অবধি শায়েস্তা খাঁ দুর্গ হস্তগত করা একেবারে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন " এই প্রদেশ দুর্গ পরিপুর্ণ,যদি একে একে সমস্ত দুর্গ হস্তগত করিতে হয়, তবে কত দিনে যে দিল্লীশ্বরের কার্য্যসিদ্ধি হইবে, কখনও সিদ্ধি হইবে কি না তাহার স্থিরতা নাই।" চাঁদখাঁ কার্য্যজ্ঞ ছিলেন এই ক্ষণেই অপ্রতিভ হইয়াছেন সে কথা বিস্মৃত হইয়া সৎপরামর্শ দিবার চেষ্টা করিলেন। "জহাঁপনা! দুর্গই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল, উহারা সম্মুখ রণ করিবে না, অথবা রণে পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই, কেননা দেশ পর্ব্বতময়, উহাদের সেনা

এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন্ দিক দিয়া অন্য স্থানে উপস্থিত হইবে, আমরা তাহার উদ্দেশ পাইব না। কিন্তু দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে পারিলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবশ্যই দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।”

শায়েস্তাখাঁ চাকন দুর্গ অধিকার করিয়া অবধি আর দুর্গ জয় করিবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বলিলেন ‘কেন? মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে কি আমরা পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিব না? আমাদের কি অশ্বারোহী নাই, পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সমস্ত মহারাষ্ট্রসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে না?’

চাঁদখাঁ পুনরায় নিবেদন করিলেন—‘যুদ্ধ হইলে অবশ্যই মোগলের জয়, ধরিতে পারিলে আমরা মহারাষ্ট্রীয়সেনা বিনাশ করিব তাহার সংশয় নাই, কিন্তু এই পর্ব্বতপ্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিতে পারে এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি বৃহৎ অশ্বারোহী বর্ম্মাবৃত ও বহু-অস্ত্র-সমন্বিত; সমভূমিতে, সম্মুখক্ষেত্রে তাহাদের তেজ, তাহাদের ভার দুর্দ্দমনীয়, তাহাদের গতি অপ্রতিহত; কিন্তু এই পর্ব্বতপ্রদেশে তাহাদিগের যাতায়াতের ব্যাঘাত জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ যেন ছাগের ন্যায় তুঙ্গশৃঙ্গে লম্ফ দিয়া উঠে, ও হরিণের ন্যায় উপত্যকা ও সুরাখের মধ্য দিয়া পলায়ন করে। জাঁহাপানা! আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। সিংহগড়ে শিবজী আছেন সহসা সেই স্থান অবরোধ করুন; এক মাস কি দুই মাস কালের মধ্যে দুর্গ জয় করিব, শিবজী বন্দী হইবে, দিল্লীশ্বরের জয় হইবে। নচেৎ এ স্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের জন্য অপেক্ষা করিলে কি হইবে? তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনের চেষ্টা করিলেই বা কি হইবে? দেখুন নিতাইজী অনায়াসে আমাদের নিকট দিয়া যাইয়া আহম্মদনগর ও আরঙ্গাবাদ ছারখার করিয়া আসিল, কস্তম জমান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কি করিল?’

শায়েস্তাখাঁ সক্রোধে বলিলেন—‘কস্তম জমান বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া নাতাজীকে পলাইতে দিয়াছে; আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। চাঁদখাঁ, তুমিও সম্মুখ যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেছ, দিল্লীশ্বরের সেনাগণের মধ্যে সাহসী কি কেহই নাই?’

প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদখাঁর মুখমণ্ডল আবার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া এক বিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন; পরে সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—‘পরামর্শ দিতে পারি এরূপ সাধ্য নাই; সেনাপতি, যুদ্ধের প্রণালী স্থির করুন, যেরূপ হুকুম হইবে, তামীল করিতে এ দাস পরাঙ্মুখ হইবে না।

চাঁদখাঁর উৎকৃষ্ট পরামর্শ অনুসারে

কার্য্য করেন, শায়েস্তাখাঁর এরূপ সাহস ছিল না।

এই সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সমাচার দিল যে, সিংহগড়ের দূত মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। শায়েস্তাখাঁ তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সভাগৃহে আসিবার আজ্ঞা দিলেন। সভার সকলে এই দূতকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

ক্ষণেক পরই মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

ন্যায়শাস্ত্রীর বয়স এক্ষণও চত্বারিংশৎ বৎসর হয় নাই; অবয়ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় ঈষৎ খর্ব্ব ও কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, নয়ন গভীরবুদ্ধিব্যঞ্জক, ললাটে দীর্ঘ তিলক চন্দন, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শরীর পুরু তুলার কুর্ত্তিতে আবৃত, সুতরাং গঠন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মস্তকে প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, এরূপ প্রকাণ্ড যে বদনমণ্ডল যেন তাহার ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে। শায়েস্তাখাঁ সাদরে দূতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

শায়েস্তাখাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন 'সিংহগড়ের সংবাদ কি ?'

মহাদেওজী একটি সংস্কৃত শ্লোক পড়িলেন —

' সন্তি নদ্যোদণ্ডকেষু তথা পঞ্চবটীবনে।
সরযুবিচ্ছেদশোকং রাঘবস্তু কথং সহেৎ॥'

পরে তাহার অর্থ করিলেন ' দণ্ডকারণ্যে ও পঞ্চবটী বনে শত শত নদী আছে কিন্তু তাহা দেখিয়া কি রাঘব সরযু নদীর বিচ্ছেদ দুঃখ ভুলিতে পারেন ? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত দুর্গ এক্ষণও শিবজীর হস্তে আছে, কিন্তু পুনা আপনার হস্তগত, সে সন্তাপ কি তিনি ভুলিতে পারেন ?'

শায়েস্তাখাঁ পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন— ' হাঁ, তোমার প্রভুকে বলিও প্রধান দুর্গ আমি হস্তগত করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার যুদ্ধ করা বিফল, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিলে বরং এক্ষণও আশা আছে।'

ব্রাহ্মণ ঈষদ্ধাস্য করিয়া পুনরায় সংস্কৃত পাঠ করিলেন—

'ন শক্তোহি স্বাভিলাষং জ্ঞাপয়িতুঞ্চাতকঃ
জ্ঞাত্বাতু তৎ বারিধরস্তোষয়তি যাচকং॥'

অর্থাৎ চাতক কথা কহিয়া আপন অভিলাষ মেঘকে জানাইতে পারে না, কিন্তু মেঘ আপনার দয়া বশতই সেই অভিলাষ বুঝিয়া পূর্ণ করে। মহজ্জনের যাচককে দিবার এই রীতি। প্রভু শিবজী এক্ষণে পুনা ও চাকন হারাইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতেও লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু ভবাদৃশ মহল্লোক তাঁহার মনের অভিলাষ জানিয়া অনুগ্রহ করিয়া যাহা দান করিবেন তাহাই শিরোধার্য্য।'

শায়েস্তাখাঁ আনন্দ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন ' পণ্ডিতজী তোতোমার পাণ্ডিত্যে আমি যে কতদূর পরি-

তুষ্ট হইলাম বলিতে পারি না; তোমাদের সংস্কৃত ভাষা কি সুমধুর ও ভাবপরিপূর্ণ। যথার্থই কি শিবজী সন্ধির ইচ্ছা করিতেছেন ?'

মহাদেও। 'খাঁ সাহেব! সম্মুখ-যুদ্ধে দিল্লীশ্বরের সৈন্যের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা কেবল সন্ধি সন্ধি এই শব্দ করিতেছি।'

শায়েস্তাখাঁ এবার আহ্লাদ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'চাঁদ খাঁ! সম্মুখ যুদ্ধ ভাল না দুর্গ অবরোধ ভাল,কিসে দ্বারা শত্রু অধিক ভীত হইয়াছে ?' পরে আনন্দ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া শায়েস্তাখাঁ বলিলেন,—

'ব্রাহ্মণ! আপনার শাস্ত্রালোচনায় সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে যদি সন্ধির কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন তবে শিবজী আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহার নিদর্শন কৈ ?'

ব্রাহ্মণ তখন গম্ভীরভাবে বস্ত্রের ভিতর হইতে নিদর্শন পত্র বাহির করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শায়েস্তাখাঁ সেইটি দেখিলেন। পরে বলিলেন—'হাঁ আমি নিদর্শন পত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে কি কি প্রস্তাব করিবার আছে করুন।'

মহাদেওজী। 'প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা যে যখন প্রথমেই আপনাদিগের জয় হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করা বৃথা।'

শায়েস্তাখাঁ। 'ভাল।'

মহা। 'সুতরাং সন্ধির জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছেন।'

শায়ে। 'ভাল।'

মহা। 'এক্ষণে কি কি নিয়মে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিতে সম্মত হইবেন তাহা জানিতে তিনি উৎসুক,জানিলে সেই গুলি পালন করিতে যত্নবান্ হইবেন।'

শায়ে। 'প্রথম, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করণ। তাহাতে আপনার প্রভু স্বীকৃত আছেন ?'

মহা। 'তাঁহার সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার নাই; মহাশয় যে যে কথাগুলি বলিবেন তাহাই আমি তাঁহার নিকট জানাইব, তিনি সেই গুলি বিবেচনা করিয়া সম্মতি অসম্মতি পরে প্রকাশ করিবেন।'

শায়ে। 'ভাল। প্রথম কথা আমি বলিয়াছি, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করণ। দ্বিতীয়, দিল্লীশ্বরের সেনা যে যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছে তাহা দিল্লীশ্বরেরই থাকিবে। তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কএকটি দুর্গ তোমরা ছাড়িয়া দিবে।'

মহা। 'সে কোন্ কোন্‌টি।

শায়ে। 'তাহা দুই এক দিনের মধ্যে পত্রদ্বারা জানাইব। চতুর্থ, অবশিষ্ট যে যে দুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে রাখিবেন তাহাও দিল্লীশ্বরের অধীনে জায়গীর স্বরূপ ভোগ করিবেন, তাহার জন্য কর দিতে হইবে। এইগুলি তোমার প্রভুকে জানাইও, ইহাতে তিনি সম্মত কি

অসম্মত তাহা যেন আমি দুই এক দিনের মধ্যে জানিতে পারি।'

মহা। 'যেরূপ আদেশ করিলেন সেইরূপ করিব। এক্ষণে যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে তখন যতদিন সন্ধিস্থাপন না হয়, ততদিন যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকিতে পারে?'

শায়ে। 'কদাচ নহে। ধূর্ত্ত কপটাচারী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না। এমত ধূর্ত্ততা নাই যে তাহাদের অসাধ্য। যতদিন সন্ধি একেবারে স্থাপন না হয় ততদিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদের অনিষ্ট করিব, তোমরা পার আমাদের অনিষ্ট করিও।'

'এবমস্তু' বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। একজন মোগল প্রহরী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'দূত মহাশয় কি দেখিতেছেন?' দূত উত্তর করিলেন 'এই গৃহে প্রভু শিবজী বাল্যকালে ক্রীড়া করিতেন তাহাই দেখিতেছি; এটিও তোমাদের হস্তগত হইয়াছে, বোধ হয় একে একে সমস্ত দুর্গগুলিই তোমরা লইবে; হা! ভগবন!' প্রহরী হাস্য করিয়া বলিল 'সে জন্য আর বৃথা খেদ করিলে কি হইবে, আপন কার্য্যে যাও।' 'সে কথা সত্য' বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

ব্রাহ্মণ শীঘ্রই বহুজনাকীর্ণ পুনা নগরীর লোকের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শুভকার্য্যের দিনস্থির।

"— ————নিশি দ্বিপ্রহরে
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহিগণ।"

নবীনচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্মণ একে একে পুনার বহু পথ অতিবাহন করিলেন; যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন সেই সেই স্থান বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দুই একটি দোকানে দ্রব্য ক্রয়ের ছলে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা বিষয় জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন, প্রশস্ত রাজপথ হইতে একটি গলিতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ সমস্ত নির্ব্বাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ আলয়ে সুপ্ত।

ব্রাহ্মণ একাকী অনেক দূর যাইলেন, আকাশ অন্ধকারময় কেবল দুই একটি তারা দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে সুপ্ত, জগৎ নিস্তব্ধ। ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হইল, তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন,—কৈ সে পদশব্দ আর শুনা যায় না।

পুনরায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পর পুনরায় বোধ হইল যেন পশ্চাতে কে অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল হইল। এই গভীর নিশীথে কে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে? সে শত্রু না মিত্র? শত্রু হইলে কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে? উদ্বেগ পরিপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন; পরে নিঃশব্দে তূলা-নির্ম্মিত কুর্ত্তির আস্তিনের ভিতর হইতে একটি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন, একটি পথের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইলেন; গভীর অন্ধকারের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন, কৈ কেহই নাই, সকলে সুপ্ত, নগর শব্দশূন্য ও নিস্তব্ধ!

সন্দিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ পুনরায় আলোকপূর্ণ বাজারে ফিরিয়া গেলেন; তথায় অনেক দোকান, নানাজাতীয় অনেক লোক এখনও ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার তথা হইতে সহসা এক গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন, পরে দ্রুতবেগে অন্যান্য গলির ভিতর দিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন! নিঃশব্দে অনেকক্ষণ শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। শব্দমাত্র নাই, চারিদিকে পথ, ঘাট, কুটীর, অট্টালিকা সমস্ত নিস্তব্ধ, নৈশ গগন গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার দ্বারা সমস্ত জগতকে আবৃত করিয়াছে! অনেকক্ষণ পর একটি চীৎকারশব্দ শ্রুত হইল; ব্রাহ্মণের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্ষণেক পর আবার সেই শব্দ হইল, মহাদেওজীর ভয় দূর হইল, সে নাগরিক প্রহরী পাহারা দিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মহাদেও যে গলিতে লুকায়িত ছিলেন সেই গলিতেই প্রহরী আসিল। গলি অতি সঙ্কীর্ণ, মহাদেও পুনরায় সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী ধীরে সেই স্থানে আসিল; এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে সেইস্থানে আসিল; মহাদেও যেস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন সেই দিকে চাহিল। উঃ মহাদেবের হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল, তিনি শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হস্তে সেই ছুরিকা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

.প্রহরী অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না; ধীরে সে পথ হইতে চলিয়া গেল। মহাদেও ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির হইয়া ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন।

পরে নিকটবর্ত্তী একটি দ্বারে আঘাত করিলেন; শায়েস্তাখাঁর এক জন মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক বাহির হইয়া আসিল, দুই জনে অতি সঙ্গোপনে নগরের মধ্যে অতি গোপনীয় ও মনুষ্যের অগম্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দুই জনে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন ' সমস্ত প্রস্তুত?'

সৈনিক। ' প্রস্তুত। '

ব্রাহ্মণ। ' অনুমতিপত্র পাইয়াছ ? '

সৈনিক। ' পাইয়াছি। '

আবার অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুত হইল। মহাদেওজী এবার ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ছুরিকাহস্তে সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন; অন্ধকারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না। ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে সৈনিককে বলিলেন 'রিক্তহস্তে আসিয়াছ ?'

সৈনিক বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইল। ব্রাহ্মণ বলিল ' ভাল। সতর্ক থাকিও। বিবাহ কবে ? '

সৈনিক। ' কল্য।'

ব্রাহ্মণ। ' অনুমতি পাইয়াছ ? '

সৈনিক। ' হাঁ ' একটি কাগজ দেখাইল।

ব্রাহ্মণ। ' কত জন লোকের ? '

সৈনিক। ' বাদ্যকর দশ জন, ও অস্ত্রধারী ত্রিশ জন ইহার অধিক অনুমতি পাইলাম না। '

ব্রাহ্মণ। 'এই যথেষ্ট, কোন সময়ে ?'

সৈনিক। ' রজনী এক প্রহর ! '

ব্রাহ্মণ। ' ভাল। এই দিক হইতে বরযাত্রা আরম্ভ হইবে। '

সৈনিক। ' স্মরণ আছে। '

ব্রাহ্মণ। ' বাদ্যকরেরা সজোরে বাদ্য করিবে। '

সৈনিক। ' স্মরণ আছে। '

ব্রাহ্মণ। ' জ্ঞাতি কুটুম্ব যত পারিবে জড় করিবে। '

সৈনিক। ' স্মরণ আছে। '

ব্রাহ্মণ তখন অল্প হাস্য করিয়া বলিলেন ' আমরাও শুভকার্য্যে যোগ দিব, সে শুভকার্য্যের ঘটা সমস্ত ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হইবে। '

সহসা একটি সজোরে নিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে লাগিল; সে তীরে প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের কুর্ত্তির নীচে লৌহ-বর্ম্মে লাগিয়া তীর খণ্ড খণ্ড হইল।

তৎপরেই একটি বর্শা। বর্শার ভীষণ আঘাতে ব্রাহ্মণ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম ভিন্ন হইল না, মহাদেও পুনরায় উঠিলেন। সম্মুখে দেখিলেন নিষ্কোষিত অসিহস্তে একজন দীর্ঘ মোগল যোদ্ধা,—তিনি চাঁদখাঁ।

অদ্য সভাতে সেনাপতি শায়েস্তাখাঁ চাঁদখাঁকে ভীরু বলিয়াছেন। যুদ্ধব্যবসায় চাঁদখাঁর কেশ শুক্ল হইয়াছিল, সম্মুখযুদ্ধ বিনা তিনি কখনও পলায়ন জানিতেন না, এ অপবাদ কখন কেহ তাঁহাকে দেয় নাই।

মনে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, অন্যকে তাহা কি জানাইবেন, মনে স্থির করিলেন কার্য্য দ্বারা এ অপবাদ দূর করিব, নচেৎ এই যুদ্ধেই এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ দান করিব।

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি শিবজীকে বিশেষ করিয়া জানিতেন, শিজবীর অসাধা-

রণ ক্ষমতা, তাঁহার বহুসংখ্যক দুর্গ, তাঁহার অপূর্ব্ব ও দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনা, তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা, হিন্দুরাজ্য স্থাপনে অভিলাষ, হিন্দুস্বাধীনতাসাধনে প্রতিজ্ঞা, এ সমস্ত চাঁদখাঁর নিকট অগোচর ছিল না। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ প্রারম্ভেই যে শিবজী পরাজয় স্বীকার ও সন্ধি যাচ্ঞা করিবেন এরূপ সম্ভব নহে, তথাপি এ ব্রাহ্মণ শিবজীর নিদর্শন পত্র দেখাইয়াছে। এ ব্রাহ্মণ কে? ইহার গুপ্ত অভিসন্ধিই বা কি?

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও চাঁদখাঁর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, মহারাষ্ট্রের নিন্দা শুনিয়া যখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হয় তাহাও তিনি দেখিয়াছিলেন। এ সমস্ত সন্দেহের কথা শায়েস্তাখাঁর নিকট বলেন নাই, সত্য বলিয়া কেন আবার তিরস্কার সহ্য করিবেন, কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন এই ভণ্ড দূতকে ধরিব। সেই অবধি দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, পথে পথে, গলিতে গলিতে অদৃশ্যভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও ব্রাহ্মণ চাঁদখাঁর নয়নবহির্ভূত হইতে পারেন নাই।

সৈনিকের সহিত ব্রাহ্মণের যে কথা হয় তাহা শুনিলেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা তখনই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দূতকে বিনাশ করিয়া সৈনিক সেনাপতিসদনে লইয়া যাইয়া প্রতিপত্তি লাভের সঙ্কল্প করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন 'শায়েস্তা খাঁ! যুদ্ধব্যবসায় বৃথা এ কেশ শুক্ল করি নাই, আমি ভীরুও নহি, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারীও নহি; অদ্য যে ষড়যন্ত্রটি ধরিয়া প্রকাশ করিয়া দিব তাহার পর বোধ হয় এ প্রাচীন দাসের কথা অবহেলা করিবে না।' কিন্তু আশা মায়াবিনী।

মহাদেওজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে চাঁদখাঁ তীর ও বর্ষা ব্যর্থ দেখিয়া লম্ফ দিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও খড়্গ দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন। আশ্চর্য্য বর্ম্মে লাগিয়া সে খড়্গ প্রতিহত হইল।

"কুক্ষণে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে" বলিয়া মহাদেওজী আপন আস্তীন গুটাইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন।

নিমেষমধ্যে বজ্রমুষ্টি চাঁদখাঁর বক্ষঃস্থলে অবতীর্ণ হইল,—চাঁদখাঁর মৃতদেহ ধরাতলশায়ী হইল।

ব্রাহ্মণ সূক্ষ্ম অধরোষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ধীরে ধীরে সেই ছুরিকা পুনরায় লুকাইয়া বলিলেন—

"শায়েস্তাখাঁ! মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা করার এই প্রথম ফল, ভবানীর কল্যাণে দ্বিতীয় ফল কল্য ফলিবে।"

শায়েস্তাখাঁ! অন্যায় তিরস্কারে অদ্য যে অমূল্য বীর রত্নটিকে হারাইলে, বিপদের সময় তাহাকে স্মরণ করিবে কিন্তু আর পাইবে না।

যোদ্ধার কর্ত্তব্যকার্য্যে যে সময়ে চাঁদ-খাঁ জীবন দান করিলেন, সেনাপতি শায়েস্তাখাঁ সে সময়ে বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, শিবজীকে বশীকরণ বিষয়ে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক এই সমস্ত ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া বলিল 'প্রভু কি করিলেন? কল্য এবিষয়ে গোল হইবে, আমাদের সমুদায় সঙ্কল্প বৃথা হইবে।'

ব্রাহ্মণ। 'কিছুমাত্র বৃথা হইবে না। আমি জানিয়াছি চাঁদখাঁ অদ্য সভায় অপমানিত হইয়াছেন, এখন কএক দিন সভায় না যাইলেও কেহ সন্দেহ করিবে না। এই মৃতদেহ ঐ গভীর কুপে নিক্ষেপ কর, আর স্মরণ রাখিও কল্য রজনী এক প্রহরকালে "—

সৈনিক। "রজনী এক প্রহরকালে।"

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনানগর ত্যাগ করিলেন। তিন চারি স্থানে প্রহরিগণ তাঁহাকে ধরিল, তিনি শায়েস্তাখাঁর স্বাক্ষরিত অনুমতি পত্র দেখাইলেন, ও নিরাপদে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজা যশোবন্ত সিংহ।

" কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পর পর সদা।"

মধুসূদন দত্ত।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় রাজপুত রাজা যশোবন্ত সিংহ একাকী শিবিরে বসিয়া রহিয়াছেন; হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া এই গভীর নিশীথেও কি চিন্তা করিতেছেন, সম্মুখে কেবল একটি মাত্র দীপ জ্বলিতেছে, শিবিরে অন্য লোক মাত্র নাই।

সংবাদ আসিল মহারাষ্ট্রীয় দূত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছেন। যশোবন্ত তাঁহাকে আনয়ন করিতে কহিলেন, তাঁহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী শিবিরে আসিলেন, যশোবন্ত তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলেন।

ক্ষণেক যশোবন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কি গভীর চিন্তা করিতেছিলেন। মহাদেও নিঃশব্দে রাজপুতের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতেছিলেন।

পরে যশোবন্ত বলিলেন 'আমি আপনার প্রভুর পত্র পাইয়াছি। তাহাতে যাহা লিখিত আছে অবগত হইয়াছি, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব আছে?

মহা। 'প্রভু আমাকে কোন প্রস্তাব করিতে পাঠান নাই, খেদ করিতে পাঠাইয়াছেন।'

যশো। 'কেবল পুনা ও চাকান দুর্গ আমাদের হস্তগত হইয়াছে মাত্র, এইজন্য খেদ?'

মহা। 'দুর্গনাশে তিনি ক্ষুব্ধ ন-হেন, তাঁহার অসংখ্য দুর্গ আছে।'

যশো। 'মোগল-যুদ্ধস্বরূপ বিপদে পড়িয়া তিনি খেদ করিতেছেন।'

মহা। 'বিপদে পড়িলে খেদ করা তাঁর অভ্যাস নাই।'

যশো। 'তবে কি জন্য খেদ ক-রিতেছেন ?'

মহা। 'যিনি হিন্দুরাজ-তিলক, যিনি ক্ষত্রিয়কুলাবতংশ, যিনি সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাকে অদ্য ম্লেচ্ছের দাস দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।'

যশোবন্তের মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হইল ; মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন ;—

'উদয়পুরের প্রতাপরাণার বংশে যিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাড়ওয়ারের রাজচ্ছত্র যাঁহার মস্তকের উপর ধৃত হই-য়াছে, রাজস্থান যাঁহার সুখ্যাতিতে পরি-পূর্ণ রহিয়াছে, সিপ্রাতীরে যাঁহার বাহু-বিক্রম দেখিয়া আরংজীব ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহাকে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ জ্ঞান করে, দেশে দেশে,গ্রামে গ্রামে, মন্দিরে মন্দিরে যাঁহার জয়ের জন্য হিন্দুমাত্রেই, ব্রাহ্মণ-মাত্রেই, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, অদ্য তাঁহাকে মুসলমানের পক্ষ হইয়া হি-ন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। রাজন্‌! আমি সামান্য দূতমাত্র, আমি কি বলিতেছি জানি না, অপরাধ হইলে মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু এ যুদ্ধসজ্জা কেন ? এ সৈন্যসামন্ত কেন ? এ সমস্ত বিজয়পতাকা কি জন্য উড্ডীন হইতেছে ? স্বাধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্য ? হিন্দু স্বাধীনতা স্থাপন করিবার জন্য ? ক্ষত্রোচিত যশোলাভের জন ? আপনি ক্ষত্রকুলর্ষভ ! আপনি বিবেচনা করুন ; আমি জানি না।'

যশোবন্ত অধোবদনে রহিলেন। মহা-দেও আরও বলিতে লাগিলেন—

'আপনি রাজপুত ! মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুত-পুত্র ; পিতা পুত্রে যুদ্ধ সম্ভবে না। আপনার সহিত প্রভুর যুদ্ধ সম্ভবে না ; স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধ নিষেধ করিয়া-ছেন। আপনি আজ্ঞা করুন আমরা পা-লন করিব। রাজপুতের গৌরবই অনাথ ভারতবর্ষের একমাত্র গৌরব। রাজপু-তের যশোগীত আমাদের রমণীগণ এখনও গাইয়া থাকে, রাজপুতদিগের উদাহরণ দেখিয়া আমাদের বালকগণ শিক্ষিত হয়, সে রাজপুতের সহিত যুদ্ধ ! ক্ষত্রকুলতি-লক ! রাজপুত-শোণিতে আমাদিগের খড়্গ রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বে যেন মহারাষ্ট্র নাম বিলুপ্ত হয়, রাজ্য বিলুপ্ত হয়, আমরা যেন বর্ষা ও খড়্গ ত্যাগ করিয়া পুনরায় লাঙ্গল ধারণ করিতে শিখি !'

যশোবন্ত সিংহ তখন নয়ন উঠাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন 'দূতপ্রধান ! তো-মার কথাগুলি বড় মিষ্ট, কিন্তু আমি দি-ল্লীশ্বরের অধীন, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ

করিব বলিয়া আসিয়াছি, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব—'

'এবং শত শত স্বধর্ম্মীকে নাশ করিবেন, হিন্দু হিন্দুর মস্তক ছেদন করিবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বক্ষে ছুরিকা বসাইবে, ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোতে ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোত মিশাইবে, শেষে ম্লেচ্ছ সম্রাটের সম্পূর্ণ জয় হইবে।' ঈষৎ ব্যঙ্গভাবে দূত এই কথা বলিলেন।

যশোবন্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্তু উদ্বেগ সম্বরণ করিয়া কিঞ্চিৎ কর্কশভাবে বলিলেন—

'কেবল দিল্লীশ্বরের জয়ের জন্য যুদ্ধ নহে;—আমি তোমার প্রভুর সহিত কিরূপে মিত্রতা করিব? শিবজী বিদ্রোহাচারী, চতুর শিবজী অদ্যের অঙ্গীকার অনায়াসে কল্য ভঙ্গ করে।'

এবার ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন 'মহারাজ! সাবধান, অলীক নিন্দা আপনার সাজে না। শিবজী কবে হিন্দুর নিকট যে বাক্য দান করিয়াছেন তাহার অন্যথা করিয়াছেন? কবে ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? দেশে শত শত গ্রাম, শত শত দেবালয় আছে; অনুসন্ধান করুন, শিবজী সত্য পালন করিতে, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিতে, হিন্দুর উপকার করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, হিন্দুদেবের পূজা দিতে কবে পরাঙ্মুখ? তবে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ! জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে কবে কোন্ দেশে সখ্যতা? বজ্রনখ যখন সর্পকে ধারণ করে সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া থাকে, মৃত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র জর্জ্জরিত-শরীর নাগরাজ সময় পাইয়া দংশন করে, এটি বিদ্রোহাচরণ নয়, এটি স্বভাবের রীতি। কুক্কুর যখন খরগোশকে ধরিবার চেষ্টা করে, খরগোশ প্রাণরক্ষার জন্য কত যত্ন করে, একদিকে পলাইবার উদ্যোগ করিয়া সহসা অন্যদিকে যায়, এটি চাতুরী না স্বভাবের রীতি? দেখুন, যাবতীয় জীব জন্তু দিগকে জগদীশ্বর যে প্রাণরক্ষার যত্ন ও উপায় শিখাইয়াছেন, মনুষ্যকে কি সে উপায় শিখান নাই? আমাদের প্রাণের প্রাণ,জীবনের জীবন স্বরূপ স্বাধীনতা যে মুসলমানেরা শত শত বৎসর অবধি শোষণ করিতেছে, হৃদয়ের শোণিত স্বরূপ বল, মান, দেশ-গৌরব, জাত্যভিমান শোষণ করিতেছে, ধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সখ্যতা ও সত্যসম্বন্ধ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি, স্বধর্ম্ম ও জাতি-গৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা, সে উপায় কি নিন্দনীয়? জীবনরক্ষার্থ পলায়ন-পটু মৃগের শীঘ্রগতি কি বিদ্রোহ? শাবককে বাঁচাইবার জন্য পক্ষী যে অপহারককে অন্যদিকে লইয়া যাইতে

যত্ন করে, সেটি কি নিন্দনীয়? ক্ষত্রিয়-রাজ! দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুসলমান-দিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয় চতুরতার নিন্দা শুনিতে পাই, কিন্তু হিন্দুপ্রবর! আপনি হিন্দুজীবন রক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা করিবেন না, শিবজীকে নিন্দা করিবেন না।' মহাদেওয়ের জ্বলন্ত নয়নদ্বয় জলে আবৃত হইল।

ব্রাহ্মণের চক্ষে জল দেখিয়া যশোবন্ত হৃদয়ে বেদনা পাইলেন। বলিলেন 'দূত-প্রবর! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি নাই, যদি অন্যায় বলিয়া থাকি মার্জ্জনা করিবেন। আমি কেবল এই মাত্র বলিতেছিলাম যে দেখুন রাজপুতগণও স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা সাহস ও সম্মুখ রণ ভিন্ন অন্য উপায় জানেন না। মহারাষ্ট্রীয়েরাও কি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে পারে না?'

মহা। 'মহারাজ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, দুর্গম পর্ব্বত বা মরুবেষ্টিত দেশ আছে, সুন্দর রাজধানী আছে, সহস্র বৎসরের অপূর্ব্ব রণশিক্ষা আছে, মহারাষ্ট্রীয়-দিগের ইহার কোন্‌টি আছে? তাহারা দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের এই প্রথম রণ-শিক্ষা। আপনাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আপনাদের পুরাতন রীত্যনুসারে যুদ্ধ দেন, পুরাতন দুর্দ্ধর্ষ তেজ ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্য রাজপুত সেনার সম্মুখে দিল্লীশ্বরের সেনা সরিয়া যায়। আমাদের দেশ আক্রমণ করিলে আমরা কি করিব? পূর্ব্বরীতি বা রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য সৈন্য নাই, যাহারা আছে তাহারা প্রত্যুত রণ দেখে নাই! যখন দিল্লীশ্বর কাবুল, পঞ্জাব, অযোধ্যা, বিহার, মালব, বীরপ্রসবিনী রাজস্থান ভূমি হইতে সহস্র সহস্র পুরাতন রণদর্শী যোদ্ধা প্রেরণ করেন, যখন অপরূপ বৃহৎ অনিবার্য্য রণ-অশ্ব ও রণ-গজ প্রেরণ করেন, যখন তাঁহার কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলা, রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা, সহস্র সহস্র শকটে আনিয়া রাশীকৃত করেন, তখন দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিবে? তাহাদিগের সেরূপ অসংখ্য যুদ্ধদর্শী সেনা নাই, সেরূপ অশ্ব গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ নাই, চতুরতা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? ত্বরিত-গতি ও পর্ব্বত-যুদ্ধ ভিন্ন তাহাদের আর কি উপায় আছে? ক্ষত্রিয়রাজ! জীবন-প্রারম্ভে দরিদ্রজাতির এইরূপ আচরণ ভিন্ন উপায় নাই। জগদীশ্বর করুন মহারাষ্ট্রীয় জাতি দীর্ঘজীবী হউক, তাহাদিগের অর্থ ও যুদ্ধায়োজনের উপায় সংস্থান হইলে, দুই তিনশত বৎসরের রণশিক্ষা হইলে, তাহারাও রাজপুতের অসাধারণ গুণ অনুকরণ করিবে।'

এই সমস্ত কথা শুনিয়া যশোবন্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিলেন, হস্তে ললাট স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাদেও দেখিলেন তাঁহার

বাক্যগুলি নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই,আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

'আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, হিন্দুগৌরবসাধনে সন্দেহ করিতেছেন কেন ? হিন্দুধর্ম্মের জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন, শিবজীরও ইহা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা নাই। মুসলমান শাসন ধ্বংস করণ, হিন্দুজাতির গৌরব সাধন, স্থানে স্থানে দেবালয় স্থাপন, সনাতন ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধি, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান, গোবৎসাদি রক্ষা করণ, ইহা ভিন্ন শিবজীর অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই বিষয়ে যদি তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হয়েন তবে স্বহস্তে এই কার্য্য সাধন করুন। আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন, মুসলমানদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করুন। আদেশ করুন দুর্গের দ্বার এইক্ষণেই উদঘাটিত হইবে, প্রজারা আপনাকে কর দিবে, আপনি শিবজী অপেক্ষা সহস্রগুণে বলবান্, সহস্রগুণ দূরদর্শী,সহস্রগুণ উপযুক্ত,শিবজী সন্তুষ্টচিত্তে আপনার একজন সেনাপতি হইয়া মুসলমানদিগের ধ্বংস সাধন করিবেন। তাঁহার অন্য বাসনা নাই।'

এই প্রস্তাবে উচ্চাভিলাষী যশোবন্তের নয়ন যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন 'মাড়য়ার ও মহারাষ্ট্র অনেক দূর, এক রাজার অধীন থাকিতে পারে না।'

মহাদেও। 'তবে আপনার উপযুক্ত পুত্র থাকিলে তাঁহাকে এই রাজ্য দিন, নচেৎ কোন আত্মীয় যোদ্ধাকে দিন। শিবজী ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে কার্য্য করিবেন, কিন্তু কদাচ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবেন না।'

যশোবন্ত আবার চিন্তা করিয়া বলিলেন—'এই বিপদকালে, আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া এদেশ রাখিতে পারিবে এমন আত্মীয় নাই।'

মহাদেও। 'কোন ক্ষত্রিয় সেনাপতিকে নিযুক্ত করুন, হিন্দুধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা হইলে শিবজীর মনস্কামনা পূর্ণ হইবে; শিবজী সানন্দচিত্তে রাজ্যপরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন।'

যশো। 'সেরূপ সেনাপতিও নাই।'

মহা। 'তবে যিনি এই মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন তাঁহাকে সাহায্য করুন। আপনার সাহায্যে, আপনার আশীর্ব্বাদে, শিবজী অবশ্যই স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের গৌরব সাধন করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয়রাজ! ক্ষত্রযোদ্ধাকে সহায়তা করুন,ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, আকাশে এরূপ দেবতা নাই যিনি আপনাকে এজন্য প্রশংসাবাদ না করিবেন।'

যশোবন্ত ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'দ্বিজবর, তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু দিল্লীশ্বর আমাকে স্নেহ করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি কিরূপে অন্যরূপ আচরণ করিব? সে কি অদ্রোহোচিত?

মহা। ‘ দিল্লীশ্বর যে হিন্দুদিগের কাফের বলিয়া জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছেন সে কার্য্য কি ভদ্রোচিত? দেশে দেশে যে হিন্দুপূজক, হিন্দুমন্দির, হিন্দুদেবালয়ের অবমাননা করিতেছেন সে কি ভদ্রোচিত? কাশীর পুরাতন মন্দির চূর্ণ করিয়া সেই প্রস্তর দ্বারা সেই পুণ্যধামে মসজীদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সে কি ভদ্রোচিত?’

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশোবন্ত বলিলেন—‘দ্বিজবর! দ্বিজবর! আর বলিবেন না, যথেষ্ট বলিয়াছেন। অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র। রাজপুতের প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হয় না, অদ্যাবধি শিবজীর পণ ও আমার পণ এক, শিবজীর চেষ্টা ও আমার চেষ্টা অভিন্ন। সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে এত দিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন সে মহাত্মা কোথায়? একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করি।’

মহারাষ্ট্রীয় দূত ঈষৎ হাস্য করিয়া যশোবন্তের কর্ণের নিকট মুখ লইয়া যাইয়া একটি কথা কহিলেন। শুনিবা মাত্র যশোবন্ত একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন, চকিতের ন্যায় ক্ষণেক নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন, বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে দূতের দিকে দেখিতে লাগিলেন, পরে সানন্দে ও সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে গোপনে, অতি মৃদুস্বরে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর মহাদেও বলিলেন ‘মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া কল্য কোন ছলে পুনা হইতে কএক ক্রোশ দূরে থাকিলে ভাল হয়।’

যশো। ‘কেন? কল্য পুনা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে?’

দূত। হাস্য করিয়া বলিল ‘না, একটি বিবাহ কার্য্য সম্পাদন হইবে, মহারাজ থাকিলে শুভকার্য্যে ব্যাঘাত হইতে পারে।’

যশোবন্ত বুঝিয়া বলিলেন ‘ভাল, দূরেই থাকিব।’ দূত বিদায় যাজ্ঞা করিলেন। যশোবন্ত ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন—

‘ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয়ের বোধ হয় অনেক দিন পাঠ সমাপন হইয়া থাকিবে; এক্ষণে স্মরণ আছে কি না?’

মহা। তথাপি যে বিদ্যা আছে তাহাতে দিল্লীর সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ বিস্মিত হইয়াছেন।’

যশোবন্ত দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইলেন, পরে বিদায়ের সময় বলিলেন ‘তবে যুদ্ধ বিষয়ে যেরূপ কথোপকথন হইল সেইরূপ কার্য্য করিবেন।’

মহা। ‘সেইরূপ কার্য্য করিবার জন্য প্রভু শিবজীকে বলিব।’

যশো। ‘হাঁ বিস্মরণ হইয়াছিলাম, সেই রূপ কার্য্য করিতে তোমার প্রভুকে

বলিও।' হাসিতে হাসিতে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

যশোবন্তের এক জন বিশ্বস্ত অমাত্য অল্পক্ষণ পরে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'আপনার শিবির হইতে এই মাত্র এক জন অশ্বারোহী সিংহগড় প্রমুখে যাইলেন, উনি কে?'

যশোবন্ত উত্তর করিলেন, 'উনি হিন্দুজাতির আশাস্বরূপ, হিন্দুধর্ম্মের প্রহরী।'

(প্রাপ্ত)

ভারতের প্রজানীতি।

ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে উদীচ্য ভাষা সমূহে যে সকল সংবাদ পত্র, পুস্তক ও পত্রিকাদি মুদ্রিত হয় বা হইবে, তাহার সুশাসন জন্য সংপ্রতি রাজপুরুষগণ যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা লইয়া ভারতের সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। ব্যবস্থার সম্ভাবিত কার্য্যকারিতা এখনও পরিচারিত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রবর্ত্তনাতেই আশঙ্কার তরঙ্গাভিঘাত আরব্ধ হইয়াছে; ইহার প্রকৃতি ও পরিণাম বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনোযোগ বিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা এই নিমিত্ত মনন করিয়াছি, এই উপলক্ষে আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সমালোচন করিয়া, বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থার সূত্রগত বিচার করিব।

রাজার গৌরব রাজার ভাষায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; রাজার শরীর অলংঘ্য এবং পবিত্র; সুতরাং রাজভাষাও নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থাতেও এই সূত্রের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে; ইংরেজরাজ বলিয়া দিয়াছেন, যে ইংরেজীতে যে ব্যক্তি মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ, তাহার অভিপ্রায়গত সাধুতার, তাহার নীতিগত সুশিক্ষার এবং তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিসঙ্গত বিজ্ঞতার অন্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। সে যে কথা বলে, তাহাতে ভ্রান্তি থাকিলেও সে ভাল মন্দ বিচার করিয়া বলিয়াছে, ইহা বুঝা যায়; যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলে, সেও সে কথার ভাল মন্দ বিচার করিয়া লইতে জানে। সেই জন্য ইংরেজীতে ভ্রম মার্জ্জনীয়, কারণ সংশোধনের সম্ভাবনা আছে।

এই নিয়মের ফলে, ১৫ মার্চ্চের পরে দেশীয় ভাষায় যে সকল পত্রাদি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে রাজনীতি বা রাজব্যবস্থা সম্বন্ধে আর সে পূর্ব্বের মত বাক্যের পরিস্ফুটতা নাই। কিন্তু নিপীড়িত ক্রোধের কম্পে, ক্ষোভের দীর্ঘনিশ্বাসে, শঙ্কার সঙ্কোচে, দ্বিগুণিত অন্তর্দাহের প্র-

মাণ সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। মুদ্রণ-স্বাধীনতার লোপ হইল বলিয়া মুদ্রিতাক্ষরে ভারতীয় লেখক যাহা প্রকাশ করিতেছেন না, ভারতবাসীর সভায়, ভারতবাসীর প্রমোদ-মন্দিরে, যানে, পাদচারে, আলাপে, প্রলাপে, হাস্যে পরিহাসে, সেই অসন্তোষ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া বিচরণ করিতেছে। কাগজের কথা এখন মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ফলে, এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই সমস্তই ভারতবাসীর একতম সম্প্রদায় নিবদ্ধ। সাম্প্রদায়িকদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়, তাহা আমরা জানি; পাশ্চাত্য শিক্ষায় যাঁহাদের হৃদয়-বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, যাঁহাদের চিত্তবলের বিকাশ হইয়াছে, জন্মভূমি ও মাতৃভাষার নামে যাঁহাদের অন্তঃকরণ তরঙ্গায়িত হয়, তাঁহাদের অনেকেই এ সম্প্রদায় ভুক্ত, তাহাও আমরা জানি। তথাপি সবিনয়ে, অথচ নিঃসঙ্কোচে আমরা বলিতেছি, যে এই দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আমরা বিশেষ বা সামান্য কোন প্রকার গৌরবের বিষয় বিবেচনা করি না। আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব, তাহার জন্য স্পষ্টাক্ষরে একথা ব্যক্ত করিয়া রাখা আবশ্যক।

যাঁহারা এই সম্প্রদায়ের অধিনায়ক, তাঁহারা ভারতবর্ষের দুঃখে নিরন্তর ব্যথিত। ভারতবর্ষে বিজাতীয়, বিদেশীয় রাজা আধিপত্য করিতেছে, ভারতবর্ষের রাজস্বে বিদেশীয় দেহ পুষ্ট হইতেছে, ভারতবর্ষে বিজাতির রীতি নীতি, ভারতবাসীর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া অথবা ইচ্ছায় বিরুদ্ধে প্রবর্ত্তিত হইতেছে,—এই ইহাঁদের দুঃখ। স্থূল কথা, ভারতবর্ষ স্বাধীন নহে,—তাহাতেই ইহাঁদের অসন্তোষ। এ অসন্তোষের অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করে না; যে ব্যবস্থার উপলক্ষে আমরা এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছি, তাহার উপস্থাপন সময়ে মন্ত্রণাবিশারদ ব্যবস্থাপকবর্গ এই অসন্তোষের উপরেই ব্যবস্থার ভিত্তি পত্তন করা হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং এই অসন্তোষের বিস্তার অনিষ্টকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই অসন্তোষ ন্যায় ও যুক্তিমূলক কি না, এই স্বাধীনতাস্পৃহা অনুমোদনীয় কি না, প্রথমতঃ তাহারই বিচার করা আবশ্যক।

স্বাধীনতা ও স্বৈরাচারে অল্পই প্রভেদ। মনুষ্যের নিকট যাহার জবাবদিহি করিতে হয় না, এইরূপ দায়শূন্য নবাবও যদি নিজের অর্থের সার্থকতা করিতেছি মনে করিয়া অতি সুখাদ্য সামগ্রী বা অত্যুপাদেয় পানীয়ে অমিত আসক্তি দ্বারা স্বীয় স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত করেন, তাঁহাকেও আমরা দোষ দিয়া থাকি; কারণ, তিনি স্বৈরাচার-পরায়ণ। অথচ এই দোষ দেওয়াতে, এই নিন্দা করাতে আমাদের যে অনধিকার চর্চ্চা করা হয়, তাহা নহে। সমাজভুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই সমাজের নিকট নীতিমূলক দায়ে আবদ্ধ, সেই জন্যই আ-

মরা নবাবের নিন্দাবাদ করি ; তাঁহার বুভুক্ষা বা পিপাসার শান্তি করণ বিষয়ে তাঁহার স্বাধীনতা থাকিলেও সেই স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ বা অতি প্রয়োগে আমরা আমাদের সেই নিন্দা করিবার ক্ষমতার পরিচালন করি ; সাধ্য থাকিলে সেরূপ স্থলে শাসন করিতেও ত্রুটি করিতাম না, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার শরীর লইয়া আত্মতৃপ্তি সাধন বিষয়ে এত বাধা ;—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহাতে কাহারই ক্ষতি হয় না ও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, তথাপি সমাজনীতির এই আক্রোশ। এমত অবস্থায় রাজনৈতিক সমাজের বন্ধন যে ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর হইবে, তাহা বিচিত্র কি ?

রাজনৈতিক সমাজের মূলসূত্র,—অধীনতা। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারের কিয়দংশ করিয়া রাজার হস্তে ন্যস্ত করাতেই রাজনৈতিক সমাজের স্থিতি। কিন্তু সেই অংশের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। ক্ষেত্র বুঝিয়া, সময় বুঝিয়া ইহা তাবৎ কালের নিমিত্ত নিরূপিত হইয়া থাকে। এই অধীনতাই আমাদের মঙ্গলের কারণ ; এই রাজা প্রজা সম্বন্ধের উপরে সামাজিক উন্নতির নির্ভর। সভ্য সমাজের প্রজাগণ শারীরিক ও বৈষয়িক সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিয়া, কাব্য, সঙ্গীত এবং চিত্রবিদ্যাদির আলোচনায় যে অন্তর্জগতের উন্নতি ও স্বাস্থ্যসাধনের অবসর পাইয়া থাকে, এই স্বাধীনতাই তাহার মূল্য স্বরূপ। সুতরাং সমাজে যাহাকে স্বাধীনতা বলি, তাহা স্বেচ্ছাচার হইতে বিভিন্ন ; বস্তুতঃ তাহা অধীনতারই এক প্রকার ফল। কেবল নিয়ম ও নিয়মকর্ত্তা কথঞ্চিৎ স্বাধীন ; তদ্ভিন্ন সকলেই সেই নিয়মের এবং যাহার হস্তে সেই নিয়ম বলবৎ করিবার ভার দেওয়া হয়, তাহার অধীন। ইউরোপ ও ইউরোপের মন্ত্রদীক্ষিত আমেরিকা এই সকল তত্ত্বের আদর ও গৌরব বুঝিয়াছে, শাসনের সুখ সেখানে জানে ; সেখানে প্রজায় যাহা কিছু করে, সেই শাসনের উৎকর্ষ চেষ্টাতেই তাহা করে, সুতরাং তত্তৎ দেশে সভ্যতা, বিদ্যা এবং ধনশালিতার বিস্ময়কর বৃদ্ধি।

ভারতবর্ষের অবস্থা অন্যরূপ। ভারতবর্ষ কোন্ কালে এক সাম্রাজ্যছিল, ইতিহাসেরও তাহা মনে নাই। এখনকার ভারতবর্ষ দেখিয়া যাহা মনে হয়, তাহাতে মস্তক ঘুরিয়া যায়।—একাদশ কোটি হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা ; তদুপরি বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, রামজী, হনুমানজী আছেন ; বিংশতি কোটি লোকের বিংশতি প্রকার ভাষা, শতাধিক প্রকার পরিচ্ছদ। শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়, বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে বঙ্গবাসী, বোম্বাই বাসীর সঙ্গে কোলাকুলি দূরে থাকুক, বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করে নাই ; এখনও যোজনান্তরে স্বাধীন রাজা, আর ইহাঁদের মধ্যে কেহই আধুনিক নহেন, সূর্য্য বা চন্দ্রের সাক্ষাৎ বংশধর। এতদ্ভিন্ন আর্য্য,

অনার্য্য, ম্লেচ্ছ, যবন, মারহাট্টা, বর্গী—কে নয়? আমাদের সমাজনীতির শিক্ষক; যাহার যে ভাবে ইচ্ছা আমাদিগকে পশুত্ব শিখাইয়া গিয়াছে। তথাপি স্বাধীনতাবাদীরা বলিবেন—ভারতবর্ষ একবর্ষ!

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ছিল না, এখনও নাই; অথচ এ স্বাধীনতার বিনিময়ে ইউরোপ প্রভৃতির তুলনায় আমরা কিছুই পাই নাই। ইহার উত্তম কারণ আছে।—প্রথমতঃ, আমরা স্বাধীনতাই হারাইয়াছি, কিন্তু কোন প্রণালীর অনুরোধে কাহাকেও তাহা অর্পণ করি নাই, স্পষ্টতঃ বা ভাবতঃ আমরা কখনই কোন চুক্তিতে পক্ষভুক্ত হই নাই। দ্বিতীয়তঃ, বহুযুগ ধরিয়া আমাদের উপকারের জন্য কেহ আমাদের রাজা হয় নাই, স্বার্থসাধনের জন্য কেহ দস্যুভাবে আসিয়া দস্যুর মত চলিয়া গিয়াছে, কেহ বা অতিলোভপরবশ হইয়া রহিয়া গিয়াছে। আত্মাতিরিক্ত উদ্দেশ্য কাহারই ছিল না। আমরা কে, ভারতবর্ষ কি, ইহা বুঝিনা বলিয়াই এত গণ্ডগোল।

যাঁহারা একান্ত জন্মভূমিভক্ত; যাঁহারা শুদ্ধ ভারত-নামামৃত শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করিয়া অন্নাভাব জনিত জঠরজ্বালা-বিস্মৃত হইতে পারেন; স্বদেশ বলিলেই, হিমালয় হইতে কুমারিকা ও পঞ্চনদ হইতে চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত এই বিশাল ক্ষেত্র যাঁহাদের মনোনয়নের উপরে প্রতিফলিত হয়; বেদ বলিলেই একেশ্বরবাদ, নিরীশ্বরবাদ, নির্ব্বাণমুক্তি, ষষ্ঠী মাখালের পূজা ও সত্য পীরের সির্ণী যাঁহাদের অন্তরের অন্তস্তলে উদিত হয়; পুরাণের নামে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণাকৌশল হইতে বিপিন কৃষ্ণের গগণ-মার্গ-বিদারিণী বক্তৃতা ও কুরুক্ষেত্র হইতে পাবনার প্রজাদের দাঙ্গার ধারাবাহিকতা দেখিতে পান,—তাঁহারাও একথা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আর্য্যোপনিবেশ এই ভারতভূমি রাজসূয় ও অশ্বমেধ সত্ত্বেও চির দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত, যে এই খণ্ডরাজ্যমালা বিভিন্ন সময়ে বিবিধ ধর্ম্মবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত; তাঁহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য যে রাজনীতিসম্বন্ধে সমগ্র ভারতবর্ষ কস্মিন্ কালেও একতন্ত্রাধীন হয় নাই, যে দরবেশ বা সেকেন্দরের আক্রমণে বিন্ধ্যাচল বা রাজমহলের উপলমালা বিকম্পিত হয় নাই, দক্ষিণে বা পূর্ব্বে ভারত ভরিয়া কেহ অশ্রুপাত করে নাই। এই অনার্য্য ভারতভূমি যবনের সংস্পর্শদূষিত হইবার পরে একবার একটুকু একীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু যে কারণেই হউক, তাহা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। ভারতের সমন্বয় "ভবিষ্যতের উদর-কন্দরে নিহিত।"

ভারতের বেদ, ভারতের দর্শন, ভারতের কাব্য, ভারতের গণিত এক কালে,—

"খুঁজিত সকলে, পুজিত সকলে
ফিনিক, সিরীয়, যুনানী মণ্ডলে।"

একথা সত্য ; কবির এ সকল কথা বলিবার অধিকার আছে ; অতি দূরসম্পর্কেও কৃতিত্ব দেখাইয়া মানবচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করা যায়, আভিজাত্যগৌরব কোন প্রকারে উদ্দীপ্ত করিতে পারিলে মনুষ্যকে উন্নীত করিতে পারাযায়। কিন্তু রাজনীতির কঠোর অঙ্কে উপস্থাপিত করিবার যোগ্য কথা এ সকল নহে। ধর্ম্ম বা বিদ্যার আলোচনায় ভারতবর্ষের এক ব্যক্তি বা এক প্রদেশ চরমসীমা দেখাইয়া থাকিলে, আহ্লাদের কথা, এবং সেই মূলে স্বজাতীয়তা স্থাপন করিতে পারিলে মঙ্গলের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে শাসনতন্ত্র-গত একজাতিত্ব সপ্রমাণ হয় না। এসিয়া খণ্ডে যীশুখ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন, এবং স্বকীয় ধর্ম্মনীতির প্রচার করেন, ইহাও আমাদের পরিতুষ্টি-জনক সংবাদ, কিন্তু তাই বলিয়া জেরুসালেম এবং পঞ্চনদের রাজনৈতিক উত্থানপতনের একীকরণ উপপন্ন হইবে না। সমগ্র পৃথিবী মনুষ্যের আবাসক্ষেত্র, অতএব এক এবং অভিন্ন ; যতদিন এই পরমবৈরাগ্য অবলম্বন করিতে না পারিবে, ততদিন প্রাচীন ভারতের একতার কথা মনে করিয়া অদ্য দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার অধিকার তোমার নাই। ভারতে রাজতন্ত্রবিষয়ে আর্য্য, পারসীক, গ্রীক, মোগল, পাঠান, ফরাশী, ইংরেজ সকলই তুল্য।

সাত শত বৎসর ভারত পরাধীন বলিয়া আজি আমরা দুঃখ করিতেছি ; কিন্তু মুসলমানের যখন প্রথম অভ্যুদয়, তখন ভারতের প্রাণ কাঁদে নাই, ভারতের বণিক্ ও কৃষক কবোষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে নাই। তাহার পর, যখন ক্রমে ক্রমে ইংরেজের প্রতাপ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল, তখনও ভারতবর্ষ তদবস্থ। অদ্য এই ইংরেজের রাজ্যে সাঁওতাল, গারো, কুকির যে অবস্থা, ইংরেজ যখন প্রথম রাজ্য-বিস্তার আরম্ভ করিল, তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের রাজনৈতিক অবস্থায় যে বিশেষ প্রভেদ ছিল, এরূপ বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, বিশ্বাস করা উচিতও নহে।

ইংরেজ বণিগ্বৃত্তি, ইংরেজ ধূর্ত্ত, ইংরেজ প্রবঞ্চক, ইংরেজ—তাহাকে যাহা বলিবে, তাহাই। কিন্তু সে কথায় আমাদের ইষ্টাপত্তি কি ? গজনবী মামুদের বা ঘোরীর মত না আসিয়া ইংরেজ বণিগ্বেশে এদেশে আসিয়াছিল, তাহাতে আমাদেরই লাভ ;—অন্যথা রক্তস্রোত প্রবলতর বহিত মাত্র। তথাপি স্বকৃতনামা স্বদেশ-বৎসলদের মনে রাখা উচিত যে, ভাব গ্রহণ করিয়া ইতিহাসপাঠে ইহাই বুঝা যায় যে ইংরেজ রাজ্যাভিলাষে প্রথমতঃ এদেশে আইসে নাই। সময়ের তাড়নায় অবস্থার তাড়নায় তাহাদিগকে রাজত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আর ইংরেজেরা এখন যাহার অধিকারী তাহার অধিকাংশই ছলে বা বলে লব্ধ হয় নাই, ইহাও মনে রাখা আবশ্যক।

ফলতঃ যেরূপেই ইংরেজের রাজ্যলাভ ঘটিয়া থাকুক, কি নিয়মে সে রাজ্য পরিচালিত হইতেছে; তাহা দেখা কর্ত্তব্য। নিয়মের পরীক্ষা, ফলে;—উদ্দেশ্যের পরিচয়, কার্য্যে। যাহার চক্ষু আছে, সেই দেখিতে পারে যে ইংরেজের রাজ্যে অসভ্যতার পরিবর্ত্তে সভ্যতা, মূর্খতার পরিবর্ত্তে জ্ঞান,দারিদ্র্যের পরিবর্ত্তে ধনবিস্তার, উপদ্রবের পরিবর্ত্তে শান্তি, অন্ধকারের পরিবর্ত্তে আলোক স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন, নির্ভীকচিত্তে, নিঃসঙ্কোচে, ট্যাঁকে টাকা গুঁজিয়া, ছাতা মাথায়, জুতা পায়, চাষা গ্রামের জমিদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে যায়; একশত ব্যক্তি এক শত বার সুবিচার পাইয়াছে দেখিয়া বিচারককে ধর্ম্মাবতার বলে, ধর্ম্মাবতার মনে করে। এখন, যে গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-পত্র নাই, সে গ্রামকে আমরা ধিক্কার করি; বাঙ্গালা ভাষায় জর্ম্মণীয় পণ্ডিতের বিদ্যা পরীক্ষা করি; এখন, রুস তুরস্কে যুদ্ধ হইলে ইউরোপের কোন্ রাজার কি পন্থা অনুশরণীয় আমরা তাহার নির্দ্ধারণ করি; সূর্য্যমণ্ডলের কলঙ্কে শস্য সম্ভাবনার বিচার করি; এখন, গলায় কম্ফর্টার, পায়ে মোজা না থাকিলে আমাদের সর্দ্দী হয়; ভদ্রলোক আমাদের বাটীতে আসিয়া আমাদিগকে অনাবৃত দেখিলে, আমরা উলঙ্গ মনে করিয়া লজ্জিত হই; এখন, কাগজে লিখিয়া রাজরাজেশ্বরকে অপদস্থ করি; বক্তৃতা করিয়া জগৎ উম্মাদিত করিয়া তুলি। অধিক কি, কএক বৎসর মাত্র ইংলণ্ডীয় গুরুর পদপ্রান্তে জ্ঞান চর্চ্চা করিয়া, গুরুকে বিদ্যায় পরাভব করিতে পারি না বলিয়া, গাত্রজ্বালায় জলে ডুবিয়া মরিতে যাই!—জিজ্ঞাসা করি,এই সমস্ত কাহার প্রসাদাৎ? তোমার ভারতের ইতিহাসের কোন্ স্থলে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া এইরূপ আর একটি চিত্র তুমি দেখাইতে পার?

তথাপি আমরা স্বাধীন হইব! আমাদের অপেক্ষাও মূর্খ ভারতবাসীকে এহেন রাজারও বিদ্রোহিতা করিতে উপদেশ দিব! রাজদ্রোহিতা শিখাও তাহাতে তত দুঃখ নাই, কিন্তু তুমি যে এখনও বালক, এখনও শিক্ষানবীশ। এ গুরু মহাশয় হয়ত মরিতে পারেন,কিংবা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে পারেন, কিন্তু কর্ত্তা যে এখনও জীবিত। আগে সংসারের ভার গ্রহণ কর, গৃহস্থ হও, তখন গুরু মহাশয়কে পেন্সন দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা থাকে দিবে; না দাও, তিনি চলিয়া যাইবেন। এখন উতলা হইও না।

উপরে যাহা বলা গেল, একবার তাহার ফল স্থির করা যাউক। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষ কখনও এক সাম্রাজ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ নাই। ইংরেজ যে সূত্র অবলম্বন করিয়া রাজ্য করিতেছেন, তাহাতে ভারতের একতা সম্পাদন সম্ভবপর; একতা সংসাধিত হইলে মঙ্গলের আশা করা

যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের রাজত্বে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিলক্ষণ রূপে হইতেছে। এখনও ভারতবর্ষে যে সকল স্বাধীন উপরাজ্য আছে, সেখানকার প্রজাদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বিশেষরূপে ইহা উপলব্ধ হইবে। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এক্ষণ যেরূপ প্রসার, পূর্ব্বে এমন ছিল না। চতুর্থতঃ, রাজনীতি সম্পর্কে আমরা এখনও বালক; আমাদের রাজনৈতিক পুষ্টিসাধন আবশ্যক এবং ইংরেজের দ্বারা তাহা সাধিত হইতেছে। সুতরাং ইংরেজের অধীনতা আমাদের বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার প্রধান উপকরণ গুরুভক্তি। গুরুর প্রতি ভক্তি না থাকিলে,তাঁহার উপদেশে শ্রদ্ধা না থাকিলে, তাঁহার কথায় আস্থা না থাকিলে, বিদ্যালাভের কিংবা জ্ঞানোপার্জ্জনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। রাজনীতিতে ইংরেজ সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাদের গুরু; অতএব তিনি যখন বলেন যে ভারতবর্ষের উপকারের নিমিত্তই তিনি প্রয়াসী,তখন সে কথার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিলেও তোমার বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। যে সূত্রে ইংরেজ ভারতের রাজতন্ত্র পরিচালন করিতেছেন, তাহার আমূলপ্রান্ত ধারণা করিবার শক্তি ভারতবাসীর এখনও হয় নাই। তথাপি গুরুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইংরেজ করিতেছেন,— যে মন্ত্রে যখন ভারতবাসীকে দীক্ষিত করেন, তাহার উদ্দেশ্য, তাহার পরিণাম, তাহার উপকারিতা এবং তাহার প্রয়োগার্হতা বুঝাইবার যত্ন করিয়া থাকেন; এবং বুঝিতে না পারিলে জিজ্ঞাসু হইতে পারিবে বলিয়া ইংরেজ ভারতবাসীকে বচনস্বাধীনতা প্রদান করিতেছেন। অসঙ্কোচে যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর, যেখানে তোমার সন্দেহ হয় ভঞ্জন করিতে বল, সন্তুষ্টচিত্তে ইংরেজ তাহা শুনিতেছেন, শুনিবেন। কিন্তু অভক্তি প্রদর্শন করিলে কেন তিনি বিরক্ত হইবেন না? ধৃষ্টতা দেখাইলে কেন তোমার কথায় কর্ণপাত করিবেন? তুমি যে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পাও,ইহা ইংরেজের দয়ার গুণে; তুমি যে দয়ার পাত্র, তুমি যে অনুগৃহীত হইলে যথোচিত আচরণ করিতে জান, তাহা কেন দেখাইবে না? আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে ইংরেজরাজকে,—

"মহতী দেবতা হ্যেসা নররূপেণ তিষ্ঠতি" মনে করিয়া এবং এই শাস্ত্র-বচন সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আচরণ করাই আমাদের উচিত, আমাদের আবশ্যক, আমাদের পরম ধর্ম্ম।

অতএব, ইংরেজ যখন আমাদের গুরুস্থানীয়, ভারতবর্ষে ইংরেজের স্থায়িত্ব যখন সর্ব্বথা আমাদের কাম্য, তখন যাহাতে আমাদের ভক্তিভাব অবিচলিত থাকিতে পারে, আমাদের প্রেমভাব দিন দিন প্রবলতর হয়, আমাদের মাধুর্য্যমিশ্রিত মমতার ভাব ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হ-

ইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বথা আমাদের যত্নশীল হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। সকল লোকের বিদ্যাবুদ্ধি কখনই সমান হইতে পারেনা; সেই জন্য সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল বলিয়া যাহারা পরিচিত সেই উপরিতন দশের কথায় নিম্নতর স্তরের ব্যক্তিবৃন্দ বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়া কার্য্য করে। সুতরাং যাহাতে রাজপুরুষবর্গের সাধু এবং অকৃত্রিম সারল্যপূর্ণ অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দেহ আরোপিত হয়, তাহা করা সেই দশের পক্ষে মহাপাপ, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি এবং অনিষ্টের সম্ভাবনা।

আমরা গুণবাদী নহি; সকল বস্তুর সুন্দর অংশই বাছিয়া দেখি, তাহা নহে। যাঁহারা আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধীয় উপরি ন্যস্ত কথা গুলিতে গুণবাদিতার লক্ষণ দেখিবেন, তাঁহাদিগকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, অপ্রিয় হইলেও অনেক সময়ে সত্য কথা বলা আবশ্যক, এবং—

"হিতং মনোহারিচ সুদুর্ল্লভং বচঃ।"

তথাপি আমরা স্বীকার করি যে, কল্পিতই হউক বা বাস্তবই হউক যে সকল দুঃখের কাহিনী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আজি কালি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সমুদয়ই ঈর্ষা, দাম্ভিকতা বা অসদভিসন্ধিবিজৃম্ভিত নহে। কিন্তু অজ্ঞতার পরিচয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেদীপ্যমান, ইহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের দুঃখের গীত যাঁহারা গাহিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের মনের ভাব এইরূপ যে তাঁহারা ইংলণ্ডের প্রজাবর্গ এবং ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ সমতার অভাবে পক্ষপাতিতার প্রমাণ দেখিতে পান, এবং তাহা ন্যায়ানুমোদিত নহে বিবেচনা করিয়া অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহার ফলে রাজভক্তির যে কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা ইহঁাদের খেদের কারণ বুঝিতে পারি না। ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত, ভিন্নরুচিসম্পন্ন, ভিন্ন-সভ্যতা-প্রবর্দ্ধিত রাজা ভারতবর্ষের নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা সংস্থাপন করেন, তাহার অধিকাংশই পরীক্ষোদ্দিষ্ট; ইংরেজ স্বদেশে যাহার গুণবত্তা দেখিয়াছেন, যাহার উপকার বুঝিতেছেন, স্বভাবতঃই এদেশে সেই নিয়মের বা সেই কার্য্যের ফলবত্তা দেখিতে বাঞ্ছা করেন; কিন্তু তাহার উপযোগিতার বিষয়ে যে আদৌ তাঁহারা সন্দিহান হইবেন ইহাও স্বভাবসিদ্ধ। সেই জন্য প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থা নিত্য পরীক্ষা করিয়া সময়ে সময়ে তাহার সঙ্কুচন বা সম্প্রসারণ করিতে বাধ্য হন। আমরা ইংলণ্ডের ইতিহাস, ইংলণ্ডের সাহিত্য, ইংলণ্ডের সমাজনীতিতে লালিত এবং পালিত; ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা জানি না বলিলেও চলে। ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের সহিত আমাদের যে সহানুভূতি, তাহাও সেই বিজাতীয়শিক্ষা-

প্রণোদিত। সুতরাং উভয় দেশের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্যের প্রতি সমুচিত দৃষ্টি না রাখিয়া সহসা রাজনৈতিক বৈষম্যে বিরক্তি প্রকাশ করি; ইংলণ্ডে যাহা ভাল, এখানেও তাহাই ভাল, এই এক ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা রাজকীয় কার্য্যকলাপের সমালোচনা করি। গতিকেই আমাদের অসন্তোষ। ইতঃপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এখানে তাহা প্রতিপন্ন হইল; আমাদের অজ্ঞতার জাজ্বল্যমান উদাহরণ এই স্থলে পাওয়া গেল। ইংলণ্ডের প্রজা যে কথায় জাতস্বত্ব বলিয়া আস্ফালন করে, যাহার সঙ্কোচ দেখিলে বা আশঙ্কা করিলে খড়্গহস্ত হইয়া উঠে, সেই কথাতে আমাদের তদ্রূপ উল্লেখ বা উক্তি নিতান্ত হাস্যজনক এবং নিতান্ত উপেক্ষণীয়, ইহা অনেকেই বুঝেন না। তবে এই সকল পরীক্ষোদ্দিষ্ট স্থলে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিবার আবশ্যকতা আছে; শান্তভাবে ভক্তিপূর্ণ বাক্যে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলা উচিত। ইংরেজ আমাদিগকে এরূপ স্থলে বলিবার অধিকার দিয়াছেন; সে অধিকারে এখনও হস্তক্ষেপ করা হয় নাই; কখনও হইবে বলিয়াও বোধ হয় না।

অন্য এক সম্প্রদায়ের দুঃখকারী, নিয়ম এবং যাহার উপর সেই নিয়মের প্রয়োগ পরীক্ষার ভার আছে, সেই ব্যক্তির প্রভেদ করেন না বা করিতে জানেন না। কর্ত্তৃ মাজিষ্ট্রেট এবং ফৌজদারি আইন ইহাঁরা এক এবং অভিন্ন বিবেচনা করেন। যে লর্ড লিটন, ফুলার ব্যাপারের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার মুদ্রণ আইন উপলক্ষে তথাবিধ বক্তৃতা করিতে পারেন, ইহাঁও তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। ফলতঃ এই সম্প্রদায়ের লোককে বুঝাইবার প্রয়োজনও নাই; ক্ষেত্রভেদে প্রয়োগ-ভেদ, এবং ফল-ভেদ হয়, আপনা আপনি যে ইহা দেখিতে পায় না, সে অন্ধ; তাহার পক্ষে আলোকেও অন্ধকারে প্রভেদ নাই। তথাপি একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক; অযুত কর্ম্মচারী লইয়া এই সাম্রাজ্য চালাইতে হয়; সুতরাং ক্বচিৎ কুত্র ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমপ্রমাদ হইবে, ইহা কেবল যে সম্ভব তাহা নহে, প্রত্যুত গৌরবেরই বিষয়; এবং এই সকল ভ্রমপ্রমাদের শাসন বা সংশোধনে আত্যন্তিক কঠোরতা প্রদর্শন না করিয়া যে, অপেক্ষাকৃত সদয়াচরণ দেখান হইয়া থাকে, ইহা উচ্চতর রাজপুরুষবর্গের বিজ্ঞতা এবং মহানুভাবতারই পরিচায়ক। রাজ্যরক্ষা শিশুর ক্রীড়া নহে। যে সকল ব্যক্তি উল্লিখিত দোষ প্রদর্শন করেন, তাঁহারা যদি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া দোষের গুরুত্বানুসারিণী কথা বলেন, রাজপুরুষবর্গ কখনই সে কথায় অবজ্ঞা করিবেন না।

অতএব স্থূলতঃ দেখিতে গেলে স্বাধীনতাবাদীদের কথা যে প্রকার অসার এবং অগ্রাহ্য, যাহারা ইংরেজাস্থিত, এবং যাঁহারা সূত্রগত ও ব্যক্তিগত কার্য্যের প্রভেদনির্ব্বাচনে অক্ষম, তাহাদের কথাও

সেইরূপ অযৌক্তিক। কিন্তু ইহাদের অসন্তোষ এই অবধি ক্ষান্ত হইলেই ক্ষতি ছিল না। ফলতঃ তাহা না হইয়া ইহাতে প্রকৃত বিপদের আশঙ্কা আছে।

ইউরোপে, মধ্য এসিয়াতে, এবং ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমায় এইক্ষণে সত্য সত্যই রাজ-নীতি-সঙ্কট উপস্থিত। ভারতবাসী রাজনীতির কথায় এখনও নিতান্ত শিশু, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং এখন কোন কথা কহিতে হইলে দ্বিগুণ সাবধানতার প্রয়োজন। তদ্বিপরীতে আমাদের অসত্য বা অসম্যক্ তত্ত্ববার্ত্তা এবং অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া আজি কালিকার বিষম সমস্যা পূরণ করিতে গিয়া, আমরা যদি হঠকারিতার পরিচয় দেই, যদি ইংরেজরাজের অধার্ম্মিকতা, ভীরুতা, দুর্ব্বলতা, স্বার্থপরতা, শোষকতা, রাজপুরুষগণের পক্ষপাতিতা, অত্যাচারপরতা; আর সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন কল্পিত গৌরবকথার প্রলাপবচনে প্রজাবর্গকে উত্তেজিত, ভক্তিশূন্য, এবং বিপ্লবপ্রিয় করিবার জন্য ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক পন্থা প্রদর্শন করি, তবে ইংরেজের হস্তক্ষেপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আজি কালি যখন চিরদিনাপেক্ষা অধিকতর রূপে শান্তির প্রয়োজন, তখন অঙ্কুরেই উপদ্রবের বিনাশসাধন, ইংরেজের একান্তই উচিত। না করিলে রাজধর্ম্মের অপলাপ হইবে, আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে।

তিন শ্রেণীর লেখককে লক্ষ্য করিয়া মুদ্রণ-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম, যাহারা স্পষ্টতঃ, বা পাকতঃ ইংরেজরাজকে অত্যাচারপরায়ণ, শোষক, পক্ষপাতকলুষিত, ভীম ইত্যাদি বিশেষণ দিয়া অপদস্থ এবং সম্মানচ্যুত করিতে যত্ন করে; দ্বিতীয়, যাহারা ইংরেজ ও ভারতবাসী হিন্দু ও খৃষ্টানকে পরস্পরের প্রতি জাতিবৈরের পন্থা প্রদর্শন করে, একজন বা দশজন দুরাচারের ব্যবহার দেখাইয়া সমগ্র জাতির নিন্দাবাদ করে, এবং ব্যক্তিবিশেষের কথা তুলিয়া শেষে কুলে কালি দিতে যায়; তৃতীয়, যাহারা অনুগ্রহ-লব্ধ এই মহাস্ত্র পাইয়া, তাহার অপপ্রয়োগ করিয়া স্বার্থসাধনের জন্য ভয়প্রদর্শন বা উৎপীড়ন করে। এই নীচবৃত্তি, লঘুচেতা, কাপুরুষ লেখকদিগের উল্লেখ করিলেই, ইহাদের জঘন্যতার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়। বাস্তবিক ইহারা সমাজের কণ্টক, মনুষ্যনামের গ্লানি মাত্র। ফলতঃ উপরে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাতে এই তিন শ্রেণীর লোকেরই যে দমন হওয়া আবশ্যক, বোধ করি সমদর্শী ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছি। ব্যবস্থার সম্পাদন যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, তাহার কোনও অংশে দোষ নাই, অভাব নাই, বা বাহুল্য নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে ইহার সূত্র লইয়া বিবাদ করিবার অধিকার নাই, গণ্ডগোল করা অ-

ন্যায়, একথা আমরা বার বার বলি। যাঁহারা ভারতবর্ষের হিতকামনার ছলে আত্মবিনাশ সাধন করিতে বসিয়াছেন,প্রজাবৃন্দের গলে ছুরিকা বসাইতে উদ্যত, তাঁহারা শঙ্কিত হউন, সাবধান হউন ;—যাঁহাদের লেখনী গরলপ্রসবিনী, ভারতবর্ষের শিরায় শিরায় যাঁহারা বিষ ঢালিতেছেন, তাঁহারা শঙ্কিত হউন, সাবধান হউন ;—যাঁহারা রৌদ্র-তপ্ত অথচ লঘুতৃণসদৃশ ভারতবাসীর চিত্তে অগ্নিসংযোগ করিতে ব্যগ্র, ভারতবর্ষ ছার খার করিতে উপস্থিত, তাঁহারা শঙ্কিত হউন, সাবধান হউন। অন্য কাহারও শঙ্কার কারণ নাই, ক্রোধের কারণ নাই, দুঃখের কারণ নাই, এবং স্বকীয় কুসুমকোমল সুখশয্যার কুসুমকোমল ক্রোড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া বৃথা ভাবনায় শুষ্ক হইবার কারণ নাই।

(উকীল)

আগ্রা

আগ্রার যাহা কিছু মাহাত্ম্য, এই সময় হইতেই তাহার সূত্রপাত হয়। এই সময় হইতেই ইহার উন্মেষিত যৌবন-গন্ধ নানা রাজ্য হইতে ভ্রমরনিবহ স্বরূপ বিবিধ প্রকারের লোককে ঝাঁকে ঝাঁকে অন্ধ করিয়া আনিতে থাকে। কত আমির, কত ওমরা, কত সাহেব, কত পাদরী, কত ফকীর, কত সন্ন্যাসী, কত পণ্ডিত এবং কত ছদ্মবেশী এই সময় হইতেই ইহার লক্ষ্মীপ্রদ পাংশু রাশিতে মস্তক অলঙ্কৃত করিয়া ঘাটে, পথে, মাঠে, আলয়ে ও গলিতে গলিতে ঘটিকাস্থ দোলক যন্ত্রের ন্যায় ইহার সর্ব্বত্র বিদুলিত হইতে থাকে। এই সময় হইতেই ইহার ভূত-বিলীন অধিবাসীরা প্রতি রাত্রে সুরণা, নফীর ও নাকৃকারার মৃদুল মধুর অভিঘাতে নিদ্রিত হইয়া. বিশাল দামামা ও করতালের সঘনগভীর গর্জ্জনে প্রভাতে জাগরিত হইতে থাকে। এই দিন হইতেই আগ্রা কিয়ৎকালের জন্য প্রাসাদ-মুকুট-শ্রেণীস্থ সুবর্ণ কলসে ঝলসিয়া সমস্ত পৃথিবীতে বিস্ময়োৎপাদন করে ; এবং এই সেই দিন, যে দিন হইতে ইহা দূর দূরস্থ চক্রবর্ত্তীদিগের নিকটে সুপরিচিত হইয়া মোগলশরীরে ভারতের ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব বিস্তার করিতে থাকে। এখন যাহা কবিদিগের কল্পনা স্বপ্নেও চিত্র করিতে পরাস্ত হয়, কিছু দিন পূর্ব্বে তাহাই সত্য ঘটনারূপে ইহার বক্ষঃসরোবরে ভাসমান ছিল। ইহার রেণুপরিণত অট্টালিকামালার গবাক্ষপংক্তি চতুর্দ্দিকে প্রায় দিবা রাত্র মোগল সুন্দরীদিগের মুখপদ্মে চিত্রিত থাকিত। সেকালে কিছু দিনের জন্য সমস্ত ভারতের বিদ্যাবুদ্ধি এই খানেই সমবেত

ভাবে সমাসীন ছিল। এই বিদ্যা এবং এই বুদ্ধির কণিকা মাত্র কর্ষণে কি সংস্পর্শনে লোকে তখন আজিকার মতই গর্ব্বিত হইত, অন্য বুদ্ধি কি বিদ্যা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট হইলেও লোকে তখন এ বিদ্যার নিকটে তাহাকে উৎকৃষ্ট দেখিত না। মাতৃভাষার যে আসন, তাহা প্রায়লোকেরই রসনাবেদিতে আজিকার ন্যায় সঙ্কীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখানকার রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, বেশ ও ভূষাদির তরঙ্গমালা ভারতের ঘরে ঘরে ব্যাপ্ত হইয়া এক সময় হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিল। এখানেও কোন সময় মোগলমস্তিষ্কের প্রতিভা হইতে নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ধর্ম্মসংহিতা রচিত হইয়াছিল, প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছিল, প্রচারিত হইয়াছিল এবং শিষ্যোপশিষ্যাদি দ্বারা ধরাতল বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। “আল্লাহু আকবর” এই দ্ব্যর্থ বাচক ধ্বনি কোন সময় লোকের মুখগহ্বরে দৈনিক সম্ভাষাতে এখানেই প্রথমে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। দেবতা হইয়া লোকের ভক্তিমঞ্চে আসীন হইবার আশা এক সময়ে এখানকার সিংহাসন হইতেই লতাকারে উত্থিত হইয়া আকাশ বেষ্টন করিতে চাহিয়াছিল। আজিকার লোকেরা যেমন আজিকার স্থান বিশেষে আজিকার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছে, কোন সময়ে কোন সময়ের লোকেরাও সেইরূপ এই স্থানবিশেষের শিল্পাদি দেখিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিয়াছিল। আজি যেমন নগরবিশেষে সমস্তই সাহেবানা, কোন সময়ে এখানেও সমস্তই মোগলানা ছিল। এই দিনে যেমন লোকেরা, সমুদয় বাগান, ভিটি ও বসতির বাটী বিক্রয় করিয়া সমুদ্র সন্তরণান্তর দ্বীপবিশেষে যাইয়া যে ফল লাভ করে, সেই দিনেও লোকেরা সেইরূপ সর্ব্বস্বান্ত পণ করিয়া একবার গঙ্গা ও যমুনা বাহিয়া এখানে আসিতে পারিলে সেই ফল লাভ করিত। পাঠকবর্গকে আর অনর্থক ভাষার ব্যাপকতা দ্বারা উত্ত্যক্ত না করিয়া সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, কোন সময় সমস্ত ভারতের সুখ দুঃখ বিতরণের ভাঁড়ার কিয়ৎকালের জন্য এইখানেই সংস্থাপিত ছিল। কোন সময় ইহার এক খানি ইষ্টকখণ্ড এক দিবসে যে ব্যাপার দর্শন করিয়াছে, আজি তাহা এক ব্যক্তি এক মাস বসিয়া লিখিয়া শেষ করিতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব আমি আমার অসহায় অবস্থায় ইহার প্রাচীন এবং নবীন অবস্থা সম্বন্ধে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা ক্রমে পাঠকবর্গের নিকটে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

প্রাকৃতিক অবস্থা।

আগ্রা হিমালয়ের প্রসারিত পাদপত্রের ক্রমনিম্ন ভূমির উপরে সংস্থাপিত এবং সমুদ্রবক্ষঃ হইতে ৫৫০ ফুট উচ্চ। বাঙ্গলা দেশ সমুদ্রের বক্ষঃস্থল হইতে

যত খানি উচ্চ, তাহা ইহা হইতে বিয়োগ করিলেই পাঠকবর্গ অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে, বঙ্গের নগরাদির সহিত তুলনা করিলে উচ্চতায় এস্থান একটি অনতিবৃহৎ পর্ব্বতপৃষ্ঠ সদৃশ। সিকিম-শৈল-শ্রেণীর পাদদেশে নিম্ন আসাম প্রভৃতি স্থান এখান হইতে ২৫০ ফুট নিম্ন, এবং সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থান ৪০৫ ফুট; হাতের পরিমাণে ২৭০ হাত নীচে। কলিকাতা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান যে আরো-কত নীচে, তাহা ইহা হইতেই অনায়াসে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সাধারণো এই বিশ্বাস যে, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, হিমালয়ের পদতলস্থ একটি সামান্য সমতল উচ্চ ভূমি মাত্র। আমাদেরও পূর্ব্বে এই বিশ্বাসই ছিল; কিন্তু এখন জানা যাইতেছে যে, ইহার উত্তরপশ্চিমে যমুনা এবং শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তি ক্ষেত্র এখান হইতে আরও ৩৬৬⅔ হাত উচ্চ। অতএব ইহা হইতে এই দেখা যায় যে, হিমালয় যেন সপরিবারে ভারতের মস্তকে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া বঙ্গাভিমুখে পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া আছে, এবং তাহার পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে নখ-রেখা সদৃশ বঙ্গভূমি সমুদ্রতটে অবস্থান করিতেছে।

আগ্রাবিভাগে ইটাওয়া, মইনপুরী, ফরক্কাবাদ, এটা এবং মথুরা এই কয়টি প্রদেশ আছে। ইটাওয়া আগ্রা হইতে লৌহবর্ত্মে ৭৩ মাইল ব্যবধানে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে রেলপথে আগ্রা আসিবার কালে ইটাওয়া ষ্টেশনের মধ্যদিয়া উত্তরপশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইতে হয়। ইটাওয়ার সহর, ইটাওয়ার রেল ষ্টেশন হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে থাকে। সহর হইতে আবার যমুনা, প্রায় মাইল দুই দক্ষিণ দিয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। এস্থান আগ্রাবিভাগের মধ্যে স্বাস্থ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। অনেক কঙ্কালাবশিষ্ট বাঙ্গালি বাবুরা দেশের জল বায়ুর উৎপাতে উৎপীড়িত হইয়া শরীর সংস্কারের জন্য অনেক সময় এস্থানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। গ্রীষ্মকালে আগ্রা যত গরম হয়, এস্থান তত হয় না; এবং ইহার বায়ুতে আগ্রা অপেক্ষা স্নিগ্ধতা কিঞ্চিৎ অধিক আছে বলিয়াই ইহার সহবাস অনেকের মনোরম্য। ইহাতে স্নিগ্ধতা থাকিবার বোধ হয় আর কোন কারণ নাই; কেবল এই কারণ যে, ইহার উত্তর পার্শ্বেই মইনপুরী প্রদেশ। এই মইনপুরী প্রদেশের দেশের মধ্যদিয়া অনেকগুলা ক্লশাঙ্গী নদী পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহার গাত্রের অন্যান্য ভাগ কতকগুলা ঝিল ও হ্রদে, খচিত আছে। মইন্‌পুরী আগ্রা হইতে রাজবর্ত্মে প্রায় ৭০। ৮০ মাইল পূর্ব্বদিকে। ইটাওয়া হইতেও যাইবার পথ আছে, লৌহবর্ত্ম নাই। এস্থান আমাদের কাছে এক বিষয়ে এ-কান্ত মনোহর। এখান হইতে আমরা কখন কখন ঝিলজাত মাগুর ও শিঙ্গীমৎস্য পাইয়া থাকি। যদিও তাহা আয়তনে

স্বাদে জন্মভূমির মৎস্য হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট, তথাপি অবয়বের সাদৃশ্য আছে বলিয়া উহার অভাবাংশ সকল আহার সময়ে কল্পনাসাহায্যে পূরণ করিয়া লই। দেশীয় মৎস্য অনেক দিন হইল দেখি না, এই বলিয়াই উহাতে আমাদের এত আদর। মইন্‌পুরীর পূর্ব্বোত্তর ফরক্কাবাদ। এই প্রদেশ গঙ্গা নদীর উত্তর তটে বিস্তৃত। ফরক্কাবাদের সহর গঙ্গার তট হইতে প্রায় ৩। ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আগ্রা হইতে রাজবর্ত্মে প্রায় ১০০ মাইলেরও অধিক দূর ব্যবধানে। ইহার সহিত আমাদের এক রাজস্ব ব্যতীত আর কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই। ফরক্কাবাদের পর এটা। এটা আগ্রা হইতে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বোত্তর এবং রাজবর্ত্মের প্রায় ৫০ মাইল হইতেও অধিক দূরে। এক রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ভিন্ন এস্থানের সহিতও আমাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার পর মথুরা। মথুরার সহর আগ্রা হইতে পশ্চিমোত্তরে রাজবর্ত্মের প্রায় ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার সহিত তীর্থ সম্বন্ধে আমাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিছু দিন পূর্ব্বে যাত্রীরা আগ্রা হইয়া উটের গাড়ীতে ইহাকে দর্শন করিয়া যাইত এবং পথে দস্যুকর্ত্তৃক সর্ব্বস্বাপহৃত হইয়া অনেক সময় অশ্রুমুখে পদব্রজে মথুরা ও বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইত। আজি কালি লৌহবর্ত্ম হওয়াতে লোকেরা সে উৎপাত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাইয়াছে। ইংরেজদিগের শাসিত রাজ্যে এত দস্যুভয় কিরূপে সম্ভবে, ইহা ভাবিয়া পাঠকবর্গ বোধহয় কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যের কোন কারণ নাই। মথুরার রাজবর্ত্মের কিয়দংশ ভরতপুরের এলাকা মধ্যে পড়িয়াছে। দস্যুরা সর্ব্বদাই এই সন্ধিস্থানে থাকিয়া আপন আপন অভীষ্ট সাধন করে। যদি রাজার শাসন উৎকৃষ্ট হইত, তাহা হইলে এরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এদেশীয়দের নিতান্ত দুরদৃষ্টবশতঃই তাহা না হওয়াতে যাত্রীদিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হয়। আজি কালি যাত্রীদিগকে আর এ ভাবনা ভাবিতে হয় না। এখন যেমন আগ্রা না আসিয়া বরাবর কলিকাতা হইতে বাষ্পীয় শকটে হোট্রাস্‌ ষ্টেশন দিয়া স্বতন্ত্র লৌহবর্ত্মে এককালে মথুরায় যাইয়া উপস্থিত হওয়া যায়, সেরূপ আবার আগ্রা হইয়াও রাজপুতনার বাষ্পীয় শকটে স্বতন্ত্র শাখা লৌহবর্ত্মে মথুরায় যাওয়া যায়। মথুরা কখন কখন কুটুম্ব হস্তে আমাদিগকে পেরা ও খুর্‌চুঙ্গ্‌রূপ মিষ্টান্ন যোগাইয়া থাকে। খুরচুঙ্গ্‌ চিনিতে পাক করা দুগ্ধের চাঁচি। আর মথুরার পেরা এইজন্য প্রসিদ্ধ যে, ইহা যুগান্তেও নষ্ট হয় না এবং ছুড়িয়া ফেলিলে দস্যুর মস্তকও ভগ্ন করা যায়। প্রবাদ আছে যে, মথুরাবাসী চৌবে ব্রাহ্মণেরা ইহার ৬। ৭ সের অনায়াসে আহার করিয়া উঠে।

আগ্রাবিভাগের দক্ষিণ সীমা ধৌল পুর, গোয়ালিয়র এবং জ্বালাউন্। পূর্ব্ব-সীমা কানপুর এবং অযোধ্যা বিভাগের অন্তর্ব্বর্ত্তী হরদোই প্রদেশ। উত্তর সীমা সাজিহানপুর, বদাওন, আলিগড় এবং পঞ্জাবের অধীনস্থ গুড়গাঁও। পশ্চিম সীমাতে রাজপুতনার অন্তর্গত ভরতপুর।

আগ্রা যমুনার পশ্চিমতটে অবস্থিত। যমুনা হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া ইহার উত্তরপশ্চিম দিয়া আসিয়া নগরের পাদদেশ ধৌত করিয়া ব্যালগতিতে পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। ইহার গতি এক এক স্থানে এত বক্র হইয়া গিয়াছে যে, সেই বক্রের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে আসিতে কোথাও বা ২০ মাইল, কোথাও বা ১২ মাইল এবং কোথাও বা ৬ মাইল পথ ঘুরিয়া আসিতে হয়। প্রভাতে একস্থান হইতে নৌকা খুলিয়া আসিয়া, সন্ধ্যার সময় নৌকা লাগাইয়া দেখ যে, সেই স্থানেরই অপরদিকে মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। এই কারণেই বোধ হয়, আমাদের দেশীয় লোকদিগের নৌকাপথে আসিতে এত বিলম্ব হইত। যমুনা আমাদের একমাত্র জলাশ্রয়। ইহারই আশ্রয়ে আমরা দারুণ নিদাঘের পশ্চিমোত্তরীয় আগ্নেয়বাতে জীবন ধারণ করিয়া থাকি ; ভস্ম হইয়া যাই না। জন্মভূমির সাগর-নিভা তটিনী সকলের ভ্রুকুটি আমরা ইহারই কৃশাঙ্গোপরিস্থ মন্দ মন্দ বীচিলহরী দেখিয়া অনেক সময় এককালে বিস্মৃত হইয়া যাই। ইহার তটদ্বয় বিলক্ষণ উচ্চ এবং স্থানে স্থানে গ্রামসীমাস্থিত শ্যামল বৃক্ষাদি দ্বারা ভূষিত হওয়াতে দূর হইতে যেন মনোহর কেলিশৈলশ্রেণীর ন্যায় দেখায়। তটস্থিত ভূমি উভয় পার্শ্বেই ভিতরের দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দূর দূরস্থ উচ্চভূমি সকল হইতে আনীত বর্ষাকালীয় জলপ্রবাহ সকলের দ্বারা এরূপ গভীর ভাবে বন্ধুর হইয়া গিয়াছে এবং নানাদিক হইতে আগত সেই সকল পয়ঃপথের পরস্পর সঙ্গম দ্বারা এরূপ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার প্রতিরূপ মানচিত্রে দেখিলে, যেন তাহা যমুনার শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট তনুরুহরাজীর ন্যায় বোধ হয়। এক এক স্থানের পয়ঃপ্রণালী এত গভীর ও দীর্ঘ যে, তাহাতে দুই তিন সহস্র সৈন্য অনায়াসে লুক্কায়িত হইয়া থাকিতে পারে। নানাদিক হইতে নানা পয়ঃপথ আসিয়া নানাভাবে মিলিত হওয়াতে ইহাদের গতি এত বিভিন্নপথগামিনী হইয়াছে যে, কোন অপরিচিত ব্যক্তি ইহার মধ্যে নামিলে সহজে বাহির হইতে পারে না। অনেক সময় পথ না পাইয়া ঘুড়িতে থাকে। এদেশের প্রায় নদীর তটই এইরূপ রেভাইন্ জাল (Ravines) দ্বারা বন্ধুরীকৃত হইয়া আছে, বৃষ্টি হইবামাত্রই এই সকল পথ আশ্রয় করিয়া তটভূমিস্থ সমস্ত গ্রাম ও নগরাদির জল বেগে আসিয়া-যমুনা গর্ভে পতিত হইয়া থাকে।

ক্ষণকালও ভূমির উপরে তিষ্ঠিতে পারে না। বৃষ্টির পরমুহূর্ত্তেই ভূমি শুষ্ক হইয়া উঠে, এই গতিকেই দেশ বর্ষাকালেও অতিশয় শুষ্ক থাকে। সহরের মধ্য দিয়া অনেক গভীর গভীর পয়ঃপথ যাইয়া এরূপে যমুনাতে পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে যখন ইহাদের মধ্যদিয়া জল চলিতে থাকে, তখন জলের এত বেগ হয় যে, প্রতিবৎসরেই শুনা যায়,দুই চারি জন যুবা ও বালক ইহার জলবেগে ক্রীড়া করিতে গিয়া যমুনাতে পতিত হইয়া মৃত হইয়াছে। যমুনার জল খাইতে অতিশয় মধুর। অনেকে সংস্কারবশতঃ অগুণ করে বলিয়া ইহার গর্ভের জল খায় না। ইহার তটস্থিত কূপোদকই প্রায় সাধারণ্যে ব্যবহৃত। বর্ষাকালে ইহার বক্ষঃ অপেক্ষাকৃত অনেক বিস্তৃত হয়। জল অত্যন্ত আবিল হয়, এবং অতিশয় বেগবান্ হয়। কোন কোন বর্ষে উভয় তট প্লাবিত হইয়া ইহার তীরস্থিত পথ ও গৃহপ্রাঙ্গণ সকলে পর্য্যন্ত জল প্রবেশ করে। শীতকালে ও গ্রীষ্ম ঋতুতে ইহা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ইহার প্রায় সমস্ত বক্ষেই শুষ্ক ও শুক্লবর্ণ পুলিন সকল জাগিয়া উঠে। কোন কোন স্থানে হাঁটু জল হইতেও অনেক কম জল থাকে, কোন স্থানে মানুষ পর্য্যন্তও তল হয়। ইহাতে বিস্তর কচ্ছপ আছে; স্নান করিবার সময় দুই হাতে ঠেলিয়া স্নান করিতে হয়। এত কচ্ছপ যে প্রথমতঃ নামিতে অতিশয় ভয় বোধ হয়, কিন্তু লোকের সঙ্গে ইহাদের এইরূপ ভ্রাতৃভাব জন্মিয়াছে যে, ইহারা কাহারও কিছু অনিষ্ট করে না। ইহার কোন কোন অংশে কুম্ভীরও আছে। কিছু দিন হইল এখানে বিডল্ মিউজিয়ম্ নামে যে একটি মিউজিয়ম ছিল, তাহাতে আমি একটি বৃহৎ কুম্ভীরের কঙ্কাল দেখিয়াছিলাম। সেটি নাকি লোকে এই যমুনার মধ্যেই মারিয়াছিল। তাহার উদরের মধ্যে মনুষ্যের শরীরের যে সকল অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও তাহার শরীর-কঙ্কালের সঙ্গে এক পার্শ্বে আবদ্ধ ছিল। বর্ষাকালে ইহাতে শুশুকদিগকেও উল্লম্ফন করিতে দেখা যায়।

যমুনা ছাড়া আগ্রার প্রায় ৮। ১০ মাইল দক্ষিণ দিয়া খাড়ি নদী নামে নালার আকৃতি অতিকৃশাঙ্গী অপর একটি নদী পশ্চিমে ভরতপুরের এলাকা হইতে আসিয়া পূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী হইয়া সহরের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে গিয়া এরাদত্ নগরের নামাতে বৌন্ অথবা উতুন্ঘুন্ নামে আর একটি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

বৌন্ নদীও ভরতপুর অঞ্চল হইতে আসিয়া আগ্রার আরও বহুদূর দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গোইতা, পার্ব্বতী ও পূর্ব্বোক্ত খাড়ি প্রভৃতি অতিক্ষীণা পয়ঃপ্রণালীসদৃশী নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া সিকোহাবাদ নামক রেলওয়ে ষ্টেশনের বহুদূর দক্ষিণে যমুনাতে যাইয়া পতিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধা চর্ম্মণ্বতী অথবা চম্বলও আমাদের অপর এক জলৈশ্বর্য্য। যদিও ইহাকে সম্পূর্ণরূপে আমাদের বলিয়া বলিতে আমরা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হই,তথাপি ইহা আমাদের বিভাগের দক্ষিণ সীমার আংশিক পরিখা এবং ইহার মৎস্য-সম্পত্তি আমাঁদেরই বাবুরচিখানার বিভব। চম্বল ধৌলপুরের মধ্যদিয়া আসিয়া আগ্রার প্রায় ১২। ১৩ ক্রোশ দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইটাওয়া ষ্টেশনের বহুদূর পূর্ব্বদক্ষিণে যমুনাতে মিলিত হইয়াছে। ইহা আকৃতি এবং প্রকৃতিতে প্রায় যমুনার সদৃশ।

ইহা ছাড়া সহরের প্রায় ৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে অপর একটি আংশিক আর্দ্র পয়ঃপ্রণালী উত্তর দিক হইতে আসিয়া যমুনার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। জল-সম্পত্তি নাই বলিয়া আহ্লাদে ইহাকেও আমরা নদী বলিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন আমাদের বিভাগে মইনপুরী ও ইটাওয়ার মধ্যে শির্ষা, সিন্দুর, পীরা, আহমি, উরুন্দ, কুলুন্দ্রী, কালী, ইসুন এবং পাণ্ডু প্রভৃতি নদীনামধারিণী কতকগুলা সোঁতা নালা চারিদিক হইতে যাইয়া যমুনা ও গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। যদিও ইহারা অনেকে বর্ষার মেঘাপগমে ভানুমুখ দেখিয়া শুষ্কতাপ্রাপ্তে পাংশুবুক হইয়া উঠে, তবু গ্রাম্য স্কুলের উপস্থিতিপুস্তকের ছাত্রসংখ্যার ন্যায় ইহারা আমাদের বিভাগের মানচিত্রে নদী সংখ্যা পুরণ করিয়া থাকে, এবং আমরাও ভীষণ লু-বায়ুর দাহসময়ে ইহাদের শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মসিচিত্র দেখিয়া আশ্বস্ত হই। এখানেই যে আমাদের জলবিভব ক্ষান্ত হইল, পাঠকবর্গ কখন এরূপ মনে করিবেন না। ইহা ছাড়াও আমাদের বিভাগে ঝিল ও হ্রদ নামধারী খানা, ডোবা ও গর্ত্ত এদিকে ওদিকে ছড়ান আছে, এবং প্রকৃত ঝিল ও হ্রদও আছে। এই বিরুক্ষ দগ্ধবক্ষ মহামরু রাজস্থানের পার্শ্বে থাকিয়া আমরা কিরূপে এত সোতা, নালা, খানা, ডোবা, হ্রদ এবং ঝিলের অধিপতি হইলাম? যে রাজস্থানের অন্তর্গত বিকানোর প্রদেশে প্রবাদ আছে যে, খৃষ্টীয় ১৮৬৯ সনে টাকাতে চারি সের জল বিক্রয় হইয়াছিল এবং যাহার অধিবাসীদিগের মধ্যে কেহ একবার আগ্রাতে আসিয়া যমুনার প্রবাহ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিল যে,"আরে! ইকেইসা, তমাম্ জল বহ্ চলা কোই ইসে বাঁধ নেহি রাখ্তা!" ঈদৃশ অঞ্চলের ধারে কাছে এত জলস্থলীর বিদ্যমানতা কিরূপে সম্ভবে? পাঠকবর্গ এবিষয় আন্দোলন করিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইতে পারেন। আমরাও মানচিত্র দেখিয়া প্রথমে তাহাই হইয়াছিলাম। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন দ্বারাই সেটি আমাদের মন হইতে দূর হইয়াছে। আমাদের পদতলেই যমুনা এবং যমুনার আর এক পার্শ্বেই খানিক দূর দিয়া গঙ্গা বহিতেছে। মইনপুরী,ইটোওয়া, ফরক্কাবাদ, এটা এবং

মথুরা প্রদেশের অধিকাংশ, সমুদয়ই এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী ক্ষেত্রবৎ ভূমিতে অবস্থিতি করিতেছে। এই ভূমিখণ্ডকে এখানে দোয়াব বলে। দোয়াব অর্থাৎ দুই জলের মধ্যবর্ত্তী ভূমি। এই দুই ভারতপ্রসিদ্ধ নদীর মধ্যবর্ত্তী হওয়াতেই এই স্থান সকল সর্ব্বদা ইহাদের দ্বারা ধৌত হইয়া হইয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে। যদিও আমি কখন এসকল স্থানে যাইয়া দেখি নাই, তথাপি মানচিত্রস্থ প্রতিরূপ দ্বারা স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, ইহারা এই নদীদ্বয়ের গতি পরিবর্ত্তন দ্বারা বারে বারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ইহাদেরই থিতান পদার্থ সকল দ্বারা পুনঃ পুনঃ রচিত হইয়াছে। ইহারা এই উভয় নদীরই শুষ্ক গর্ভ ভিন্ন আর কিছু নয়। অতএব এ সকল স্থানে এত বিল, ঝিল এবং সোতা, নালা থাকিবার এই কারণ। কোন কোন বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণে বাঙ্গলা দেশের সদৃশ। শুনিয়াছি গ্রীষ্মকালে লু-বায়ু ইহাদের শরীরোপরি কিঞ্চিৎ মন্দভাবে বহিয়া থাকে। বর্ষাতেও আর্দ্রতার তত প্রকোপ হইতে পারে না। এই অঞ্চলের অনেক স্থানে নীল জন্মে। পাঠকবর্গ আমাদিগকে যেন সম্পূর্ণভাবে অগ্নিদগ্ধার মধ্যে গণনা করেন না। যদিও আমাদের অব্যবহিত পশ্চাৎদিক হইতে রাজস্থানের মরুস্থলীরূপ চুল্লী, শীতের ছয় মাস নির্ব্বাপিত থাকিয়া, সমস্ত নিদাঘ আমাদিগকে উত্তপ্ত তন্দূর মুখে ফেলিয়া ভাজিতে থাকে, তবু আমরা আমাদের বিভাগীয় প্রতিবেশিবর্গের জল-সম্পত্তির কথা শুনিয়া শ্রুতিপথে অনেক স্নিগ্ধ থাকি। এককালে কবাব হইয়া যাই না। আমাদের দৈনিক আহারের মৎস্যোপকরণ এই সকল নদী, নালা, বিল, ঝিল হইতেই যোগান হইয়া থাকে। রোহিত, কাতলা, কালীবাউস, বোয়াল, ছোট ছোট চাইন, ফলি, চিতল, মিরকা, পাঙ্গাস, গজার, সরপুঁটী, পুঁটী, খরশুল, চেলা, বাঁশপাতি, টেঙ্গরা, ক্ষুদ্র চিঙ্গরী, নারিকেলি, বাচা, রিঠা, আইর, চাঁদা, পোঁয়া, ফেশুয়া, চাপিলা, ছোট ছোট শকুল, মাগুড়, শিঙ্গী, কাঁকড়া এবং কখন কখন ইলিশ পর্য্যন্তও পাইয়া থাকি। ইলিশ, ফাল্গুন, চৈত্র এবং বৈশাখ এই তিন মাসের মধ্যে কোন কোন দিন পাওয়া যায়। এখানে ইলিশ শব্দ শুদ্ধ ইলিশের আকৃতি এবং অবয়ব বাচ্য। স্বাদবোধক নয়। ইহাকে যখন পাই, তখনই অন্তঃসত্বা অবস্থায় পাই। ডিমেই ইহা প্রায় সর্ব্বস্বাপহৃতা হইয়া থাকে। অন্য অন্য মৎস্যেরা আপনাদের ঋতু অনুসারে উপস্থিত হয়। রোহিত, কাতলা, মিরকা এবং বোয়াল প্রায় বার মাসই পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের মৎস্য অপেক্ষা শীতের মৎস্য কিছু স্বাদু। তত আঁইশের গন্ধ থাকে না। ফিরিঙ্গী ভায়াদের জন্য খরশুল মাছে হাত রাখিবার যো নাই। এদেশে বাসার ভৃত্য কাহার-জাতিরাই মৎস্য বিক্রয় করে এবং নৌকাবাহক মাল্লা

জাতীয়েরাই মৎস্য ধরে। কখন কখন কাহারেরাও ধরে। এখানে মৎস্যের কোন বাজার নাই। কাহারেরা স্ত্রীপুরুষে মাথায় করিয়া করিয়া বাঙ্গালি, ফিরিঙ্গী এবং মুসলমান এই জাতির মধ্যে বিক্রয় করে। বোধ হয় এই তিন জাতি এই অঞ্চলে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে মৎস্যের ব্যবহার ছিল না; ব্রহ্মধর্ম্ম এবং জৈন ধর্ম্মের শাসনই ইহার বোধ করি এক মাত্র কারণ। মরা খায় বলিয়া যদিও এদেশের কচ্ছপ খাইতে অতিশয় ঘৃণা হয় এবং কখন কোন বাঙ্গালি কি ফিরিঙ্গী খায় না, কিন্তু তাহার ডিম মৎস্যবিক্রেতাদিগকে বলিয়া আনাইয়া খাইয়া থাকে। হকিমি মতে মাছ গরম বলিয়া গ্রীষ্মকালে এদেশের মুসলমানেরা কেহ খায় না। এই গতিকে একটুকু শস্তা হয়। কিন্তু খাইতে বড় ভাল লাগে না। বিশেষতঃ বড় বড় মাছ। বড় মাছ মাত্রেরই পেট চিরা থাকে সুতরাং তাহাদের আভ্যন্তরিক অনেক খাদ্যাংশ পাইবার যো থাকে না। অনেক সময় মনোমত এবং অভিরুচি-গত দ্রব্য লাভের জন্য বাঙ্গালিরা মৎস্য বিক্রেতাদিগকে পুরাতন বস্ত্রাদি দান করিয়া উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।

আগ্রা ও যমুনা সম্বন্ধে আর একটি বিষয় পাঠক বর্গকে পূর্ব্বে কহিতে ভুলিয়াছি। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যমুনা এবং গঙ্গার গর্ভ নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। ইহাদের গর্ভ-পরিবর্ত্তন দ্বারাই পার্শ্ববর্ত্তি স্থানাদির আকৃতি এবং প্রকৃতিগত অনেক বৈলক্ষণ্য জন্মিয়া থাকে। শুনা যায় যে, আগ্রা হইতে পূর্ব্বদক্ষিণে প্রায় ১২। ১৩ মাইল দূরে যমুনার একটি পরিত্যক্ত শুষ্ক গর্ভ আছে। ইহা প্রস্থে কোন কোন স্থানে ১½ মাইলের অধিক হইবে এবং দীর্ঘে কোন কোন স্থান ২০ মাইলের ও অধিক হইবে। বর্ষাকালে এখনও এই গর্ভ অংশতঃ প্লাবিত হয়। কার্লাইল সাহেব বলেন, এবং তাহা অনেক সম্ভব যে, যদি হিন্দুদিগের সময়ের প্রাচীন আগ্রা খুজিতে হয়, তাহা হইলে এই পুরাতন গর্ভের পার্শ্বস্থ গ্রামাতে খোজাই কর্ত্তব্য। বাস্তবিক এইক্ষণ ভারতবর্ষে যত নগর বিদ্যমান আছে, তাহাতে প্রাচীন হিন্দুদিগের কীর্ত্তি-সমাধি দেখিতে হইলে, আধুনিক নগর সকলের পার্শ্ববর্ত্তি স্থানাদি খনন করিয়া দেখিতে হয়।

কোন নবীন অভ্যাগত বঙ্গবাসী, যখন বাষ্পীয় শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া দীর্ঘপর্য্যটনজনিত শরীর-গ্লানি হইতে কিঞ্চিৎ অবকাশ পান, এদিকে ওদিকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, এবং পথের এপাশে ওপাশে হাটিয়া মুহুর্মুহুঃ নগরের মুখচ্ছবির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তখন সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার মনে একটি ধূলিধূসরিত বিরুক্ষ ভাবের উদয় হইয়া থাকে; এবং সুস্নিগ্ধ শ্যামল লতাপত্রতরুগুল্মাদির গাঢ় অবগুণ্ঠনে সুন্দর

অবগুণ্ঠিতা বঙ্গভূমির সান্নিধ্য হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেন চতুর্দ্দিকে কেবল হা-হাকারের প্রতিকৃতি দেখেন। গৃহাদির প্রতি নয়নপাত করিলে দেখেন, কেহ আতপভয়ে মস্তকে খড় বাঁধিয়া, কেহ সু-জীর্ণ পুরাতন পতনোন্মুখ গাত্রবেষ্টনে দ-রমা জড়াইয়া, কেহ শৈবালে লেপিত, কেহ তৃণাঙ্কুরে রোমায়িত ভগ্ন কর্পরে ব-সিয়া, কেহ পলিতকেশনিভ মর্ম্মরগ্র-থিত মস্তকে বিচূর্ণচূড় হইয়া, কেহ সুবর্ণ-কলস মস্তকে মর্ম্মরাম্বরে আপাদশির আচ্ছাদিত করিয়া ও পদ্মাসনে যমুনাতটে উপবিষ্ট হইয়া, কেহ সদ্যঃ চূর্ণ-ধৌত-ক-লেবরে বিবিধ রঙ্গমালায় কণ্ঠ বিরঞ্জিয়া, কেহ আবার তাহারই পার্শ্বে গলিতত্বকে ও জানু-জঙ্ঘা-কপোল-বিভগ্নে বিকটাস্য হইয়া এবং কেহ বিক্ষিপ্ত শরীর ইষ্টকে ধরা পতিত রহিয়া অতি গম্ভীর ভাবে মনুষ্যকণ্ঠের অবিরাম কল কল ও যা-নাদির খট খট ও ঘর্ঘরের মধ্যে ভূত ভ-বিষ্যৎ বর্ত্তমান চিন্তারূপ যোগে যেন নিমগ্ন নিমগ্ন রহিয়াছে। চারিদিক হইতে ব্রজের রজোরেণু উড়িয়া উড়িয়া সকলের গাত্রে লাগিতেছে। ধূলিরই মঞ্চ, ধূলিরই আসন, এবং ধূলিরই ধুনী। যে দিকে দেখা যায়, কেবল ধুলাই ধূলা। বাস্তবিক আজি কালি আগ্রার ধুলাই প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক সম্পত্তি। জানি না, আকবর কি দেখিয়া ইহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন। বর্ষার দুটি মাস নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গেলে, অবশিষ্ট দশ মাস আগ্রা কেবল ধূলি-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। এত ধূলা হইবার বোধ হয় দুটি কারণ। প্রথমতঃ ইহার মৃত্তিকাই স্বাভাবিক পাংশুল ও আঁঠা শূন্য। দ্বিতীয়তঃ, বিবিধ প্রকারের যানাদি অনবরত অবিশ্রান্তভাবে ইহার পৃষ্ঠকে ঘর্ষণ করিয়া থাকে। ইহার পৃ-ষ্ঠোপরিস্থ অণুসংহতিতে যে কিঞ্চিৎ যো-গাকর্ষণ আছে, তাহাও প্রতিনিয়ত ইংরে-জিশকট এবং দেশীয় এক্কা, বহেলী ও উষ্ট্র সিকৃরমের চক্রঘর্ষণে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহার শরীরস্থ প্রায় দ্বিহস্ত প্রমাণ মৃত্তিকা বর্ষে বর্ষে আকাশপথে উড্ডীন হওতঃ দূর দূরস্থ রাজ্যাদিতে নিক্ষিপ্ত হয়। এখানকার ক্ষেত্রাদির মৃত্তিকাও এইরূপ পাংশুল এবং মরুবর্ণ অর্থাৎ ঈষৎ পীতাভ। জলে সিক্ত না করিলে ডেলা বাঁধে না। যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকার স্বাভাবিক ডেলা বাঁধা হয়, শু-নিয়াছি তাহা অতিশয় উর্ব্বর এবং তাহার প্রতি বিঘাতে কৃষককে বার্ষিক সাত আট টাকা কর দিতে হয়। মধ্যম শ্রেণীর ভূ-মিও কিঞ্চিৎ ডেলা বাঁধা হয় এবং তাহা-তেও শস্যাদি উৎপন্ন হয়। বিঘা প্রতি ইহারও তিন চারি টাকা কর দিতে হয়। অধম শ্রেণীর ভুমি অধিকাংশই ক্ষার ও ক-ঙ্করময়। ইহাতে উষ্ট্রের খাদ্য নানা প্র-কার কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ ভিন্ন আর কি-ছুই জন্মে না। যখন আমরা কোন কোন সময় ক্ষেত্রাদিতে ভ্রমণ করিতে যাই, তখন আমরা দেখি যে, কোন কোন স্থান সুশ্র-

তোক্ত ঔদ্ভিদ-লবণ দ্বারা শুক্লীকৃত হইয়া আছে। কোন কোন খানে সোরাও দৃষ্ট হয়। নগরের অভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকাতে এত সোরা যে, নূতন কোন গৃহ নির্ম্মিত হইলে, কএক বৎসরের মধ্যেই ইহার আক্রমণে জর্জ্জরিত হইয়া উঠে এবং প্রাচীরস্থ চূর্ণের আস্তর সকল খসিয়া খসিয়া পড়ে। ইষ্টক সকল চূর্ণ হইয়া ঝুর ঝুর করিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহে এরূপ হইতে দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন বহুকাল হইতে মনুষ্য এবং পশুমূত্র সঞ্চিত হইয়া এরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বে সহরেরই উত্তরপশ্চিম প্রান্তে মহু নামক গ্রামের কাছে এক প্রকার লবণ জন্মিত, এখন তাহা সরকার হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যমুনার ধারে আকবরের সময়ের সোরাওয়ালী কুঠীনামে একটি বৃহৎ বাটী আছে; এইক্ষণ তাহা মথুরার প্রসিদ্ধ ধনী লক্ষ্মী চাঁদ শেঠ কিনিয়া লইয়াছেন। শুনা যায় যে, আকবরের সময়ে এখানে সোরা প্রস্তুত হইত।

আগ্রার সহর সমুদয় একস্থানে একত্রীকৃত নয়। ইহা অংশে অংশে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত এবং সহরের মধ্যে মধ্যে অনেক বিস্তৃত বিস্তৃত শূন্য স্থান সকল পড়িয়া আছে। এ সকল শূন্য স্থানের অনেক গুলা পূর্ব্ব হইতেই শূন্যাবস্থায় আছে, এবং কতক গুলা প্রাচীন গৃহাদির বিলোপে ক্রমে শূন্য হইয়া উঠিয়াছে। কাশী এবং দিল্লীকে কোন অত্যুচ্চ স্থানে বসিয়া যেরূপ মনোহর দেখায়, ইহার শরীরের অভ্যন্তরে অনেক শূন্য ভূমি থাকাতে ইহাকে সেরূপ সুন্দর দেখায় না। এরূপ হওয়াতে যদিও ইহা নয়নের আরাম দায়ক হয় নাই বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের অনেক আরামজনক হইয়াছে। স্থানে স্থানে বায়ু সুন্দররূপে খেলিতে পারে বলিয়া অনেক পরিষ্কৃত থাকে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইহার এক একটি অংশও নিতান্ত অবিস্তৃত নয়। ইহার সমুদয় অংশ এক স্থানে একত্রিত হইলে, ইহাকে বর্ত্তমানাপেক্ষা অত্যন্ত বিস্তৃত দেখাইত। ইহার গাত্রোপরিস্থ ভূমি, আমাদের দেশের ভূমির ন্যায় তত সমতল নয়; সর্ব্বত্রই প্রায় উচ্চ নীচ। যদিও এখানকার বর্ষা অতিশয় ক্ষীণ, তবু ইহার মৃত্তিকা অনেক শ্লথ বলিয়া নানাদিক হইতে আগত বর্ষার জল-গতি দ্বারা ক্রমে ধৌত হইয়া হইয়া স্থানে স্থানে বড় বড় নালা সকল প্রস্তুত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে কঙ্করপ্রস্তরমিশ্রিত মৃত্তিকার বিস্তৃত স্তূপ সকল দাঁড়াইয়া আছে। লোকেরা তাহার উপরে গৃহ অট্টালিকাদি তুলিয়া বাস করিতেছে। এই জন্যই সহরের বক্ষ[illegible] সকল নালার গর্ত্ত দ্বারা এক প্রকার এবড়ো খেবড়ো হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কোন নালা প্রায় পঁচিশ ত্রিশ মাইল হইতেও দীর্ঘ। পীপলমণ্ডি নামক সহরের একটি অংশ এইরূপ একটি নালার এক অংশের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে। বর্ষার সময়ে ইহার মধ্যে স্থাপিত গৃহাদির কটি ঘেষিয়া জল

চলিতে থাকে। কলিকাতাতে সাহেবেরা এত অর্থ ব্যয় করিয়াও যাহাতে কৃতকার্য্য হইতেছেন না, এখানে প্রকৃতি আমাদিগকে আপন যত্নে বিনা ব্যয়ে তাহা-করিয়া সর্ব্বদা শুষ্ক বিছানায় সুস্থ রাখিতেছে।

মৃত্তিকার হাত কএক নীচেই কঙ্কর প্রস্তরের স্তর। পূর্ব্ব বাঙ্গালার মৃত্তিকাতে কোন খানেও ইহা নাই। থাকিবার বোধ হয় কারণও নাই। কিন্তু রাঢ় দেশের কোন কোন স্থানে আমি ইহা দেখিয়াছি। তাহারা ইহাকে ঘেটেং বলে এবং ইহা ভস্ম করিয়া চূণা প্রস্তুত করে। এখানেও তাহাই করে। এখানে সাধারণতঃ সমস্ত চূণার কর্ম্ম ইহাকে ভস্ম করিয়া হয়। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষদ্র চূর্ণ-প্রস্তর। আকৃতি অত্যন্ত বন্ধুর। ইহাকে কুটিয়া গুঁড়া করিয়া এবং তদ্দ্বারা কর্দ্দম প্রস্তুত করিয়া কুম্ভকারেরা এক প্রকার সুন্দর অতি পাতল সুরাই প্রস্তুত করে। এই সুরাইতে সাধারণ মাটির সুরাই হইতে জল অপেক্ষাকৃত শীতল থ[illegible]। এখানে ইহাকে ' কঙ্কর কা সু-[illegible]' বলে। ভূমির অব্যবহিত নীচেই এই চূর্ণ প্রস্তরের স্তর থাকাতে এখানকার কূপোদক মাত্রেই চূণের অংশ থাকে। কোন খানে কম, কোন খানে বেশি। এই চূণের অংশ এবং তৎসহ সোরা ও অন্যবিধ ক্ষারজ লবণের অংশ মিশ্রিত থাকাতে এখানকার প্রায় সমুদয় কূপোদকই খাইতে বিস্বাদ। কেবল যমুনার পার্শ্ববর্ত্তি কূপোদকেই এ দোষ নাই। থাকিলেও সহজে জিহ্বাতে অনুভব করা যায় না। এই চূর্ণপ্রস্তরের স্তর ভেদ করিয়া আরও অনেক নীচে চলিয়া গেলে মিস্ট জলের স্তর পাওয়া যায়। আমার পরিচিতের মধ্যে কোন একটি সমৃদ্ধিশালী ক্ষত্রিয় বাড়ীতে বসিয়া মিস্ট জল খাইবার আশায় এখানকার ইঞ্জিনিয়র সাহেবদিগের দ্বারা আপনার গৃহপ্রাঙ্গণে বহু অর্থব্যয় করিয়া একটি কূপ খনন করাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন মতেই মিষ্ট জল পাইতে পারিলেন না। উপরিস্থিত স্তর সকলের মধ্যদিয়া বর্ষা এবং অন্যান্য প্রকারের জল সকল চোঁয়াইয়া পড়িয়া কূপের নিম্নস্থ জলকে নস্ট করিয়া ফেলে।

উপরোক্ত কঙ্কর ব্যতীত, ইহার বক্ষে চিকনী ও পোতানি নামে আরও দুই প্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়। তাহা এখানকার সাধারণ লোকেরা গৃহ-প্রলেপে ব্যবহার করিয়া থাকে। সাহেবেরাও অনেক সময়ে পরিমিতব্যয়িতার অনুরোধে আপনার প্রাঙ্গণস্থ বহিঃ-প্রাচীরাদিতে ইহার প্রলেপ করাইয়া থাকেন। ইহার প্রলেপ দেখিতে চূর্ণের প্রলেপ হইতে বড় কম সুন্দর দেখায় না।

(ক্রমশঃ) (প্রবাসী)

তরঙ্গিণী ।

গীতি-কবিতা ।

(রাগিণী লগ্নী, তাল জৎ)

বড়ই সাধের তুমি সজনি আমার রে,
তরঙ্গ-রঙ্গিনি !
যখনি দেখিতে যাই
তখনি দেখিতে পাই
নূতন-মূরতি তব নয়ন-রঞ্জিনী ।
প্রেমের প্রবাহ তুমি প্রাণ-বিনোদিনি ।

২

কত লীলা ও তনুতে, কতই ভঙ্গিমা রে,
বিভ্রম, ভামিনি !
চাঁদের আলোতে হেসে,
চাঁদের আলোতে ভেসে,
চলেছ চটুলে কোথা বল তাহা শুনি ।
হাসিছে তোমার সুখে সুখদা যামিনী ।

৩

কার না জুড়ায় প্রাণ হেরিলে ওরূপ রে,
রূপ-বিলাসিনি !
আকাশে একটি চাঁদ,
হৃদে তব কোটি চাঁদ,
জড়িত জ্যোৎস্নায় তুমি রস-তরঙ্গিনি !
তুমিই কি বিয়োগীর সন্তাপ-বারিনী ?

৪

যৌবন-জোয়ারে তব খেলিছে লহরী রে,
ভুবন-মোহিনী,
লহরে লহরে মরি
উথলিছে কি মাধুরী
কি গরিমা, কিবা ছটা ভুজঙ্গ-গঞ্জিনী,
পুলিনে মলিন লাজে বন-সোহাগিনী ।

৫

মৃদুল মৃদুল বহে ধীর-সমীরণ রে,
অধীর-গামিনি !
অধীর সে পরশনে,
বুঝি না কি ভেবে মনে,
কি মায়ায় কি ছলনা খেল মায়াবিনি !
একি পুনঃ ? তালে তালে নাচিছ তটিনি ?

৬

আবার আবার একি ভীষণ হিল্লোল রে,
তট-বিঘাতিনি !
কেন এই গরজন
এ নিঠুর দরশন
নিরখি অম্বরে ওই নীল-কাদম্বিনী,
পরকীয় ছায়াও কি ছোঁয় না মানি

৭

কল কল কল নাদে কি কথা কহিছ রে,
কল-নিনাদিনি !
অস্ত যায় রবি শশী
পোহায় দুঃখের নিশী
তবু হায় না ফুরায় তোমার কাহিনী
কার প্রেমে বল ধনি, তুমি উন্মাদিনী ?

মরমের দুখ আজি কহিব তোমায় রে,
ভূধর-নন্দিনি !
তব তটে বসি' বসি',
অশ্রু জলে সদা ভাসি,
নিবার এ অশ্রু-বারি দুঃখীর-সঙ্গিনি !
দ্রবময়ি ! দ্রব-দয়া, করুণা-রূপিণি !

বড়ই সাধের তুমি সজনি আমার রে,
তরঙ্গ-রঙ্গিণি !
'কোথা যাও ফিরে চাও'
সঙ্গে মোরে লয়ে যাও
তরল-তরঙ্গ-ময়ি ! অনন্ত-গামিনি !
ভাসাব তরঙ্গে তব জীবন-তরণী। (শ্রীবঃ)

সংক্ষিপ্তসমালোচন

১। 'মিত্রপাঠ; আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত।'—বঙ্গদেশের ইহা একটি কলঙ্ক যে, যাঁহাদিগের কবিত্বশক্তি আছে, তাঁহারা বালকবালিকাদিগের জন্যে কাব্য লিখেন না। ইহার এক কারণ এই, এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারা প্রায়শঃই স্বজনবৎসল ও অনুগত-পালক শিক্ষাসমাজের নিকট বিড়ম্বিত হন;—আর এক কারণ এই, তাঁহারা কাব্যের বিপণিতে যাঁহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করেন, ঈদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা দূরে থাকুক,—সেই কোটি কোটি লেখকবর্গের সহিত তাঁহারা সময় বিশেষে মল্লযুদ্ধ করিতেও বাধ্য হন। হেলেনাকাব্যের রচয়িতা উল্লিখিত বিড়ম্বনা ও লজ্জা উভয়েরই প্রতি দৃক্‌পাতশূন্য হইয়া এই কলঙ্ক মোচনে যত্নশীল হইয়াছেন। তাঁহার মিত্রপাঠ, বালকশিক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। যে শ্রেণির বালকেরা বোধোদয় পড়িয়া থাকে, তাহারা মিত্রপাঠ পড়িলে ভাষা শিখিবে, অথচ জ্ঞান লাভ করিবে।

২। 'কুন্দমালা। নিসর্গ সুন্দরী-প্রণেতা শ্রীশারদা প্রসাদ স্মৃতিরত্ন বিরচিত।' এদেশীয় কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে ইদানীং যাঁহারা প্রসিদ্ধ ও প্রথিতনামা হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিল্টন, বায়রণ, স্কট ও টেনিসন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের মন্ত্রশিষ্য। তাঁহাদিগের বাঙ্গালা কবিতা ইংরেজী কবিতার নূতন এক মূর্ত্তির মত। বিলাতের বিবিদিগকে সাড়ী এবং বলয় চন্দ্রহার প্রভৃতি আভরণ পরাইয়া বৌ সাজাইলে, অথবা এদেশের বধূদিগকে গাউন পরাইয়া বিবি সাজাইলে যেমন দেখায়, ঐ সমস্ত কবিতাও আমাদিগের নিকট তেমনি প্রতীত হয়। দেখিতে সুন্দর,—শোভায় অপূর্ব্ব; কিয়ৎপরিমাণে নূতন নূতন, অথচ স্থিরচক্ষে তাকাইলে পরিচিতপূর্ব্ব। স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির গুরুস্থান স্বদেশ। তাঁহারা যাহা কিছু শিখিয়াছেন, তাহা কা-

লিদাস, ভারবি ও ভবভূতি প্রভৃতি ভারতীয় কবিসম্প্রদায়ের নিকট। সুতরাং তাঁহাদিগের কবিতায় ঐ অপূর্ব্বত্ব, ঐ নূতনত্ব নাই। কিন্তু অপূর্ব্ব ও নূতন না হইলেও কুন্দমালার মত কবিতা অবহেলার বস্তু নহে। আমরা নিসর্গসুন্দরীর নির্ম্মল কান্তি দেখিয়াই স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে কবি বলিয়াছি, তদীয় অশ্রুজলসিক্ত কুন্দমালার গাঁথনি দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তির বিকাশবিষয়ে আশান্বিত হইলাম।

৩। 'কবিতামুকুর। শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।' গ্রন্থকার তদীয় বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় দফায় লিখিয়াছেন ; "—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি নবাবসরকারে চাকরি করিয়া মজুমদার খেতাব প্রাপ্ত হন, এবং তদবধি আমাদের বংশাবলী ঐ খেতাবে আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু আপাততঃ ঐ খেতাব মনোরম বোধ না হওয়ায় আমাদের চিরপ্রচলিত মুখোপাধ্যায় উপাধি গ্রহণ করা গেল।"

একথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই। কত লোক কত অসৎকর্ম্ম করিয়া খেতাব লইতেছে, অথচ কেহ তাহাদের নিন্দা করিতেছে না। এমত স্থলে আমাদের গ্রন্থকার কেতাব লিখিয়া খেতাব লইবেন, অথবা পুরাতন খেতাব, পুরাতন জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে ইহ খলু নশ্বর জগতে কোন্ পাষাণচিত্ত দুর্নীত ব্যক্তির আপত্তি হইতে পারে? কিন্তু গ্রন্থকার তদীয় বিজ্ঞাপনের প্রথম দফায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের নানারূপ আপত্তি আছে। প্রথম দফার প্রথম পংক্তি এই,— "কয়েকটি কবিতা বিরচিত করিয়া কবিতামুকুর প্রকাশিত হইল।" বাঙ্গালা ভাষা বেওয়ারিশী মাল হইলেও ইহাতে এইরূপ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ ও রীতিবিরুদ্ধ বাক্য গ্রথিত হওয়া অনুচিত। দ্বিতীয় আপত্তি 'পরাপরাধেন পরস্য দণ্ডং।' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের রীতি অবলম্বন পূর্ব্বক অধিকাংশ কবিতাগুলি লিখিত হইয়াছে।" এই কথায় আমাদের কেন, অনেকেরই আপত্তি হইতে পারে। গ্রন্থকার কিরূপ কবিতাকে হেমচন্দ্রের অনুকৃতি বলেন, নিম্নে তাহার একটি প্রদর্শিত হইল।

"আশীলক্ষ বর্ষ পশ্বাদি জনম,
জনমি জগতে, ভুঞ্জিয়া অসম
যাতনা যতেক, জীবাত্মা চরম,
হয় দৃষ্ট ভবে মান-বা-কারে।
কত বিড়ম্বনা কঠোর নিগ্রহ
ভোগ-শেষ হয় টুটে যবে গ্রহ,
যায় তবে পেয়ে ঈশ-অনুগ্রহ,
আগ্রহে জীবাত্মা পবিত্রাধারে।"

এই কবিতাটিতে হেমবাবুর অনুকরণের মধ্যে আমরা এই দেখিয়াছি,—ইহার একস্থানে লেখা আছে, 'প্রয়োগ',—আর একস্থানে লেখা আছে, 'শাখা' এবং তৃতীয় একস্থানে লেখা আছে

'পূর্ণকোরস্'। অনুকরণ মন্দ নহে।

৪। 'কবিতা প্রসূনমালা। শ্রীরজনীকান্ত বসু প্রণীত।' এখানিতে নানাবিধ নীতি কথা আছে। যথা,—

"হে মানব! যে প্রতিজ্ঞা কর একবার,
দেখ যেন নাহি হয় অন্যথা তাহার।
বাক্যে যা বলিবে তাহা অবশ্য করিবে,
নতুবা বিভুর কাছে অপরাধী হবে।
প্রত্যয় হবে না কারু তোমার বচনে;
অতএব কর যত্ন প্রতিজ্ঞাসাধনে।"

৫। 'ভারত-উদ্ধার। অথবা চারি আনা মাত্র। (ভবিষ্য ইতিসাসের এক পৃষ্ঠা।) শ্রীরামদাস শর্ম্ম-বিরচিত।' আমরা কবিতা মুকুর এবং কবিতা প্রসূন-মালার সঙ্গে সঙ্গেই যে, ভারত উদ্ধারের নাম করিলাম মান্যবর শ্রীযুক্ত রামদাস শর্ম্মা ইহাতে অবশ্যই পুলকিত হইবেন, এবং বিনা যত্নে, বিনা পরিশ্রমে এবং অত্যল্পমাত্র অর্থ ব্যয়ে কবি সমাজে স্থান পাইলেন বলিয়া অবশ্যই তিনি আনন্দ ভরে অশ্রুপাত করিবেন। কিন্তু তথাপি আমাদিগকে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, ভারত উদ্ধারের অপর নাম 'চারি আনা'—কবিতা মুকুর এবং কবিতা প্রসূন মালার অপর নাম 'ছয় আনা।' বঙ্গে অদ্যাপি গুণাগুণের তারতম্যানুসারে কাব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হয় কি না,—অদ্যাপি লোকে কাঁচ কাঞ্চনের পার্থক্য দেখিয়া আপনা হইতেই আপনার উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লয় কি না, ইহা হইতেই রস-ভাব-বিচার-সক্ষম বিচক্ষণ পাঠকবর্গ তাহা অনুভব করিতে পারিবেন।

মূল্য-গত তারতম্যের কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপে সমালোচনা করিতে হইলে আমাদিগের বলা আবশ্যক যে, রামদাস শর্ম্মার এই নূতন কাব্য বাঙ্গালা ভাষার এক নূতন সৃষ্টি। ইহার প্রত্যেক বাক্য এবং প্রত্যেক পংক্তিই রচয়িতার অসাধারণ মনস্বিতা এবং অনন্যসাধারণ ব্যঙ্গবর্ণন-শক্তির পরিচয় প্রদান করে। ফলতঃ এই কাব্যখানির আদ্যন্ত পাঠ করিলে মনে সর্ব্বাগ্রেই এই প্রতীতি জন্মে যে, বাঙ্গালার বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য এবং নাম কাটা সিপাহিদিগকে যদি কেহ চিনিয়া থাকে, তবে চিনিয়াছেন রামদাস শর্ম্মা, এবং বাঙ্গালার অন্তঃসারশূন্য অকর্ম্মণ্য বাগ্মী ও লেখকবর্গকে উপদেশ দেওয়ার জন্য যদি কোন ব্যক্তি উপযুক্ত হইয়া থাকেন, সেই ব্যক্তিও আমাদের এই রামদাস শর্ম্মা।

উৎসাহ উপকারজনক, উৎসাহের অনুকরণে বৃথা আস্ফালন যার পর নাই অপকারজনক। স্বদেশবাৎসল্য সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়, কিন্তু স্বদেশবাৎসল্যের নাম লইয়া সময় ও শক্তির অপচয় করা, এবং নট ও নটীর মত রঙ্গভূমিতে নৃত্য করিতে যাওয়া সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। কৃষিকার্য্য পৃথিবীর উপকারি,—পার্থিব প্রয়োজনে অপরিহার্য্য, কিন্তু কৃষিকার্য্যের অনুরোধে মার্জ্জারের দ্বারা হল-

চালনা, মূষিকের দ্বারা ক্ষেত্রোৎকর্ষ-বিধানের চেষ্টা একান্ত উপহাসের বিষয়। সাধনায় স্বর্গ আছে, কিন্তু সিদ্ধির প্রথম সোপান শিক্ষা। ইত্যাদি গভীর তত্ত্বকে অতি-গভীর বিদ্রূপচ্ছলে বর্ণনা করাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্যবিষয়ে গ্রন্থকারের মনোরথ সফল হইয়াছে। যে তাঁহার এই ত্রিচত্বারিংশৎ পৃষ্ঠাত্মক পুস্তকখানি লইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল উপবিষ্ট রহিয়াছে, সেই প্রথমে হাসিয়াছে,—হাসিয়া অন্যকে হাসাইয়াছে, এবং পরিশেষে প্রতপ্তহৃদয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছে।

রামদাস শর্ম্মার অমিত্রাক্ষর পদ্য নিতান্ত প্রীতিপ্রদ। ভাষা লইয়া ক্রীড়া করিতে, ভাষার রস-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া পাঠকের চিত্তে তৃপ্তি জন্মাইতে তাঁহার অণুমাত্রও আয়াস হয় না। তিনি নিরন্তর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং শ্লেষ পরিহাসে ব্যাপৃত রহিয়াও দুই এক স্থলে ভুলিয়া কিরূপে অন্যবিধ উচ্চ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিচয়ে তাহা প্রকাশ পাইবে।

"কে বলে নদীর স্রোত কাল-স্রোত-সম ?
ভাসাইয়া জবাফুল গঙ্গার সলিলে—
একটি একটি করি বহুতর ফুল,—
সারি দিয়া ভেসে যেতে দেখেছি বাহার
তীরে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুক্ষণ পরে,
সাঁতারিয়া সব গুলি এনেছি ধরিয়া।
কিন্তু রে কালের স্রোতে পারিজাত জিনি
অমূল্য কুসুম কত ভাসিয়া গিয়াছে,
দেখিছি নয়নে হায়! পারি নি ফিরাতে!
সাগরে সাঁতার দিলে ফিরে যদি পাই
সুখের শৈশব তবে চাহি না কি আর ?
একবার কালস্রোতে পড়িয়াছে যাহা,
তার তরে হাহাকার ভিন্ন কি উপায় ?
কে বলে নদীরস্রোত কালস্রোতসম ?"

আমাদিগের সুযোগ্য সহকারী আর্য্যদর্শনসম্পাদক ভারত-উদ্ধারের সমালোচনা করিতে গিয়া অভিনববস্তুদর্শনজন্য আনন্দের উৎসাহে ইহার একার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা যদি অধিকতর আনন্দোৎসাহে ইহার অপরার্দ্ধ উদ্ধৃত করি তাহা হইলে আর রামদাস শর্ম্মার 'চারি আনা' লাভ ঘটিয়া উঠে না। অথচ আমাদিগের বিবেচনায় প্রত্যেক বাঙ্গালিরই ইঁহাকে চারি আনা দক্ষিণা দিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্যালাভ করা কর্ত্তব্য। আমরা এই নিমিত্ত ভারত উদ্ধারের আর কোন স্থল উদ্ধৃত না করিয়া কেবল গ্রন্থকারকে আশীর্ব্বাদ মাত্র দিয়াই বিদায় করিতে বাধ্য হইলাম। আমরা আশীর্ব্বাদ করি, ব্যাস যেমন ভারত-কাব্য লিখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বরে অমর হইয়াছেন, রামদাস শর্ম্মাও সেইরূপ এই ভারত উদ্ধার কাব্য রচনার জন্য বিপিন কৃষ্ণের বরে কল্পতরুর অক্ষয়-ফল লাভ করুন,—এবং হেম-তুলিকা-চিত্রিত শচীর মত ভার্য্যা ও জয়ন্তের মত পুত্র লাভ করিয়া ইন্দ্রের উজ্জ্বল কান্তিতে সমুজ্জ্বল হউন।

যমুনা তটে

যমুনার কাল জল নাচিতে নাচিতে
দেখিনু ছুটিছে দ্রুত হাসিতে হাসিতে,
করি রঙ্গ মনসাধে, প্রেমিকে ফেলিয়া ফাঁদে
ভাগিরথী-কোলে স্রোত সোহাগেতে
ঢালিতে!
উদিত নবীন রবি, ধরিয়া নবীন ছবি,
তরল রূপের ছটা ঝলমল করিছে!
কি মরি সে কম কান্তি! হৃদয়ে জন্মায় ভ্রান্তি,
তরল তপন হতে রূপধারা ঝরিছে!
কাল জলে ভাসি ভাসি ছড়াইয়া রূপরাশি
হাসিমাখা মুখে মরি জনমন হরিছে!
কেমন রবির ছবি যমুনায় খেলিছে!

২

মন্দ মন্দ গন্ধবহ ফুলরেণু উড়ায়ে,
হাসিতে মাখায়ে হাসি সুধাধারা ছড়ায়ে,
ফুলদলে নাচাইয়া, লতা পাতা কাঁপাইয়া,
কুঞ্জবন হাসাইয়া মৃদুরবে বহিল।
কালিন্দীর কালজলে আমরি কি কুতূহলে
রবির কণকছটা ঝলমল করিল!—
তরঙ্গে ঢালিয়া অঙ্গ তালে তালে নাচিল।

৩

কালিন্দীর কালজলে কিবা শোভা হইল!
নব ঘনদলে যেন সৌদামিনী হাসিল!—
লতা পাতা তরুদল সব হল সচঞ্চল,
এঁকে, বেঁকে, থেকে থেকে, ধীরে ধীরে
কাঁপিল!
হলে পর হিমালয়, সেও হেথা হ'ত লয়!
আমরি কালিন্দী কিবা গঙ্গাজলে মিশিল?
বরদার বক্ষে কেরে মসি-রেখা আঁকিল?

৪

ব্রিটিশের জয়স্তম্ভ সমুন্নত বদনে
ভীমদুর্গ ছুটিতেছে চুম্বিবারে গগনে!
ভীষণ গম্ভীর বেশ, ঊর্দ্ধজটা ব্যোমকেশ,
নিমগ্ন গভীর তপে!—সেও আজ কাঁপিল!
দেখিয়া কেহ না দেখে—দেখিয়া কেহ না
শেখে!—
না দেখিয়া কেহ কিংবা মনে মনে শিখিল--
যমুনার কাল জল কত খেলা খেলিল।

৫

দেখিতে দেখিতে ভানু অস্তগত হইল।
হাসি হাসি মুখশশী শশধর উদিল!
আমরি কি রূপরাশি! সকলি উঠিল হাসি!--
রসবতী বসুমতী খল খল হাসিল।
রজতের শুভ্রজলে জলস্থল ভাসিল!
তীরস্থিত পুষ্পোদ্যানে পুষ্পরাজি হাস্যাননে
হাসাইয়া জনমন কিবা মরি ফুটিল।
গুণে বশ দিগ দশ, ঢল ঢল সুধারস,
সুধারসভারবাহী সমীরণ ছুটিল!
গুঞ্জরবে অলি সবে দিবা ভ্রমে। জুটিল

৬

সাগর-অম্বরা মহী শ্বেতাম্বর পরিল!—
একাকার ত্রিসংসার! রূপে মন হরিল।

শুভ্র জল, শুভ্র স্থল, ফল, ফুল, তরু দল,
শুভ্রতর নীলাম্বর!—কমনীয় কোলেতে
নবশিশু শুভ্রমুখ—হৃদয়ে উথলে সুখ,
ভাসে যথা হেরি মাতা সুখ-সিন্ধু-জলেতে!
ভেসেছে সকলি পূত সুখ-সুধা-রসেতে।

৭

হায় পূর্ব্ব কথা সব আজি মনে পড়িল।
সুখের সাগরে অই বাড়বাগ্নি জ্বলিল!
চলিয়াছ চল চল, হে যমুনে! বল বল
সে যমুনা তুমি কিগো, যার কালজলেতে
ভাসিত রাধিকা শ্যাম পূত প্রেমরসেতে!
ফুটিত কণকপদ্ম, বিমল অমৃত পদ্ম—
মধুগন্ধে আমোদিত হত সব ধরণী;—
যমুনে! তুমি কি সেই নবঘনগৌরী?

৮

যমুনে! তুমি কি সেই মৃদুকলনাদিনী?
কোথা সে গোপের বালা প্রফুল্ল ফুলের ডালা
অধরে মোহনবাঁশী,—বল গজগামিনি,
কোথা রাধা-মনোহর—পরম পুরুষবর?
কোথা সে পবিত্র প্রেম? সুবর্ণের নলিনী?
সেই নৃত্য সেই গীত; সে বাজনা সুললিত
কোথা সেই মহোৎসব? তপনের গরিমা?
ও পবিত্র তব নীর সত্য কি গো কাল চির
কিংবা ভেবে ভেবে মনে পড়িয়াছে
কালিমা?
কালিমা হৃদয়ে যার, কিসে হাসি হবে তার--
পশিলে কুসুমে কীট সে কুসুম ফুটে না!—
হতাশার চিত্তপটে ইন্দ্রধনু উঠে না।

৯

কাল স্বচ্ছ জল তব, তপন তনয়ে!
নহে কভু, পড়িয়াছে কালিমা হৃদয়ে!
উদ্বেলিত চিত্তোচ্ছ্বাস, অত্যুষ্ণ প্রশ্বাস শ্বাস
হৃদয়-পাবক-শ্বাস—স্ফুলিঙ্গের অবনী!
তোমার এ হাসি নয়!--শশী কি উদিত হয়
অমানিশাগগনেতে?—তুমিই যে কেবলি
বাহিরে শীতল রয়ে, অন্তরে গরল বয়ে,
গুমরে গুমরে সদা জ্বলিতেছ ললনে;—
তা নয় তা নয় নয়; অচল সচল চয়
কাঁদিতেছে--পুড়িতেছে সদা মনোবেদনে।
কাঁদিব না আমি আর, আজিকে পেয়েছি
সার,
তব তটস্থিত যথা তরু লতা বল্লরী—
বায়ুবিলোড়িত জলে, উত্তাল তরঙ্গ দলে
হয় বটে লণ্ড ভণ্ড,—ভূধর কি নগরী,—
সেই ধ্বংসে কিন্তু নয় ধ্বংস সেই সমুদয়—
কাঁপে বটে প্রভাকর—প্রতিবিম্ব কেবলি।
সেই মত আজ সতী তরঙ্গিত বসুমতী
নীরবিলে বায়ুবেগ হাসিবেক সকলি;—
ফুটিবে ও কালজলে সরসিজ-আবলী।

১০

কুলুকুলু ধ্বনি করি প্রবাহিনী চলিল।
সেই স্বচ্ছ নীরে কিবা চঞ্চল বিদ্যুৎ বিভা
সুবর্ণ ব্রততী কোলে কুমুদিনী দুলিল।
নিশা হল অবসান, বিহঙ্গ ধরিল গান,
শীতল প্রভাত বায়ু মৃদু মৃদু বহিল।
পূর্ব্বাম্বরে কেবা আসি ঢেলে দিল হাসি-
রাশি—
আমরি কি রূপ ছটা!—বসুন্ধরা জানিল!
অতি রমণীয় বেশ, কুসুমে সজ্জিত কেশ,
সুধাময়ী ঊষাদেবী হাসি উঁকি মারিল!

আমরি এ কারুকার্য্য অতুলনা!—অত্যা-
শ্চর্য্য!—
প্রসন্ন সহাস্য আস্য পুনঃ রবি উদিল!
আদরে জগতজন নবরসে মাতিল!

১১

অয়ি ঊষা সুহাসিনী! অমৃতের আসারে
হাসি যথা মৃদু মৃদু ভাসাইলে সবারে;—
শীতল শিশির জলে জুড়াইলে ধরাতলে-
সঞ্জিবিলে সমুদায় পুন নব জীবনে;—
এ হৃদয় কবে বল হাসাইবে? মনানল
জুড়াইবে—পার কি গো? মধুরস মি-
লনে?
হে রবি উঠিলে ভাল মাখিয়া কিরণজাল,
কবে হে উঠিবে হাসি এ হৃদয়-গগনে;—
ফুটিবে পরম পদ্ম দেখে তব বদনে।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

ঝিন্দন।

ঝিন্দন ভারতীয় ইতিহাস পটের একখানি প্রধান চিত্র। প্রধান চিত্র বলিয়াই অদ্যাপি বৈদেশিক সমালোচক গণ ইহা লইয়া কৌতুক-প্রিয় জনগণের সমক্ষে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছেন। এই আস্ফালন যাহারা দেখিতেছে, অথবা লোকপরম্পরায় ইহার কাহিনী শুনিতেছে তাহাদের কেহ অট্টহাস্যে করতালির ধ্বনিতে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে, কেহ ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া একটী অসহায় পতিত জাতির দেহে কলঙ্কের দুর্গন্ধ পঙ্ক ঢালিয়া দিতেছে, কেহ দুঃসহ মর্ম্ম বেদনায় অধীর হইয়া উদ্দেশে তর্জ্জনী সঞ্চালন করিতেছে, এবং কেহ বা নির্জ্জনে গম্ভীর ভাবে অতীত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দুঃখে, ক্ষোভে ও অভিমানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। এই বিচিত্র আস্ফালনের কারণ কি?

আমরা বলি এই আস্ফালন কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ইহা হৃদয়ের অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্ম অথবা প্রকৃতি-তরঙ্গিণীর অবশ্যম্ভাবী তরঙ্গ-লীলা। যখন যাহা পরিদৃশ্যমান সংসারের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিস্তার করে, মানব প্রকৃতি তখনই তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হয়, মানব কল্পনা তখনই উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার অন্তর্গত ধর্ম্ম নানাবর্ণে রঞ্জিত করিতে থাকে। এই ধর্ম্ম অথবা এই কল্পনার বলে, সে হয়ত সমাজে পূজনীয় হইয়া অনেকের হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইবার অধিকারী হয়, অথবা হয়ত কলঙ্ক ও নিন্দার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া ধিক্কারের অদ্বিতীয় পাত্র হইয়া থাকে। বনান্ত-বিহারিণী বিহঙ্গী যখন মানবের অগম্য কাননে থাকিয়া অনন্ত লীলাকাশে মৃদুমধুর সঙ্গীত-

সুধা বর্ষণ করে, এবং আপনার সৌন্দর্য্য-মহিমায় আপনিই মুগ্ধ হইয়া শ্যামল তরুর শাখায় শাখায় নাচিয়া বেড়ায়, তখন কে তাহার বিষয় আলোচনা করে? কোন্ প্রাণিবৃত্তান্তের প্রতিপত্র তাহার স্তুতিগীতিতে পরিপূরিত হয়? কোন্ কঠোর সমালোচকের কঠোর সমালোচনার তীব্রবাণে তাহার অযত্ন-রক্ষিত সুন্দর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকে? কিন্তু এই বিহঙ্গী যখন লোক-লোচনের সম্মুখবর্ত্তিনী হয়, তখন ইহার সম্বন্ধে কত তুমুল আন্দোলন হইতে থাকে, বৈজ্ঞানিকের লেখনী ইহার যশ, গুণ প্রভৃতির সম্বন্ধে কত বিষয় অজস্র সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে। তখন কেহ এই বিহঙ্গীকে প্রাণ বিযুক্ত করিয়া উৎকট স্বার্থপরতা চরিতার্থ করে। কেহবা বিরাগে বিভৃষ্ণায় ইহার কোমল-দেহ-বিচ্ছিন্ন কোমল পালক-রাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনার অহঙ্কারের পরিচয় দিতে থাকে।

ঝিন্দন যদি এই বনবিহারিণী বিহঙ্গীর ন্যায় আপনার মহিমায় আপনিই বিমুগ্ধ থাকিতেন; অথবা বিমুগ্ধ হইয়াই আপনার মহিমা বিকাশ আপনিই করিয়া সুখী হইতেন তাহা হইলে তিনি কখন কাহারও বিষাক্ত বাণ বা প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলির লক্ষ্য হইতেন না। অনন্ত-প্রসারিত গগনতলে ক্ষুদ্র নক্ষত্র-বিন্দুর ন্যায় অথবা অনন্ত বিস্তৃত জলধি-হৃদয়ে নগণ্য জল-বিম্বের ন্যায় তিনি নীরবে উত্থিত হইয়া নীরবেই বিলয় পাইতেন। কিন্তু ঝিন্দন এরূপ নীরবে সমুত্থিত হয়েন নাই। অনেকে বিস্ময়-স্তিমিত নেত্রে তাঁহার সমুত্থান চাহিয়া দেখিয়াছে; অনেক মন্ত্রণাপর রাজনীতিজ্ঞের হৃদয়ে তাঁহার সমুত্থান আশঙ্কা উৎপাদন করিয়াছে। ওয়াটার্লুর ভীষণ ক্ষেত্রে যাহারা টলে নাই, পলাশির শোণিত স্রোত দর্শনে যাহারা বিচলিত হয় নাই, রাজনীতির রহস্যধারণে যাহারা অসামর্থ্য প্রকাশ করে নাই, যাহারা বারিধি বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করিয়া সমগ্র পৃথিবীর নিকট বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতার পূজা পাইয়া আসিয়াছে, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া যাহাদের প্রভুশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে; ঝিন্দন তাহাদিগকেও নিস্তেজ বণিক্-প্রকৃতিক বলিয়া উপহাস করিতেন; তাহাদের বিভীষিকাও ঝিন্দনের তেজস্বি হৃদয়ের কঠিন আবরণ ভেদ করিতে অসমর্থ হইত। এরূপ তেজস্বিনী ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ললনার চরিত্র লইয়া যে বৈদেশিক সমালোচক গণ আস্ফালন করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা এই, ঝিন্দন যাহাদের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছেন, যাহাদিগকে বিকলাঙ্গ করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহারাই ঝিন্দনের চরিত্র-পটের চিত্রকর হইয়া সাধারণের সমক্ষে উপনীত হইয়াছে। সুতরাং এ-

তৎ প্রসঙ্গে তাহাদের আস্ফালন আপনা হইতেই নিয়মিত সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। মানব মন সহজেই দুর্ব্বল, সহজেই চঞ্চল, ও সহজেই তারল্য-বিকাশক। ইহা ধীরতা ও বিবেকের অবলম্বনে না চলিলে এই অপরূপ সংসার-প্রলয় পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে একবারে নিমগ্ন হইয়া যায়। পদ্মপত্রের উপর বারিবিন্দু যতক্ষণ স্থির ভাবে থাকিতে পারে,—ততক্ষণ মন যদি ধীরতা ও বিবেক বিহীন হয়, তাহা হইলে কর্ত্তব্য বুদ্ধি একবারে স্তম্ভিত হইয়া আইসে। এই কর্ত্তব্য বুদ্ধির স্তম্ভীভাবে যদি অকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে ঝিন্দনের চরিত্র অঙ্কনে নিঃসন্দেহ সেই অকার্য্যানুপাতের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

চিত্রকর চিত্রের যথাযথ স্থলে যথাযথ বর্ণ প্রতিফলিত না করিলে চিত্রখানি যেরূপ কদাকার ও অশ্রদ্ধেয় হয়, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে ঝিন্দনের চিত্রও ঠিক সেই রূপ কদাকার ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু কলঙ্ক, যত কিছু পঙ্কিল পদার্থ ও যত কিছু অস্পৃশ্য ঘৃণার্হ সামগ্রী আছে, চিত্রকর অম্লানবদনে, অসঙ্কুচিত হৃদয়ে,তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া ঝিন্দনের চিত্র আঁকিয়াছেন। কলঙ্কই এই চিত্রের উপাদান এবং একটি নারীকে কলঙ্কিনী করিয়া তৎসংসৃষ্ট একটি প্রবল জাতির উপর সাধারণের বিরাগ উৎপাদনই এই চিত্রের উদ্দেশ্য। চিত্রকর এই উপাদান সঙ্কলনে ও এই উদ্দেশ্য সাধনে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও উদারতার বিশেষ প্রশংসা এই, তিনি এই সমস্ত কলঙ্কের ভার বহনে কিছুমাত্র কাতর হয়েন নাই, ইহার উৎকট দুর্গন্ধে নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া কিছুমাত্র মুখ বিকৃত করেন নাই। সংসার-বিরাগী পরমাত্মনিষ্ঠ পরমহংসের ন্যায় তিনি সকল প্রকার দুর্গন্ধময় দ্রব্যই আদরে অবিকার চিত্তে হস্তে করিয়া আপনার কার্য্য সাধন করিতেছেন। ইহাতে ঘৃণা, লজ্জা অথবা বিরাগ আসিয়া তাঁহার কার্য্যে বাধা জন্মায় নাই। এইরূপ ধীরে ধীরে কলঙ্কের রেখাপাত করাতে চিত্রের সকল স্থানই কলঙ্কময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কোনও স্থলে কমনীয়তার বিকাশ নাই, কোনও স্থলে সরলতার স্ফূর্ত্তি নাই, এবং কোনও স্থলে পবিত্র সৌন্দর্য্যের মদালসবিভ্রম নাই। অবায়ু-সন্তাড়িত অপার জলধিতে যেমন একই নীলিমা ভাসিয়া বেড়ায়, নিষ্কম্প জলধর পটলে আচ্ছাদিত গগণে যেমন একই কালিমা লীলা করে, এই চিত্রের প্রতি রেখাতে সেইরূপ একই কলঙ্ক বিকাশ পাইতেছে। শবাসনা লোলরসনা রুধিরাক্তদেহা দিগম্বরী ভৈরবীর মূর্ত্তিতে অথবা রোমের বীর চূড়ামনির প্রেম ভিখারিণী সৈশরী রাজবালাতেও মাধুর্য্য ও পবিত্রতার আভাস সম্ভবে, কিন্তু এই চিত্রে অণুমাত্র মাধুর্য্য ও পবিত্রতার

রেখাপাত সম্ভবে না। কালের করাল রাজ্যে তীব্র হলাহলময় যত নরক আছে, তৎসমুদয়ের প্রতিবিম্বই এই চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। ঝিন্দনের ও ঝিন্দন-সংস্পৃষ্ট জাতির সহিত যাহাদের সহানুভূতি নাই; ইহাদের অভ্যুদয়ে যাহাদের লাভের স্পৃহা নাই, তাহারা যে এই কলঙ্কময় চিত্রের কলঙ্কিনী আভা দেখিয়া ঘোরতর করতালি-ধ্বনির সহিত অট্টহাস্যে উপহাস করিবে, তাহাও কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু বৈদেশিক চিত্রকরের সকলেই যে ভারতীয় ইতিহাসপটে এইরূপ কালিমা বিস্তার করিয়াছেন, আমরা প্রাণান্তেও তাহা বলিব না। অনেক বৈদেশিক, ধীরতা ও বিবেকের মন্ত্রণায়, ঝিন্দনের সহিত বিলক্ষণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। এবং ন্যায়ের দিকে চাহিয়া ঝিন্দনের কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রতিভাবলে পূর্ব্বোক্ত কালিমা অপসারিত হইয়া ঝিন্দনের চরিত্রে যথাযথ বর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা যদি একথা স্বীকার না করি তাহাহইলে আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন ও অমানুষপ্রকৃতি। দরিদ্র অসহায় ভারতবর্ষ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত এই অপক্ষপাত পুরুষসিংহদিগকে অভিবাদন করিতেছে।

কি কি পাপ কার্য্য দেখাইয়া বৈদেশিকগণ ঝিন্দনকে কলঙ্কিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার কোনও উল্লেখ করিব না। ঝিন্দন ধীরে ধীরে যখন রাজাধিরাজ রণজিৎ সিংহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, ধীরে ধীরে যখন রণজিতের সহধর্ম্মিণীরূপে পরিগৃহীত হইয়া আপনার ভবিষ্য ক্ষমতার অঙ্কপাত করেন, এবং ধীরে ধীরে যখন কোহিনুরের কান্তিতে বিভাসিত হইয়া লাহোরের দরবারে রাজনীতির পর্য্যালোচনা করেন, বৈদেশিকের নেত্রে তখন তাঁহার যেরূপ পাপীয়সী মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, সে মূর্ত্তি ধ্যান করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইহার পর ঝিন্দন যখন স্বীয় নিয়তিনেমির বহুবিধ আবর্ত্তনের পর কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়া বারিধি বেষ্টিত অপরিচিত ও অজ্ঞাতস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, এবং এই স্থানে যখন অদৃষ্টলিপি তাঁহার জীবনস্রোতঃ কালের অনন্ত স্রোতে মিশাইয়া দেয়, তখনও ঝিন্দনকে দয়ার চক্ষে নিরীক্ষণ করা হয় নাই। অধিক কি, অদ্য যে পুরুষসিংহ ইংলণ্ডে থাকিয়া সকলের নিকট আদর ও প্রীতি পাইতেছেন, ভারতের ললাটমণি রাজরাজেশ্বরী বিক্টোরিয়া যাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মানিত করিতেছেন, কলঙ্কিনী ঝিন্দনের সন্তান বলিয়া তিনিও কলঙ্কী হইয়া ইতিহাসের পত্রে পত্রে লীলামর্কটের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। এই সমস্ত কলঙ্কের কাহিনী শুনিলেও কর্ণে হস্তার্পণ করিতে হয়। বৈদেশিকগণ এই পাপ, এই কলঙ্ক, এত স্তূপে স্তূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন যে, ভারত মহাসাগর শতবর্ষ পরিশ্রম ক-

...রিয়াও ইহা প্রক্ষালিত করিতে পারিবে না, হিমালয় স্বীয় গগণস্পর্শী শৃঙ্গাবলী পাতিত করিয়াও ইহা ধূলি রাশিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে না।

আমরা ঝিন্দনকে চিরকাল দয়ার চক্ষেই দেখিব; কুঠোর আঘাতে কঠোর প্রহারে যে অবলার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে তাহাকে আবার পদাঘাত করা ...ধে মহাপাপ, চিরকাল ইহা আমরা মনে রাখিব। অবলা চিরদিনই প্রীতির পুত্তলী। অবলা চিরদিনই দয়ার পাত্র। ইহার পর যখন দেখিতেছি, বহুলোকে বহুদিক্ হইতে একটি অবলাকে ধরিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব তাড়না করিতেছে, অবাচ্য ভৎসনার সুতীক্ষ্ণ বাণে তাহার হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করিতেছে, এবং মৃত হইলেও নিরস্ত না হইয়া অকথ্য কলঙ্কের মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার পরলোকগত আত্মার তর্পণ করিতেছে; তখন কে কোন্ প্রাণে সেই অবলার মৃতদেহে আঘাত দিতে সমুদ্যত হয়? কে কোন্ প্রাণে তাঁহার শত্রুদের উদ্ঘোষিত নিন্দাবাদের পুনরুদ্ঘোষণা করে? এই জন্যই আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলিতেছি, বৈদেশিক সমালোচকগণ ঝিন্দনের চরিত্রে যে যে কলঙ্কের আরোপ করিয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া লেখনীকে কলঙ্কিত করিব না। এস্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ঝিন্দনের প্রতি যে যে দোষ আরোপিত হইয়াছে, যদি তৎসমুদয় সত্য হয়, তাহা হইলে প্রকাশ করায় দোষ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে, লোকে ঝিন্দনকে যে যে কলঙ্কে কলঙ্কিনী বলিতেছে, সে সকল প্রকৃত ঘটনার উপর স্থাপিত কি না তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। এই মীমাংসা একবারে অসাধ্য নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল বিষয় উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা দৃঢ়তর হয় নাই। সুতরাং তাহার উপর সহজে বিশ্বাস স্থাপিত হইতে পারে না। এদিকে ঝিন্দনের যে অনন্যসাধারণ প্রভাব ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ঘটনাবলীর এইরূপ অসম্পূর্ণতায় একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিপক্ষ সম্প্রদায় কেবল বিষম অন্তর্দ্দাহে অধীর হইয়া ঝিন্দনকে সাধারণের নিকট অপদস্থ করিয়াছেন। সুতরাং আরোপিত দোষ প্রকাশ করিয়া ফল কি? হইতে পারে ঝিন্দন অবলাসুলভ কমনীয়তার বশীভূত হইয়া একজনের প্রতি অধিক অনুগ্রহ দেখাইতেন, অথবা একজনকে অধিক ভাল বাসিতেন; ন্যায়ের অনুরোধে আমরা ইহা অবশ্যই স্বীকার করি যে, পঞ্চনদের অধিশ্বরীর এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দোষের মধ্যে গণনীয়। ইহার জন্য ঝিন্দনকে অপরাধিনী বলিতে আমরা সঙ্কুচিত নহি। কিন্তু "অপরাধিনী" বলিবার পূর্ব্বে একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিব। অনুগ্রহ প্রদর্শন ও ভালবাসা অবলাহৃদয়ের অনিবার্য্য ধর্ম্ম। ঝিন্দন অবলাহৃদয়ের

অধিকারিণী হওয়াতেই এই অবলাপ্র-কাশ করিয়াছেন। বিচারক জগৎ ইহাতেও তাঁহাকে মার্জ্জনা করিল না। যাঁহারা জগতের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিকাশ করেন, তাহাদের হৃদয়ের প্রতি স্তর এইরূপ কঠোরভাবেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

ঝিন্দনের অন্য শত অপরাধ থাকুক, কিন্তু তিনি পঞ্জাবে আপনার প্রভুত্ব যেরূপ বিস্তার করিয়া সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম ইতিহাসের স্তুতিগীতিতে অনন্তকাল বিঘোষিত হইবে। ঝিন্দন যখন পঞ্জাবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, যখন আপনার অপূর্ব্ব প্রভাব ও অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত পঞ্চনদ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার লোকাতীত তেজোমহিমার নিকট মস্তক অবনত করিল। দরবারের অমাত্যগণ তখন তাঁহাকে তেজস্বী রণজিৎ সিংহের উপযুক্ত তেজস্বিনী মহিষী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে লাগিল, এবং রাজ্যের প্রজাগণ তখন তাঁহাকে রক্ষাকর্ত্রী মাতা বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণে আমরা ঝিন্দনের এই তেজস্বিতা এবং প্রজাসাধারণের এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিষয় কিছু কিছু বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

দলীপ সিংহ যখন পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন হইতেই ঝিন্দনের ক্ষমতার বিকাশ হইতে থাকে। ঝিন্দন এত দিন খনির অন্ধকারময় গর্ভে থাকিয়া আপনার প্রভায় আপনিই দীপ্তি পাইতেছিলেন, এক্ষণে খনির গর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সেই দীপ্তি বিস্তার করিতে লাগিলেন। রণজিৎ সিংহের পরলোক প্রাপ্তির পর পঞ্জাব রাজ্য যেরূপ অন্তর্বিদ্রোহের ভয়াবহ তরঙ্গে আন্দোলিত হয়, তাহা ইতিহাস পাঠকগণ সবিশেষ অবগত আছেন। দলীপ সিংহ এই সময়ে নাবালক; সুতরাং রাজ্যসংক্রান্ত কোন কার্য্যেই তাঁহার হাত ছিল না। ঝিন্দন এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে লাহোরের সিংহাসনে সমাসীন হইয়া রাজ্যের সুব্যবস্থা করিতে যত্ন করেন। তিনি প্রতিদিনই নিয়মিত সময়ে দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, এবং প্রতি দিনই স্বীয় শিশু পুত্রের রাজ্য নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব করিবার জন্য রাজনীতির গূঢ়তম মর্ম্ম উদ্ভেদ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেন। যে দুই প্রতীপপ্রবাহ পরস্পরের আঘাতে প্রতিঘাতে হিংসাপরায়ণ হইয়া বেলাভূমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল; ঝিন্দনের প্রভাবে তাহারা একস্রোতে মিশিয়া শান্তভাবে প্রবাহিত হয়। যাহারা দীর্ঘকাল কেশাকেশি, মুষ্টামুষ্টি, শোণিতস্রাবে অধীর হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে পরস্পরে পরস্পরকে রোষকষায়িত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দর্পের স্পর্দ্ধা করিতেছিল, ঝিন্দনের প্রভাবে তাহারা একহাড়, এক

প্রাণ হইয়া পরস্পরকে প্রীতিভাবে আলিঙ্গন করে। যাঁহার হৃদয় এইরূপ তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ, যাঁহার মন এইরূপ উচ্চতর গ্রামে আরূঢ়, সে কখন অসার বা অপদার্থ হইতে পারে না।

যখন ঝিন্দন পঞ্জাবের শীর্ষস্থানে বর্ত্তমান, রাজা লাল সিংহ তখন উজীরের পদে আরূঢ়। লাল সিংহের কোনও অমাত্যোচিত গুণ ছিল না। পঞ্জাবের সকলেই তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিত। লাল সিংহ পঞ্জাবে থাকিয়া উচ্চতম সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সৌভাগ্যে তাঁহার কোনও গুণ বিকাশ পায় নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্য কেবল দেহ-যষ্টিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, উহা আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে উপগত হইয়া চিত্তের উদারতা সাধন করে নাই; সুশাসনক্ষমতা কেবল অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠেই সীমাবদ্ধ ছিল, উহা বহিঃপ্রদেশে প্রসারিত হইয়া রাজ্যের উন্নতি সাধন করে নাই; রণনিপুণতা কেবল তোষামোদ-প্রিয় কুপোষ্য সম্প্রদায়ের সমক্ষেই প্রকাশিত হইত, উহা রণস্থলে প্রদর্শিত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দেয় নাই। ফলে লালসিংহ শিখসমাজে ধূমকেতু স্বরূপ ছিলেন। ঝিন্দন এই ধূমকেতুর প্রতি কিছুমাত্র বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই! প্রত্যুত, নানা প্রকারে উহার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। ঝিন্দনের চরিত্রের এই অংশ নিতান্ত ক্ষীণ ও নিতান্ত দুর্ব্বল। এই ক্ষীণতা ও এই দুর্ব্বলতা ঝিন্দনের অবলাপ্রকৃতির দোষ। ঝিন্দন লাল সিংহের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতেন এবং তাঁহাকে সাধারণ লোক অপেক্ষা একটুকু অধিক ভাল বাসিতেন; সুতরাং অনুগ্রহ ও ভালবাসার পাত্রের দোষ ঝিন্দনের চক্ষে দোষ বলিয়াই পরিগণিত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি, ঝিন্দনের এই দোষ অবলাহৃদয়ের দোষ বলিয়াই আমরা চিরকাল দয়ার চক্ষেই দেখিব।

রণজিতের মৃত্যুর পর খালসা সৈন্যের বিশৃঙ্খলা ও যথেচ্ছাচারিতা দেখিয়া ইংরেজগণ আপনাদিগের সীমান্তপ্রদেশ (Frontier) রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত করিলেন। এজন্য বহুসংখ্যক সৈন্য ব্রিটীষ রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইল। ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের এই উদ্যোগ দর্শনে খালসাদিগের হৃদয় নানাপ্রকার আশঙ্কিত তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। ঝিন্দনও এই তরঙ্গের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না। ঝিন্দন যখন পঞ্জাবে আধিপত্য করিতেছিলেন, তখন সীমান্ত ভাগে ইংরেজদিগের সৈন্য-শৃঙ্খলা দেখিয়া ভাবিলেন, ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট আপনাদের সীমায় যেরূপ আট ঘাট বাঁধিতেছেন, তাহাতে হঠাৎ পঞ্জাবরাজ্য আক্রান্ত হইতে পারে। পূর্ব্ব-স্মৃতি আসিয়া তাঁহার এই ভাবনার সহায় হইল। ঝিন্দন আবার ভাবিলেন, ইংরেজগণ এইরূপ কৌশলেই ভারতে আপনাদের রাজ্য প্রসারিত ক-

রিয়াছে ; এইরূপ কৌশলেই স্বাধীন রাজ্য সমূহে পরাধীনতার দুর্ব্বহ লৌহ নিগড় পরাইয়া দিয়াছে। এই কৌশলের বলেই দক্ষিণে মহারাষ্ট্র দীর্ঘকাল হস্ত সঞ্চালন, পাদসন্তাড়ন ও শোণিত মোক্ষণের পর, কালের বিকট শ্মশানে শয়ন করিয়াছে, এবং এই কৌশলের বলেই মধ্যে মুসলমান যোগরত তপস্বীর ন্যায় ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া আপনার পূর্ব্ব গৌরবের ধ্যান করিতেছে। এইরূপ ভাবনায় অধীর হওয়াতেই ঝিন্দন প্রথম শিখ যুদ্ধানলের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। যে আশঙ্কায় খালসাগণ মদমত্ত বারণের ন্যায় শতদ্রু পার হইয়া ব্রিটীষ রাজ্য আক্রমণ করিল, সেই আশঙ্কায়ই ঝিন্দন তাহাদিগকে নিরস্ত না করিয়া উৎসাহিত করিলেন। ইহাতে ঝিন্দনের যে বিশেষ সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিব না। ঝিন্দন এবিষয়ে যদি তাঁহার পতির অবলম্বিত নীতি অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার সম্মান রক্ষা পাইত।

লালসিংহও তেজসিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথম শিখ যুদ্ধে খালসাদিগের পরাজয় হইল। ঝিন্দন এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একপ্রকার ব্রিটীষ-সিংহের করায়ত্ত হইলেন। সুতরাং প্রথম শিখযুদ্ধের পরই ঝিন্দনের অদৃষ্ট-চক্র এক এক গ্রাম নিম্নে যাইতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বিনী ঝিন্দনের তেজস্বি হৃদয় ব্রিটীষ সিংহের দুর্নিবার তেজের নিকট পরাভূত হইল না। ঝিন্দন অটল পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইয়া রহিলেন। তাঁহার রাজ্য পরপদানত হইয়াছে, পরজাতি সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তাঁহার রাজ্যে আসিয়া আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে, ইহা তাঁহার অসহনীয় হইল। বিদেশীর এই আস্পর্দ্ধা, এই অনধিকারপ্রিয়তায় ঝিন্দন মর্ম্মে আঘাত পাইলেন। কামিনীর কোমল হৃদয় অপমান-বিষে কালীময় হইয়া উঠিল।

রেসিডেণ্ট্ (হেনূরী লরেন্স্) ঝিন্দনের প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেন। এরূপ তেজস্বিনী নারী লাহোরে থাকিলে যে আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিবে না, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। এই বিশ্বাসেই রেসিডেণ্ট্ ঝিন্দনকে লাহোর হইতে সেখপুরে নির্ব্বাসিত করিলেন। সেখপুরও দীর্ঘকাল ঝিন্দনের লাবণ্য তরঙ্গে তরঙ্গায়িত রহিল না। পরবর্ত্তী রেসিডেণ্টের (ফেডরিক কারি) মন্ত্রণায় ঝিন্দন সেখপুর হইতে আবার বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইলেন। এইরূপ উপর্য্যুপরি নির্ব্বাসনে ঝিন্দনের কিছুমাত্র বিকার পরিলক্ষিত হইল না। প্রকৃত বীরজায়া ও বীরনারীর ন্যায়, ঝিন্দন অটল ভাবে অবিকার চিত্তে স্বীয় দশা-বিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন করিয়া পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ঝিন্দন এক সময়ে যে লাহোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া

চারিদিকে আপনার গৌরব বিকাশ করিয়াছিলেন, যে লাহোরের অমাত্য-সমিতি এক সময়ে ঝিন্দনের অপ্রতিহত প্রভুশক্তির নিকট অবনতমস্তক ছিলেন; সেই লাহোর পরিত্যাগ সময়ে ঝিন্দনের যেরূপ স্থিরতা দৃষ্ট হইয়াছিল, পঞ্জাব পরিত্যাগ সময়েও সেইরূপ স্থিরতার কিছুমাত্র হানি হইল না। যে পঞ্জাব এতকাল তাঁহাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় পূজা করিয়া আসিয়াছিল, এক্ষণে সেই পঞ্জাব তাঁহার নেত্র বিনোদনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। স্থির হৃদয়ে ঝিন্দন পঞ্জাব পরিত্যাগ করিলেন। বৈদেশিকের নিকট ঝিন্দনের চরিত্রগতি যতই নিম্নগামিনী বলিয়া বোধ হউক না কেন, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া ঝিন্দনের চিত্র যতই কালিমায় পরিনত হউক না কেন, ঝিন্দন এই স্থিরতার জন্য নারী সমাজে গরীয়সী বলিয়া পরিগণিতা হইবেন।

এই নির্ব্বাসন-ঘটনাই ঝিন্দনের সৌভাগ্য-অভিনয়ের যবনিকা পতন। এই যবনিকা-পতনের অব্যবহিত পরে পঞ্জাবে যে ভয়াবহকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়; ঝিন্দনের নির্ব্বাসনই তাহার অন্যতম কারণ। এই ভয়াবহকাণ্ড দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শিখদিগের স্বাধীনতা-ইতিহাসের শেষ অধ্যায়; এবং দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শিখদিগের সৌভাগ্য-নেমির শেষ আবর্ত্ত। সাগরের দুটী উত্তুঙ্গ জলোচ্ছ্বাস যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে প্রলয়ের ধ্বজা স্বরূপ আসিয়া পরস্পরের সংঘর্ষে ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত করে, এবং বহুক্ষণ ঘাত প্রতিঘাতের পর ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া অনন্ত বারিরাশির সহিত মিশিয়া যায়, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধেও সেইরূপ দুটী প্রবল জাতি বিশ্বত্রাস গর্জ্জনে বিভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়া বহুক্ষণ হস্তাহস্তির পর এক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ রণজিৎরাজ্যে করাল প্রলয়-কাদম্বিনী। ইহার হৃৎকম্পকারী জল-প্রবাহে শিখদিগের প্রভুত্ব মহত্ত্ব সমস্তই বিধৌত হইয়া গিয়াছে। রণজিৎ সিংহ ইষ্টকের উপর ইষ্টক গ্রথিত করিয়া যে মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধের প্রবল বাত্যাতেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অপর দিকে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ শিখ দিগের বীর্য্যবহ্নির অসাধারণ বিস্ফুরণকারী। গুরুগোবিন্দ সিংহ যে ফল লক্ষ্য করিয়া শিখদিগকে সাধারণ তন্ত্রসমাজে একত্রিত করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধেই তাহা পরিপাক হয়। যে চিনিয়ানওয়ালার নাম ভারত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, যে চিনিয়ানওয়ালার জন্য ভারতবর্ষ বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়া প্রাণগত শ্রদ্ধার পূজা পাইয়া আসিতেছে; যে চিনিয়ান ওয়ালায় শিখদিগের দুর্দ্দমনীয় তেজের নিকট ওয়াটার্লুজয়ি ব্রিটীষ তেজও পরাভব মানিয়াছে; দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধেই সেই চিনিয়ান ওয়ালা পুণ্য-পুঞ্জময় মহাতীর্থ হইয়া সক-

লের রসনায় রসনায় লীলা করিতে থাকে। বৈদেশিকের লিখিত ইতিহাস যাহাই বলুক না কেন, আমরা অসঙ্কুচিত হৃদয়ে ঝিন্দনের নির্ব্বাসনকেই এই প্রলয়-ঘটনার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। অনেকে বলিতে পারেন, ঝিন্দনের নির্ব্বাসনের সময় পঞ্জাবে বিপাকের কোন ও চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। কেহই অশ্রুপাত, হাহাকার, শিরে করাঘাত করিয়া এই নির্ব্বাসন-সম্বাদ চারিদিকে ঘুষিয়া বেড়ায় নাই। পঞ্জাব নিবাত, নিষ্কম্প সমুদ্রের ন্যায় ধীর ভাবে ঝিন্দনের নির্ব্বাসন চাহিয়া দেখিয়াছে; সুতরাং ঝিন্দনের নির্ব্বাসনকে শিখজাতির সমুত্থান ও তন্নিবন্ধন যুদ্ধ-সঙ্ঘটনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। যাহারা এইরূপ বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের সম্মান নষ্ট করিতে চাহেন, তাহারা মানব প্রকৃতির তত্ত্বানভিজ্ঞ। আমরা শত হস্ত দূর হইতে তাহাদিগকে অভিবাদন করি। তাহারা যাহাকে আহ্লাদের চিহ্ন মনে করেন, আমরা তাহাকেই বিষম-মর্ম্ম-পীড়ার বিষম দাহন মনে করি; এবং তাহারা যাহাতে সুখ ও শান্তি দেখিয়া সুখী হয়েন, আমরা তাহাতেই গভীর আতঙ্ক ও গভীর মনোবেদনা দেখিয়া দুঃখিত হই।

যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে না; তাহা সামান্য বাহ্য বিকারের সহিতই নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই দুঃখ দুখের অভিনয় প্রদর্শন মাত্র। যখন দেখি, কেহ দুঃখে অধীর হইয়া দুই হস্তে মস্তকের কেশউৎপাটন করিতেছে, হাহাকারে রোদন করিয়া চারিদিকে জনতা বৃদ্ধি করিতেছে, তখন সদয় ভাবে তাহাকে দুঃখের অভিনয়কারী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিব; কিন্তু যখন দেখিব, কেহ কোন ঘোরতর আকস্মিক বিপৎপাতে ম্রিয়মান হইয়া অবীচিবিক্ষোভিত সাগরের ন্যায় ধীর ভাবে বসিয়া আছে, মস্তকের এক গাছি কেশও নড়িতেছে না, এক বিন্দু অশ্রুও নেত্র হইতে বিচ্যুত হইতেছে না; হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন ধস্. ধস্. করিতেছে, কোন বাহ্য ভঙ্গীর সহিত তাহার তাপ বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে না; পরমাত্মসংযত, ধ্যানস্তিমিতনেত্র যোগীর ন্যায় নিঃশব্দ ও নিস্পন্দ ভাবে সে আপনার জ্বালায় আপনিই পুড়িয়া মরিতেছে; তখন তাহাকে কাতর ভাবে দুঃখের জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়াই উল্লেখ করিব। "অল্প দুঃখ নেত্র বারির সহিতই বিগলিত হয়; অল্প ক্রোধ ভ্রূকুঞ্চন ও দন্ত ঘর্ষণের সহিতই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; অল্প আশঙ্কা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিতই বিলয় পায়।" কিন্তু যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রসারিত হয়, যে ক্রোধ শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে, যে আশঙ্কা মর্ম্মে মর্ম্মে বদ্ধমূল হইয়া অন্তঃকরণকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করিতে থাকে, তাহা কখন ও অশ্রুজল, ভ্রূকুঞ্চনা ও দীর্ঘ

নিঃশ্বাসের সহিত বিলীন হয় না। ঝিন্দনের নির্ব্বাসন সময়ে পঞ্জাবের যে নিশ্চল ভাব লক্ষিত হইয়াছিল,তাহা এইরূপ দুঃখ, ক্রোধ ও আশঙ্কা-মূলক। পঞ্জাবের এই নিস্তব্ধতা শান্তির নিস্তব্ধতা নহে; ইহা গভীর দুঃখ, গভীর ক্রোধ ও গভীর আশঙ্কার নিস্তব্ধতা। এই দুঃখ, ক্রোধ ও আশঙ্কায় দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। গুরু গোবিন্দ সিংহের মহিমা-বলে পঞ্জাবের অন্তর্নিগূঢ় তুষানল এই যুদ্ধের সময়েই প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইয়া বিষম স্ফুলিঙ্গক্রীড়া প্রদর্শন করে। যে বীর শ্রেষ্ঠ চিনিয়ান ওয়ালায় বিজয় বৈজয়ন্তীতে পরিশোভিত হইয়াছিলেন; যুদ্ধের সময় যাঁহার হস্তে সেনানায়কতা সংরক্ষিত ছিল, সেই পুরুষ-পুঙ্গব সের সিংহও ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে মর্ম্মাহত হইয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, "ইহা সকলেই ভালরূপে জানিতে পারিয়াছেন, সমস্ত পঞ্জাববাসী, সমস্ত শিখ, সংক্ষেপতঃ সমস্ত পৃথিবীর বিদিত হইয়াছে, ফিরিঙ্গিগণ কিরূপ দৌরাত্ম্য, অত্যাচার ও বিশ্বাস-ঘাতকতাসহকারে পরলোক-সুখ-ভোগী রণজিৎ সিংহের বিধবা মহিষীর সহিত ব্যবহার করিয়াছে, এবং কিরূপ দৌরাত্ম্যে এই রাজ্যের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রথমতঃ তাহারা সমস্ত প্রজার মাতা স্বরূপ মহারাণীকে কারারুদ্ধ ও হিন্দুস্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া সন্ধিভঙ্গ করিতে ত্রুটী করে নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের দৌরাত্ম্যে শিখগণ এতদূর নিপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং তৃতীয়তঃ, আমাদের রাজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা গৌরব শূন্য হইয়া পড়িয়াছে *।" ইহাতে ও কি বলিব ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে পঞ্জাব দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয় নাই? ইহাতে ও কি বলিব, পঞ্জাব নিরুদ্বেগে ঝিন্দনের নির্ব্বাসন চাহিয়া দেখিয়াছে?

কিন্তু ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে কেন পঞ্জাব এইরূপ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইল? কেন পঞ্জাবের প্রতি রোমকূপে ক্রোধের অনলকণা প্রবিষ্ট হইল? কেন পঞ্জাবের শিরায় শিরায় তীব্র বিষ প্রসারিত হইল? ইহার একই উত্তর, ঝিন্দনের প্রতি পঞ্জাবের আন্তরিক ভক্তি, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভালবাসা। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্রের শোচনীয় দশা কখনই শান্তভাবে নিরীক্ষণ করা যায় না। পঞ্জাব যাঁহাকে পরম দেবতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, মাতার ন্যায় সরল হৃদয়ে ভাল বাসিত, তাঁহার নির্ব্বাসনে যে পঞ্জাবের হৃদয় উগ্র হলাহলে কালীময় হইয়া উঠিবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। এক্ষণে এরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভাল বাসার পাত্রকে আমরা কোন্ প্রাণে পাপীয়সী ও কলঙ্কিনী বলিয়া ঘৃণা করিব? কোন প্রাণে

* সের সিংহের এই উক্তির জন্য প্রবন্ধলেখক দায়ী নহেন।

এরূপ উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে কলঙ্কের পঙ্ক লেপিয়া হৃদয় অপবিত্র করিব? যাঁহারা এরূপ পবিত্র ভাবে দেখিয়াও ঝিন্দনকে পাপীয়সী ও কলঙ্কিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা মানব জাতির শত্রু। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া পবিত্র ভক্তির অবমাননা করেন, পবিত্র শ্রদ্ধার মুণ্ডচ্ছেদ করেন, এবং পবিত্র ভালবাসার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন ও সহানুভূতি নাই।

এই ঔজ্জ্বল্যেই ঝিন্দন বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে সমস্ত ভারতবর্ষ বিভাসিত করিয়াছিলেন; এই ঔজ্জ্বল্যেই ঝিন্দনের সমস্ত ক্ষীণতা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, এবং এই ঔজ্জ্বল্যেই আমরা ঝিন্দনের এতদূর পক্ষপাতী হইয়াছি। ঝিন্দন তেজস্বিনী নারীর অদ্বিতীয় দৃষ্টান্তভূমি। তিনি লাবণ্যলীলাময়ী ললনা হইয়াও, দৃঢ়তা ও অটলতার আস্পদ ছিলেন, কোমলতাময় অঙ্গনা হৃদয়ের অধীকারিণী হইয়াও, ধীরতার অবলম্বন ছিলেন, এবং কমনীয় কান্তির আধার হইয়াও ভীম-গুণান্বিত তেজস্বিতার পরিপোষক ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোনও নারী এরূপ হঠাৎ সমুত্থিত হইয়া একটী প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সহিত এরূপ তেজস্বিতা ও শাসন ক্ষমতার স্পর্দ্ধা করে নাই। আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, ঝিন্দনের তরলা প্রকৃতিতে অনেক খুঁত থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে যে সকল অলৌকি-সামান্য গুণ আছে, তাহার জন্য ঝিন্দনকে আদর না করা কাপুরুষতার কর্ম্ম। কবে কখন ক্লিওপেট্রা আপনার সম্মোহন রূপ-সাগরে সকলকে ডুবাইয়া প্রেমের খেলা খেলিয়াছেন, কবে কখন কুইন মেরী হৃদয়ের গরল ঢালিয়া আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন; ঝিন্দনের একটী খুত দেখিয়াই তাঁহার চরিত্রে সেই ক্লিওপেট্রা বা কুইন মেরীর কলঙ্ক লেপন করা প্রকৃত সামাজিকতার লক্ষণ নহে। দোষকে সকল স্থলেই দোষ বলিয়া ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করা উচিত, এবং গুণকে সকল স্থলেই গুণ বলিয়া আদরের সহিত গ্রহণ করা উচিত। কোনও বিশ্বশত্রু পাষণ্ডের কোনও অলোকসাধারণ গুণ দেখিলে তাহার পাষণ্ডত্ব ক্ষণ কাল বিস্মৃত হইয়া তাহার লোকাতীত গুণের পূজা করা কর্ত্তব্য। যখন দেখিতেছি, এক জন নির্দ্দয় দস্যু একদিকে মূর্ত্তিমান পাপের ন্যায় সকলের হৃদয়-বৃন্ত ছিন্ন করিয়া সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠন করিতেছে; অপর দিকে অপরিসীম, ও অনবদ্য ভক্তির সহিত মাতার পদসেবা করিতেছে; এবং অপরিসীম ও অনবদ্য প্রেমের সহিত বনিতার মনোরঞ্জন করিতেছে; তখন তাহার মাতৃভক্তি ও দাম্পত্য-প্রেমের নিকট সহজেই মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। যখন দেখিতেছি, একজন নিষ্ঠুর দুরাশয় এক সময়ে একজন নির্দ্দোষ নিরীহের উপর অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আপনার দুরাশয়তা চরিতার্থ করিয়াছে, পরক্ষণেই আ-

বার পবিত্র ভাবে সংযত চিত্তে স্নান করিয়া আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে স্বীয় অশ্রুজল ভাগীরথীর জল প্রবাহের সহিত মিশাইয়া উর্দ্ধনেত্রে নিষ্পন্দ ভাবে পরম দেবতার আরাধনা করিতেছে; তখন আপনা হইতেই তাহার দেবভক্তির পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ নীচাশয় নিষ্ঠুরগণও যখন সময় বিশেষে হৃদয়ের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, তখন ঝিন্দন এক জনের প্রতি একটুকু অধিক মাত্রায় অনুগ্রহ দেখাইতেন অথবা একজনকে একটুকু অধিক মাত্রায় ভাল বাসিতেন বলিয়াই যে তিনি শ্রদ্ধা ও প্রীতির অপাত্র হইবেন,হৃদয় থাকিতে আমরা ইহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

আমরা ঝিন্দনকে আজীবন শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিতই দেখিব; আজীবন ঝিন্দনের চরিত্র শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিতই স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিব। আমরা কখনও অপরের আরোপিত কলঙ্কের কথায় সায় দিয়া হৃদয়কে কলঙ্কিত করিব না। বৈদেশিক গণ যেরূপ জঘন্য ভাবে ঝিন্দনের চরিত্র আঁকিয়াছেন, যেরূপ জঘন্য ভাবে অসহায় ভারতের একটী অসহায় ললনার উপর কলঙ্কের কালীমাবর্ষণ করিয়াছেন, আমরা চিরকাল তাহার জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিব; এবং চিরকাল ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত সেই জঘন্য চিত্রের প্রতি তাচ্ছীল্য দেখাইব।

জীবন প্রভাত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শিবজী।

"অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি[illegible]কলেবর ?
অসুর পদাঙ্করজঃ; শো[illegible] মস্তকে ?
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমরবীর্য্য সমরের স্রোতে,
ভাসিব অনন্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে,
দেবরক্ত যতদিন না হবে নিঃশেষ।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখা যাইতেছে, এমন সময় ব্রাহ্মণবেশধারী শিবজী সিংহগড় প্রবেশ করিলেন। উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, উষ্ণীষ ও তুলার কুর্ত্তি ফেলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালের আলোকে মস্তকের লৌহ শিরস্ত্রাণ ও শরীরের বর্ম্ম ঝকমক করিয়া উঠিল। বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কোষে 'ভবানী' নামক প্রসিদ্ধ খড়্গ। হস্তদ্বয় দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, শরীর ঈষৎ খর্ব্ব বটে, কিন্তু সুবদ্ধ; সুদৃঢ়বন্ধনী ও পেশীগুলি বর্ম্মের নীচ হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পেশওয়া মুরে-

শ্বর ত্রিমূল পিঙ্গলী সানন্দে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

'ভবানীর জয় হউক! আপনি এতক্ষণ পরে কুশলে ফিরিয়া আসিলেন।'

শিব। 'আপনার আশীর্ব্বাদে কোন্ বিপদ্ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি?'

মুর। 'সমস্ত স্থির হইয়াছে?'

শিব। 'সমস্ত।'

মুর। 'অদ্যরাত্রি বিবাহ?'

শিব। 'অদ্যই।'

মুর। 'শায়েস্তাখাঁ কিছু জানেন না? তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাঁদখাঁ কিছু জানে না?'

শিব। 'শায়েস্তাখাঁ ভীত শিবজীর নিকট সন্ধি প্রার্থনা প্রতীক্ষা করিতেছেন; যোদ্ধা চাঁদখাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, আর যুদ্ধ করিবেন না।' শিবজী সবিশেষ বিবরণ বলিলেন।

মুর। 'যশোবন্ত?'

শিব। 'আপনি পত্রে যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছিল; আমি যাইয়াই দেখিলাম তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং অনায়াসেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইল।'

মুর। 'ভবানীর জয় হউক! উঃ আপনি এক রাত্রিতে একাকী যে কার্য্যসাধন করিলেন তাহা সহস্রের অসাধ্য। যে অসমসাহসী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ভাবিলে এক্ষণও হৃৎকম্প হয়। শিবজী! শিবজী! এরূপ কার্য্যে আর প্রবৃত্ত হইবেন না, আপনার অমঙ্গল হইলে মহারাষ্ট্রের কি থাকিবে?

শিবজী গম্ভীর ভাবে বলিলেন 'মুরেশ্বর! বিপদে ভয় করিলে অদ্যাবধি জাগীরদার মাত্র থাকিতাম, বিপদে ভয় করিলে এ মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে সাধন হইবে? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী করুন যেন মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হয়।'

মুর। 'বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার জয় অনিবার্য্য, স্বয়ং ভবানী সহায়তা করিবেন। কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে, শত্রুশিবিরে, একাকী ছদ্মবেশে? অঙ্গীকার করুন এরূপ আচরণ করিবেন না, আপনার কি বিশ্বস্ত অনুচর নাই?'

শিবজী দেখিলেন বিশ্বস্ত পেশওয়ার নয়নে একবিন্দু জল। হাস্য করিয়া বলিলেন,—'অদ্য সত্যই একটী মহা বিপদে পতিত হইয়াছিলাম।'

মুর। 'কি?'

শিব। 'এমন মূর্খকেও আপনি সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন। আপন নাম স্বাক্ষর [illegible] পারে না, সে সংস্কৃত স্মরণ রা[illegible]

মুর। '[illegible]কেন, কি হইয়াছিল?'

শিব। 'আর কিছু নহে, শায়েস্তাখাঁর সভায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় সমস্ত শ্লোকগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলেন!'

মুর। 'তাহার পর?'

শিব। 'দুই একটী মনে ছিল, তদ্দ্বা

রাই কার্য্য সিদ্ধ হইল।' সহাস্য বদনে শিবজী শয়নাগারে গেলেন।

শিবজীর সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়; এই স্থলে তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমরা কিছু বলিতে চাই; ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এইটী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।

শিবজী ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, স্থতরাং আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর ছিল। তাঁহার ...র নাম শাহজী ও পিতামহের নাম ...ী-ভন্‌স্লে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে ফু... দেশের দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিম্বলকর ...র কথা বলিয়াছি; সেই বংশের ...পাল রাও নায়েকের ভগ্নী দীপা...ক মল্লজী বিবাহ করিয়াছিলেন। অ... দিন অবধি সন্তানাদি না হওয়ায়, ...মদনগরনিবাসী শাহশরীফ নামক ...চন মুসলমানপীরের নিকট মল্লজী ...ক অনুরোধ করেন, এবং পীরও মল্ল... সন্তানার্থে প্রার্থনাদি করেন। তাহা... কিছু পরে দীপাবাইয়ের গর্ভে একটী ...ন হওয়াতে মল্লজী সেই পীরের না... নামে পুত্রের নাম শাহজী রাখিলেন। আহম্মদনগরের প্রসিদ্ধনামা লক্ষজী ... রাওয়ের নাম প্রথম অধ্যায়েই উ... হইয়াছে। ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে হুলির মল্লজী আপন সন্তান শাহজীকে ল... যাদব রাওয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। ...জীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র, যাদব রাওয়ের কন্যা জীজীর বয়স তিন কি চারি বৎসর, স্থতরাং বালক বালিকা বড় আনন্দে একত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যাদব রাও সন্তুষ্ট হইয়া আপন কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন 'কেমন, তুই এই বালকটীকে বিবাহ করিবি?' পরে অন্যান্য লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'দুই জনে কি সুন্দর জোড় মিলিয়াছে!' এই সময়েই শাহজী ও জীজী পরস্পরের দিকে ফাগ নিক্ষেপ করায় সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু মল্লজী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন 'বন্ধুগণ! সাক্ষী থাকিও, যাদব রাও আমার বৈবাহিক হইবেন, অদ্য প্রতিশ্রুত হইলেন।' সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। যাদবরাও উচ্চ বংশজ, শাহজীর সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিতে কখনই বাসনা করেন নাই; কিন্তু মল্লজীর এই চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

পর দিন যাদব রাও মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক বলিয়া স্বীকার না করিলে মল্লজী যাইবেন না বলিয়া পাঠাইলেন। যাদবরাও সেরূপ স্বীকার করিলেন না, স্থতরাং মল্লজী আসিলেন না। যাদব রাওয়ের গৃহিণী যাদবরাও হইতেও বংশমর্য্যাদার অভিমানিনী। কথিত আছে যে যাদবরাও রহস্য করিয়াও আপন দুহিতার সহিত শাহজীর বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গৃহিণী

তাঁহাকে বিলক্ষণ দুই এক কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন! মল্লজী সরোষে একটি গ্রামে চলিয়া গেলেন ও প্রকাশ করিলেন যে ভবানী সাক্ষাৎ অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে বিপুল অর্থ দিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে ভবানী এই সময়ে মল্লজীকে বলিয়াছিলেন, 'মল্লজী, তোমার বংশে একজন রাজা হইবেন, তিনি শম্ভুর ন্যায় গুণান্বিত হইবেন, মহারাষ্ট্রদেশে ন্যায়বিচার পুনঃ স্থাপন করিবেন, এবং ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের শত্রুদিগকে দূরীভূত করিবেন। তাঁহার সময় হইতে কাল গণনা হইবে ও তাঁহার সন্তানসন্ততি সপ্তবিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন।'

সে যাহা হউক, মল্লজী যে এই সময়ে বিপুল অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। সেই অর্থের দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেন ও এ বিষয়ে তাঁহার শ্যালক যোগপালও তাঁহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। অচিরে মল্লজী আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি হইলেন, 'রাজা ভন্‌স্লে' খেতাব প্রাপ্ত হইলেন, সুবর্ণী ও চাকান দুর্গ ও তৎপার্শ্বস্থ দেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন, ও জায়গীর স্বরূপ পুনা ও সোপানগর পাইলেন। তখন আর যাদবরাওয়ের কোন আপত্তি রহিল না; ১৬০৪ খ্রীঃ অব্দে মহা সমারোহে শাহজীর সহিত জীজীর বিবাহ হইল, ও আহম্মদনগরের সুলতান স্বয়ং সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তখন শাহজীর বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র। কালক্রমে মল্লজীর মৃত্যুর পর শাহজী পৈতৃক জায়গীর ও পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে দিল্লীশ্বর আকবরশাহ আহম্মদনগর রাজ্য দিল্লীর অধীনে আনিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই যুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশৎবর্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। আকবরের পর জাহাঙ্গীর ও তৎপর শাহজিহান আহম্মদনগর জয়ের জন্য প্রয়াস পান; পরে শেষোক্ত সম্রাটের সময় ১৬৩৭ খ্রীঃঅব্দে এই রাজ্য সম্পূর্ণরূপে দিল্লীর অধীনে আইসে ও যুদ্ধ শেষ হয়। এই যুদ্ধকালে শাহজী সুষুপ্ত ছিলেন না। ১৬২০ খ্রীঃ অব্দে (জাহাঙ্গীরের শাসনকালে) তিনি আহম্মদনগরের প্রধান সেনাপতি মালীক অম্বরের অধীনে ছিলেন ও একটি মহাযুদ্ধে আপন সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। নয় বৎসর পর তিনি দিল্লীশ্বর শাহজহাঁর পক্ষাবলম্বন করিলে, উক্ত সম্রাট তাঁহাকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি করিলেন ও অনেক জায়গীর দান করেন। কিন্তু সম্রাটদিগের অনুগ্রহ আজ আছেত কাল থাকে নাই; তিন বৎসর পর শাহজীর কতকগুলি জায়গীর সম্রাট্ কাড়িয়া লইয়া ফতেহখাঁকে দান করেন, তাহাতে শাহজী বিরক্ত হইয়া, সম্রাটের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে বিজয়পুরের সুলতানের

পক্ষ অবলম্বন করিলেন ও আপন মৃত্যু পর্য্যন্ত অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে কখনও বিজয়পুরের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

পতনোন্মুখ আহম্মদনগর রাজ্য নিজ অসাধারণ বাহুবলে দিল্লীর স্বাধীন রাখিবার জন্য শাহজী দিল্লীর সেনার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন। সুলতান শক্রহস্তে পতিত হইলে, শাহজী সেই বংশজ আর একজনকে সুলতান বলিয়া সিংহাসনে আরোপিত করিলেন, কতকগুলি বিজ্ঞব্রাহ্মণের সাহায্যে দেশ শাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহু সংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন, ও সুলতানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট শাহজিহান এই সমস্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজী ও তাঁহার প্রভু বিজয়পুরের সুলতানকে এককালে দমন করিবার জন্য অষ্টচত্বারিংশৎ অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক প্রেরণ করিলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করা বিজয়পুরের সুলতান বা শাহজীর সাধ্য নহে; কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর সন্ধিস্থাপন হইল; আহম্মদনগর রাজ্য বিলুপ্ত হইল (১৬৩৭) এবং শাহজী বিজয়পুরের অধীনে জায়গীরদার ও সেনাপতি রহিলেন। সুলতানের আদেশানুসারে কর্ণাট দেশের অনেক অংশ জয় করিলেন, সুতরাং বিজয়পুরের উত্তরে পুনার নিকট তাঁহার যেরূপ জায়গীর ছিল, দক্ষিণে কর্ণাট দেশেও সেইরূপ বহু জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন।

জীজীবাই দ্বারা শাহজীর শম্ভুজী ও শিবজী নামে দুই পুত্র হয়। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, জীজীর পিতা লক্ষজী যাদবরাও পুরাতন দেবগড়ের হিন্দুরাজার বংশ হইতে অবতীর্ণ, এরূপ জনশ্রুতি আছে। এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভব সন্দেহ নাই। ১৬৩০ খৃঃ অব্দে, শাহজী টুকাবাই নাম্নী আর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন; অভিমানিনী জীজীবাই তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করিলেন ও পুত্র শিবজীকে লইয়া পুনার জায়গীরে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন শাহজী টুকাবাইকে লইয়া কর্ণাটেই থাকিতেন, তথায় তাহার গর্ভে বেনকাজী নামে একটি পুত্র হইল।

শাহজীর দুইজন অতিবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী ছিলেন। দাদাজী কানাইদেব পুনার জায়গীর রক্ষা করিতেন এবং জীজী ও শিশু শিবজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন; নারায়ণপন্ত নামে অন্য কর্ম্মচারী কর্ণাটের জায়গীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে সুবর্ণীদুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। এই দুর্গ পুনা হইতে অনুমান ২৫ ক্রোশ উত্তরে ও জুনীর নামে খ্যাত। শিবজীর তিন বৎসর বয়সের সময় শাহজী টুকাবাইকে বিবাহ করিলেন, সুতরাং জীজীর সহিত বিচ্ছেদ জন্মিল। শাহজী কর্ণাটাভিমুখে যাইলেন, জীজী সপুত্রা পুনায় আসিয়া দাদাজী কানাই

দেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করিতে লাগিলেন।

শিবজীর বাসার্থে দাদাজী পুনানগরে একটি বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে সেই গৃহে শায়েস্তাখাঁকে দেখিয়াছি।

মাতা পুত্রে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, ও বাল্যকালাবধি শিবজী দাদাজীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শিবজী কখনও নাম লিখিতেও শিখেন নাই, কিন্তু অল্প বয়সেই ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার, বর্ষা নিক্ষেপ, নানারূপ মহারাষ্ট্রীয় খড়্গ ও ছুরিকা চালন ও অশ্বারোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় মাত্রেই অশ্বচালনায় তৎপর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিলেন। এইরূপ ব্যায়াম ও যুদ্ধশিক্ষায় বালকের দেহ শীঘ্রই সুদৃঢ় ও বলবান হইয়া উঠিল।

কিন্তু কেবল অস্ত্রবিদ্যায়ই শিবজী কাল অতিবাহিত করিতেন না। যখন অবসর পাইতেন দাদাজীর চরণোপান্তে বসিয়া মহাভারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরত্বের গল্প শ্রবণ করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। শুনিতে শুনিতে বালকের হৃদয়ে সাহসের উদ্রেক হইল, হিন্দুধর্ম্মে আস্থা দৃঢ়ীভূত হইল, সেই পূর্ব্বকালীন বীরদিগের বীরত্ব অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল; ধর্ম্মবিদ্বেষী মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল। অচিরাৎ শাস্ত্রানুযায়িক সমুদয় ক্রিয়া কর্ম্ম শিখিলেন, এবং কথা শুনিতে এরূপ আগ্রহ জন্মিল যে অনেক বৎসর পর যখন দেশে খ্যাতি ও রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত কোন স্থানে কথা হইবে শুনিলে বহু বিপদ ও কষ্ট সহ্য করিয়াও তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেন।

এইরূপে দাদাজীর যত্নে, শিবজী অল্পকাল মধ্যেই স্বধর্ম্মানুরক্ত ও অতিশয় মুসলমান-বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন, ও ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে স্বাধীন পলীগার হইবার জন্য নানারূপ সংকল্প করিতে লাগিলেন। আপনার ন্যায় উৎসাহী যুবকদিগকে এবং দস্যুগণকেও চারিদিকে জড় করিতে লাগিলেন, ও পর্ব্বতপরিপূর্ণ কঙ্কণদেশে তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। সেই পর্ব্বত কিরূপে উল্লঙ্ঘন করা যায়, কোথায় পথ আছে, কোন্ পথে কোন্ দুর্গে যাওয়া যায়, কোন্ কোন্ দুর্গ অতিশয় দুর্গম, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ বা রক্ষা করা যায়, এ সকল চিন্তায় বালকের দিন অতিবাহিত হইত। কখন কখন কয়েকদিন ক্রমাগত এই পর্ব্বত ও উপত্যকায় মধ্যে যাপন করিতেন; কোন দুর্গ কোন পথ, কোন উপত্যকা শিবজীর অজ্ঞাত ছিল না। শেষে কিরূপে দুই একটি দুর্গ হস্তগত করিবেন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া বৃদ্ধ দাদাজী ভীত হইতে লাগিলেন। তিনি অনেক প্রবোধবাক্য

দ্বারা বালককে সে পথ হইতে আনয়ন করিয়াজায়গীর যাহাতে সুচারুরূপে রক্ষা হয়, তাহাই শিখাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে যে বীরত্বের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল তাহা আর উৎপাটিত হইল না। শিবজী দাদাজীকে পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন, কিন্তু যে উন্নত পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিলেন না।

মাউলীজাতীয়দিগের কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য শিবজী তাহাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন, ও তাঁহার যৌবন-সুহৃদগণের মধ্যে যশজীকঙ্ক, তন্নজীমালশ্রী ও বাজীফাসলকর নামক তিন জন মাউলীই প্রিয়তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিশেষে ইঁহাদের সহায়তায় ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে তোরণ দুর্গের কিল্লাদারকে কোনরূপে বশবর্ত্তী করিয়া শিবজী সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই তোরণ দুর্গের বর্ণনা করা হইয়াছে; এই প্রথম বিজয়ের সময় শিবজীর বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র। ইহারই পরবৎসর তোরণ দুর্গের দেড় ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে একটি তুঙ্গগিরিশৃঙ্গের উপর শিবজী একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন ও তাহার রাজগড় নাম দিলেন।

বিজয়পুরের সুলতান এই সমস্ত বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন ও এই সমস্ত উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়পুরের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শাহজী এসমস্ত বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না, তিনি দাদাজীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন। এইরূপ আচরণে সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভব তাহা অনেক বুঝাইলেন, ও বিজয়পুরের অধীনে কার্য্য করিয়া শিবজীর পিতা কিরূপ বিপুল অর্থ, জায়গীর, ক্ষমতা ও সম্মান পাইয়াছেন তাহাও দেখাইলেন। শিবজী পিতৃসদৃশ দাদাজীকে আর কি বলিবেন, মিষ্ট বাক্যদ্বারা উত্তর দান করিলেন, কিন্তু আপন কার্য্যে নিরস্ত হইলেন না। ইহার কিছু দিন পরেই দাদাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালেই দাদাজী শিবজীকে আর একবার ডাকাইয়া নিকটে আনেন। বৃদ্ধ পুনরায় ভৎর্সনা করিবেন এই বিবেচনা করিয়া শিবজী তথায় যাইলেন, কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মৃত্যুশয্যায় যেন দাদাজীর দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল, তিনি শিবজীকে সস্নেহ ভাবে বলিলেন "বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর; ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয়কলুষিতকারীদিগকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর।" বৃদ্ধ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, শিবজীর

হৃদয় এই দিব্য উপদেশ পাইয়া উৎসাহ ও সাহসে দশগুণ স্ফীত হইয়া উঠিল। তখন শিবজীর বয়ঃক্রম বিংশ বৎসর।

সেই বৎসরেই চাকন ও কন্দানা দুর্গের কিল্লাদারগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিবজী উভয় দুর্গ হস্তগত করেন, ও কন্দানার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া সিংহগড় রাখেন। আখ্যায়িকায় চাকন ও সিংহগড়ের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শিবজীর বিমাতা টুকাবাইয়ের ভ্রাতা বাজী-মহিতী সোপা দুর্গের ভার প্রাপ্ত ছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহর রজনী সময়ে আপন মাওলী সৈন্য লইয়া শিবজী এই দুর্গ সহসা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। মাতুলের প্রতি কোনও অত্যাচার না করিয়া তাহাকে কর্ণাটে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরেই পুরন্দর দুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে ভ্রাতৃকলহ হয়, শিবজী কনিষ্ঠ দুই ভাইয়ের সহায়তা করিবার ছলনায় আপনি সেই দুর্গ হস্তগত করেন। এই অভদ্র আচরণে তিন ভ্রাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শিবজী যখন দেশের স্বাধীনতা স্বরূপ আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন, যখন সেই উদ্দেশ্যসাধন জন্য ভ্রাতৃগণ হইতে সহয়তা যাচ্ঞা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের ক্রোধ রহিল না। শিবজীর বাক্‌পটুতার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তাঁহার কথা শুনিয়াও তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া তিন ভ্রাতাই শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, তাহার নাম লিখিয়া এই আখ্যায়িকা পূর্ণ করিবার আবশ্যকতা নাই। ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে শিবজীর কর্ম্মচারী আবাজী স্বর্ণদেব কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ জয় করিলেন, তখন বিজয়পুরের সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন ও তাহাকে এক প্রস্তরময় ঘরে রাখিয়া আদেশ করিলেন যে নিয়মিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা স্বীকার না করিলে সেই গৃহের দ্বার প্রস্তর দ্বারা একেবারে রুদ্ধ হইবে। শিবজী দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু চারি বৎসরকাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দী স্বরূপ রহিলেন।

জৌলীর রাজা চন্দ্ররাওকে শিবজী স্বপক্ষে আনিবার জন্য ও মুসলমান অধীনতাশৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন। চন্দ্ররাও যখন একেবারে অস্বীকার করিলেন তখন শিবজী নিজ লোকদ্বারা সেই রাজা ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া, সহসা রাত্রিযোগে আক্রমণ করিয়া সেই দুর্গ হস্তগত করেন। শিবজী আপন উদ্দেশ্যসাধনার্থ অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ গর্হিত কার্য্য আর একটী করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সমস্ত জৌলী প্রদেশ অধিকার করিলেন

ও সেই বৎসরেই(১৬৫৬)প্রতাপগড় নামক একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণকরাইলেন,ও আপন প্রধান মন্ত্রী সত্রাজপন্তকে পেশওয়া খেতাব দিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে সত্রাজ কঙ্কণদেশে ফতেখাঁর নিকট পরাস্ত হওয়ার শিবজী তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া পদচ্যুত করিলেন ও মুরেশ্বর ত্রিমুল পিঙ্গলীকে পেশওয়া করিলেন। মুরেশ্বরের সহিত পাঠক পূর্ব্বেই পরিচিত হইয়াছেন। সমগ্র কঙ্কণদেশ জয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য জড় হইল।

এবার বিজয়পুরের সুলতান শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানস করিলেন। আবুল ফাজেল নামক একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ৫০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া যাত্রা করিলেন। গর্ব্বিতভাবে প্রকাশ করিলেন যে শীঘ্রই সেই অকিঞ্চিৎকর বিদ্রোহীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া সুলতানের পায়তখ্তের নিকট উপস্থিত করিবেন। (১৬৫৯ খৃঃ অব্দ)

এ সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধ অসম্ভব ; শিবজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আবুল ফাজেল গোপীনাথ নামক একজন ব্রাহ্মণকে শিবজী-সদনে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপগড় দুর্গের নিকট সভামধ্যে সাক্ষাৎ হইল ও নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল , রজনী যাপনার্থ গোপীনাথের জন্য একটি স্থান নির্দ্দেশ করা হইল।

রজনীযোগে শিবজী গোপীনাথের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শিবজীর অসাধারণ বাক্‌পটুতা ছিল, তিনি গোপীনাথকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বলিলেন ' আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ করুন। আমি যাহাই করিয়াছি সমস্তই হিন্দুজাতির জন্য, হিন্দুধর্ম্মের জন্য করিয়াছি ; স্বয়ং ভবানী আমাকে ব্রাহ্মণ ও গোবৎসাদিকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছেন, হিন্দুদেব ও দেবালয়ের উচ্ছিষ্টকারীদিগকে দণ্ড দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ও স্বধর্ম্মের শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, ভবানীর আদেশ সমর্থন করুন, ও আপন জাতীয় ও দেশীয় লোকের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করুন।' এইরূপ উত্তেজনা বাক্যের পর শিবজী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে জয়লাভ হইলে তিনি গোপীনাথকে হেওরা গ্রাম অর্পণ করিবেন। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সেই গ্রাম তাঁহাদেরই থাকিবে। গোপীনাথ এই সমস্ত বাক্যে তুষ্ট হইয়া শিবজীর সহায়তা করিতে স্বীকার হইলেন ; পরামর্শ স্থির হইল যে কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবুল ফাজেলের সহিত শিবজীর কোন স্থানে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক।

কয়েকদিন পর প্রতাপগড় দুর্গের নিকটেই সাক্ষাৎ হইল। আবুল ফাজেলের পঞ্চদশ শত সেনা দুর্গ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রহিল, তিনি স্বয়ং একমাত্র সহচরের সহিত শিবিকারোহণে নির্দ্দিষ্ট গৃহে

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবজী সেই দিন বহুযত্নে প্রাতে স্নান পূজাদি সমাপন করিলেন ; স্নেহময়ী মাতার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন ; তুলার কুর্ত্তি ও উষ্ণীষের নীচে লৌহবর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন ; দুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, বাল্যসহচর তন্নজীমালশ্রীকে সঙ্গে লইয়া আবুল ফাজেলের নিকট আসিলেন.—আলিঙ্গনচ্ছলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা মুসলমানকে ভূতলশায়ী করিলেন। শিবজীর উদ্দেশ্য সাধন হইল,কিন্তু এই গর্হিত কার্য্যে তাঁহার যশোরাশি চিরকাল কলুষিত থাকিবে। তৎক্ষণাৎ শিবজীর গুপ্তসেনা আবুল ফাজেলের সেনাকে পরাস্ত করিল, অন্নজী দত্ত নামক শিবজীর প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারী পানাল্লা ও পবনগড় হস্তগত করিলেন, বিজয়পুরের অন্য সেনাপতি রস্তুম জমানকে সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয়পুরের দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া আনিলেন।

বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ আরও তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে ১৬৬২ খৃঃ অব্দে শাহজী মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শাহজী যখন শিবজীকে দেখিতে আসিলেন শিবজী পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পিতাকে রাজার তুল্য অভিবাদন করিলেন, পিতার শিবিকার সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন, ও পিতা বসিতে আদেশ করিলে ও তিনি পিতার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন না। কয়েকদিন পুত্রের নিকট থাকিয়া শাহজী পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে যাইলেন, ও সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শিবজী পিতা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত এই সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। শাহজীর জীবদ্দশায় শিবজীর সহিত বিজয়পুরের আর যুদ্ধ হয় নাই, তাহার পরও যখন যুদ্ধ হয় সেই সময়ে শিবজী আক্রমণকারী ছিলেন না।

১৬৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধিস্থাপন হয়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই বৎসরই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। আমাদের আখ্যায়িকাও এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের সময় সমস্ত কঙ্কণদেশ শিবজী অধিকৃত করিয়াছিলেন, ও তাঁহার সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশৎ পদাতিক সেনা ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

শুভকার্য্য সম্পাদন।

"যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর,
জ্বলুক গগন ব্যাপি অনন্ত বহ্নিতে।
জ্বলুক সে দেবতেজ স্বর্গ সংবেষ্টিয়া,
অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রদীপ্ত শিখায়,

দলুক দানবকুল দেবের বিক্রমে
পুত্র পরম্পরা দগ্ধ চির শোকানলে।"
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূর্য্য অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়াছেন, সিংহগড় দুর্গের ভিতর সৈন্যগণ নিঃশব্দে সজ্জিত হইতেছে; এত নিঃশব্দে যে দুর্গের বাহিরের লোকও দুর্গের ভিতর কি হইতেছে তাহা জানিতে পারে না।

দুর্গের একটি উন্নত স্থানে কএকজন মহাযোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; সেই দুর্গচূড়া হইতে দৃশ্য অতি মনোহর! দুর্গতলে,পূর্ব্বদিকে সুন্দর নীরা নদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যকা বসন্ত কালের নব পুষ্প পত্র ও দুর্ব্বাদলে সুশোভিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। উত্তরদিকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র, বহুদূর পর্য্যন্ত সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। বহুদূরে বিস্তীর্ণ পুনা নগরী সুন্দর শোভা পাইতেছে, যোদ্ধাগণ প্রায়ই সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, অদ্য রজনীতে সেই নগরীতে কি বিষম ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। কেহ কেহ বা দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে দেখিতেছিলেন, উন্নত পর্ব্বতের পর উন্নত পর্ব্বত, যতদূর দেখা যায় অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণী নীল মেঘমালায় বিজড়িত রহিয়াছে, অথবা অস্তাচলচূড়াবলম্বিসূর্য্যকিরণে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে! কিন্তু বোধ করি যোদ্ধাগণ এই চমৎকার পর্ব্বত দৃশ্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন না; অন্য চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছেন।

যে যুদ্ধে বা যে অসমসাহসিক কার্য্যে একবারে বহুকালের বাঞ্ছিত ফল লাভ হইতে পারে বা এককালে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহার প্রাক্কালে মুহূর্ত্তের জন্যও অতিশয় সাহসিক হৃদয়ও চিন্তাপূর্ণ ও স্তম্ভিত হয়। অদ্য শায়েস্তাখাঁ ও মোগল সৈন্য ছিন্নভিন্ন ও পরাভূত হইবে, অথবা অসমসাহসে মহারাষ্ট্র সূর্য্য একবারে চির-অন্ধকারে অস্ত যাইবে, এইরূপ চিন্তা অগত্যা যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে উদ্রেক হইতে লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত করিলেন না, ভবানীর আশীর্ব্বাদে অবশ্যই জয় হইবে, সকলেই এইরূপ বলিয়াছিলেন, তথাপি যখন নিঃশব্দে যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন তখন কাহারও মনোগত ভাব লুক্কায়িত রহিল না। কেবল বিংশ বা পঞ্চবিংশ মাত্র সেনা লইয়া শিবজী শত্রুসেনার মধ্যে যাইয়া আক্রমণ করিবেন! এরূপ ভীষণ কার্য্যে শিবজীও কখন লিপ্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ! কেনই বা যোদ্ধাদিগের ললাট মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তামেঘাচ্ছন্ন না হইবে?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদর্শী পেশওয়া মুরেশ্বর ত্রিমুল ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে যুদ্ধব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, পরে শিবজীর অধীনে আসিয়া প্রতাপগড়ের চমৎকার দুর্গ তিনিই নির্ম্মাণ করেন। চারি

বৎসরাবধি পেশওয়া পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই পদের যোগ্যতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবুল ফাজেলকে শিবজী হত্যা করিলে পর মুরেশ্বরই তাঁহার সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, পরে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হওয়া অবধি তিনিই পদাতিক সৈন্যের সরনৌবৎ অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধকালে সাহসী, বিপদকালে স্থির ও অবিচলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী, মুরেশ্বর অপেক্ষা কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ও প্রকৃত বন্ধু শিবজীর আর ছিল না।

আবাজী স্বর্ণদেব নামে তথায় দ্বিতীয় একজন দূরদর্শী ও যুদ্ধপটু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম নীলুপন্ত স্বর্ণদেব, কিন্তু আবাজী নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনিই ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে কল্যাণ দুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ হস্তগত করেন, এবং সম্প্রতি রায়গড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধনামা অন্নজীদত্তও অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনিই পানাল্লা ও পবনগড় হস্তগত করেন, ও শিবজীর কর্ম্মচারীর মধ্যে একজন প্রধান ও অতিশয় কার্য্যদক্ষ ছিলেন।

অশ্বারোহীর সরনৌবৎ অর্থাৎ সেনাপতি নিতাইজী পহলকর সিংহগড়ে ছিলেন না; তিনি কিরূপে মোগল সৈন্যের সম্মুখ দিয়া যাইয়া আরঙ্গাবাদ ও আহম্মদনগর ছারখার করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা আমরা শায়েস্তাখাঁর সভায় চাঁদখাঁর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। সিংহগড়ে সে সময়ে কেবল অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সেনা কর্ত্তাজী গুজ্জরনামক একজন নীচস্থ সেনানীর অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে শিবজীর তিন জন প্রধান মাউলী বাল-সুহৃদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বাজী ফাসলকরের তিন বৎসর পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল; তন্নজীমালশ্রী ও যশজী কঙ্ক অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। বাল্যকালের সৌহার্দ্দ্য, যৌবনের বিষম সাহস ইহাঁরা একক্ষণও ভুলেন নাই, শিবজীকে প্রাণের ন্যায় ভাল বাসিতেন; শতবার রজনীযোগে মাউলী সৈন্য লইয়া শিবজীর সহিত শত পর্ব্বত দুর্গ নিঃশব্দে আরোহণ করিয়া সহসা অধিকার করিয়াছিলেন।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যার ছায়া যেন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হইতেছে, তখনও সেই যোদ্ধৃমণ্ডলী দুর্গশৃঙ্গে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান; এমত সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। যোদ্ধার নয়ন উজ্জ্বল, বস্ত্রের নীচে তিনি বর্ম্ম ও অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, অদ্য নিশির অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দৃষ্টি স্থির ও অবিচলিত।

ধীরে ধীরে বলিলেন "সমস্ত প্রস্তুত, বন্ধুগণ। বিদায় দিন।"

ক্ষণেক সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শেষে মুরেশ্বরপন্ত বলিলেন " তবে স্থির করিয়াছেন, অদ্য রজনীতে স্বর্ণদেব কি অন্নজী কি আমাকে সঙ্গে যাইতে দিবেন না? মহাত্মন! বিপৎকালে কবে আমরা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি?"

শিবজী। " পেশওয়াজী! ক্ষমা করুন, আর অনুরোধ করিবেন না; আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার নিকট অবিদিত নাই; কিন্তু অদ্য ক্ষমা করুন। ভবানীর আদেশে আমি অদ্য বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অদ্য আমিই এই কার্য্য সাধন করিব নচেৎ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। আশীর্ব্বাদ করুন জয়লাভ করিব; নচেৎ যদি অমঙ্গল হয়, যদি অদ্যকার কার্য্যে নিধন প্রাপ্ত হই, তথাপি আপনারা তিন জন থাকিলে মহারাষ্ট্রের সকলই রহিল। আপনারা আমার সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার দূরদর্শী বুদ্ধিবলে দেশ থাকিবে? কাহার বাহুবলে স্বাধীনতা থাকিবে? হিন্দু-গৌরব কে রক্ষা করিবে? যাত্রাকালে আর অনুরোধ করিবেন না।"

পেশওয়া বুঝিলেন আর অনুরোধ করা বৃথা, সুতরাং আর কিছু বলিলেন না। শিবজী পেশওয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

" মুরেশ্বর, আপনি পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আজ জয়লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অবশ্যই ফলিবে। আবাজী! তন্নজী! আশীর্ব্বাদ করুন, আমি কার্য্যে প্রস্থান করি। সকলেই বাষ্পোৎফুল্ল লোচনে বিদায় দিলেন।

পরে তন্নজী ও যশজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাল্য-সুহৃৎ! বিদায় দাও।"

দুই জনই খেদে নির্ব্বাক্! ক্ষণেক পর তন্নজী বলিলেন—" প্রভু! কি অপরাধে আমাদিকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন? কোন্ নৈশ ব্যাপারে, কোন্ দুর্গ জয়ের সময় আমরা প্রভুর সঙ্গে না ছিলাম? পূর্ব্বকাল স্মরণ করিয়া দেখুন, কঙ্কণদেশে আপনার সহিত কে ভ্রমণ করিত? শৈলচূড়ে, উপত্যকায়, পর্ব্বতগহ্বরে, তরঙ্গিণীতীরে কে আপনার সহিত দিবায় শিকার করিত, রজনীতে একত্র শয়ন করিত, বা দুর্গজয়ের পরামর্শ করিত? যশজী, মৃত বাজী, আর এই দাস তন্নজী। বাজী প্রভুর কার্য্যে হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অন্য বাসনা নাই। অনুমতি করুন অদ্য প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়লাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আনন্দিত হইব, যদি প্রভু বিনষ্ট হন, বিবেচনা করুন আমাদের এস্থানে জীবিত থাকিলে কোন উপকার নাই; আমাদের এরূপ বুদ্ধিবল নাই যে পরে রাজকার্য্যে কোন সাহায্য করি। আপনার বাল-সুহৃদ্‌কে বঞ্চিত করিবেন না।"

শিবজী দেখিলেন তন্নজীর চক্ষে জল; মুগ্ধ হইয়া তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "ভ্রাতঃ তোমাদিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই;—শীঘ্র রণসজ্জা করিয়া লও।" দুই জনে বিদ্যুদ্গতিতে দুর্গের নীচে অবতরণ করিলেন, তথায় বর্ষাকালের সায়ংকালিক কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশির ন্যায় রাশিরাশি সৈন্য সজ্জিত হইতেছিল। শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দুঃখিনী জীজী একাকী একটি ঘরে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, পুত্রের অদ্যকার বিপদে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমত সময় শিবজী আসিয়া বলিলেন—

"মাতঃ, আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই।"

জীজী স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন "বৎস! আইস একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি; কবে তোমার এ বিপদ্‌রাশি শেষ হইবে, কবে এ দুঃখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ হইবে?"

শিব। "মাতঃ, আপনার আশীর্ব্বাদে কবে কোন্ বিপদ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি? কোন্ যুদ্ধে জয়ী না হইয়াছি?"

জীজী। "বৎস! দীর্ঘ-জয়ী হও, ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন!" সস্নেহে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুজল শীর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর পড়িতে লাগিল।

শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন। এতক্ষণ তাঁহার দৃষ্টি স্থির ও স্বর অকম্পিত ছিল; এক্ষণ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চক্ষুর্দ্বয় ছল্ ছল্ করিতে লাগিল; উদ্বেগকম্পিতস্বরে বলিলেন—

"স্নেহময়ী জননি! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে যেন ভক্তিভাবে চিরজীবন পূজা করি, আপনার আশীর্ব্বাদে সকল বিপদ্ তুচ্ছজ্ঞান করিব।" বীরশ্রেষ্ঠ মাতার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন, মাতৃস্নেহের পবিত্র অশ্রুবারিতে সেই পবিত্র পদযুগল ধৌত করিলেন।

জীজী পুত্রকে হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, ও বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদায়কালে বলিলেন "বৎস, হিন্দুধর্ম্মের জয়সাধন কর; স্বয়ং দেবরাজ শম্ভু তোমার সাহায্য করিবেন।" শিবজী অশ্রুমোচন করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন।

সমস্ত সেনা সজ্জিত। শিবজী নিঃশব্দে অশ্বারোহণ করিলেন; নিঃশব্দে সৈন্যগণ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

দুর্গদ্বার অতিক্রম করিবার সময়ে একজন অতি অল্পবয়স্ক যোদ্ধা শিবজীর সম্মুখে আসিয়া শির নামাইল; শিবজী তাহাকে চিনিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—

"রঘুনাথজী হাবিলদার! তোমার কি প্রার্থনা?"

রঘু। "প্রভু যে দিন তোরণ দুর্গ হইতে পত্রাদি আনিয়াছিলাম, সে দিন

প্রসন্ন হইয়া পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।”

শিব। “অদ্য এই উৎকট ব্যাপারের প্রারম্ভে কি পুরস্কার চাহিতে আসিয়াছ?”

রঘু। এই পুরস্কার চাই যে ঐ উৎকট ব্যাপারে আমাকে লিপ্ত হইতে দিন; যে পঞ্চবিংশ মাউলী যোদ্ধার সহিত পুনানগরে প্রবেশ করিবেন, দাসকে তাহাদের সহিত আপনার সঙ্গে যাইতে আদেশ করুন।”

শিব। “কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক এ সঙ্কটে আসিতেছ? তোমার এই বিষয়েই বা বিশেষ কি অধিকার আছে?”

রঘু। “রাজন্! আমি ক্ষুদ্রতম সৈনিক, আমার বিশেষ অধিকার কি থাকিবে? এই মাত্র আছে যে আমার এ জগতে কেহ নাই, অন্যে মরিলে লোকে শোক করিবে, আমি এই আহবে মরিলে আক্ষেপ করিবে এরূপ জন মাত্র নাই। আর যদি প্রভুকে কার্য্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারি, জীবিত থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি; তবে,—তবে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল।”

রঘুনাথের সেই কৃষ্ণকেশগুচ্ছগুলি ভ্রমরবিনিন্দিত, নয়নের উপর পড়িয়াছে, সেইরূপ বালকের সরল উদার মুখমণ্ডলে যোদ্ধার স্থির প্রতিজ্ঞা বিরাজ করিতেছে। অল্পবয়স্ক যোদ্ধার এইরূপ কথা শুনিয়া ও উদার মুখমণ্ডল দেখিয়া শিবজী সন্তুষ্ট হইলেন, ও সঙ্গে পুনার ভিতরে যাইতে অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শিরঃনত করিয়া পরে লম্ফ দিয়া অশ্বে অধিরোহণ করিলেন।

সিংহগড় হইতে পুনা পর্য্যন্ত সমস্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্য রাখিলেন। সন্ধ্যার ছায়ায় নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে স্থানে সেনা সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একটি দীপ জ্বলিলে, বা সৈন্যেরা শব্দ করিলে পুনায় তাঁহার এই কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে, সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে সৈন্য সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।

সে কার্য্য শেষ হইল, রজনী জগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল, শিবজী তন্নজী ও যশজী ২৫ জন মাত্র মাউলী লইয়া পুনার নিকটে একটি বৃহৎ বাগানে পঁহুছিয়া তথায় লুক্কায়িত রহিলেন। রঘুনাথ ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাৎ রহিলেন।

আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই অম্রকাননকে আবৃত করিল, সন্ধ্যার শীতলবায়ু আসিয়া সেই কাননের মধ্যে মর্ম্মর শব্দ করিতে লাগিল, সন্ধ্যার পথিক একে একে সেই কাননের পার্শ্ব দিয়া পুনাভিমুখে চলিয়া যাইল, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, পত্রের মর্ম্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্রমে পুনার গোলমাল নিস্তব্ধ হইল, দীপাবলি নির্ব্বাণ হইল, নিস্তব্ধ নগরে কেবল প্রহরিগণ এক একবার উচ্চ শব্দ

করিতে লাগিল, ও সময়ে সময়ে শৃগালের শব্দ বায়ুপথে আসিতে লাগিল।

ঢং ঢং ঢং সহসা শব্দ হইয়া উঠিল; শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল; সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গলির মধ্যে শব্দ হইতেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা যায় না।

ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব্দ হইল, আবার চাহিয়া দেখিলেন; বহুলোক দীপাবলী লইয়া বাদ্য করিতে করিতে প্রশস্ত পথ দিয়া আসিতেছে;—এই বরযাত্রা!

বরযাত্রা নিকটে আসিল। পুনার চারিদিকে প্রাচীর নাই, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পথ লোকে সমাকীর্ণ, ও নানা বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অতি উচ্চ রব হইতেছে। অনেকে অশ্বারোহী,অধিকাংশ পদাতিক।

শিবজী নিঃশব্দে বাল-সুহৃদ তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিলেন মাত্র। ‘হয়ত এই শেষ বিদায়’ এই ভাব সকলের মনে জাগরিত হইল ও নয়নে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বাক্যে অনাবশ্যক। নিঃশব্দে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যাত্রীদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন।

যাত্রীগণ শায়েস্তাখাঁর বাটির নিকট দিয়া যাইল; বাটীর কামিনীগণ গবাক্ষে আসিয়া সেই বহুলোকসমারোহ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে যাত্রীগণ চলিয়া গেল, কামিনীগণ ও শয়ন করিতে গেলেন; যাত্রীদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিংশৎ জন খাঁসাহেবের গৃহের নিকট লুক্কায়িত রহিলেন। ক্রমে বরযাত্রার গোল থামিয়া গেল। শুভকার্য্য সম্পাদিত হইল।

রজনী আরও গভীর হইল; শায়েস্তাখাঁর রন্ধন গৃহের উপর একটি গবাক্ষ ছিল তথায় অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল, খাঁ সাহেবের পরিবারের কামিনীগণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিদ্রালু, সে শব্দ শুনিয়াও গ্রাহ্য করিলেন না।

একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি, পরে আর একখানি সরিল, ঝুর ঝুর করিয়া বালুকা পড়িল। নারীগণ তখন সন্দিগ্ধ হইয়া সেই স্থান দেখিতে আসিলেন, দেখিলেন ছিদ্রের ভিতর দিয়া একজন, পরে আর একজন, পরে আর একজন যোদ্ধা! পিপীলিকা সারের ন্যায় যোদ্ধৃগণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে! তখন চীৎকার শব্দ করিয়া যাইয়া শায়েস্তাখাঁর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদয় অবগত করিলেন।

শিবজী সন্ধি প্রার্থনার মিনতি করিতেছেন, খাঁ সাহেব এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; সহসা জাগরিত হইয়া শুনিলেন, শিবজী পুনা হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন।

পলায়নার্থে এক দ্বারে আসিলেন, দেখিলেন বর্ম্মধারী মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা! অন্য দ্বারে আসিলেন, তাহাই দেখিলেন। সভয়ে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিলেন, গবাক্ষ দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন,

এমত সময়ে সভয়ে শুনিলেন ' হর হর মহাদেও ' বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

তখন রাজপুরী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোল হইল। প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকেই হত বা আহত হইয়াছিল, তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রভুর রক্ষার্থ দৌড়িয়া আসিল ও সেই পঞ্চবিংশজন মাউলীকে চারিদিকে বেষ্টন করিল।

শীঘ্রই ভীষণ রবে সেই প্রাসাদ পরিপূরিত হইল; কোন ঘরের দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ পিশাচের ন্যায় চীৎকার করিয়া হত্যা করিতে লাগিল; কোন ঘরে মশালের আলোকে হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ করিতেছে, কবাটের ঝন্‌ঝনা শব্দ, আক্রমণকারীদিগের মুহুর্মুহুঃ উল্লাসরব, ও আক্রান্ত ও আহতদিগের চীৎকারে ও আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্শা হস্তে লম্ফ দিয়া যোদ্ধাদিগের মধ্যে পড়িলেন। ' সনাতনধর্ম্মের জয় হউক ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, মোগল প্রহরীগণ পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ বর্শাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া শায়েস্তাখাঁর শয়নঘরে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন মোগল সেই ঘরে ধাবমান হইল; শিবজী দেখিলেন সর্ব্বসম্মুখে মৃত চাঁদখাঁর বিক্রমশালী পুত্র শমশের খাঁ! পিতা অপমানিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে; তথাপি পুত্র সেই প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ও অগ্রগণ্য! শিবজী এক মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান হইলেন; কোষে খড়্গ রাখিয়া বলিলেন, ' যুবক, তোমার পিতার রক্তে এক্ষণও আমার হস্ত কলুষিত রহিয়াছে, তোমার জীবন লইব না, পথ ছাড়িয়া দেও। '

' কাফের! হত্যাকারীর এই দণ্ড! ' শম্‌শের খাঁর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলন্ত, শিবজী আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বেই শম্‌শেরের উজ্জ্বল খড়্গ আপন মস্তকোপরি দেখিলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতা ভবানীর নাম লইলেন; সহসা দেখিলেন পশ্চাৎ হইতে একটি বর্শা আসিয়া খড়্গাধারী শমসেরকে ভূতলশায়ী করিল। পশ্চাতে দেখিলেন রঘুনাথজী হাবিলদার!

' হাবিলদার! এ কার্য্য আমার স্মরণ থাকিবে। ' কেবল এই মাত্র বলিয়া শিবজী অগ্রসর হইলেন।

এই অবসরে গবাক্ষ দিয়া রজ্জু অবলম্বন করিয়া শায়েস্তাখাঁ পলাইলেন। কয়েক জন মাওলী সেই গবাক্ষমুখে ধাবমান হইয়াছিল, একজন খড়্গের আঘাত করিয়াছিল তাহা শায়েস্তাখাঁর অঙ্গুলীতে লাগিয়া একটি অঙ্গুলী চ্ছেদন হইল, কিন্তু

শায়েস্তাখাঁ আর পশ্চাতে না ফিরিয়া পলায়ন করিলেন, তাঁহার পুত্র আবদুল ফতেখাঁ ও সমস্ত প্রহরী নিহত হইয়াছিল। তখন শিবজী দেখিলেন ঘর, প্রাঙ্গণ, বারন্দা রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে প্রহরীগণের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, স্ত্রীলোক ও পলাতকগণের আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইতেছে, ও তখনও মাউলীগণ, মোগলদিগের ধ্বংস সাধনার্থ চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। মশালের অস্পষ্ট আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও ছিন্নমুণ্ড, কোথাও বা রক্ত প্রণালী ভীষণ দেখাইতেছিল। তখন শিবজী আপন মাউলীদিগকে নিকটে ডাকিলেন। সকল সময়ে সকল যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করিলে পর বৃথা প্রাণনাশ দেখিলে বিরক্ত হইতেন ও শত্রুর ও সেরূপ প্রাণনাশ যাহাতে না হয় তাহার যথেস্ট যত্ন করিতেন। আদেশ করিলেন, ‘আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে, ভীরু শায়েস্তাখাঁ আর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না ; এক্ষণে দ্রুতবেগে সিংহগড়াভিমুখে চল।’

অন্ধকার রজনীতে শিবজী অনায়াসে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন ও সিংহগড়ের দিকে ধাবমান হইলেন, প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়া মশাল জ্বালিবার আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক মশাল জ্বলিল ; পুনা হইতে শায়েস্তাখাঁ দেখিতে পাইলেন মহারাষ্ট্রসেনা নিরাপদে সিংহগড়ে উঠিল।

পর দিন প্রাতে ক্রুদ্ধ মোগলগণ সিংহগড় আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু গড়ের কামানের গোলায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল. কর্ত্তাজী গুজ্জর ও তাঁহার অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীগণ বহুদূর পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গেল।

অল্প বিপদে সাহসী যোদ্ধার আরও যুদ্ধপিপাসা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শায়েস্তাখাঁ সেরূপ যোদ্ধা ছিলেন না ; তিনি আরংজীবকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাহাতে নিজ সৈন্যের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন ও যশোবন্ত অর্থে বশীভূত হইয়া শিবজীর পক্ষাচরণ করিতেছে এইরূপ জানাইলেন। আরংজীব দুই জনকেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন, ও নিজপুত্র সুলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে পাঠাইলেন, পরে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য যশোবন্তকে পুনর্ব্বার পাঠাইলেন।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন যুদ্ধকার্য্য হইল না। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই শিবজীর পিতা শাহজীর কাল হওয়ায় শিবজী সিংহগড়েই শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া, পরে রায়গড়ে যাইয়া রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন ও নিজনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। আমরা এখন এই নবভূপতির নিকট বিদায় লইব।

পাঠক ! বহু দিবস হইল তোরণদুর্গ হইতে আসিয়াছি, চল এই অবসরে একবার সেই দুর্গে যাইয়া কি হইতেছে দেখি।

মৌক্তিক

পাঠক, অনেক দিন হইল যে মণিকার তোমার সুন্দর গ্রীবায় হীরককণ্ঠি পরাইয়াছিল, অদ্য সেই আবার এই মৌক্তিক হার লইয়া তোমার সমক্ষে উপস্থিত। মুক্তা নানা আকারের ও নানা মূল্যের, বৃহৎ হংসডিম্বের ন্যায় মুক্তাও আছে, এবং সর্ষপ প্রমাণ অতি ক্ষুদ্র মুক্তাও আছে। আবার এক একটি মুক্তার মূল্য একাদশ লক্ষ মুদ্রারও অধিক, আবার দেশীয় কবিরাজ মহাশয়েরা যে মুক্তা ভস্ম করেন, তাহার মূল্য এক পয়সারও কম। আমার এই হারে সুন্দরের কারু-চাতুর্য্য নাই। এবং ইহার গুণ ব্যাখ্যা করিতে "মেলেনী মাসী" ও নাই। কিন্তু মুক্তাগুলি বহুমূল্য—কেন না বহুযত্নে সংগৃহীত। যদি তুমি একবার পরিধান কর তবেই শ্রম সার্থক বোধ করিব।

মুক্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষে একটি কাব্যীয় প্রবাদ আছে। অর্থাৎ বৈশাখ মাসে যখন নূতন জল পতিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন শুক্তি গুলি মুখব্যাদান করিয়া জলের উপরিভাগে বিচরণ করিতে থাকে, পরে যে দিবস স্বাতীনক্ষত্রের যোগ হয়, তখনকার বৃষ্টিজল শুক্তির অভ্যন্তরে পতিত হইলেই মুক্তার উৎপত্তি হয়।

ভেরোনা নগরবাসী রোমীয় পণ্ডিত প্লিনি এই ভারতীয় প্রবাদের সহিত স্বীয় কল্পনা মিশাইয়া মুক্তার উৎপত্তির এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন যে "কস্তুরিকাগৃহীত নীহারকণার গুণানুসারে মুক্তার গুণের তারতম্য হয়। শিশিরবিন্দু পরিষ্কৃত হইলে মুক্তাও পরিষ্কৃত হয়; এবং উহা অপরিষ্কৃত হইলে মুক্তাও অপরিষ্কৃত হয়। যখন সেই বহুমূল্য বিন্দু শুক্তিগর্ভে পতিত হয়, তখন বায়ু মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে, মুক্তার পাংশুবর্ণ হয়; শুক্তিতে যত শিশির ধরে তত পড়িলে মুক্তা বৃহৎ হয়। বিদ্যুদ্দাম হইলে অকস্মাৎ শুক্তির মুখরুদ্ধ হওয়াতে মুক্তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়। শিশিরবিন্দুগ্রহণ সময়ে বজ্রপাত হইলে মুক্তাও অন্তঃসারশূন্য খোসার ন্যায় হইয়া যায়।"

ইতালি দেশের একজন প্রসিদ্ধ কবিও পূর্ব্বোক্তরূপ কল্পনা করিয়াছেন। মুক্তার কল্পিত উৎপত্তি যত অদ্ভুত না হউক, প্রাকৃত উৎপত্তি বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে কস্তূরিকা-জাতীয় অনেকগুলি মৎস্যের এক প্রকার পীড়া হইতে এই বহুমূল্যপদার্থটি উৎপন্ন। * ডাক্তর বেয়ার্ড

* ১৭১৭ খৃঃ অঃ রুমার নামা পণ্ডিত বলেন প্রাণীদিগের শরীরে ইহা একপ্রকার পাথরি রোগ।

কহেন, কখন কখন শুক্তি ও তন্মধ্যস্থ মৎস্যদেহের অন্তরে বালুকণা বা অপর কোন পদার্থ প্রবেশ করাতে একপ্রকার বিজাতীয় কণ্ডূয়ণ উপস্থিত হয়। সেই উপদ্রব নিবারণ করিবার জন্য মৎস্যটি ঐ পদার্থের উপরে একখানি অতি সূক্ষ্মত্বক্ বিস্তার করে, এবং উহাকে স্বীয় শরীরস্থ একপ্রকার স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলে। কখন কখন অপর কোন জন্তু শুক্তিমধ্যস্থ প্রাণীটিকে বহির্গত করিবার জন্য শুক্তি-দেহের কোনস্থল বিদ্ধ করে; কিন্তু উক্ত প্রাণীটি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব কথিত উপায়ে ঐ বিদ্ধস্থল আবরণ করিয়া আত্মরক্ষা করে। এই উভয় কারণ হইতে যে মৌক্তিকের উৎপত্তি তাহা শুক্তির অভ্যন্তরেই দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌বেত্তা লিলিয়স এই শেষোক্ত উপায়ে মুক্তা উৎপাদন করিয়া স্বদেশস্থ রাজার নিকট বহু সম্মান ও গৌরবান্বিত উপাধি প্রাপ্ত হন। চীন দেশীয় লোকদিগের নিকট ইহা অনেক কাল হইতে বিদিত আছে। তাহারা জীবিত কস্তুরা ধরিয়া তাহার গাত্রে নানা পরিমাণের রন্ধ্র করিয়া ছাড়িয়া দেয়, অনেক কস্তুরা এইরূপে বিনষ্ট হয়, কিন্তু অনেকের অভ্যন্তরে এই কৃত্রিম উপায়ে নানা আকারের মুক্তা উৎপন্ন হয়।

ডাক্তর বেয়ার্ডের মতে অপর একপ্রকার মুক্তা শুক্তি মধ্যস্থ প্রাণীতে জন্মে, এবং উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সর এভারার্ড হিউম কহেন যে প্রাণি শরীরে প্রাগুক্তরূপ কণ্ডূয়ণ হইবার কারণ এই উহাতে এরূপ কতকগুলি অণ্ড উৎপন্ন হয়, যাহা হইতে শাবক জন্মে না, অর্থাৎ উহা নষ্ট হইয়া যায়। শুক্তি-মৎস্য যেরূপ অপর ডিম্ব প্রসব করে, ইহাদিগকে তদ্রূপ প্রসব করে না। উহা বীজাধারেই দ্বিতীয় বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। প্রাণিশরীর হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া বীজাধার ক্রমে বৃহৎ করিতে থাকে। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে ঐ বীজকোষের উপরে একটি সূক্ষ্মত্বক্ জন্মে। এবং পূর্ব্বোক্ত পদার্থে সেই অণ্ডগুলি সম্পূর্ণরূপে আবৃত হইয়া সুন্দর সুগোল মুক্তা উৎপন্ন হয়। শুক্তির অভ্যন্তরস্থ মুক্তা গুলি- কখন গোল, কখন বাদামী আকারের হয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভে আমরা যে অতিক্ষুদ্র মুক্তার উল্লেখ করিয়াছি তাহাদিগকে মুক্তা ঝুরি কহে। ইংরেজীতে উহার নাম বীজ-মুক্তা। এই মুক্তা-ঝুরি গুলির প্রাচীন সময়ে বহুধা ব্যবহারছিল। কারণ প্লিনি এক স্থলে কহেন যে, 'স্ত্রীলোকেরা পাদুকাতে পর্য্যন্ত মুক্তা পরিধান করিত।' এদেশীয় স্ত্রীলোকেরাও পূর্ব্বে বেশরের দুলে ইহা ব্যবহার করিতেন, এবং অধুনা সীঁতি ও ঝুমকা প্রভৃতির দুলে ইহা ব্যবহৃত হয়। এস্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজন। শুক্তি-মৎস্যের পীড়া নিবন্ধন মুক্তার যে উৎপত্তি হয়, তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। যাহারা মুক্তা সংগ্রহ করে,তাহারা বলে যে মসৃণ অক্ষত শুক্তি-গর্ভে মুক্তা প্রায়ই পাওয়া যায় না;

কিন্তু ভগ্ন ও অসমান শুক্তি-গর্ভে মুক্তা স-চরাচরই দেখা যায়।

এসিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকার স্থানে স্থানে মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এসিয়ায় সিন্ধুনদের পিল্‌তী নামক মোহানায়, করাচীনগরে, করমণ্ডল উপকূলস্থ টিউটিকরিন নগরে, লঙ্কার কণ্ডাচী উপসাগরে; মালক্কস্ প্রণালীতে, লোহিত সাগরে, পারস্য উপসাগরস্থ খরকদ্বীপে, এবং জাপান ও ফিলিপাইন দ্বীপের নিকটে মুক্তা পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মুর্সিদাবাদের কোন কোন বিলেও যথেষ্ট মুক্তা পাওয়া যায়। ইউরোপের মধ্যে স্কট্‌লণ্ডে অধুনা যথেষ্ঠ উৎকৃষ্ট মুক্তা মিলে। কথিত আছে যে দুইশতাব্দী পুর্ব্বে রোমানেরা ইংলণ্ড হইতে প্রভূত পরিমাণে মুক্তা সংগ্রহ করিত। প্লিনি বলেন যুলিয়স্ সিজর ভিনস্ দেবীরে যে কঞ্চুলিকা উপহার দেন, তাহা ব্রীটনীয় মুক্তায় খচিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে পার্থ্‌সায়রের নদীজাত লক্ষটাকার মুক্তা বর্ষে বর্ষে লণ্ডনে বিক্রীত হইয়াছে, এমন কি এখনও যাহারা কন্‌ওয়ে নামক উপকূলে ভ্রমণ করিতে যান, তাহারা এক ঔন্সপরিমিত ব্রীটনীয় মুক্তা ২॥০ টাকা হইতে ৫ টাকা মূল্যে যত ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারেন। রুসিয়াতে নবোগরড্, ভার্, স্কভ, প্রভৃতি প্রদেশে; এবং সাক্সনি, বেভেরিয়া, বোহিমিয়া, এবং সিলিসিয়ার নদীতে অদ্যাপি যথেষ্ঠ মুক্তা জন্মে।

এমেরিকায় মেক্সিকো ও কালিফর্নিয়ার উপকূলে, সেণ্ট্‌টমাস, নবগ্রেণেডা, এবং ব্রীটিস পশ্চিম ইণ্ডিয়া দ্বীপসমূহে বহুল পরিমাণে মুক্তা পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এল্‌জেরিয়া ও সুলুদ্বীপে, মাগ্রেরিটা দ্বীপে, ও পানামা উপসাগর প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট মুক্তা পাওয়া যায়। পারস্য গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ একমাত্র বেহারিণ দ্বীপে বর্ষে বর্ষে ২৪ লক্ষমুদ্রার মুক্তা সংগৃহীত হয়। করাচি নগরের নিকট যে সকল ক্ষুদ্র মুক্তা সংগৃহীত হয়, তজ্জন্য গর্ণমেণ্টকে বর্ষে বর্ষে চল্লিশ সহস্র মুদ্রা কর দিতে হয়। কি প্রণালীতে মুক্তা সংগৃহীত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটন করিলে, বোধহয় পাঠক বর্গের বিরক্তিকর হইবে না।

লঙ্কাদ্বীপই মুক্তার জন্য পৃথিবী মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; অতএব কণ্ডাচী উপসাগরে মুক্তা-সংগ্রহের বিবরণই আমরা লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রতিবৎসর গবর্ণমেণ্ট হইতে উক্ত উপকূলের জরিপ হয়। জরিপ শেষ হইলে এক বৎসরের নিমিত্ত নিলামে ঐ জমা বিক্রীত হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে আরম্ভ হইয়া এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে মুক্তা সংগ্রহ শেষ হয়। সাকল্যে ছয় সপ্তাহ বা দুইমাস কাল ডুবারুরা মুক্তাসংগ্রহ করিতে পায়। কিন্তু এই সকল ডুবারু মালাবার উপকূলবাসী রোমান কাথলিক খৃষ্টান, ইহাদের এই সময় এতগুলি পর্ব্ব ও উপবাসাদি আছে যে,

মোট ৪০ দিনের অধিককাল কাজ করিতে পারে না। মুক্তাসংগ্রহব্যাপার যে দিন আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্ব্ব দিবস রাত্র ১০ ঘটিকার সময় একটি কামানের শব্দ হয়। তৎক্ষণাৎ কণ্ডাচী উপসাগর হইতে সমুদায় নৌকা ছাড়িয়া দেয়। প্রত্যূষের সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে নৌকা পৌঁছে, এবং দিবা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ডুবারুরা মুক্তা সংগ্রহ করে। দ্বিপ্রহরের পর তথা হইতে নৌকা বোঝাই করিয়া বেলাবেলি কণ্ডাচী উপসাগরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। অমনি শুক্তি গুলি তীরে উঠাইয়া নিলাম করা হয়। প্রত্যেক নৌকায় ১০ জন ডুবারু ও দশজন নাবিক থাকে। তদ্ব্যতীত নৌকার অধ্যক্ষরূপে একজন কর্ণধার এবং " হাঙ্গড়-দমী " নামে মালাবারাস্থ এক এক জন পুরোহিত বা ওঝা থাকে।

একবারে ৫ জন করিয়া ডুবারু অবগাহন করে, তাহারা উত্থিত হইলে, অবশিষ্ট পাঁচজন অবগাহন করে। কাপ্তান ষ্টুয়ার্ট কহেন ডুবারুরা সাধারণতঃ প্রতি ডুবে ৫৩ হইতে ৫৭ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত জলের তলে থাকে; কিন্তু অর্থ দিলে ৮৪ হইতে ৮৭ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। অনেক পাঠক বোধ হয় ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। ভরসা করি নিম্ন লিখিত বিবরণ পাঠে বুঝিতে পারিবেন যে, ৮৭ সেকেণ্ড জলের নীচে থাকা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

প্রথমতঃ চিকিৎসকেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে সুস্থ শরীরে প্রৌঢ়াবস্থ পুরুষদিগের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৭৫ বার পর্য্যন্ত চলে; সুতরাং ৮৭ সেকেণ্ডে ১০৯ বার নাড়ী চলে। দ্বিতীয়তঃ, ঘটিকা যন্ত্রের দোলদণ্ড প্রতি সেকেণ্ডে একবার করিয়া দোলে, এবং মনুষ্যের শ্বাসও সুস্থাবস্থায় প্রতি সেকেণ্ডে গড়ে একবার করিয়া বহে, সুতরাং ৮৭ বার শ্বাস ত্যাগ করিতে যত সময় লাগে ডুবারুরা তত সময় জলের নীচে থাকে, একি সাধারণ ক্ষমতা! অধুনা বিজ্ঞানের উন্নতিবশতঃ ডুবারুরা জলের নীচে ৬। ৭ ঘণ্টা থাকিতে পারে, কিন্তু সে যন্ত্রের সাহায্যে। যাহা হউক, আমরা পুনশ্চ প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি।

ডুবারুদিগের কটীদেশে একটি করিয়া জালি থাকে, সংগৃহীত শুক্তিগুলি তাহার মধ্যে রাখে। শীঘ্র শীঘ্র জলের ভিতর অধিরোহণ করিবার জন্য রজ্জু দ্বারা একটি ফাঁস প্রস্তুত থাকে; এবং তাহাতে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর সংলগ্ন থাকে। নীচে নামিবার সময় ঐ ফাঁসের মধ্যে পদস্থাপন করে। আর একগাছি রজ্জুও ডুবারুদের কটীদেশে সংলগ্ন থাকে। অনেকক্ষণ জলের নীচে থাকিয়া কষ্ট হইলে, তাহারা এই রজ্জুটি নাড়িতে থাকে; তৎক্ষণাৎ নৌকাস্থিত লোকেরা তাহাদিগকে টানিয়া তুলে। উঠিবার সময় পূর্ব্বোক্ত ফাঁস হইতে পা বাহির করিয়া লয়। ডুবারুরা উভয় কর্ণ তুলা দ্বারা বন্ধ করে,

এবং যতক্ষণ জলের নীচে থাকে, এক হস্তে নাসিকারন্ধ্র চাপিয়া রাখে। তাহারা দিনে ৪০ হইতে ৫০ ডুব পর্য্যন্ত দেয়, এবং প্রতিডুবে প্রায় একশত শুক্তি উত্তোলন করে।

ডুবারুদের পক্ষে হাঙ্গরের ভয়ই অত্যন্ত। যে পর্য্যন্ত হাঙ্গড়দমী ওঝারা মন্ত্র দ্বারা হাঙ্গড়ের মুখ বন্ধ না করে, তাবৎ ডুবারুরা জলে নামে না। যতদিন মুক্তা সংগ্রহব্যাপার চলিতে থাকে, ওঝারা কূলে থাকিয়া পূজা, নানাবিধ অনুষ্ঠান,ও নানা প্রকার শারীরিক কষ্ট করে। কখন কখন ওঝারা নৌকাতেও থাকে। যতক্ষণ ওঝা নৌকায় থাকে, ততক্ষণ ডুবারুরা অকুতোভয়ে অগাধ জলে যাইতেও পরাঙ্মুখ হয় না। মুক্তা সংগ্রাহক বনিকেরা ওঝাদিগকে বেতন দেন। ডুবারুরা মুক্তার কোন অংশ বা তাহার মূল্য স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করে। শুক্তিগুলিকে মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া ঢাকিয়া রাখে, এবং তাহার উপরে দড়মার বেড়া দেয়। কিছু দিন পর পচিয়া শুক্তিগুলি দ্বিধা হইয়া যায় ও মুক্তা বাহির হয়। অতঃপর মুক্তাগুলিকে প্রক্ষালিত, পরিষ্কৃত, ও সরন্ধ্র করা হয়। মুক্তা দ্বারাই এই প্রকার চূর্ণ প্রস্তুত হয়, তদ্দ্বারা মাজিয়া মুক্তা পরিষ্কার করে।

শ্বেত,মসৃণ, উজ্জ্বল মৌক্তিকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জেফ্রি নামা একজন প্রসিদ্ধ রত্নজীবী বলেন যে "দুগ্ধবৎ শ্বেত, অত্যুজ্জ্বল, অক্ষত, কলঙ্করহিত মুক্তাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।" বর্ণবিশিষ্ট মুক্তা তাঁহার মতে অকর্ম্মণ্য। সম্পূর্ণ গোলাকার মুক্তাই উৎকৃষ্ট, কিন্তু ইয়ারিং প্রভৃতিতে অণ্ডাকৃতি মুক্তাই অধিক ব্যবহৃত হয়। হিন্দুরা ঈষল্লোহিত বা ঈষৎ পীত মুক্তাই অধিক মনোহর জ্ঞান করেন। জেফ্রি এইরূপে মুক্তার মূল্য নিরূপণ করেন;—প্রায় চারিরত্তি পরিমিত মুক্তার মূল্য চারি টাকা; ৮ রত্তি পরিমাণ হইলে ১৬ টাকা; ১২ রত্তি পরিমাণ হইলে ৩৬ টাকা। অর্থাৎ ৪ রত্তিতে এক 'কেরাট' হয়, সুতরাং যত 'কেরাট' হইবে তাহার বর্গ লও, এবং সেই বর্গফল দ্বারা এক কেরাটের মূল্য ৪ টাকাকে গুণ কর। কিন্তু প্রাচীন কালীন অনেক মুক্তার কথা শুনা যায়, যাহার মূল্য এই নিয়মে নিরূপিত হয় নাই। এমন কি, এখনও কোন মুক্তা অতি উৎকৃষ্ট বা সুন্দর হইলে, তাহার মূল্য পরিমাণানুসারে হয় না।

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে কেবল শুক্তিই মুক্তার উৎপত্তি স্থান নহে। ভাব প্রকাশে যথাঃ—

"শঙ্খোগজশ্চ ক্রোড়শ্চ ফণিমৎস্যশ্চ দদ্রুরঃ।
বেণুরেতে সমাখ্যাতাস্তজজ্ঞৈ র্মৌক্তিক যোনয়ঃ॥"

অর্থাৎ শঙ্খ, হস্তী, শূকর, ভুজঙ্গ, মৎস্য, কচ্ছপ, বংশ প্রভৃতিতেও মুক্তা জন্মায়। রাজ নির্ঘণ্টে জাতিভেদে অষ্টধা মুক্তার উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

"মাতঙ্গোরোগমীনপোত্রিশিরসন্তুকসার-
শঙ্খাম্বুভূৎ
শুক্তীনামুদরাচ্চ মৌক্তিক মনিঃ স্পষ্টো
ভবত্যাষ্টধা॥"

মুক্তার লক্ষণ সম্বন্ধে রাজ নির্ঘণ্ট বলেন—

"নক্ষত্রাভং শুদ্ধমত্যন্ত মুক্তং স্নিগ্ধং স্থূলং
নির্ম্মলং নির্ব্রণঞ্চ।
ন্যস্তংধত্তে গৌরবং যত্তুলায়াং তন্নি-
র্ম্মাল্যং মৌক্তিকং সৌখ্যদায়ি।"

যে মুক্তা নক্ষত্রের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল, অত্যন্ত বিশুদ্ধ, স্নিগ্ধ, স্থূল, নির্ম্মল ও ব্রণ-রহিত, এবং তুলাতে স্থাপন করিলে যাহার গুরুত্ব অনুভূত হয়, সেই নির্ম্মল মৌক্তিকই সুখদায়ি অর্থাৎ প্রশস্ত।

রাজ নির্ঘণ্টকার পুনশ্চ মুক্তার বিশেষ লক্ষণ কহিয়াছেন। যথা—

"ছায়াপাটলনীলপীতধবলাস্তত্রাপি
সামান্যতঃ।
সপ্তানাং বহুশো ন লব্ধি
রিতি চেচ্ছৌক্তেয়কং তুল্যনং॥"

যদিচ অপর সপ্তবিধ মুক্তা শৌক্তিকেয় অর্থাৎ শুক্তি-গর্ভজাত মুক্তার তুল্য বহুছায়াবিশিষ্ট না হউক, তথাপি পাটল, নীল, পীত, ধবল এই কএক প্রকার ছায়া তৎসমুদায়ে সাধারণতঃ আছে।

ভোজ রাজতন্ত্র নামে একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থে ছায়া দ্বারা নানাবিধ মুক্তার পরীক্ষা করিবার বিবরণ লিখিত আছে। আমরা এস্থলে বহু অন্বেষণ করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হইলাম না। দুঃখের কথা বলিব কি আমরা একখানি হস্তলিখিত রাজনির্ঘণ্টে মুক্তাসম্বন্ধে আরও যে সকল প্রমাণ পাইলাম, তাহা লিপিকরের প্রমাদ-বশতঃ এত অশুদ্ধ হইয়াছে, যে তাহার কোনও অর্থসংগ্রহ হয় না। অধিক কি, আমরা যে কএকটি বচন উদ্ধৃত করিলাম তাহারও স্থানে স্থানে অনেক ভ্রম রহিল।

এতদ্দেশীয় ভিষক্‌দিগের মতে মুক্তার নানাগুণ, এবং উহা তাঁহারা নানাবিধ ঔষধেও ব্যবহার করেন। কিন্তু ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা একথা গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা বলেন যে, সামান্য চুণ এবং মুক্তাভস্মে কোনও প্রভেদ নাই। বস্তুতঃ আমরা স্থলান্তরে মুক্তার যে রাসায়নিক গুণের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এতদুভয়কে একই পদার্থ বলিলিয়া বিশ্বাস হয়। যাহা হউক বৈদ্যক শাস্ত্রমতে মুক্তার গুণ এই।

"সারকত্বং, শীতত্বং, কষায়ত্বং, স্বাদুত্বং, লেখনত্বং, চক্ষুষ্যত্বঞ্চ।", ইতি রাজবল্লভঃ।

অর্থাৎ মুক্তায় সারকত্ব, শৈত্য, কষায়ত্ব ও মুখপ্রিয়ত্ব গুণ আছে। ইহা দ্বারা লেখন অর্থাৎ ক্ষার দ্বারা যে দাগ করিয়া দেওয়া যায়, সেই গুণ এবং চক্ষুরোগের উপশমত্ব গুণও আছে।

"বৃষ্যত্বং বলপুষ্টিদত্বঞ্চ" ইতিভাবপ্রকাশঃ।

ইহাতে পুং শক্তির বৃদ্ধি, বল ও পুষ্টি প্রদান করে।

"মৌক্তিকঞ্চ মধুরং সুশীতলং দৃষ্টিরোগ-
শমনং বিষাপহং।

রাজযক্ষ্মপরিকোপনাশনং ক্ষীণবীর্য্যবল-পুষ্টিবর্দ্ধনং ॥ ,, ইতি রাজনির্ঘণ্ট—

ইহা মধুর, সুশীতল, দৃষ্টিরোগ ও যক্ষ্মারনাশক ; এবং ক্ষীণবীর্য্যদিগের বল-

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অপর কএকটি পদার্থের সহিত মুক্তার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণ ও তুলনা করিয়াছেন। প্রতিঘন ফুটে যত গুরুত্ব তাহা ঔন্সে দেওয়া যাইতেছে। এক ঔন্স অর্দ্ধ ছটাক।

চীনাবাসন	২৩৮৫	অর্থাৎ	৭৪.৫	সের
চকমকি প্রস্তর	২৫৯৪		৮১.	
স্ফটিক	২৬৪০		৮২.৩	
প্রবাল	২৬৮০	"	৮৩.৭	
মুক্তা	২৬৮৪	"	৮৩.৯	
হীরক	৩৫৩৬	"	১১০.৫	
গোমেদক	৩৮০০	"	১১৮.৬	
নীলকান্তমণি	৩৯৯৪	"	১২৪.৮	"
পদ্মরাগমণি	৪২৮৩	"	১৩৩.৮	"
অয়স্কান্তমণি	৪৯৩০		১৫৪.	

যে দশটি পদার্থের তুলনা করা গেল, তম্মধ্যে মুক্তা পাঁচটি অপেক্ষা ভারী, এবং অবশিষ্ট পাঁচটি অপেক্ষা লঘু। মুক্তা লৌহ অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ লঘু; কিন্তু জল অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ ভারী; অঙ্গারক চূর্ণের স্থায়িত্ব হেতু মুক্তা এত দৃঢ়; অম্ল পদার্থ (এসিড্) মধ্যে মুক্তা নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ দ্রব হইয়া যায়! অর্থাৎ এসিডের সহিত সোডা, মিলিত হইলে যেরূপ বুদ্বুদ্ উত্পন্ন হইয়া থাকে, মুক্তা দ্রবীকরণ কালেও ঠিক তদ্রূপ হয়। ফলতঃ সোডা যে পদার্থ, মুক্তার রাসায়নিক উপকরণও তাহাই। দ্রব হইয়া গেলে অতি সূক্ষ্ম একটি ত্বক্ মাত্রাবশিষ্ট থাকে। সময়ে সময়ে কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিতে অনেকে প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু জেকুইন নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এবিষয়ে যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তত আর কেহই নহে। বাজারে গ্লাসের যে মুক্তা বিক্রয় হয়, উহাই জেকুইনের আবিষ্কৃত। সংপ্রতি কতিপয় প্রসিদ্ধ মুক্তার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিয়া আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

প্রাচীন পুরাবৃত্তে দেখাযায়, একদা মার্কস্ এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা কোন ভোজে বাজি রাখেন। তাহাতে রূপ ও ধনে গর্ব্বিতা রাণী স্বীয় কর্ণভূষা হইতে দুইটি বহুমূল্য মুক্তা লইয়া একটি সের্কায় দ্রব করিয়া পান করেন ; অপরটি এণ্টনি কাড়িয়া লইয়া রক্ষা করেন এবং তাহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভিনস্‌দেবীর কর্ণভূষায় প্রদত্ত হয় উহার মূল্য সম্বন্ধে নানা মত আছে। কেহ বলেন ৮০৭২৯১৫০ টাকা *, কাহারও মতে ৭৬০০০০ টাকা † এবং কাহারও মতে ৮৪০০০০ টাকা। ‡

জুলিয়স সিজর ব্রুটাসের জননী সার্ভিলিয়াকে উপহার স্বরূপ যে একটি মুক্তা

* পেটার্সনকৃত প্রাণিতত্ত্ব। † এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা ১৭ ব। ‡ মণ্ডার্সকৃত অভিধান।

দিয়াছিলেন, তাহার মূল্য কাহার মতে ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ মুদ্রা, * কাহার মতে ৪৮৪১৭৫ মুদ্রা। †

এ, জে, বি, হোপ নামা পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য বিশেষের নিকট একটি মুক্তা ছিল, অত বড় মুক্তার কথা এখন আর বড় শুনা যায় না। উহার ওজন ১৮৻০ আনা, বেড় ৪॥ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য ২ ইঞ্চি। মূল্য প্রায় ১৯০০০০ টাকা। ‡

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে টেবার্ণিয়ার নামে এক-জন পরিব্রাজক পারস্যাধিপতির নিকট এ-কটি মুক্তা দেখেন, উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ ইঞ্চ; বেড় প্রায় ৩॥ ইঞ্চ এবং মূল্য ১১০০০০০ একাদশ লক্ষ মুদ্রা। ¶ ইহার আকৃতি অ-ণ্ডাকার, অক্ষত ও অব্রণ। আরব্য দেশস্থ কেটিকা নামক স্থানে ইহা ক্রীত হয়। কেহ অনুমান করেন যে, পারস্যের পুর্ব্বতন সুলতান ফতেআলি সার এই মুক্তাটি ছিল।

হংসডিম্বাকার একটি পানামা উপ-কূলজাত সুন্দর মুক্তা স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপকে ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উপ-হার স্বরূপ প্রদত্ত হয়। উহার আয়তনও একটি কপোতাণ্ডের ন্যায় হইবে। উহার মূল্য পেনি সাইক্লোপিডিয়ার মতে চল্লিশ সহস্র; কিন্তু হেডেনের অভিধানানুসারে ১৩৯৯৬০ মুদ্রা। †

ডি বুটী নামা পণ্ডিত কহেন যে সম্রাট্ দ্বিতীয় রডল্‌ফের মুকুটে হংসাণ্ডবৎ ৩০ কে-রাট অর্থাৎ ১। ভরি ওজনের একটি মুক্তা ছিল। ইহার মূল্যের নিরূপণ কেহ করেন নাই। সাধারণ নিয়মানুসারে গণনা ক-রিলে ৩৬০০ টাকা হইবে। ইহার নাম “অতুলন।”

ভিনিসের গবর্ণমেণ্ট রুমের বাতসা সোলেমানকে যে মুক্তাটি উপহার দেয়, তাহার মূল্য ১৬০০০০ একলক্ষ ষাট হা-জার টাকা।

দশম লিও নামে রোমান কাথলিক দিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ (পোপ) কোন ভিনি-সিয়ান মণিকারের নিকট এক লক্ষ চারি সহস্র মুদ্রায় একটি মুক্তা ক্রয় করেন।

স্পেনের রাজধানী মেড্রিডনগরবা-সিনী একটি মহিলা ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে মা-র্কিন দেশ হইতে একটি মুক্তা ক্রয় করিয়া আনেন, তাহার মূল্য তিনলক্ষ তের শত মুদ্রা।

* পেনিসাইক্লোপিডিয়া † পেটা-র্সনকৃত প্রাণিতত্ত্ব।

‡ ব্রেণ্ডিসের বৈজ্ঞানিক অভিধা-নের বিবরণও প্রায় এইরূপ।

¶ মণ্ডার্স অভিধানমতে এইরূপ এবং বিটনের সার্ব্বভৌমিক অভিধানের মতও এই; কেবল বিটনের মতে দৈর্ঘ্য ২ ইঞ্চি। পেনিসাইক্লোপিডিয়ার মতে মূল্য ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার। হেডেনের সময়-নির্ণায়ক অভিধানমতে মূল্য ১ কোটি ১০ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রীটেনিকার মতে ১ লক্ষ।

† পেনিসাইক্লোপিডিয়ার সন ১৫৭৯।

রুসিয়ার মস্কোনগরের জোসিমা চিত্রশালিকায় পেলিগ্রিনা নামে দুগ্ধনিভ শুভ্র, সম্পূর্ণ গোল, অত্যুজ্জ্বল একটি মুক্তা আছে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কোন জাহাজের নিকট লেঘহরণ নগরে জোসিম নামা একব্যক্তি উহা ক্রয় করে। উহার ওজন প্রায় ১৯ রত্তি পরিমাণ, এবং সামান্য হিসাবে মূল্য ১৩৩৬ মুদ্রা। উহা মস্কোনগরস্থ আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে অতি বিখ্যাত।

কতিপয় বর্ষ গত হইল মান্দ্রাজ নগরের কোন প্রদর্শনে একটি অদ্ভুৎ জড়াও রত্ন প্রদর্শিত হয়। উহা একটি অর্দ্ধমৎস্যনারীরূপ, মস্তক ও বাহু শ্বেত চুণি প্রস্তরের, হস্ত দ্বারা কেশ বিন্যাস করিতেছে, বক্ষ একটি দীর্ঘাকার জাপান-মুক্তা, উহাও দুগ্ধবৎ শুভ্র ও অতি সুন্দর। মৎস্যার্দ্ধভাগ হরিদ্বর্ণের চুনি প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই মুক্তাটিকে অনেকে বহুমূল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। শ্রীজ

কবি কাঞ্চনাচার্য্য

এই রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমির অনন্ত গর্ভে কত রত্ন অপূর্ব্ব প্রভায় প্রতিভাত হইয়াছে এবং তদনন্তর কালের করাল গ্রাসে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা কালগ্রাসে অস্পৃষ্ট রহিয়া অদ্যাপি অতিক্ষীণ আলোকে মনুষ্যের লোচনগোচর হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? দুর্ব্বৃত্ত অনার্য্যজাতির ক্রূরহস্তেই বা কত মহাত্মার যশঃশরীর ভস্মীকৃত হইয়াছে, কে তাহা বলিতে পারে? দুরদৃষ্ট যে কত প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভারতের সর্ব্বাঙ্গে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত মহাত্মার নামমাত্র, কত রসার্দ্রচিত্ত ভাবুকের গ্রন্থের নামমাত্র আমাদের শোকের হেতুভূত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। কোনও গ্রন্থকারের একখানি ক্ষুদ্রতম গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হইলেও আমাদিগের অন্তঃকরণ এই সন্দেহে আকুল হইয়া উঠে, যে ইঁহার অবশ্য অন্য গ্রন্থ ছিল—এ রসসাগরের অবশ্য অপর প্রবাহ ছিল। বাস্তবিক, সংস্কৃত সাহিত্যসাগরে অবগাহন করিলে ভগ্নপ্রাসাদশ্রেণীদর্শনে তত্ত্বানুসন্ধায়ীর ন্যায়, একরূপ অপূর্ব্ব ব্যাকুলতা আসিয়া হৃদয়ে উপস্থিত হয়। যাহাহউক, সে কথা সময়ান্তরে আলোচ্য। অদ্য যে বিষয় আমাদিগের বিবক্ষিত, তাহার অবতারণা করা যাইতেছে।

এই প্রস্তাবের শীর্ষদেশে যাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি একজন রসার্দ্রচিত্ত সুকবি। ধনঞ্জয় বিজয় নামক অতিক্ষুদ্র একখানি গ্রন্থ তাঁহার কবিত্বের নিদর্শন-স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। এখানি ব্যায়োগ। রূপকের যে দশ প্রকার ভেদ ক-

ল্পিত হইয়াছে, ব্যায়োগ তাহার অন্যতম। অলঙ্কারগ্রন্থে ব্যায়োগের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহা সেই সমস্ত লক্ষণে সংযুক্ত। উত্তরকালরচিত বলিয়াই হউক, বা প্রয়োজনাভাববশতই হউক, সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে ইহার নাম,বা ইহার শ্লোক উল্লিখিত অথবা উদ্ধৃত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, স্বরচিত "সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব" নামক যে গ্রন্থে সংস্কৃত কবিমণ্ডলীর গ্রন্থের পরিচয় ও সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ধনঞ্জয়-বিজয়কার কাঞ্চনাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করেন নাই। গ্রন্থের ক্ষুদ্রাঙ্গতা যে তাঁহার উল্লেখ না করিবার কারণ, এরূপ আমরা মনে করিনা। মহামণি ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও তাহা শিরোধার্য্য। অন্যথা অমরু, ময়ূর ভট্টাদির এত সম্মান কেন? যদিও কাঞ্চনাচার্য্য ময়ূরভট্টাদির সম্পূর্ণ তুল্যকক্ষ নহেন, তথাপি সুকবিশ্রেণীতে অবশ্য পরিগণনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা স্বমতসমর্থনার্থ তাঁহার গ্রন্থের বিষয় সঙ্ক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

গ্রন্থের প্রারম্ভে যে নান্দীশ্লোকদ্বয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অতি উদাত্তভাবপূর্ণ। প্রথম শ্লোকটি বিষ্ণুবিষয়ক। যথা ;—

হরের্লীলাবরাহস্য দংষ্ট্রাদণ্ডঃ স পাতুবঃ।
হেমাদ্রিকলসা যত্র ধাত্রীচ্ছত্রশ্রিয়ং দধৌ।

প্রলয়কালে নিখিল জগৎ জলপ্লাবিত হইলে ভগবান্ নারায়ণ বিশাল বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দশনদ্বারা ধরণীমণ্ডলকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই সময়কে অধিকার করিয়া কবি মঙ্গলাচরণ করিতেছেন ;—লীলাচ্ছলে বরাহমূর্ত্তিধারী ভগবান্ বিষ্ণুর সেই বিশাল দশন তোমাদিগকে রক্ষা করুন, যে দশনের উপরি পৃথিবী ছত্রের শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং যে দশন সেই পৃথিবীরূপ ছত্রের দণ্ড স্বরূপ হইয়াছিল এবং স্বর্ণময় সুমেরু যে উর্দ্ধকৃত পৃথিবীরূপ ছত্রের কলসস্বরূপ (ছত্রের শিরঃস্থিত বস্তুবিশেষ) হইয়াছিল। পাঠকগণ দেখুন, সংক্ষিপ্তবাক্যে কতদূর অলৌকিক ভাবের পরিব্যক্তি হইয়াছে।

নান্দীর দ্বিতীয় শ্লোকটি কালীবিষয়ক। যথা ;—

তদ্বঃ প্রমার্ষ্টু বিপদঃ প্রণতার্ত্তিহন্ত্র্যা
ন্যস্তং পদং মহিষমূর্দ্ধনি চণ্ডিকায়াঃ।
বৈরী যদীয়নখরাংশু-পরীতশৃঙ্গঃ
শক্রায়ুধাঙ্কিতনবাম্বুধরপ্রভোঽভূৎ॥

ভগবতীর মহিষাসুরের সহিত সমর সময় অবলম্বন করিয়া কবি কহিতেছেন,—দেবী চণ্ডিকার প্রণতজনের পীড়াহর সেই চরণ তোমাদিগের বিপত্তিনাশ করুন, যে চরণ মহিষরূপী অসুরের মস্তকে স্থাপিত হইলে সেই চরণের অরুণনখশ্রেণীর প্রভায় মহিষের কুটিল শৃঙ্গদ্বয় সুরঞ্জিত হওয়ায় ঘোরকৃষ্ণবর্ণ মহিষাসুর ইন্দ্রধনুঃশোভিত নবমেঘের শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই শ্লোকে কি অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্যভাব উদ্ভাবিত হইয়াছে!

বিরাট নৃপতির উত্তর গোগৃহ হইতে যে অসংখ্য গো রাজা দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক হৃত হয়, তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সেই সকল গোর প্রত্যানয়ন এ গ্রন্থের বর্ণনীয়। শরৎকাল যুদ্ধাদির অনুকূল বলিয়া গ্রন্থের প্রারম্ভেই শরৎ সূচনা করা হইয়াছে। অনন্তর নায়ক ধনঞ্জয়ের যুদ্ধযাত্রা। যাত্রাকালে নায়কের হৃদয়ভাব দেখুন ;—

অর্জ্জুনঃ। (সোৎসাহং) অনুকূলং দৈবং-লক্ষ্যতে যতঃ,
যা লতান্বিষ্যতে সৈব লগ্না সম্প্রতি পাদয়োঃ।
কুরুরাজোভিযাতব্যঃ স্বয়মেব সমাগতঃ॥

অর্জ্জুন উৎসাহের সহিত বলিতেছেন, দৈব অনুকূল বলিয়া বোধ হইতেছে। যে লতাকে অন্বেষণ করিতেছি, সেই লতা পদদ্বয়ে আসিয়া সংলগ্ন হইল। যে কুরুরাজের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রার্থে উৎসুক ছিলাম, তিনি স্বয়ংই উপস্থিত !

যুদ্ধে প্রবল দায়াদরূপ শত্রু পরাজয়ে যশঃসুখলাভউৎসাহে উৎসাহিত হইলেও তাহাদিগের গোহরণরূপ দুষ্কার্য্য স্মরণ করিয়া নির্ব্বিণ্নচিত্তে কহিলেন,—"রে সুযোধন ! পূর্ব্বপুরুষ গণ বিপুলভুজবলে যে রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তুই কপটপাশক্রীড়াচ্ছলে সেই রাজ্য হস্তগত করিয়া অদ্য গোহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। হাধিক্! আমাদিগের কুলগুরু ভগবান্ চন্দ্রমা তোর দ্বারা লজ্জাপ্রাপ্ত হইলেন।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই যুদ্ধোপকরণাদিসহ বিরাটকুমার আগমন করিলেন। অর্জ্জুন রথারূঢ় হইলেন ও বিরাটকুমার সারথি হইয়া বেগে রথচালনা করিতে লাগিলেন। কএকটি শ্লোকে সারথিমুখে অশ্ব ও রথের গতি অতিসুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। অবিলম্বেই গোপালক সকল দৃষ্টিগোচর হইল। অর্জ্জুন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

রে রে গোপালা অলংবিষাদেন। তথাহি ;
সিঞ্চন্তঃ করুণারসেন হৃদয়ং যাবন্ন বৎসা অমী
মাতুর্মার্গবিলোকনব্যসনিনো মুঞ্চন্তি হম্বারবান্।
যাচন্তে নহি যাবদেব শিশবঃ পাতুং পয়ঃ সোৎসুকাস্তাবদ্গাব ইহেত্যবেত ভবতাং চেতোজ্বরঃ শাম্যতু॥

"রে রে গোপসকল ! তোমরা বিষাদ দূর কর। এই যে গোবৎস সকল মাতার পথের প্রতি সোৎকণ্ঠে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক করুণরসে হৃদয় আর্দ্র করিতেছে, ইহারা যাবৎ হম্বারব না করে, আর শিশুগণ উৎসুক হইয়া যাবৎ দুগ্ধপানের জন্য প্রার্থনা না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত গোসকল এইস্থানে আছে বলিয়া জানিও। তোমাদিগের মনের উদ্বেগশান্তি হউক।"

অনন্তর অনতিদূরে কুরুসৈন্যরাশি সন্নিবেশিত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইল। অবিলম্বে দৃষ্ট হইল অশ্বসমূহের খুরাভিঘাতে উত্থিত ধূলিরাশি 'নীলকণ্ঠকণ্ঠরুচি' ধারণ পূর্ব্বক নভস্তল আচ্ছন্ন ক-

রিতেছে, ‘ভর-পূর্য্যমাণ’ গভীর শঙ্খনাদে দিগন্ত প্রতিনাদিত হইতেছে, উর্দ্ধে পক্ষিকুল ভয়ে দ্রুত উড্ডয়মান, নিম্নে আরণ্যপশুগণ তাদৃশ সম্ভ্রমচকিত। ক্রমে রথ সৈন্যশ্রেণীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বিপক্ষবীরগণ অর্জ্জুনকে একাকী উত্তরের সহ প্রতিবলে অবগাহন করিতে দেখিয়া নানাবিতর্ক করিতে লাগিল। এই সময়ে কুরুরাজ সেনানীদিগকে সজ্জিত করিতেছিলেন। পার্থ রাজপুত্র উত্তরকে তাহা দেখাইলেন। উত্তর কহিলেন, দেব, বিপক্ষযোদ্ধৃবর্গের বলবীর্য্য ও স্বরূপ অবগত হওয়া সারথির একান্ত কর্ত্তব্য। পার্থ কহিলেন, ঐ দেখ, রোষকষায়িতলোচন হিড়িম্বঘাতীর সম্মুখেও যে সাহসী বিষধরের অঙ্গ হইতে নির্ম্মোকের ন্যায় দ্রৌপদীর হৃদয়-স্থল হইতে লজ্জাদুকূলাঞ্চল আকর্ষণ করিয়াছিল, সে ঐ দুঃশাসন, কুরুরাজের দক্ষিণভাগে। (১) কুমার কহিলেন, সাহসের পরাকাষ্ঠা বটে! পার্থ কহিলেন, এদিকে দেখ (২) অন্য অঙ্গনাসংসর্গ চিরপরিহার করিয়াছেন বলিয়া প্রণয়বশে ধবলবেশা কীর্ত্তিদেবী পলিতচ্ছলে যাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, যিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে সুবিশ্রুত জামদগ্ন্যের বিজেতা, তিনি ঐ দেবব্রত ভীষ্মদেব,বিপুলযশাঃ আমাদিগের পিতামহ। এই সময়ে বৈমানিকগণ যুদ্ধদর্শনলালসায় নভোমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সবিস্ময়ে দেখিলেন, এক দিকে অগণ্য যুদ্ধদুর্ম্মদ কর্ণাদি বীরগণ, অপরদিকে অসহায় রথী পার্থ সমরে প্রবেশ করিয়াছে। দেখিয়া বুঝিলেন, বিপুলতেজোময় সত্ত্ব অপায়ের প্রতি দৃক্‌পাত করে না। এদিকে কুমার উত্তর অগ্রে অবলোকন করিয়া কহিলেন, দেব! কুরুরাজই আসিতেছেন। পার্থ কহিলেন, তবে আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইল। অবিলম্বে রাজা দুর্য্যোধন রথারোহণে পুরোবর্ত্তী হইয়া পার্থের অভিমুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, (৩) অহে সাহসিক! বনবাসের ক্লেশরাশিতে কি জীবনে এমন নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, যে তুমি একাকী এই অসংখ্য যোদ্ধার সহ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ধ-

---

(১) রোষোৎকর্ষকষায়িতোল্বণদৃশোঽপ্যগ্রে হিড়িম্বদ্বিষঃ
পাঞ্চালীহৃদয়স্থলাৎ সরভসং লজ্জাদুকূলাঞ্চলঃ।
নির্ম্মোকঃ ফণিনস্তনোরিব বলাৎ যেনাবকৃষ্টঃ পুরা
সোঽয়ং সাহসিকাগ্রণীস্তনুরথো দুঃশাসনস্তিষ্ঠতি॥

(২) অন্যাঙ্গনাপরিহৃতিপ্রণয়েন কীর্ত্ত্যাবালিঙ্গিতো ধবলয়া পলিতচ্ছলেন।
দ্বন্দ্বাহবপ্রকটনির্জ্জিতজামদগ্ন্যো-
দেবব্রতঃ পৃথুযশাঃ স পিতামহোনঃ॥

(৩) বনবাসপরিক্লেশাৎকিং নির্ব্বিন্নোসি জীবনে
যদভীরেকএব ত্বমনেকৈর্যোদ্ধুমুদ্যতঃ॥

নঞ্জয় সোপহাসে (৪) কহিলেন, পার্থ একাকী কালকেয়ের সহ নিবাতকবচগণকে ভস্মীভূত করিয়াছিল; একাকীই বাসুদেবের ভগ্নীকে হরণ করিয়া ছিল, আর সেই একব্যক্তিই খাণ্ডববন অনলে দগ্ধ করিয়াছিল। পার্থের সমরে এ পন্থা নূতন নহে। দুর্য্যোধন কহিলেন, উপহাসে প্রয়োজন কি, পরীক্ষাস্থল সংগ্রামই উপস্থিত হইয়াছে। পার্থ সহাস্যে কহিলেন, কুরুনাথ! এস্থান হইতে অপসরণ কর; সে অন্যবিধ দ্যূতক্রীড়া, যাহাতে দ্রুপদরাজপুত্রীকে দাসী করিয়াছিলে; এখানে শরশলাকাপাতপূর্ব্বক প্রতি নৃপতির শররূপ অক্ষে ক্ষত্রিয়দিগের দ্যূতক্রীড়া হইয়া থাকে। দুর্য্যোধন সরোষে বলিলেন, যাহার হস্ত সুচিরকালকার্ম্মুকাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া হস্তিদন্তনির্ম্মিত বলয়ে ভূষিত হইয়া আসিতেছে, তাহার অভ্যন্ত নৃত্যশালায় প্রবেশই উচিত, এস্থানে নহে; এ সংগ্রামস্থান, প্রবীর পুরুষের উপযুক্ত। বিরাটপুত্র সকটাক্ষে উত্তর করিলেন, (৫) আর্য্য! আপনি ইহাকে যে চিরপরিত্যক্ত কার্ম্মুকাভ্যাস বলিতেছেন, তাহা যুক্তই বটে। যেহেতু ইন্দ্রপ্রেরিত গন্ধর্ব্বগণ যখন আপনাদিগকে বন্ধন করিয়া লইয়াযায়, তখন কৃপাপরবশ নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশক্রমে আপনাদিগের মোচনার্থ ইনি যে শরপঞ্জর রচনা করিয়াছিলেন, অতি বিহ্বলতা প্রযুক্ত আপনি তাহা দেখিতে পান

(৪) একোনিবাতকবচান্ সহ কালকেয়ৈর্ভস্মীচকার ভগিনীমহরচ্চ শৌরেঃ। একেন খাণ্ডববনং জুহুবেঽনলে চ পার্থস্য নাভিনব এষ রণেষু পন্থাঃ ॥
দুর্য্যো। অলমেতৈরুপহাসৈঃ উপস্থিতো নিকষোপলোপমঃ সংগ্রামঃ।
নায়কঃ। (সহাসম্।)

অপসর কুরুনাথ দ্যূতমন্যাদৃশং তৎ দ্রুপদনৃপতিপুত্রী যত্র দাসীকৃতাসীৎ। ইহ হি শরশলাকাপাতপূর্ব্বং সগর্ব্বং প্রতিনৃপতিশরাক্ষৈঃ ক্ষত্রিয়দ্যূতকেলিঃ ॥

দুর্য্যো। (সামর্ষং)।

করিবদনবলয়ভূষিতকরশ্চিরত্যক্তকার্ম্মুকাভ্যাসঃ।
নর্ত্তনশালাংপ্রবিশ প্রবীরপুরুষোচিতো হি সংগ্রামঃ ॥

(৫) কুমারঃ। (সোপহাসম্) আর্য্যৈনং চিরপরিত্যক্তকার্ম্মুকাভ্যাস ইত্যভিধৎসে তদ্যুক্তং।

সংক্রন্দনপ্রহিতখেচরবর্গবদ্ধ-
যুষ্মৎকৃপাকুলনিজাগ্রজশাসনেন।
ভীমানুজেন বিহিতা শরপঞ্জরশ্রী-
র্নালোকিতাহি ভবতা নৃপ বিহ্বলেন ॥

দুর্য্যো। সূত অলং বিপ্রজনোচিতবাক্কলহেন। বিষমেয়ং ভূমিঃ। রথসঞ্চারোচিতাং ভুবমবতরাম। ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।
বিদ্যাধরঃ। নায়করথং নির্দ্দিশ্য। দেব!

ত্বন্নন্দনস্যন্দনবাজিরাজি-
খুরক্ষতক্ষুণ্ণরজঃপতাকাঃ।
বিপক্ষবক্ষোহরণিমন্থনোত্থ-
প্রতাপবহ্নেরিব ধূমলেখাঃ ॥

নাই। দুর্য্যোধন কহিলেন, সূত! ব্রাহ্মণের ন্যায় বাক্‌কলহে প্রয়োজন কি? এভূমি অতি বন্ধুর, রথসঞ্চারোপযুক্ত ভূমিতে অবতরণ কর। অনন্তর উভয়ে রণভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। অশ্বসমূহের খুরাহত ধূলিরাশি উত্থিত হইতে লাগিল। আকাশে বিদ্যাধর অর্জ্জুনের রথের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, দেব দেখুন আপনার আত্মজের রথযোজিত অশ্বসমূহের খুরোদ্ধত ধূলিরাশি বিপক্ষদিগের বক্ষঃস্থলরূপ অরণিদণ্ডজাত প্রতাপবহ্নির ধূমরাশি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এদিকে যুদ্ধঘোষণা হওয়ায় অশ্বের হ্রেষারবে হস্তীর বৃংহিতে, বিপুল জ্যাঘাতশব্দে যুদ্ধবাদ্যরাবে ও মদহস্তিনিবহের স্কন্ধলম্বি ঘণ্টানিনাদে যুদ্ধস্থলে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। অর্জ্জুন অদ্ভুত শিক্ষাবলে অতি লঘুহস্তে বাণবর্ষণে নিমেষমধ্যে কাহাকে খণ্ডিতগণ্ড, কাহাকে ভগ্নকোদণ্ড, কাহাকে শীর্ষকহীন, কাহাকে নির্ভিন্নচক্ষুঃ, কাহাকে ভগ্নভুজ, কাহাকে ক্ষতবক্ষঃস্থল করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্রের পার্শ্বচর বিদ্যাধর পার্থের ক্ষুতহস্ততায় নিমেষ মধ্যে সংগ্রাম-ক্ষেত্রের অপূর্ব্বদশা দেখিয়া সবিস্ময়ে সব্যগ্রে ইন্দ্রকে কহিলেন, দেব দেখুন দেখুন, (৬) সৈন্যরাশিতে এই রণভূমি ভাদ্রমাস দুর্দ্দিনের আকার ধারণ করিয়াছে। তথাহি, মদস্রাবী মাতঙ্গযূথ বর্ষুক মেঘজালের ন্যায় আচরণ করিতেছে, এই বিচিত্র কার্ম্মুকগুলি ইন্দ্রধনুঃ বলিয়া বোধ হইতেছে, শ্বেতচ্ছত্র সকল শিলীন্ধ্র পুষ্পের শোভা ধারণ করিয়াছে, আর অস্ত্রসংঘট্টনে সমুদ্ভূত বিক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ খদ্যোত পুঞ্জের ন্যায় আচরণ করিতেছে, এবং জ্বলন্ত নারাচ সকল অশনির ন্যায় বোধ হইতেছে।

অতঃপর যে ভয়ঙ্কর ও মনোহর যুদ্ধব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে আমরা তাহার প্রদর্শনে বিরত হইলাম। কারণ, সংক্ষেপে পরিচয়-প্রদানই আমাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু নিতান্ত অন্যায় হয় বিবেচনা করিয়া ২টীমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমরা কবির বর্ণনাশক্তির পরিচয় দিব।

প্রাচীনকালে যেরূপ অলৌকিকভাবে যুদ্ধদৃশ্য বর্ণিত হইত, এ কবিও সে প্রণালী পরিত্যাগ করেন নাই। ক্রমে বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি বৈনায়কঅস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন বিমানচারিগণ দেখিলেন,--

সিন্দূরারুণমৌলিভিঃ স্বদশনপ্রোতাম্বুদ
শ্রেণিভি
র্নীলোদস্তকরাগ্রমাক্রতভর-প্রোজ্ঝিতভারা-
গণৈঃ।

(৬) বিদ্যাধরঃ। দেব পশ্য পশ্য
মুঞ্চদ্ভির্মদবারি বারণগণৈর্মেঘায়িতং
কার্ম্মুকৈ-
রৈন্দ্রৈঃ শক্রশরাসনায়িতমথশ্ছত্রৈঃ শি-
লীন্ধ্রায়িতং।
খদ্যোতায়িতমস্ত্রঘট্টনসমুদ্ভূতস্ফুলিঙ্গৈঃস্ফুর
ন্নারাচৈরশনায়িতং রণভুবা সৈন্যোর্মভ-
স্যায়িতম্॥

পাদাঘাতচলৎকুলক্ষিতিধরৈঃ সঙ্কীর্ণমাল-ক্ষ্যতে
ছেরম্বাস্ত্রবিনিঃসৃতৈর্ম্মদমুখৈঃ শুম্বৈরমৈর-ম্বরম্ ॥

পার্থ অবিলম্বে সিংহাস্ত্রপ্রয়োগে তাহার নিবারণ করিলেন ;—

দংষ্ট্রাজ্যোতিঃ-খচিতগগনৈঃ কেশরাটোপভীমৈ-
ক্কল্লাঙ্গুলৈঃ ক্ষিতিধরগুহাসঞ্চরদ্ধীরনাদৈঃ ।
সিংহৈরস্তর্নখরশিখরোৎখাতকুম্ভস্থলাসৃগ্
ধারাস্বাদব্যসনবিবশৈঃকাপিনীতাগজেন্দ্রাঃ॥ ইত্যাদি ।

বিদ্যাধর কহিলেন, দেব ! জয়ের আর অপেক্ষা নাই । ভীষ্মের অশ্বসকল হত, দ্রোণাচার্য্যের সারথি নিহত, কর্ণের রথ চূর্ণীকৃত, দ্রোণপুত্রের ধনুর্লতা ছিন্ন হইয়াছে, কৃপাচার্য্য বিচেতন হইয়াছেন ও কুরুনাথ ভয়ক্রত নিজ সৈন্যগণের সহ পলায়ন করিতেছেন এবং অর্জ্জুন তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছেন । প্রতীহারী নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, দেখুন দেখুন, দুর্য্যোধনের অত্যাহিত উপস্থিত । বিদ্যাধর কহিলেন, ভয় নাই, বিমুখের উপরি "ইন্দ্রতনয়ের" অস্ত্র কখনও নিপতিত হয় না। বাস্তবিক তাহাই হইল । পার্থ নিরস্ত হইলেন । সমরও শেষ হইল এবং গোসকল প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া গোরক্ষকদিগকে সমর্পণ পুর্ব্বক পৌরজন কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পুরপ্রবেশ করিলেন । অতঃপর ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত তদীয় মিলন, অজ্ঞাতবাস হইতে মুক্তি, বিরাটের অনুনয় ও কন্যাদান সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কবি গ্রন্থসমাপ্তি করিয়াছেন । গ্রন্থের শেষ শ্লোকটি পাঠে প্রতীত হয়, যে মগুন নামক কবির সহিত তাঁহার প্রতিযোগিতা ছিল । কিন্তু হায় ! কোথায় মণ্ডন ! তাঁহার প্রতিযোগীর কাব্যে তদীয় নামোল্লেখ মাত্রেই পৃথিবীতে এককালীন তাঁহার অস্তিত্ব আমাদিগের বোধবিষয় হইতেছে, অন্যথা তাহারও সম্ভাবনা ছিলনা হায় ! মানবেরা যে যশঃ কীর্ত্তিকে অবিনশ্বর বলিয়া অভিমান করেন, তাহারও এইরূপ নশ্বরতা এবং যশোলিপ্সাজনিত পণ্ডিত মণ্ডলীর যে অন্যোন্যবিরোধ সমাজে নিন্দনীয়, তাহারও এরূপ সুফলপ্রসবিতা !

ধনঞ্জয়বিজয় সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল, ইহাতেই পাঠক গ্রন্থকারের কবিত্ব সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন । তদ্বিষয়ে বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন । হৃদয়গত রসভাবোচ্ছ্বাস ভাষায় যথাযথরূপে স্ফুটীকৃত হইলেই কবিতার উৎপত্তি হয় । পাঠমাত্রেই প্রতীতি হয় যেন উহা কবির লেখনী হইতে সচ্ছন্দপ্রবাহে নির্গত হইয়াছে, কবিকে তন্নিমিত্ত সামান্য প্রয়াসপরম্পরাও স্বীকার করিতে হয় নাই । উহা পাষাণোত্থ উৎসধারা, মনুষ্যের হস্তব্যায়ামোৎক্ষিপ্ত জলগণ্ডূষ নহে । কবিতার বাহ্য নিদর্শন স্থূলতঃ এই দেখা যায়, যে উহাতে অনাবশ্যক শব্দমাত্রও লক্ষিত হয় না, সমস্তই প্রকৃতরসের পরিপুষ্টির নিমিত্ত

প্রযুক্ত হয়। বিশেষতঃ সংস্কৃত কবিতার আর এক রীতি এই যে কতিপয় পদ শ্রুতিগোচর হইলেই তাহার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। অলক্ষ্য ব্যবহিত স্থান হইতে বন্ধুজনের স্বর শুনিয়া যেমন প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে, অশ্রুতপূর্ব্ব প্রকৃত কবিতা শ্রবণেও তেমনি তৎক্ষণাৎ উহা কবিনির্ম্মিতি বলিয়া পরিচয় সঞ্জাত হয়। গ্রন্থারম্ভে শরদারম্ভকালীন প্রভাতবর্ণনাবসরে,—

দারাণাংমুরবৈরিণো রতিপতের্মাতুস্ত্রি-
লোকীজিতঃ
স্ফারৎপঙ্কজকোটরোদরজুষো নিদ্রাবি-
রামে শ্রিয়ঃ।
প্রত্যূষ্যুদ্ভমরালপক্ষপটহধ্বনিপ্রবন্ধানুগং
ভৃঙ্গী মঙ্গলগাথিকেব সততং প্রোৎকূ-
জতি প্রাঙ্গণে॥ ৭

(৭) এই বর্ণনায় রাজ্ঞীর নিদ্রাভঙ্গসময়ে বৈতালিকবধূর তাললয়ানুগত মাঙ্গলিক গীতপ্রসঙ্গ ব্যঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু ইনি সামান্য রাজ্ঞী নহেন। ইনি জগতের উৎপাতস্বরূপ দৈত্যগণের নিহন্তা বীরশ্রেষ্ঠের মহিষী, ত্রিভুবনবিজয়ী রতিপতির জননী, স্বয়ং ত্রিভুবনসৌন্দর্য্যরূপিণী লক্ষ্মী দেবী। সুকোমল কমলগর্ভ তাঁহার শয়নাগার। প্রভাতে রাজহংসকুল জাগ্রত হইয়া অলস পক্ষপুটের সঞ্চালনশব্দসহকারে সেই কমলময় সরোবরে অবতরণ করিতেছে, মধুকরী অগ্রে অগ্রেই আগমন করিয়া মধুর গুঞ্জন আরম্ভ করিয়াছে।

এই কবিতা যখনই আমাদিগের কর্ণে প্রবেশ করে, তখনই ইহার রচয়িতাকে—স্বভাবের এই দ্বিগুণবৈচিত্র্যবিধাতাকে কাব্যজগতের অন্যতর বিধাতা বলিয়া আমাদিগের প্রতীতি জন্মে। বাস্তবিক, গায়কের অসম্পূর্ণগীত রাগপ্রবাহ, চিত্রকরের অসম্যক্ অঙ্কিত রেখাময় আলেখ্য এবং কবির ক্ষীণধারায় অভিব্যক্ত বাগমৃত সহজেই স্ববিভবসামগ্র্যের পরিচয় দেয়। যদিও মূল আদর্শের সমক্ষে ইহা অকিঞ্চিৎকর,—মহাভারতকে সহস্রশাখ অক্ষয় বটবৃক্ষ বলিলে ইহা তাহার একটি শাখারও তুলনীয় কি না সন্দেহ, তথাপি ইহা রমণীয়। সেই বিশালমূর্ত্তি পাদপের যেমন এক ভয়বিস্ময়বিমিশ্র অপূর্ব্ব শোভা, সেই বৃক্ষকে বাল্যদশায় কতিপয় ঘনসরসশ্যামলপল্লবশোভিত ক্ষুদ্র একটি শাখারূপে অবলোকন করিলে তাহারও তেমনি আর একরূপ অপূর্ব্ব ললিতকান্তি আমাদিগের হৃদয়কে মুগ্ধ করে। সংসারে এরূপ শোভা গ্রহণ করিতেও হৃদয়ের দ্বার স্বভাবতঃ উদ্ঘাটিত হয় সন্দেহ নাই। শ্রীশা—

সুখসুপ্তা লক্ষ্মীদেবী সেই স্বরসঙ্গীতে সমুদ্বোধিত হইলেন; অমনি কমলদল উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল; লক্ষ্মীদেবী নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক বহিরাবির্ভূত হইয়া অমৃতনিস্যন্দিনী দৃষ্টিপাতে ত্রিজগৎ সমুদ্ভাসিত করিলেন। ইহা অপেক্ষা প্রভাতবর্ণন আর কত মধুর হইতে পারে?

ডেস্‌ডিমোনা।

১

নিশীথ রজনী, ঘোর অন্ধকার
ঘেরেছে সাইপ্রস্ শত প্রসরণে,
কুসুম-কোমল শান্তির আধার
মার অঙ্কে যথা চিন্তাশূন্য মনে

২

নিদ্রা যায় শিশু, তেমতি সুন্দর
সাইপ্রস্ শু'য়ে ভূমধ্য সাগরে
বীচিরবচ্ছলে মনোমুগ্ধকর
ধীরে ধীরে ধীরে শ্রবণ বিবরে

৩

ঘুমের অস্ফুট সংগীত ঢালিয়া
হরিছে চেতনা ; সাগরে আঁধারে,
আঁধারে সাগরে দেহ মিশাইয়া
রাজত্ব করিছে আজ চারি পারে।

৪

ধীরে ধীরে ধীরে অতি ধীরে ধীরে
ক্ষুদ্র বীচিমালা খেলিছে পুলিনে,
যথা নিদ্রাগত শিশুর শরীরে
সঞ্চালেন কর জননী যতনে।

৫

এ দিগন্ত ব্যাপী আঁধার ভেদিয়া
ভয়ে ভয়ে যেন তারকা জ্বলিছে,
লোহিত বিভায় দিশি উজলিয়া
সুদূরে আগ্নেয় তরঙ্গ খেলিছে।

৬

নির্জ্জন-নিস্তব্ধ-সাগরসৈকতে
ধূমবর্ণ-গণ্ড-শৈলের প্রমাণ
শোভিতেছে দুর্গ, নিদ্রিত জগতে
দাঁড়াইয়া যেন রুদ্র নিদ্রা যান।

৭

আঁধারে ডুবিয়া উচ্চ দুর্গচূড়ে
কাদম্বিনী-কোলে ফট্ ফট্ করি
সুন্দর বিচিত্র বৈজয়ন্তী উড়ে
নিঃশব্দে ভ্রমিছে সশস্ত্র প্রহরী।

৮

নিদ্রিত জগত গভীর নিদ্রায়
দুর্গকক্ষে এক সতী ডেস্‌ডিমোনা
কুসুম-কোমল ধবল শয্যায়
নিদ্রা যায় ;—যেন বিশদ-বসনা

৯

ভিক্টোরিয়া লিলি রূপে আলোকরি
সরসীর জলে রয়েছে ফুটিয়া
কিম্বা জ্যোতির্ম্ময়ী তারকা আমরি!
যেন সে কক্ষেতে পড়েছে খসিয়া—

১০

জ্বলিতেছে দীপ যেন ম্লান-জ্যোতিঃ
ভবিষ্যৎ স্মরি ; কিছুই জানেনা
সোণার প্রতিমা প্রেম-মূর্ত্তিমতী
নিদ্রা যায় সুখে সতী ডেস্‌ডিমোনা!

১১

ঊর্দ্ধমুখী হয়ে নিদ্রিতা সুন্দরী ;
দক্ষিণ মৃণাল-ভুজ সুগঠিত
স্থাপিত কোমল স্ফীত বক্ষোপরি,
বাম বাহু নিম্নে হেলায় লম্বিত।

১২

সুন্দর শৃঙ্খলা বিহীন হইয়া
লাবণ্য মাখাম ললাটে কেমন
চূর্ণ কুন্তলের লহরী পড়িয়া
নয়ন নাসাগ্র করিছে চুম্বন।

১৩

প্রশান্ত ললাটে, মুদিত নয়নে,
কোমল কপোলে, সূক্ষ্ম নাসাশিরে
অলকাবলীতে, কর্ণ-আভরণে,
ক্ষীণ দীপালোক খেলে ধীরে ধীরে।

১৪

"—অকারণ নহে, নহে অকারণ,
কিন্তু সে কারণ—নিশার কুন্তলে
মুকুতা-রূপিণী স্ফটিক হৃদয়
হাস যে তোমরা, লো তারা কুন্তলে,

১৫

"সে কারণ, হায়,—সে পাপ-কারণ
বলিব না আমি শু'নোনা তোমরা ;
শুনিলে সে কথা রোধিবে শ্রবণ,
অঙ্গ শিহরিবে হবে জ্যোতিঃ হারা।

১৬

"—কিন্তু রক্ত-পাত,—তার রক্ত-পাত
করিবনা ; তার সোণার শরীরে,
করিব না আমি কভু অস্ত্রাঘাত
কিন্তু তথাপিও বধিব তাহারে।

১৭

"যদি নাহি বধি, যদি এ ধরায়
এ কাল-সাপিনী আরও কিছু দিন
ধরে পাপ-দেহ, নাহি জানি হায় !
কত হতভাগা কত জ্ঞানহীন

১৮

"ব্যক্তিরে সে বিষে করিবে জর্জ্জর !
তার বাগুড়ায় আমারি মতন
রূপে মুগ্ধ হয়ে কত মুর্খ নর
পতঙ্গের মত হইবে পতন।

১৯

"নিবাইব এই প্রদীপ এখনি।
—তার পর ?—এই ঘোর পাপিষ্ঠার
জীবনপ্রদীপ। কণকবরণি
লো জ্বলন্ত-শিখা তোরে একবার

২০

"নিবাইয়া পুনঃ দীপ্ত করা যায়,
কিন্তু সুধামুখী কলো বিষধরি,
জীবনপ্রদীপ জ্বালাইতে হায়
পারিবি কি যদি নির্ব্বাপিত করি ?

২১

"এই হস্তে যদি প্রাণ-পুষ্প তোর
ছিঁড়ি একবার, জীবন্ত রাখিতে,
অভাগিনি, আর নহে সাধ্য তোর ;
শুকাইবে এক দিবসে নিশিতে।

২২

"এ সুরভি পুষ্প পুর্ব্বে ছিঁড়িবার
একবার আমি দেখিব আণিয়া"
এই বলি সেই প্রেমপ্রতিমার
বিম্বাধরে স্বীয় অধর স্থাপিয়া

২৩

করিল চুম্বন, সতী শিহরিলা।
"আর একবার—এই শেষ বার"
সহসা ললনা জাগ্রত হইলা।
পরাজিয়া মৃদু-বীণার ঝঙ্কার

২৪

কহিলা সুন্দরী,—"ওকে প্রাণেশ্বর ?
"আমি, ডেসডিমোনা" কহিলা ওথেলো
"হইল রজনী দ্বিতীয় প্রহর
শোও এসে কেন জাগিতেছ বল ?"

২৫

যথা অগ্ন্যুৎপাৎ আশঙ্কা না করি
আগ্নেয় গিরির নিকটে আসিয়া
নিত্য কর্ম্ম যত দিবস শর্ব্বরী
করিতেছে লোক নিশ্চিন্ত হইয়া;

২৫

কিন্তু অচলের উচ্চ চূড় ফুটি
শিলা, ভস্ম, ধাতু, উত্তপ্ত-অঙ্গার
সহসা যেমন অন্তরীক্ষে উঠি
মুহূর্ত্তেকে ধ্বংস করে চারি ধার।

২৭

সেই রূপ হায় শুদ্ধা ডেস্‌ডিমোনা
ওথেলোর হৃদে রৌরব অনল
গর্জ্জিছে যে তার কিছুই জানেনা ;
যেন নিরমল ঊষার কমল।

২৮

"ঈশ্বরোপাসনা করেছ কি আজ ?
যদি এখনও নাহি করে থাক,
করি কোন মহা গরহিত কাজ
চাও যদি ক্ষমা, শীঘ্র তাঁকে ডাক"

২৯

সুগম্ভীর স্বরে ওথেলো কহিলা।
"একি কথা আজ কহিছ প্রাণেশ ?"
বিস্মিত হইয়া সতী উত্তরিলা।
ওথেলোর মুখে দৃষ্টি অনিমেষ

৩০

স্থাপিয়া সুন্দরী দেখিলা সভয়ে
ওথেলোর আজি ভীষণ মুরতি ;—
চক্ষু দুটি ক্রোধে বিস্ফারিত হয়ে
বৈদ্যুতিক তেজে পাইছে স্ফুরতি ;

৩১

দেহের রক্তিমা হয় অনুমান
বাড়িয়াছে যেন, অধরে রুধির,
কটিবন্ধে জ্বলে অস্ত্র খরশাণ,
স্নেহ মাখা নহে স্বর সুগম্ভীর।

৩২

তীব্রতর স্বরে কহিলা ওথেলো
"কহিলাম যাহা কর শীঘ্র করি ;
এইস্থানে আমি ভ্রমি ক্ষণ কাল
অপ্রস্তুত ভাবে তোমারে, সুন্দরী

৩৩

বধিবনা আমি ; অন্তিম সময়
অন্তর্য্যামী যিনি সম্মুখে তাঁহার
খুলেদেও পাপ-কুটিল-হৃদয় ;
বধিবনা আমি আত্মাকে তোমার।"

৩৪

যেন ডেস্‌ডিমোনা নেশায় বিহ্বল
কিছুই দেখেনা, কিছুই বোঝেনা ;
চক্ষে ঘোরে যেন কক্ষ-ধরাতল,
বলি বলি করি বচন সরে না

৩৫

অবশেষে ধীরে কহিলা সরলা;
"বধিবে আমারে কহিছ কি তাই ?"
"তাই কহিতেছি" দুষ্ট উত্তরিলা ;
"তবে এ দাসীরে তাঁর পদে ঠাই

৩৬

"দিউন ঈশ্বর" এতেক কহিয়া
অশ্রু-পূর্ণ দুটি কমল-নয়ন
আকাশের পানে ধীরে উঠাইয়া
নীরবিলা সতী ; নীরবে তখন

৩৭

দুইটি মুকুতা খসিয়া পড়িল !
ক্রোধান্ধ ওথেলো তাহা দেখিলনা;
জানিস্ দুর্ম্মতি জানিস্ ওথেলো,
এ মুক্তার দুটি নাহিক তুলনা !

৩৮

নিরদয় মূঢ় কহিল অমনি ;—
"তবে তাই হোক্" নম্রতম স্বরে
কহিলা সুন্দরী "অধিক রজনী
হয়েছে প্রাণেশ, ঘোর নিদ্রাভরে

৩৯

"আঁখি দুটি তব লোহিত বরণ,
পরিহাস ছাড়, আইস শয্যায় !"
জাননা অভাগি নিদ্রিত এখন
হইবে আপনি অনন্ত-নিদ্রায় ।

৪০

কহিল ওথেলো ; "নিজ ব্যভিচার,
পাপীষ্ঠা বারেক কর লো স্মরণ।"
মুছিয়া রুমালে মুকুতার ধার
ভগ্নস্বরে সতী কহিলা তখন ;

৪১

"—ওথেলো প্রাণেশ ! মুক্তকণ্ঠে আজ
কহিতেছি আমি ধর্ম্মে সাক্ষী করি
তোমারই মূরতি সতত বিরাজ
করে এ হৃদয়ে দিবস শর্ব্বরী ।

৪২

"একদেবে আমি ভজি ভক্তিভরে ;
সেদেব ওথেলো ! তুমিই আমার
এই ঊর্ম্মিময় সংসারসাগরে
জীবন-তরীর তুমি কর্ণধার ।

৪৩

"অপর পুরুষে অপবিত্র ভাবে
একবার যদি নিরখিয়া থাকি,
যবে দেহ হতে প্রাণ উড়ে যাবে
হে ঈশ্বর ! তুমি ডুবাইয়া রাখি

৪৪

"অতল-অনন্ত রৌরব-অনলে
দিও অভাগীর অনন্ত যাতন।"
এতেক কহিয়া ভাসি অশ্রুজলে
ছিন্নতন্ত্রিসম থামিলা তখন ;

৪৫

কিন্তু ভয়ে ভয়ে দেখিলা চাহিয়া
ক্রোধী ওথেলোর শরীর কাঁপিছে,
চক্ষু রক্তবর্ণ, অধর বহিয়া
ফোটে ফোটে লাল রুধির পড়িছে !

৪৬

"চুপ্ ডেস্‌ডিমোনা !" কহিল ওথেলো
মেঘমন্দ্রসম সুগম্ভীর স্বরে ।
"করিলাম চুপ্ কি হয়েছে বল ?"
ডেস্‌ডিমোনা সতী কহিলা কাতরে ।

৪৭

"কি হয়েছে হায়, কি হয়েছে বল ?"
কহিলা ওথেলো,—"কি হইবে আর
বাছি বাছি যেই শুভ্র শতদলে
যতনে তুলিয়া হৃদয়ে আমার

৪৮

"করিনু স্থাপন, এক বিষধরী
তাহা হতে হায়, বাহির হইয়া
মর্ম্ম স্থানে মোর দংশেছে সুন্দরি !
কি যে হইয়াছে, কাজ কি কহিয়া !

৪৯

"দেখ ডেস্‌ডিমোনা শুন কথা মোর
আসন্ন সময় তব সন্নিকটে,
জীবন-যামিনী শীঘ্র হবে ভোর
নিজ অপরাধ কও অকপটে।

৫০

"কৃত পাপ কেন করি অস্বীকার
পাপের উপরে পাপ চাপাইবে !
কেমনে বহিবে এত পাপভার
পরকালে তব কি গতি হইবে ?,,

৫১

"প্রাণনাথ ! "চুপ্ চুপ্ ! পাপিয়সি !
ওথেলো কাহারো প্রাণনাথ নয়,"
তথাপি কাতরে কহিল রূপসী
"তুমিই আমার আছ প্রাণময় !

৫২

কেশিওকে আমি—ধর্ম্মে সাক্ষী করি
কহি বার বার—কেশিওকে আমি,
ওথেলো তোমাকে তিলার্দ্ধ পাসরি,
ভজি নাই কভু, তুমি মোর স্বামী !"

৫৩

"ভজ নাই তুমি ? পিশাচি, পাপিনি !
ভজ নাই তুমি"—ওথেলো গর্জ্জিল ;
"কেমনে লো তবে কহলো সাপিনি !
আমার রুমাল কেশিও পাইল ?"

৫৪

"আমি দেই নাই !" "তুমি দেও নাই ?"
"আমি দেই নাই ওথেলো প্রাণেশ !
আমি দেই নাই জানেন গোসাঁই
বুঝি সে কোথাও পড়িয়া পাইল !'

৫৫

"ডাক কেশিও রে, সুধাও তাহারে
সে যা সত্য জানে করুক স্বীকার।"
"প্রতারণা আর করিতে আমারে
নারিবে পাপিনি ! সব দোষ তার

৫৬

স্বীকার করেছে ; ডেস্‌ডিমোনার,
ওথেলোর পত্নী—না না তাহা নয় ;
ডেসডিমোনার সহ ব্যভিচার
করেছে কেশিও অনেক সময়।"

৫৭

কহিলা সুন্দরী কাঁদিতে কাঁদিতে
"ওথেলো, এমন অসত্য বচন
পারেনা কেশিও কখন কহিতে।
'সত্য' বিষ হাসি হাসিয়া তখন

৫৮

ওথেলো কহিল ;—"কহিতে পারেনা ;
দুষ্ট কেশিওর চিরদিন তরে
দৃঢ় বদ্ধ মুখ, নীরব রসনা।"
'তবে' ডেস্‌ডিমোনা কহিলা কাতরে

৫৯

"তবে কি কেশিও হয়েছে নিহত ?"
"দেখ ডেস্‌ডিমোনা" উত্তরিল মূঢ়,
"এই শিরোদেশে কেশ সংখ্যা যত
কেশিওর এত সংখ্যক প্রচুর

৬০

"যদি—শুনিছ ত ?—থাকিত জীবন,
ক্ষুধার্ত্ত দুরন্ত শার্দ্দূলের প্রায়
করিতাম আমি একত্রে চর্ব্বণ !
তার সদ্য উষ্ণ শোণিত-ধারায়

৬১

দাবানলসম যে মহা অনল
দহিতেছে হায় ! মরম আমার,
নিবাইয়া তাহা হ'তাম শীতল !
তার পরে—না না কহিবনা আর"—

৬২

"মরেছে কেশিও বিনা দোষে হায় !"
এতেক কহিয়া কাঁদিলা সুন্দরী
"হায় ! হায় ! আজ্ আমি নিরুপায়"
"কেশিওর তরে, কিলো বিষধরি !"

৬৩

গর্জ্জিল ওথেলো—"কেশিওর তরে
করিস্ আক্ষেপ সম্মুখে আমার ?"
এতেক কহিয়া মহাক্রোধভরে
অগ্রসর হল মূঢ় দুরাচার।

৬৪

"ওথেলো, প্রাণেশ !" সজল নয়নে
পতিপ্রাণা সতী কহিল কাতরে
"রেখে এস মোরে গহন কাননে
ভয়াল ভল্লুক যথায় বিচরে।

৬৫

"সেইখানে আমি চিরদিন রব
বিরক্ত তোমারে কভু করিব না ;
যত কষ্ট হয় মনে মনে সব
ব'ধোনা আমারে পরাণে ব'ধোনা !"

৬৬

"বধিবনা তোরে ? পিশাচি ! পাপিনি !
বধিবনা তোরে ?" ঘোর সিংহরবে
গরজিল মূঢ় ;—"একাল সাপিনী
থাকিলে সংসারে সর্ব্বনাশ হবে।"

৬৭

অশ্রুজলে ভাসি, কর যোড় করি
কহিলা সাবিত্রী শোক-ভগ্ন-স্বরে,—
"পোহাইলে এই কাল বিভাবরী
বধো অভাগীরে। আজি দয়া করে

৬৮

"প্রাণেশ ওথেলো ! আজি দয়া করে
জীবিত থাকিতে দেও এ ধরায় !
তব চিরদাসী অন্তিমে কাতরে
তব পদে মাত্র এই ভিক্ষা চায় !"

৬৯

"না না তা হবে না—কখনই হবে না,
—দ্যাখ্ পলাইতে পুনঃ চাস্ যদি,
অস্ত্রাঘাতে ঘাতে দ্যাখ্ ডেস্‌ডিমোনা
বহারিব তোর শোণিত নদী !"

৭০

পতিপদতলে লুঠিত হইয়া
কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তরিলা সতী,
"তবে মুহূর্ত্তেক দাঁড়াও ভাকিয়া
লই দয়াময়ে—অগতির গতি।"

৭১

"না না না আর না"—এতেক কহিয়া
রুদ্র-রূপী মূঢ় অর্দ্ধ-লম্ফ দিল,
দৃঢ় লৌহ জিনি বজ্রাঙ্গুলি দিয়া
দয়িতার গলা চাপিয়া ধরিল।

৭২

"দ্বার খোল, প্রভু, খোল খোল দ্বার,"
"কে তুমি ?" চমকি ওথেলো কহিল ;
"দ্বার খোল আগে" সঙ্গে সঙ্গে তার
বারংবার দ্বারে আঘাত পড়িল।

৭৩

খুলিল দুয়ার। দাসী এমিলিয়া
ঊর্দ্ধশ্বাসে আসি পশিল কোঠায় ;
"যাও যাও প্রভু, যাও দেখ গিয়া
রডারিগো হত হইয়াছে হায় !"

৭৪

"পড়িয়াছে কিসে রডারিগো মারা ?
নহে সে কেশিও—কখন ?—এখন ?
হইয়াছে যম আজ মাতওয়ারা
একের বদলে অন্যের নিধন !"

৭৫

"হায় অকারণে মোর প্রাণ যায় !
জানাইও নাথে প্রণাম আমার,
চলিলাম এমি বিদায় ! বিদায় !"
"—ওহে গলা কর্ত্রী ডেসডিমোনার !"

৭৬

"উঠ উঠ সবে ! হায় ! হায় ! হায় !
কহ ঠাকুরাণী" কাঁদি এমিলিয়া
সুধাইল দাসী ডেসডিমোনায়,—
"কাহার একাজ কহনা ভাঙ্গিয়া ?"

৭৭

"আমি নিজে মরি কারো দোষ নয় !"
ক্ষীণ-ভগ্ন-স্বরে কহিলা ললনা,
"পতি-পদে মোর প্রণাম নিশ্চয়
জানাইও এমি ! ভুলোনা ! ভুলোনা !"

৭৮

কহিতে কহিতে নীরব-রসনা
চক্ষু জ্যোতিঃ-হীন স্পন্দহীন কায়,
স্ফটিক হৃদয়া সতী ডেস্‌ডিমোনা
হইলা মগন অনন্ত নিদ্রায় ! শ্রীদী—

পাণিনি।

সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তিভূমি এক্ষণে কোথায় ? ইহার নির্ম্মাতা কে ? কোন্ সময়ে ইহার সূত্রপাত হয়, এবং কোন্ সময়েই বা কোন্ দেশের লোকেরা ইহার প্রচার করিয়াছিল ? কে কে ইহার উন্নতি করিয়াছিল ? ইহা কি আদিমতম ভারতবাসীদিগের মাতৃভাষা ছিল ? না তাঁহাদের অন্যবিধ ভাষা ছিল, তাহাই সংস্কার পূর্ব্বক নিয়মবদ্ধ করিয়া, সংস্কৃত নাম দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন ? এ সকল নির্ণয় করে কাহার সাধ্য ? এই বর্ষীয়সী ভাষার উৎপত্তিকাল নির্ণয় করে কাহার সাধ্য। উ-

পরে যে "পাণিনি" মুকুটার্পণ করিয়া প্রস্তাব আরম্ভ করিলাম, উনি এই বর্ষীয়সী ভাষার কত নিম্নের বালক তাহা বলা যায় না। এমনি শুনিতে পাণিনি বৃদ্ধতম, কিন্তু এই ভাষার ক্রোড়ে বসাইয়া দেখিলে উহাঁকে সদ্যঃপ্রসূত শিশু বলিয়া বোধ হইবে।

এই ভাষার উৎপত্তিকাল চিন্তার পরপারে লুক্কায়িত আছে। বুদ্ধির অগম্য পথে প্রোথিত আছে—আর তাহা পাওয়া যাইবে না।

যাঁহারা সংস্কারক বা উন্নতি করেন তাঁহাদিগকেও পাওয়া যাইবে না, তাঁহারা ইহলোকে নাই—অনেক শতবর্ষ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আর তাঁহাদিগকে পাওয়া যাইবে না। তবে আমাদেরই দুপাঁচ জন পূর্ব্ব পুরুষ, যাঁহারা সংস্কৃত লইয়া কিঞ্চিৎকাল মাত্র ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুই একজনের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করিব মানস করিয়াছি। তন্মধ্যে পাণিনি, শীর্ষকে যাঁহার নাম অঙ্কিত করিয়াছি, তাঁহারই বিষয় যথাসাধ্য বলিবার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সংস্কৃত ভাষা এদেশীয়দিগের যত্নের ধন। এক সময়ে এদেশীয়েরা ইহার দ্বারা স্বর্গীয় সুধা পানের ক্ষোভ নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। ভাণ্ডরি, ঔপমন্যব, যাস্ক, গালব, শাকল্য, জৈমিনী প্রভৃতি ঋষিকুলের নিকট ইনি দেবভাষা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা যত্নের সহিত ইহার পুষ্টি সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অতঃপর এই সংস্কৃত ভাষা ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃষ্ণ, আপিশালী, শাকটায়ন, ব্যাড়ি, পাণিনি, কাত্যায়ন, ও পতঞ্জলি প্রভৃতি আচার্য্যকুলের নিকট বিশেষ সমাদৃতা ছিলেন, তাঁহারাও যথাসাধ্য ইহাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মার্জনা করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত আচার্য্যদিগের মধ্যে পাণিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ। এখন আর পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মত চলে না, সর্ব্বকনিষ্ঠ পাণিনির মতই এক্ষণে প্রবল। যদিও দুই একটা মত প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ চলে না, সে সকল গ্রন্থ লোপ হইয়াছে।

পাণিনির মত এত প্রবল কেন? তাঁহারই বা এত মান্য কেন? তিনি কোন্ দেশের লোক? কোন্ সময়ের লোক? কাহার পুত্র? এসকল জানিবার জন্য অনেকেরই কুতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ইতঃপূর্ব্বে অনেক মহাত্মাকে সেই কুতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে. তাহা দেখিয়া আমিও তৎপথে পদার্পণ করিতেছি। যদি বল প্রয়োজন কি?—প্রয়োজন না থাকিলে অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিরও বিষয় প্রবৃত্তি হয় না। পাণিনির সময়াদি নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতা দোষে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং নির্ম্মূল কল্পনার আশ্রয়ে থাকিয়া জিজ্ঞাসুদিগকে ভুল বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই জন্যেই আমি তাঁহাদের সিদ্ধান্তে স-

তুষ্ট না থাকিয়া, স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছি।

আমারও যে ভুল হইবে না, ইহাও প্রত্যাশা করা যায় না; কেন না, অতীত বস্তুর যথার্থ নির্ণয় দুঃসাধ্য। অতীত বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষের প্রভুতা নাই। প্রত্যক্ষ কেবল বর্ত্তমান লইয়াই থাকেন। অনুমানও কখন কখন ভ্রম বুঝাইয়া দিয়া থাকে, যেহেতু অনুমান-প্রমাণটি প্রত্যক্ষ-সংস্পৃষ্ট। ভ্রান্ত অনুমান বস্তুর দোষেও হয়, দেখিবার দোষেও হয়। আর একটি প্রমাণ আছে তাহার নাম 'ঐতিহ্য।' ঐতিহ্য কি, তাহা বলিতেছি। যাহা বৃদ্ধপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে তাহাই ঐতিহ্য। যদি কোন প্রবাদ বহুকাল হইতে অবিচ্ছেদে চলিয়া আইসে, তবে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করার রীতি আছে, কিন্তু তাহা সত্য না হইতেও পারে। অতএব অতীত বস্তুর যাথার্থ্য-নির্ণয়পক্ষে যখন এত বাধা আছে, তখন আমিও যে অভ্রান্ত নির্ণয় করিতে পারিব ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে পদ্ধতিতে অতীত বস্তুর নির্ণয় হওয়া সুসম্ভব, সেই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা দোষ ত্যাগ করিয়া, নির্মূল কল্পনা বর্জন করিয়া অতি সাবধানে নির্ণয় করিব, ইহাতে যতটুকু সত্যের আকর্ষণ সম্ভব, পাঠকগণ তাহাই পাইবেন।

পুরাতত্ত্ব জানিবার দুইটি মাত্র উপায় আছে, যুক্তি ও ঐতিহ্য। অবিচ্ছেদেও ধারাবাহিকরূপে সমাগত বিশ্বাসযোগ্য জনপ্রবাদ. তৎকালের কি তৎপরবর্ত্তী কালের লিপি, ঘটনাবিশেষের লুপ্তাবশেষ, প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য, এই সকল উহার আলম্বন। এই সকল অবলম্বন করিয়াই যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রাচীন বস্তু অনুসন্ধান করিতে হয়। যে যুক্তির কোন মূল নাই, যে যুক্তি পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ, একদিকে সংলগ্ন, একদিকে অসংলগ্ন, এমন যুক্তি পরিত্যাজ্য। ঐতিহ্য পক্ষেও এই রীতি। এই রীতির অনুগত থাকিয়াই পাণিনির জীবনী নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

আচার্য্য হেমচন্দ্র স্বকৃত অভিধানচিন্তামণির মর্ত্যকাণ্ডে পাণিনির নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"অথ পাণিনৌ,শালাতুরীয়দাক্ষেয়ৌ।"

শালাতুরীয় ও দাক্ষেয় এই দুইটি শব্দ পাণিনি নামক মুনিবোধক। এই লিপির দ্বারা ৭৫০ বৎসরের সংবাদ পাওয়া গেল। বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রচারক শঙ্করাচার্য্যকেও পাণিনির নামোল্লেখ করিতে দেখা যায়। যথা—

"নচ পাণিনিস্মৃতিবিরোধঃ —"

(১ম অং)

এই লিপি অনুসারে নির্ণয় হইতেছে যে, পাণিনি ১০৮৯ বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, কেন না শঙ্করাচার্য্য উক্ত পরিমিত কালের লোক। যথা "নিধিনাগেহভবন্হ্যব্দে"

ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

জৈমিনীসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা বহুপ্রাচীন। কেননা শঙ্করাচার্য্য স্বকৃত বেদান্ত ভাষ্যের ১ম অধ্যায়ে "যত্তুশাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদামনুক্রমণম্" এই উক্তি করিয়া, শবরস্বামীর বাক্য উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বৃদ্ধোচিত পূজা করিয়াছেন। এই বৃদ্ধতম শবরস্বামীও পাণিনির উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"নহি বৃদ্ধিশব্দেন আপাণিনের্ব্ব্যবহারতঃ আদৈবঃ প্রতীয়েরন্ পাণিনিকৃতিমননুমন্য।" (১ অং, ১ পাদ)

অতএব,ইহার দ্বারা স্থির হইতেছে যে পাণিনি অন্যূন ১২। ১৩ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী। যেহেতুক শবরস্বামীর কাল এক্ষণে উহার ন্যূন নহে। অমর সিংহকেও পাণিনির অনুসরণ করিতে দেখা যায়, সুতরাং পাণিনি ৫০০ খৃষ্টাব্দের বহুকাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন,ইহা নিশ্চিত হইতে পারে।

মগধেশ্বর শেষনন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের সমকালিক চাণক্য মুনিকেও পাণিনির উল্লেখ করিতে দেখাযায়। যথা—'অন্তের্ভূঃ' 'ক্রবোবাচি' 'আধারোঽধি করণম্' 'ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্' এই সকল পাণিনিসূত্র তিনি স্বকৃত ন্যায়ভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন। চাণক্য যখন পাণিনির উল্লেখ করিয়াছেন তখন নিশ্চয় হইতেছে যে, তিনি অবশ্য ২৩ শত বৎসরের কোন এক অনির্দ্দিষ্ট কালের লোক।

এস্থলে ন্যায়ভাষ্যজ্ঞ পাঠকের একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। সে সংশয় এই যে, ন্যায়-ভাষ্যে লেখা আছে তাহা বাৎস্যায়নকৃত; কিন্তু আমি বলিলাম চাণক্যকৃত। এই সংশয়-ভঞ্জনের জন্য, চাণক্য ও বাৎস্যায়ন যে একব্যক্তি, এস্থলে তাহাও প্রমাণ করা যাইতেছে।

চাণক্যের একটি নাম নহে। পূর্ব্বকালে গুণ, বংশ, কার্য্য, ইত্যাদি বহু কারণবশতঃ এক ব্যক্তির বহু নাম থাকিত, সুতরাং চাণক্যেরও বহু নাম ছিল দেখা যাইতেছে। তাঁহার বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, কৌটিল্য, চাণক্য, দ্রামিল, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত, ও অঙ্গুল এতগুলি নাম ছিল। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র স্বকৃত অভিধানচিন্তামণিতে এই সমস্ত নামগুলিই পর্য্যায়বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"বাৎস্যায়নে মল্লনাগঃ কোটিলশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চসঃ।" (মর্ত্তকাণ্ড)

ন্যায়ভাষ্য যে চাণক্য-বাৎস্যায়নের কৃত তাহারও প্রমাণ আছে। উদ্যোতকর মিশ্রকৃত বার্ত্তিক, এবং বাচস্পতি মিশ্রকৃত তাৎপর্য্য-টীকায় এই গ্রন্থ পক্ষিল স্বামী-কৃত বলিয়া উল্লেখ আছে। ন্যায়শাস্ত্রে যে পক্ষিল স্বামীর একটি স্বতন্ত্র মত আছে তাহা আধুনিক নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করেন। পক্ষিল স্বামী বাৎস্যায়নকে চাণক্য ভিন্ন অন্য কোন বাৎস্যায়ন কল্পনা

করা যায় না। সুতরাং এই চাণক্যের নীতিশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্রে আছে। শব্দশাস্ত্রে ইনি কৌটিল্য-নামে বিখ্যাত। এসকল আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, এ-জন্য এ সম্বন্ধের বিশেষ বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ করিলাম না।

চাণক্য পণ্ডিত যখন পাণিনির উল্লেখ করিতেছেন, তখন অবশ্য তিনি চন্দ্রগুপ্তের বা শেষনন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহার দ্বারা তদীয় কালসংখ্যাস্থলে অন্যূন ২৫০০ শত বৎসর গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতঃপর আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা কোন একটা নির্দ্দিষ্টকাল স্থির করা যাইতে পারে। আরোহ-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ২৫০০ শত বৎসরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। এক্ষণে অবরোহ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখা যাউক তাহাতেই বা কোথায় দাঁড়াইতে হয়।

কোন একটি নির্দ্দিষ্টকাল কেন্দ্র করিয়া অবরোহ প্রণালীতে ক্রমে অবতরণ করিয়া আসিতে হয়।

কোন্ কালটিকে কেন্দ্র করা যাইবে? সর্ব্বসংহারক কাল যে সময়ে এই ভারতবর্ষে ভীষণ সংক্ষয় উপস্থিত করিয়াছিল, যে দিনটির অবসানে কালরাত্রিতুল্য করালরাত্রের মধ্যভাগে বটবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া দ্রোণপুত্র কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য জীবশূন্য পৃথিবী দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, যে সংক্ষয়ের পর ভারত আর জাগ্রত হইল না, সেই সময়টিকে কেন্দ্র করিয়া নিম্নে আগমন করা যাইতেছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালটির উল্লেখ মহাভারতে আছে; কিন্তু তাহাতে একটি নির্দ্দিষ্টকাল-সংখ্যা পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থের অনুসরণ করা যাইতেছে। বরাহসংহিতানামক জ্যোতিগ্রন্থে এই কালটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রাজতরঙ্গিণী নামক প্রাচীন ইতিবৃত্তগ্রন্থে ও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা—"গতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষুচ বৎসরে। অভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ।"

কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়। উক্ত গ্রন্থকারেরা জনশ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া উক্ত কাল সংখ্যা লেখেন নাই। জ্যোতির্গণনা ও অব্দব্যবহার তাহাতে প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের সময়েও যৌধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত হইল। বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ আরম্ভের সময় যৌধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ ছিল। এইরূপ আর্য্যভট্টীয় গ্রন্থেও যৌধিষ্ঠিরাব্দ বর্ত্তমান থাকার উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের বৃত্তান্তঘটিত মহাভারত, ভগবৎ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল (সাত ভেয়ে তারা) মঘা নক্ষত্রে ছিল। ইহা অবলম্বন করিয়া উক্ত জ্যোতির্বেত্তারা বলিয়াছেন, যে উক্ত সপ্তর্ষি মণ্ডল শত বৎসর করিয়া এক এক নক্ষত্রভোগ করে। শত বৎসরান্তে প-

রিবর্ত্তিত হইয়া অন্য নক্ষত্রে গতি হয়। সূর্য্যের যেমন একমাসে এক রাশি ভোগ হয়, সেইরূপ সপ্তর্ষিমণ্ডলের ২২৫ বৎসরে এক রাশি ভোগ হয়। এতাদৃশ সপ্তর্ষিমণ্ডল যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে মঘা নক্ষত্রে ছিল, এক্ষণে আমরা উহাকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে দেখিতেছি। এই কালে প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় হইয়াছে, যে কলির ৬৫৩ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার পরেও যুধিষ্ঠিরেরা অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহাতে অনধিক ৭০০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। এই যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ অর্জ্জুন, তৎপুত্র অভিমন্যু, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, তৎপুত্র জনমেজয়; এই জনমেজয়ের পরে নৈমিষারণ্যীয় ঋষিদিগের দ্বারা মহাভারত প্রচার হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আর মহাভারত প্রচার, এতন্মধ্যে অন্যূন ৩০০ শত বৎসর ব্যবধান আছে, ইহা বলিলে বোধ হয় সমধিক দোষ হয় না, এবং তাহা হইলে কলির সহস্র বৎসরান্তে মহাভারত প্রচার হইয়াছে ইহাও বলা যাইতে পারে। এই ভারতে পুরাণকালের এবং তৎ-সমকালের যে কোন মহাত্মা, সকলেই সন্নিবিষ্ট আছেন, কিন্তু ইহাতে যাস্ক, পারস্কর, শাকটায়নাদির উল্লেখ নাই। কেবল মহাভারত নহে, মহাভারতের পরবর্ত্তি অন্যান্য পুরাণেও নাই। যখন মহাভারতের পরবর্ত্তী বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণসমূহের উৎপত্তিকালে যাস্ক পারস্করাদির অসত্তা নির্ণীত হইতেছে, তখন তাঁহারা নিশ্চিত তদপেক্ষা অন্যূন ৫০০ শত বৎসরের পরভাবিক। পাণিনি মুনি স্বীয় সূত্রে ঐ সকল ব্যক্তি অর্থাৎ যাস্ক, পারস্কর, শাকটায়ন, এবং ভারতীয় ব্যাস, তৎশিষ্য ও তৎপ্রশিষ্যাদির উল্লেখ করিয়া নিজের অনেক নিম্নবর্ত্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে, অবরোহ প্রণালীতে, কলির দুই সহস্র বৎসর বাদ দেওয়া যাইতে পারে। এখন পাঠক দেখুন, পাণিনি মুনি কালপ্রাসাদের কোন্ সোপানটিতে বসিয়া ব্যাকরণসূত্র রচনা করিতেছেন? বর্ত্তমান সময় হইতে অন্যূন ২৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে এবং কলির প্রবৃত্তির ২০০০ বৎসর পরে তিনি এই সন্ধি-স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

যুক্তি অবলম্বন করিলে পাণিনির সময় নির্ণয় সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত সত্যলাভ হইতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাউক, ঐহিত্য অবলম্বন করিলে কি হয়।

ঐতিহ্য অবলম্বন করিলেও উপরোক্ত নির্ণয়ই স্থির থাকে এবং তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না, বরং যুক্তিলভ্য সত্যটি দৃঢ় হয়। ঐতিহ্য গ্রহণ করিবার অবলম্বন অধিক নাই, বৃহৎ কথা এবং তাহারই সঙ্কলন কথাসরিৎসাগর ও বৃহৎ কথামঞ্জরী, এই গ্রন্থত্রয় মাত্র আছে। এই গ্রন্থত্রয়েই পাণিনির জীবনীর ঐক্য আছে। অতএব বৃহৎ কথার উল্লেখমাত্র করিয়া

তাহা হইতে ঐতিহাসিক সার কথা কএকটি উল্লেখ করিতেছি। পাঠকগণ ইহা মিলাইয়া দেখিলে যুক্তিলভ্য সত্যের সহিত বড় অধিক ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন না।

বৃহৎকথা বলেন, পাণিনি উপবর্ষ পণ্ডিতের ছাত্র। উপবর্ষ নামক একজন শব্দশাস্ত্রের আচার্য্য ছিলেন, তাহা আমরা গ্রন্থান্তরেও পাইয়াছি। যথা;—

"যদাহ ভগবানুপবর্ষঃ
বর্ণাএবহিশব্দাঃ" (সূত্রভাষ্য ২অং)

বৃহৎকথা বলেন, পাণিনি মধ্যদেশে ছিলেন। পাণিনিনিজেই 'শালাতুরীয়' নাম দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সালাতুর নামক প্রদেশ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বাসভূমি ছিল, কিন্তু তিনি নিজে তদ্দেশবাসী নহেন।

বৃহৎকথা বলিয়াছেন যে, পাণিনি নন্দের সমসাময়িক, পূর্ব্বপ্রদর্শিত যুক্তিতেও প্রায় তাহাই পাওয়া গিয়াছে।

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে বৃহৎকথার মধ্যেও ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত আছে। কেবল বৃহৎকথা কেন, কথাগ্রন্থমাত্রেরই কিয়ৎপরিমাণে সত্য আছে। কোন এক সত্যভিত্তির উপর কথারচকেরা অলঙ্কার দিয়া বাহুল্য রচনা করিয়া থাকেন, ইহাই কথারচকদিগের স্বভাব। তদ্ভিন্ন আকাশকুসুমের ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলে উহা কথাগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত না. যেহেতু কথাগ্রন্থের লক্ষণই ঐরূপ। যথা;—

"প্রবন্ধ-কল্পনাং স্তোক সত্যাং প্রাজ্ঞাঃ
কথাংবিদুঃ।
পরম্পরাশ্রয়া যা স্যাৎ সা মতাখ্যায়িকা
বুধৈঃ॥"

অতএব যুক্তি-লভ্য অর্থের সহিত বৃহৎ কথার যে যে অংশের সামঞ্জস্য আছে, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? বৃহৎকথা পাণিনিকে নন্দের সমকালিক বলিয়াছেন, তাহা শেষ নন্দ না হইয়া নবনন্দের তৃতীয় কি চতুর্থ নন্দ হউক। বৃহৎ কথা বলিয়াছেন পাণিনি ও ব্যাড়ি তুল্যকালিক, যুক্তি ও পাণিনি নিজে তাহাই বলিতেছেন।

আচার্য্য গোল্‌ডস্টুকরের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। ইউরোপীয় অন্যান্য পণ্ডিতগণের মতে তিনি খৃষ্টজন্মের ৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তি ছিলেন। তিব্বতদেশীয় লামা তারানাথ তাঁহাকে নন্দের সমকালিক এই মাত্র বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন্ নন্দের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। যদি শেষ নন্দ হয় তবে তিনি তদীয় মতে খৃষ্টজন্মের ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। বঙ্গদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাচস্পতি তারানাথও এই রূপস্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে নন্দের তুল্যকালজন্মা চাণক্য-পণ্ডিত অপেক্ষা পাণিনি বহুল প্রাচীন এবং যাস্ক পারস্করাদির বহু অর্বাচীন। তখন তিনি কোন প্রকারেই শেষনন্দের

সমকালিক হইতে পারেন না। আমাদিগের মতে তিনি দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দের সমকালিক। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারি না, কেন না, তাহা হইলে তিনি ব্যাসের অধস্তন পঞ্চমশিষ্য এবং যাস্ক প্রভৃতিকে চিনিতে পারিতেন না, সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বকৃত ব্যাকরণসূত্রে আনিতে পারিতেন না।

পাণিনি কোন্ দেশীয় লোক? তাঁহার বাসভূমি কোথায় ছিল? এবিষয়েরও অন্বেষণ করা যাউক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পাণিনির আর দুইটি নাম আছে, শালাতুরীয় এবং দাক্ষেয়। শালাতুরীয় নামটি দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শালাতুর নামক গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি বা বাসভূমি নির্ণয় করিয়াছেন। শালাতুর গ্রামটি গান্ধার (কান্দাহার) প্রদেশের অন্তর্গত, আধুনিক 'অটক' নামক স্থানের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে তিনি জন্মিয়াছিলেন বা এই স্থানে বাস করিতেন, ইহার কোন কথাটিতেই আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ, পাণিনি নিজেই শালাতুরগ্রাম তাঁহার বাসভূমি বলিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যথা--চতুর্থ অধ্যায়ে ৯০ সূত্রে 'অভিজনশ্চ।' এই সূত্র আর তাঁহার শালাতুরীয় নাম, এই দুই একত্র হইয়া একটি গূঢ় সত্য প্রকাশ করিতেছে। সেইটি এই যে, শালাতুর গ্রাম তাঁহার বাস-ভূমিও নহে এবং জন্মভূমিও নহে। তবে কি? উহা তাঁহার কুল-পুরুষদিগের জন্মভূমি এবং বাসভূমি। যথা—

পাণিনি 'অভিজনশ্চ' সূত্রের পূর্ব্বে 'তদস্য নিবাসঃ' এই একটি সূত্র করিয়াছেন। ইহার দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, নিবাস ও অভিজন এই দুয়ের মধ্যে অবশ্য কিছু প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদটি বৃত্তিকার দেখাইয়া দিয়াছেন। যথা, "যত্র সংপ্রত্যুষ্যতে স নিবাসঃ যত্র পুর্ব্বপুরুষৈ রুষিতং সোঽভিজনঃ" যে স্থান পূর্ব্ব পুরুষের বাস ছিল তাহা অভিজন এবং যাহা বর্ত্তমান বাসস্থান তাহা নিবাস। এতাদৃশ অভিজন অর্থে পাণিনি নিজে 'শালাতুরীয়' নামটি নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কেন না,—'অভিজনশ্চ' এই সূত্রের পরে, অভিজন অর্থটির আকর্ষণ করিয়া, 'তুদী শলাতুর বর্ম্মতী কুচবারাড্ঢক্ (৪।৩।৯৪) এই সূত্রটি নির্ম্মাণ করিয়া, শলাতুর শব্দের উপরে ঢক্ প্রত্যয় করিয়া 'শালাতুরীয়' রূপনির্ম্মাণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। অতএব পাণিনি নিজে যখন "শালাতুর" গ্রাম আপনার অভিজন বলিয়া জানিতেন, তখন আমরা তাঁহাকে শালাতুরবাসী বলিতে পারি না। সুতরাং পাণিনিকে বৃহৎকথার লিখিত মগধদেশবাসী বলিতে হইল। কেননা 'অভিজনশ্চ' এই অর্থে নিষ্পন্ন শালাতুরীয় নামের দ্বারা বৃহৎকথার ঐতিহাসিক সত্যতা সপ্রমাণ হইতেছে।

বৃহৎকথার ইতিহাসাংশ যে কিয়ৎ-পরিমাণ সত্য, এবং পাণিনি যে এদেশীয় তাহা পাণিনির ‘দাক্ষেয়’ এই তৃতীয় নাম দ্বারা ও প্রকাশ পাইতেছে। যথা—“জীবতিতুবংশ্যে তদপত্যং যুবা” এবং “অপত্যং পৌত্রপ্রভৃতি গোত্রম্” এই দুই সূত্রে, বংশ-পুরুষ জীবিত থাকিলে তদীয় প্রপৌত্র প্রভৃতি অতি দূর বংশীয়েরা ‘যুবন্’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে বলিয়াছেন। এতদনুসারে ‘দাক্ষি’ নামক ব্যক্তির জীবিত কালের মধ্যে, তৎপৌত্র কি প্রপৌত্র দাক্ষায়ণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দাক্ষায়ণ ও ব্যাড়ি এক ব্যক্তি। কেন না, পতঞ্জলি ব্যাড়িকৃত লক্ষশ্লোকাত্মক সংগ্রহ নামক গ্রন্থকে দাক্ষায়ণের কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—‘শোভনাখলু দাক্ষায়ণস্য সংগ্রহস্যকৃতিঃ’ ইত্যাদি। অতএব, ব্যাড়ি বা দাক্ষায়ণের পিতামহ কি প্রপিতামহের নাম দাক্ষি এবং এই দাক্ষির কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম দাক্ষী। “দক্ষস্যাপত্যং পুমান্ দাক্ষি,দক্ষস্যাপত্যং স্ত্রী দাক্ষী।” এই নির্বচনলভ্য অর্থের অপ্রামাণ্য আশঙ্কা কস্মিন্ কালেও নাই। পাণিনি এই দাক্ষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাও তদীয় ‘দাক্ষায়ণ, নাম দ্বারা লব্ধহয় এবং ‘দাক্ষী-পুত্রেণ ধীমতা’ ইত্যাদি স্পষ্ট প্রমাণ-বাক্যও আছে। এতদনুসারে, দাক্ষায়ণ বা ব্যাড়ির পিতামহ বা প্রপিতামহ দাক্ষির সহিত দাক্ষেয় বা পাণিনির মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধ দাড়াইতেছে। দাক্ষির জীবদ্দশাতেই ব্যাড়ির পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল, এবং ব্যাড়ির জীবৎ কালেও তদীয় পিতামহ বা প্রপিতামহ দাক্ষি নিশ্চিত জীবিত ছিলেন, তাহা না থাকিলে ব্যাড়ির ‘দাক্ষায়ণ’ নাম হইতে পারিত না। অতএব ব্যাড়ির নাম দাক্ষয়ণ *। আর পাণিনির নাম দাক্ষেয়, এই নাম দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, ব্যাড়ি ও পাণিনির বয়োগত ন্যূনাধিক্য থাকিলেও তাঁহারা পরস্পরকে দেখিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু ব্যাড়ি অপেক্ষা পাণিনি বয়োবৃদ্ধ হওয়াই অধিক সম্ভব। ইহা নিম্ন প্রদর্শিত চিত্র দেখিলেই প্রতীত হইবে।—

(বংশ পুরুষ)

দক্ষ।

দাক্ষি (পুত্র)　　দাক্ষী (কন্যা)

ব্যাড়ি বা দাক্ষায়ণ　　পাণিনি বা দাক্ষেয়

* ব্যাড়ির মাতার দাক্ষী নামটি গোত্রানুসারে হইয়াছে। নচেৎ তাঁহার প্রকৃত নাম নন্দিনী। এতদনুসারে ইহাঁর ‘নন্দিনী-তনয়’ একটি নাম। দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন বলিয়া ‘বিন্ধ্যবাসী’ নামও ছিল। আচার্য্য হেমচন্দ্র “অথ ব্যাড়ি বিন্ধ্যবাসী নন্দিনীতনয়শ্চ সঃ।” নামমালায় গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

" জীবতিতু বংশ্যে তদপত্যং যুবা ,, পাণিনির এই লিপি অনুসারে দাক্ষির জীবদ্দশায় সন্তান ভিন্ন যে দাক্ষেয় ও দাক্ষায়ণ নাম নিষ্পন্ন হয় না, সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরের দৃষ্টিতে তাহা পতিত হয় নাই। সেই জন্যই তিনি পাণিনি ও ব্যাড়িকে তুল্য-কালিক বলিতে পারেন নাই এবং ঐভুলটি তাঁহার সকল সিদ্ধান্তের মূল শিথিল করিয়া রাখিয়াছে।

যুক্তি ও ঐতিহ্যের দ্বারা এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, পাণিনি অন্যূন সার্দ্ধদ্বি সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; নবনন্দের দ্বিতীয় কি তৃতীয় নন্দকে তিনি জানিতেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা গান্ধার প্রদেশের শালাতুর গ্রামে বাস করিত, এবং তিনি স্বয়ং মগধাদি প্রদেশের কোনও একস্থানে বাস করিতেন। তিনি দক্ষ গোত্রের ও পাণিন্ উপাধি-প্রাপ্ত কোন এক বিখ্যাত বংশের সন্তান, তাঁহার মাতার নাম দাক্ষী এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসী ব্যাড়ির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল এবং দেখা সাক্ষাৎও ছিল। ইহাঁর পিতার নাম ঠিক্ জ্ঞাত হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম দেবল। কোন্ দেবল তাহা জানা যায় না। ফল মহাভারতীয় ঋষি দেবল নহেন। ইনি ব্যাকরণাচার্য্যগণের শিরোভূষণ। এক্ষণে আচার্য্য গোল্ডষ্টুকরের মত সমালোচিত হইতেছে।

গোল্ডষ্টুকরের মতে পাণিনি খৃষ্টজন্মের ৬০০বৎসরের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু নন্দের তুল্যকালিক, ন্যায়-ভাষ্যে পাণিনি সূত্র উদ্ধৃত হওয়াতে এই মতের মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে। এইরূপ অন্যান্য বহুবিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতের অনৈক্য হওয়ায় আমারা দুঃখিত হইতেছি। কি করি, ঐতিহ্য ও যুক্তির বলে যে সকল সত্য আবিষ্কৃত হয় তাহার অপমান করিতে পারি না। অতএব, সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ এবিষয়ে আমাদের প্রগল্ভতা মার্জনা করিবেন।

আচার্য্য গোল্ডষ্টুকর কেবল মাত্র ব্যাকরণ সূত্রের কতকগুলি কথা লইয়া তদীয় কাল, দেশ, এবং তদানীন্তন গ্রন্থাবলীর যে সত্বা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক। বৈয়াকরণিক সঙ্কেত কেবল প্রচলিত সাধুশব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ দেখিয়া, তাহার সাধুতা সপ্রমাণ করিয়া দেয় মাত্র। এতদ্ভিন্ন কোন ইতিহাস নির্ণয় করিয়া, দেয় না। প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ ও সাধন-প্রণালী প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশেষ শব্দকে অর্থ বিশেষে ব্যবস্থাপনা করাই ব্যাকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু পারিভাষিক বা নিরূঢ় সঙ্কেতযুক্ত শব্দের উপর ব্যাকরণের কিছু মাত্র প্রভুতা নাই, সুতরাং ব্যাকরণের সহিত তাদৃশ শব্দের কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। ইহা সত্য কি অসত্য নিদর্শন দেখাইতেছি। পুরাণে একটি শব্দ আছে " পঞ্চাত্র "

"পঞ্চাম্ররোপী নরকং ন যাতি" যে পঞ্চাম্র রোপণ করে তাহার নরকে গতি হয় না। এই পঞ্চাম্র শব্দটির অর্থ পাণিনি বলিবেন, পাঁচটি আম্রবৃক্ষ, বস্তুতঃ তাহা নহে। নিম্ব, অশ্বত্থ, বট, জাতিপুষ্প, দাড়িম্ব, এই সকল বৃক্ষ একত্র রোপণ করিলে তৎসমুদায়কে পঞ্চাম্র বলে, ইহাতে আম্রের নাম গন্ধও নাই, অথচ ইহা পঞ্চাম্র হইল।

যদিও পঞ্চাম্র শব্দটির উৎপত্তি পাণিনির পরে হইয়া থাকে এমতও হয়, তথাপি তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যেরা বা বৈয়াকরণিকেরা তাহা ত্যাগ করিবেন কেন? ইহাতে বুঝিতে হইবে যে তাদৃশ শব্দের সমাবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই এবং তজ্জন্যই ব্যাকরণে তাদৃশ শব্দের বর্জন আছে।

আর একটি শব্দ আছে "ষোড়শী"। এই শব্দের অর্থ পাণিনি বলিবেন, ষোল সংখ্যার পূর্ত্তি। কাব্য লেখকেরা বলিয়াছেন "যুবতী" স্ত্রী। পুরাণে আছে, তীর্থস্থলে প্রদত্ত ঊনবিংশপিণ্ড, আবার বেদে বলে একটি যজ্ঞপাত্র অর্থাৎ সোমরস গ্রহণের পাত্র। এই ষোড়শী শব্দটি পাণিনি কি অন্য কোন ব্যাকরণের মতে যজ্ঞপাত্র বুঝা যায় না। ইহা পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলে ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বস্বধন সোমের পাত্র বিস্মৃত হইয়া ষোল সংখ্যার পূরণ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন না!! কিন্তু পাঠকগণ, বলিয়া দিতেছি, ইহা পাণিনির চিরপরিচিত যজুর্বেদের সহস্র স্থানে আছে। "অতি রাত্রে ষোড়শীং গৃহ্লাতি নাতিরাত্রে ষোড়শীং গৃহ্লাতি" ইত্যাদি। অতএব, কেবল মাত্র ব্যাকরণ সূত্রের দ্বারা কোন ইতিবৃত্তি নির্ণয় হইতে পারে না। যেমন একমাত্র ব্যাকরণের দ্বারা কোন ইতিহাস নির্ণয় হয় না সেই রূপ, এক শব্দকে দুই ব্যক্তি দুই অর্থে ব্যবহার করিল বলিয়া সেই দুইজনের মধ্যে একটা লম্বমান কালনিবেশ করাও যায় না।

এইরূপ শিথিল মূলযুক্তির আশ্রয় লইয়া আচার্য্য গোল্ড্ষ্টুকর ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদান্ত, মীমাংসা, উপনিষদ, আরণ্যক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদয় আর্ষ গ্রন্থকে পাণিনির পরভাবী বলিয়া লোকে বৃথা মোহ জন্মাইয়া দিয়াছেন। উল্লিখিত সমস্ত শব্দই পারিভাষিক। পারিভাষিক শব্দের দ্বারা যে ব্যাকরণের কাল নির্ণয় হয় না তাহা তিনি কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন নাই।

পাণিনির একটি সূত্র আছে "অরণ্যান্ মনুষ্যে" মনুষ্য অভিধেয়ে "আরণ্যকঃ" এই পদ নিষ্পন্ন হইবে। যথা—আরণ্যকো মনুষ্যঃ অর্থাৎ অরণ্যবাসী মনুষ্য। ইহা দেখিয়াই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পাণিনির পূর্ব্বে বা সময়ে আরণ্যক নামক বেদাংশ ছিল না, কিন্তু উহা মনুপ্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের সময়ে ছিল? ইহাতে তাঁহার সিদ্ধান্তের ভ্রম হইয়াছে।

ন্যায় দর্শন ও সাঙ্খ্যদর্শন ও পারিভা-

যিক শব্দ। এই পরিভাষা গুলি শিষ্যসম্প্রদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণ আমরা যাহাকে যোগদর্শন ও পাতঞ্জলদর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম "প্রবচন"। আমরা যাহাকে উত্তর মীমাংসা ও বেদান্তদর্শন বলি, তাহার প্রকৃত নাম "উত্তরকাণ্ড"। এইরূপ উপনিষদ শব্দ সাঙ্কেতিক। পাণিনি মুনি ব্যাস ও তাঁহার ক্রমানুসারে নিম্নবর্ত্তী পাঁচজন শিষ্যকে অর্থাৎ শিষ্য প্রশিষ্য প্রভৃতিকে চিনিতেন, যুধিষ্ঠিরাদি রাজন্যবর্গকে চিনিতেন, ইহা তদীয় সূত্রে প্রকাশ আছে। ন্যায়, সাঙ্খ্য, আরণ্যক প্রভৃতি পাণিনির জ্ঞাত ছিলনা, কিন্তু তাঁহার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী উল্লিখিত ব্যক্তিদের জ্ঞাত ছিল? ইহা কিরূপ সত্য, বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করুন। উল্লিখিত ব্যক্তিরা যে উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় জ্ঞাত ছিলেন, তাহা সকল আর্ষ গ্রন্থেই প্রকাশ আছে। একটি নহে, দুইটি নহে, বহু পরিমাণ বচন আছে। একদেশে নহে, দুইদেশে নহে, সকল দেশের পুস্তকেই তুল্য পাঠ আছে। অতএব সেই শ্লোকগুলি আধুনিক বলাও অল্প সাহসের কার্য্য নহে।

"নির্ব্বাণোহবাতে" "আশ্চর্য্যমনিত্যে", এই সকল সূত্র দেখিয়া এবং ইহার "অদ্ভুত ইতিবক্তব্যম্" ইত্যাদি বৃত্তি ও ভাষ্য দেখিয়া গোল্‌ডষ্টুকর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির পূর্ব্বে নির্ব্বাণ শব্দের মুক্তিবাচকতা দূরে থাকুক, সামান্য নিবিয়া যাওয়া অর্থও ছিলনা। আশ্চর্য্য শব্দেরও অদ্ভুতার্থদ্যোতকতা ছিলনা। আমরা এবিষয়ে তর্ক করিতে ইচ্ছা করিব না; যেহেতু তাহা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইমাত্র বলি যে তিনি কি জন্য "পানংদেশে" এই সূত্র লইয়া বিচার করেন নাই? তিনি, পান শব্দে তরল খাদ্য বুঝাইত কিনা তাহা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই বলিয়া, ঐ সূত্রটির আর উল্লেখ করেন নাই। পাঠকগণ কি "পানং দেশে" সূত্রআছে বলিয়া বলিতে পারেন যে পাণিনির পূর্ব্বে বা পাণিনির সময়ে পান শব্দে দেশ বা স্থান বুঝাইত—তরলখাদ্য বুঝাইত না? ফলতঃ মহামহোপাধ্যায় গোল্‌ডষ্টুকর এই সকল স্থানে যে যে তর্ক উদ্ভাবন করিয়াছেন সমস্তই অমূলক। কেননা, পাণিনি সূত্রস্থান মাত্র রচনা করিয়া ছিলেন, বৃত্তি কি ভাষ্য তাঁহার নহে। অতএব অন্যের প্রদত্ত উদাহরণ দ্বারা পাণিনির সাময়িক ব্যবহার নির্ণীত হইতে পারেনা।

আর একটি গুরুতর বিচার উত্থাপিত হইতেছে। পণ্ডিতবর গোল্‌ডষ্টুকর পাণিনি-সূত্রের মধ্যে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ দেখিতে পান নাই বলিয়া অনুমান করিয়াছেন যে পাণিনি অথর্ব্ববেদ অবগত ছিলেন না। অথর্ব্ববেদটি তাঁহার পর রচিত হইয়াছে। এইরূপ বাক্য ব্যক্ত করাতে তাঁহার বিলক্ষণ ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন—"আথার্বণিকস্যেক লোপশ্চ" (৪। ৩)

" কপি বোধাদাঙ্গিরসে " " দাণ্ডি-নায়ন হাস্তিনায়নথর্ব্বর্ণিক—" (৬।৪) এই সকল সূত্রে যে অথর্ব্ব-শব্দ আছে এবং আঙ্গিরস শব্দ আছে, তাহার অর্থ তৎকালে কি ছিল ? আমরা দেখিতেছি অথর্ব্ব শব্দের চতুর্থবেদবোধকভিন্ন অন্য অর্থ ছিল না। অথর্ব্ব শব্দের যদি চতুর্থ বেদ কি তৎপ্রণেতা মুনি ভিন্ন অন্য অর্থ থাকিত,তবে তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই কেন ? এবিষয়ে তাঁহার অনুমান এই যে পাণিনি যখন অথর্ব্ববেদ বা অথর্ব্বা-ঙ্গিরস এইরূপ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই তখন তিনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। তাঁ-হার ন্যায় পণ্ডিতের এই অনুমানকৌশল দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। এই পা-ণিনি কেবল " ছন্দসি " " ছন্দসি " ব-লিয়া গিয়াছেন। " দৃষ্টংসায় " বলিয়া গিয়াছেন। বেদ বা সামবেদ, যজুর্বেদ, ঋগ্বেদ, কি কোথাও এরূপ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। অতএব পাণিনির সময়ে যদি কোন বেদই না থাকে তবে অথর্ব্ব বেদও থাকিবে না ইহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই।

ঋগ্বেদে যে যে স্থানে অথর্ব্বন্ শব্দ আছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথমতঃ ৬, ১৬, ১৪। পুনশ্চ ১০, ১৮, ২ তৎ-পরে ১০; ২১, ৫। ৮, ৯৭। পুনশ্চ ১০।৮৭।১২।—৯।১১।২। পুনশ্চ ১০, ১৪, ৬।১।৮০।১৬।৮৩।৫। ৬।১৬।১৩। পুনরায় ।১০।১২০। ৯।১।১১২।১০। ঋগ্বেদ সংহিতা।

অনেকের ভ্রম আছে অথর্ব্বাঙ্গিরস মুনি অথর্ববেদের রচক। কিন্তু অথর্ব্বা-ঙ্গিরস ব্যক্তিটি কে ? তাহা অধিকাংশ ব্যক্তি জানেননা। মহাব্যাস উদ্যোগপর্ব্বে ইহাঁর পরিচয় দিয়াছেন। ইনি বৃহস্পতি। দেবতাদিগের গুরু এবং অঙ্গিরা ঋষির পুত্র। পৌরাণিক মতে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে অথর্ব্বাঙ্গিরস উপাধি প্রদান ক-রেন, কারণ ইনি অথর্ব্ব-বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রের স্তুতি করিয়াছিলেন এবং এই বেদে ইহাঁর বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

পাণিনিসূত্রে যাস্কের উল্লেখ থাকায় আ-চার্য্য গোল্ডস্টুকর তাঁহাকে পাণিনির পু-র্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এইক্ষণে সেই যাস্কপ্রণীত নিরুক্ত মধ্যে অথর্ব্বাঙ্গিরস মুনির অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে। ইত্যাদি।

এইরূপ পণ্ডিতবর গোল্ডস্টুকর যে সিদ্ধান্তে পাণিনিবিচার করিয়াছেন,তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে না। কিন্তু তিনি যে পাণিনি সম্বন্ধে অপুর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তৎ-পাঠে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করি-য়াছি। এই গ্রন্থ তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্ব-রূপ চিরকাল সাহিত্য সংসার উজ্জ্বল করিয়া থাকিবে।

আমরা পাণিনি সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিব। শ্রীরামদাস সেন।

উকীলের প্রজানীতিসম্বন্ধে চারিটি কথা।

জ্যৈষ্ঠমাসের বান্ধবে ভারতের প্রজানীতি-শির্ষক যে প্রবন্ধ প্রকটিত হয়, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে ক্ষুব্ধ, কেহ বিরক্ত, কেহ বা ক্রোধান্বিত হইয়াছেন। বাস্তবিক উহাতে সত্য মিথ্যা যে প্রকারে জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রবন্ধের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় এবং লেখকের মত-নিশ্চয় নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, লেখক শ্লেষ-চতুর; এবং মনোদুঃখে দগ্ধ-হৃদয় হইয়া গরলরূপে অমৃত উদ্গীর্ণ করিয়াছেন। আমাদের এ প্রকার বিশ্বাস করিবার কারণ আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

প্রবন্ধলেখক 'উকীল' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন; তাহাতেই যথেষ্ট ঈঙ্গিত করা হইয়াছে যে, তাঁহার প্রত্যেক কথাই বিতর্ক করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, প্রতিচিত্রের ওকালতীর আবরণ উম্মোচন করিয়া দেখিতে হইবে। বস্তুতঃ সে ভাবে দৃষ্টি করিলে বিতর্কাধীন প্রবন্ধলেখকের সহৃদয়তা, স্বদেশবৎসলতা, এবং কর্ত্তব্যপ্রিয়তার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। আর আমরা যাহা মনে করিয়াছি, লেখকের যদি সত্য সত্যই সেইরূপ অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাঁহার লেখনভঙ্গী অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। দিনকাল বিবেচনা করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করাতেই বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশল-বত্তা প্রদর্শিত হয়।

দুর্ব্বলপক্ষ প্রবলরূপে প্রতীয়মান করিতে হইলে যে পন্থা অবলম্বন করিতে হয়, আমাদের উকীল তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন। তাহার পর, যাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হইতেছে, তাহার মন ভুলাইবার জন্য যে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, উকীল তাহাও করিয়াছেন। তথাপি যাহাদের বুদ্ধি জড়পদার্থ নহে, যাহারা সর্ব্ববিষয়ের অন্তস্তলপ্রবেশী, তাহাদের চক্ষে উকীল ধূলা দিতে পারেন নাই, কেহই পারে না, কারণ পারিবার উপায় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভাবিয়া দেখিতে গেলে উকীল ব্যবসায়ানুচিত কার্য্য করিয়াছেন বলিলেও বলা যায়; যাহার উকীল তাহারই ক্ষতি করিয়াছেন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তবে নথীতে যে বৃত্তান্ত সকল সপ্রমাণ, তাহার ব্যতিক্রম বা বিপরীত গমন করিবার অধিকার তাঁহার নাই বলিয়াই, বোধ হয়, তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া মুদ্রণশাসনীব্যবস্থা

অনুচিত প্রবর্ত্তন নহে, এবং আবশ্যক, উকীল এই প্রতিজ্ঞার উপপত্তি সাধন জন্য যে কএকটি পদার্থে আমাদিগকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিয়াছেন, তাহা এই—

"প্রথমতঃ, ভারতবর্ষ কখনও এক সাম্রাজ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ নাই। ইংরেজ যে সূত্র অবলম্বন করিয়া রাজ্য করিতেছেন, তাহাতে ভারতের একতা সম্পাদন সম্ভবপর, একতা সংসাধিত হইলে মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজের রাজত্বে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিলক্ষণ রূপ হইয়াছে। এখনও ভারতবর্ষে যে সকল স্বাধীন উপরাজ্য আছে, সেখানকার প্রজাদের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বিশেষরূপে ইহা উপলব্ধ হইবে।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এক্ষণ যেরূপ প্রসার, পূর্ব্বে এমন ছিল না।

চতুর্থতঃ রাজনীতি সম্পর্কে আমরা এখনও বালক, আমাদের রাজনৈতিক পুষ্টিসাধন আবশ্যক, এবং ইংরেজের দ্বারা তাহা সাধিত হইতেছে। সুতরাং ইংরেজের অধীনতা আমাদের বাঞ্ছনীয়।"

তাহার পরেই উকীল বলিতেছেন, ইংরেজ আমাদের রাজনীতি বিষয়ের গুরু,—ইংরেজ দেবতা! এবং ইহা হইতে যে কথা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা উকীলের ভাষাতেই ব্যক্ত হউক;—

"অতএব, ইংরেজ যখন আমাদের গুরুস্থানীয়, ভারতবর্ষে ইংরেজের স্থায়িত্ব যখন সর্ব্বথা আমাদের কাম্য, তখন যাহাতে আমাদের ভক্তিভাব অবিচলিত থাকিতে পারে, আমাদের প্রেমভাব দিন দিন প্রবলতর হয়, আমাদের মাধুর্য্য-মিশ্রিত মমতার ভাব ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বথা আমাদের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। সকল লোকের বিদ্যা বুদ্ধি কখনই সমান হইতে পারে না; সেই জন্য সুশিক্ষিত ও চিন্তাশীল বলিয়া যাহারা পরিচিত সেই উপরিতন দলের কথায় নিম্নতর স্তরের ব্যক্তি-বৃন্দ বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়া কার্য্য করে। সুতরাং যাহাতে রাজপুরুষদিগের সাধু এবং অকৃত্রিম সারল্যপূর্ণ অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দেহ আরোপিত হয়, তাহা করা সেই দলের পক্ষে মহাপাপ, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি এবং অনিষ্টের সম্ভাবনা।"

পরিশেষে উকীল সিদ্ধান্ত করিলেন যে "যদি প্রজাবর্গকে উত্তেজিত, ভক্তিশূন্য এবং বিপ্লব-প্রিয় করিবার জন্য ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক পন্থা প্রদর্শন করি, তবে ইংরেজের হস্তক্ষেপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অঙ্কুরেই উপদ্রবের বিনাশ সাধন ইংরেজের একান্তই উচিত। না করিলে রাজধর্ম্মের অপলাপ হইবে, আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে।"

যিনি রাজ্যেশ্বর তিনি রাজ্যের শান্তি রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, শান্তি রক্ষা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম—এই সামান্য অবি-

সংবাদিত তত্ত্বের সংস্থাপন জন্য চতুর উকীল এত বাগাড়ম্বর করিতেছেন, ইহা মনে হইলে হাস্য-সংবরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু মুদ্রণশাসনীব্যবস্থার-সমর্থন পক্ষে ইহার অধিক কিছু বলিবারও নাই। প্রবন্ধলেখক উকীল সাজিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন, যে কটূক্তি কর, কটাক্ষ কর, যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাও কিন্তু লম্ফ ঝম্পের অবসান এই খানেই হইবে। সেই জন্য ইহার পরেই 'উকীল' নীরব, আর সে তর্কের গাঁথনি নাই, বিচার-প্রবৃত্তির বেগ-শালীতা নাই। ফল স্থির হইল যে, যে কথার জন্য ওকালতী, তাহা প্রতিপন্ন হইবার নহে। "জোর যার, মুলুক তার" এই নীতিই মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থার একমাত্র অবলম্বন। যদি তাহা না হইত, তবে কথা বার্ত্তা না কহিয়া, প্রমাণ প্রয়োগ না দেখাইয়া 'উকীল' সহসা গর্জ্জন করিয়া বলিতে পারিতেন না যে "ইহার সূত্র লইয়া বিবাদ করিবার অধিকার নাই, গণ্ডগোল করা অন্যায়।"

কেন? শান্তি রক্ষাই কি ব্যবস্থার সূত্র? তবে দণ্ডবিধি আছে কেন? যষ্টি সহস্র বিলাতী সঙ্গিন ভারতে ঝক্ মক্ করিতেছে কেন? রাজ্যের শস্য ধ্বংস করিয়া পঙ্গপালের মত এত লাল পাগড়ি, নীলজামা ভারতের বুকের উপর অহোরাত্র দাপট করিয়া বেড়াইতেছে কেন? ভারতবাসীর হৃদয়-শোষিত শোণিতকে রজতরূপে পরিণত করিয়া এই অযুত রাজকর্ম্মচারী আর অকর্ম্মচারী কি কেবল বল্মীক স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছেন?

ফলকথা, মুদ্রণশাসনীব্যবস্থার সূত্র শান্তি রক্ষা নহে, ইহার অপর সূত্র আছে। ন্যায়ভীতি, স্বপ্রবর্ত্তিত পক্ষপাতশূন্য বিচারপ্রণালীর মুলোচ্ছেদ, এই ব্যবস্থার মূল সূত্র। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ চালনাই এ ব্যবস্থার প্রাণ। অপ্রিয় প্রকৃত কথা শুনিবার অনিচ্ছাই এ ব্যবস্থার নিদান।

কিন্তু উকীল একথা স্বীকার করিতে পারেন না, সেই জন্য এস্থলে নীরব। এই আত্ম-ঘাতক তর্ক পরিবর্জ্জন না করিলে ওকালতী চলে না, সেই জন্য অন্তঃশূন্য এক হুঙ্কার ছাড়িয়া উকীলকে এই স্থল উল্লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে।

তথাপি শ্লেষবিশারদ প্রবন্ধলেখক উকীলের মুখে যে কথা স্বীকার করাইয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহাই পর্য্যাপ্ত। উকীলকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে "ব্যবস্থার সম্পাদন যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, তাহার কোনও অংশে দোষ নাই, অভাব নাই বা বাহুল্য নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না।" যাঁহারা এ ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট, বিরক্ত বা ভীত, তাঁহারা ইহার অধিক কি বলেন? বঙ্গবাসী কাঁদিবে, কিন্তু "মা গো!" বলিয়া কাঁদিতে পাইবে না;—ভারতবর্ষের ভাষার প্রতি এই নিষ্ঠুরাচরণ, মুদ্রণ শাসনী ব্যবস্থার দোষ। বর্ণ-ভেদ জাতিভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ মনে না করিয়া ইংরেজ

বিচারক অপক্ষপাতে ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধরিয়া রহিয়াছেন; সে বিচারক ইংরেজ রাজেরই নিয়োজিত, কিন্তু ভারতবর্ষের মুদ্রাকরের বিচার তিনি করিতে পাইবেন না—ব্যবস্থার এই স্থলে অভাব। রাজার বুকে বসিয়া রাজার বাড়ীতে রাজার স্বজাতি ভারতের জন্য মুদ্রিতাক্ষরে অশ্রুপাত করিলেন, ভারতের ক্ষুদ্রতম পুস্তক-বিক্রেতা সেই লিপি আনাইয়া বিপণির গৌরব বাড়াইল, মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থা তাহাকে দণ্ড দিবে—ব্যবস্থার এই বাহুল্য।

উকীল স্পষ্ট করিয়া, এ কথা গুলি বলিলেন না, বলিতে পারিলেন না। বলিতে হইলে তাঁহাকে এই কথাই বলিতে হইত। প্রবন্ধ-লেখক এস্থলে উকীলকে এই কথাগুলি বলিবার জন্য উৎপীড়ন করেন নাই, কিন্তু যাহা বলিতে হইত তাহার আভাস দিয়াছেন। ইহার অপেক্ষা কঠোরতর বা অধিকতর অন্তর্ভেদী শ্লেষ আর কি হইতে পারে?

ব্যবস্থার পক্ষ সমর্থন জন্য উকীলকে নথীর বিপরীত প্রসঙ্গ করিতে হইয়াছে, ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষকে উপলক্ষ করিয়া আজি কালি রাজনীতিসঙ্কট উপস্থিত, এই এক অতিরিক্ত কথা ব্যবস্থার হেতুবাদের পোষক বলিতে হইয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থার প্রবর্ত্তয়িতা একথার উল্লেখ করেন না, সুতরাং আমরা ইহার যৌক্তিকতার বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য নহি। তবে সংক্ষেপে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, যে ১৮৫৭। ৫৮ অব্দের সহিত তুলনা করিলে, বর্ত্তমান কালকে শান্তি এবং নিশ্চিন্ততার মূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত করা যায়। মনে রাখিতে হইবে যে নীরবে, নির্ব্বিরোধে, নিরুপদ্রবে বরদার গায়েকবাড়ের রাজ্যচ্যুতি এবং কারাদণ্ড অধিক দিনের কথা নহে, মনে রাখিতে হইবে যে, যে নিজাম বেরার রাজ্য পুনঃ-প্রাপ্তির জন্য ইংরেজরাজের সঙ্গে বহুদিন ধরিয়া বচসা করিয়া আসিতেছেন, তিনিই আবার ইউরোপে ইংরেজের সাহায্য কামনায় নিজ সৈন্য সামন্ত দিবার জন্য ব্যাগ্র; মনে রাখিতে হইবে—না, ভারতেশ্বরীর জয় হউক! তাঁহার প্রতিনিধি এবং মন্ত্রিবর্গ যে কথার উল্লেখ করেন নাই, তাহার প্রতিবাদ জন্য কেন সময় নষ্ট করিব?

তথাপি আমাদের বোধ হইতেছে যে প্রবন্ধলেখক একথার উত্থাপন করিয়া ইংরেজরাজপুরুষগণের উপর কঠোর ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার লিখনভঙ্গীতে মনে হয় যেন রাজপুরুষগণ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন জন্য যে সকল কারণে চালিত হইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিতে তাঁহাদের সাহস নাই, অথবা সত্যের প্রতি তাহাদের আজি কালি অশ্রদ্ধা বা অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। ভারতবর্ষের ইংরেজ এতাদৃশ হীনভাবাপন্ন হইয়াছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করি না। নথীতে যাহা নাই, উকীলের সে কথা আমরা গ্রাহ্য করিলাম না।

এখন পূর্ব্বকথার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখা যাইতেছে যে, উকীল যে সকল প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা মানিয়া লইলেও মূল প্রতিজ্ঞার পূরণ হয় না; মূল প্রতিজ্ঞার সহিত তাহাদের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কিছুমাত্র নাই এবং এই সম্বন্ধ সংস্থাপনজন্য উকীলও প্রয়াস পান নাই। প্রবন্ধলেখকের চতুরতা—বুঝিবার বস্তু, আস্বাদনের বস্তু, সরস এবং সুমিষ্ট। দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইয়া দিই।

১ম;—ভারতবর্ষ কখনও এক সাম্রাজ্য ছিলনা, সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ নাই। যদি ইহার পরেই বলা যায়—অতএব মুদ্রণশাসনীব্যবস্থা আবশ্যক, তাহা হইলে বক্তাকে বাতুল বলিতে কেহই সঙ্কোচ করিবেনা।

২য়;—ইংরেজরাজ্যে আমাদের বিলক্ষণ উন্নতি—অতএব ব্যবস্থার প্রয়োজন। একথা বলিলে হাসিতেও লজ্জা বোধ হয়।

৩;—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার এক্ষণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উত্তম কথা, কিন্তু তাই বলিয়া কি মুদ্রণশাসন?

৪র্থ;—রাজনীতি বিষয়ে আমরা বালক, ইংরেজ আমাদের গুরু, ইংরেজ দেবতা। তাহাতেই কোন্ বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থার "মহীপালের গীত" ভাব অপসারিত হইতেছে? বয়োবৃদ্ধি সহকারে কি বালকতারও বৃদ্ধি হয়? আজি চল্লিশ বৎসর আমরা মুদ্রণ-স্বাধীনতা পাইয়াছি; এ চল্লিশ বৎসর কি আমাদের বয়স বাড়ে নাই, না কি বয়স কমিয়াছে? আর "দেবতার মত" ইংরেজ এতকাল আমাদের গুরুগিরি করিয়া যদি এই ফল ফলাইয়া থাকেন, তবে সে গুরুর কলঙ্কের কি সীমা আছে? তাহাহইলে সে গুরুকেও ধিক্! আমাদের মত শিষ্যকে শতবার ধিক্! যদি সপাদ শত বৎসর এহেন গুরুর চরণোপান্তে বসিয়া শেষ কালের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি হইয়া থাকে, তবে উচিত যে, হয় এই গুরুমহাশয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া আপন বাস্তুভিটায় বসিয়া মুদিখানা খুলিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা দূর করেন;—নয় এই শিষ্য বৃন্দ স্ব স্ব গলদেশে রজ্জুবন্ধন পূর্ব্বক সাভিনিবেশচিত্তে বিচালি চর্ব্বন আরম্ভ করেন। প্রবন্ধলেখক রসিক, আমরাও কম নহি। কিন্তু লোকে সহজে বুঝেনা, এ ক্ষোভ আমাদের উভয়েরই রহিয়া গেল।

যাহারা স্বাধীনতা প্রয়াসী হইয়া ভারতবর্ষে বিদ্রোহভাব উত্তেজিত করে, তাহাদেরই জন্য মুদ্রণ-ব্যবস্থা বিধি-বদ্ধ হইয়াছে, উকীল অন্তঃসলিলা নদীর মত এই কথা তাহার প্রবন্ধের ভিতরে ভিতরে অর্দ্ধ আবরিত রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনটী কথা উত্থাপিত হইতেছে।

১ম;—বিদ্রোহভাবের উত্তেজনকারী কেহ আছে কিনা? যদি থাকে তবে কেন আছে?

২য়;—স্বাধীনতাপ্রিয়তার সহিত রাজভক্তির নিত্য বৈরভাব কি না?

৩য়;—মুদ্রণব্যবস্থার বিদ্রোহভাবের দমন সম্ভবপর কি না?

ভারতীয় প্রজার অন্তরে বিদ্রোহ-ভাবের অস্তিত্ব আমরা একেবারে অস্বীকার করি। ভারতের কৃষক, বণিক, ভূ-স্বামী —যাহাদিগকে লইয়া ভারতবর্ষ,—তাহারা ইংরেজ-রাজ্যের স্থায়িত্ব-কামনা ভিন্ন অন্য কিছু জানে না। উকীলও একথার সূচনা দিয়াছেন; তবে এবিদ্রোহভাবের জন্য কোথায় অন্বেষণ করিতে হইবে? উকীল ইহার উত্তর দেন নাই, উত্তর দিতে অক্ষম।

উকীল এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই বটে, কিন্তু "অসন্তুষ্ট" আখ্যাদিয়া এক শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে তাহাদেরই স্কন্ধে দোষারোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি উকীল যে সমুদয় বিশেষণের দ্বারা ইহাদিগকে পরিচায়িত করিয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের গৌরবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; প্রবন্ধলেখক এই স্থলেই শ্লেষ-দক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

উকীল স্বয়ং বলিতেছেন,—"পাশ্চাত্য শিক্ষায় যাহাদের হৃদয়-বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, যাঁহাদের চিত্তবলের বিকাশ হইয়াছে, জন্মভূমি ও মাতৃভাষার নামে যাঁহাদের অন্তঃকরণ তরঙ্গায়িত হয়—তাঁহারাই—"অসন্তুষ্ট"। ইহাঁদের "সংখ্যা অল্প নয়" তাহাও উকীল স্বীকার করিতেছেন। ইহাঁদের "অসন্তোষের" কারণ নির্দ্দেশ করিতেও উকীল সংকোচ করেন নাই; কারণ "তাঁহারা ভারতবর্ষের দুঃখে নিরন্তর ব্যথিত। ভারতবর্ষে বিজাতীয়, বিদেশীয় রাজা আধিপত্য করিতেছে, ভারতবর্ষের রাজস্বে বিদেশীয় দেহ পুষ্ট হইতেছে, ভারতবর্ষে বিজাতীয় রীতিনীতি, ভারতবাসীর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া অথবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবর্ত্তিত হইতেছে"। তদুপরি—ভারতবর্ষের দুঃখের কাহিনী "ঈর্ষ্যা, দাম্ভিকতা বা অসদভিসন্ধি-বিজৃম্ভিত নহে।"

এইবার সারসংগ্রহ করিয়া দেখ, যাহারা স্বদেশ-বৎসল, যাহারা সুশিক্ষিত, যাহারা সহৃদয়, তাহারাই উকীলের মতে অসন্তুষ্ট; অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রদর্শী, যাহারা ইতিহাসের অনুশীলন করে, যাহারা কাল-ধর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম, তাহারাই অসন্তুষ্ট! ভয়ঙ্কর কথা! আমরা ইহার অনুমোদন করি না, কারণ তাহাহইলে রাজার দোষ আছে, এবং রাজার স্বকার্য্যে দোষ প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই বলিতে হইবে! আমাদের শঙ্কা হইতেছে, প্রবন্ধলেখক এই স্থলে মর্ম্ম-দুঃখে অধীর হইয়া আত্ম-বিস্মৃতির পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি বলিয়া রাখি, যাহারা রাজার কার্য্যে ত্রুটি দেখিয়া ব্যথিত হয়, আর সেই ত্রুটি রাজগোচরে জ্ঞাপন করে, তাহাদের রাজভক্তি নিতান্তই প্রবল; নহিলে এত্রুটি তাহারা দেখাইয়া দিত না, ব্রণ লুকাইয়া

রাখিত ; যত দিনে অভ্যন্তর ছুরিত হইয়া অঙ্গচ্ছেদের প্রয়োজন না উপস্থিত হইত, ততদিন নীরব থাকিত। ইহারা কখনই রাজদ্রোহী হইবার ব্যক্তি নহে ; ইহারা কাহাকেও রাজদ্রোহিতা শিখাইবে না।

তথাপি মনে করা যাউক যে, ইহারা ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকে বিদ্রোহী এবং বিপ্লবপ্রিয় করিবার জন্য যত্ন করিতেছে। সে যত্ন কি মুদ্রিতাক্ষরে রাজার নয়নোপরি করিবে বলিয়া-কেহ বিশ্বাস করিতে পারে ? তবে একথা লইয়া মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা কেন ? দিনে ডাকাইতি করা যাহাদের অভ্যস্ত, তাহারাই গৃহস্থকে কখন কখন পত্র লিখিয়া জানায় বটে। পরাধীনতাই আমাদের অভ্যস্ত ; অপহৃত স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতে আমরা কখনও শিখি নাই ; কখনও উদ্যোগ করি নাই, কখন চেষ্টাও করি নাই। তবে এ " মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা " কেন ?

স্বাধীনতা ভালবাসিলেই যে কাহাকেও রাজদ্রোহী হইতে হইবে, ইহার অর্থ নাই, " উকীলই ইহার হেতুবাদ করিয়াছেন, এবং সুন্দর দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন। মোটামুটি বলা যায়, ইউরোপ এবং আমেরিকা স্বাধীন ; অথচ তথাকার লোক স্বদেশের রাজার অধীন। উকীলের পরিভাষা অনুসারেই, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অধীনতার রূপান্তর মাত্র। ইংরেজ-রাজ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ; এবং ব্যবস্থা-প্রণয়ন, ও আয় ব্যয়ের বিধানাদি বিষয়েও ভারতবাসী ক্রমে ক্রমে অধিকতর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং রাজপ্রসাদানুসারেই ভারতবাসী স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। স্বাধীনতা কামনা রাজার অনুমোদিত এবং রাজার অনুগ্রহে পরিপুষ্ট হইতেছে। তবে কেন ভারতবর্ষের প্রজাবৃন্দ স্বাধীনতা ভালবাসিবে না ? এতদ্ভিন্ন ইংরেজরাজ আমাদিগকে নিত্য নিত্য বলিতেছেন, তোমরা স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য হইলেই আমরা তাহা প্রত্যর্পণ করিব, ভারতের উপকার-জন্যই ভারতে আমরা আসিয়াছি। ইহাতে এই বুঝা যায় যে, স্বাধীনতারদিকে দৃষ্টি না রাখিলেই বরং ভারতবাসী প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবে, রাজেচ্ছার প্রতীপ-গমন চেষ্টার দোষে দোষী হইবে। এত যে অমূল্য শিক্ষা ইংরেজ আমাদিগকে দিতেছেন, ইহা কি কেবল আমাদিগকে দাসত্ব এবং পশুত্বে অবনীত করিবার জন্য ? উকীল বলেন, তাহা নহে ; আমরাও বলি তাহা কখনই নহে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে আমাদের চরমলক্ষ্য হওয়া উচিত, তাহা যেমন আমাদের রাজার অভিপ্রেত, তেমনি উকীলেরও বাঞ্ছনীয়। ভারতের একতা যে অভিলষিতব্য, উকীল তাহা একাধিকবার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; সে একতার পরিণামে মঙ্গল হইবে, উকীল তাহাও বলিয়াছেন। সে মঙ্গল যদি স্বা-

ধীনতা না হয়, তবে কি ? মুদ্রণগুণে যদি স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তবে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা যে কেবল নিষ্প্রয়োজন, তাহা নহে, প্রত্যুত, নিতান্ত অব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া তিরস্করণীয়।

প্রসঙ্গাধীন ব্যবস্থার দ্বারা বিদ্রোহ-ভাবের দমন যে অসাধ্য এবং অসম্ভব, ইহা বলাই বাহুল্য। যদি প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধাচরণ করা কাহারও অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে মুদ্রিতাক্ষরের আশ্রয় গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে আদৌ অতিযত্নে তাহা পরিবর্জ্জন করিবে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহিবর্গ হিন্দুপেট্রিয়ট্ পত্রে প্রবন্ধ প্রচার করে নাই, এইরূপ শুনা আছে। চর্ব্বিত চর্ব্বণে প্রবৃত্তি থাকিলে, এই স্থলে বলিতাম যে ভারতবাসীর হৃদয়ে সত্য সত্যই যদি বিদ্রোহ-প্রবৃত্তি থাকিত, তাহা হইলে সংবাদ পত্রাদির প্রচারে অপসারিত হইবারই কথা। বাষ্প-যন্ত্রের রক্ষণ-রন্ধ্র নিত্য উপকারই করিয়া থাকে ; তাহাতে অনিষ্ট হয় না।

অতএব, উকীলের কথা যথাবৎ বিশ্বাস করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইতেছে যে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা সমর্থন করিবার চেষ্টা বৃথা, সে চেষ্টা কৃতকার্য্য হইবার নহে। ইহাও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা গর্হিত নহে, বরং ইংরেজরাজ সর্ব্বথা তাহার আনুকূল্য করিতেছেন। তবে এই সৎপ্রবৃত্তির সুপ্রয়োগ এবং পুষ্টি সাধন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা একবার দেখা যাউক।

উকীল যথার্থই বলিয়াছেন, যে ইংরেজ আমাদের গুরু। সাত শত বৎসর স্বার্থপর দস্যুর অধীনে থাকিয়া আমরা যে প্রকারে দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি, এই গুরুর অনুগ্রহে এখন আমরা তাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি। নিস্বার্থ ইংরেজরাজের কৃপাবলে মহাবেগে আমরা উন্নতিপথে সঞ্চালিত হইতেছি। প্রগাঢ় অন্ধকার হইতে এখন আমরা তীব্র আলোকে আনীত হইয়াছি, এখন বিস্ময়ে, স্তব্ধভাবে, সংকুচিত নেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, এবং পূর্ব্বতন দুর্দ্দশার স্বরূপ চিন্তা করিতেছি। এই মহোপকারের জন্য, জন্ম জন্ম আমরা ইংরেজসমীপে কৃতজ্ঞ রহিব।

অধিকন্তু ইংরেজ আমাদিগকে এক্ষণ এরূপ অবস্থায় উপস্থাপিত করিয়াছেন, যে এখন আমরা মার্শমেনের কথায় ভুলিয়া তদীয় গ্রন্থকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করি না। অতিপূর্ব্বে আমরা কি ছিলাম, স্বচক্ষে তাহা দেখিতে পাই ; এখন সামান্যা "সাধারণী" ও আমাদিগকে অশোকের জয়স্তম্ভ দেখাইয়া দেয়, প্রাচীন তাপস-কুলের আশ্রমে—আমাদিগকে লইয়া যায়, এবং তীর্থস্থলের মহিমা গান করিয়া, আর্য্যসন্তানের চিরন্তন সম্বন্ধ—একধর্ম্মতা, একপ্রাণতা মনে করিয়া, দেয়। উকীল এই সত্যের পথাবরোধ করিতেছিলেন, নহিলে তাঁহার ওকালতী ॥

চলে না। কিন্তু ইংরেজ-গুরুর প্রসাদে আমরা তত্ত্বানুসন্ধান করিতে শিখিয়াছি, তত্ত্ব জানিয়াছি। আর আমরা বাক্‌ছলে ভুলি না। ইংরেজরাজ আজিও মন্বাদি ঋষির সম্মান রক্ষা করিয়া, আর্য্য জাতির একতা প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদিগের হৃদয়ে জাগরুক করিয়া দিতেছেন। বাস্তবিক ভারতবর্ষের আদিম সভ্যতা, স্বাধীনতা— এবং উন্নতাবস্থার চিত্র নিয়ত আমাদের নয়ন-সমক্ষে না ধরিলে, আমরা এত সত্বর অমূল্য গুরূপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম না, ইংরেজ-বাঞ্ছিত আমাদের স্বাধীনতা প্রবৃত্তির পুষ্টি সাধন হইত না।

এ সমুদয়ই উকীল আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। উকীলের প্রজানীতিকে আমরা রত্নাকর বলিয়া অভিহিত করিব। খুঁজিলেই ইহাতে রত্ন পাওয়া যাইবে। ইহাতে উত্তাল-তরঙ্গ আছে, বাড়বানলের শঙ্কা আছে, কুম্ভীর হাঙ্গরের ভয় আছে, —সত্য; তথাপি ইহা—রত্নাকর। জল দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। মন্থন-দোষে ইহাতে গরল উঠিতে পারে, কিন্তু অমৃতও ইহাতে পাওয়া যায়।

আর প্রস্তাব বাহুল্য করিব না; উকীলকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা এই স্থলে ক্ষান্ত হইব।

বঙ্গবিধবা।

(জ্ঞানদাসের ছন্দানুকৃতি)

১

সখিরে কি কব মনের দুখ;
কি সুধাও সই কি কহিব তোরে,
ভাবিতে বিদরে বুক।
(সখিরে) বিধাতা করিলা জনম দুখিনী,
যুবতি বিধবা বালা;
(হায়) অনুদিন সই, নয়নের জলে,
ঘুচাই মনের জ্বালা।

২

সখিরে, আমি হেন অভাগিনী,
নাহি জানি পতি, কিবা সে মুরতি,
বিবাহ কি নাহি জানি।
(সখি) মা বাপ নিদয়, শৈশব সময়ে,
পর হাতে সঁপি দিলা,
(আমি) অনিচ্ছাতে সই, খেলিনু তখন,
সে এক দুঃখের খেলা।

৩

সখিরে, কি কব প্রাণের জ্বালা;
ছিড়িয়া কলিকা, কণ্টক লতায়,
বিঁধিয়া গাঁথিল মালা!
(সখি) তাতেও আবার, বিধাতা বিমুখ;
সেও মালা ছিঁড়ে গেল;

(আমি) ধূলায় পড়িয়া, যাই গড়াগড়ি,
এ মোর কপালে ছিল !

৪

সখিরে, বিধাতা নিঠুর অতি ;
দুঃখের অনলে, দহিতে নিয়ত,
গড়েছিলা এমুরতি।
(সই) হেন যদি বিধি, করিলা অবিধি,
কেন না হরিলা স্মৃতি ;
কেন লো স্বজনি, বাসনা কামনা
(পাপ) হৃদয়ে করিলা স্থিতি *।

৫

সখিরে, কাল নিশি অবসানে ;
দেখেছি যেরূপ, পাশরিতে নারি,
ধৈরয না ধরে প্রাণে !
(সখি) কুসুম কাননে, একাকী বিরলে,
যখন ছিলাম বসি ;
(আমি) সহসা দেখিনু, হাসিতে হাসিতে,
ভূতলে নামিল শশী।

৬

সখিরে, কি কব রূপের কথা ;
সে মুখ স্মরিতে, ঝড়ে দুনয়ন,
মরমে উপজে ব্যথা !
(হায়) কিবা অনুপম, সে শ্যাম মুরতি,
বদনে প্রীতির ভার ;
(সই) চাহিতে চাহিতে, দেখিতে দেখিতে,
হরে নিল মন আমার।

৭

সখিরে কিবা সে মধুর ভাষা ;
শুনিতে শুনিতে বাড়িল পিয়াস,
না পূরিল মন আশা !
(জিনি) বংশীর সুরব, কোকিল কাকলি,
কহিলা করুণ স্বরে ;
"(বড়) ভাল বাসি আমি,তোমারে সুন্দরি,
এসেছি তোমার তরে।"

৮

সখিরে, আমি হেন অভাগিনী ;
"ভাল বাসি তোরে" এমধুর কথা,
জনমে নাহিক শুনি !
(হল) আলু থালু প্রাণ, হারাইনু জ্ঞান্
হইনু পাগল পারা ;
(তখন) খসিল বসন, ঘন বহে শ্বাস,
স্থির দুনয়ন তারা !

৯

সখিরে, কি কব এ পোড়া মুখে,
মনে হল সাধ, কণ্ঠহার করি,
পরি সে রতনে বুকে।
(আমার) মনে হল সাধ, পড়িনু প্রমাদে,
দুরু দুরু হিয়া কাঁপে ;
(তখন) চারিদিকে চাই, দেখে যদি কেহ,
পুড়িব কলঙ্ক তাপে !

১০

সখিরে, বলিতে বিদরে হিয়ে !
নেহারিনু আমি, সেইরূপ রাশি,
নয়নে নয়ন দিয়ে।
(তখন) সেই সুধাকর, কোমল দুকর,
কণ্ঠেতে করিল দান ;
(অমনি) সাপটিয়া সই, ধরিনু উরসে,
পরশে অবশপ্রাণ !

* স্থিতি করিলা সকর্ম্মকরূপে ব্যবহৃত।

১১

সখিরে, আচম্বিতে এ কি হল ;
অধরে চুম্বিতে, পূর্ণিমার চাঁদ,
আকাশে মিশিয়া গেল।
(সখি) হইতাম যদি, বন বিহঙ্গিনী,
উড়িতাম তার তরে ;
(আমি) হইতাম সুখী, বারেক নিরখি,
সেই পূর্ণ শশধরে।

১২

সখিরে, আমি হেন অভাগিনী,
এ পাপ পরশ, সহেনা সে দেহে,
হায় আগে নাহি জানি!
(আহা!) পাই যদি পুনঃ সেই সুধাকরে,
দেখিয়া ঘুচাই ক্ষুধা ;
(আমি) দূর হতে সই, চকোরের মত,
খাই সে মুখের সুধা!

১৩

সখিরে, পাসরিয়া ভয় লাজে ;
যোগিনী হইয়া বেড়াইব সখি,
গহন কানন মাঝে।
(সখি) কখন কাঁদিব, কখন হাসিব,
কভু পড়ি ধরাতলে ;
(আমি) নখরে কাটিয়া, সরোবর সই,
ভরিব নয়ন জলে!

১৪

সখিরে, সেই সরোবর মাঝে ;
কুমুদিনী হয়ে, বেড়াব ভাসিয়ে,
দেখিতে সে দ্বিজরাজে ?
(আমি) আকাশের পানে, থাকিব চাহিয়া,
ঐরূপ করিব ধ্যান ;
(সখি) না পাইলে তারে, অগাধ সলিলে,
ডুবিয়া ত্যজিব প্রাণ!

১৫

সখিরে, কি কাজ বিলম্ব করি ?
আর এক পথ, আছেরে আমার,
শোন তবে সহচরি।
(সই) সাজাইয়া চিতা, জ্বলন্ত অনলে,
পাপ দেহ কর ছাই ;
মনের আগুন, মিশিবে আগুনে,
(আমার) বেঁচে থেকে কাজ নাই!

১৬

সখিরে, সেই সুখের শ্মশান পরে ;
অশোক বকুল, তমালের তরু,
রোপিস্ যতন করে।
(যখন) পথিক আসিয়ে পথশ্রান্ত হয়ে,
বসিবে সে তরুতলে ;
(তখন) কহিস "এখানে, বঙ্গের বিধবা,
পুড়িয়াছে চিতানলে!" (পথিক)

জীবনপ্রভাত।



দশম পরিচ্ছেদ।

আশা।



" মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে,
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া দুরু দুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ "

মধুসূদন দত্ত।

যেদিন রঘুনাথ তোরণদুর্গে আসিয়াছিলেন, যেদিন তাঁহার হৃদয় উন্মত্ত ও উৎক্ষিপ্ত হয়, সেইদিন প্রথমপ্রেমের আনন্দময়ী লহরীতে আর একটি বালিকা-হৃদয় ভাসিয়া গিয়াছিল। ছাদে সন্ধ্যার সময় যখন সরযুর দৃষ্টি সহসা সেই তরুণ যোদ্ধার উপর পতিত হইল, বালিকার হৃদয় যেন সহসা অজ্ঞাতপুর্ব্ব উদ্বেগে চমকিল ও স্তম্ভিত হইল। আবার চাহিলেন, আবার সেই উদার বদন মণ্ডল, সেই উন্নত তরুণ যুদ্ধবেশধারী অবয়ব দেখিলেন, প্রথমপ্রেমের তরঙ্গবেগে বালিকার হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

সেই উদ্বেগ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে রঘুনাথকে ভোজন করাইতে যাইলেন, পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দেব-বিনিন্দিত অবয়বের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সময়ে সময়ে স্পন্দহীন হইয়া একেবারে চকিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। আবশ্যকমতে সম্মুখে আসিলেন, প্রেমবিদগ্ধা বালিকা তখনও নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না; যখন চারিচক্ষুর মিলন হইল, তখন লজ্জাবৃত-বদনা ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলেন।

সরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে নূতন একটি ভাব উদয় হইল। রঘুনাথ তাঁহারদিকে সোদ্বেগে দৃষ্টি করিলেন কেন? রঘুনাথ এরূপ বিচলিত-চিত্ত হইয়া ভোজন করিতেছেন কেন? তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস কি জন্য? হস্ত কাঁপিতেছে কি জন্য? জগদীশ্বর! ঐ দেবপুরুষ কি এই অভাগিনীকে মনে স্থান দিয়াছেন?

পরদিন আবার সেই তরুণ যোদ্ধাকে দেখিলেন, আবার হৃদয়, মন, প্রাণ সেই দিকে ধাবমান হইল। যখন বিদায় লইয়া যোদ্ধা অশ্বারূঢ় হইয়া চলিয়া গেলেন, সরযুর প্রাণটিও লইয়া গেলেন, কেবল দেহমাত্র প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সেই মন্দিরে দণ্ডায়মান রহিল। যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন, পুরুষের মন উচ্চাভিলাষে যুদ্ধ-উল্লাসে স্ফীত হইতে লাগিল; রমণী একাকী গবাক্ষ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নিঃশব্দে দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু বিমো-

চন করিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় নিঃশব্দে বিদীর্ণ হইতেছিল।

বালিকা একথা মুখ ফুটিয়া বলিবে কিরূপে, এ মর্ম্মভেদী দুঃখ জানাইবে কাহার কাছে?

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহী অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বালিকা নিস্পন্দে সেইদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। দিবালোকে পর্ব্বতমালা অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, তাহার উপর, যতদূর দেখা যায়, পর্ব্বত-বৃক্ষ সমুদ্রের লহরীর মত বায়ুতে দুলিতেছে। উপরে পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত পতিত হইতেছে, সেই স্বচ্ছজল নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে। নীচে সুন্দর উপত্যকায় গ্রামের কুটীর দেখা যাইতেছে, সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সমস্ত দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া পর্ব্বত-কন্যা তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে,ও মেঘ বিবর্জ্জিত সূর্য্য এই সুন্দর দৃশ্যের উপর দিয়া আপন আলোক-হিল্লোল আনন্দে গড়াইয়া দিতেছেন। কিন্তু সরযু এ সমস্ত দেখিতেছিলেন না, তাঁহার মন এ সমস্ত দৃশ্যে ন্যস্ত ছিল না। তিনি কেবল একমাত্র পর্ব্বতপথের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মন সেই দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া বালিকা আর কিছু দেখিতে পাইলেন না; তাঁহার নয়ন পুনরায় জলে আপ্লুত হইল, শীঘ্রই অবারিত ধারা বহিয়া গণ্ড ও বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। বালিকার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

শূন্য-হৃদয়ে সরযুবালা সংসারকার্য্যে নিয়োজিত হইলেন; স্নেহময়ী কন্যা পিতার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা অব্যক্তব্য ও অব্যক্ত, প্রফুল্ল মুখখানি কেবল ঈষৎ ম্লান, ধীরে ধীরে পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ধৈর্য্যই রমণীর প্রধান গুণ, ধৈর্য্যই রমণী বাল্যকাল অবধি অভ্যাস করেন। এই বিষম সংসারের নানা শোক দুঃখে, পীড়ায়, যাতনায়, বিষম উদ্বেগে, সকল সময়েই নারী ধৈর্য্যধারণ করিয়া সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অসহ্য শোকযাতনা হৃদয়ে গোপন রাখিয়া হাস্যমুখী স্বামীর সেবা করেন, দুর্ব্বহনীয় পীড়া তুচ্ছ করিয়া স্নেহময়ী সযত্নে সন্তানকে লালন পালন করেন। শুনিয়াছি, পুরাকালে তাপসেরা ইন্দ্রিয়সুখ তুচ্ছ করিতেন, হেলায় সহস্র যাতনা সহ্য করিতেন। কিন্তু যখন আমি সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করি, প্রেমময়ী রমণীকে সহস্র যাতনা, সহস্র দুঃখ, সহস্র অপমান সহ্য করিয়াও স্বামীর দিকে এক-নিবিষ্টচিত্ত থাকিতে দেখি; যখন স্নেহময়ী জননীকে পীড়া, দারিদ্র্য, সংসারের অসংখ্য ও অসহ্য যন্ত্রণা হেলায় সহ্য করিয়া পুত্র কন্যাদিগকে সযত্নে লালন পালন করিতে দেখি, তখন আমি তাপসদিগের কথা বিস্মৃত হই, সংসারের মধ্যে গৃহস্থিনী তাপসীদিগের সহিষ্ণুতা দেখিয়া

বিস্মিত হই। সরযুবালা রমণী, সুতরাং বাল্যকাল হইতে সহগুণ অভ্যাস করিয়াছিলেন; নিঃশব্দে পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, হৃদয়ের উদ্বেগ নিঃশব্দে হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন।

সায়ংকালে পিতার ভোজনের সময় নিকটে বসিলেন; স্বহস্তে পিতার শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে আপন শয়নাগারে যাইলেন, অথবা সেই নিস্তব্ধ রজনীতে পুনরায় ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষ পার্শ্বে যাইয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

পুনরায় প্রভাত হইল, পুনরায় দিন গতে সন্ধ্যা হইল, সপ্তাহ অতীত হইল, মাসকাল অতিবাহিত হইল, সে তরুণযোদ্ধা আর আসিলেন না, তাঁহার কোন সংবাদও আসিল না। সরযুবালা সেই পর্ব্বতপথ চাহিয়া রহিলেন।



একাদশ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা।

"এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি,
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনু,
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।"

মধুসূদন দত্ত।

জনার্দ্দন স্বভাবতই সরলস্বভাব লোক ছিলেন, সমস্ত দিন শাস্ত্রানুশীলন বা দেবপূজায় রত থাকিতেন, প্রভাতে ও সায়ংকালে কিল্লাদারের নিকট সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, কদাচ বাটীতে থাকিতেন। তিনি একমাত্র কন্যাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, ভোজনের সময় কন্যাকে নিকটে না দেখিলে তাঁহার আহার হইত না, রজনীতে কখন কখন শাস্ত্রের গল্প বলিতেন, সরযু বসিয়া শুনিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রায়ই আপন কার্য্যে রত থাকিতেন; কন্যাও পূর্ব্ববৎ পিতার সেবা করিতেন, গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা ও কখন কখন ঈষদ্ ম্লান মুখখানি জনার্দ্দন লক্ষ্য করেন নাই।

বালিকার হৃদয়ে সহসা যে ভাবগুলি উদয় হয়, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না; একদিন সন্ধ্যাকালে ও একদিন প্রাতে সরযুর হৃদয়ে সহসা যে ভাবের উদ্রেক হইল, তাহা এক সপ্তাহে বা এক মাসের মধ্যেই বিলুপ্ত হওয়াই সম্ভব। যদি সরযুর মাতা থাকিত, বা ছোট ছোট ভগ্নী বা খেলিবার সঙ্গিনী থাকিত, বা জ্ঞাতি কুটুম্ব অনেকে থাকিত, তবে সেই মাতাকে দেখিয়া বা খেলায় রত হইয়া সেই নবভাব বিস্মরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সরযু জন্মাবধি একাকিনী, পিতা ভিন্ন তিনি আপনার লোক কাহাকেও কখন দেখেন নাই, কাহাকেও জানিতেন না, সুতরাং বাল্যকাল অবধিই ধীর, শান্ত, চিন্তাশীল। প্রথমযৌবনে যেরূপ দেখিয়া সহসা সরযুর হৃদয় আলোড়িত হইল, মন উন্মত্ত হইল, অপূর্ব্ব সুখের উ-

চ্ছ্বাস হইল, সরযু এখন সেই চিন্তায় মগ্ন হইলেন; দিনে, সায়ংকালে, প্রভাতে, সেই চিন্তা করিতেন, সুতরাং সে বিলুপ্ত না হইয়া ক্রমেই হৃদয়ে গভীরাঙ্কিত হইতে লাগিল।

সে চিন্তা কি? সরযু সেই তরুণ সেনাপতির চিন্তা করিতেন। তিনি এতদিনে যুদ্ধের উল্লাসে মগ্ন হইয়াছেন, দুর্গ হস্তগত করিতেছেন, শত্রু ধ্বংস করিতেছেন, বিক্রম ও বাহুবলে বীরনাম ক্রয় করিতেছেন, এখন কি আর এ অভাগিনীকে স্মরণ আছে? চিরকাল আমাকে স্মরণ রাখিবেন, বলিয়াছিলেন সে কথা কি এখন মনে আছে? পুরুষের মন! নানা কার্য্য, নানা চিন্তা, নানা শোক, নানা উল্লাসে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। জীবন আশাপূর্ণ, অদ্য এই কার্য্য সাধন করিব, কল্য অপর কার্য্য সিদ্ধ করিব, এইরূপ নানা আশায় অতিবাহিত হয়। আশা ফলবতী হউক আর নাই হউক, জীবন সর্ব্বদা উল্লাসপূর্ণ থাকে। রাজদ্বারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শোকগৃহে বা নাট্যশালায়, নানা কার্য্যে নানা চিন্তায় হৃদয় পূর্ণ থাকে! কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? প্রেম আমাদের জীবন, প্রেম আমাদের জগৎ; জীবিতেশ্বর! সেটিতে যেন নৈরাশ করিও না! ধীরে ধীরে এক বিন্দু জল সরযুর গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল।

আবার চিন্তা আসিত;—তরুণ যোদ্ধা কি এখনও এ অভাগিনীর কথা ভাবেন? একালে এ বয়সে কি তাঁহার মন স্থির আছে? হায়! নব নব আনন্দে আমার কথা অনেক দিন বিস্মৃত হইয়াছেন! তাঁহার রমণীর অভাব কি? সুখের অভাব কি? নবীন যোদ্ধা এতদিনে অভাগিনীকে বিস্মৃত হইয়াছেন! হায়! নদীর উর্ম্মি পার্শ্বস্থ পুষ্পটীকে লইয়া ক্ষণকাল খেলা করে, পুষ্প আনন্দে নাচিয়া উঠে, তাহার পর উর্ম্মি কোথায় চলিয়া যায়, পুষ্পটি শুকাইয়া যায়, কিন্তু জল আর ফেরে না! আমাদের হৃদয়, আমাদের জীবন, পুরুষের খেলার দ্রব্য। মুহূর্ত্তে তাহাদের খেলা সাঙ্গ হয়, পরে রমণীর সমস্ত জীবন খেদ ও দুঃখপূর্ণ! নীরবে সরযু আর একবিন্দু জল মোচন করিলেন।

নিশীথে যখন সেই উন্নত দুর্গ ও চারিদিকে পর্ব্বতমালা চন্দ্রের সুধাকিরণে নিস্তব্ধে সুপ্ত হইত, তখন নীল আকাশ ও শুভ্র চন্দ্রেরদিকে চাহিতে চাহিতে বালিকার হৃদয়ে কত ভাব উদয় হইত, কে বলিবে? বোধ হইত যেন, সেই পর্ব্বত-পথ দিয়া একজন নবীন অশ্বারোহী আসিতেছেন, অশ্ব শ্বেতবর্ণ, আরোহীর সেইরূপ গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ ললাট ও নয়ন ঈষৎ আবৃত করিয়াছে! যেন দুর্গে আসিয়া অশ্বারোহী অবতরণ করিতেন, যেন তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ-খচিত শিরস্ত্রাণ, বলিষ্ঠ সুগোল বাহুতে সুবর্ণের বাজু, দক্ষিণ হস্তে সেই দীর্ঘ বর্শা! যেন যোদ্ধা আবার আহার করিতে বসিলেন, সরযু তাঁহাকে ভো-

জন করাইতেছেন; অথবা রজনীতে সেই ছাদে সরযু সেই যোদ্ধার হস্ত ধারণ করিয়া একবার মনের কথা খুলিয়া বলিতেছেন, হৃদয় ভরিয়া একবার কাঁদিতেছেন। যোদ্ধার প্রশান্ত শীতল বক্ষে সরযু মুখখানি লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাঁদিতেছেন! উঃ! সে দিন কি কখন আসিবে? সে আনন্দময় প্রতিমাকে কি সরযু আর দেখিতে পাইবে?

চিন্তার শেষ নাই, অগাধ সমুদ্রের হিল্লোলের ন্যায় একটির পর আর একটি আইসে, তাহার পর আর একটি। সরযু আবার ভাবিলেন যেন যুদ্ধ হইয়াগিয়াছে, তরুণ সেনাপতি বহু খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, বড় উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু সরযুকে ভুলেন নাই। যেন পিতা তাঁহার সহিত সরযুকে বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, যেন ঘর লোকে পরিপূর্ণ, চারিদিকে দীপালোক জ্বলিতেছে, বাদ্য বাজিতেছে, গীত হইতেছে, আর কত কি হইতেছে সরযু জানে না, ভাল দেখিতে পাইতেছে না। যেন সরযু কম্পিত-কলেবরে সেই দেব প্রতিমূর্ত্তির নিকট বসিলেন, যেন যুবকের হস্তে আপন স্বেদাক্ত কম্পিতহস্তটি রাখিলেন, যেন রজনীতে সেই জীবিতেশ্বরকে পাইলেন। উঃ! আনন্দে বালিকা-হৃদয় স্ফীত হইতেছে, তিনি আনন্দাশ্রু সম্বরণ না করিতে পারিয়া সেই বীরের শীতল হৃদয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া মুহুর্মুহু ক্রন্দন করিতেছেন। সরযু! পাগলিনী হইও না।

আবার চিন্তা আসিল। রঘুনাথ খ্যাতিপন্ন হয়েন নাই, রঘুনাথ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই, রঘুনাথ দরিদ্র, কিন্তু সরযু সেই পরম ধনকে পাইয়াছেন। পর্ব্বতের নীচে ঐ যে সুন্দর উপত্যকা দেখা যাইতেছে, যেখানে শান্তবাহিনী নদী চন্দ্রালোকে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, যেখানে হরিদ্বর্ণ সুন্দর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র চন্দ্রালোকে সুপ্ত রহিয়াছে, ঐ রমণীয় স্থানে অনেকগুলি কুটীরের মধ্যে যেন একটি ক্ষুদ্র কুটীর সরযুর! যেন দিবাবসানে সরযু স্বহস্তে রন্ধনকার্য্য সমাপন করিয়াছেন, যেন যত্নপূর্ব্বক জীবিতনাথের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কুটীর সম্মুখে সুন্দর দূর্ব্বার উপর বসিয়া রহিয়াছেন, পার্শ্বে শিশুসন্তান ক্রীড়া করিতেছে। যেন সরযু দূর ক্ষেত্রের দিকে চাহিতেছেন, যেন সেই দিক হইতে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একজন দীর্ঘকায় পুরুষ কুটীরাভিমুখে আসিতেছেন। সরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, শিশুসন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, যেন সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ আসিয়া প্রথমে শিশুকে, পরে শিশুর মাতাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। উঃ! সরযুর মস্তক ঘুরিতে লাগিল, সরযু ধন মান চাহে না, সুবর্ণ রৌপ্য চাহে না, খ্যাতি পদ চাহে না; ভগবন্! সরযুকে সেই ক্ষুদ্র কুটীর, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠটী দাও।

গভীর নিশীথে শ্রান্ত হইয়া সরযু

সেই ছাদে সুপ্ত হইয়া পড়িলেন; অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইলেন; ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র, সহস্র মোগল সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের ছিন্ন মস্তক বা ছিন্ন বাহু পতিত রহিয়াছে, ক্ষেত্র রক্তে আবৃত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে সেই নবীনযোদ্ধা পড়িয়া রহিয়াছেন! যোদ্ধার বক্ষঃস্থল হইতে রক্তস্রোত বহির্গত হইতেছে ও উজ্জ্বলতাশূন্য নয়নদ্বয় সরযুর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সরযু শিহরিয়া চীৎকার শব্দে জাগরিত হইলেন, দেখিলেন সূর্য্য উদয় হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত, ও এখনও কাঁপিতেছে, তাঁহার দীর্ঘ কেশপাশ, বাহু স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের উপর আলুলায়িতরূপে রহিয়াছে।

এইরূপে এক মাস, দুইমাস তিন মাস অতিবাহিত হইল, কিন্তু সে নবীনযোদ্ধা আর আসিলেন না। গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল, তাহার পর সুন্দর শরৎকাল শুভ্রচন্দ্র ও তারাবলীকে সঙ্গে লইয়া যেন জগৎকে সুধাপূর্ণ ও শান্ত করিল, কিন্তু সরযুর তপ্ত-হৃদয় শান্ত হইল না। শীত আসিল, চলিয়া গেল, আবার মধুময় বসন্তকাল আসিল, পুষ্পগুলি দেখা দিল, বৃক্ষে বৃক্ষে পত্র মঞ্জরিত হইল কিন্তু পূর্ব্ববসন্তে সরযু যে মধুময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, মধুকালের সহিত তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না।

বৎসরকাল অতীত হইল, সরযু সেই পর্ব্বত-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু সে পথে সে নবীনযোদ্ধা আর দেখা দিলেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নৈরাশ।

"বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি পড়ি ভূমিতলে
হারাই সতত জ্ঞান; চেতন পাইয়া
মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে!"
মধুসূদন দত্ত।

কয়েক মাসের চিন্তার অবশেষে সরযুর শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, মুখ ম্লান হইল, নয়নদুটী ঈষৎ কালিমাবেষ্টিত হইল। যে লাবণ্য দেখিয়া দুর্গের সকলেই বিস্মিত হইতেন, সে অপূর্ব্ব প্রফুল্ল লাবণ্য আর নাই; শরীর শীর্ণ, ওষ্ঠদুটি শুষ্ক, নয়নের প্রফুল্ল জ্যোতিঃ হ্রাস পাইয়াছে। শরীরে যত্ন নাই, মনেও প্রফুল্লতা নাই। জনার্দ্দন সময়ে সময়ে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিতেন "সরযু! তোমার শরীর কাহিল হইতেছে কেন?" অথবা "সরযু! তোমার খাওয়া দাওয়ার রুচি নাই কেন?" কিন্তু সরযু উত্তর দিতেন না, পিতা কিছু না জানিতে পারেন, এই জন্য ঈষদ্ধাস্য করিয়া অন্য কথা আনিতেন, সুতরাং সরল-স্বভাব জনার্দ্দন কিছুই জানিতে পারিলেন না।

কিন্তু অগ্নি বস্ত্রাবৃত হইলে সেই বস্ত্রকে দাহ করে, যত্নসঙ্গোপিত চিন্তা সরযুর হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতে লাগিল। শরীর আরও অবসন্ন হইতে লা-

গিল, বদন-মণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, চক্ষুর্দ্বয় কোটর-প্রবিষ্ট হইল, বালিকার শরীর আর সহ্য করিতে পারিল না, সরযু সঙ্কটজনক পীড়াক্রান্ত হইলেন। ভীষণ জ্বরে শরীর দগ্ধ করিতে লাগিল, বালিকা জ্বালায় অস্থির হইয়া "জল" "জল" করিতে লাগিল, অথবা সময়ে সময়ে অজ্ঞান হইয়া নানারূপ কথা কহিতে লাগিল।

জনার্দ্দন যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, কিন্তু কারণ জানিতেন না। শারীরিক পীড়ামাত্র বিবেচনা করিয়া প্রসিদ্ধ চিকিৎসকদিগকে আনয়ন করিয়া কন্যার চিকিৎসা করাইলেন।

বালিকার অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া চিকিৎসকেরাও ভীত হইল। বালিকার শরীর কখন কখন ঘর্ম্মে আপ্লুত হইত, কখন বা শীতে কণ্টকিত হইয়া উঠিত। সর্ব্বদাই অজ্ঞান অবস্থায় থাকিত, নানারূপ কথা উচ্চারণ করিত, কিন্তু তাহা এরূপ তীব্র ও অস্পষ্ট যে কিছুই বুঝা যাইত না।

সূক্ষ্ম রক্তশূন্য অঙ্গুলীগুলি সর্ব্বদাই নড়িত, কখন কখন বালিকা বাহু প্রসারণ করিত, সময়ে সময়ে শিহরিয়া উঠিত, সময়ে সময়ে চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিত।

উঃ! সেই রোগীর মনে কত সময়ে কত রূপ চিন্তার উদ্রেক হইত, তাহার স্বপ্নে কত রূপ আকৃতির আবির্ভাব হইত, তাহা কে বলিবে?

কখন সম্মুখে বিস্তীর্ণ মরুভূমি দেখিত, বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে, সূর্য্যের প্রখর তাপে সে বালুকা উত্তপ্ত হইয়াছে, সেই মরুভূমিতে সেই রৌদ্রে বালিকা একাকী গমন করিতেছে। উঃ! তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে; জল! জল! এক বিন্দু জল দিয়া প্রাণ রক্ষা কর, গাত্রচর্ম্ম দগ্ধ হইতেছে, জল! জল! জল! সে মরুভূমিতে বৃক্ষ নাই, গ্রাম নাই, কেবল তপ্ত বালুকা, সরযুর পদ দগ্ধ হইতেছে। আকাশে মেঘ নাই, অথবা যাহা আছে তাহাতে উত্তাপ অধিকতর বৃদ্ধি করিতেছে! সরযুকে কে জল দিবে? সহসা অট্টহাস্য শুনা যাইল, সরযু সেই আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রঘুনাথ তাঁহার কষ্ট দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেছেন; বালিকা ক্রোধে ও খেদে তর্জ্জন করিয়া উঠিল। সুপ্তরোগী চীৎকার করিয়া উঠিল, চিকিৎসকগণ ভীত হইল।

আবার স্বপ্ন দেখিল। নিবিড় বন, অন্ধকার, জনশূন্য! সেই বনের মধ্য দিয়া সরযু বেগে পলাইতেছে, একটা ব্যাঘ্র তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইতেছে। চীৎকারশব্দ করিয়া সরযু পলাইতেছে, তাঁহার শব্দে বন প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বনের কণ্টকে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, পদযুগল ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, কিন্তু ভয়ে দাঁড়াইতে পারে না। উঃ! শরীর জ্বলিতেছে, পা জ্বলিতেছে, এ জ্বালা কিছুতে নিবারণ হয় না? সহসা সম্মুখে কি দেখিল? দেখিল সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ সম্মুখে দ-

শায়মান রহিয়াছেন, ভীত সরযুকে বামহস্তে রক্ষা করিলেন, দক্ষিণহস্ত চালনায় খড়্গদ্বারা ব্যাঘ্রকে ধরাশায়ী করিলেন। উঃ! সরযুর প্রাণ শীতল হইল; শ্রান্ত রোগীর অস্থিরতা নিবারণ হইল, রোগী গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। চিকিৎসকগণ এই সুলক্ষণ দেখিয়া সে দিন চলিয়া গেলেন।

এইরূপে প্রায় একমাস পর্য্যন্ত সরযু রোগগ্রস্ত ও অজ্ঞান হইয়া রহিল। সময়ে সময়ে রোগের এরূপ তীব্রতা হইত যে চিকিৎসকেরাও জীবনআশা ত্যাগ করিতেন। জনার্দ্দন স্ত্রীর মৃত্যু অবধি একরূপ উদাসীন হইয়াছিলেন, শাস্ত্রানুশীলনে ও পূজাকার্য্যেই রত থাকিতেন, এক দিনের জন্যও শাস্ত্রপাঠে নিবৃত্ত থাকিতেন না। কিন্তু অদ্য সংসারের মায়া কাহাকে বলে বুঝিলেন; বৃদ্ধ নিরানন্দে সেই শয্যার নিকট বসিয়া থাকিতেন, স্নেহময়ী কন্যার জন্য হৃদয় শোকে উথলিতে লাগিল, সেই কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, নিশীথে অনিদ্র হইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেন। অনেক দিনে, অনেক যত্নে, ক্রমে ঔষধি সেবনে রোগের উপশম হইতে লাগিল; অনেক দিন পরে সরযু শয্যা হইতে উঠিলেন, অন্ন আহার করিলেন, এ দিক ওদিক পদচারণ করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু তখন বদন-মণ্ডল একেবারে পাণ্ডুবর্ণ, শরীরে যেন রক্ত মাংস কিছুই নাই।

রজনী একপ্রহর হইয়াছে, ক্ষীণ দুর্ব্বল সরযু ছাদে উপবেশন করিয়া গ্রীষ্মকালের মন্দ মন্দ নৈশ বায়ু সেবন করিতেছেন। তিনি এখনও অতিশয় ক্ষীণ, শরীরের জ্বালা এখন ওসম্পূর্ণরূপে যায় নাই,এই জন্যই বায়ুসেবন করিতে ভাল বাসিতেন।

ধীরে ধীরে গত গ্রীষ্মের কথা মনে আসিতে লাগিল, যে যুবক তাঁহাকে বৃথা আশা দিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারই কথা মনে আসিতেছিল। চিন্তার তীব্রতা এখন নাই, কেননা শরীর অতি দুর্ব্বল, চিন্তাশক্তিও দুর্ব্বল। যেমন মন্দ মন্দ গতিতে সরযু পদচারণ করিতে পারিতেন, তাঁহার চিন্তাশক্তিও সেইরূপ ধীরে ধীরে পূর্ব্ব বৎসরের কথা জাগরিত করিতেছিল।

নিশির মন্দ মন্দ বায়ুতে যেন ধীরে ধীরে পূর্ব্বস্মৃতি আনিতে লাগিলেন; গলদেশে সেই কণ্ঠমালা দুলিতেছিল, সেইটীর দিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একবিন্দু জল শুষ্ক গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া পড়িল; ভাবিলেন "যদিও তিনি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, আমি কি তাঁহাকে ভুলিতে পারি? যতদিন জীবিত থাকিব, এই কণ্ঠমালা সযত্নে হৃদয়ে ধারণ করিব।" আর এক বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল, কণ্ঠমালা দিবার সময় যে মিষ্ট কথাগুলি রঘুনাথ বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল; রঘুনাথের মুখখানি মনে পড়িল; বোধ হইল যেন রঘুনাথ সেই মিষ্টস্বরে আবার ডাকিলেন "সরযু!"

সরযু শিহরিয়া উঠিলেন, পরে খেদে অল্প হাসিয়া ভাবিলেন "হায়! আমি জ্ঞান হারাইলাম না কি? সকল সময়ে তাহাকে দেখিতে পাই, এখনই বোধ হইল যেন তিনি সেই মিষ্টস্বরে আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। ভগবন্! এবিড়ম্বনা কেন!"

আবার সেই কোকিল-বিনিন্দিত শব্দ শুনিতে পাইলেন—"সরযু!" সরযু চমকিত হইয়া পশ্চাৎদিকে চাহিলেন, দেখিলেন—রঘুনাথ!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

"দেখিব প্রেমেরস্বপ্ন জাগি হে দুস্বনে!"

মধুসূদন দত্ত।

দেখিতে দেখিতে রঘুনাথ নিকটে আসিলেন, সহসা নত হইয়া সরযুর পদযুগল ধরিয়া বলিলেন "সরযু! আমাকে ক্ষমা কর, আমার মত পাতকী এ জগতে নাই, কিন্তু তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর।" রঘুনাথের চক্ষুজলে সেই পদযুগল সিক্ত হইল।

আনন্দে, বিস্ময়ে, লজ্জায় সরযু বাক্‌শূন্য হইলেন, রঘুনাথকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। আর কি করিলেন, তিনি জানেন না; আনন্দে তাঁহার শরীর বায়ুতাড়িত পত্রের মত কাঁপিতেছিল। যাঁহার প্রেমময় মুখখানি এক বৎসর অবধি চিন্তা করিতেছিলেন, যাঁহার উপর হৃদয়, মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, জগদীশ্বর! সরযু কি সেই হারাধন ফিরিয়া পাইলেন?

রঘুনাথ পুনরায় কম্পিতস্বরে বলিলেন "সরযু! তুমি আমার চিন্তা করিয়াছিলে, তুমি পীড়িত হইয়াছিলে, সেই পীড়ায় তুমি আমার নাম করিয়াছিলে;—আর আমি,—আমি কোথায় ছিলাম? সরযু এ পাপিষ্ঠকে কি তুমি মার্জ্জনা করিতে পার?" সরযু চাহিয়া দেখিলেন—চন্দ্রালোকে দেখিলেন, সেই কৃষ্ণকেশ-শোভিত, উদার দেবনিন্দিত মুখখানি সিক্ত,—সেই ভ্রমরনিন্দিত নয়ন হইতে অশ্রু বহিয়া পড়িতেছে! সরযুর নয়নও শুষ্ক রহিল না।

রঘুনাথ আবার বলিলেন "উঃ! ঐ পাণ্ডু-বদন দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; আমি তোমাকে কত শোক দিয়াছি; তুমি আমাকে কি মনে করিয়াছিলে?" পরে ধীরে ধীরে আপন বক্ষের উপর সরযুর হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, "কিন্তু সরযু! যদি তুমি এই হৃদয়ের ভাব জানিতে, দিবাভাগে, নিশীথে, শিবিরে, ক্ষেত্রে, যুদ্ধমধ্যে ঐ দেবী-বিনিন্দিত মূর্ত্তি কত ভাবিয়াছি যদি জানিতে, তবে বোধ হয় তোমাকে যে দারুণ কষ্ট দিয়াছি তাহাও মার্জ্জনা করিতে। জগদীশ্বর! আমি কি জানিতাম যে সরযুবালা এ অভাগার জন্য চিন্তা করেন, এ অভাগাকে মনে রাখিয়াছেন;"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিলেন, চারিচক্ষুর মিলন হইল, চারি চক্ষুই জলে ছল্ ছল্ করিতেছে, উভয়ের হৃদয় স্ফীত হইতেছে, সরযুর দুইটী হাত রঘুনাথ স্বহস্তে ধারণ করিয়াছেন, উভয়ের হৃদয় পরিপূর্ণ, মুখে আর বাক্য নাই; মন,প্রাণ, হৃদয়ের বেগবতী চিন্তা যেন সেই সজল নয়নে প্রকাশ পাইতেছে।

চন্দ্র! রঘুনাথ ও সরযুর উপর সুধাবর্ষণ কর, তুমি নিশীথে জাগরণ করিয়া সকল দেখিতে পাও, কিন্তু জগতে এরূপ দৃশ্য আর দেখ নাই। তরুণ বয়সে যখন মন প্রথম প্রেমোল্লাসে উৎক্ষিপ্ত হয়, যখন নবজাত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় নবজাত প্রেমের আনন্দ-হিল্লোল মানসজগতে গড়াইতে থাকে, যখন বহুবিচ্ছেদের পর পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উন্মত্তপ্রায় হয়, যখন পরস্পরের প্রেমে আনন্দিত হইয়া উভয়ে জগৎ বিস্মৃত হয়, স্থান কাল বিস্মৃত হয়, দোষ গুণ বিস্মৃত হয়, নীচে পৃথিবী,উপরে আকাশ বিস্মৃত হয়,—কেবল সেই প্রণয়মুখ ভিন্ন সমুদয় বিস্মৃত হয়,—তখন, তখনই যেন এ জগতে ইন্দ্রপুরী অবতীর্ণ হয়।

চন্দ্র! আরও সুধা বর্ষণ কর। বায়ু! ধীরে ধীরে বহিয়া যাও, এরূপ সুখের স্থানে তুমি কখনও বহিয়া যাও নাই। সরযু অনুচিত কার্য্য করিতেছেন তাহা জানেন না, অজ্ঞাত পুরুষের হস্ত ধারণ করিয়া আছেন তাহা জানেন না; কেবল যে মূর্ত্তি এক বৎসরকাল ধ্যান করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ দেখিতেছেন এইমাত্র জানেন, কেবল সেই নবীন মুখমণ্ডল, সেই চক্ষু, সেই কেশ, সেই ওষ্ঠ, দেখিতেছিলেন, এইমাত্র জানেন। আর রঘুনাথ! একি ভদ্রোচিত কার্য্য? রঘুনাথ জানেন না, রঘুনাথ উন্মত্ত!

সেই চন্দ্রালোকে, নিস্তব্ধ নিশাকালে রঘুনাথ সংক্ষেপে আপন বিবরণ সরযুকে জানাইলেন, সরযু পুলকিত শরীরে সেই মিষ্ট কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। এক বৎসর কাল অবধি রঘুনাথ নানাস্থানে, নানা যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তোরণে আসিবার জন্য একদিনেরও অবকাশ পান নাই। এক্ষণে শিবজী রায়গড়ে যাইয়া রাজা উপাধি লইয়াছেন, দেশশাসনপ্রণালীতে মনোনিবেশ করিয়াছেন, রঘুনাথ বিদায় পাইয়াছেন। রঘুনাথ দরিদ্র হাবেলদার মাত্র, তাঁহার নাম নাই, অর্থ নাই, পদ নাই, তিনি সরযুরত্নকে কি রূপে পাইবেন? জগদীশ্বর সহায় হউন, রঘুনাথ চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না, রঘুনাথ সেই রত্নটী কুড়াইয়া বক্ষে ধারণ করিবেন, অথবা চেষ্টায় অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিবেন। রঘুনাথ অদ্যই দুর্গে আসিয়াছেন, আসিয়াই সরযুর পীড়ার কথা শুনিয়াছিলেন, রাত্রিতে একবার সরযুকে গোপনে থাকিয়া দেখিবেন বলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সে পাণ্ডুবদন দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই,

ধীরে ধীরে নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, নিকটে আসিয়াছেন, তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, সরযু তাহা মার্জ্জনা করিবেন। রঘুনাথ পুনরায় কল্যই চলিয়া যাইবেন, কিন্তু দেহে যতদিন প্রাণ থাকিবে, সরযুর চিন্তা, সরযুর মুখখানি কখনও বিস্মৃত হইবেন না। সরযুকে এক একবার এই দরিদ্র সেনার জন্য চিন্তা করিবেন।

পুলকিত শরীরে সরযু মধুর কথাগুলি শুনিতেছিলেন, আহা! তাঁহার তাপিত হৃদয় শীতল হইল, দগ্ধ শরীর জুড়াইল, কিন্তু রাত্রি অধিক হইয়াছে, পিতা শয়ন করিয়াছেন, সরযুর কি রঘুনাথের নিকট বসিয়া থাকা উচিত? এই কথা সহসা মনে জাগরিত হওয়ায় সরযু উঠিলেন, ধীরে ধীরে রঘুনাথের হস্ত হইতে আপন হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন, পরে বলিলেন—

'রঘুনাথ!' সেই মিষ্ট নামটি উচ্চারণ করিয়াই লজ্জায় অধোবদন হইলেন। রঘুনাথের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। বলিলেন "সরযু! সরযু! আর একবার ঐ মিষ্টস্বরে ঐ নামটি উচ্চারণ কর, এক বৎসরের চিন্তা অদ্য বিস্মৃত হইব, এক বৎসরের কষ্ট অদ্য তুচ্ছজ্ঞান করিব।"

সরযু লজ্জা সংবরণ করিয়া বলিলেন "রঘুনাথ! জগদীশ্বর তোমাকে নিরাপদে রাখুন, তোমাকে জয়ী করুন! এ অভাগিনীর তাহা ভিন্ন অন্য প্রার্থনা নাই। তাহা ভিন্ন জীবনে অন্য চিন্তা নাই।" ধীরে ধীরে সরযু শয়নাগারে যাইলেন।

সে দিন রঘুনাথ তোরণ-দুর্গে রহিলেন, পরদিন প্রাতে কিল্লাদারের নিকট বিদায় লইয়া দুর্গ ত্যাগ করিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল; সরযুর চিন্তা পূর্ব্ববৎ বলবতী; কিন্তু পূর্ব্ববৎ খেদযুক্তা নহে। তিনি আনন্দের, সুখের চিন্তাই করিতেন; মায়াবিনী আশা কানে কানে বলিত "শীঘ্র যুদ্ধ শেষ হইবে, শীঘ্র রঘুনাথ জয়ী হইবেন, তখন তিনি এ অভাগিনীকে বিস্মৃত হইবেন না।" সরযুর শরীর ও পূর্ব্ববৎ পুষ্টতা ও লাবণ্য ধারণ করিল। দেখিয়া জনার্দ্দন পুনরায় নিশ্চিন্ত হইলেন, পুনরায় শাস্ত্রানুশীলনে মন দিলেন।

কএক মাস পরে সংবাদ আসিল, যে সম্রাট অম্বরাধিপতি জয়সিংহকে শিবজীর সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন। জনার্দ্দন পূর্ব্বপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বড়ই উৎসুক হইলেন; কিল্লাদারের অনুমতি লইয়া তোরণদুর্গ হইতে যাত্রা করিলেন। জনার্দ্দন সরল-হৃদয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে শত্রুশিবিরে যাইতে দিতে কিল্লাদার বা শিবজী কোন আপত্তি করিলেন না; বিশেষ ভদ্রাচরণদ্বারা জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন হয় শিবজীর এই ইচ্ছা ছিল, জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে তিনি কদাপি সম্মত ছিলেন না।

সমস্ত স্থির হইল, জনার্দ্দন কন্যার সহিত তোরণদুর্গ ত্যাগ করিলেন, কন্যার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল!— কেন?

সরযুর চিন্তামালিন্য দূর হইল, সরযুর

লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইল, সরযুর হৃদয়াশয় ছুরু ছুরু করিতেছে, সরযুর মুখে সর্ব্বদা হাসি!

সরযুর আনন্দে পিতা আরও আনন্দিত হইলেন, উভয়ে নিরাপদে রাজা জয়সিংহের শিবিরে পৌঁছিলেন। পাঠক! আমরা তোরণদুর্গে থাকিয়া কি করিব, চল আমরাও সেই স্থানে যাই।

নিশীথচিন্তা।

বিরহ।

প্রেমের পুষ্টি মিলনে, না বিরহে? যাঁহাদিগের হৃদয় আছে, এবং হৃদয়ে প্রীতির পবিত্রপ্রতিমা অঙ্কিত আছে;—যাঁহারা প্রেম আর বিরহকে ব্রজলীলার কথা মনে না করিয়া, হৃদয়রহস্য ও অধ্যাত্মতত্ত্বের নিগূঢ় কথা বলিয়া মনে করেন, সেই সাধুহৃদয় প্রেমিকেরা এই প্রশ্নের উত্তর করুন। আমার চক্ষে প্রেমের মোহময় সম্মিলন যেমন সুখপ্রদ, বিরহের বিষাদময়বহ্নিও তেমনই উপকারজনক। একটিতে প্রীতির আলম্ব, আর একটিতে প্রীতির উদ্দীপনা। যে বিরহের যজ্ঞীয় অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই, সে প্রেমের আভোগ ও আবেশ কাহাকে বলে, তাহা জানে না। যে সম্মিলনসুখের নির্ম্মল অমৃতরাশিতে অবগাহন করে নাই,—হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া মানবহৃদয়স্থ তরল তরঙ্গের সেই গভীর সঙ্গীত শ্রবণ করে নাই, বিরহের বিষযন্ত্রণায় যে কি শিক্ষা, কি সম্পদ, কি মেঘাবৃত জ্যোৎস্না, কি মধুময় দুঃখ আছে, তাহাও সে জানিতে পায় না; ফলতঃ বিরহ নিরবচ্ছিন্ন বিপদ নহে। বিরহে প্রেমের পরিশুদ্ধি,—প্রীতির পবিত্রতা। যে প্রেম নিরাবিল ও নির্ম্মল নহে, তাহা প্রেমের বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট, অথবা মনুষ্যত্বের উচ্চতর আদর্শে বঞ্চিত, পশু-প্রকৃতি-সম্পন্ন ইতর জনেরই ভোগে আসিতে পারে; প্রকৃত মনুষ্যের উপভোগ্য হয় না। সুতরাং প্রীতি যাহাতে সর্ব্বতোভাবে আবিলতাশূন্য হয়, ইহাই প্রার্থনীয়;—হৃদয় যাহাতে প্রীতির নাম লইয়া পঙ্কে গিয়া ডুবিয়া না পড়ে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। বিরহে সেই নিরাবিল মাধুর্য্য, সেই পঙ্ক-স্পর্শ-শূন্য প্রেমের প্রথম স্বাদ। হৃদয়, বিরহে দগ্ধ হইয়া, অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চনের ন্যায়; নূতন কান্তি ধারণ করে,—এবং দুঃখের মুর্ম্মুরদাহনে পুড়িয়া পুড়িয়া পবিত্রতার মোহনমূর্ত্তি সন্দর্শন করে। এইরূপে ইচ্ছা লালসাশূন্য হয়, লালসা একবারে বিনষ্ট না হইলেও প্রীতিতে পরিণতি পায়, এবং মনুষ্যের প্রাণ স্মৃতির উপাসনা করিতে প্রথম শিক্ষা পাইয়া দেবপ্রকৃতির সোপানপরম্পরায় ধীরে ধীরে আরোহণ

করে। ঈদৃশ শিক্ষাকে কোন প্রকারেই সামান্য শিক্ষা বলিতে সাহস পাই না।

শোক কি? না স্মৃতির উপাসনা। এবং স্মৃতির উপাসনাতেই মনুষ্যত্বের গৌরব। মুহূর্ত্তের জন্য যে অনুরাগ, তাহা মানব জাতির অধস্তন জীবসমূহেই শোভা পায়,—মনুষ্যে শোভা পায় না। মনুষ্যের অনুরাগ অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে না পারিলে পরিতৃপ্ত হয় না,—সূর্য্য, চন্দ্র, ও নক্ষত্রনিচয়ের সৃষ্টি ও বিলয়কেও পরিহাস করিয়া একবারে কালের সঙ্গে সমান রেখায় বহিতে না পারিলে, কৃতার্থ হয় না। এই নিমিত্তই মনুষ্যের জন্য মনুষ্যের শোক,—এবং এই নিমিত্তই শোকে মনুষ্যের এক অলৌকিক, অনির্ব্বচনীয়, অকন্তুদ সুখ। যাহারা শোকসন্তপ্ত ব্যক্তিকে সংসারের বৃথা কথা কহিয়া সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করে, আমার বিবেচনায় তাহারা হৃদয়-শূন্য। আর,—যাহারা বিবিধ নিষ্ঠুর নীতিসূত্র অথবা মমতার অনিত্যতা প্রভৃতি বিবিধ অর্থশূন্য বাক্য শুনাইয়া শোকাকুল হৃদয়ের মর্ম্মস্থান হইতে লোকান্তর-গত প্রিয়জনের প্রতিমূর্ত্তিখানি পুছিয়া ফেলিতে যত্নশীল হয়, তাহারা মূঢ়। আমার নিকট শোকের প্রতিকৃতি, সাধনার প্রতিকৃতির ন্যায়, যার পর নাই সুন্দর ও পবিত্র,—এবং শোকাকুলের দৃষ্টি সুধাবর্ষিণী। আমি আর্ত্তনাদকে শোক বলিনা, এবং প্রিয় বিচ্ছেদের প্রথম আঘাতে যে এক আত্মহত্যা জন্মে, তাহাকে ও শোক বলিয়া ব্যাখ্যা করি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শোকের নাম স্মৃতির উপাসনা, এবং যে ঐরূপ উপাসনার ভাবে শোকাকুল, সে সার্থক-জন্মা। মনুষ্য যখন শোকে এইরূপ শান্ত, সুস্থির ও ধীরপ্রকৃতি হয়, তখন তাহার জন্য দুঃখ না হইয়া, প্রত্যুত তাহার প্রতি আমার ভক্তি জন্মে,—এবং মনুষ্যের স্নেহ ও মনুষ্যের মমতা যে নিতান্তই একটি কথার কথা, খেলার সামগ্রী অথবা মায়ার ছলনা নহে, ইহা অনুভব করিয়া মনুষ্যজাতির প্রতি শ্রদ্ধাতে হৃদয় তখন অবনত হইয়া পড়ে। যে সংসারে স্বার্থই একমাত্র উপাস্য দেবতা, ক্ষতিলাভ-গণনাই মনুষ্যের একমাত্র শিক্ষা,এবং ভোগের আবর্ত্তচক্রই মনুষ্যের বিলাসক্ষেত্র, যদি সেই সংসারেও শোকের প্রকৃত সম্মান না হয়;—যে সংসারে প্রীতি প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ-স্পর্শে বিকশিত হইয়া সন্ধ্যাগমেই শুকাইয়া যায়, মনুষ্যের মমতা সৈকত-ভূমিতে জলরেখার ন্যায় দেখিতে দেখিতেই অদৃশ্য হয়, অনুরাগের তরঙ্গ বসন্তকালীন স্রোতস্বিনীর লীলাতরঙ্গের ন্যায় এই খল খল হাসিতে থাকে, এই আবার ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই পুনরায় লীলাজলে বিলীন হইয়া যায়, যদি সেই সংসারেও স্মৃতির উপাসনা মনুষ্যচিত্তে সমুচিত পূজা না পায়, তবে জানিনা মনুষ্যের শেষ গতি কি?

বিরহও শোকের ন্যায় স্মৃতির উপাসনা। সুতরাং বিরহও শোকের ন্যায়

সম্মাননীয়। যাহার হৃদয়ে শোকের দীপ-শিখা লুক্কাইত ভাবে জ্বলিতে থাকে, সেই শোক-সন্তপ্ত ব্যক্তির পরিম্লানমুখশ্রীতেও যে গাম্ভীর্য্য, বিরহসন্তপ্ত প্রেমিক ব্যক্তির পরিম্লান-মুখ-মাধুরীতেও সেই গাম্ভীর্য্য। শোক সুদীর্ঘবিরহ ;—বিরহ শোকের সাময়িক ভোগ। শোকে যে শিক্ষা,বিরহেও সেই শিক্ষা ;—শোকে যে শুদ্ধি, বিরহেও সেই পরিশুদ্ধি। প্রভেদ এইমাত্র, শোক অনেক দুর্ভাগ্য মনুষ্যের নিকটই আশা-শূন্য অন্ধকার। বিরহের অন্ধকার আশাপ্রদ।

অপিচ,বিরহে প্রেমের পরীক্ষা। দৃষ্টি যখন মুখরা নর্ম্ম-সখীর ন্যায় হৃদয়ের কথা হৃদয়ের নিকট কহিয়া দেয়, রজ্জুর ন্যায় বন্ধনীর কার্য্য করিয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়কে গ্রন্থন করিতে যত্নশীল রহে,—জিহ্বায় যাহা প্রকাশ পায়না, অন্তরের অন্তরতমস্থাননিহিত সেই নিগূঢ় কাহিনী প্রকাশ করিয়া প্রিয়জনের চিত্তবিনোদন করে, নিতান্ত অসারচিত্ত ক্ষীণপ্রাণ মনুষ্যও তখন প্রীতির হিল্লোলে ক্ষণকালের তরে ভাসিতে পারে। তাদৃশ যত্নসিদ্ধ প্রীতির আর গৌরব কিসে ? সেই প্রীতিই প্রীতি, যাহা আপনার বলে আপনি জীবিত রহে;—সেই প্রীতিই প্রীতি, যাহা কালের তরঙ্গাঘাতে এবংঅবস্থার ঘূর্ণপাকে আহত ও প্রত্যাহত হইয়াও সম্পূর্ণরূপে অটল থাকে; সেই প্রীতিই প্রীতি,যাহা চক্ষুর প্রলোভন এবংচিরপ্রিয় প্ররোচনায় বঞ্চিত রহিয়াও আশা ও নৈরাশ্যে,আলোকে ও অন্ধকারে হৃদয়পুরলের ধ্যান করে। ইহারই নাম প্রণয়ের তপস্যা। এবং প্রীতির যদি কিছু পরীক্ষা থাকে,সেই পরীক্ষা বিরহের এই সুদীর্ঘ তপস্যায়।

এই সংসারে কে না প্রণয়ের খেলা খেলে ? এবং কে না প্রণয়ের খেলা খেখেলিয়া আত্মবিড়ম্বনা, এবং মনুষ্যের অবমাননা করে ? মুহূর্ত্ত পরে যাহাকে ভুলিয়া যায়, মনুষ্য তাহাকে প্রাণাধিক বলে। নয়নপথের অন্তরালে গেলেই যে একবারে হৃদয়েরও অদৃশ্য হইয়া পড়ে, মনুষ্য তাহাকে অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করে। যাহাকে হর্ষ ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ, কোন সময়েই মনে পড়েনা, এবং অতি দীর্ঘ বিরহেও যাহার জন্য মন পোড়ে না,—মনুষ্য যাহাকে ছাড়িয়া আনন্দ ও নিরানন্দ উভয়ই ভোগ করিতে পারে,—এবং যাহার অদর্শন ও অভাবে আপনাকে কোন অংশে অঙ্গহীন জ্ঞান না করিয়া জীবনের সমস্ত ব্যাপারেই নিবিষ্ট রহিতে সমর্থ হয়,—কি ঘৃণা কি লজ্জার কথা, মনুষ্য তাদৃশ দূরস্থ জনকেও নিকটে পাইলে প্রিয়সম্ভাষণের মধু বিলাইয়া পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। প্রীতির পরমারাধ্য পবিত্রতা লইয়া এইরূপ লৌকিক খেলা খেলিতে আমার সাহস হয়না,—এবং মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের এইরূপ ছলনার খেলা দেখিতেও আমার আর প্রাণে সহেনা। প্রীতির নাম অমৃত। যুগান্তব্যাপি তপস্যা বিনা এ অমৃতে মনুষ্যের অধিকার হয়না ;—প্রীতি অবনীতে সাক্ষাৎ স্বর্গ;

মনুষ্য বহুদিনের সাধনায় আপনার আত্মাকে নরকস্পর্শ হইতে প্রক্ষালিত করিতে না পারিলে, এই স্বর্গে প্রবেশ-পথ পায়না। যদি হৃদয়ে প্রকৃত প্রীতিই পরিস্ফুট হইল, তাহা হইলে আর বিরহ কি? এবং বিরহে দুর্ভাবনা কি? এই নিখিল জগৎ নৈশনিস্তব্ধতায় অভিভূত হইয়া নিদ্রার ক্রোড়ে অচেতন রহে, বিরহিণী প্রীতি তখন তপস্বিনীর ন্যায় জাগ্রত রহিয়া, সুখও নয়, দুঃখও নয়, সুখদুঃখের মিশ্রণও নয়, মনের সেই যে এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা, প্রিয়-চিন্তার আবেশে তাহাতে ডুবিয়া পড়ে। আত্মার গাম্ভীর্য্য এবং প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য তখন এক হইয়া যায়। প্রকৃতির যে সকল প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য অন্য সময়ে চক্ষে পড়ে না, প্রেমালোক-প্রদীপ্ত মনুষ্যচক্ষু যামিনীর তিমিররাশি ভেদ করিয়া তাহা তখন দেখিতে পায়। শ্রুতি যে সকল অপার্থিব ধ্বনি কখনও শুনিতে পায় না, দূরশ্রুত সঙ্গীতের ন্যায় তাহা তখন শ্রুতিপথে প্রবেশ করে,—এবং মধ্যে যত কেন ব্যবধান থাকুক না হৃদয় তখন হৃদয়ের সহিত আলাপ করিয়া, যিনি সকল হৃদয়ের শেষগতি এবং প্রীতির আদি প্রস্রবণ, তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে লীন হয়।

কবিতা পুস্তক *

আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। ইহাতে যে কয়টি কবিতা বিনিবেশিত হইয়াছে, বঙ্গদর্শন ও ভ্রমরের পাঠকবর্গ অবশ্যই তাহা পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এই কবিতাগুলিকে বঙ্কিম বাবুর বলিয়া জানিতেন না। এইক্ষণ তাহা জানিতে পাইয়া, পাঠসময়ে নূতন আনন্দ লাভ করিবেন।

যদি চিত্রনৈপুণ্য অথবা কল্পনার বৈচিত্র্যই কবিত্বশক্তির প্রধান পরিচয় হয়, তাহা হইলে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের একজন প্রধান কবি। তাঁহার আয়েষা, তাঁহার সূর্য্যমুখী, তাঁহার মৃণালিনী, তাঁহার তিলোত্তমা, দময়ন্তী শকুন্তলার প্রণয়-সখী হইবার যোগ্য। এসকল দেবদুর্লভ, দেবজনস্পৃহনীয় পবিত্রপুষ্প যাঁহার মানসকুঞ্জে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তিনি কবিসমাজে আদরের আসন পাইতে অধিকারী। তাঁহার অপরাপর উপাদেয় কারুকার্য্যের মধ্যে শৈবলিনীর প্রভাপরায় পার্থিব উপকরণে গঠিত হইয়াও এমনই এক অপার্থিব সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত রহিয়াছে যে,

* শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কাঁটালপাড়া, বঙ্গদর্শনযন্ত্রালয়ে রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যতকাল ইচ্ছা নিরীক্ষণ কর, চক্ষু কখনও ফিরিতে চাহিবে না। আমরা যখন প্রতাপের প্রতি স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করি,—প্রতাপের গভীরা প্রীতি, গভীরতর মহত্বের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হই, তখন প্রতাপচরিত্র-স্রষ্টাকে শুধু প্রশংসা করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। আমরা তখন ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় তাঁহার নিকট অবনত হই, এবং কাব্যশাস্ত্রই যে প্রকৃত ধর্মশাস্ত্র, তাহা অনুভব করিয়া কবিকে হৃদয়ের সহিত সাধুবাদ দেই। ফলতঃ বঙ্কিম বাবুর তুলিপাতশক্তি অসামান্যা। যাঁহার হৃদয় নাই, এবং হৃদয়ে প্রীতির আবেগ এবং কল্পনার প্রবাহ নাই, তিনি এইরূপ সৃষ্টি নৈপুণ্যও এইরূপ চিত্রনৈপুণ্য দেখাইতে পারেন না।

কিন্তু বঙ্গীয়পাঠকসমাজে এসকল গুণে কবিত্বের পরীক্ষা হয় না। এদেশে কবিত্বের পরীক্ষা কর্ণে। বাঙ্গালির কবি ঠুংরী তালের তরলতরঙ্গ তুলিয়া আপনি নাচিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে নাচাইবে;—নহিলে সে কবি নহে। বাঙ্গালির কবি কথায় কথায় ছড়া কাটিবে, কথার ছটায় বাহবা দেওয়াইবে, এবং অকথায়ও কথা সৃষ্টি করিবে;—নহিলে সে কবি নহে। সংক্ষেপতঃ বাঙ্গালির কবি কেবলই গীত গাইবে, সে গীতে ভ্রমরগুঞ্জনের অনুকরণ না হইয়া ভেকধ্বনির অনুকরণ হউক, তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন গাইতে হইবে। যদি গ্রন্থসমালোচনা কিংবা রাজনীতির কথা লইয়া আলোচনা করিতে হয়, তাহাও ভট্টাচার্য্য কিংবা ভূতপূর্ব্ব প্রভাকরের রীতিতে ছন্দোময়ী গীতিকবিতায় লিখিত হওয়া চাই। এই জন্যই বঙ্গে অত্যুৎকৃষ্ট গদ্যকাব্যও অকাব্য বলিয়া উপেক্ষিত, এবং এই জন্যই বঙ্গে যারপর নাই জঘন্য, ও অস্পৃশ্য পদ্য প্রবন্ধ কাব্য বলিয়া আদৃত।

বঙ্কিম বাবুর সমস্ত লেখাই পদ্যে। সুতরাং বঙ্গদেশের সাহিত্যানুরাগী রসিক সম্প্রদায়ের নিকট তিনি উপন্যাসরচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং আসমানী ও হীরা, এবং অলবলা ও বিদ্যাদিগগজের স্তুতিগায়ক বলিয়া সমাদৃত থাকিলেও সুকবি বলিয়া এতদিন পরিচিত ছিলেন না। তাঁহার এই কবিতা-পুস্তক সেই অভাব পূরণ করিবে। বিংশতি বৎসরের প্রগাঢ় চিন্তাশ্রমে যে ফল ফলে নাই, এতদিনের পর সেই ফল ফলিবে। যাঁহারা স্কট ও লিটনের কল্পনার সহিত বাঙ্গালির কল্পনার তুলনা করিতে পারেন, সেই অল্পসংখ্যক অসামাজিক ব্যক্তিরাই এত দিন তাঁহাকে সুকবি বলিয়া সম্মান করিতেন, এইক্ষণ আপামর সাধারণ সকল শ্রেণির পাঠকই তাঁহার নাচনী ছন্দের কবিতা পড়িয়া তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে ও নির্ভীকচিত্তে কবি বলিবে। বঙ্কিম বাবু মনস্বিতার উচ্চশৈলে সমাসীন রহিয়াও বাঙ্গালি ভুলাইবার মোহমন্ত্রে কিরূপ সিদ্ধবিদ্যা লাভ করিয়াছেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত

পংক্তি নিচয় পাঠ করিলেই পাঠকগণ হৃদয়াঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

" এই মধুমাসে, মধুর বাতাসে,
শোন লো মধুর বাঁশী।
এই মধুবনে, শ্রীমধুসূদনে,
দেখ লো সকলে আসি॥)
মধুর সে গায়, মধুর বাজায়,
মধুর মধুর ভাসে।
মধুর আদরে, মধুর অধরে,
মধুর মধুর হাসে॥
মধুর শ্যামল, বদন কমল
মধুর চাহনি তায়।
কণক নূপুর, মধুকর যেন,
মধুর বাজিছে পায়॥
মধুর ইঙ্গিতে, আমার সঙ্কেতে,
কহিল মধুর বাণী।
সে অবধি চিতে, মাধুরি হেরিতে,
ধৈরয নাহিক মানি॥
এসুখ রঙ্গেতে, পর লো অঙ্গেতে,
মধুর চিকণ বাস।
তুলি মধুফুল পর কানে দুল,
পুরাও মনের আশ॥
গাঁথি মধুমালা, পর গোপবালা,
হাসলো মধুর হাসি।
চল যথা বাজে, যমুনার কুলে,
শ্যামের মোহন বাঁশী॥

২

চল যথা বাজে, যমুনারকুলে,
ধীরে ধীরে ধীরে বাঁশী।
ধীরে ধীরে যথা, উঠিছে চাঁদনি,
স্থল জল পরকাশি॥
ধীরে ধীরে যাই, চল ধীরে যাই,
ধীরে ধীরে ফেল পদ।
ধীরে ধীরে শুন, নাদিছে যমুনা,
কল কল গদ গদ॥
ধীরে ধীরে জলে, রাজহংস চলে,
ধীরে ধীরে ভাসে ফুল।
ধীরে ধীরে বায়ু, বহিছে কাননে,
দোলায়ে আমার দুল॥
ধীরে যাবি তথা, ধীরে কবি কথা,
রাখিবি দোহার মান।
ধীরে ধীরে তার, বাঁশিটী কাড়িবি,
ধীরেতে পুরিবি তান॥
ধীরে শ্যাম নাম, বাঁশিতে বলিবি,
শুনিব কেমন বাজে।
ধীরে ধীরে চূড়া, কাড়িয়ে পরিবি,
দেখিব কেমন সাজে॥
ধীরে বনমালা, গলাতে দোলাবি,
দেখিব কেমন দোলে।
ধীরে ধীরে তার, মন করি চুরি,
লইয়া আসিবি চলে॥

যে দেশে জয়দেবের জন্ম, বিদ্যাপতির বিচিত্র বিলাস, এবং সর্ব্বত্রই ব্রজবিলাসী শ্যামধনের বংশীধ্বনি, সেই দেশ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কোথাও এইরূপ ললিত কবিতা লিখিত হইতে পারে না, এবং সেই দেশের প্রেমালস অধিবাসী ভিন্ন অন্য কেহই এইরূপ কবিতার প্রকৃত রস পান করিতে সমর্থ হয় না। আমরা মৃণালিনী ও গিরিজায়ার কল-কণ্ঠ নিঃসৃত

সুকোমল সংগীত শ্রবণ করিয়া বহুদিন হইল এইরূপ অনুমান করিয়াছিলাম যে, বঙ্কিম বাবু ইচ্ছা করিলেই একজন উৎকৃষ্ট গীতি-কবি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। এই কবিতাপুস্তকের প্রত্যেক কবিতাই এইক্ষণ আমাদিগের সেই অনুমানকে সমর্থন করিতেছে। ললিত পদবিন্যাস, সুললিত ছন্দোবন্ধ, প্রাঞ্জল ভাষা এবং রসের মৃদুললহরী এই কয়টিই সাধারণতঃ গীতিকবিতার প্রধান গুন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, অন্ততঃ বঙ্গদেশের গীতি-কবিতা এই সাধারণ গুণেই প্রণয়ব্যবসায়িদিগের মধ্যে সুপরিচিত। আমরা বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পড়িয়া দেখিলাম, বঙ্কিম বাবুর কবিতানিচয়ে এ সকল গুণের কিঞ্চিন্মাত্রও অভাব নাই। তাঁহার ভাষা কখনও মুগ্ধার ন্যায় মধুরহাস্যে চিত্ত বিনোদন করে, কখনও প্রগল্ভার বঙ্কিমকটাক্ষে চিত্তবিদারণ করে;—কখনও ভাবের আবেশে আপনা হইতে ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে, কখনও মৃদুসমীর-সঞ্চালিত তরঙ্গিণীর ন্যায় নাচিয়া নাচিয়া এবং খেলিয়া খেলিয়া যুগপৎ নয়ন মন মোহন করে। অভাবের মধ্যে এই দেখিলাম, ইহাতে উদ্দীপনা নাই, কিন্তু আবেশ আর উদ্দীপনা একত্র থাকিতে পারে কি না, তাহাও সন্দেহের কথা।

সংক্ষিপ্ত সমালোন।

১। "প্রবন্ধমালা। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।" এই পুস্তকে অন্ধদিগের শিক্ষা ও জীবনোপায়, প্রতাপ সিংহ, রামায়ণের সাধারণ ধর্ম্ম ও নীতি, সংযুক্তা এবং গুরুগোবিন্দ সিংহ এই পাঁচটি প্রবন্ধ বিনিবেশিত হইয়াছে, এবং এই পাঁচটি প্রবন্ধই আমাদিগের বিবেচনায় ছাত্রশিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইহার বাঙ্গালা যেমন বিশুদ্ধ, তেমনই প্রাঞ্জল। এই গ্রন্থখানি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক মধ্যে পরিগৃহীত হইলে, গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই উপকার দর্শিবে।

২। "পাঠমঞ্জরী। নীতিপূর্ণ পদ্যগদ্যময় সরল পাঠ।" এখানিও রজনী বাবুর দ্বারা প্রণীত হইয়াছে, এবং তিনি যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছেন, রচনার প্রাঞ্জলতা এবং বিষয়ের সারগর্ভতা এই উভয় গুণেই সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ইহা চলনসহ পুস্তক অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্টতর।

জীবনপ্রভাত



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাজা জয়সিংহ।

"নরকুলোত্তম তুমি———————
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে!"
মধুসূদন দত্ত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আরংজীব শায়েস্তাখাঁ ও যশোবন্ত সিংহ উভয়কেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, ও নিজ পুত্র সুলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন, ও তাঁহার সহায়তার জন্য যশোবন্তকে পুনরায় প্রেরণ করেন। তাঁহারাও বিশেষ ফললাভ করিতে না পারায়, সম্রাট্ অবশেষে তাঁহাদের স্থানান্তরিত করিয়া অম্বরাধিপতি প্রসিদ্ধনামা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার সহিত দিলাওয়র খাঁ নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতিকে দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দের চৈত্রমাসের শেষযোগে জয়সিংহ পুনায় উপস্থিত হইলেন। শায়েস্তাখাঁর ন্যায় নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া না থাকিয়া, তিনি দিলাওয়রখাঁকে পুরন্দর দুর্গ আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন, ও স্বয়ং সিংহগড় বেষ্টন করিয়া রাজগড় পর্য্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

শিবজী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ, বিশেষ জয়সিংহের নাম, সৈন্যসংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও পরাক্রম তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল না। সেরূপ পরাক্রান্ত সেনাপতি বোধ হয় সম্রাট্ আরংজীবের আর কেহই ছিলেন না,—তাৎকালিক ফরাসী ভ্রমণকারী বর্ণীয়র লিখিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয় সমগ্র ভারতবর্ষে জয়সিংহের ন্যায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী লোক আর একজনও ছিলেন না। শিবজী প্রথম হইতেই ভগ্নোদ্যম হইলেন, ও বার বার জয়সিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ চতুর শিবজীকে জানিতেন, এ সমস্ত প্রস্তাব বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে শিবজীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী দূতবেশে জয়সিংহের নিকট আসিলেন, ও রাজাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত চতুরতা করিতেছেন না, তিনিও ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রোচিত সম্মান তিনি জানেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের এই সত্যবাক্য রাজা জয়সিংহ বিশ্বাস করিলেন, তখন ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ

করিয়া বলিলেন "দ্বিজবর! আপনার বাক্যে আমি আশ্বস্ত হইলাম; রাজা শিবজীকে জানাইবেন যে দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, পরন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, সে জন্য আমি বাক্যদান করিতেছি। আপনার প্রভুকে বলিবেন, আমি রাজপুত, রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না।" রঘুনাথ এই আশ্বাসবাক্য শিবজীর নিকট লইয়া গেলেন।

ইহার কএক দিন পর বর্ষাকালে রাজা জয়সিংহ আপন শিবিরে সভার মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন, একজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল—

"মহারাজের জয় হউক! রাজা শিবজী স্বয়ং বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন।"

সভাসদ্ সকলে বিস্মিত হইলেন, রাজা জয়সিংহ স্বয়ং শিবজীকে আহ্বান করিতে শিবিরের বাহিরে যাইলেন। বহু সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া শিবিরাভ্যন্তরে আনিলেন, ও রাজগদিতে আপনার দক্ষিণ দিকে বসাইলেন।

শিবজীও এইরূপ সমাদর পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইলেন। রাজা জয়সিংহ ক্ষণেক মিষ্টালাপ করিয়া অবশেষে বলিলেন, "রাজন্, আপনি আমার শিবিরে আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এই শিবির আপনার গৃহের ন্যায় বিবেচনা করিবেন।"

শিব। "রাজন্, এ দাস কবে আপনার আজ্ঞাপালনে বিমুখ? রঘুনাথ পন্ত দ্বারা আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দাস উপস্থিত হইয়াছে। আপনার মহৎ আচরণে আমিই সম্মানিত হইয়াছি।"

জয়। "হাঁ, রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রীকে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা স্মরণ আছে। রাজন্, আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা করিব, দিল্লীশ্বর আপনার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, এ বিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, এ সমস্ত করিব, রাজপুতের কথা অন্যথা হয় না।"

এইরূপে ক্ষণেক কথোপকথনের পর সভাভঙ্গ হইল; শিবিরে শিবজী ও জয়সিংহ ভিন্ন আর কেহই রহিলেন না; তখন শিবজী কপটানন্দ-চিহ্ন ত্যাগ করিলেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। জয়সিংহ দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে জল।

বলিলেন—"রাজন্! আপনি যদি আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষুণ্ন হইয়া থাকেন, সে খেদ নিষ্প্রয়োজন! আপনি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন, রাজপুত বিশ্বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। অদ্যই রজনীতে আমার অশ্বশালা

হইতে অশ্ব বাছিয়া লউন, পুনরায় প্রস্থান করুন, আপনি নিরাপদে আসিয়াছেন, নিরাপদে যাইবেন, আমার আদেশে কোনও রাজপুত আপনার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি ভাল, না পারি ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কদাচ বিস্মরণ করিব না।”

রাজা জয়সিংহের এতদূর মাহাত্ম্য দেখিয়া শিবজী বিস্মিত হইলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন—

“মহারাজ! ভবাদৃশ লোকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি তাহাতে খেদ নাই। বাল্যকাল অবধি যে হিন্দু-ধর্ম্মের জন্য, যে হিন্দুগৌরবের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সে মহদুদ্যম, সে উন্নত উদ্দেশ্য, অদ্য এককালে বিনষ্ট হইল, সে চিন্তায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্তু সে বিষয়েও মন স্থির করিয়াই আপনার শিবিরে আসিয়াছিলাম, সে জন্যও এখন খেদ করিতেছি না।”

জয়। “তবে কি জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন?”

শিব। বাল্যকাল হইতে আপনাদের গৌরব-গীত গাইতে ভালবাসিতাম; অদ্য দেখিলাম সে গীত মিথ্যা নহে, জগতে যদি মাহাত্ম্য, সত্য ও ধর্ম্ম থাকে তবে রাজপুত-শরীরে আছে। এরাজপুত কি যবনাধীনতা স্বীকার করিবেন? মহারাজ জয়সিংহ কি যবন আরংজীবের সেনাপতি?”

জয়। “ক্ষত্রিয়রাজ! সেটী প্রকৃত দুঃখের কারণ। কিন্তু রাজপুতেরা সহজে অধীনতা স্বীকার করেন নাই, যতদিন সাধ্য দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; বিধির নির্ব্বন্ধে পরাধীন হইয়াছেন। মেওয়ারের বীরপ্রবর প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ অসাধ্য সাধনের ও যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ততিও দিল্লীর করপ্রদ, এ সমস্ত বোধ হয় মহাশয় অবগত আছেন।”

শিব। “আছি। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাঁহাদের সহিত আপনাদিগের এতদিনের বৈরভাব, তাঁহাদের কার্য্যে আপনি এরূপ যত্নশীল কি জন্য?

জয়। “যখন দিল্লীশ্বরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্যদান করিয়াছি; যে বিষয়ে সত্যদান করিয়াছি তাহা করিব।”

শিব। “সকলের নিকট সকল সময় কি সত্য পালনীয়? যাঁহারা আমাদের দেশের শত্রু, ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী, তাঁহাদের সহিত কি সত্যসম্বন্ধ?”

জয়। “আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতের ইতিহাস পাঠ করুন, সহস্র বৎসর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন কখনও সত্য লঙ্ঘন করেন নাই। কখন জয়লাভ করিয়াছেন, অনেক সময়ে পরাস্ত হইয়াছেন, কিন্তু জয়ে পরাজয়ে, সম্পদে আপদে, সর্ব্বদা সত্যপালন করিয়াছেন। এখন আমাদের সে গৌরবের স্বাধীনতা

নাই, কিন্তু সত্যপালনের গৌরব আছে। দেশে বিদেশে, মিত্র মধ্যে, শত্রু মধ্যে, রাজপুতের নাম গৌরবান্বিত। ক্ষত্রিয়রাজ টোডর মল্ল বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, মানসিংহ কাবুল হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয়পতাকা লইয়াছিলেন, কেহ কখনও ন্যস্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, মুসলমান সম্রাটের নিকটও যাহা সত্য করিয়াছিলেন তাহা পালন করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্ররাজ! রাজপুতের কথাই সন্ধিপত্র, অনেক সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের কথা লঙ্ঘন হয় নাই।"

শিব। "মহারাজ! যশোবন্তসিংহ হিন্দুধর্ম্মের একজন প্রধান প্রহরী; তিনি মুসলমানের জন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।"

জয়। "যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, যশোবন্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রহরী, সন্দেহ নাই। তাঁহার মাড়ওয়ারদেশ মরুভূমিময়, তাঁহার মাড়ওয়ারী সেনা অপেক্ষা কঠোর জাতি ও সাহসী সেনা জগতে নাই। যদি যশোবন্ত সেই মরুভূমিতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেনার সহায়ে হিন্দুস্বাধীনতা রক্ষার,—হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার যত্ন করিতেন, আমি তাঁহাকে সাধুবাদ করিতাম। যদি জয়ী হইয়া আরংজীবকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে হিন্দুপতাকা উড্ডীন করিতেন, ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম রক্ষা করিতেন, আমি তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া সম্মান করিতাম। অথবা যদি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে বীরপ্রবর প্রতাপের ন্যায় সেই মরুভূমে প্রাণত্যাগ করিতেন, আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতাম! কিন্তু যে দিন তিনি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি হইয়াছেন, সেই দিন তিনি মুসলমানের কার্য্যসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। সে কার্য্য ভাল হউক, মন্দ হউক, ব্রত গ্রহণ করিয়া গোপনে লঙ্ঘন করা ক্ষত্রোচিত কার্য্য হয় নাই; যশোবন্ত কলঙ্কে আপন যশোরাশি ম্লান করিয়াছেন। তিনি সিপ্রানদী তীরে আরংজীবের নিকট পরাস্ত হইয়া অবধি আরংজীবের অতিশয় বিদ্বেষী,নচেৎ তিনি এ গর্হিত কার্য্য করিতেন না।"

চতুর শিবজী দেখিলেন জয়সিংহ যশোবন্ত নহেন! ক্ষণেক পরে আবার বলিলেন,—

"হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টা কি গর্হিত কার্য্য? হিন্দুকে ভ্রাতা মনে করিয়া সহায়তা করা কি গর্হিত কার্য্য?"

জয়। "আমি তাহা বলি নাই। যশোবন্ত কেন আরংজীবের কার্য্য ত্যাগ করিয়া, জগতের সাক্ষাতে, ঈশ্বরের সাক্ষাতে, আপনার সহিত যোগ দিলেন না? আপনি যেরূপ স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছেন,তিনি সেইরূপ করিলেন না কি জন্য? সম্রাটের কার্য্যে থাকিয়া গোপনে বিরুদ্ধাচরণ করা কপটাচরণ। ক্ষত্রিয়রাজ! কপটাচরণ কি ক্ষত্রোচিত কার্য্য?"

শিব। "তিনি আমার সহিত প্র-

কার্য্যে যোগ দিলে দিল্লীশ্বর অন্য সেনাপতি পাঠাইতেন, সম্ভবতঃ আমরা উভয়ে পরাস্ত ও হত হইতাম। ”

জয়। “ যুদ্ধে মরণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? ক্ষত্রিয় কি যুদ্ধে মরণ ডরে?”

শিবজীর মুখ আরক্ত হইল তিনি বলিলেন,—

“ রাজপুত! মহারাষ্ট্রীয়েরাও মৃত্যু ডরে না, যদি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিলে আমার উদ্দেশ্য সাধন হয়, হিন্দু-স্বাধীনতা, হিন্দু-গৌরব পুনঃস্থাপিত হয়, তবে ভবানীর সাক্ষাতে এই মুহূর্ত্তে এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব, অথবা রাজপুত! তুমি অব্যর্থ বর্শা ধারণ কর, এই হৃদয়ে আঘাত কর, সহাস্যবদনে প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু যে হিন্দু-গৌরবের বিষয় বাল্যকালে স্বপ্ন দেখিতাম, যাহার জন্য শত যুদ্ধ যুঝিলাম, শত শত্রুকে পরাস্ত করিলাম, এই বিংশ বৎসর পর্ব্বতে, উপত্যকায়, শিবিরে, শত্রু মধ্যে, দিবসে, সায়ংকালে, গভীর নিশীথে, চিন্তা করিয়াছি, আমি মরিলে সে হিন্দুধর্ম্মের, সে হিন্দুস্বাধীনতার, সে হিন্দু গৌরবের কি হইবে? যশোবন্ত ও আমি প্রাণ দিলে কি সে সমস্ত রক্ষা হইবে? ”

জয়সিংহ শিবজীর তেজস্বী কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, চক্ষুতে জল দেখিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—

“ সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা না হয়, সত্য লঙ্ঘনে হইবে? বীরের শোণিতে যদি স্বাধীনতাবীজ অঙ্কুরিত না হয়, তবে বীরের চাতুরীতে হইবে?”

শিবজী পরাস্ত হইলেন। অনেকক্ষণ পর পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন—“ মহারাজ! আমি আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করি, আপনার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা আমি কখনও দেখি নাই, আমি আপনার পুত্রতুল্য। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি পিতৃতুল্য সৎপরামর্শ দিন। আমি বাল্যকালে যখন কঙ্কণপ্রদেশের অসংখ্য পর্ব্বত ও উপত্যকায় ভ্রমণ করিতাম, আমার হৃদয়ে নানারূপ চিন্তা আসিত, স্বপ্ন উদয় হইত। ভাবিতাম যেন সাক্ষাৎ ভবানী আমাকে স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য আদেশ করিতেছেন, যেন দেবালয়সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে ব্রাহ্মণদিগের সম্মান বৃদ্ধি করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে, ধর্ম্মবিরোধী মুসলমানদিগকে দূর করিতে দেবী সাক্ষাৎ উত্তেজনা করিতেছেন। আমি বালক ছিলাম, সেই স্বপ্নে ভুলিলাম, সদর্পে খড়্গ গ্রহণ করিলাম, বীরশ্রেষ্ঠদিগকে জড় করিলাম, দুর্গ অধিকার করিতে লাগিলাম। যৌবনেও সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি,—হিন্দু নামের গৌরব, হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য, হিন্দু স্বাধীনতা সংস্থাপন! সেই স্বপ্নবলে দেশ জয় করিয়াছি, শত্রু জয় করিয়াছি, রাজ্য

বিস্তার করিয়াছি, দেবালয় স্থাপন করিয়াছি। ক্ষত্রিয়রাজ! আমার এ উদ্দেশ্য কি মন্দ? এ স্বপ্ন কি অলীক স্বপ্ন মাত্র? আপনি পুত্রকে উপদেশ দিন।”

বহুদূরদর্শী, ধর্ম্মপরায়ণ, রাজা জয়সিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; পরে গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন “রাজন্! আপনার উদ্দেশ্য অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আমি জানি না, আপনার স্বপ্ন অপেক্ষা প্রকৃত আর কিছুই আমি জানি না। শিবজী! তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমার নিকট অবিদিত নাই, আমি শত্রুর নিকট, মিত্রের নিকট, তোমার উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়াছি, পুত্র রাম সিংহকে তোমার উদাহরণ দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছি, রাজপুত স্বাধীনতার গৌরব এখনও বিস্মৃত হয় নাই। আর শিবজী! তোমার স্বপ্নও স্বপ্ন নহে; চারিদিকে যত দেখি, মনে মনে যত চিন্তা করি, বোধ হয় মোগলরাজ্য আর থাকে না,—যত্ন, চেষ্টা সকলই বিফল! মুসলমান-রাজ্য কলঙ্করাশিতে পূর্ণ হইয়াছে, বিলাসপ্রিয়তায় জর্জ্জরিত হইয়াছে, পতনোন্মুখ গৃহের ন্যায় আর দাঁড়াইতে পারে না। শীঘ্র কি বিলম্বে, এই প্রাসাদতুল্য মোগলরাজ্য বোধ হয় ধূলিসাৎ হইবে, তাহার পর পুনরায় হিন্দুর প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রীয় জীবন অঙ্কুরিত হইতেছে, মহারাষ্ট্রীয় যৌবনতেজে বোধ হয় ভারতবর্ষ প্লাবিত হইবে। শিবজী! তোমার স্বপ্ন স্বপ্ন নহে, ভবানী তোমাকে মিথ্যা উত্তেজনা করেন নাই!”

উৎসাহে, আনন্দে, শিবজীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

“তবে ভবাদৃশ মহাত্মা সেই পতনোন্মুখ মোগল প্রাসাদের একমাত্র স্তম্ভ স্বরূপ রহিয়াছেন কি জন্য?”

জয়। “সত্যপালন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, যাহা সত্য করিয়াছি তাহা পালন করিব। কিন্তু অসাধ্য সাধন হয় না, পতনোন্মুখ গৃহ পতিত হইবে।”

শিব। “ভাল, সত্য পালন করুন, কপটাচারী আরংজীবের নিকট ও আপনার ধর্ম্মাচরণ দেখিয়া দেবতারাও বিস্মিত হইয়া আপনার সাধুবাদ করিবেন। কিন্তু আমি আরংজীবের নিকট কখনও সত্য করি নাই, আমি যদি চাতুরী দ্বারাও স্বধর্ম্মের উন্নতি সাধনের প্রয়াস পাইয়া থাকি, আরংজীবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকি, তবে সে চাতুরী কি নিন্দনীয়?”

জয়। “ক্ষত্রিয়রাজ! চাতুরী যোদ্ধার পক্ষে সকল সময়ে নিন্দনীয়, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে চাতুরী অধিকতর নিন্দনীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৌরব-বৃদ্ধি অনিবার্য্য, বোধ হয় তাঁহাদের বাহুবল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, বোধ হয় তাঁহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু শিবজী! অদ্য যে শিক্ষা আপনি দিতেছেন, সে শিক্ষা কদাচ ভুলিবে না। আ-

মার কথায় দোষ গ্রহণ করিবেন না, অদ্য আপনি নগর লুণ্ঠন করিতে শিখাইতেছেন, কল্য তাহারা ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবে, অদ্য আপনি চতুরতা দ্বারা জয় লাভ করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহারা সম্মুখযুদ্ধ কখনই শিখিবে না। যে জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বাল্যগুরু, গুরুর ন্যায় ধর্ম্ম শিক্ষা দিন। অদ্য আপনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সম্মুখ-রণশিক্ষা দিন, চতুরতা বিস্মৃত হইতে বলুন আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য আমি শত শতবার ধন্যবাদ করিয়াছি, আপনি এই উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে? মহারাষ্ট্রের শিক্ষাগুরু! সাবধান! আপনার প্রত্যেক কার্য্যের ফল বহুকালব্যাপী,—বহুদেশব্যাপী হইবে! মন্দ শিক্ষা দিলে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দেশে দেশে সেই শিক্ষার ফল দৃষ্ট হইবে। বৃদ্ধ বহুদর্শী রাজপুতের কথা গ্রহণ করুন।”

এই মহৎ বাক্য শুনিয়া শিবজী ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন,—

“আপনি গুরুর গুরু! আপনার উপদেশগুলি শিরোধার্য্য! কিন্তু অদ্য আমি আরংজীবের অধীনতা স্বীকার করিলাম, শিক্ষা কবে দিব?”

জয়। “জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই। অদ্য আমার জয় হইল, কল্য তোমার জয় হইতে পারে; অদ্য তুমি আরংজীবের অধীন হইলে, ঘটনাক্রমে কল্য স্বাধীন হইতে পার।”

শিব। “জগদীশ্বর তাহাই করুন, কিন্তু আপনি আরংজীবের সেনাপতি থাকিতে আমার স্বাধীন হওয়ার আশা বৃথা। এবং ভবানী হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।”

জয়সিংহ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—“শরীর ক্ষণভঙ্গুর, এ বৃদ্ধ শরীর কত দিন থাকিবে?—কিন্তু যতদিন থাকিবে সত্যপালনে বিরত হইবে না।”

শিব। “আপনি দীর্ঘজীবী হউন।”

জয়। “শিবজী! এক্ষণে বিদায় দিন;—আমি আরংজীবের পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে আরংজীবের অধীনে কার্য্য করিতেছি, যতদিন জীবিত থাকিব দিল্লীর এ বৃদ্ধ সেনা বিদ্রোহাচরণ করিবে না;—কিন্তু ক্ষত্রিয়প্রবর! নিশ্চিন্ত থাক, মহারাষ্ট্রের গৌরব, হিন্দুর প্রাধান্য অনিবার্য্য! বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য কর, বহুদর্শিতার কথা গ্রাহ্য কর, মোগলরাজ্য আর থাকে না, হিন্দুতেজ আর নিবারিত হয় না, তখন দেশে দেশে হিন্দুর গৌরব নাম, তোমার গৌরব নাম, প্রতিধ্বনিত হইবে।”

শিবজী অশ্রুপূর্ণ লোচনে জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন “ধর্ম্মাত্মন্! আপনার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, আপনার কথাই যেন সার্থক হয়! আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না, আমি আত্মস-

মর্পণ করিয়াছি ; কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে পুনরায় স্বাধীন হইতে পারি, তবে ক্ষত্রিয়প্রবর ! আর একদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, আর একদিন পিতার চরণোপান্তে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব।”



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গবিজয়।



“ চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ
উথলিল,সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বিবায়ুসহনির্ঘোষে।”
মধুসূদন দত্ত।

শীঘ্রই সন্ধিস্থাপন হইল। শিবজী মোগলদিগের নিকট হইতে যে যে দুর্গ জয় করিয়াছিলেন তাহা ফিরাইয়া দিলেন, বিলুপ্ত আহম্মদনগর রাজ্যের মধ্যে যে দ্বাত্রিংশৎ দুর্গ অধিকার বা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও ২০টী ফিরাইয়া দিলেন, অবশিষ্ট দ্বাদশটীমাত্র আবংজীবের অধীনে জায়গীর স্বরূপ রাখিলেন। যে প্রদেশ তিনি সম্রাটকে দিলেন তাহার বিনিময়ে বিজয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ কতক প্রদেশ সম্রাট শিবজীকে দান করিলেন, ও শিবজীর অষ্টমবর্ষীয় বালক শম্ভুজী পাঁচ হাজারীর মনসবদারপদ প্রাপ্ত হইলেন।

শিবজীর সহিত যুদ্ধ সমাপ্তির পর রাজা জয়সিংহ বিজয়পুরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া সেই প্রদেশ দিল্লীশ্বরের অধীনে আনিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। শিবজীর পিতা বিজয়পুরের সহিত শিবজীর যে সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন, শিবজী তাহা লঙ্ঘন করেন নাই, কিন্তু শিবজীর বিপদকালে বিজয়পুরের সুলতান সন্ধি বিস্মরণ হইয়া শিবজীর রাজ্য আক্রমণ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। সুতরাং শিবজী এক্ষণে জয়সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিজয়পুরের সুলতান আলী আদিলশায়ের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, এবং আপন মাউলী সৈন্যদ্বারা বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন।

জয়সিংহের সহিত শিবজীর সদ্ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ও পরস্পরের মধ্যে অতিশয় স্নেহ জন্মাইল। উভয়ে সর্ব্বদাই একত্র থাকিতেন, ও যুদ্ধে পরস্পরের সহায়তা করিতেন। বলা বাহুল্য, যে শিবজীর একজন তরুণ হাবেলদার সর্ব্বদাই জয়সিংহের একজন পুরোহিতের সদনে যাইতেন। নাম বলিবার কি আবশ্যক আছে ?

সরলস্বভাব পুরোহিত জনার্দ্দনও ক্রমে রঘুনাথকে পুত্রবৎ দেখিতে লাগিলেন, সর্ব্বদাই গৃহে আহ্বান করিতেন ; রঘুনাথও যখন পারিতেন পুরোহিতের আবাসস্থান আপন আবাসস্থান করিতেন। এরূপ অবস্থায় রঘুনাথ ও সরযূর সর্ব্বদাই দেখা হইত, সর্ব্বদাই কথা হইত, উভয়ের জীবন, মন, প্রাণ প্রথম প্রণয়ের অনির্ব্বচনীয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত হইতে লা-

গিল। জগতে রঘুনাথ ও সরযূ অপেক্ষা কে সুখী? সরলচিত্ত জনার্দ্দন তাহাদিগের হৃদয়ের ভাব কিছুই বুঝিতেন না, কখন কখন তাহাদিগকে একত্র দেখিতেন বা কথা কহিতে দেখিতেন, কিন্তু রঘুনাথ "বাড়ীর ছেলে", নিষেধ করিতেন না। রঘুনাথও জনার্দ্দনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

কএক মাসের মধ্যে বিজয়পুর অধীনস্থ অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া শিবজী অবশেষে একটি অতিশয় দুর্গম পর্ব্বতদুর্গ লইবার মানস করিলেন। তিনি কবে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করিবেন, পূর্ব্বে শত্রুকে তাহার সংবাদ দিতেন না, নিজের সৈন্যেরাও পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতে পারিত না। দিবাভাগে সেই দুর্গ হইতে ৫। ৬ ক্রোশ দূরে জয়সিংহের শিবিরের নিকটই তাঁহার শিবির ছিল, সায়ংকালে এক সহস্র মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন, এক প্রহর রজনীর সময়, গভীর অন্ধকারে প্রকাশ করিলেন যে রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণ করিবেন। নিঃশব্দে সেই এক সহস্র সেনাসমেত দুর্গাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দে দুর্গতলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সমভূমি, তাহার মধ্যে একটি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর রুদ্রমণ্ডলদুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতে উঠিবার একমাত্র পথ আছে, এক্ষণে যুদ্ধকালে সেই পথ রুদ্ধ হইয়াছে; অন্যান্য দিকে উঠা অতিশয় কষ্টসাধ্য, পথ নাই, কেবল জঙ্গল ও শিলারাশি পরিপূর্ণ। শিবজী সেই কঠোর দুর্গম স্থান দিয়া সেনাগণকে পর্ব্বত আরোহণ করিবার আদেশ দিলেন; তাঁহার মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন পর্ব্বত-বিড়ালের ন্যায় সেই বৃক্ষ ধরিয়া, শৈল হইতে শৈলান্তরে লম্ফ দিতে দিতে পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন স্থানে বসিয়া, কোথাও বৃক্ষের ডাল ধরিয়া লম্বমান হইয়া, কোথাও বা লম্ফ দিয়া, সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাষ্ট্রীয় সেনা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সৈন্য এরূপ পর্ব্বত আরোহণে সমর্থ কি না সন্দেহ। সহস্র সেনা এই রূপে পর্ব্বত আরোহণ করিতেছে, কিন্তু শব্দমাত্র নাই, নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর নিশীথে কেবল নৈশবায়ু এক একবার সেই পর্ব্বতবৃক্ষের মধ্য দিয়া মর্ম্মর শব্দে বহিয়া যাইতেছে।

অর্দ্ধেক পথ উঠিলে পর শিবজী সহসা দেখিলেন, উপরে দুর্গপ্রাচীরের উপর একটি উজ্জ্বল আলোক। চিন্তাকুল হইয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন; শত্রুরা কি তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছেন? নচেৎ প্রাচীরের উপর এরূপ আলোক কেন? আলোকের কিরণ দুর্গের নীচে পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছে, যেন দুর্গবাসিগণ শত্রুপ্রতীক্ষা করিয়াই এই আলোক জ্বালিয়াছে যে অন্ধকারে আবৃত

হইয়া কেহ দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারে। ক্ষণকাল চিন্তাকুল হইয়া সেই আলোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে নিজ সৈন্যগণকে আরও সতর্কভাবে বৃক্ষ ও শৈলরাশির অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। নিঃশব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল, যেখানে বড় বৃক্ষ, যেখানে ঝোপ, যেখানে শৈলরাশি, সেই সেই স্থান দিয়া বুকে হাঁটিয়া উঠিতে লাগিল, শব্দমাত্র নাই, অন্ধকারে নিঃশব্দে শিবজী সেই পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পর একটী পরিষ্কার স্থানের নিকট আসিয়া পড়িলেন, উপর হইতে আলোক তথায় স্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে, সে স্থান দিয়া সৈন্য যাইলে, উপর হইতে দেখা যাওয়ার অতিশয় সম্ভাবনা। শিবজী পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন; বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া এদিকে ওদিকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে দেখিলেন প্রায় ১০০ হস্ত পরিমাণ স্থানে বৃক্ষমাত্র নাই, পরে পুনরায় বৃক্ষশ্রেণী রহিয়াছে। এই ১০০ হস্ত কিরূপে যাওয়া যায়? পার্শ্বে দেখিলেন, যাইবার কোন উপায় নাই, নীচে দেখিলেন, অনেক দূর আসিয়াছেন, পুনরায় নীচে যাইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিলে দুর্গে আসিবার পূর্ব্বেই প্রাতঃকাল হইতে পারে। শিবজী ক্ষণেক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন; পরে বাল্যকালের সুহৃদ্ বিশ্বাসী মাউলী যোদ্ধা তন্নজী মালশ্রীকে ডাকাইলেন; দুইজনে সেই বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক অতি মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে তন্নজী চলিয়া যাইলেন, শিবজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমস্ত সৈন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তন্নজী ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার শরীর সিক্ত, কেশ ও সমস্ত পরিচ্ছদ হইতে জল পড়িতেছে। তিনি শিবজীর নিকট আসিয়া অতি মৃদুস্বরে কি কহিলেন; শিবজী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহাই হউক, অন্য উপায় নাই।" তিনি পুনরায় সেনাদিগকে চলিবার আদেশ দিলেন, তন্নজী অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

বৃষ্টির জল অবতরণ দ্বারা এক স্থানে প্রস্তর ক্ষয় পাইয়া প্রণালীর ন্যায় হইয়াছিল। দুই পার্শ্ব উচ্চ, মধ্য গভীর, বৃষ্টির সময় সেই গভীর স্থান জলে পরিপূরিত হইত, এখনও তাহাতে জল আছে। সেই জল ভাঙ্গিয়া বুকে হাঁটিয়া যাইলে পর দুই পার্শ্বে উচ্চ পাড় থাকায় সম্ভবতঃ শত্রুরা দেখিতে পাইবে না, এই পরামর্শ স্থির হইল ও সমস্ত সৈন্য ধীরে ধীরে সেই স্রোতের মধ্য দিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। শত সহস্র শিলাখণ্ডের উপর দিয়া নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতে অনন্তনাদে পর্ব্বতজল অবতরণ করিতেছে, সেই শিলাখণ্ডের উপর দিয়া, সেই জল

ভাঙ্গিয়া সহস্র সেনা নিঃশব্দে পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল! অচিরাৎ উপরিস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল, শিবজী মনে মনে ভবানীকে ধন্যবাদ করিলেন।

সহসা তাঁহার পার্শ্বস্থ একজন সেনা পতিত হইল, শিবজী দেখিলেন, তাহার বক্ষঃস্থলে তীর লাগিয়াছে! আর একটী তীর, আর একটী, আরও বহু সংখ্যক তীর! শত্রুগণ জাগরিত হইয়া রহিয়াছে, শিবজীর সৈন্য জলপ্রণালী দিয়া আরোহণ করিবার সময় তাহাদের সন্দেহ হওয়ায় তাহারা সেই দিকে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে।

শিবজীর সমস্ত সৈন্য বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইল, তীর নিক্ষেপ থামিয়া গেল, শিবজী বুঝিলেন শত্রুরা সন্দেহ করিয়াছে মাত্র, এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই। তিনি দুর্গের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটী আলোকের স্থলে দুই তিনটী প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে প্রহরীগণ এদিক ওদিক যাইতেছে। তখন তিনি দুর্গপ্রাচীর হইতে কেবল মাত্র ৩০০ হস্ত দূরে। বুঝিলেন সৈন্যগণ সতর্কিত হইয়াছে, ভীষণ যুদ্ধ বিনা অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবার নহে!

শিবজীর চির সহচর তন্নজী মালশ্রীও এ সমস্ত দেখিলেন; ধীরে ধীরে বলিলেন "রাজন্! এক্ষণ ও নামিয়া যাইবার সময় ;, অদ্য দুর্গ হস্তগত না হয় কল্য হইবে, কিন্তু অদ্য চেষ্টা করিলে সকলের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা আছে।" বিপদরাশির মধ্যে শিবজীর সাহস ও উৎসাহ সহস্র গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। তিনি বলিলেন "জয়সিংহের নিকট যাহা বলিয়াছি তাহা করিব, অদ্য রুদ্রমণ্ডল লইব অথবা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিব।" শিবজীর নয়নদ্বয় উজ্জ্বল, স্বর স্থির ও অকম্পিত, তন্নজী দেখিলেন অন্য পরামর্শ বৃথা, বলিলেন "বিপদের সময় প্রভু-পার্শ্ব ভিন্ন তন্নজীর অন্য স্থল নাই, অগ্রসর হউন।"

শিবজী নিস্তব্ধে সেই বৃক্ষ-শ্রেণীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুকে ভুলাইবার জন্য এক শত সৈন্যকে দুর্গের অপর পার্শ্বে যাইয়া গোল করিতে আদেশ করিলেন। এক দণ্ড কালের মধ্যে দুর্গের অপর পার্শ্বে গোল শুনা যাইল, সেই দিক হইতে শিবজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দুর্গস্থ প্রহরী ও সৈন্য সকলে সেই দিকে ধাবমান হইল। এ দিকে প্রাচীরোপরি যে দুই তিনটী আলোক জ্বলিতেছিল তাহা নিবিয়া যাইল। তখন শিবজী বলিলেন "মহারাষ্ট্রীয়গণ! শত যুদ্ধে তোমরা আপন বিক্রমের পরিচয় দিয়াছ, শিবজীর নাম রাখিয়াছ, অদ্য আর একবার সেই পরিচয় দাও! তন্নজী! বাল্যকালের সৌহৃদ্যের পরিচয় অদ্য প্রদান কর।" পরে রঘুনাথজীউকে পার্শ্বে দেখিয়া বলিলেন "হাবেলদার! এক

দিন আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছিলে, অদ্য বাঁচাও।” প্রভুবাক্যে সকলের হৃদয় সাহসে পরিপূরিত হইল, নিঃশব্দে সেই গভীর অন্ধকারে সকলে অগ্রসর হইলেন, অচিরে দুর্গপ্রাচীরের নিকট পঁহুছিলেন। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, আকাশে আলোক নাই, জগতে শব্দ নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু সেই পর্ব্বত বৃক্ষের ভিতর দিয়া মর্ম্মর শব্দে প্রবাহিত হইতেছে।

কন্দ্রমণ্ডলের প্রাচীর হইতে শিবজী পঞ্চাশৎ হস্ত দূরে আছেন, এমন সময় দেখিলেন প্রাচীরের উপর এক জন প্রহরী;—বৃক্ষের ভিতর শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহরী পুনরায় এই দিকে আসিয়াছে। একজন মাউলী নিঃশব্দে একটী তীর নিক্ষেপ করিল,—হতভাগা প্রহরীর মৃত শরীর প্রাচীরের বাহিরে পতিত হইল।

সেই শব্দ শুনিয়া আর এক জন, দুই জন, দশ জন, শত জন, ক্রমে দুই তিন শত লোক প্রাচীরের উপর ও নীচে জড় হইল; শিবজী রোষে ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিলেন, আর লুকায়িত থাকিবার উপায় দেখিলেন না, সৈন্যকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন;

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের “হর হর মহাদেও” ভীষণনাদ গগনে উত্থিত হইল, এক দল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য দৌড়াইয়া গেল, আর এক দল বৃক্ষের ভিতর থাকিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে প্রাচীরারোহী মুসলমানদিগকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। মুসলমানেরাও শত্রুর আগমনে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া “আল্লাহু আকবর” শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল, কেহ বা প্রাচীরের উপর হইতে তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা উৎসাহপরিপূর্ণ হইয়া প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া আসিয়া বৃক্ষমধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিল।

শীঘ্রই সেই প্রাচীরতলে ও বৃক্ষমধ্যে ভীষণকাণ্ড হইয়া উঠিল। প্রাচীরের উপরিস্থ মুসলমানেরা সবল বর্শাচালনে আক্রমণকারীদিগকে হত করিতে লাগিল, তাহারাও অব্যর্থ তীর সঞ্চালনে মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাশি রাশি মৃত দেহে প্রাচীর-পার্শ্ব পরিপূর্ণ হইল, যোদ্ধৃগণ সেই মৃত দেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়া খড়্গ বা বর্শা চালন করিতে লাগিল, রক্তে আক্রান্ত ও আক্রমণকারীদিগের শরীর রঞ্জিত হইয়া যাইল। শত শত মুসলমানেরা বৃক্ষের ভিতর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; শিবজীর মাউলীগণ একেবারে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, প্রবলপ্রতাপ আফগানেরাও যুদ্ধে অপটু নহে, রক্তস্রোত সেই পর্ব্বত দিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল। বৃক্ষের অন্তরালে ঝোপের ভিতর, শিলারাশির পার্শ্বে শত শত মহারাষ্ট্রীয়গণ দণ্ডায়মান হইয়া অব্যর্থ তীর ও বর্শা সঞ্চালন করিতে লাগিল, বৃক্ষপত্র ও

বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া অবারিত স্রোতে সেই তীর আক্রান্তদিগের সংখ্যা ক্ষীণতর করিতে লাগিল, আক্রমণকারী ও আক্রান্তদিগের ঘন ঘন সিংহনাদে ও আর্ত্তদিগের আর্ত্তনাদে সেই নৈশ গগন কম্পিত হইতে লাগিল।

সহসা এ সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া প্রাচীর হইতে "শিবজী কি জয়" এইরূপ বজ্রনাদ উত্থিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া, মৃতদেহরাশির উপর দাঁড়াইয়া, রক্তাপ্লুত বর্ষার উপর ভর দিয়া একজন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা এক লম্ফে রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীরের উপর উঠিয়াছেন; তথায় পাঠানদিগের পতাকা পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়াছেন, পতাকাধারী ও দুই একজন প্রহরীকে বর্ষা ও খড়্গ চালনে হত করিয়াছেন, প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সেই অপূর্ব্ব যোদ্ধা বজ্রনাদে "শিবজীকি জয়" শব্দ করিয়াছিলেন, সেই যোদ্ধা রঘুনাথজী হাবেলদার।

হিন্দু ও মুসলমান এক মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তারকালোকে সেই দীর্ঘ মুর্ত্তিরদিকে দৃষ্টি করিল। যোদ্ধার লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রান তারকালোকে চক্ মক্ করিতেছে, হস্ত, বাহু, পদদ্বয় রক্তে আপ্লুত, বিশাল বক্ষের চর্ম্মে দুই একটী তীর লাগিয়া রহিয়াছে, দীর্ঘ হস্তে রক্তাপ্লুত, অতি দীর্ঘ বর্ষা, উজ্জ্বল নয়ন গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশে আবৃত। শত্রুরাও পোতের সম্মুখে উর্ম্মিরাশির ন্যায়, এই যোদ্ধার দুই পার্শ্বে মুহূর্ত্তের জন্য সচকিতে সরিয়া গেল, সেই দীর্ঘ বর্ষাধারীর নিকট সহসা কেহ আসিল না, মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হইল যেন স্বয়ং রণদেব দীর্ঘ বর্ষা হস্তে আকাশ হইতে প্রাচীরোপরি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ক্ষণকাল মাত্র সকলে নিস্তব্ধ রহিল; পরেই আফগানগণ, শত্রু প্রাচীরে উঠিয়াছে দেখিয়া; চারিদিক হইতে বেগে আসিতে লাগিল; রঘুনাথকে চারিদিকে শত্রুদল কৃষ্ণমেঘের ন্যায় আসিয়া বেষ্টন করিল। রঘুনাথ খড়্গ ও বর্ষাচালনে অদ্বিতীয়, কিন্তু শত লোকের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব, রঘুনাথের জীবন সংশয়।

কিন্তু মাউলীগণও ক্ষান্ত রহিল না। রঘুনাথের বিক্রম দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া সকলে সেই প্রাচীরের দিকে ধাবমান হইল; ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া প্রাচীরে উঠিল, রঘুনাথের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, দশ পঞ্চাশ, দুই তিন শতজন সেই প্রাচীরের উপর বা উভয় পার্শ্বে আসিয়া জড় হইল, ছুরিকা ও খড়্গাঘাতে পাঠানদিগের সারি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পথ পরিষ্কার করিল, মহানাদে দুর্গ পরিপূরিত করিল! সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত দুই তিন শত পাঠানের যুদ্ধ করা সম্ভব নহে, তাহারা মহারাষ্ট্রীয়ের গতিরোধ করিতে পারিল না কিন্তু তখনও সিংহবীর্য্য প্রকাশ করিয়া গতিরোধের চেষ্টা করিতেছে।

সেই তুমুল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আর একটী বজ্রনাদ উত্থিত হইল; শিবজী ও তন্নজী প্রাচীর হইতে লম্ফদিয়া দুর্গের ভিতরদিকে ধাবমান হইতেছেন; সৈন্যগণ বুঝিল, আর এস্থানে যুদ্ধের আবশ্যকনাই, সকলেই প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গের ভিতর দিকে ধাবমান হইল। পাঠানগণ প্রায় হত কি আহত, মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে অসমর্থ!

শিবজী বিদ্যুৎ-গতিতে কিল্লাদারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, সে প্রাসাদ অতিশয় কঠিন ও সুরক্ষিত, সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের বর্ষাঘাতে প্রাচীর ও দ্বারদেশ কম্পিত হইল, কিন্তু ভাঙ্গিল না। শিবজীর আদেশ অনুসারে মহারাষ্ট্রীয়েরা সেই প্রাসাদ বেষ্টন করিল ও বাহিরের প্রহরী সকলকে হত করিল। শিবজী তখন বজ্রনাদে কিল্লাদারকে বলিলেন "দ্বার খুলিয়া দাও, নচেৎ প্রাসাদ দাহ করিব, প্রাসাদবাসী সকলে বিনষ্ট হইবে।" নির্ভীক পাঠান উত্তর করিলেন "অগ্নিতে দগ্ধ হইব, কিন্তু কাফেরের সম্মুখে দ্বার খুলিব না।"

তৎক্ষণাৎ শত মহারাষ্ট্রীয় মশাল আনিয়া দ্বারে ও জানালায় অগ্নিদান করিতে লাগিল। উপর হইতে কিল্লাদার ও তাঁহার সঙ্গীগণ তীর ও বর্ষা নিক্ষেপে প্রাসাদে অগ্নিদান নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইলেন, শত মহারাষ্ট্রীয় মশালহস্তে ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু অগ্নি জ্বলিল।

প্রথমে দ্বার, গবাক্ষ, পরে কড়িকাট, পরে সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ সমস্ত অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল, সেই প্রচণ্ড আলোক ভীষণনাদে আকাশের দিকে ধাবমান হইল, ও রজনীর অন্ধকারকে আলোকময় করিল। দুর্গের উপরে নীচের পল্লিগ্রামে, বহুদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতে ও উপত্যকায় সেই আলোকস্তম্ভ দৃষ্ট হইল, সেই দাহের শব্দ শ্রুত হইল, সকলে জানিল শিবজীর দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান-দুর্গ জয় করিয়াছে!

বীরের যাহা সাধ্য, পাঠান কিল্লাদার রহমৎ খাঁ তাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সঙ্গের যোদ্ধার সহিত বীরেরন্যায় মরিতে বাকি ছিল। যখন গৃহ অগ্নিপূর্ণ হইল, রহমৎ খাঁ ও সঙ্গীগণ লম্ফ দিয়া ছাদ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন, এক এক জন এক এক মহাবীরেরন্যায় খড়্গ চালনা করিতে লাগিলেন, সেই খড়্গ চালনায় বহু মহারাষ্ট্রীয় হত হইল।

সকলে সেই মুসলমানদিগকে বেষ্টন করিল, তাঁহারা শত্রুর মধ্যে চমৎকার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া একে একে হত হইতে লাগিলেন। একজন, দুইজন, দশজন হত হইলেন। রহমৎ খাঁ আহত ও ক্ষীণ, তথনও সিংহবীর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে, চারিদিকে খড়্গ উত্তোলিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের আশা নাই, এরূপ সময় উচ্চৈঃস্বরে শিবজীর

আদেশ শ্রুত হইল “কিল্লাদারকে বন্দী কর, বীরের প্রাণসংহার করিও না।” ক্ষীণ আহত আফগানের হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্ত বন্ধন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাসাদের অগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছে এমত সময় শিবজী দেখিলেন দুর্গের অপর পার্শ্ব হইতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় প্রায় ছয়শত আফগান সৈন্য রাশীকৃত হইয়া আসিতেছে। শিবজী দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে যে একশত সেনাকে অপর পার্শ্বে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারা সেইদিকে গোলকরাতে দুর্গের অধিকাংশ সেনা সেই দিকেই গিয়াছিল; ধূর্ত্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্ষণেক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে মুসলমানেরা উৎসাহিত হইয়া পর্ব্বতের তল পর্য্যন্ত সেই একশত মহারাষ্ট্রীয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, অপর দিকে শিবজী আক্রমণ করিয়া যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন তাহা তাহারা কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই।

পরে যখন প্রাসাদের আলোকে ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্ব্বত ও উপত্যকা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সেই অধিকাংশ মুসলমানগণ আপনাদিগের ভ্রম জানিতে পারিয়া পুনর্ব্বার দুর্গারোহণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। শিবজী অল্প সংখ্যক সেনাকে পরাস্ত করিয়া দুর্গজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে অপর পার্শ্ব হইতে পাঁচ কি ছয়শত যোদ্ধা আসিতেছে দেখিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল।

সুতীক্ষ্ণ নয়নে দেখিলেন দুর্গের মধ্যে কিল্লাদারের প্রাসাদই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম স্থান। চারিদিকে পরিখা, তাহার পর প্রস্তরময় প্রাচীর, অগ্নিতে সে প্রাচীরের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। তাহার মধ্যে প্রাসাদ, প্রাসাদের দ্বার ও গবাক্ষ জ্বলিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ঘর পড়িয়া প্রস্তর রাশি হইয়াছে, তীক্ষ্ণনয়ন শিবজী মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখিলেন অধিক সংখ্যক সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার স্থল ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর হইতে পারে না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে সমস্ত ধারণা করিলেন; স্বয়ং তন্নজী ও দুইশত সেনা সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, প্রাচীরের পার্শ্বে তিরন্দাজ রাখিলেন, দ্বার গবাক্ষের পার্শ্বে পার্শ্বে তিরন্দাজ রাখিলেন, ছাদের উপর বর্শাধারী যোদ্ধাগণকে সন্নিবেশিত করিলেন; কোথাও প্রস্তর পরিষ্কার করিলেন, কোথাও অধিক প্রস্তর একত্র করিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। তখন হাস্য করিয়া তন্নজীকে কহিলেন “এই আমাদের শেষ উপায়, কিন্তু শত্রুকে এই স্থানে আসিতে দিবার পূর্ব্বেই বোধ হয় পরাস্ত করা যাইতে পারে, অন্ধকারে সহসা আক্রমণ করিলে তাহারা ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে। তন্নজী, দুইশত সৈন্যসহিত এই স্থানে অবস্থিতি কর,

আমি একবার উদ্যোগ করিয়া দেখি।”

তন্নজী। “তন্নজী এস্থানে অবস্থিতি করিবে না, একজন মহারাষ্ট্রীয় ও এস্থানে অবস্থিতি করিবে না! ক্ষত্রিয়রাজ! সম্মুখ যুদ্ধে সকলেই অপটু, কিন্তু যদি এস্থান আক্রান্ত হয় তবে আপনি না থাকিলে কাহার কৌশল-বলে এ প্রাসাদ রক্ষিত হইবে?”

শিবজী ঈষৎ-হাস্য করিয়া বলিলেন “তন্নজী! তোমার কথাই ঠিক! আমি সম্মুখে শত্রু দেখিয়া যুদ্ধলুব্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু না, এই স্থানেই আমার থাকা কর্ত্তব্য। আমার হাবেলদারদিগের মধ্যে কে তিন শত মাত্র সেনা লইয়া ঐ আফগানগণকে অন্ধকারে সহসা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে পারিবে?”

পাঁচ, সাত, দশ জন হাবিলদার একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন, সকলে গোল করিয়া উঠিল। রঘুনাথ তাহাদের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে মৃত্তিকারদিকে চাহিয়া রহিলেন।

শিবজী ধীরে ধীরে সকলের দিকে চাহিয়া, পরে রঘুনাথকে দেখিয়া বলিলেন “হাবেলদার! তুমি ইহাঁদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ, কিন্তু ঐ বাহুতে অসুরবীর্য্য ধারণ কর, অদ্য তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমিই অদ্য দুর্গবিজয় আরম্ভ করিয়াছ, তুমিই শেষ কর।”

রঘুনাথ নিঃশব্দে ভূমি পর্য্যন্ত শির নমাইয়া তিন শত সেনার সহিত বিদ্যুৎগতিতে নয়নের বহির্গত হইলেন।

শিবজী তন্নজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন হাবেলদার রাজপুত জাতীয়; উহার মুখমণ্ডল ও আচরণ দেখিলে কোন উন্নত বীরবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু হাবেলদার কখন বংশের বিষয় একটী কথাও বলে না, আপন অসাধারণ সাহস সম্বন্ধে একটী গর্ব্বিত বাক্যও উচ্চারণ করে না, কেবল যুদ্ধকালে, বিপৎকালে, সেই সাহস ও বিক্রম কার্য্যে পরিণত করে। এক দিন পুনায় আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, অদ্য রঘুনাথই দুর্গবিজয়ে অগ্রসর,—আমি এপর্য্যন্ত কোনও পুরস্কার দিই নাই, কল্য রাজসভায় রাজা জয়সিংহের সম্মুখে রঘুনাথ সাহসের উচিত পুরস্কার পাইবেন।”

রঘুনাথজী যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা করেন নাই, করিতে চেষ্টাও করেন নাই; একেবারে তিন শত মাউলীর সহিত বর্শাহস্তে দুর্দ্দমনীয় ভীষণ বেগে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। ত্রিংশৎ হস্ত দূর হইতে সকলে অব্যর্থ বর্শা নিক্ষেপ করিল, পরে “হর হর মহাদেও” ভীষণ নাদে ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে যাইয়া পড়িল। সে বেগ অমানুষিক ও অনিবার্য্য, মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত আফগানশ্রেণীও ছারখার ও ভিন্ন হইয়া গেল, উন্মত্ত মাউলীদিগের অবারিত ছুরিকা ও খড়্গ

আঘাতে আফগানগণ নিপতিত হইতে লাগিল।

কিন্তু আফগানগণও যুদ্ধবিষয়ে অপটু নহেন; শ্রেণীচ্যুত হইয়াও হটিল না, পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে যুদ্ধনিনাদ করিয়া মাউলীদিগকে বেষ্টন করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে যে দৃশ্য দৃষ্ট হইল তাহার বর্ণনা দুঃসাধ্য। নিবিড় অন্ধকারে শত্রু মিত্র দেখা যায় না, আপন হস্তের অসি ভাল দেখা যাইতেছে না, মৃতদেহে সেই স্থান পরিপূর্ণ হইল, রক্ত স্রোতরূপে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, বর্শা, খড়্গ, ছুরিকা অবারিত পরিচালিত হইতেছে, যুদ্ধনিনাদে মেদিনী ও গগন পরিপূরিত হইতেছে; বোধ হয় যেন এ মনুষ্যের যুদ্ধ নহে, শত সহস্র রক্তলোলুপ ক্ষুধিত ব্যাঘ্র পৈশাচিক শব্দে পরস্পরকে নখদ্বারা বিদীর্ণ করিতেছে।

ঘন ঘন ভীষণনাদে বেষ্টনকারী আফগানগণ মুহুর্মুহুঃ সেই তিন শত যোদ্ধাকে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব যোদ্ধৃশ্রেণী কম্পিত হইল না। সমুদ্রের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জনে মুসলমানেরা সেই বীর-প্রাচীরে আঘাত করিতেছে, কিন্তু পর্ব্বততুল্য সেই বীর প্রাচীর অনায়াসে সে আঘাত প্রতিহত করিতেছে। মৃতের শরীরে চারিদিক প্রাচীরের ন্যায় হইয়াছে, মাউলীদিগের সংখ্যা ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে, আফগানগণ পুনঃ পুনঃ অধিকতর বেগে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু সে শ্রেণী ভিন্ন হইল না।

সহসা "শিবজীকি জয়" এইরূপ বজ্রনাদ হইল, সকলে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, দুর্গের তিন চারি স্থলে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা অগ্নিতে ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে ও সেই দিক হইতে যুদ্ধনিনাদ করিয়া আরও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য আসিতেছে। যে একশত জন মহারাষ্ট্রীয় ধূর্ত্ততার সহিত আফগান সৈন্য দুর্গের বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আফগানগণ দুর্গে প্রত্যাগমন করিলে তাহারাই পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক্ষণে সেইদিক হইতে আসিয়া কয়েকটি গৃহে অগ্নিদান করিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। আফগানদিগের দুর্গ শত্রু হস্তগত হইয়াছে, প্রাসাদ জ্বলিয়া গিয়াছে, অন্যান্য অট্টালিকা জ্বলিতেছে, সম্মুখে শত্রু, পশ্চাতে শত্রু, মনুষ্যের যাহা সাধ্য তাহারা করিয়াছিল, আর পারিল না, একেবারে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, মহারাষ্ট্রীয়গণ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া শত শত শত্রু বিনষ্ট করিল। রঘুনাথ তখন উচ্চৈঃস্বরে আদেশ দিলেন "পলাতককে বন্দী কর, হত্যা করিও না; শিবজীর আদেশ পালন কর।" পলাতকগণ অস্ত্র বিসর্জ্জন করিয়া প্রাণ যাচ্ঞা করিল,—তাঁহাদিগের প্রাণরক্ষা হইল।

তখন রঘুনাথ দুর্গের অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া, প্রাচীরের স্থানে স্থানে প্রহরী সংস্থাপন করিলেন; গোলা বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘরে আপন প্রহরী সন্নিবেশিত ক-

রিলেন, বন্দীদিগকে একটি ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন ; দুর্গের সমস্ত ঘর সমস্ত স্থান হস্তগত করিয়া সুরক্ষার আদেশ দিয়া শিবজীর নিকট যাইয়া শির নমাইয়া সমস্ত সমাচার নিবেদন করিলেন।

ঊষার রক্তিমাচ্ছটা পূর্ব্ব দিকে দৃষ্ট হইল ; প্রাতঃকালের সুমন্দ শীতল বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতে লাগিল ; সমস্ত দুর্গ শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ ! যেন এই সুন্দর শান্ত পাদপমণ্ডিত পর্ব্বতশেখর যোগী ঋষির আশ্রম,—যেন যুদ্ধের পৈশাচিক রব কখন এস্থানে শ্রুত হয় নাই !

কে গাহিল!

১

কে গাহিল—কি মধুর—ওই যে আবার—
ছুটিল সঙ্গীত-স্রোত ভাসায়ে গগণ,
একি—এযে ভেসে যায় হৃদয় আমার,
নিশীথে কে করে হেন সুধা-বরিষণ !
আবার—আবার গায়
পুনঃ চিত্ত ভেসে যায় ;
নারীকণ্ঠ ? বটে তাই,
ছুটিয়া গবাক্ষে যাই—
দেখিলাম, কি দেখিনু কি বলিব হায়,
স্থির-সৌদামিনী-লতা পড়িয়া ধরায় !

২

জ্যোৎস্না-প্লাবিত দূর সরসির তটে,
কৌমুদী-কিরণ-স্নাত পাষাণ সোপানে,
পড়িয়া প্রতিমা খানি যেন চিত্রপটে
বিস্তৃত নয়ন দুটি গগণের পানে।
বাম গণ্ড বাম করে,
বাতাসে কুণ্ডল নড়ে,
নিশিগন্ধা বসন্তের
কিম্বা শশী শরদের—
ললিত সপ্তম গায় সঙ্গীত লহরী
পীযুষ প্রবাহে মত্তা নীরব শর্ব্বরী।

৩

আবার সঙ্গীত-স্রোত উঠিল উথলি,
আবার প্রকৃতি-চিত্ত উঠিল আঁকুলি ;
নাচিল সরসিজদল, নাচিল পবন,
নাচিল শাখায় পাতা লতায় প্রসূন।
হরষিত নীলাম্বরে
হাসিয়া কিরণ ঝরে,
মরি কি গভীর তান,
আকুল করিল প্রাণ ;
অবসে মৃদুল খাদে গড়ায়ে পড়িল,
হৃদয়ের স্রোতসম সঙ্গীতে মিশিল।

৪

শুনিয়াছি বসন্তের কোকিল-কূজন,
শুনিয়াছি বাঁশরীর মধুর নিক্কণ,
বসিয়া তরুর তলে, মাথার উপরি
ছুটিয়াছে পাপিয়ার সঙ্গীত লহরী,
হাসিপূর্ণ বিম্বাধরে
নর্ত্তকী মধুর স্বরে

গাহিয়াছে মুলতান,
শুনিয়াছি সেই গান
কিন্তু হেন উন্মাদিনী জীবন্ত রাগিণী,
শুনি নাই হেন গীত চিত্ত-বিপ্লাবিনী।

৫

শুনিলাম—কিন্তু কভু শুনিবনা আর
সুধুই হারায়ু চিত্ত সঙ্গীত শ্রবণে,
সুখের পিপাসা চিত্তে কেন দুর্নিবার,
সাধের সামগ্রী কেন দুর্লভ জীবনে?
ইচ্ছা করে দিবানিশি
এই গবাক্ষেতে বসি,
ওই সুমধুর গান
শুনিয়া যুড়াই প্রাণ,
বুঝেনা স্বাধীন পাখী পথিকের মন,
যুড়ায়ে আপন চিত্ত করে পলায়ন।

৬

শুনিব না আর যদি গাহ একবার
হৃদয়-কবাট আমি করি উদ্ঘাটন,
গাহ তুমি বরষিয়া সুধা-পারাবার,
রেখে দেই চিত্তে আমি করিয়া বন্ধন;
কি শয়নে কি স্বপনে
উথলি উঠিবে প্রাণে,
বাজিবে তরঙ্গ বুকে
উঠিবে উথলি সুখে,
তুলিয়া সপ্তমে তুমি গাহ বিহঙ্গিনী
বেঁধে রাখি বক্ষঃস্থলে তব প্রতিধ্বনি।

✓ভারবি।

অসীম বারিধি-হৃদয়ে যেমন অনন্ত রত্ন-রাজি, অমল কবিহৃদয়ে সেইরূপ অনন্ত ভাবরাশি। বারিধি-হৃদয়ের রত্ন যেমন বহির্জ্জগতে অপূর্ব্বশোভা বিকাশ করে, কবি-হৃদয়ের ভাব সেইরূপ অন্তর্জ্জগতে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়া থাকে। কবির হৃদয়-সাগর অনন্ত মাধুর্য্যে আতট পরিপূর্ণ। ইহাতে কোথাও পঙ্কের কালিমা নাই, ফেণের আবিলতা নাই, এবং পার্থিব বিকারের মলিনতার সঞ্চার নাই। তুষার-ক্ষেত্রের অসীম বিস্তারে যেমন একই ধবলতা হাসিতে থাকে, নিরভ্র গগণের অনন্তবক্ষে যেমন একই নীলিমা খেলিয়া বেড়ায়, কবির হৃদয়ে সেইরূপ একই পবিত্রতা, একই মাধুর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। ✓কবি সকলস্থানেই মধুর ও উদাত্ত ভাবের বিকাশ দেখিতে পান। তাঁহার হৃদয় ক্ষুদ্রপ্রাণ সফরীর ন্যায় অল্পমাত্র জলেই নাচিয়া বেড়ায় না, উহা অগাধ জলসঞ্চারী রোহিতের ন্যায় গভীর জলেই থাকিতে ভালবাসে। সাধারণে যাহা দেখিলে বিস্ময় ও আতঙ্কে জড়ীভূত হয়, ভয়ে শুকাইয়া যায় এবং ভাবনায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, কবি তাহাতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব আভাস দেখিয়া অসীম আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়েন। তরঙ্গ-লীলাময়ী তর-

ঙ্গিনীর বিকট হাস্য, জলধির প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস, অভ্রংলিহ গিরিবরের ভয়ঙ্কর দৃশ্য, এবং শ্বাপদসমাকীর্ণ গহন বনের ভীষণ পরিপূর্ণতায় তাঁহার হৃদয় আতঙ্ক, ভয় ও ভাবনায় অবশ হইয়া পড়ে না। তিনি প্রকৃতির এই চিত্রের অভ্যন্তরেও ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের রেখাপাত দেখিয়া আনন্দরস উপভোগ করেন, এবং নিজের হৃদয়-স্রোত সাধারণের অগম্য, অচিন্ত্য, ও অপ্রাপ্য অমৃতপ্রবাহে মিশাইয়াদিয়া সারস্বতীশক্তির আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন। কবি এই সারস্বতী শক্তির কৃপাবলে নরলোকে থাকিয়াও দেবলোকের পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয়ের অনন্ত প্রস্রবণ হইতে পবিত্রসলিলা জাহ্নবীর খরস্রোতের ন্যায় নিরন্তর অমৃতধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। সেক্ষপীয়র ও মিল্টন এক সময়ে এই অমৃত প্রবাহে ইংলণ্ড প্লাবিত করেন, এবং কালিদাস ও ভবভূতি এক সময়ে এই অমৃত ধারায় ভারতের বিশুষ্ক হৃদয় শীতল করিয়া লোকের হৃদয়গত শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হয়েন। বহুযুগ অতীত হইয়াছে; বহুবৎসর অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া গিয়াছে,তথাপি এই প্রবাহ বিশুষ্ক হয় নাই। ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড ও লাণ্ডক এবং উজ্জয়িনী ও পদ্মনগর হইতে যে ধারা উদ্গত হইয়া ছিল, তাহা আজপর্য্যন্ত পৃথিবীর মন প্রাণ শীতল করিয়া আসিতেছে।

ভারবির সম্বন্ধেও এই সকল কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। ভারবির কবিতা ওজস্বিনী, প্রখর দীপ্তিমতী ও মাধুর্য্যশালিনী। কিন্তু কালিদাস যেমন বিশ্বসংসারের সকল মধুর সৌন্দর্য্যরাশি এক-সূত্রে গাঁথিয়া পাঠকের হৃদয় বিমুগ্ধ করেন, ভারবি সেরূপ কোন কৌশল অবলম্বন করেন না। তিনি পাঠকের সম্মুখে গভীর ও উদাত্ত বিষয় স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখেন, সেই গভীর ও উদাত্ত বিষয়ে গভীর ও উদাত্ত ভাব সংযোজিত করেন। এবং সেই ভাবের সহিত এমন একটু তীব্র মদিরা, এমন একটু মনোমদ উগ্ররস ঢালিয়া দেন যে, তাহার আস্বাদমাত্র শরীর কণ্টকিত হয়, হৃদয় ওজস্বিতায় বিকশিত হয় এবং ধমনীমধ্যে প্রতপ্ত শোণিত-স্রোত তীব্রবেগে প্রবাহিত হইয়া উঠে। কালিদাস স্বীয়চিত্রে ধীরে ধীরে মাধুর্য্যের রেখাপাত করেন, এবং যেখানে যে রং ফলাইলে সেই মাধুর্য্য অধিকতর বিকশিত হয়, তদনুসারে ধীরে ধীরে আপনার তুলি সঞ্চালিত করিতে থাকেন; ভারবি স্বীয়চিত্রে উৎকট বিষয়ের সমাবেশ করেন, এবং যে ভাবে সেই বিষয় গুলি সাজাইলে তাহার উৎকটতা বিকশিত হয়, তজ্জন্য যত্ন করিতে থাকেন। কালিদাসের কবিতা মলয়-বাত-চুম্বিতা বাসন্তীলতা, ভারবির কবিতা ফলাবনত পত্র-সুশোভিত বিশাল নৈদাঘতরু; একটি ভ্রমরচুম্বিত, অপূর্ণ-বিকশিত প্রভাতকমল, অপরটি প্রস্ফুটিত বাতসঞ্চালিত স্থলারবিন্দ;

একটি সুশীতল সুবিশুদ্ধ শারদী জ্যোৎস্না, অপরটি জ্বালাময়ী পবিত্র বহ্নিশিখা। একটি কলনাদিনী গিরি-নির্ঝরিণীর ন্যায় মৃদু মধুর ধ্বনিতে কর্ণ পরিতৃপ্ত করে, অপরটি ফেণায়মানা তরঙ্গমালিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় উদাত্ত ভাবের সঞ্চার করে। একটি ব্রীড়াময়ী তরুণীর ন্যায় মৃদু মধুর ভাবে অঙ্গলতিকা দুলাইয়া হৃদয়ের প্রতিগ্রন্থি অমৃতরসে পরিপ্লুত করে, অপরটি প্রৌঢ়া কামিনীর ন্যায় তীব্র রস বিকাশ করিয়া হৃদয়ের প্রতিস্তর অভিষিক্ত করিতে থাকে; একটি " ফুটে অথচ ফাটিয়া পড়ে না, দ্রবে অথচ বিগলিত হয় না," হাসে অথচ ধ্বনি করে না; অপরটি ফাটিয়াই শোভা বিকাশ করে, বিগলিত হইয়াই শিরায় শিরায় তীব্রতেজ সঞ্চারিত করে, এবং অট্টহাস্যে হাসিয়াই দশ দিক্‌ পরিপূর্ণ করে! সংক্ষেপে কালিদাসের কবিতা কোমল মাধুর্য্যময়ী, ভারবির কবিতা উগ্র মধুরতাশালিনী।

ভারবির কবিতার সহিত ভবভূতির কবিতার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। উভয়েই ওজস্বিনী, তটাভিঘাতিনী ও আপনার গৌরবে আপনি গৌরবিণী; উভয়েই সমানবেগে সমান দক্ষতার সহিত তীব্র মদিরা ঢালিয়া দিয়া হৃদয় মাতাইয়া তুলেন; উভয়েই হিমালয়-কন্দর-নিঃসৃত ভাগীরথীর ন্যায় খরতরবেগে ছুটিয়া এক এক সময়ে সমস্ত বিপ্লাবিত করে, এবং যাহা সম্মুখে পায়, তাহাকেই আপনার লোকাতীত তেজোমহিমা প্রদর্শন করিয়া ডুবাইয়া ফেলে। ভারবি কোন নাটক রচনা করেন নাই, ভবভূতি ও কোন মহাকাব্য প্রণয়ন করেন নাই। নাটকের সহিত মহাকাব্যের তুলনা হয় না। ভিন্ন পদ্ধতির বলে নাটক ও মহাকাব্য উভয়ই ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। তথাপি আমরা সাধারণতঃ কবিতার উপর নির্ভর করিয়াই ভবভূতি ও ভারবির সম্বন্ধে এই সাদৃশ্য দেখাইলাম। ইহাতে ভবভূতি ও ভারবির কবিতা এক শ্রেণীতে সমাবেশিত ও একসূত্রে গ্রথিত হইতে পারে। ফলে মধুরতায় যেমন কালিদাস প্রধান, উগ্রতায় সেইরূপ ভবভূতি ও ভারবি শ্রেষ্ঠ।

ভারবি, ব্যাসের সংগৃহীত উপকরণ লইয়া নিজের কাব্য রচনা করিয়াছেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে অর্জ্জুনাভিগমন কৈরাত ও ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্ব্বাধ্যায়ে যে যে বিষয় সন্নিবেশিত আছে, ভারবি-প্রণীত কিরাতার্জ্জুনীয়েও ঠিক সেই সেই বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইরূপ পরপ্রবর্ত্তিত পথানুবর্ত্তি হইলেও ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয় কোন অংশে হেয় বা অপদার্থ নহে। কালিদাস বাল্মীকির পথানুসরণ করিলেও রঘুবংশ জগতে একখানি অতুল্য ও অমূল্য কাব্যরত্ন। ভারবি ব্যাসের উপকরণ লইয়া চিত্র প্রস্তুত করিলেও কিরাতার্জ্জুনীয় একখানি অপূর্ব্ব মহাকাব্য। আমরা ক্রমশঃ এই মহাকাব্যের সৌন্দর্য্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

যাঁহারা প্রাচীন কবিদের বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাঁহাদের সেই কাব্যে কারুকার্য্যেরই সমধিক প্রবলতা দেখা যায়। প্রাচীন কবিগণ অযত্নে অনায়াসে যে চিত্র প্রস্তুত করেন, আধুনিক কবিগণ তুলী ঘসিয়া, লতা পাতা আঁকিয়া ও রং ফলাইয়া সেই চিত্রে অধিকতর শিল্প-কুশলতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন। প্রাচীন কবিগণের লেখনী হইতে যে স্বভাবশালিনী চিত্তহারিণী কবিতা অবলীলায় অসঙ্কোচে নির্গত হয়, আধুনিক কবিগণের লেখনী ধীরে ধীরে সেই কবিতামালা সজ্জিত ও অলঙ্কৃত করিতে থাকে। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক কোন কাব্যেরই দোষ গুণের নির্ণয় হইতেছে না, কাব্যের শ্রেণীভাগ হইতেছে মাত্র। এই উভয় শ্রেণীর কাব্যের একশ্রেণী রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি, অপর শ্রেণী রঘুবংশ ও কিরাতার্জ্জুনীয় প্রভৃতি। এক শ্রেণীতে স্বভাবের সমধিক বিলাস, অপর শ্রেণীতে শিল্পচাতুরীর সমধিক প্রাদুর্ভাব। এক শ্রেণী অযত্নরক্ষিতা, অনায়াসবর্দ্ধিতা আরণ্যলতা, অপরশ্রেণী প্রযত্নপরিরক্ষিতা, আয়াসপালিতা উদ্যান-ব্রততী। এক শ্রেণী তাপসকুমারীর ন্যায় বনবিহারিণী, পবিত্রদেহা, নিরাভরণা, বিলাসানভিজ্ঞা অথচ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যমহিমায় জগতে অতুলনীয়া; অপরশ্রেণী রাজকুমারীর ন্যায় বিলাসভবনবাসিনী, অলঙ্কৃতদেহা ও সৌন্দর্য্যগৌরবিণী।

ভারবি ব্যাসের অবলম্বিত পথে পা দিয়া স্বীয়কাব্যে এইরূপ শিল্পচাতুরীর পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কিরাতার্জ্জুনীয়ের প্রথমেই রাজ্যনির্ব্বাসিত, দ্বৈতবনবাসী যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎলাভ হয়। যুধিষ্ঠির এখন কপট দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বনেচর, এবং রাজচিহ্ন, রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া মুনিবেশধারী। দুর্য্যোধন কিরূপে রাজ্যশাসন করিতেছে, কিরূপে সামদণ্ডাদি রাজনীতির প্রয়োগ ক-করিতেছে, জানিবার নিমিত্ত এই মুনিবেশী বনেচর একজন কিরাত-শ্রেষ্ঠকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দেন। কিরাত যতিবেশধারণ করিয়া হস্তিনাপুরে যায়, এবং দুর্য্যোধনের রাজ্যশাসন-ব্যাপার অবগত হইয়া দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগমন করে। এই কিরাত যাহা জানিয়া আইসে, কিরাতার্জ্জুনীয়ের প্রারম্ভেই তৎসমুদয়ের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় ভারবির কবিত্ব কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারবির কবিতা শিল্পকুশলতায় অভিচিত্রিত। এই শিল্পের গুণে তাঁহার বনেচর কিরাত, সাধারণ কিরাতগণ অপেক্ষা উচ্চতর গ্রামে আরোহিত হইয়াছে। ভারবির কিরাতে কিরাতগণের সে গ্রাম্যতা নাই, সে মূঢ়তা নাই, সে আরণ্যভাব নাই। ভারবির কিরাত পণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ ও তত্ত্বানুস-

স্থায়ী । কিরূপে কোন্ স্থানে, কোন্ বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, কিরূপে কথার আরম্ভ ও উপসংহার করিতে হইবে, তাহা ভারবির কিরাতের নখদর্পণে স্থিত। ভারবির কিরাত বিপৎপাতে অধীর হয় না, যাতনায় অবসন্ন হয় না এবং মন্ত্রসাধনায় পরাঙ্মুখ হয় না। অধিকন্তু ভারবির কিরাত ভয়ের জন্য মিথ্যা কথা কহে না, মনস্তুষ্টির জন্য তোষামোদ করে না, এবং পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত হয় না। এ কিরাত সত্যবাদী, ধর্ম্মশীল ও নীতিপরায়ণ,—এ কিরাত গুপ্তচরের সম্যক্ উপযুক্ত এবং গুপ্তচরের গুণগ্রামে সম্যক্ অলঙ্কৃত।) এই বনবিহারী ধর্ম্মপরায়ণ গুপ্তচর যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে কিরূপ গম্ভীরভাবে এবং কিরূপ সৌষ্ঠব ও কিরূপ ঔদার্য্যের সহিত স্ববক্তব্যের অবতারণা করিতেছে, পাঠক শ্রবণ করুন। বনেচর অভিবাদন পূর্ব্বক কহিতেছে :—

" ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপ চারচক্ষুষো,
ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোঽনুজীবিভিঃ।
অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা,
হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ।

(অনুবাদ) মহারাজ! চারচক্ষু (১) প্রভুদিগকে প্রতারণা করা, কার্য্যে নিয়োজিত অনুজীবিগণের উচিত নয়। এই

(১) চরই রাজাদিগের চক্ষুঃস্থানী। অর্থাৎ চর স্বরাষ্ট্রে ও পররাষ্ট্রে বেড়াইয়া যাহা দেখিয়া আইসে, রাজাদিগকে তদনুসারেই কার্য্য করিতে হয়।

জন্য (আমার বাক্য) অপ্রিয়ই (হউক), প্রিয়ই (হউক), আপনি ক্ষমা করিবেন। হিতকারি অথচ মনোহারি বাক্য দুর্ল্লভ।

স কিংসখা সাধু ন শাস্তি যোঽধিপং
হিতান্ন যঃ সংশৃণুতে স কিংপ্রভুঃ।
সদানুকূলেষু হি কুর্ব্বতে রতিং
নৃপেষ্বমাত্যেষু চ সর্ব্বসম্পদঃ॥

(অনুবাদ)। যে (অমাত্য) প্রভুকে হিতোপদেশ দেয় না, সে দুষ্টস্বভাব বন্ধু, এবং যে (রাজা) হিতকর কথা শুনেন না, তিনিও দুষ্টস্বভাব প্রভু। রাজা ও অমাত্য (ইহারা সকলেই পরস্পর) একমত হইলে সম্পত্তি (সেই রাজ্যে) অচলা হয়।

নিসর্গদুর্ব্বোধমবোধবিক্লবাঃ
ক ভূপতীনাঞ্চ চরিতং ক জন্তবঃ।
তবানুভাবোঽয়মবেদি যন্ময়া,
নিগূঢ়তত্ত্বং নয়বর্ত্ম বিদ্বিষাং॥"

(অনুবাদ) ভূপতিদিগের স্বভাব দুর্ব্বোধ কার্য্যপ্রণালীই বা কোথায়, আর মূঢ়মতি মাদৃশ প্রাণিগণই বা কোথায়। (তথাপি যে) আমি শত্রুপক্ষের রাজনীতির গূঢ়তত্ত্ব জানিয়া আসিয়াছি, সে কেবল আপনার ক্ষমতার বলে ;

এ উক্তি চরের উপযুক্ত, এ উক্তির প্রারম্ভ গম্ভীর ও নীতি-বিশুদ্ধ। চর যাহা দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাই বলিবে, মিথ্যা কহিয়া অথবা অনুচিত বাগাড়ম্বর করিয়া সত্যের অপলাপ করিবে না। সত্য কথা বলিতে গেলে যদি তাহা প্রভুর অপ্রিয়

হয়, এই জন্য চর পূর্ব্বেই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। আমাদের নীতিশাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" (সত্য কথা ও প্রিয় কথা কহিবে, অপ্রিয় সত্য কথা কহিবে না)। কিন্তু চর কর্ত্তব্যানুরোধে সকল স্থলেই সত্য কথা কহিবে, উহা প্রিয়ই হউক, অপ্রিয়ই হউক, তদ্বিষয়ে সে বিচার করিবে না। সুতরাং প্রভুর অপ্রীতিসাধন ও নীতিশাস্ত্রের অবমাননা-অপরাধের ক্ষালন জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই যুক্তিসিদ্ধ। যদি সত্য কহিলেও প্রভুর অপ্রিয়পাত্র হইতে হয়, তাহা হইলে নীরবে থাকাই ভাল ; যাহারা এই সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া সত্য কহিতে ইতস্ততঃ করে, চর দ্বিতীয়বাক্যে তাহাদিগকে নিরুত্তর করিয়াছে। এই বাক্যে চর দেখাইয়াছে যে, সত্য কহা অনুজীবিদিগের যেমন কর্ত্তব্য, সেই সত্যের অনুবর্ত্তী হওয়াও প্রভুদিগের তেমনি কর্ত্তব্য। ইহার পর চর তৃতীয় বাক্যে আপনার অহঙ্কার ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া বিনয় ও নম্রতার পরিচয় দিয়াছে। ভারবি যে দশদিক দেখিয়া কবিতাকুসুম সজ্জিত করেন, এইরূপ পূর্ব্বাপর সঙ্গতিই তাহার প্রমাণ।

চর, এইরূপ উদারভাবে ও বিনয়নম্রতার সহিত স্ববক্তব্যের অবতারণা করিয়া, দুর্য্যোধনের রাজ্যশাসনের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভারবি, দুর্য্যোধনের শাসনকার্য্যের দোষোদ্ঘোষণ করেন নাই। ভারবির দুর্য্যোধন যদিও বঞ্চনাবলে রাজ্য অধিকার করিয়াছে, তথাপি রাজকার্য্যে কখনও ঔদাসীন্য বা অব্যবস্থিততা দেখায় নাই। শাসনকার্য্যে ভারবির দুর্য্যোধন অনেক উন্নত। যুধিষ্ঠিরের গুণগ্রাম ও সুকীর্ত্তিমহিমা ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য ভারবির দুর্য্যোধন অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিরন্তর ব্যাপৃত। চর গম্ভীরভাবে যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে এই দুর্য্যোধনের শাসন শৃঙ্খলা ও উদার ভাবের বর্ণনা করিয়াছে।

আমরা এই বর্ণনায় দেখিতে পাই, দুর্য্যোধন, গুণে ও যশে যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করিবার জন্য সুরাজনীতির বলে পৃথিবী শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার দয়াদাক্ষিণ্যাদির গুণে যশ বাড়িয়া উঠিয়াছে, পৌরুষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং সুশাসন-মহিমা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। দুর্য্যোধন এক্ষণে অতন্দ্র হইয়া দিবারাত্রি ভাগ করিয়া যথাসময়ে যথাবিধি রাজনীতির প্রয়োগ করিতেছে ; অহঙ্কারশূন্য হইয়া লোকের সমক্ষে ভৃত্যদিগকে বন্ধুরন্যায় দেখিতেছে, বন্ধুদিগকে ভ্রাতারন্যায় স্নেহ ও আদর করিতেছে, এবং ভ্রাতাদিগকে রাজ্যাধিপতি বলিয়াই পরিচিত করিতেছে। উঁাহার রাজ্যে শত্রুগণ নিৰ্জ্জিত হইয়াছে, মিত্র রাজগণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে, অপক্ষপাতে ন্যায়ানুসারে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। সৈন্যগণ প্রাণপণে রাজ্যরক্ষা করিতেছে, পু-

থিবী দয়া-দাক্ষিণ্যে পরিতুষ্ট হইয়া নিরন্তর ধনপ্রদানে পরিতোষ জন্মাইতেছে, হুতাশন যজ্ঞস্থলে যথাবিধি সৎকৃত ও অভ্যর্থিত হইতেছেন এবং নদীমাতৃক ক্ষেত্রসকল শস্যসম্পত্তিতে অনুক্ষণ শোভা পাইতেছে। ভারবির দুর্য্যোধন এইরূপ সুরাজনীতি ও সদ্ধর্ম্মপরায়ণ ; চর অবলীলায় ও অসঙ্কোচে এই দুর্য্যোধনের শাসনমহিমার এইরূপ বর্ণনা পরিসমাপ্ত করিয়াছে। এই বর্ণনা প্রগাঢ়তা ও অর্থগাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। ইহার অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয় না। কিন্তু প্রবন্ধের অবয়ব অতিশয় বাড়িয়া উঠিবে ভাবিয়া আমরা সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। যে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে শাসন-শৃঙ্খলা যেরূপ অভিব্যক্ত হইবে, সেইরূপ কবির রাজনীতিজ্ঞতা ও আভ্যন্তরীণ অবস্থায় অভিজ্ঞতাও জানা যাইবে। দুর্য্যোধনের রাজ্যে কিরূপে দণ্ডবিধি প্রয়োজিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে যুধিষ্ঠির-প্রেরিত চর কহিতেছে—

"বসূনি বাঞ্ছন্ন বশী ন মন্যুনা
স্বধর্ম্ম ইত্যেব নিবৃত্তকারণঃ।
গুরূপদিষ্টেন রিপৌ সুতেঽপি বা
নিহন্তি দণ্ডেন স ধর্ম্মবিপ্লবম্॥

(অনুবাদ) সেই জিতেন্দ্রিয় দুর্য্যোধন ধনলোভে অথবা ক্রোধবশতঃ দণ্ডবিধান করেন না, রাজধর্ম্ম [রক্ষার] জন্যই লোভাদি পরিত্যাগ করিয়া, শত্রুই হউক, (আর) নিজের পুত্রই হউক, অধর্ম্মাচরণ করিলে সকলকেই প্রাড়্‌বিবাকের উপদেশানুসারে দণ্ডিত করেন *।

স্থলান্তরে কৃষিকার্য্যের সম্বন্ধে চর বলিতেছেঃ—

সুখেন লভ্যাদধতঃ কৃষীবলৈ-
রকৃষ্টপচ্যা ইব শস্যসম্পদঃ।
বিতম্বতি ক্ষেমমদেবমাতৃকা-
শ্চিরায় তস্মিন্ কুরবশ্চকাসতে॥

(অনুবাদ) সেই দুর্য্যোধনের মঙ্গলকর কার্য্যের গুণে নদীমাতৃক কুরুজনপদ কৃষকদিগের এরূপ সুখলভ্য শস্য-সম্পত্তি ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে যে, বোধ হয় যেন ঐ শস্য বিনা কর্ষণেই পরিপক্ক হইতেছে †।

সন্ধিবন্ধন ও দানের প্রসঙ্গে চর এইরূপ বাক্য বিন্যাস করিয়াছেঃ—

* আধুনিক রাজ্যপালকগণ প্রাচীন ভারতের কবির নিকট এই উদারতা ও মহত্ত্ব শিক্ষা করুন। প্রাচীন ভারতের শাসনকার্য্যে এরূপ উদারতা ও মহত্ত্বের অনাদর ছিল না।

† এই বাক্যে প্রতিপন্ন হইতেছে, পূর্ব্বে ভূমিসকল দেবমাতৃক ছিল না, কৃষকগণ কেবল পর্জ্জন্য দেবের উপর নির্ভর করিয়াই থাকিত না। পূর্ত্তকার্য্যের গুণে শস্যক্ষেত্রের নিকট খাল প্রভৃতি থাকাতে কৃষিকার্য্যের বিশিষ্ট সুবিধা হইত। এক্ষণে যাঁহাদের রাজ্য অনাবৃষ্টির জন্য বারম্বার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয়, তাঁহাদের এবিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

নিরত্যয়ং সাম ন দানবর্জ্জিত-
ন্ন ভূরি দানং বিরহয্য সৎক্রিয়াম্।
প্রবর্ত্ততে তস্য বিশেষ-শালিনী
গুণানুরোধেন বিনা ন সৎক্রিয়া ॥

(অনুবাদ) সেই দুর্য্যোধনের দান ব্যতিরেকে নির্ব্বাধ সন্ধি প্রবর্ত্তিত হয় না, সদসদ্বিবেচনা ব্যতিরেকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা সম্পন্ন হয় না *।

স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছেঃ—

মহীভৃতাং সচ্চরিতৈশ্চরৈঃক্রিয়াঃ
স বেদ নিঃশেষমশেষিতক্রিয়ঃ।
মহোদয়ৈস্তস্য হিতানুবন্ধিভিঃ
প্রতীয়তে ধাতুরিবেহিতংফলৈঃ ॥

(অনুবাদ)। ফলোদয় পর্য্যন্ত কার্য্যকারী সেই দুর্য্যোধন সচ্চরিত্র চরদ্বারা রাজাদিগের সমস্ত কার্য্যই অবগত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্য কেবল হিতকর ফল দেখিয়াই জানিতে পারা যায় †।

* রাজ্যাধিপতিদিগের এই নীতিবাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা উচিত।

† কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশে দিলীপ রাজার গুণবর্ণনেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা;

তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ।
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব॥

(অনুবাদ) সেই রাজা দিলীপের মন্ত্রণা এরূপ গোপনে থাকিত, এবং আকার ইঙ্গিত এরূপ নিগূঢ় ছিল যে, তাঁহার কার্য্য, জন্মান্তরীণ সংস্কারের ন্যায় ফল দেখিয়া অনুমান করা যাইত।

দুর্য্যোধন কেন এইরূপ সুরাজতার পরিচয় দিতেছে? কেন এইরূপ বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুসারে শাসনকার্য্যের পরিচালনা করিতেছে? কবি পূর্ব্বেই তাহার উত্তর দিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের গুণগ্রাম অতিক্রম ও সুরাজতা বিলুপ্ত করিবার জন্য রাজ্য সুব্যবস্থিত ও সুশাসিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। সুতরাং দুর্য্যোধনের এইরূপ সুনীতিপ্রয়োগ কেবল যুধিষ্ঠিরের যশ ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য। কবি এইরূপ দুর্য্যোধনের চরিত্রে একটুকু রং ফলাইয়া যুধিষ্ঠিরের চরিত্র শতগুণে উজ্জ্বল করিয়াছেন। দুর্য্যোধন দুরাত্মা, দুর্য্যোধন মায়াবী, দুর্য্যোধন কপটদ্যূতে পর-রাজ্যাপহারী; এ দুর্য্যোধন যখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপদে সমাসীন হইয়া যুধিষ্ঠিরের গুণাতিক্রমী——যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তিস্পর্দ্ধী হইবার জন্য সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বমান্য, সর্ব্বপূজিত ধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, তখন যুধিষ্ঠির কতদূর মহান্, কতদূর উদারচেতা, কতদূর সুনীতিপরায়ণ! কবি যুধিষ্ঠিরের কাছেও গেলেন না, তাঁহার চরিত্রপটে একটুকু রেখাপাতও করিলেন না, অথচ অপূর্ব্ব কৌশলে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র সুরঞ্জিত করিয়া তুলিলেন,—অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে যুধিষ্ঠিরকে উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে তুলিয়া দিলেন। ইহা কবিত্বের পরাকাষ্ঠা।

দুর্য্যোধন সুনিয়মে প্রজাপালন করি-

লেও যুধিষ্ঠিরের ভয় হইতে বিমুক্ত হয় নাই ; অদ্যাপি যুধিষ্ঠিরের নামে তাহার মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয়, মস্তক অবনত হইয়া পড়ে এবং হৃদয়, আশঙ্কা ও আতঙ্কে অবসন্ন হইয়া উঠে। বনবিহারী কিরাত এসম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেঃ—

প্রলীনভূপালমপি স্থিরায়তি
প্রশাসদাবারিধিমণ্ডলম্ভুবঃ।
সঞ্চিন্তয়ত্যেব ভিয়স্ত্বদেষ্যতী
রহো দুরন্তা বলবদ্বিরোধিতা॥

(অনুবাদ) সমস্ত শত্রু পরাজয় করিয়া স্থিরোত্তর কালা, সসাগরা পৃথিবী শাসন করিলেও, সেই দুর্য্যোধন সর্ব্বদা আপনার ভয়ে চিন্তিত রহিয়াছেন। অহো ! প্রবলদিগের সহিত বিরোধ কি কষ্টকর !

কথাপ্রসঙ্গেন জনৈরুদাহৃতা,
দনুস্মৃতা খণ্ডলসূনুবিক্রমঃ।
তবাভিধানাদ্ ব্যথতে নতাননঃ
স দুঃসহান্মন্ত্রপদাদিবোরগঃ॥

(অনুবাদ) লোকে কথাপ্রসঙ্গে আপনার নাম করিলে সেই দুর্য্যোধন, সর্প যেমন দুঃসহ মন্ত্রে গরুড়ের পরাক্রম মনে করিয়া নতশির হয়, সেইরূপ অর্জ্জুনের পরাক্রম স্মরণ করিয়া ব্যথিতচিত্তে অবনত মস্তক হইয়া পড়েন।

এস্থলে কবির কৌশল অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। কবি এস্থলে দুর্য্যোধন অপেক্ষা যুধিষ্ঠিরের শ্রেষ্ঠতা স্পষ্ট দেখাইয়াছেন। কবির কিরাত এস্থলে তোষামোদ করিল না, ব্যাপকতা দেখাইল না, দুর্য্যোধনকে নরকে ফেলিয়া যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে তুলিল না ; অথচ দুই একটি গভীর রেখায় যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব্ব তেজোমহিমা—, অপূর্ব্ব দেবোপম ভাব স্পষ্ট আঁকিয়া দিল। যদি এই ভাব মানস-পটে অঙ্কিত করিতে চাও, তবে যুধিষ্ঠিরের কাছেও যাইও না ; কল্পনারনেত্রে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের প্রতি একবারও চাহিয়া দেখিও না। অগ্রে দুর্য্যোধনের প্রতি নয়নপাত কর ; অগ্রে দুর্য্যোধনের সুশাসন, দুর্য্যোধনের ভয়, দুর্য্যোধনের আতঙ্ক, একে একে স্মৃতিপটে চিত্রিত কর ; তাহা হইলেই যুধিষ্ঠিরের উজ্জ্বল কান্তিতে তোমার হৃদয় আলোকিত হইবে ; তাহা হইলেই শারদী পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্না-বিধৌত নিবাত নিষ্কম্প তরঙ্গিণীর ন্যায়, অথবা চন্দ্রালোকস্পৃষ্ট পূর্ণ বিকশিত কুমুদস্থলীর ন্যায় যুধিষ্ঠিরের পবিত্রতাময়ী শুভ্রোজ্জ্বল কীর্ত্তি তোমার সম্মুখে হাসিতে থাকিবে। দুর্য্যোধনের প্রতিবিম্বিতচ্ছবির সম্মুখবর্ত্তী না হইলে একীর্ত্তির গরিমা, একীর্ত্তির মধুরিমা বুঝিতে সমর্থ হইবে না। এই ছবিই এ কীর্ত্তি সন্দর্শনের অদ্বিতীয় আলোকবর্ত্তি, এবং এই চ্ছবিই এ কীর্ত্তি-মন্দিরের অদ্বিতীয় সোপান। অগ্রে এই আলোকবর্ত্তি হাতে কর, অগ্রে এই সোপানে পা দেও, তবেই এ কীর্ত্তির মধুর আভা নয়ন ভরিয়া পান করিতে পারিবে।

ভারবি এইরূপে এক দুর্য্যোধনের চিত্রেই

যুধিষ্ঠিরের চারিত্র-সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। "অহো! দুরন্তা বলবদ্‌-বিরোধিতা" এই কথাতেই কত অর্থ গাম্ভীর্য্য! এই একটি সামান্য কথায় যুধিষ্ঠি-রের চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য কত পরিস্ফুট হই-য়াছে, পঞ্চমুখে স্তুতিগীত গাইলে অথবা শত পৃথিবীর প্রশংসাবাদ লিখিলেও সেই ঔজ্জ্বল্য তত বিকশিত হইত না। প্রবাসে জীর্ণকুটীরে সুসজ্জিত-হর্ম্ম্য-সুশোভিনী অ-লঙ্কৃতদেহা সুন্দরী পদ্মাবতীর সমক্ষে বন-বিহারিণী নিরাভরণা সুন্দরী কপালকুণ্ডলা যেমন অধিকতর সুন্দরী হইয়াছিল, রাজা-সনস্থ দুর্য্যোধনের চিত্রের সমক্ষে বনেচর যুধিষ্ঠিরের চিত্র সেইরূপ অধিকতর সুন্দর হইয়াছে। দরায়ুস দুহিতা সুন্দরী না হ-ইলে সেকন্দর সা'হের ধর্ম্ম কখনও পরম সুন্দর বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় হইত না; কিরাতার্জ্জুনীয়ে দুর্য্যোধন সু-ন্দর না হইলে কখনও যুধিষ্ঠিরের সৌন্দর্য্য সুস্পষ্ট অনুভব করা যাইত না।

কোন ক্ষুদ্র কবি হইলে হয়ত তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রশংসাধ্বনিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া দুর্য্যোধনকে একবারে নরকে ফে-লিয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে কা-ব্যের গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য একবারে বিনষ্ট হইয়া যাইত। দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের প্রতি-দ্বন্দ্বী, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমকক্ষেই হওয়া উচিত, এবং এই সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সৌন্দর্য্য-জনক হইয়া থাকে। কাব্যের মুখ্য উ-দ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। সৌন্দর্য্যই কাব্যের আত্মা এবং সৌন্দর্য্যই কাব্যের প্রাণ। যিনি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে না পারেন, তিনি কখনও "কবি" নামের অধিকারী নহেন এবং তৎপ্রণীত গ্রন্থও কখনও "কাব্য" নামের যোগ্য নহে। ভীমার্জ্জুন-নকুলসহদেব-সহচর যুধিষ্ঠির যদি দুর্য্যো-ধনের ন্যায় একজন ক্ষুদ্র-প্রাণ, ক্ষুদ্র-বুদ্ধি ও ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে কাব্যের গৌ-রব বা সৌষ্ঠব রক্ষা পাইত না। এবং তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের চরিত্র কখনও র-মণীয় বা ঔজ্জ্বল্য-বিকাশক হইত না। সুতরাং চিত্রকরের চিত্র আত্মাহীন, প্রাণ-হীন হইয়া অকিঞ্চিৎকর পদার্থের দলে মিশিয়া যাইত। ইহাতে কখনও কোন সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইত না।

কুমন্ত্রণায় যদিও দুর্য্যোধনের চিত্তের মালিন্য জন্মিয়াছে কুমন্ত্রীর পরামর্শে য-দিও দুর্য্যোধন ভ্রাতৃরাজ্য হরণ করিয়াছে; দুষ্টবুদ্ধিতে যদিও দুর্য্যোধন 'দুরাত্মা' বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তথাপি ক্ষত্রিয়তেজ,-ক্ষত্রিয় সাহস ও ক্ষত্রিয় দর্প দুর্য্যোধনকে একবারে ছাড়িয়া পলায় নাই। এই তেজ, এই সাহস ও এই দর্প দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠিরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও যুধিষ্ঠিরের গুণাতি-ক্রমী হইতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। এদৃশ্য-ও দেখিতে সুন্দর। মহৎ লোকের সহিত দুষ্টাশয়ের এরূপ বিরোধ এবং মহৎলো-কের গুণস্পর্দ্ধী হইতে দুষ্টাশয়ের এরূপ চেষ্টাও কাব্যের উৎকর্ষ-সম্পাদক।

অধিকন্তু, দুর্য্যোধনের চরিত্রে সুরাজ-গুণের আভাস লক্ষিত না হইলে কাব্যের ঘটনাগত উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইত। কিরাতার্জ্জুনীয়ের ঘটনাগত উদ্দেশ্য, কিরাতবেশধারী ভবানীপতি মহাদেবকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের বাহুবলপরীক্ষা ও তদনন্তর অর্জ্জুনের অরাতিদমন অস্ত্রলাভ।) এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে অর্জ্জুনের অরাতিপক্ষকে বিশিষ্ট প্রবল ও সহায়সম্পন্ন করা উচিত। প্রতিদ্বন্দীকে বিলক্ষণ প্রবল না দেখিলে তাঁহার দমন জন্য দুষ্কর কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে না। দুর্য্যোধনকে রাজনীতি-কুশল, সসাগরা সদ্বীপার অদ্বিতীয় অধীশ্বর ও রণপণ্ডিত সেনাপতিসমূহে পরিবৃত দেখিয়াই অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের নিমিত্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও জায়া হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন, একাকী হিম-গিরিতে দুষ্কর তপস্যা করেন, এবং পরিশেষে ভবানীপতিকে পরিতুষ্ট করিয়া ধনুর্ব্বেদ লাভ করেন। প্রবল অরাতিপক্ষের দমন জন্য তরুণবয়স্ক বীরপুরুষের এরূপ উৎকট চেষ্টাও দেখিতে সুন্দর। দুর্য্যোধন কৌরবসাগরে নগণ্য জলবিম্ব হইলে তাহার বিলয়জন্য বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সেই দুষ্কর কার্য্য, সেই কঠোর যত্ন অবশ্যই উপহাসকর ও কাব্যের অপকর্ষ-সম্পাদক হইত। ইহাতে কাব্যের কোথাও উদ্ভাবনার পারিপাট্য থাকিত না, কোথাও সৃষ্টির রমণীয় বিকাশ প্রতিবিম্বিত হইত না এবং কোথাও পবিত্র সৌন্দর্য্যের মদালস বিভ্রম লীলা করিত না। অনন্ত জলধরপটলের ছায়ায় যেমন অনন্ত বারিধিবক্ষ কালীময় হইয়া যায়, একটি চরিত্রের কলঙ্কময় প্রতিবিম্বে সেইরূপ কাব্যের প্রতিচিত্রের প্রতিরেখা কলঙ্কময় হইয়া যাইত। দুর্য্যোধনের রাজোচিত গুণ ও রাজোচিত গৌরব অস্থানে বা অসময়ে বিকশিত হয় নাই। কবি চিত্ররঞ্জিত করিয়াই অনেক উদ্দেশ্যের সিদ্ধি ও অনেক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।)

ক্রমশঃ

পৃথ্বীরাজচরিত।

পুরাণে কথিত আছে অবনী দৈত্যদানব-দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইলে ভগবান বিষ্ণু জীব-শরীর ধারণ পূর্ব্বক ভূভার হরণ করিয়াছেন। ফলতঃ সময়ে সময়ে পৃথিবীতে এক এক জন মহাপুরুষের প্রয়োজন হয়, এবং সেই প্রয়োজন সাধন জন্য তাঁহারা অবনীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের স্বীয় জীবনের পৃথক্ অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাইনা, কারণ তাঁহারা এক হইয়া অনেক,—তাঁহারা জাতীয় জীবনের আদর্শ-স্বরূপ। যে দেশে যখন তাঁহারা আবির্ভূত হন,

সেই দেশ ও তৎকালের ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা হইলে তাঁহাদিগের জীবন পাঠ করিলেই হয়; পক্ষান্তরে তাঁহাদিগের জীবনচরিত জাতীয় ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। নেপোলিয়ান বোনাপার্টী কহিতেন, ফ্রান্স ও আমি এক ও অভিন্ন, আমার জীবনই ফরাসিশ জাতির জীবন! ইহা বৃথা গর্ব্ব নহে, উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসিশ ইতিহাস নেপোলিয়নের জীবন চরিতের ছায়া মাত্র। আমরা উপরে যে মহাত্মার নাম স্থাপন করিলাম, তদীয় জীবনচরিতও তদ্রূপ দ্বাদশ শতাব্দীর হিন্দু জাতির ইতিহাস। আর্য্য জাতি কি ছিল, যদি কেহ জানিতে চান, তিনি পৃথ্বীরাজের চরিত পাঠ করুন। যদি কেহ আর্য্য জাতির পুনরুদ্ধার দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে পৃথ্বীরাজের উন্নতি ও পতনের বিষয় চিন্তা করুন।

পৃথ্বীরাজের কাহিনী পাঠ করিতে করিতে সাহসে মন উৎসাহিত, আনন্দে উৎফুল্ল, ও অভিমানে উন্নত হয়, পৃথ্বীরাজ আর্য্যকুলগৌরবস্থল। আবার পক্ষান্তরে পৃথ্বী-চরিত পাঠে, মনে ক্ষোভ হয়, হতাশ হয়, লজ্জা হয়,—পৃথ্বী আর্য্য জাতির কলঙ্ক।

পৃথ্বীচরিত ঐতিহাসিকদিগের প্রগাঢ় চিন্তার স্থল; নীতিজ্ঞদিগের উপদেশের প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল; দেশ-হিতৈষীদিগের স্বদেশহিতৈষণা শিখিবার উৎকৃষ্ট স্থল; এবং কবিদিগের অনুপম ক্রীড়াস্থল। ফলতঃ ইহাতে ইতিহাস, নীতি, কাব্য প্রভৃতির অপর্য্যাপ্ত উপকরণ বিদ্যমান আছে। বিষয়টি এত গুরুতর যে, একটি প্রবন্ধে ইহার শেষ করা দুঃসাধ্য। অথচ এরূপ প্রস্তাব ক্রমশঃ প্রকাশ করিলেও সাময়িক পত্রিকার পাঠকবর্গের প্রীতিকর হয় না। সুতরাং আমরা যথাসাধ্য এক প্রবন্ধেই ইহার শেষ করিব। এই জীবনীটি যে ভাবে লেখা উচিত, হয়ত আমাদের ক্ষমতার দোষে তাহার কিছুই পাঠক ইহাতে দেখিতে পাইবেন না। এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ-প্রয়োজন। পৃথ্বীরাজচরিত ইতিহাসে বিশেষ কিছুই লেখা নাই। কাব্য হইতে ইহার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত বিষয়ের সহিত কবি-কল্পনার এত অধিক মিশ্রণ হইয়াছে যে, কতটুকু কাব্য আর কতটুকু ইতিহাস তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। আমরা এই প্রস্তাবে কাব্যাংশের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা যতদূর সম্ভব তাহা প্রদান করিতে চেষ্টা পাইব। কাব্যিয় উপকরণের আধিক্য দেখিয়া, আমরা একদা একখানি বৃহৎ কাব্য লিখিব বলিয়া স্থির করি, কিন্তু প্রথম সর্গের কিয়দ্দূর রচনা করিয়া নানা কারণে বিরত হই। বর্ত্তমান লেখকের দুটি প্রবন্ধের উপর নির্ভর করিয়া যিনি "পলাসীর যুদ্ধ" রূপ উপাদেয় পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহাকেই আমরা এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রথমে আহ্বান করিতেছি।

৩৬টি রাজপুত নৃপতিবংশের মধ্যে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইন্দ্রপ্রস্থে তুমার, অজমীরে চোহান, কান্যকুব্জে রাঠোর, এবং গুজ্জরাষ্ট্রে ভগিলা এই চারি বংশই প্রবল ছিল। খ্রীষ্টিয় ৭৯২ অব্দে অনঙ্গ পাল কর্ত্তৃক তুমার বংশের সৃষ্টিপত্তন হয়। নরসিংহদেব নামধারী * শেষ রাজা ১১৩৪ শাকে রাজত্ব করেন। এই বংশে সর্ব্ব শুদ্ধ ২৬ জন রাজা রাজত্ব করেন। অনহল চোহান বংশের আদিপুরুষ। ৩৮ জন রাজার রাজত্বের পর সোমেশ্বর আজমিরের সিংহাসনে আরোহণ করেন; ইনি তুমার রাজের সহায় হইয়া কান্যকুব্জ প্রভৃতি দেশের রাজাদিগকে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করান। দিল্লীশ্বর নরসিংহ সোমেশ্বরের উপর ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় দুহিতাকে তদীয় হস্তে সম্প্রদান করেন। আমাদের নায়ক এই শুভ পরিণয়ের ফল। ১১৫৯ শাকে শুভলগ্নে ইনি ভূমিষ্ঠ হন্। রাঠোরপতি বিজয় পাল নরসিংহের দ্বিতীয় কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, এবং তদীয় গর্ভে কুক্ষণে আর্য্যকুল-কালিমা কান্যকুব্জাধিপতি নরাধম জয় চন্দ্রের জন্ম হয়।

ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ রাজা নরসিংহদেবের পুত্রসন্তান জন্মে না। সুতরাং স্বীয় দৌহিত্র পৃথ্বীকে অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। তিনি মাতামহের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।* এবং এই হইতেই চোহান ও তুমার বংশের একীকরণ হইল, উভয় দেশই এক অধিপতির শাসনাধীন হইল।

পৃথ্বীরাজ-জনক সোমেশ্বরের অপর এক পত্নীছিল, সে অতি দুশ্চরিত্রা ছিল। কিন্তু সোমেশ্বর তাহাকেই প্রাণপণে ভাল-

---

* টড্‌সাহেবের মতে ইহার নামও অনঙ্গপাল।

* রাজাবলী নামক গ্রন্থে এই বৃত্তান্তটি অন্যরূপে বর্ণিত আছে। যথা— সোমেশ্বরের (প্রাচ্য দেশের রাজার) অপর এক রাক্ষসী স্ত্রী ছিল। সে নরসিংহের দুহিতার গর্ভজাত প্রথম পুত্রকে ভক্ষণ করে। এবং ক্রমে স্বীয় স্বামীকেও স্বীয় মতাবলম্বী করাইয়া দেশে নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করে। নরসিংহ দুহিতা পতি ও স্বপত্নীর আচরণে ভীতা হইয়া স্বীয় ভ্রাতা জীবন সিংহের (নরসিংহের পুত্র) আলয়ে গমন করেন, তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। কালে পিত্রালয়ে পৃথুনামে তাঁহার এক পুত্রজন্মে। জীবন সিংহ অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং ভাগিনেয় পৃথুকেই উত্তরাধিকারী রূপে স্থির করেন। কিছু কাল পরে রাজগিরির রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে জীবনসিংহ তথা গমন করেন, এই অবকাশে পৃথু দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। সমরান্তে জীবন সিংহ স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় ভাগিনেয়ের দুষ্টাচরণ শ্রবণ পূর্ব্বক কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। পৃথু নির্ব্বিবাদে দিল্লীশ্বর হইলেন।

বাসিতেন। ফলতঃ সেই খলমতি কুহকিনীর প্রেম-কুহকে তিনি জড়িত হইয়া কিছুদিন মধ্যে তদীয়হস্তে ক্রীড়াপুত্তলবৎ হইয়া পড়িলেন। এইরূপে স্বামীকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিয়া সেই নর-রাক্ষসী দেশে নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল, ক্রমে দেশ উৎসন্ন হইল, প্রজা ও অধীন সর্দ্দারেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল ফলতঃ কিছুদিন মধ্যে প্রাচদেশে সম্পূর্ণ-অরাজকতা উপস্থিত হইল। প্রধান কর্ম্মচারী, সর্দ্দার ও সাধারণ প্রজাবৃন্দের ভাবগতি বুঝিয়া কৃপাপাত্র সোমেশ্বরকে শত্রুহস্তে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই দুরাচারিণী রাজধানী হইতে রাত্রযোগে একদা পলায়ন করিল।

পৃথ্বীরাজ অজ্জমীরের এই দুরবস্থার কথা শুনিতে পাইয়া সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং সামদানভেদদণ্ড চতুর্ব্বিধ উপায়ে সর্দ্দার, অমাত্য ও প্রজাবৃন্দকে বশ করিয়া পিতাকে পুনর্ব্বার পদস্থ করিতে মনন করিলেন। কিন্তু সোমেশ্বরের উপর প্রজাদিগের এরূপ বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ হইয়াছিল যে, পৃথ্বীরাজ বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিলেন, এবং দিল্লী ও অজ্জমীর সংযুক্ত রাজ্যে স্বীয় একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। *

* রাজাবলীর মতে সোমেশ্বরের প্রার্থনানুসারে পৃথু তাঁহার মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক রাক্ষসী-সহবাস-পাপ হইতে উদ্ধার করেন।

ঘটনাচক্রে পৃথ্বী দিল্লীশ্বর হইলেন, পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং অজ্জমীরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই উভয় ব্যাপারে তাঁহার অপরাধ কি? নেপোলিয়ান কহিতেন আমি "ঘটনার সন্তান" † ফলতঃ মনুষ্য মাত্রেই ঘটনার অধীন। একথায় কেহ যেন এরূপ মনে করেন না যে, আমরা মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছামতের বিরোধী। মনুষ্য যন্ত্র নহে, ইচ্ছা বিশিস্ট জীব, সত্য; কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে এরূপ ঘটনাজালে পরিবেষ্টিত হইতে হয়, যে ইচ্ছার প্রতিকূলেও তাঁহাকে ঘটনাস্রোতে শরীর ঢালিয়া দিতে হয়। আমাদের নায়ককেও তাহাই করিতে হইয়াছিল; কিন্তু "উদয়মুখী প্রতিভার নিত্য-বিদ্বেষিণী ঈর্ষা" তদীয় অনিষ্ট সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন লোলুপ ক্রূরমতি জয়চন্দ্র সঞ্চিত অভিলাষপরাঙ্মুখ হইয়া পৃথ্বীর ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন; অসূয়াপরবশ হইয়া তাঁহার নানারূপ দুর্নাম রটনা করিতে লাগিলেন; কিছু দিনের মধ্যে দিল্লীর অধীন ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্বাধীন ভূপতিবর্গ পৃথ্বীরাজের ভয়ানক শত্রু হইয়া উঠিলেন। জয়চন্দ্রের মন্ত্রণায় পত্তন আনৃহালরবার রাজা ও মন্দরের পুরিহর বংশীয় রাজারা পৃথ্বীর অধীনতা অস্বীকার করিলেন। এই সময়ে হিন্দু ভূপতিগণ দুইটি দলে বিভক্ত হইলেন।

† Child of circumstances.

লৌহ-দৃঢ়-কলেবর পত্তনেশ্বর ভোলা-ভীম দেব; ধ্রুবতারাসদৃশ সমরে অটল প্রমরাবংশাবতংশ জীতমাল; দিল্লী-বিপক্ষদলের নিকট করগ্রাহী মেয়োরাধিপ সমর সিংহ ও মন্দরাধীশ্বর মাকুকুল-পতি নির্ভীক মহামানী নেহার রাও জয়চন্দ্রের পক্ষ। চিতোর, নাগোর, সিন্ধু, জলবৎ, পেশোয়ার, লাহোর, কাজারা, কাশী, প্রয়াগ, ও দেবগড় প্রদেশসমূহের অধিপতিগণ পৃথ্বীরাজের পক্ষ। সিমারের রাজারাও ভয়ে পৃথ্বীরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তম্মধ্যে বীরকেশরী যোগীন্দ্র চিতোরাধিপতির কিঞ্চিৎ বিবরণ এই স্থলে বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক।

১২০৬ খ্রীস্টিয় শাকে সমরশায়ী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কুলদেবতা মহাদেবের পরমভক্ত ছিলেন। জনকরাজর্ষির ন্যায় শিরে জটাজুট, গ্রীবায় কমল-পুষ্পবীজমালা; ও কটীতটে রক্তাম্বর ধারণ করিতেন। এদিকে সমরে অসম সাহস, অপ্রতিমেয় ধৈর্য্য ও অদ্ভুত নৈপুণ্য ছিল, এবং মন্ত্রণায় পরিণামদর্শিতা, প্রাজ্ঞতা, ও কৌশল ছিল। উদ্দীপনাবিষয়ে প্রধানবাগ্মী, আচরণে পরমধার্ম্মিক ও সভ্য ছিলেন। স্বীয় প্রজা ও অধীনবর্গের যার পর নাই অনুরাগ-ভাজন ছিলেন। সমরশায়ী পৃথ্বীরাজের ভগিনীকে পরিণয় করেন; এবং তাঁহার সহিত ইহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য ও বন্ধুতা ছিল। পৃথু ইহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, এবং ইহার পরামর্শ ভিন্ন কোন কর্ম্ম করিতেন না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে মন্দরাধিপ পুরিহর (বা, মাক) বংশোদ্ভব নেহাররাও জয়চন্দ্রের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। পুরিহর বংশীয়েরা তুমার ও চোহান বংশীয়দিগের করদ প্রজা ছিলেন। নেহার জয়চন্দ্রের কুমন্ত্রণায় বার্ষিক কর প্রদানে বিরত ও স্বাধীন হইতে উদ্যত হন। মহাবীর পৃথ্বীরায় অচিরে তদীয় গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া নিয়মিত কর প্রদানে বাধ্য করিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে কাটীরাজপুতেরা যুদ্ধ বিষয়ে অতি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইহারা পৃথু ও জয়চন্দ্রের অধীনে থাকিয়া বহুযুদ্ধ করে। ঝালার রাজপুতেরাও উভয় পক্ষেই যোগ দেয়। পৃথু দর বা দদ নামা ঝালার রাজাকে সমরে পরাভূত করিয়া তদ্দেশে এক কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন। ফলতঃ কিছুদিনের মধ্যে মহাবীর অথচ মন্ত্রণাকুশল পৃথ্বীরাজ সমস্ত রাজপুতদিগকে একপ্রকার বশতাপন্ন করেন। কেহ ভয়ে, কেহ মৈত্রিতে, কেহবা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, তদীয় প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। পরিশেষে কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্র ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। এই জয়চন্দ্রের সহিত ক্রমাগত কলহে উভয় পক্ষ হীনবল হইয়া পড়ে, সেই সুযোগে ভারতের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

বায়েনার দাহিম নামক রাজার দুই

কন্যা ও তিন পুত্র ছিল। এক কন্যাকে পৃথ্বীরাজ বিবাহ করেন, এই কন্যার নাম পৃথা। অপর কন্যা মেওয়ারের রাজা বিবাহ করেন। চাঁদ কবি কহেন যে, পৃথার যৌতুকস্বরূপ দিল্লীশ্বর আটজন পরম রূপবতী সখী, ত্রিষষ্ঠীটি দাসী, পারস্য দেশজাত একশত অশ্ব, দুইটি গজ, দশটি চর্ম্ম, ও একটি স্বর্ণরৌপ্যখচিত বহুমূল্য শয্যা প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত পৃথাকে কাষ্ঠনির্ম্মিত শত পুত্তলিকা, শত রথ, ও শত স্বর্ণমুদ্রা প্রদত্ত হয়। কিন্তু দাহিমতনয়ত্রয়কে সহায় পাইয়া দিল্লীশ্বরের যে মহোপকার হয়, তাহার সহিত তুলনায় এসকল বহুমূল্যরত্ন অতি অকিঞ্চিৎকর। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কায়মসকে পৃথু প্রধান সচিবের পদে নিযুক্ত করেন; ইনি মন্ত্রণায় বৃহস্পতিতুল্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় যে অন্যায়রূপে স্বীয় পত্নীর সতিত্বের উপর সন্দেহ হওয়াতে অকালে আত্মহত্যা করেন। পুন্দির নামা দ্বিতীয় ভ্রাতা একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। ইনি প্রথমে রাজসমীপে অমাত্য রূপে নিযুক্ত থাকেন, পরে লাহোরের শাসনকর্তৃত্ব পদে বরিত হন। ইহার সহিতই সাহাবুদ্দিনের প্রথম যুদ্ধ হয়, এবং সেই যুদ্ধেই ইনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ চাঁদরাও থানেশ্বরের যুদ্ধে প্রধান সেনানী ছিলেন, ইহার বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। মুসলমানেরা ইহাকে খাণ্ডীরাও বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং ফেরেস্তা ইহার শৌর্য্য বীর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সাহাবুদ্দিনের সহিত সমরই পৃথু-নাটকের শেষ অঙ্ক। তাহার অভিনয়ের পূর্ব্বে পৃথ্বীর জীবনচরিত সম্বন্ধে আমরা আরো দুই একটি বিবরণের উল্লেখ করিব। পৃথুর সহিত জয়চন্দ্রের মনোবাদের প্রথম কারণ পৃথুর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ ও অচির উন্নতি। ইহার যথাযথ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। নাগোরকোটস্থ প্রভূত সঞ্চিত ধনলাভ দ্বিতীয় কারণ; রাজসূয়যজ্ঞে পৃথ্বীরাজের অনাগমন তৃতীয় কারণ; এবং পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চন্দ্র-দুহিতার পরিণয় দিতে অসম্মতি চতুর্থ কারণ। আমরা ক্রমে এই তিনটি কারণের সংক্ষেপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

নাগরকোটনগরে পূর্ব্বতম কোন নৃপতির সঞ্চিত সপ্তলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা নিহিত ছিল। পৃথ্বীরাজ তাহা হস্তগত করিতে বাসনা করেন। কিন্তু জয়চন্দ্র যবনরাজ সাহাবুদ্দিন ও পত্তনরাজ ভীমদেবকে সহায় করিয়া তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে চেষ্টা করেন। তখন দিল্লীশ্বর স্বীয় কুটুম্ব ও সচিব পুন্দিরকে চিতোরনগরে দূত স্বরূপ প্রেরণ করেন, এবং সমরশায়ীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। সমরশায়ী স্বীয় প্রিয়তম তনয় কর্ণের হস্তে রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া পৃথ্বীরাজের সাহায্যার্থ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করেন। প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে থাকিতে পৃ-

থ্বীরাজ অমাত্যবর্গসহ অগ্রসর হইয়া সাদরে সমরশায়ীকে গ্রহণ করেন। উভয়ে মন্ত্রণাপূর্ব্বক এই স্থির করিলেন যে পৃথ্বীরাজ ভীমদেবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন, সমরশায়ী সাহাবুদ্দিন ও জয়চন্দ্রের প্রতিকূলে গমন করিবেন। এই মন্ত্রণার পর সমরশায়ী নাগরকোটে উপস্থিত হইয়া প্রবল শত্রুদ্বয়ের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কোন পক্ষেই জয় পরাজয়ের সম্ভাবনা কিছু দৃষ্টহইল না। ইতিমধ্যে পৃথ্বীরাজ ভীমদেবকে পরাস্ত করিয়া নাগরকোটে যাইয়া সমরশায়ীর অনুবল হইলেন। প্রজ্বলিত ভীষণ দাবানলে প্রবল-প্রভঞ্জনের সংযোগ হইল; আর কার সাধ্য যে সে অনলপ্রবাহের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে? জয়চন্দ্র ও সাহাবুদ্দিন সত্বরই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়নপরায়ণ হইলেন। নাগর কোটের বিপুল সম্পত্তি বিজয়িদিগের হস্তগত হইল; কিন্তু সমরশায়ী তাহার কপর্দ্দক ও স্পর্শ করিলেন না, সকলই পৃথুকে অর্পণপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

দ্বিতীয়তঃ জয়চন্দ্রের অনঙ্গমুঞ্জরী নামে এক পরমরূপবতী দুহিতা ছিল। কন্যা বয়স্থা হইল, কিন্তু মনোমত বর জুটে না। তখন রাজসূয়যজ্ঞব্যাপদেশে পাত্র নির্ব্বাচন করিতে মনস্থ করিলেন। সেই মহাযাগের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রণ পাইয়া দিগ্ দিগন্তর হইতে ভূপতিবৃন্দ কান্যকুব্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেবল জয়চন্দ্রের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া পৃথ্বীরাজ তথায় গমন করিলেন না। এই ব্যাপারের নিয়ম এই যে হোমাঙ্গের সমস্ত কার্য্য মুকুটধারিদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়া প্রয়োজন। পৃথ্বীরাজের অনুপস্থিতিনিবন্ধন হোমের অঙ্গহানির আশঙ্কা হইল। পরে পণ্ডিত দিগের ব্যবস্থা লইয়া পৃথ্বীরাজের এক স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইলেন; এবং তাঁহার উপর জাতক্রোধ বশতঃ তাঁহাকে দ্বারবানের স্থানীয় করিয়া যজ্ঞসভার দ্বারে স্থাপন করাইলেন। লোকপরম্পরায় এই সংবাদ পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি শ্রবণমাত্র ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া সসৈন্যে কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বীরকেশরী দিল্লীশ্বরের হস্তে জম্বুকোপম জয়চন্দ্র শীঘ্রই পরাজিত ও হতমান হইলেন। দ্বারস্থিত কাঞ্চন-প্রতিমা লইয়া পৃথ্বীরাজ জয়োল্লাসে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ অঙ্গহীন হইয়া কোনমতে সমাপ্ত হইল; পৃথ্বীরাজের প্রতি জয়চন্দ্রের বিদ্বেষ ভাব অধিকতর প্রবল হইল। বিজয়ী পৃথু যখন পরাস্ত নৃপতিবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া হোমপ্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হইয়া স্বদেশগমননিমিত্ত স্বীয় সৈন্যদিগকে অনুমতি করিতেছেন, এমন সময়ে তদীয় মস্তকে পার্শ্ববর্ত্তী প্রাসাদ হইতে পুষ্পবৃষ্টি

হইল; পৃথু উর্দ্ধভাগে নয়নপাত করিলেন, অমনি এক অনুপমা সুন্দরীর চক্ষে আপন চক্ষু মিলিত হইল।

জয়চন্দ্র যে অভিপ্রায়ে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন তাহা নিষ্ফল হইল; নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গমধ্যে অনঙ্গমুঞ্জরীর মনোমত বর মিলিল না। হোম-প্রাঙ্গনে যে বিজয়ী যুবকের প্রতি নয়ন আকৃষ্ট হইয়াছিল, মন তাঁহার পশ্চাতে গিয়াছে,মনের মত বরকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন, অন্যবরে মন আর যাইবে কেন? যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, জয়চন্দ্র একদা দুঃখিত হইয়া তনয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কাহাকে পতিত্বে বরণ করিবে? অনঙ্গমুঞ্জরী প্রথমতঃ কোনও উত্তর করিলেন না। পরিশেষে পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয় অতিক্রম করিতে নাপারিয়া যে একটি নাম করিলেন, তাহা শুনিবামাত্র জয়চন্দ্রের আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া গেল। চিরশত্রু পৃথ্বীরাজকে কন্যাসম্প্রদান অপেক্ষা তাহাকে জলে নিমজ্জনও শ্রেয়ঃ। দুহিতাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; অনঙ্গমুঞ্জরী পিতৃ-নিষ্কাষিতা হইয়া কোন আত্মীয়ের গৃহে রহিলেন। কিছু দিন মধ্যে এই কথা পৃথুরায়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পত্রসহ চন্দ্রভাটকে কান্যকুব্জে প্রেরণ করিলেন। তিনি জানিতেন প্রাণসত্ত্বে জয়চন্দ্র এ পরিণয়ে সম্মত হইবেন না, অতএব স্বদলবলে স্বয়ংও দূতের অনুগমন করিলেন। এবং জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া অনঙ্গমুঞ্জরীকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। মহাসমারোহে পরিণয় সমাধা হইল। বিধাতার চক্র বুঝাভার। কোন দুর্লক্ষ্য সূত্রে কি ঘটে লোকে তাহা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারে না।

নবপ্রণয়িণীর রূপলাবণ্যে বীরকুলর্ষভ প্রজারঞ্জক পৃথ্বীরাজ মোহিত হইয়া শৌর্য্য বীর্য্য বিস্মৃত হইলেন, প্রজাপালন ও রাজ্যশাসনে বিরত হইলেন। অমাত্যবর্গের হস্তে সমস্ত কার্য্য ন্যস্ত করিয়া সমস্ত দিন অন্তঃপুরেই অতিবাহিত করিতেন। রাজকার্য্যে নৃপতির ঈদৃশ ঔদাস্যাবলোকনে রাজ্যমধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। পশ্চিমে যে বিতস্তিপ্রমাণ মেঘ দেখা দিয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে বৃহদাকার ধারণ পূর্ব্বক ঘোরতর ঘনঘটারূপে, প্রচণ্ড প্রভঞ্জনরূপে ভারতাকাশে সহসা উদয় হইল। ভারত-শত্রু সাহাবুদ্দিন-যবন ভারতবক্ষে দিগ্বিজয়িরূপে পদার্পণ করিল। ইতিপূর্ব্বেও একদা নাগরকোট নগরে উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে অন্যভাবে। অর্থলোভে জয়চন্দ্রের মন্ত্রণায় আসিয়াছিল, অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেও তখনই জানিয়া যায় যে পৃথুও জয়চন্দ্রের গৃহবিবাদে ভারত ক্রমে দুর্ব্বল ও বীরশূন্য হইতেছে। এতদিন ধূর্ত্ত শৃগালের ন্যায় সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল, এইক্ষণ কুলাঙ্গার জয়চন্দ্রের আম-

রূপে ভারতবিজয় সঙ্কল্প করিয়া উপস্থিত হইল।

যে গৃহ-বিবাদে দশাননের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল; যে গৃহ-বিবাদে কুরুকুল নির্ম্মূল হইয়াছিল; পুনশ্চ ভারতে সেই সাজ্যাতিক রোগ যে দিন উপস্থিত হইল, সেইদিনেই ভারতবাসী হিন্দুগণের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। সেই দিনই জানা কর্ত্তব্য ছিল যে সেই ভয়ানক রোগ চরমে কি শোচনীয় ফল প্রসব করিবে। কিন্তু হায়! কাহারই চৈতন্য হয় নাই! সেই পাপে অদ্য পবিত্র ভারতবক্ষে ম্লেচ্ছের পদাঘাত! কুলাঙ্গার জয়চন্দ্র, কি করিলে? এ পাপের ভোগ কি তোমায় ভোগিতে হইবেনা? কিন্তু, আমরা কি লিখিতে কি লিখিতেছি? পাঠক, মার্জ্জনা কর, শুন তৎপর কি হইল।

সাহাবুদ্দিন লাহোরের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, তত্রত্য শাসনকর্ত্তা মহাবীর পুন্দির সসৈন্যে তদীয় পথাবরোধ করিলেন। ঘোরতর সংগ্রামের পর পুন্দির নিহত হইল, বিজয়োৎফুল্ল যবন সেনা "আল্লাহু আকবর"! ঘোর রণনাদে দিগন্ত কম্পিত করিয়া সগর্ব্বে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই বিবরণ পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইল, কিন্তু তাহাতেও তিনি বিপদ অনুভব করিতে পারিলেন না। সাহাবুদ্দিন দিল্লির সীমায় পদার্পণ করিলেন, তখনও পৃথু মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত। ক্রমে থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী নারায়ণ গ্রামে * উপস্থিত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিল। পৃথ্বীরাজের প্রিয়পাত্র চন্দ্র ভাট যাইয়া এই কুসংবাদ তাঁহাকে প্রদান করিল। তখন নিদ্রিত শার্দ্দূলের ন্যায় শূর-সিংহ পৃথ্বীরাজ গর্জ্জিয়া উঠিলেন। ইঙ্গিত মাত্র ঘোর রোলে রণশঙ্খ ও রণভেরী বাজিয়া উঠিল; নানাদিকে অধীনরাজবর্গকে আহ্বান করিতে দূত প্রেরিত হইল; শিক্ষিত সৈন্যদলের আস্ফালনে নগর টলমল করিতে লাগিল। তখন রাজপুতনায় সৈনিক-শাসন-প্রথা † প্রচলিত ছিল, সুতরাং দেশে যত লোক, সকলেই সৈনিক, সকলেই সমর-কুশল, সকলেই সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত। সুতরাং দুই এক দিনে লক্ষাধিক সৈন্য সংগ্রহ হইল; এবং ক্রমেং অধীন নৃপতিবর্গও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৃথুও জয়চন্দ্রের গৃহবিবাদে যাঁহারা পৃথ্বীরাজের বিপক্ষ ছিলেন, ভারতের সাধারণ শত্রুদমন করিতে হইবে বলিয়া, তাঁহারা শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া একত্রে বন্ধুভাবে মিলিত হইলেন। আহা! ভারতের সে এক সুখের দিন গিয়াছে!

চিত্ররথ গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক দুর্য্যোধন স-

* বোধহয় এলফিনিস্টোন প্রভৃতি ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরা ইহাকেই "টিরোরি" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

† Feudal system. টড্ সাহেব কৃত রাজস্থানের ইতিহাস দেখ।

গ্রীক বন্দীকৃত হইলে, যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য ভীমার্জ্জুনকে আদেশ করিলেন। ভীমার্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, " মহারাজ, আপনকার এ কিরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি, আমরা বুঝিতে পারিনা। যে শত্রু আমাদিগকে এত কষ্ট ও এত লাঞ্ছনা দিল, সে বিনষ্ট হইলেত পরম আহ্লাদের বিষয়। তাহাকে কিজন্য উদ্ধার করিতে যাইব ?" উদারচরিত্রপ্রশস্তমনা ধর্ম্মতনয় সোদরদ্বয়কে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—

" কহিলা যতেক পার্থ অন্যথা নাকরি।
সে মম পরম শত্রু আমি তার অরি॥
আত্ম পক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করিব যখন।
তারা শত সোদর আমরা পঞ্চজন॥
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত।
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর শত॥"

কাশীরাম দাস। *

ধন্য যুধিষ্ঠির! ধন্য আর্য্যসন্তান! ধন্য ভারতবর্ষ! আহা! এরূপ উদার ভাব এইক্ষণ আর দেখা যায় না। তাহাতেই ভারতের এতুর্দ্দশা। জয়চন্দ্রের সহিত আত্ম-কলহে পৃথ্বীরাজের অসংখ্য সৈন্য নাশ হইয়াছিল; ১০৮ জন সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে মাত্র ৬৪ জন জীবিত ছিল। যাহা হউক, তথাপি দ্বিলক্ষ পদাতী, দ্বিলক্ষ অশ্বারোহী, এবং তিনসহস্র সমর-মাতঙ্গ লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। চিতোরাধিপ সমরশায়ী প্রধান সেনানীপদে বরিত হইলেন। তিন দিবস উভয় পক্ষ পরস্পরকে কিছুই বলিলেন না। চতুর্থ দিবস প্রত্যুষে যুদ্ধারম্ভ হইল।

সাহাবুদ্দিন স্বীয় সৈন্যের পুরোভাগে অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশন পূর্ব্বক, তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, " বীরগণ! তোমরা জয়লোলুপ হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এই কাফেরের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। তোমরা পঞ্জাব জয় করিয়াছ, লাহোর জয় করিয়াছ, এবং সিন্ধুদেশও জয় করিয়াছ সত্য; কিন্তু সে সকল স্থান তোমাদের স্বদেশ মধ্যেই বলিতে হইবে। এবং যেসকল বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, তাহারাও আমাদের সমধর্ম্মী এবং একইরূপ রণকৌশলসম্পন্ন। অদ্য তোমরা প্রবল সিন্ধু নদের পর পারে উপস্থিত হইয়াছ, পৃষ্ঠদেশে খরস্রোতা কাগার নদী বহিতেছে; যদি তোমরা কাফের সৈন্য দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়নে চেষ্টা কর, পলায়ন করিতে পারিবে না। কাগার তোমাদের পথ রোধ করিবে, এবং কাফেরের হস্তে একজনও রক্ষা পাইবে না। যুদ্ধ করিয়া যদি পরাভূত হও, তাহাতেও যে ফল, যুদ্ধ না করিয়া প্রস্থানপরায়ণ হইলেও সেই ফল। সুতরাং শৃগালের ন্যায় প্রস্থান না করিয়া সিংহ-বিক্রমে প্রাণপণে যুদ্ধ করাই আ-

* " প্রাচীন রোমের গীতি " নামক লর্ডমেকলের প্রথম প্রবন্ধের চরমভাগ দেখ।

মাদের উচিত। জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই, যদি আল্লার দোওয়ায় জয় লাভ করিতে পার, তবে এই সম্মুখস্থিত বিশাল রাজ্য, ও ভারতের মণিকাঞ্চন তোমাদিগেরই। আমি তোমাদিগের প্রভু বটি, কিন্তু এসকল আমার হইলে তোমরা যথাযোগ্য অংশলাভে কেহই বঞ্চিত হইবে না। আমার পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই যুদ্ধে জয়ী হইলে তোমাদের পরমারাধ্য মুসলমান ধর্ম্মেরই জয়। এই ধর্ম্ম-যুদ্ধে যদি প্রাণও যায়, তথাপি স্বর্গে যাইয়া সুরমা-নয়না পৈরীদিগের সহবাসে থাকিয়া শত্রু-করোটীতে সুস্বাদু সুরাপান করিতে পারিবে। মনোহর আলয়ে বাস ; সুমিস্ট খাদ্য ; শত শত সুন্দরী রমণী ; এসকলই অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারিবে।* এপৃথিবীর সুখ অল্পকাল স্থায়ী, কিন্তু স্বর্গীয় সুখ অনন্তকাল স্থায়ী। অতএব এ যুদ্ধের মৃত্যুও মঙ্গল। সুতরাং সাহসকর, অগ্রসর হও, শত্রুমুণ্ড চ্ছেদন কর।" ইহা কহিয়া শরাসন হইতে একটি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে সরিয়া গেলেন। শ্মশ্রুধারী যবন-অশ্বারোহীগণ "আল্লাহু আকবর!" বলিয়া গগন কাঁপাইয়া নক্ষত্রবেগে শত্রুর অভিমুখে ধাবিত হইল।

পৃথ্বীরাজ স্বীয় সৈন্যগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। দক্ষিণ-পার্শ্বিক সৈন্যের ভার স্বহস্তে রাখিলেন, বাম পার্শ্ব মহাবীর চাঁদরাওয়ের হস্তে ন্যস্ত করিলেন ; অধিকাংশ-অশ্বারোহী-সম্বলিত সৈন্যের মূলভাগ বীরকুলচূড়ামণি সমরে অটল সমরশায়ীর অধীনে ছিল। নির্দ্ধারিত হইল যে সমরশায়ী বিপক্ষ সেনার কেন্দ্রস্থান লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইবেন, এবং সাহাবুদ্দিন ও অপরাপর মহম্মদীয় সেনাপতিদিগকে কেন্দ্র রক্ষা করিতে নিযুক্ত রাখিবেন। ঠিক সেই সময়ে পৃথ্বীরাজ ও চাঁদরাও বিপক্ষের উভয় পার্শ্ব আক্রমণ করিবেন। এইরূপ সুব্যবস্থা করিয়া পৃথ্বীরাজ এক ভীষণ সমর-মাতঙ্গে আরোহণ করিলেন। এবং অসিচর্ম্ম তিনবার তাড়িতবেগে দোলায়মান করিয়া সৈন্যগণের চিত্তাকর্ষণ করিলেন। সকলই নীরব, নিস্তব্ধ, স্থির ও অটল। তখন জলদগম্ভীর শ্রুতিসুখকর অথচ চিত্ত-উত্তেজী স্বরে কহিলেন "রাজপুতকুল ললামবীরবৃন্দ! তোমরা প্রাতঃস্মরণীয় বাপ্পারাও ও মহাবীর খুমানের বংশধর, এই কথাটি যেন স্মরণ থাকে। দুরাত্মা ম্লেচ্ছদুরাচার একবার নাগরকোটে তোমাদের অসির তেজ অনুভব করিয়াও পুনরায় পতঙ্গবৎ জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইতে আসিয়াছে। এবার বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া তোমাদিগকে পরাস্ত করিতে ; তোমাদিগের স্ত্রীপুত্রকে অনাথ করিতে ; স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী জন্মভূমিকে জয় করিতে আসিয়াছে ! একি সামান্য আস্পর্দ্ধা ! বীরপ্রসূ রাজ-

* সেল্‌সকোরাণ ৭০, ১৪০, ১৪৯, ১৫১, ২৭৮, ৪৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

স্থানে যবনের পদার্পণ। আশ্চর্য্য,বেনমাতা রাক্ষসী ইহাদিগকে এখনও গ্রাস করেন নাই। আশ্চর্য্য, কুলদেবতা একলিঙ্গ মহাদেব স্বীয় সর্ব্বসংহারক শূলে ইহাদিগকে নির্ম্মূল করেন নাই! দেবতারা দেখিবেন রাজস্থানে বীর আছে কি না? তাঁহারা তোমাদের শূরত্বের পরীক্ষা করিতেছেন? তবেকি আর এখনও নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে? আর এক মুহূর্ত্তও কি পবিত্রা জন্মভূমিকে ম্লেচ্ছপাদরেণুতে কলঙ্কিত দেখিবে? স্বীয় স্ত্রী পুত্রদিগকে ভীকরাও রক্ষা করে। কাপুরুষেরাও স্বীয় কুলদেবতাদিগকে রক্ষা করে। আর অগ্নিকুলসম্ভূত দেবসন্তান রাজপুত কি ভীরু হইতেও অধম? বাপ্পারাওয়ের সঙ্গে সঙ্গে খুমানের সঙ্গে সঙ্গেই কি রাজস্থানের বীরত্ব লোপ পাইয়াছে? পৃথ্বীরাজের শরীরে প্রাণ থাকিতে, তোমাদিগের ন্যায় সমরবিজয়ী বীরকুল তাঁহার সহায় থাকিতে সে আশঙ্কা নাই। ঐ দেখ শত্রুর তীক্ষ্ণশর শন্ শন্ করিয়া আসিতেছে, আর বিলম্ব কেন? দৃঢ় মুষ্টিতে অসি ধারণ কর; কটীবন্ধন কর; অগ্রসর হও। জয় অসুর-নাশিনী বেনমাতা! জয় হর হর একলিঙ্গ।* " ইহা বলিয়া পৃথ্বীরাজ হুঙ্কার ছাড়িলেন, সেই হুঙ্কারের সহিত সহস্র সহস্র বীরগর্জ্জন মিশিল, রণভেরী ঘোররোলে বাজিল। চতুর্দ্দিকে "জয় অসুর নাশিনী বেনমাতা," "জয় হর হর একলিঙ্গ" ভয়ঙ্কর রণনিনাদ উত্থিত হইল, অসি ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল, দিঙ্মণ্ডল ঘোর কোলাহলে পরিপূর্ণ। হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষারব, পদাতিক ও অশ্বারোহীদিগের আস্ফালনে যুগপ্রলয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক ধূলী ও কলম্বকুলে আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে কেবল "মার্ মার্" " কাট্ কাট্" শব্দ শুনা যাইতে লাগিল, কিন্তু কয়েক দণ্ড আর কিছুই শ্রবণ বা দর্শন হইল না।

পূর্ব্বনির্দ্দেশ মতে সমরশায়ী শত্রু সৈন্যের কেন্দ্রভাগ, ও পৃথ্বীরাজ ও চাঁদরাও উভয় পার্শ্ব যুগপৎ আক্রমণ করিলেন। সমর-মাতঙ্গ ও রাজপুত সেনার বিক্রম দেখিয়া মহম্মদীয় পার্শ্বিক সৈন্যেরা ভীত হইল; এবং ক্রমে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কেন্দ্রস্থ সে তখন সাহাবুদ্দীন ও সমরশায়ীতে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে। বহুক্ষণ পরে সাহাবুদ্দিন সমরশায়ীর উপর এরূপ বেগে বর্ষা-

* আমরা এস্থলে চরিতাখ্যায়কদিগের পদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কবিদিগের অনুসরণ করিয়াছি। ডাক্তর ফ্রিমেন সেন্‌লাকের যুদ্ধের পূর্ব্বে উইলিয়ম ও হেরল্‌ডের মুখে যেরূপ বক্তৃতা দিয়াছেন, (নর্ম্মানকঙ্কোয়েষ্ট ৩ বালাম ৪৫৫ ও ৪৬৮ পৃষ্ঠা) আমরা তাহারই অনুকরণ করিয়াছি। বোধ হয় ইহাতে ঐতিহাসিক সত্যের কোন অপমান হয় নাই। ইহাতে আমরা যদি দোষী হই, তবে অনেক চরিতাখ্যায়ক ও ঐতিহাসিকই দোষী।

ঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতেই তাঁহার প্রাণনাশ হইত, সহসা তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া মহাবীর চাঁদরাও অগ্রসর হইলেন। তাঁহার রণকৌশলে মহম্মদীয় সেনারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তিনি এরূপ লঘুহস্তে অসিচালন করিতে লাগিলেন যে, এক এক আঘাতে এক এক জনের মুণ্ড ভূমিসাৎ করিতে লাগিলেন। এমন সময় দক্ষিণ পার্শ্ব পরাস্ত করিয়া পৃথ্বীরাজ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু চাঁদরাওয়ের অদ্ভূত যুদ্ধকৌশল দেখিয়া পৃথ্বী ও সমরশায়ী নিশ্চেস্টভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে এবং একএকবার উৎসাহ দিতে লাগিলেন। নৃপতিও মহাবীর সমরশায়ীর উৎসাহ পাইয়া দ্বিগুণিত বিক্রমে চাঁদরাও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। একজন বীরের তেজে স্বীয় বহু সৈন্যের নাশ দেখিয়া সাহাবুদ্দিন চাঁদরাওয়ের প্রতি এরূপ বেগে আঘাত করিলেন যে, ছিন্ন শির হইয়া সেই শূরশ্রেষ্ঠ রণভূমিতে পতিত হইলেন। প্রিয়তম সেনানীর মৃত্যু দেখিয়া শোকে ও ক্রোধে পৃথ্বীরায় স্বয়ং সাহাবুদ্দিনকে আক্রমণ করিলেন। দুই এক মুহুর্ত্ত মধ্যে তদীয় বিশাল খড়্গের আঘাতে যবনরাজ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন। ভারতের নিতান্ত কপাল ভাঙ্গিয়াছে, ভারতের সর্ব্বনাশ হইবে, তাই বলিয়াই কেবল তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইলনা। স্বীয় সৈন্যেরা অচেতন সাহাবুদ্দিনকে ফেলাইয়া যুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া মেষপালের ন্যায় পলায়নপরায়ণ হইল। সমরশায়ী বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অনুসরণপুর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থের সীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। লজ্জা ও ক্ষোভে সাহাবুদ্দিন অবশিষ্ট কতিপয় সৈন্য লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

থানেশ্বর সমরক্ষেত্র হইতে পরাস্ত ও হতমান হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর সাহাবুদ্দিন আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু সে অপমান দগ্ধ অঙ্গারবৎ তদীয় হৃদয়ে ধক্ ধক্ করিয়া সর্ব্বদা জ্বলিত। ফেরেস্তা কহেন "একদিনের তরে তিনি সুখে নিদ্রা যান নাই; এবং জাগ্রত হইয়া ও কেবল শোকে ও লজ্জায় দগ্ধ হইতেন।" * যে সকল সৈন্য ও সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে নানামতে অপমান করেন এবং লাঞ্ছনা দিয়া অনেককে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দেন। এইরূপে দুই বৎসর গত হইল।

এই সময়মধ্যে তুরস্ক, তাজিক, আফগান প্রভৃতি সুশিক্ষিত ১২০,০০০ অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক সংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয়বার ভারতাভিমুখে যাত্রাকরিলেন। এই সৈন্যদিগের মধ্যে অনেকের উষ্ণীষ মণিমুক্তা খচিত, ও বর্ম্ম রজতকাঞ্চনে সুশোভিত ছিল। † দিল্লীশ্বরও

* ব্রিগ্স ফেরেস্তা ১ম বালম ১৭৩ পৃ।

† ঐ। মার্সমেনকৃত ভারত ইতিহাসে ১ম বালম ৩০ পৃ।

সাহাবুদ্দিনের অতিথিসৎকার করিতে অপ্রস্তুত ছিলেন না। সার্দ্ধশত হিন্দু নৃপতি দিল্লীশ্বরের অনুবল হইলেন, সর্ব্বশুদ্ধ তিনলক্ষ অশ্বারোহী, তিন সহস্র সমরমাতঙ্গ, এবং অসংখ্য পদাতি সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার থানেশ্বর সমরক্ষেত্রে কাগার নদীর পুর্ব্বপারে যাইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। ভারতীয় ভূপতিগণের জয় বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস, যবন বলিয়া ভ্রূক্ষেপ নাই। ভাগিরথীর পবিত্র সলিল স্পর্শ করিয়া সকলেই শপথ করিয়াছেন, হয় যুদ্ধে জয়ী হইব, নতুবা প্রাণত্যাগ করিব *। হিন্দু নৃপতিগণ সাহাবুদ্দিনকে বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি তোমার স্বীয় জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মিয়া থাকে, তথাপি এতগুলি লোকের পরিবারদিগকে কেন অনর্থক অনাথ করিবে? যদি প্রস্থান করিতে চাও, পথ পরিষ্কার আছে। যদি নিতান্তই মরিতে ইচ্ছাহইয়া থাকে তবে অগ্রসর হও। আমরা দেবতার নাম করিয়া শপথ করিয়াছি, রজনীমধ্যে প্রস্থান নাকরিলে নিশি অবসান মাত্র শত্রুব্যূহ-ভেদী সমর মাতঙ্গ, আহবামোদে-উন্মত্ত যুদ্ধাশ্ব, এবং শোণিত-পিপাসু সৈনিক লইয়া তোমাকে আক্রমণ করিব।* এবং তোমার হতভাগ্য সৈন্যকে পদে দলিত করিব।"*

ধূর্ত্ত যবন যেন এই সগর্ব্ব বাক্যে ভীত হইয়াছে, এই ভাণ করিয়া নম্রভাবে উত্তর করিল, আমি ভ্রাতৃ-আদেশে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি। আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নহে। তবে ভ্রাতার অনুমতি ভিন্ন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারি না। যাহাহউক ভ্রাতার নিকট আপনাদের আদেশ লিখিয়া পাঠাইলাম, উত্তর আসাপর্য্যন্ত যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখিবেন। † এই চাতুরিপূর্ণ উত্তরে হিন্দুরাজগণ আহ্লাদে অধীর হইলেন। দ্বারে কালসর্প রাখিয়া গৃহমধ্যে সুখে সুষুপ্তি সম্ভোগে নিবিষ্ট হইলেন।

মহাসমারোহে ভোজ ও নৃত্য গীতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই নিরস্ত্র, সকলেই আমোদে মত্ত, সকলেই অপ্রস্তুত। নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে ধূর্ত্ত যবন-পতি সসৈন্যে কাগার নদী পার হইয়া অতর্কিত রূপে বিপক্ষ শিবির আক্রমণ করিল। ক্ষণমাত্রে নৃত্য গীত স্থগিত হইয়া শিবির মধ্যে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইল। কিন্তু বহুসংখ্যক সেনানী সেই অল্প সময় মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া শিবির রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ইতিমধ্যে অবশিষ্টেরাও প্রস্তুত হইল। তখন সমস্ত হিন্দুসৈন্য চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া চতুষ্কোণব্যূহ রচনা করিল। সাহাবুদ্দিন ব্যূহ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার এক প্রতারণাপরিপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করিলেন। ব্যূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুসৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে

* মার্সেকৃত ভারতেতিহাস ১৭৫ পৃ।

† এলফিন্‌ষ্টোন ৩১১ পৃ, ও মার্সে ১৭৫পৃ।

প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা প্রস্থানের ভাণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পশ্চাৎ ছুটিয়া যাইতে লাগিল। হতবুদ্ধি হিন্দুসৈন্যগণ সেই দুরভিসন্ধির মর্ম্মভেদ করিতে না পারিয়া ব্যূহ ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। রণজয়ুক সাহাবুদ্দিন এই অবসরে স্বীয় শরীররক্ষক বর্ম্মধারী দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে সেই ছত্রভঙ্গ হিন্দু সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। এইরূপে প্রতারিত হইয়া অধিকাংশ হিন্দুসৈন্য হত নিহত ও বন্দীকৃত হইল; অবশিষ্ট প্রস্থান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। দিল্লীশ্বর স্বয়ং বন্দীকৃত ও হত হইলেন। কিন্তু সেই ভয়ানক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াও চিতোরাধিপ সমরশায়ী ও তদীয় তনয় কল্যাণ বীরের ন্যায় বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া সাহাবুদ্দিনের অধিকাংশ সৈন্যসামন্ত সংহার করেন। অবশেষে স্বীয় অধীনস্থ ত্রয়োদশ সহস্র সৈন্য ও পুত্র সমভিব্যাহারে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া রণভূমিতে বীরশয়নে শায়িত হইলেন।

থানেশ্বরের যুদ্ধের সহিত সেন্‌লাকের যুদ্ধের অনেক বিষয়ে তুলনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ সাহাবুদ্দিনের সহিত উইলিয়ম কঙ্কাররের, পৃথ্বীরাজের সহিত হেরল্‌ডের; পরন্তু সমরশায়ী ও তদীয় তনয় কল্যাণের সহিত গার্থ ও সোয়েনতনয় হেকোর সুন্দর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ গৃহ-বিবাদ, এবং হেরলড্ ও টষ্টিগের পরস্পর কলহে সাক্সনেরা যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া ছিল; পৃথু ও জয়চন্দ্রের আত্মকলহে রাজপুত জাতির ও তদ্রূপ দুর্দ্দশা হয়। তৃতীয়তঃ পোপের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া উইলিয়ম যেরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, এবং হেরল্‌ড তাঁহাকে উচিত স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতেছেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল; সাহাবুদ্দিন ও তদ্রূপ মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতে ও পূর্ব্ব পুরুষ গজাননপতির অধিকৃতস্থান উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ উইলিয়মের সুশিক্ষিত নর্ম্মাণ সৈন্যের সহিত দেশহিতৈষী সাক্সনেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও যেরূপ কিছু করিতে পারিয়াছিলনা; সাহাবুদ্দিনের শিক্ষিত সৈন্যের অগ্রেও রাজপুত সৈন্যগণ সেইরূপ পরাস্ত হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ সেন্‌লাকের যুদ্ধেই যেমন সাক্সনেরা সিংহাসনচ্যুত হন ও ইংলণ্ডে নর্ম্মাণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়; থানেশ্বরের যুদ্ধেও তদ্রূপ স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের ধ্বংশ ও ম্লেচ্ছাধিকারের সূত্র পাত হয়।

আমাদের আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইল। কিন্তু যবনিকাপতনের পূর্ব্বে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন হইতেছে। পৃথ্বীরাজের মৃত্যু হইলে তদীয় পত্নীদ্বয় জ্বলন্ত চিতায় আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুমৃতা হন। সাহাবুদ্দিনকে করপ্রদানে স্বীকৃত হওয়াতে পৃথুর জনৈক পুত্র সিংহাসনে অধি-

ষ্ঠিত হন। কিরূপে জয়চন্দ্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল—তদীয় পাপে ভারতের অপরাপর হিন্দু রাজত্বের কি দশা হইয়াছিল,তাহা ইতিহাসেই বর্ণিত আছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহাতেই কি ভারতবাসীর চক্ষু দান হইয়াছিল ? ইতিহাসই একথার উত্তর প্রদান করিবে।



যবন

" যবন " শব্দের উৎপত্তি কি এবং কোন্ দেশবাসিরাই বা "যবন" নামে অভিহিত হইত,এপর্য্যন্ত ইহার স্থির মীমাংসা কেহই করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির বাস ; তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান হইতে অধিক। "হিন্দু" এই শব্দের মীমাংসা এক প্রকার হইয়াছে। সিন্ধুর অপভ্রংশ ইণ্ডস্ হইতে হিন্দুশব্দের উৎপত্তি। হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে যবনশব্দে অভিহিত করেন। এবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ বলেন "যবন" শব্দের সহিত গ্রীক আওনিয়া (Ionia) শব্দের সৌসাদৃশ্য আছে; অতএব পূর্ব্বে গ্রীক্‌দিগকেই যবন কহিত। কিন্তু এই কথাইযে ঠিক তাহার প্রমাণ কি ?

এবিষয়ের সত্য অনুসন্ধান করা একান্ত দুরূহ কার্য্য। অনুমান আমাদিগের প্রধান সম্বল। কিন্তু অনুমানের উপর নির্ভর করা যুক্তিসিদ্ধ বোধহয় না। প্রথমে যবন শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিতে পারিলে, যবনদিগের আদিমস্থান কোথায়ছিল সহজেই স্থিরকরা যাইবে, এবং তাহাদের আচার ব্যবহার জানিলে অনেক বিষয়ের সত্য আপনিই প্রকাশ হইবে।

(১) ধাতু—যু (মিশ্রিত করা)+ অন—যবন।

" যৌতি মিশ্রয়তি, মিশ্রীভবতি বা জাতিভেদাভাবাদিতি যবনঃ "। যাহাদিগের জাতিভেদ নাই তাহারাই যবন।

তবে কেবল মুসলমান কেন, অনেক জাতিকেই যবন বলা যাইতে পারে।

(২) (Synonymy) সমবাক্য —ম্লেচ্ছ=ম্লিচ্ছ-অ। ম্লিচ্ছ মিশ্রিত করা।

" গোমাংসখাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহুভাষতে। ধর্ম্মাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছইত্যভিধীয়তে ॥ " বৌধায়ন সূত্র।

যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে, বহু ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে এবং যাহাদিগের কোন ধর্ম্মনাই, তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ কহে।

ইংরেজাদি ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিদিগকেওত তবে ম্লেচ্ছবলা যাইতে পারে!

ইহাতে বোধ হইতেছে পূর্ব্বে হিন্দুভিন্ন সমস্ত জাতিকে ম্লেচ্ছ বা যবনশব্দে অভিহিত করিত। কিন্তু এক্ষণে সেই শব্দে কেবল মুসলমানদিগকেই বুঝায়।

(৩) যবনের আদিনিবাস—

(ক) মধ্য আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণপশ্চিম দিকে যবনদেশ। পরাশর।

(খ) যে রেখা লঙ্কাদ্বীপকে দ্বিভাগ করে তাহার ৬০° পশ্চিমে যবনদেশ।

বরাহ মিহির।

(গ) ভারতবর্ষের পশ্চিমে যবনদেশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে কাবুল, টার্টরী, পারস্য, বাক্ট্রিয়া ইত্যাদি দেশ সকল পূর্ব্বে যবনদেশ এবং তত্রত্য অধিবাসিদিগকে যবন কহিত। দেখা যাইতেছে "যবন" শব্দ নূতন নহে। বহু পূর্ব্বকাল হইতে ইহার ব্যবহার আছে। তবে কেবল মুসলমানদিগকে যে যবন বলিত না, তাহা একপ্রকার স্থির নিশ্চয়, যেহেতু মুসলমান জাতির উদয়ের পূর্ব্বহইতে একথা প্রচলিত দৃষ্ট হয়।

(৪) যবনদিগের আচার ব্যবহার—

(ক) "যবনান্ মুণ্ডিতশিরসোঽর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্ প্রলম্বকেশান্ পারদান্ পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধারিণঃ"। বিষ্ণুপুরাণ।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ রচনার কাল নিরূপণ করা অতীব দুরূহ কার্য্য। যদি এখানিকে বহুকালের রচিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে নিঃসন্দেহই মুসলমানদিগকে যবন বুঝায়; কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ পুরাণ গ্রন্থ নহে।

অভিজ্ঞান শকুন্তলায় কালিদাস লিখিয়াছেন—

"এসো বাণাসণ হত্থাহিং জবণীহিং বণপুপ্পমালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি পিঅবঅস্সো।"

দ্বিতীয় অঙ্ক পাঠান্তর।

মহারাজ দুষ্মন্তের পরিচারিকাগণ যবনকন্যা ছিল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে কালিদাস মুসলমানদিগকে যবন বলিয়াছেন। যেহেতু মুসলমানমহিলারা উত্তম নৃত্যকী, এবং প্রায় নৃপতিগণ তাহাদিগকে রাখিতেন।

রঘুবংশে লিখিত আছে, রঘু দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া পারস্যাধিপতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এখানকার স্ত্রীলোকদিগকে কালিদাস যবনী বলিয়াছেন,—

"পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপুংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী॥
যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাব্জানামকালজলদোদয়ঃ॥"

পাণিনীপ্রণীত সিদ্ধান্ত কৌমুদী নামক ব্যাকরণে যবনবর্ণ বুঝাইবার নিমিত্ত একটি সূত্র দেওয়া হইয়াছে। যথা—

ইন্দ্র বরুণ ভব সর্ব রুদ্র মৃড় হিমারণ্য যব যবন মাতুলাচার্য্যাণ আনুক্, (যবনাৎ লি প্যাম্) যবনানাং লিপির্যবনানী। । ১। ৪। ৪৬।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যবনগণ হিন্দুদিগের চিরপরিচিত।

ভোজরাজসভাসদ কবি কালিদাস প্রণীত (শকুন্তলারচয়িতা কালিদাস নহে) মালবিকাগ্নিমিত্র গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যে মহারাজ পুষ্পমিত্র অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্ব সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া অপরকূলে উপস্থিত হইলে একদল যবন তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

যদিও ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত যে গ্রিক আইওনিয়া শব্দ হইতে যবন শব্দের উৎপত্তি, কিন্তু সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণ একথা বিশ্বাস করেন না। পুরাণে ইহার যেরূপ মীমাংসা আছে তাহাই তাঁহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় বৈবস্বতমনুপুত্র পিসধ্র তাঁহার গুরুর গাভী হরণ করেন এবং এই নিমিত্ত তাঁহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যদিও তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ বেদবিধি অনুসারে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, তথাপি তাহাদিগকে যবন বলিত।

একদা সগররাজা হৈহৈ তালজঙ্ঘদিগকে সমরে পরাস্ত করেন এবং ঘোর অবমাননার চিহ্নস্বরূপ তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া বাড়ী হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। যথা—

" অর্দ্ধমুণ্ডশিরসঃ কাংশ্চিৎ সর্ব্বমুণ্ডান্ থাপরান্। কাংশ্চিৎ শ্মশ্রুধরান্ কাংশ্চিৎ মুক্তকচ্ছান্যথাপরান্॥ "

এস্থলে প্রতিপন্ন হইতেছে স্বজাতিচ্যুত ব্যক্তিদিগকে যবন কহিত।

মহাভারতে দেখিতে পাই যবনজাতি বশিষ্ঠধেনু নন্দিনীর কায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

কিন্তু যদ্যপি আইওনিয়া দেবী, মহাভারত এবং অন্যান্য সংস্কৃতগ্রন্থ যাহাতে যবন শব্দের উল্লেখ আছে তাহাদের কাল নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে এবিষয়ের মীমাংসা সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু একার্য্য একপ্রকার অসাধ্যসাধন।

(খ) " যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈবচ। "

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

যবনজাতি তাহাদের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করে।

(গ) যবনঃ শয়ানো ভুংক্তে। পাণিনী।

যবনজাতি শয়নাবস্থায় ভোজন করে।

যবনশব্দ।—

যবন-দ্বিষ্ট—ধুনা

যবনপ্রিয়—কালমরিচ

যবনালজ—সোরা

যবনিকা—তাঁবু

যবনেষ্ঠ—রসুন

যবনেষ্ঠা—খেজুর

যবনাশ্ব—যবনদেশীয় ঘোড়া।

উপরি উক্ত বিষয় গুলি সুস্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সপ্রমাণ হইবে

বাকৃট্রিয়ার সমীপবর্ত্তী কোন দেশ যবনদিগের আদি নিবাস। আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে এই জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল; কিন্তু কালক্রমে স্বধর্ম্ম হইতে পতিত হইলে ইহাদিগকে যবন নাম দেওয়া হয়। একথা প্রমাণ করা নিতান্ত কঠিন কার্য্য নহে যেহেতু আজ পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে; যদি কোন ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য না করে তাহাকে সমাজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। কেহ তাহার বাটীতে আহার করে না এক হুঁকায় ধূমপান করে না সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তবে এক্ষণে আর তাদৃশ হিন্দুধর্ম্মের মান সম্ভ্রম নাই। ইংরেজী শিক্ষা হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। যদি এই ব্যক্তি কোন সুযোগে পুনর্ব্বার স্বপদ উদ্ধার করিতে পারিলেন ভাল,নতুবা ইহার সন্তান সন্ততিগণ কালক্রমে নিজ ব্যবসায় অবলম্বন করিলে তাহারাই যবন হইবে।

মহাভারতে যবন শব্দের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ গ্রীকজাতির অভ্যুত্থানের বহুপূর্ব্বে রচিত। বিশেষতঃ পুরাণে প্রমাণ পাওয়া যায় যে যবনগণ তুর্ব্বসুর সন্তান সন্ততি। পূর্ব্বকালে সিন্ধুনদীর পশ্চিম পারস্থিত দেশসমূহ হিন্দুদিগের অধিকার ও আবাসস্থান ছিল। তাঁহাদের মধ্যে এক দল ভারতবর্ষ জয় ও অধিকার পূর্ব্বক তথায় আপনাদিগের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। তাঁহারা এই দেশের সৌন্দর্য্য রমণীয়তা ও উর্ব্বরতা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আর স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন না। ক্রমে ক্রমে সমস্ত আদিম নিবাসিদিগকে পরাস্ত ও দূরীকৃত করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারিত করিলেন। তাঁহাদিগের যে অংশ স্বদেশে রহিয়া গেল তাঁহাকেই ইহারা যবন নামে অভিহিত করিলেন।

এখানে ইঁহাদিগের প্রভুত্ব বিস্তারের সহিত জ্ঞানেরও বিস্তার হইতে লাগিল। স্বর্গীয় সংস্কৃত ভাষা যাহাদিগের মাতৃভাষা সুতরাং তাঁহারা যে স্বল্প কালমধ্যে ভুবনবিখ্যাত হইবেন তাহা বিচিত্র কি? ক্রমে ক্রমে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ,ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের আলোচনায় সকলে মনোনিবেশ এবং তৎবিষয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করিলেন। ওদিকে তাঁহাদের ভ্রাতৃগণের দিন দিন অধঃপতন হইতে লাগিল; তাহারা আপনাদিগের তেজ ও বীর্য্য বিস্মৃত হইয়া নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন, স্বধর্ম্মে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং গোমাংস ইত্যাদি অখাদ্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; ইহাতে ভারতবর্ষবাসী হিন্দুগণ যে তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং তাঁহারা এককালে তাঁহাদের সহিত আদান প্রদান বন্ধ করিয়া দিলেন। এবং তাহাদের নাম ম্লেচ্ছ ও যবন রাখিলেন।

পূর্ব্বে যবনশব্দ দ্বারা যে কেবল মুস-

লমান জাতিকে বুঝাইত না চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট মনুষ্য মাত্রেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। ইংরেজ ফরাস ওলন্দাজ ইত্যাদি সমস্ত জাতিকেই যবন বলা যাইত। ইহাতে কি বুঝায়? যে সকল জাতি হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিত না তাহাদিগকেই যবন বলিত।

হিন্দুগণ অতি বিশুদ্ধাচারী এবং সতত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। এবং আপনাদিগের অদ্ভূত ক্ষমতাবলে কি রাজনীতি, কি সামাজিক নীতি, কি বীরত্ব, কি যুদ্ধকৌশল, কি শিল্প বিদ্যা, সর্ব্ব বিদ্যায় ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। ব্যাস, মিহির, বাল্মিকী, বরাহ, কালিদাস, বশিষ্ঠ, পরাশর, নারদ, মনু, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সেই কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন, সুতরাং জাত্যভিমান ও আত্মাভিমান তাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি, ভাল বাসা ও সহানুভূতি জন্মিল; এবং তাঁহাদের অন্তঃকরণে ঘোর অহঙ্কারের উদয় হইল; এমন কি তাঁহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে মনুষ্য বলিয়া গণনা করিতেও অস্বীকার করিতেন। স্বধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের এত ভক্তি জন্মিয়াছিল যে তাঁহারা ভাবিতেন—ভাবিতেন যথার্থই, তাহাদের ভ্রম ছিল না—সেই ধর্ম্মই সকল ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। যাহারা সেই ধর্ম্ম মানিত না তাহাদিগকে অসভ্য, ম্লেচ্ছ ও যবন বলিতেন। সুতরাং যবন নামে কোন একটি জাতি ছিল না। আর্য্যগণ হিন্দু ভিন্ন সমস্ত জাতিকেই যবন বলিতেন।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।



ভালমানুষ।

কেহ বলিতে পার, কি করিলে "ভাল মানুষ" হওয়া যায়? চলিত কথায় যাহাকে 'ভালমানুষ' বলে, অর্থাৎ সদসৎ বিবেকশূন্য, মৃৎপিণ্ডসদৃশ নিস্তেজ-হৃদয়, 'গো বেচারা' ভালমানুষের কথা বলিতেছি না। পূর্ব্বজন্মের বিশেষ পুণ্য না থাকিলে এরূপ ভালমানুষ হওয়া যায় না। যিনি সমস্ত বুঝিয়া, সমস্ত জানিয়া শুনিয়া 'ভালমানুষ,'—যিনি রঘুবংশের "জ্ঞানে মৌনং, ক্ষমা শক্তৌ, ত্যাগে শ্লাঘা-বিপর্য্যয়ঃ" ইত্যাদি গুণে বিভূষিত হইয়া 'ভালমানুষ,' তাঁহার কথা বলিতেছি। যিনি বাক্যে সত্যবাদী, মনে অহমিকাশূন্য, কার্য্যে ফলপ্রয়াসী,—যিনি পৃথিবীতে অজ্ঞাত, সমাজে অনাদৃত, পরিবার মধ্যে অবহেলিত হইয়াও সদানন্দ;—যিনি বিপদে প্রসন্ন এবং সম্পদে ধীর, তাঁহার কথা বলিতেছি।—যিনি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে হিতাহিত বিবেচনা করেন না, যিনি সময়ের গতি অনুসারে স্বীয় কার্য্যের গতি নিয়মিত করেন না,—যিনি আশাবাক্যে বন্ধুকে উৎসাহিত করিয়া কার্য্যকালে পলায়ন করেন না, সেই সহৃদয় মহাত্মার কথা বলিতেছি।

কি করিলে ভালমানুষ হওয়া যায়? নীতিশাস্ত্র পাঠ করিলে? কত কত নীতি পড়িলাম, কত নীতিশাস্ত্রবেত্তা দেখিলাম, কিন্তু কখনও দেখিলাম না যে, জ্ঞানের উন্নতির সহিত নীতির উন্নতি হইল। "সত্যকথা বলিও, মিথ্যা বলিও না" ইহাত কত শাস্ত্রে কত প্রকার পড়িলাম, মিথ্যাকথার ফলে কতবার ভুগিলাম, কতবার দেখিলাম; কিন্তু কখন সত্যবাদী হইতে পারিয়াছি কি? কার্য্যকালে দেখিয়াছি যে, সর্ব্বদা হিতোপদেশকারের কথাই সত্য হয়।

> "ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং
> ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।
> স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে
> যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ॥"

আরিস্তটলের সময় হইতে ইয়ুরোপে নীতিশাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে; কিন্তু ইউরোপের নীতি কিঞ্চিন্মাত্র বিশুদ্ধ হইয়াছে কি? সেই মিথ্যাকথা, সেই প্রতারণা, সেই স্বার্থপরতা, সেই নীচাশয়তা, এখনও আছে। তবে একমাত্র প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বকার অধিবাসীরা মনোবৃত্তি গোপনের এত কৌশল জানিত না। সভ্যতার সঙ্গে ভণ্ডামিরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং নীতির অবনতিই ঘটিয়াছে।

তবে কিসে ভালমানুষ হওয়া যায়? ধর্ম্মালোচনা দ্বারা? কত হিন্দু দেখিলাম, কত প্রাতস্নায়ী, নিরামিষাশী, চন্দনচর্চ্চিত, কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলাম; কত মেও-য়াজওয়ালা সুদীর্ঘ দাঁড়িবিশিষ্ট মুসলমান দেখিলাম; রবিবারের সন্ধ্যাকালে কত অশ্রুবারিপরিপ্লুত ব্রাহ্মভ্রাতা দেখিলাম; কত "ফ্রক কোটেড" মিসনরী 'পারসন' দেখিলাম; কখনও ধর্ম্মের সঙ্গে নীতি মিশ্রিত দেখিলাম কি? খ্রীষ্টানেরা বলেন, এবং ব্রাহ্মেরাও দেখাদেখি বলিতে শিখিয়াছেন, যে মনুষ্য জগদীশ্বরের 'গ্রেস' (Grace) 'দয়াময়ের দয়া' না পাইলে ধার্ম্মিক অথবা বিশুদ্ধচরিত্র হইতে পারে না। এই জগদীশ্বরের করুণা পাইবার প্রধান উপায় 'উপাসনা'। এ'উপাসনা'ও ত অনেককাল করিলাম। উপাসনা-গৃহে বসিয়া জগদীশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া কতবার আন্তরিক প্রতিজ্ঞা করিলাম, কখনও প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম কি? পৃথিবীর দারুণ প্রলোভনের সাক্ষাতে, সমস্ত প্রতিজ্ঞা, সমস্ত জগদীশ্বর, সমস্ত উপাসনা, কোথায় উড়িয়া গেল। ইংরাজীতে এক প্রবচন আছে যে, "যদি জগদীশ্বরের সাহায্য চাও, তবে অগ্রে আপনি আপনার সহায় হও"। এ প্রবচন সাংসারিক উন্নতিসম্বন্ধে যেরূপ সত্য, নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। শুদ্ধ উপাসনায় সংসারে অন্ন মিলিবে না; শুদ্ধ উপাসনায় চরিত্রের উন্নতিও হইবে না। "উপাসনা" অর্থাৎ সন্তোষকর বাক্যে মনুষ্য ভুলিতে পারে। আপনি বড় ধনী, আপনি বড় বিদ্বান আপনি বড় সুন্দর, এ সকল কথায় মনুষ্য ভুলিতে পারে। কিন্তু জগদীশ্বর কথায় ভুলিবার পাত্র নহেন। তাঁহাকে কার্য্যে ভুলাইতে হইবে। চক্ষু মুদিয়া তুমি বড় সুন্দর, তুমি বড় জ্ঞানী, তুমি বড় মহৎ বলিলে চলিবেনা। *

তবে কি করিলে ভালমানুষ হইব? এক উপায় আছে। যুদ্ধ করিলে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, প্রত্যেক কার্য্যে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। স্বার্থত্যাগ চরিত্র-উন্নতির মূলমন্ত্র। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, সকল প্রকার দোষের মূলেই এই স্বার্থানুরাগ আছে। লোকের মনে স্বকীয় ক্ষমতার আধিক্য স্পষ্টীভূত করিবার জন্য মিথ্যাকথার সৃষ্টি লোকের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার জন্য মিথ্যা কার্য্যের সৃষ্টি। যত কিছু দুষ্কর্ম্ম করি, সকলই আত্মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। জনসন্ বলেন যে, কেহ কেহ বিনা অভিপ্রায়ে, বিনা স্বার্থপ্রত্যাশায় দুষ্কর্ম্ম করে। কিন্তু আমাদিগের দৃঢ়

---

* এস্থলে এরূপ বলা হইতেছে না যে উপাসনার কোন কার্য্যকারিতা নাই। উপাসনার অন্য অনেক প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ উপাসনায় চরিত্র উন্নত হয় না এই কথা বলা লেখকের অভিপ্রেত।

বিশ্বাস যে, যাহা তোমার আমার নিকট বিনা অভিপ্রায়ে, বিনা স্বার্থপ্রত্যাশায়, দুষ্কর্ম্মকারীর নিকট তাহা স্বার্থানুসন্ধান ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এই স্বার্থপরতার যে কত প্রকার মূর্ত্তি আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের প্রধান দেবতা বিষ্ণুর দশ অবতার ; কিন্তু স্বার্থানুরাগের লক্ষকোটি অবতার। পরের উপকারে কিংবা পরের অপকারে এই একই দেবতার পূজা হয়। কেহ কর্ত্তৃপক্ষের পদানুসরণ করিয়া, কেহবা তাহার অবাধ্যতাচরণ করিয়া এই এক দেবতারই পূজা করেন। ধর্ম্মের প্রবন্ধ ও নাস্তিকতার প্রবন্ধ এই একই দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত হয়। ইনি কখন বা সত্যের বেশ ধরিয়া, কখন বা মিথ্যা কথার বেশ ধারণ করিয়া, কখন বা ভীরুতার বেশে, কখন বা নির্ভীকতার বেশে, ইহাঁর সেবকদিগের নিকট উপস্থিত হয়েন। *

ইউরোপের আধুনিক দার্শনিকেরা নীতির ভিত্তি স্বার্থানুসন্ধানের উপর স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, বুঝিয়া দেখিলে পরহিতৈষিতা ও স্বার্থচিন্তা একই প্রকার কার্য্যপ্রণালীর উপযোগী বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহাদের মতে স্বার্থে ও পরার্থে অবশ্যম্ভাবী বিসম্বাদিতারাখা অল্প বুদ্ধির কার্য্য। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে পরের ইষ্ট করিলে প্রকারান্তরে আপনারই ইষ্ট করা হয়। মিলের (Utilitarianism) এই মূল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত।

এইমত সম্বন্ধে দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, যে বুদ্ধি বা যে জ্ঞান থাকিলে পরার্থের মধ্যে ও স্বার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সে বুদ্ধি বা সে জ্ঞান অধিকাংশেরই দুষ্প্রাপনীয়। মিলের মত দুই চারি জন অমানুষপ্রতিভাশালী ব্যক্তি ভিন্ন পরার্থে ও স্বার্থে একত্ব প্রতিপাদন অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই মত সম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে পরার্থ ও স্বার্থের ভবিষ্যৎ একত্ব বুঝিলেও স্বার্থ ত্যাগ করা বড় সহজ নহে। বুঝিতে পারি যে গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের সাহায্য করিলে ভবিষ্যতে আমাদেরই ইষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু এই কথাটি বুঝিয়া কয়জনে স্ত্রীর অলঙ্কার হইতে টাকা বাঁচাইয়া বিদ্যালয়ের সাহায্য করিয়াছেন? সংস্কৃতে এক প্রবচন আছে। "কাচঃ কাচঃ মণির্মণিঃ" সহস্র যুক্তি প্রয়োগ করিলেও কাচ কাচই থাকিবে এবং মণি মণিই থাকিবে। সেইরূপ যতই কেন যুক্তি প্রয়োগ করুন না, মনুষ্যের মধ্যে আত্ম পর বলিয়া যে একটা প্রভেদ, তাহা থাকিবেই থাকিবে। যত দিন মনুষ্যের মনে ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রবল ছিল, ততদিন পরার্থের মধ্যে স্বার্থানুসন্ধান অনায়াসেই করা যা-

* এতৎ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে। অন্যত্র বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ইতে পারিত। তখন পর কালের দোহাই দিয়া স্বার্থে ও পরার্থে একত্ব প্রতিপাদন করা যাইতে পারিত। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে এরূপ কোন পর কালের উপর বিশ্বাস নাই। সুতরাং এক্ষণে পরার্থের মধ্যে ও স্বার্থাবলোকন করা বড় কঠিন ব্যাপার। তবে যাঁহারা " বসুধৈব কুটুম্বকম্ " বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের নীতিশিক্ষা সম্পুর্ণ হইয়াছে ; তাঁহাদিগের জন্য এ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে না। অন্য দেশে যাহাই হউক, আমাদের দেশে স্বার্থ ও পরার্থ এক বলিয়া বুঝা অত্যন্ত কঠিন। শুদ্ধ কঠিন কেন, একরূপ অসম্ভব। যে জাতির মধ্যে ঐকজাত্য নাই, যাঁহাদের চরিত্র গঠনে কাপুরুষতাই প্রবল, স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার নির্ম্মাণই যাঁহাদের পৌরুষের পরাকাষ্ঠা, তাঁহারা যে কখন পরার্থে ও স্বার্থে একত্ব দেখিবেন, ইহা আশা করাও বাতুলের কার্য্য। আত্ম পরের প্রভেদ যত আমাদিগের মধ্যে, এত আর অন্য কোন জাতিতে আছে কি না সন্দেহ।

তবে স্থির হইল, স্বার্থ ত্যাগেই নীতির উন্নতি সম্ভব। কিন্তু স্বার্থ ত্যাগ শিখিবার উপায় কি ? নীতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া বা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া স্বার্থ ত্যাগ শিখিতে পারিব না। সংসারের প্রলোভন জয় করিব কিরূপ ? এক উপায় আছে ; সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া। প্রলোভন জয় করিতে পারিলাম না, সুতরাং প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় প্রলোভন হইতে পলায়ন। সংসার হইতে দূরে, বিজন অরণ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া প্রবৃত্তি দমন কর। যদি প্রবৃত্তি দমন করিয়াছ বলিয়া বুঝিতে পার, তবে পুনরায় সংসারে আসিয়া মিশিও। নতুবা বিজন অরণ্যমধ্যে এই অনন্ত জগতের অনন্তলীলা ধ্যান করিতে করিতে জীবন কাটাইও।

যদি কেহ কখন এ প্রবন্ধ পাঠ করেন, তবে তিনি বলিবেন " হাঁ এ নীতি বাঙ্গালির ছেলের বটে। 'পলায়ন কর' এ মহামন্ত্র বাঙ্গালির একচেটিয়া। " কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যদি জয় করিতে না পারি, পলায়ন করিব না কেন ? জয়ের উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা, আমার পলায়নের উদ্দেশ্যও তাহাই। তবে যে জয়কে পলায়ন অপেক্ষা ভাল বলি, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। শত্রুকে জয় করিলে ভবিষ্যতে তাহা হইতে বিপদের সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু শত্রুর নিকট হইতে পলায়ন করিলে শত্রুকর্ত্তৃক পুনরুৎপীড়ন অধিকতর সম্ভব। কিন্তু যেখানে পলায়নই প্রাণরক্ষার এক মাত্র উপায়, সেখানে পলায়নই শ্রেয়ঃ। পলায়ন করিতে জানিত না বলিয়া রজপুতের ধ্বংস হইয়াছে ; পলায়ন করিতে জানে বলিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি ভূমণ্ডলে আধিপত্য করিতেছে। যদি তোমরা কেহ এমন থাক যে, শত্রুর সহিত

যুদ্ধ করিতে পার, যুদ্ধ কর; আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যদি কেহ আমার মত দুর্ব্বল, আমার মত ভীরু হয়, তবে সে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করুক, তাহাতে আপত্তি করিও না। সকলে তোমাদের মত বীরপুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই।

কেহ হয়ত আপত্তি করিবেন যে, যদি সকলেই এইরূপ করিতে যায়,তবে সংসার চলিবে কিরূপে? দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমার মত আমি বলি, "চলিয়া কাজ কি? এতকাল যে চলিল এই দুঃখ।" সংসার চলিবে কি না তাহা আমি কি জানি? আমি আপনাকেই বাচাইতে পারিনা। সংসার যাঁহার সৃষ্টি, সংসার পালন যাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তিনি সংসারের কথা ভাবিবেন। তুমি আমি সংসারের পরমাণু মাত্র। আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি না,আবার সংসার। আর এক কথা; সংসারের অসারতা বুঝিলেই সংসার ছাড়া যায় না। সংসারে যে রাশি রাশি প্রলোভন রহিয়াছে, তাহারাই সংসার চালাইবে। যে শিল্পকুশল নির্ম্মাতা এ সংসার সৃষ্টি করিয়াছিল,সে ইহার রক্ষার জন্য অগ্রেই সমস্ত উপাদান প্রস্তুত রাখিয়াছিল। সংসার রক্ষার জন্য তোমার আমার মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিবার প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাই ভালমানুষ হইবার এক প্রধান উপায়। এ সম্বন্ধে আরও একটি গভীর তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে। যদি প্রলোভন জয় করা ভালমানুষের অর্থ হয়, তাহা হইলে সমাজশূন্য স্থানে থাকিয়া ভালমানুষ হওয়া যাইতে পারে না। কারণ যেখানে প্রলোভন নাই, সেখানে প্রলোভনজয় কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে? আর এক কথা, কেহ স্থলে থাকিয়া সন্তরণ শিক্ষা করিতে পারে না। শিশু চির কাল মাতৃক্রোড়ে শয়ান রহিয়া সঞ্চরণ শিখিতে পারে না। তবে প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া কি প্রকারে প্রলোভন জয় শিক্ষা করা যাইতে পারে? যদি কেহ কখন জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন, তবে তাহা কেবল সমাজে থাকিয়াই সম্ভব হইতে পারে। বালক, সঞ্চরণক্রিয়া শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে অনেকবার ভূপতিত হইবে, অনেকবার দারুণ ব্যথা প্রাপ্ত হইবে, অনেকদিন ধাত্রীর কর-ধারণ করিয়া চলিবে। সন্তরণশিক্ষার্থী অনেকবার জলে নিমজ্জিত হইবে, অনেকবার হাবুডুবু খাইবে, অনেক বার অন্যের পৃষ্ঠের উপর নির্ভর করিয়া সাহসের সহিত গভীর জলে যাইবে। সেইরূপ যিনি বিশুদ্ধচরিত্র হইতে চাহেন, তাঁহাকেও অনেকবার অনেক প্রকার লোকের সহিত মিশিতে হইবে, অনেকবার তাঁহারও পদ-স্খলন হইবে, অনেকবার তাঁহাকেও দারুণ মনস্তাপ পাইতে হইবে, অনেকবার তাঁহাকেও "সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম" ইহা বুঝিতে ও তথায়

আশ্রয় লইতে হইবে। সর্ব্বত্র শিক্ষার নিয়মই এই।

এ তর্কটি বড় আশ্বাসদায়ক, বড় সান্ত্বনা-প্রদ। প্রতিদিন যে এই অসংখ্য দুষ্কর্ম্ম ও দুশ্চিন্তা করিতেছি, এ সমস্তই কি তবে কেবল চারিত্র-উন্নতির সোপানমাত্র? এখানেও কি জগদীশ্বর মন্দবৃক্ষ হইতে সুন্দরফল নিষ্কাশন করিতেছেন? যেমন তিক্ত ঔষধ সেবন না করিলে কঠিন রোগের উপশম হয় না, সেইরূপ কি দুষ্কর্ম্ম না করিলে চারিত্র-উন্নতি হইতে পারে? চরিত্র-সুবর্ণ বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে কি দুষ্কর্ম্ম-অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে?

কথাগুলি বড় মিষ্ট। শুনিলে নরাশ্য অন্তর্হিত হয়; হৃদয়ের কঠোরতা দ্রবীভূত হয়; মলিন চিত্ত প্রফুল্ল হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কথাগুলি অন্যত্র সত্য হইলেও চরিত্র-উন্নতি সম্বন্ধে সত্য হইতে পারে না।

প্রথমে দেখাযাউক, আমরা নূতন বিষয় শিক্ষা করি কেন? যতদিন আমরা আমাদিগের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকি, ততদিন কোন বিষয় শিক্ষা করিবার ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। চীনের বাসীরা নূতন বিষয় শিক্ষা করে না; কারণ, তাহারা জানে যে তাহাদের শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। যেহেতু তাহারা তাহাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট আছে। বালকেরা সঞ্চরণ শিক্ষা করে, কারণ তাহাদের শারীরিক রক্ত তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে দেয় না। এই জন্যই বলিষ্ঠ বালক অধিক পরিমাণে ও দুর্ব্বল বালক অল্প পরিমাণে সঞ্চরণ-ক্রিয়া সম্পাদন করে। নৈসর্গিক প্রকৃতি বলে বলিষ্ঠ বালক আপন অবস্থায় সহজে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। আবার নৈসর্গিক কারণ বশতঃই দুর্ব্বল বালক সহজে আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়। এইরূপে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, অভাব ও অসন্তোষই শিক্ষার প্রধান নিয়ামক। বড় মানুষের সন্তানেরা লেখা পড়া শিখিতে পারে না। কারণ তাহাদের মনে অভাব ও অসন্তোষ বিদ্যমান নাই।

পাপ ছাড়িয়া পুণ্য করিতে হইলেও এইরূপ অভাবও অসন্তোষের আবশ্যক হইবে। কিন্তু পাপের সঙ্গে অভাবের কোন সম্পর্ক নাই। যেখানে যে সুখ আছে, পাপী তাহা অম্লানবদনে অধিকার করে; যতক্ষণ তাহাদের শক্তি থাকে, ততক্ষণ সেই সুখভোগ করে, এবং সুখের প্রীতিকারিণী শক্তির হ্রাস হইলেই অন্যত্র সুখের আশায় ধাবমান হয়। এইরূপ সুখ হইতে সুখান্তরের অন্বেষণে তাহার জীবন অতিবাহিত হয়; সুতরাং সে কখন অভাবের মুখ দেখিতে পায় না। সুতরাং কখন তাহার অসন্তোষও হয় না। সত্য বটে, সে অনেক সময়ে সুখলাভে বঞ্চিত হয়, সত্য বটে সে অনেক সময়ে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, সত্য বটে অনেক সময়ে দুঃখই তাহার সুখের পরিণাম হয়; কিন্তু এ পৃথিবীতে সর্ব্বদা সুখী কে? এ

যে ধার্ম্মিক পুরুষ ধীরপদে মন্দ মন্দ গমনে সংসারে বিচরণ করিতেছেন, ঐ যে উনি সর্ব্বত্রৈবং বিচার করিয়া করিয়া কার্য্য করিতেছেন, উনিই কি সর্ব্বদা সুখী ? উঁহারও কি সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখলাভ হয় না ? যদি সাংসারিক সুখের কথা বল, সে বিষয়ে পাপী ও পুণ্যবান উভয়েই সমান। পুণ্যবানের ও দুঃখ সুখ দুইই হয় ; পাপীরও দুঃখ সুখ দুইই হয়। জয়ী সিজার ও পরাজিত কেটো, জয়ী ওয়াশিংটন ও পরাজিত নেপোলিয়ন, দগ্ধীকৃত ল্যাটিমার ও সিংহাসনাভিষিক্ত ক্রমওয়েল, এবিষয়ের সাক্ষ্যস্থল।

আর একটি আপত্তি হইতে পারে যে, সাংসারিক সম্পদ সম্বন্ধে পাপীর অভাব না থাকিতে পারে, কিন্তু পাপীর মানসিক শান্তিসম্বন্ধে নিশ্চয়ই অনেক অভাব আছে। আন্তরিক নিরুদ্বেগ, পাপীর অভাব ; এই অভাবের জন্য সে অন্যত্র সুখের আশায় ধাবিত হয়। যখন সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াও পাপী মনের উদ্বেগ দূর করিতে পারে না, তখনই তাহার মনে পুণ্যশিক্ষার ইচ্ছা বলবতী হয়। একথাটির মধ্যে অল্প পরিমাণে সত্য আছে। কিন্তু পাপীর মনে অশান্তিও অধিক লক্ষিত হয় না। আমাদের মনে ধর্ম্ম জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু তাহা কাহাকেও দারুণ যন্ত্রণায় ফেলে না। যদি আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান(Conscience)প্রবল হইত; তাহা হইলে সকলেই, অন্ততঃ অনেকেই, পুণ্যপথে চলিত। যে দেশে শাস্তির নিয়ম বলবৎ, সেদেশে পাপের সংখ্যা অল্প। দণ্ডবিধি প্রবর্ত্তিত হওয়া অবধি আমাদের দেশে চুরি ডাকাতি অনেক কমিয়াছে। সেইরূপ যদি অন্তরের দণ্ডবিধির কোন ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে পাপের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতে পারিত না। গোল্‌ডস্মিথ বলেন, "Conscience is a coward "আমাদের ধর্ম্মজ্ঞানের কোন সাহস নাই। পাপের পুর্ব্বে ইহার নিবর্ত্তনা এত অস্ফুট বলিয়া বোধ হয় যে, লোকে ইহাকে অক্লেশে তাচ্ছিল্য করিতে পারে। আবার পাপের পরেও ইহার তিরস্কার কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক হয় না। সুতরাং মানসিক শান্তি সম্বন্ধে যে অভাব তাহাও পাপীর বড় অধিক নয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে শিক্ষার প্রধান নিয়ামক যে অভাব, তাহা পাপীর নাই। এই জন্যই পাপের ও হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি এরূপ কোন প্রধান অভাব থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে পৃথিবীতে সত্যযুগের আবির্ভাব হইত।

আর এক কথা, শিক্ষার অন্য এক নিয়ামক দৃষ্টান্ত। যদি দেখিতাম যে অনেকে পাপ ছাড়িয়া পুণ্য করিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী ফল ভোগ করিতেছে ; তাহা হইলে পুণ্য শিক্ষা করিতে স্বতঃই ইচ্ছা হইত। কিন্তু সমাজে এরূপ পুণ্যের দৃষ্টান্ত কয়টি দে-

খিতে পাওয়া যায়? যিনি বাহ্য দৃশ্যে ভারি পুণ্যাত্মা, তাঁহাকেও বিশেষ করিয়া দেখিলে ভণ্ড সন্ন্যাসী বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হয়।

এই সকল কারণে পুণ্যকে শিক্ষার বস্তু বলিয়া গণনা করা উচিত হয় না। এস্থলে শিক্ষার প্রধান নিয়ামক যে অভ্যাস ও দৃষ্টান্ত সে দুইটিই নাই। সুতরাং যদি কেহ মনে করেন যে পাপ করিতে ক্রমে-ক্রমে পুণ্য শিক্ষা করিব, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা কখনই সফল হইবে না। একটি গল্প আছে যে, একজন মাতাল তাহার পিতাকে বলিয়া ছিল, "বাবা তুমিও একদিন মদ খাইয়া দেখ, পরে আমাকে তিরস্কার করিও" পিতা তদনুসারে একদিন মদ খাইয়া নিজেই মাতাল হইয়া উঠিলেন। সেইরূপ যিনি পাপ করিতে করিতে পুণ্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি অবশেষে নিজেই ঘোর পাপী হইয়া উঠিবেন। অতএব প্রলোভন হইতে দূরে থাকাই পুণ্য শিক্ষার প্রধান উপায়।

সংসারে থাকিয়া ভাল মানুষ হওয়া যে এক প্রকার অসম্ভব তাহা অনেক দার্শনিক স্বীকার করেন। বহুকাল হইতে এই পুণ্য শিক্ষা সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। একটির নাম স্বাতন্ত্র্যবাদ (Freewill) অপরটির নাম নিযুক্তিবাদ (Predestination)। স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে মনুষ্যের নিজইচ্ছাই সকল কর্ম্মের নিয়ামক। নিযুক্তিবাদ মতে মনুষ্য কর্ম্মসূত্রের অধীন। স্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন, আমি ইচ্ছা করিলে পাপও করিতে পারি, পুণ্যও করিতে পারি। নিযুক্তিবাদীরা বলেন যে পাপ পুণ্য আমার ইচ্ছার অনধীন। আমি জগদীশ্বরের করধৃত ক্রীড়াপুত্তল মাত্র। তিনি আমার শিরে পাপ পুণ্যের ভার যেরূপ ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহা আমি ইচ্ছা না করিলেও ঘটিবে, ইচ্ছা করিলেও ঘটিবেনা।

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

এই দুইটি মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং কোন্‌টি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করা আমাদিগের ক্ষমতার অসাধ্য। এক্ষণে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে পৃথিবীতে এরূপ একদল দার্শনিক ছিলেন, যাঁহারা পাপ পুণ্য মনুষ্যের ইচ্ছার বহির্ভূত বলিয়া মনে করিতেন। ইহাঁরা যে পুণ্য শিক্ষা অসম্ভব বোধ করিতেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। মিল স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন; কিন্তু তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, যে পুণ্যশিক্ষা অতীব কঠিন ব্যাপার। যাহা মার্জ্জিতবুদ্ধি, নির্লোভ, জ্ঞানী মহাপুরুষের নিকট অতীব কঠিন, তাহা যে তোমার আমার নিকট এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

জন্‌সন্ বলেন, "যে অধিক কথা বলে, সে কতকগুলি অনর্থক বলিবেই ব-

লিবে ।' কথা সম্বন্ধে যে নিয়ম, কার্য্য সম্বন্ধেও তাহাই । 'যে অনেক কার্য্য করে, সে কতকগুলি কার্য্য অন্যায় করিবেই করিবে ।' এমতটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাংসারিক যে সন্ন্যাসী অপেক্ষা অধিকতর পাপী হইবেন, তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে ।

এস্থলে, আমরা কি বলিলাম একবার তাহা স্মরণ করিয়া দেখা আবশ্যক বোধ হইতেছে । আমাদিগের যুক্তির প্রণালী নিম্নে প্রদর্শিত হইল ।

(১) স্বার্থত্যাগ শিক্ষাই ভাল মানুষ হইবার প্রধান উপায় ।

(২) স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা সংসারে থাকিয়া হইতে পারে না । এজন্য সংসার ত্যাগ করা উচিত । কিন্তু সংসার ত্যাগ সম্বন্ধে কএকটি আপত্তি আছে । যথা—

(ক) সকলে সংসার ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে না ।

(খ) সংসার ত্যাগ করিলে স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা করা যায় না । স্বার্থত্যাগ শিক্ষা সংসারে থাকিয়াই সম্ভব ।

(৩) আপত্তিখণ্ডন । (আমরা যথা সাধ্য দেখাইয়াছি যে, সংসারে থাকিলে কোনরূপেই পুণ্য শিক্ষা করা যায় না ।)

যদি কেহ এ প্রবন্ধ এতদুর পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, কিজন্য আমরা স্বার্থত্যাগকে দুর্দ্ধর্ষ ও অজেয় শত্রু বলিয়া মনে করি । আমাদের অন্য এক প্রবল প্রমাণ এই যে, এতকাল পৃথিবী চলিয়া আসিতেছে, তথাপি পৃথিবীতে ভাল মানুষের সংখ্যা অতি অল্পই বৃদ্ধি হইয়াছে । যদি সংসারে থাকিয়া ভাল মানুষ হওয়া যাইত, তাহা হইলে এতদিন ভাল মানুষে সংসার পুরিয়া উঠিত ।

অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে আমরা ভাল মানুষের কি অর্থ করি, তাহা আরও একটুকু বিশদ করিয়া বলা উচিত বোধ হইতেছে । 'ভাল মানুষ' এ কথাটিতে প্রশংসাবাচক কিছুই নাই । সংসারের উপকার করিব, পৃথিবীর জ্ঞান বর্দ্ধন করিব, এসকল উদ্দেশ্য ভাল মানুষের নহে । ভাল করিতে পারি, না পারি, কাহার ও অনিষ্ট করিব না ; সৎকার্য্য করিতে পারি না পারি, কোন অসৎকার্য্য করিব না ; মহৎকার্য্য করিতে পারি না পারি, অন্যায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না ; ইত্যাদি ভাল মানুষের উদ্দেশ্য । 'ভালমানুষ' চাহেন না যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার নাম প্রতিধ্বনিত হউক; চাহেন না যে দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে তাঁহার কীর্ত্তি বিঘোষিত হউক । 'ভালমানুষ' চাহেন নির্ম্মল, প্রসন্ন, রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত, শান্তভাবাপন্ন হৃদয়বৃত্তি । মনস্তুষ্টি জনিত সুখই ভাল মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য । (ক্রমশঃ)

শ্রীনী—

জীবনপ্রভাত।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিজেতার পুরস্কার।

'ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে!
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে।'

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পর দিন অপরাহ্ণে সেই দুর্গোপরি অপরূপ সভা সন্নিবেশিত হইল। রৌপ্য-বিনির্ম্মিত চারি স্তম্ভের উপর রক্ত বর্ণের চন্দ্রাতপ, নীচেও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত রাজগদীর উপর রাজা জয়সিংহ ও রাজা শিবজী উপবেশন করিয়া আছেন। চারি পার্শ্বে সৈন্যগণ বন্দুক লইয়া শ্রেণীবদ্ধে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই বন্দুকের কিরীচ হইতে রক্তবর্ণের পতাকা অপরাহ্ণের বায়ুহিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। চারিদিকে শত শত লোক দিল্লীশ্বরের ও জয়সিংহ ও শিবজীর জয়নাদ করিতেছে।

জয়সিংহ সহাস্য বদনে বলিলেন 'আপনি দিল্লীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া অবধি তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়াছেন। এ উপকার দিল্লীশ্বর কখনই বিস্মৃত হইবেন না, আপনার সকল চেষ্টার জয় হইয়াছে।'

শিবজী। 'যেখানে জয়সিংহ সেই খানে জয়!'

সভাসদ্‌গণ সকলে সাধুবাদ করিল। জয়সিংহ আবার বলিলেন 'বোধ করি আমরা শীঘ্রই বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিব, আপনি এক রাত্রির মধ্যে এই দুর্গ অধিকার করিবেন তাহা আমি কখনই আশা করি নাই।'

শিব। 'মুসলমানদিগকে সুপ্ত পাইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম সকলে জাগ্রত ও সসজ্জ! পূর্ব্বে কখনও দুর্গজয় করিতে এরূপ যুদ্ধ করিতে হয়নাই।'

জয়। 'বোধ করি এক্ষণ যুদ্ধের সময় বলিয়া রজনীতে সর্ব্বদাই শত্রুরা সসজ্জ থাকে।'

শিব। 'সত্য, কিন্তু এত দুর্গ জয় করিয়াছি, কোথাও সৈন্যগণকে এরূপ প্রস্তুত দেখি নাই।'

জয়। 'শিক্ষা পাইয়া ক্রমে সতর্ক হইতেছে। কিন্তু সতর্কই থাকুক অথবা নাই থাকুক, রাজা শিবজীর গতি অবারিত, শিবজীর জয় অনিবার্য্য।'

শিব। 'মহারাজের প্রসাদে দুর্গ

জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কল্য রজনীর ক্ষতি জীবনে পূরণ হইবে না। সহস্র আক্রমণকারীর মধ্যে পঞ্চশত জনকে আমি আর এ জীবনে দেখিব না, সেরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বিশ্বস্ত সেনা বোধ হয় আর পাইব না।' শিবজী ক্ষণেক শোকাকুল হইয়া রহিলেন। পরে বন্দীগণকে আনয়নের আদেশ করিলেন।

রহমৎখাঁর অধীনে সহস্র সেনা সেই দুর্গম দুর্গ রক্ষা করিত, কল্যকার যুদ্ধের পর কেবল তিনশত মাত্র জীবিত আছে। সকলের হস্তদ্বয় পশ্চাৎ দিকে বদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলে সভাসম্মুখে উপস্থিত হইল।

শিবজী আদেশ করিলেন 'সকলের হস্ত খুলিয়া দাও। আফগান সেনাগণ! তোমরা বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের আচরণে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমরা স্বাধীন। ইচ্ছা হয় দিল্লীশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হও,নচেৎ আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট চলিয়া যাও,—আমার আদেশে কেহ তোমাদিগের কেশাগ্র স্পর্শ করিবে না।'

শিবজীর এই সদাচরণ দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না; সকল যুদ্ধে, সকল দুর্গজয়ের পর তিনি বিজিতদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ ও সদাচরণ করিতেন, তাঁহার বন্ধুগণ কখন কখন তাঁহাকে এজন্য দোষ দিতেন, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। শিবজীর সদাচরণে বিস্মিত হইয়া আফগানগণ অনেকেই দিল্লীশ্বরের বেতনভোগী হইতে স্বীকার করিল।

পরে শিবজী কিল্লাদার রহমৎখাঁকে আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহারও হস্তদ্বয় পশ্চাৎদিকে বদ্ধ, তাঁহার ললাটে খড়্গের আঘাত, বাহুতে তীর বিদ্ধ হইয়া ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু বীর তখনও সদর্পে সভাসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, সদর্পে শিবজীর দিকে চাহিলেন।

শিবজী সেই বীরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া স্বয়ং আসন ত্যাগ করিয়া খড়্গের দ্বারা হস্তের রজ্জু কাটিয়া ফেলিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

'বীরপ্রধান! যুদ্ধের নিয়মানুসারে আপনার হস্তদ্বয় বদ্ধ হইয়াছিল, আপনি এক রজনী বন্দীরূপে ছিলেন, আমার সে দোষ মার্জ্জনা করুন, আপনি এক্ষণে স্বাধীন। আপনার বীরত্বের কথা কি বলিব; জয় পরাজয় ভাগ্যক্রমে ঘটে, কিন্তু আপনার ন্যায় যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমিই সম্মানিত হইয়াছি।'

রহমৎখাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তাহাতেও তাঁহার স্থির গর্ব্বিত নয়নের একটি পত্রও কম্পিত হয় নাই; কিন্তু শিবজীর এই অসাধারণ ভদ্রতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। যুদ্ধসময়ে শত্রুমধ্যে কেহ কখনও রহমৎখাঁর কাতরতা-চিহ্ন দেখেন নাই, অদ্য বৃদ্ধের দুই উজ্জ্বল চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। রহমৎখাঁ মুখ ফিরাইয়া

তাহা মোচন করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—

'ক্ষত্রিয়-রাজ! কল্য নিশীথে আপনার বাহুবলে পরাস্ত হইয়াছিলাম, অদ্য আপনার ভদ্রাচরণে তদধিক পরাস্ত হইলাম। যিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের অধীশ্বর, যিনি পাদসাহের উপর পাদসাহ, জমীন ও আসমানের সুলতান, তিনি এই জন্য আপনাকে নূতন রাজ্য বিস্তারের ক্ষমতা দিয়াছেন।' বৃদ্ধের নয়ন হইতে আর দুই বিন্দু জল পড়িল।

রাজা জয়সিংহ কহিলেন 'পাঠানরাজ! আপনারও উচ্চপদের যোগ্যতা আপনি প্রমাণ করিয়াছেন। দিল্লীশ্বর আপনার ন্যায় সেনা পাইলে আরও পদবৃদ্ধি করিবেন সন্দেহ নাই। দিল্লীশ্বরকে কি লিখিতে পারি যে আপনার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সৈন্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইতে সম্মত হইয়াছেন ?'

রহমৎখাঁ উত্তর করিলেন 'মহারাজ! আপনার প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম, কিন্তু আজীবন যাঁহার কার্য্য করিয়াছি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না; যত দিন এ হস্ত খড়্গ ধরিতে পারিবে, বিজয়পুরের জন্য ধরিবে।'

শিবজী বলিলেন 'তাহাই হউক। আপনি অদ্য রাত্রি বিশ্রাম করুন, কল্য প্রাতে আমার একদল সেনা আপনাকে বিজয়পুর পর্য্যন্ত নিরাপদে পঁহুছিয়া দিবে।' এই বলিয়া রহমৎখাঁকে যথোচিত সম্মান ও শুশ্রূষা করিবার জন্য একজন প্রহরীকে আদেশ দিলেন।

রহমৎখাঁ স্থিরনেত্রে ক্ষণেক শিবজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন 'ক্ষত্রিয়বর! আপনি আমার সহিত ভদ্রাচরণ করিয়াছেন, আমি অভদ্রাচরণ করিব না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না। আপনার সেনার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন সকলে প্রভু ভক্ত নহে। কল্য দুর্গাক্রমণের গোপনানুসন্ধান আমি পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্যই সমস্ত সেনা সমস্ত রাত্রি সসজ্জ ও প্রস্তুত ছিল। অনুসন্ধানদাতা আপনারই একজন সেনা। ইহার অধিক বলিতে পারি না, সত্য লঙ্ঘন করিব না।' রহমৎখাঁ ধীরে ধীরে প্রহরীগণের সহিত প্রাসাদাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

রোষে শিবজীর মুখমণ্ডল একবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার বন্ধুগণ বুঝিলেন এক্ষণে পরামর্শ দেওয়া বৃথা; তাঁহার সৈন্যগণ বুঝিল অদ্য প্রমাদ উপস্থিত।

জয়সিংহ শিবজীকে এতদাবস্থায় দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'ক্ষান্ত হউন, একের দোষে সমস্ত সৈন্যের উপর ক্রোধ অনুচিত।' পরে শিবজীর সৈন্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

'এই দুর্গ আক্রমণ করা হইবে, তোমরা কখন জানিয়াছিলে ?

সৈন্যগণ উত্তর দিল 'এক প্রহর রজনীতে।'

জয়। 'তাহার পূর্ব্বে কেহই এ কথা জানিতে না ?'

সৈন্য। 'রজনীতে কোন একটি দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে জানিতাম; এই দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে তাহা জানিতাম না।'

জয়। 'ভাল, কোন্ সময়ে তোমরা দুর্গে পৌঁছিয়াছিলে ?'

সৈন্য। 'অনুমান দেড় প্রহর রজনীর সময়।'

জয়। 'উত্তম। এক প্রহর হইতে দেড়প্রহর মধ্যে তোমরা সকলেই কি একত্র ছিলে ? 'অমুক উপস্থিত নাই,' 'অমুক কোথায় গিয়াছে ?' 'অমুক আসিল না কেন ?' তোমাদিগের মধ্যে এরূপ কথা হয় নাই ? যদি হইয়া থাকে প্রকাশ কর। দেখ একজনের জন্য সহস্র জনের গ্লানি অনুচিত ; তোমরা দেশে দেশে পর্ব্বতে পর্ব্বতে গ্রামে গ্রামে মহাবীর রাজা শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, রাজা তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন,তোমরাও এরূপ প্রভু কখনও পাইবে না। আপনাদিগকে বিশ্বাসের যোগ্য প্রমাণ কর, যদি কেহ বিদ্রোহী থাকে তাহাকে আনিয়া দাও যদি সে কল্য রজনীর যুদ্ধে মরিয়া থাকে তাহার নাম কর, অন্যায় সন্দেহে কেন সকলের নাম কলুষিত হইতেছে ? ,,

সৈন্যগণ তখন কল্যকার কথা স্মরণ করিতে লাগিল, পরস্পরের কথা কহিতে লাগিল ; শিবজীর রোষ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিলেন ' মহারাজ ! অদ্য যদি সেই কপট যোদ্ধাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন আমি চিরকাল আপনার নিকট ঋণী থাকিব।'

চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

'রাজন্ ! কল্য এক প্রহর রজনীর সময় যখন আমরা যুদ্ধযাত্রা করি, তখন আমার অধীনস্থ একজন হাবেলদারকে অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই, যখন দুর্গতলে পঁহুছিলাম তখন তিনি আমাদের সহিত যোগ দিলেন।'

ভীষণস্বরে শিবজী বলিলেন 'সে কে, এখনও জীবিত আছে ? '

বিদ্রোহীর নাম শুনিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ !—একটি নিশ্বাসের শব্দ ও শুনা যাইতেছে না, সভাতলে একটি সুচিকা পড়িলে বোধ হয় তাহার শব্দ শুনা যায়। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন,—" রঘুনাথজী হাবেলদার।'

সকলে নির্ব্বাক, বিস্ময়স্তব্ধ !

চন্দ্ররাও একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি সকলে চন্দ্ররাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতিতে ঈর্ষ্যার ন্যায় ভীষণ বলবতী প্রবৃত্তি আর নাই।

শিবজীর মুখমণ্ডল পুনরায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠে দন্ত স্থাপন করিয়া চন্দ্র-

রাওকে লক্ষ্য করিয়া সরোষে বলিলেন—

'নিন্দুক, কপটাচারি! তোমার মিথ্যার রঘুনাথের যশোরাশি স্পর্শ করিবে না, রঘুনাথের আচরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কিন্তু মিথ্যা নিন্দুকের শাস্তি সৈন্যেরা দেখুক।'

সেই বজ্রহস্তে শিবজী লৌহবর্ষা উত্তোলন করিয়াছেন সহসা রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—

'মহারাজ! প্রভু চন্দ্ররাওয়ের প্রাণ সংহার করিবেন না। তিনি মিথ্যাবাদী নহেন, আমার দুর্গতলে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।

আবার সভাস্থল নিস্তব্ধ। নিঃশব্দে সমস্ত সৈন্য রঘুনাথের দিকে অবলোকন করিতেছে!

শিবজী ক্ষণকাল প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন,—"উঃ! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তুমি! রঘুনাথ তুমি এই কার্য্য করিয়াছ! তুমি যে প্রাচীরলঙ্ঘনের সময় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া একাকী অগ্রসর হইতেছিলে, পরে তিনশত সেনা মাত্র লইয়া দ্বিগুণ সংখ্যক আফগানকে পরাস্ত করিয়াছিলে, তুমি বিদ্রোহাচরণ করিয়া কিল্লাদারকে পূর্ব্বে আক্রমণসংবাদ দিয়াছিলে?' শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, 'প্রভু, আমি সে দোষে নির্দ্দোষী।' দীর্ঘকায় নির্ভীক তরুণ যোদ্ধা শিবজীর অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নিষ্কম্প হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না, একটি পত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে না সভাস্থ সকলে, চারিদিকে অসংখ্য লোক সমূহে, রঘুনাথের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে। রঘুনাথজী স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত; তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল কেবল গভীর নিশ্বাসে স্ফীত হইতেছে! কল্য যেরূপ অসংখ্য শত্রুমধ্যে প্রাচীরোপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, অদ্য তদপেক্ষা অধিক সঙ্কট মধ্যে যোদ্ধা সেইরূপ ধীর, সেইরূপ অবিচলিত।

শিবজী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন— 'তবে কি জন্য আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এক প্রহর রজনীর সময় অনুপস্থিত ছিলে?'

রঘুনাথের ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, কোন উত্তর না করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুনাথকে নির্ব্বাক দেখিয়া শিবজীর সন্দেহ বৃদ্ধি হইল, নয়নদ্বয় পুনরায় রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন—

'কপটাচারি! এই জন্য এরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলে? কিন্তু কুক্ষণে শিবজীর নিকট ছলনা চেষ্টা করিয়াছিলে।'

রঘুনাথ সেইরূপ ধীর অকম্পিত স্বরে বলিলেন,—'রাজন্! ছলনা, কপটাচরণ

আমার বংশের রীতি নহে,—বোধ হয় প্রভু চন্দ্ররাও তাহা জানিতে পারেন।' অদ্য প্রথমে রঘুনাথ আপন বংশের উল্লেখ করিলেন।

রঘুনাথের স্থির ভাব শিবজীর ক্রোধে আহুতি স্বরূপ হইল, তিনি কর্কশভাবে বলিলেন—

'পাপিষ্ঠ! নিষ্কৃতি চেষ্টা বৃথা! ক্ষুধার্থ সিংহের গ্রাসে পড়িয়া পলায়ন করিতে পার, কিন্তু শিবজীর জ্বলন্ত ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ নাই।'

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, 'আমি মহারাজের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করি না, মনুষ্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি না, জগদীশ্বর আমার দোষ মার্জ্জনা করুন!'

ক্ষিপ্তপ্রায় শিবজী বর্শা উত্তোলন করিয়া বজ্রনাদে আদেশ করিলেন,—

'বিদ্রোহাচরণের শাস্তি প্রাণদণ্ড।'

রঘুনাথ সেই বজ্রমুষ্টিতে সেই তীক্ষ্ণ বর্শা দেখিলেন, সেই অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—'যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে, বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই।'

শিবজী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অব্যর্থ মুষ্টিতে সেই বর্শা কম্পিত হইতেছে এরূপ সময়ে রাজা জয়সিংহ তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন।

তখন শিবজীর মুখমণ্ডল ক্রোধে বিকৃত হইয়াছিল, শরীর কম্পিত হইতেছিল, তিনি জয়সিংহের প্রতিও সমুচিত সম্মান বিস্মৃত হইলেন, কর্কশ স্বরে কহিলেন—

'হস্ত ত্যাগ করুন; রাজপুতদিগের কি নিয়ম জানি না, জানিতে চাহি না, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সনাতন নিয়ম—বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড; শিবজী সেই নিয়ম পালন করিবে।

জয়সিংহ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "ক্ষত্রিয়রাজ! অদ্য যাহা করিবেন, কল্য তাহা অন্যথা করিতে পারিবেন না। এই যোদ্ধার অদ্য প্রাণদণ্ড করিলেন চিরকাল সে জন্য অনুতাপ করিবেন! যুদ্ধ-নিয়মে আপনি পারদর্শী কিন্তু বৃদ্ধ যে পরামর্শ দিতেছে তাহা অবহেলা করিবেন না।"

শিবজী জয়সিংহের ভদ্রতা দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন 'তাত! আমার পরুষ বাক্য মার্জ্জনা করুন, আপনার কথা কখন ও অবহেলা করিব না; কিন্তু শিবজী বিদ্রোহীকে ক্ষমা করিবে তাহা কখন মনে ভাবে নাই।' পরে রঘুনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

'হাবেলদার! রাজা জয়সিংহ তোমার জীবন রক্ষা করিলেন, কিন্তু আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শিবজী বিদ্রোহীর মুখদর্শন করিতে চাহে না।' তৎক্ষণাৎ পুনরায় বলিলেন 'অপেক্ষা কর; দুই বৎসর হইল তোমার কোষের ঐ অসি আমিই তোমাকে দিয়াছিলাম, বিদ্রোহীর হস্তে আমার অসির অবমাননা হইবে না। প্রহরীগণ! অসি কাড়িয়া লও, পরে বি-

দ্রোহীকে দুর্গ হইতে নিক্রান্ত করিয়া দাও।' প্রহরীগণ সেইরূপ করিল।

রঘুনাথের যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, রঘুনাথ সে সময়ে অবিচলিত ছিলেন, কিন্তু প্রহরীগণ যখন অসি কাড়িয়া লইতেছিল, তখন তাঁহার শরীর ঈষৎ কম্পিত হইল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইল। কিন্তু তিনি সে ভীষণ উদ্বেগ সংযম করিলেন। শিবজীর দিকে একবার চাহিয়া মৃত্তিকা পর্য্যন্ত শির নমাইয়া, নিঃশব্দে দুর্গ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া জগৎ আবৃত করিতেছে, একজন পথিক একাকী নিঃশব্দে পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রান্তরাভিমুখে গমন করিলেন। প্রান্তর পার হইলেন, একটি গ্রামে উপস্থিত হইলেন, সেটি পার হইয়া আর একটি প্রান্তরে আসিলেন। অন্ধকার গভীরতর হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে, অন্ধকারে সে পথিককে আর দেখা গেল না, তাহার পর আর কেহ সে পথিককে দেখিতে পাইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্ররাও জুমলাদার।

'আমা হইতে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ,
হৃদে জ্বলে হলাহল।———'

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্ররাও জুমলাদারের সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়, তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, অসাধারণ বীর্য্য, অসাধারণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তাঁহার বয়স রঘুনাথ অপেক্ষা ৫। ৬ বৎসর অধিক মাত্র, কিন্তু দূর হইতে দেখিলে সহসা তাঁহাকে পঞ্চত্রিংশৎ বৎসরের লোক বলিয়া বোধ হয়। প্রশস্ত ললাটে এই বয়সেই দুই একটি চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, মস্তকের কেশ দুই একটি শুক্ল। নয়ন অতিশয় উজ্জ্বল ও তেজোব্যঞ্জক, কিন্তু চন্দ্ররাওকে যাঁহারা বিশেষ করিয়া জানিতেন তাঁহারা বলিতেন যে চন্দ্ররাওয়ের তেজ ও সাহস যেরূপ দুর্দ্দমনীয়, গভীর দূরদর্শী চিন্তা এবং ভীষণ অনিবার্য্য স্থির প্রতিজ্ঞাও সেইরূপ। সমস্ত মুখমণ্ডলে এই দুইটি ভাব বিশেষ রূপে ব্যক্ত হইত। দেহ যেন লৌহবিনির্ম্মিত ও অসীম পরাক্রান্ত; যাঁহারা চন্দ্ররাওয়ের অসীম পরাক্রম, বিজাতীয় ক্রোধ গভীর বুদ্ধি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা কখনই সেই অল্পভাষী স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভয়ানক জুমলাদারের সহিত বিবাদ করিতেন না। এ সমস্ত ভিন্ন চন্দ্ররাওয়ের আর একটি গুণ বা দোষ ছিল তাহা কেহই বিশেষরূপে জানিত না। বিজাতীয় উচ্চাভিলাষে তাঁহার হৃদয় দিবারাত্র জ্বলিত। অসাধারণ বুদ্ধিসঞ্চালনে আত্মোন্নতির পথ আবিষ্কার করিতেন, অতুল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত সেই পথ অবলম্বন করিতেন, খড়্গহস্তে সে পথ পরিষ্কার

করিতেন ; শত্রু হউক, মিত্র হউক, দোষী হউক, নির্দ্দোষী হউক, অপকারী হউক বা পরম উপকারী হউক, সে পথের সম্মুখে যিনি পড়িতেন,উচ্চাভিলাষী চন্দ্ররাও নিঃসঙ্কোচে পতঙ্গবৎ তাহাকে পদ-দলিত করিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিতেন। অজ্ঞ বালক রঘুনাথ ঘটনাবশতঃ সেই পথের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, তাহাকে পতঙ্গবৎ দলিত করিয়া জুমলাদার পথ পরিষ্কার করিলেন। এরূপ অসাধারণ পুরুষের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক ; সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের বংশবৃত্তান্তও কিছু কিছু জানিতে পারিব।

তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত তিনি প্রকাশ করিতেন না, আমরাও জানি না, অতি উন্নত রাজপুতকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন। রাজা যশোবন্ত সিংহের একজন প্রধান সেনানী গজপতি সিংহ চন্দ্ররাওকে বাল্যকালে লালনপালন করিয়াছিলেন। অনাথ বালক গজপতির গৃহের কার্য্য করিত, গজপতির পুত্র কন্যাকে যত্ন করিত, ও সেই সংসারের মধ্যে থাকিয়া কালযাপন করিত।

যখন চন্দ্ররাওয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র,তখনই গজপতি তাঁহার গভীর চিন্তা ও বুদ্ধি, দুর্দ্দমনীয় তেজ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, নিজ পুত্র রঘুনাথের ন্যায় চন্দ্ররাওকে ভাল বাসিতেন, ও এই কোমল বয়সেই আপন অধীনে সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন।

সৈনিকের ব্রত ধারণ করিয়া অবধিই চন্দ্ররাও দিন দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া প্রাচীন যোদ্ধাগণও বিস্মিত হইত। যুদ্ধে যে স্থানে অতিশয় বিপদ্, যে স্থানে প্রাণনাশের অতিশয় সম্ভাবনা, যে স্থানে শত্রু ও মিত্রের শব রাশীকৃত হইতেছে, রক্তস্রোত বহিয়া যাইতেছে, ধূলি ও ধূমে গগন আচ্ছাদিত হইতেছে, যোদ্ধার ভীষণ হুঙ্কারে ও আর্ত্তের আর্ত্তনাদে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে,—তথায় অন্বেষণ কর, পঞ্চদশ বর্ষের বালক নিঃশব্দে অসুর-বীর্য্য প্রকাশ করিতেছে ; মুখে রব নাই, কিন্তু নয়ন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত, ললাট কুঞ্চিত ও বিজাতীয় ক্রোধচ্ছায়ায় কৃষ্ণবর্ণ! যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যে স্থানে যুদ্ধজয়ী সেনাগণ একত্র হইয়া রজনীতে গীত বাদ্য করিতেছে, হাস্য ও আমোদ করিতেছে,—চন্দ্ররাও তথায় নাই ; অল্পভাষী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক শিবিরের অন্ধকারে একাকী বসিয়া রহিয়াছে, অথবা কুঞ্চিত ললাটে প্রান্তরে বা নদীতীরে একাকী সায়ংকালে পাদচারণ-করিতেছে! চন্দ্ররাওয়ের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হইল, তিনি এক্ষণে অজ্ঞাত ব্রাহ্মণশিশু নহেন, তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছে, গজপতি সিংহের অধীনস্থ সমস্ত সেনার মধ্যে চন্দ্ররাও এক্ষণে একজন অসাধারণ সাহসী তেজস্বী বীর বলিয়া পরিচিত। মর্য্যাদাবৃদ্ধির সহিত চন্দ্ররাওয়ের উচ্চাভিলাষ ও গর্ব্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

একদিন একটি যুদ্ধে চন্দ্ররাওয়ের বিক্রম দেখিয়া গজপতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, বিজয়ের পর চন্দ্ররাওকে নিকটে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে যথোচিত সম্মান করিয়া বলিলেন 'চন্দ্ররাও! অদ্য তোমার সাহসেই আমাদিগের যুদ্ধে জয় হইয়াছে, ইহার পুরস্কার তোমাকে কি দিতে পারি?' চন্দ্ররাও মুখ অবনত করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন 'প্রভুর সাধুবাদে দাস যথেষ্ট পুরস্কৃত হইয়াছে, আর অধিক সে কি চাহিতে পারে?' গজপতি সস্নেহে বলিলেন 'মনে ভাবিয়া দেখ, যাহা ইচ্ছা হয় প্রকাশ করিয়া বল। অর্থ, ক্ষমতা, পদবৃদ্ধি,—চন্দ্ররাও! তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই।' চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে নয়ন উঠাইয়া বলিলেন,—

'রাজপুত বীর কখনও অঙ্গীকার অন্যথা করেন না জগতে বিদিত আছে। বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে আমার সহিত বিবাহ দিন।'

সভাস্থ সকলে নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ! গজপতির মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইল; অসি কোষ হইতে অর্দ্ধেক নিষ্কোষিত করিলেন, কিন্তু সে ক্রোধ কথঞ্চিৎ সংযম করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন—

'অঙ্গীকার পালনে স্বীকৃত আছি, কিন্তু তোমার মহারাষ্ট্র দেশে জন্ম, রাজপুতদুহিতাদিগের দস্যু মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত পর্ব্বতকন্দরে ও জঙ্গলমধ্যে থাকিবার অভ্যাস নাই। অগ্রে লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ কর, পরে মহারাষ্ট্রীয় ভৃত্যের সহিত রাজবংশীয়া বালিকার বিবাহ দিবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাইবে। এখন অন্য কোন যাচ্ঞা আছে?'

সভাস্থ সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন 'অন্য কোন যাচ্ঞা এক্ষণে নাই, যখন থাকিবে প্রভুকে জানাইব।'

সভা ভঙ্গ হইল, সকলে নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল, উদারচেতা গজপতি চন্দ্ররাওয়ের প্রতি ক্রোধ অচিরাৎ বিস্মৃত হইলেন, সেদিনকার কথা শীঘ্র বিস্মৃত হইলেন। চন্দ্ররাও সে কথা বিস্মৃত হইলেন না, সেই দিন সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে আপন শিবিরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন, প্রায় দুই দণ্ড এইরূপে পাদচারণ করিলেন, শিবির অন্ধকার, কিন্তু তাহা অপেক্ষা দুর্ভেদ্য অন্ধকার চন্দ্ররাওয়ের হৃদয় ও ললাটে বিরাজ করিতেছিল। তাঁহার সে সময়ের ভাব বর্ণনা করিতে আমরা অশক্ত, সে সময়ে তাঁহার মুখের ভীষণ আকৃতি দেখিলে বোধ হয় স্বয়ং মৃত্যুও চকিত হইতেন।

দুই দণ্ডের পর চন্দ্ররাও একটি দীপ জ্বালিলেন,—একখানি পুস্তকে সযত্নে কি লিখিলেন, পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন, আবার খুলিলেন, আবার দেখিলেন, আবার বন্ধ করিলেন। ঈষৎ বিকট হাস্য মুখমণ্ডলে দেখা গেল।

তাঁহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘চন্দ্র! কি লিখিতেছ?’ চন্দ্ররাও সহজ অবিচলিত স্বরে বলিলেন ‘কিছু নহে, হিসাব লিখিয়া রাখিতেছি, আমি কাহার নিকট কি ধারি তাহাই লিখিতেছি।’

বন্ধু চলিয়া গেল! চন্দ্ররাও পুনরায় পুস্তকখানি খুলিলেন। সেইটি যথার্থই হিসাবের পুস্তক, চন্দ্ররাও একটি ঋণের কথাই লিখিয়াছিলেন। পুনরায় পুস্তক বন্ধ করিয়া দীপ নির্ব্বাণ করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আরংজীবের সহিত যশোবন্তের উজ্জয়িনী সন্নিধানে মহাযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গজপতি সিংহ হত হয়েন, কিন্তু যে তীর তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করে তাহা শত্রুহস্ত নিক্ষিপ্ত নহে।

তাহার পর যখন যশোবন্তের রাজ্ঞী সেই যুদ্ধে পতির পরাজয়ের কথা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিলেন, তখন একজন সংবাদ দিল যে গজপতি নামক একজন সেনানীর ভীরুতা ও কপটাচারিতাতেই পরাজয় সাধন হইয়াছে। রাজ্ঞী সে সময়ে বিচার করিতে অসমর্থ, আদেশ করিলেন যে কপটাচারীর সন্তান সন্ততি মাড়ওয়ার হইতে দূরীকৃত হয়, ও সমস্ত সম্পত্তি রাজাধীনে নীত হয়! গজপতির কপটাচারিতার সংবাদ কে দিল তাহা স্পষ্ট প্রকাশ হইল না।

গজপতির অনাথা বালক ও বালিকা মাড়ওয়ার হইতে দূরীকৃত হইয়া পদব্রজে অন্য দেশে যাইতেছিল, রঘুনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, লক্ষ্মীর নয় বৎসর মাত্র, সঙ্গে কেবল একমাত্র পুরাতন ভৃত্য। রাজ্ঞীর ভয়ে হতভাগাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেও কেহ সাহস করিল না। পথিমধ্যে একদল দস্যু সেই ভৃত্যকে হত্যা করিয়া বালকবালিকাকে মহারাষ্ট্রদেশে লইয়া যাইল। বালক অল্পবয়সেই তেজস্বী; রজনীযোগে দস্যুদিগের শিবির হইতে পলায়ন করিল, বালিকাকে দস্যুপতি বলপুর্ব্বক বিবাহ করিলেন। তিনি চন্দ্ররাও!

তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্ররাওয়ের মনোরথ কতক পরিমাণে পূর্ণ হইল। গজপতির সংসার হইতে প্রভুত অর্থ ও মণি মাণিক্য আনিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ জায়গীর কিনিলেন, মহারাষ্ট্রে একজন সমাদৃত সম্ভ্রান্ত লোক হইলেন। ‘টাকা থাকিলে সব সাজে,—’ চন্দ্ররাওয়ের বংশ এক পুরাতন রাজপুতবংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথা কেহ অবিশ্বাস করিল না, তিনি প্রসিদ্ধনামা রাজপুত গজপতি সিংহের একমাত্র দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন সকলে দেখিতে পাইল, তাঁহার যথার্থ সাহস বিক্রম দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে জুমলাদারের পদ দিলেন, তাঁহার বিপুল অর্থ জায়গীর ও বাহ্যাড়ম্বর দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সমাজে সমাদর করিলেন। চন্দ্ররাও আরও দুই তিনটি বড় ঘরে বিবাহ করিলেন, বড় লোকের স-

হিত মিশিতে লাগিলেন, বড় রকম চাল অবলম্বন করিলেন। আর কি করিলেন বলার আবশ্যক কি? যে সমস্ত সুন্দর কৌশলে আমরাই 'বড় লোক' হই, সমাজের শিরোভূষণ হই, পদ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করি, সঙ্গে সঙ্গে দম্ভ ও গাম্ভীর্য্যও বৃদ্ধি করি,—চন্দ্ররাও তাহাই করিলেন। তবে চন্দ্ররাও অসভ্য, তিনি স্বহস্তে পিতাস্বরূপ গজপতিকে হনন করিয়া সে উন্নত বংশের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন—আমরা সুসভ্য, আমরা চাতুরী ও মোকদ্দমা স্বরূপ সুন্দর উপায়ে কত সোণার সংসার ছার খার করি, কেহ নিন্দা করিতে পারে না, কেননা এ সভ্য 'আইন সঙ্গত' উপায়। চন্দ্ররাও অসভ্য, যুদ্ধে ভীষণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া আপন পদবৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেন, দেশে দেশে যশোবিস্তারের চেষ্টা পাইতেন। আমরা সুসভ্য, বক্তৃতা স্বরূপ বাগ্‌যুদ্ধে বা সংবাদপত্র স্বরূপ লেখনীযুদ্ধে ভীষণ বিক্রম দেখাইয়া রাজার নিকট উপাধি প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করি, অচিরে 'দেশহিতৈষী মহল্লোক' হইয়া উঠি। চারিদিকে জয়ধ্বনি বাজিতে থাকে, সংবাদপত্রের ভেরী বাজিতে থাকে, দেশে দেশে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে—আমরা 'বড়লোক।'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মীবাই।

"স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার যে বিধাতা।
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনা অন্যজন,
কেহ নহে সুখ মোক্ষদাতা।"
মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় রঘুনাথ দস্যুবেশী চন্দ্ররাও দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজস্থান হইতে মহারাষ্ট্রদেশে নীত হইয়াছিলেন। এক দিন রজনীযোগে তিনি পলায়ন করেন, পর্ব্বতকন্দরে, বনমধ্যে, প্রান্তরে, বা গৃহস্থের বাটিতে, কয়েক দিন লুক্কায়িত থাকেন, সুন্দর অনাথ অল্পবয়স্ক বালককে দেখিয়া কেহই মুষ্টিভিক্ষা দিতে পরাঙ্মুখ হইত না।

তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর রঘুনাথ নানা স্থানে নানা কষ্টে অতিবাহিত করিল। সংসার স্বরূপ অনন্ত সাগরে অনাথ বালক একাকী ভাসিতে লাগিল। নানা দেশে পর্য্যটন করিল, নানা লোকের নিকট ভিক্ষা বা দাসত্বরত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিল। পূর্ব্ব গৌরবের কথা, পিতার বীরত্ব ও সম্মানের কথা, বালকের মনে সর্ব্বদাই জাগরিত হইত, কিন্তু অভিমানী বালক সে কথা, সে দুঃখ, কাহাকেও বলিত না, কখন কখন দুঃখভার সহ্য করিতে না পারিলে নিঃশব্দে প্রান্তরে বা পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি উ-

পবেশন করিয়া একাকী প্রাণ ভরিয়া রোদন করিত, পুনরায় চক্ষের জল মোচন করিয়া স্বকার্য্যে যাইত।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বংশোচিত ভাব হৃদয়ে যেন আপনিই জাগরিত হইতে লাগিল। অল্প বয়স্ক ভৃত্য গোপনে কখন কখন প্রভুর শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধারণ করিত, প্রভুর অসি কোষে ঝুলাইত। সন্ধ্যার সময় প্রান্তরে বসিয়া দেশীয় চরণদিগের গান উচ্চৈঃস্বরে গাইত, নৈশপথিকেরা পর্ব্বতগুহায় সংগ্রাম সিংহ বা প্রতাপের গীত শুনিয়া চমকিত হইত। যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়স তখন রঘুনাথ শিবজীর কীর্ত্তি, শিবজীর উদ্দেশ্য, শিবজীর বীর্য্যের কথা, চিন্তা করিতেন। রাজস্থানের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়দেশ স্বাধীন হইবে, শিবজী দক্ষিণদেশে হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবেন, চিন্তা করিতে করিতে বালকের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইল, তিনি শিবজীর নিকট যাইয়া একটি সামান্য সেনার কার্য্য প্রার্থনা করিলেন।

শিবজী লোক চিনিতে অদ্বিতীয়, কয়েক দিনের মধ্যে রঘুনাথকে চিনিলেন, একটি হাবেলদারী পদে নিযুক্ত করিলেন, ও তাহার কয়েক দিবস পরেই তোরণদুর্গে পাঠাইলেন। পথে রঘুনাথের সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

রঘুনাথ হাবেলদারী পদ পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। রঘুনাথের শিবজীর নিকট আগমনের সময় চন্দ্ররাও জুমলাদারের অধীনে একজন হাবেলদারের মৃত্যু হয়, তাহারই পদ রঘুনাথ প্রাপ্ত হয়েন। রঘুনাথ চন্দ্ররাওকে পিতার পুরাতন ভৃত্য ও আপন বাল্যসুহৃৎ বলিয়া চিনিলেন; পিতৃহন্তা, বা দস্যুরূপী, বা ভগিনীপতি বলিয়া জানিতেন না, সুতরাং তিনি সানন্দে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাইলেন। চন্দ্ররাও রঘুনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু অল্পভাষী জুমলাদারের ললাট অদ্য পুনরায় কুঞ্চিত হইল।

দিনে দিনে রঘুনাথজীর সাহস ও বিক্রমের যশ অধিক বিস্তার হইতে লাগিল, চন্দ্ররাওয়ের চিন্তা গভীরতর হইল। পতঙ্গ বা কীট আমাদের পথের সম্মুখে আসিলে আমরা পদসঞ্চালন দ্বারা দুর্ভাগ্যকে হত করিয়া পথ পরিষ্কার করি—চন্দ্ররাও ও কোনদিন গোপনে রঘুনাথকে হনন করিয়া আপন পথ পরিষ্কার করিবেন ভাবিলেন। কিন্তু যখন রঘুনাথের যশোরাশি তাঁহার নিজের যশকেও ম্লান করিল, যখন লোকে বালকের সাহস দেখিয়া বিক্রমশালী চন্দ্ররাওয়ের বিক্রম ও বিস্মৃত হইতে লাগিল, চন্দ্ররাও তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন 'এ বালককে ভীষণতর শাস্তি দেওয়া আবশ্যক,—ইহার যশ বিনষ্ট করিব।' চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্ররাওয়ের নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, মৃত্যুর ছায়া যেন সেই কুঞ্চিত ললাটকে আবৃত করিল।

চন্দ্ররাওয়ের স্থির প্রতিজ্ঞা কখন ও বিচলিত হইত না, গভীর মন্ত্রণা কখনও ব্যর্থ হইত না। অদ্য রঘুনাথজী দৈবযোগে প্রাণে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু বিদ্রোহী কপটাচারী বলিয়া শিবজীর কার্য্য হইতে দূরীকৃত হইলেন।

চন্দ্ররাওও শিবজীর নিকট কয়েক দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী যাইলেন। পাঠক চল চল, আমরাও এক বার বড়লোকের বাটী সভয়ে প্রবেশ করি।

জুমলাদার বাটী আসিলেন, বহির্দ্বারে নহবৎ বাজিতে লাগিল,দাস দাসী শশব্যস্তে প্রভুর সম্মুখে আসিল, গৃহিনীগণ পতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন, প্রতিবাসীগণ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, অচিরে চন্দ্ররাওয়ের আগমন বার্ত্তা সমগ্র গ্রামে রাষ্ট্র হইল।

সায়ংকালে চন্দ্ররাও অন্তঃপুরে আসিলেন, লক্ষ্মীবাই ভক্তি ভাবে স্বামীর চরণে প্রণত হইলেন, পরে আহারাদির আয়োজন করিয়া স্বামীকে আহ্বান করিলেন। চন্দ্ররাও আহারে বসিলেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই যথার্থ লক্ষ্মীস্বরূপা, শান্তা, ধীরা, বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা। বাল্যকালে পিতার আদরের কন্যা ছিলেন, কিন্তু কোমল বয়সে বিদেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে অল্পভাষী কঠোরস্বভাব স্বামীর হস্তে পড়িলেন, বৃক্ষ হইতে উৎপাটিত কোমল পুষ্পের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন। নয় বৎসরের বালিকার জীবন শোকাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু সে শোক কাহাকে জানাইবে? কে দুটা কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে? বালিকা পুর্ব্ব কথা স্মরণ করিত, পিতার কথা স্মরণ করিত, প্রাণের সহোদরের কথা স্মরণ করিত, আর গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিত।

শোকে পড়িলে, কষ্টে পড়িলে, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, আমাদের হৃদয় ও মন শান্ত, সহিষ্ণু হয়। বালিকা দুই এক বৎসরের মধ্যেই সংসারের কার্য্য করিতে লাগিলেন, স্বামীর সেবায় রত হইলেন। হিন্দু-রমণীর পতি ভিন্ন আর কি গতি আছে? স্বামী যদি সহৃদয় ও সদয় হয়েন, নারী আনন্দে ভাসিয়া তাঁহার সেবা করেন, স্বামী নির্দ্দয় বা বিমুখ হইলেও নারীর পতিসেবা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? চন্দ্ররাওয়ের হৃদয়ে প্রণয় বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না, অভিমান, জিঘাংসা, উচ্চাভিলাষ, অপুর্ব্ব বিক্রমে সে হৃদয় পুর্ণ; তথাপি তিনি স্ত্রীর প্রতি নির্দ্দয় ছিলেন না, দাসী লক্ষ্মীবাইয়ের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতেন, লক্ষ্মীও দাসী স্বরূপ স্বামীর যথেষ্ট সেবা করিতেন, স্বামীর স্বভাব জানিয়া সর্ব্বদা ভীত থাকিতেন, একটি মিষ্ট কথা শুনিলে আপনাকে পরমা ভাগ্যবতী বিবেচনা ক-

রিতেন, স্বামীর একান্ত প্রণয় কি কখন জানিতেন না, সুতরাং কখন আশা করেন নাই।

এইরূপে সংসারকার্য্যে ও পতিসেবায় এক বৎসরের পর আর এক বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, ধীর শান্ত লক্ষ্মী যৌবনপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে যৌবন কি শান্ত, নিরুদ্বেগ! পূর্ব্বের কথা প্রায় ভুলিয়া গেলেন, অথবা যদি সায়ংকালে কখন রাজস্থানের কথা মনে উদয় হইত, বাল্যকালের সুখ, বাল্যকালের ক্রীড়া ও প্রাণের ভ্রাতা রঘুনাথের কথা মনে হইত, যদি নিঃশব্দে দুই এক বিন্দু অশ্রু সেই সুন্দর রক্তশূন্য গণ্ডস্থল দিয়া গড়াইয়া যাইত,লক্ষ্মী সে অশ্রু বিন্দু মোচন করিয়া পুনরায় গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

ক্রমে চন্দ্ররাও আরও চারি পাঁচটি দার পরিগ্রহ করিলেন, কাহারও উচ্চবংশের জন্য, কাহারও বিপুল অর্থের জন্য, কাহারও বিস্তীর্ণ জায়গীরের জন্য, এই সকল কন্যা গ্রহণ করিলেন। চন্দ্ররাও বালক নহেন,প্রণয় বা সৌন্দর্য্যের জন্য কাহাকেও বিবাহ করেন নাই। তথাপি লক্ষ্মীবাই ঘরের গৃহিণী বটে,—তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, তিনি প্রথম স্ত্রী ও প্রসিদ্ধ রাজপুতবংশ-সমুদ্ভূতা এই জন্য। চন্দ্ররাও সকলকে ভূরি ভূরি গহনা, ভূরিভূরি অর্থ ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি দিতেন, কেহ কোথাও যাইলে অনেক দাস দাসী, অশ্ব, হস্তী পদাতিক ও বাদ্যকর সঙ্গে দিতেন, সকলেই জানিতে পারিতেন চন্দ্ররাওয়ের পরিবার যাইতেছেন, এ সমস্ত আড়ম্বর তাঁহার আপনার মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য, রমণীদিগের মনস্তুষ্টির জন্য তত নহে। বাটিতে সকল রমণীই পতিকে সমান ভয় করিতেন, দাসীর ন্যায় সকলেই প্রভুর সেবা করিতেন।

চন্দ্ররাও আহারে বসিয়াছেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতেছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বয়ঃক্রম একণে সপ্তদশ বর্ষ। অবয়ব কোমল, উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়, কিন্তু ঈষৎ ক্ষীণ। ভ্রূযুগল কি সুন্দর সুচিক্কণ, যেন সেই পরিষ্কার শান্ত ললাটে তুলী দ্বারা ন্যস্ত। শান্ত, কোমল, কৃষ্ণ নয়ন দুটিতে যেন চিন্তা আপনার আবাসস্থান করিয়াছে। গণ্ডস্থল সুন্দর, সুচিক্কণ, কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ. সমস্ত শরীর শান্ত ও ক্ষীণ। যৌবনের অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকাশিত রহিয়াছে, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্লতা,উন্মত্ততা কৈ? আহা! রাজস্থানের এই অপূর্ব্ব পুষ্পটি মহারাষ্ট্রে সেইরূপ সৌন্দর্য্য ও সুঘ্রাণ বিতরণ করিতেছে, কিন্তু জীবনাভাবে শুষ্ক, নতশির। পদ্মাসনা লক্ষ্মীর ন্যায় লক্ষ্মীবাইয়ের চারু নয়ন, সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশভার, কোমল সুগোল দেহ দেখিতেছি, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্ল সূর্য্যকিরণ নাই, জীবনাকাশ চিন্তামেঘাচ্ছন্ন।

চন্দ্ররাও গজপতিকে হনন করিয়াছেন, লক্ষ্মী ততদূর জানিতেন না, কিন্তু

স্বার্থসাধনের জন্য পিতার বংশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহা চন্দ্ররাওয়ের আচরণে ও কখন কখন দুই একটি কথা হইতে বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভয়ে সে বিষয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না।

একদিন চন্দ্ররাও লক্ষ্মীকে জানাইলেন যে তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্রাওয়ের অধীনে হাবেলদার হইয়াছে ও যশোলাভ করিয়াছে। কথাটি সাঙ্গ হইলে চন্দ্র ঈষৎ হাসিলেন; লক্ষ্মী স্বামীকে জানিতেন, সে হাসি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ শুষ্ক হইয়া গেল।

রঘুনাথ কেমন আছেন, কি করিতেছেন, ইত্যাদি নানা ভাবনা সর্ব্বদাই লক্ষ্মীর মনে জাগরিত হইত, কিন্তু স্বামীকে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না, স্বামী বাটি আসিলে তাঁহার অধীনস্থ পদাতিক বা ভৃত্যদিগকে অর্থে বশ করিয়া গোপনে সংবাদ জানিতেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদাই ভয় হইত পাছে স্বামী ভ্রাতার অনিষ্টসাধন করেন। কি জন্য এরূপ ভয় হইত তিনি জানিতেন না।

একদিন স্বামীর দুই একটি মিষ্টবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া লক্ষ্মী স্বামীর পদযুগলের নিকট বসিয়া বলিলেন— ,দাসীর একটি নিবেদন আছে কিন্তু বলিতে ভয় করে।'

চন্দ্ররাও শয়ন করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন, সস্নেহে বলিলেন—' কি বল না।'

লক্ষ্মী বলিলেন ' আমার ভ্রাতা বালক অজ্ঞান।'

চন্দ্ররাওয়ের মুখ গম্ভীর হইল।

লক্ষ্মী ভীত হইলেন, কিন্তু তথাপি ভাবিলেন কপালে যাহা থাকে আজ বলিব। প্রকাশ্যে বলিলেন—

' সে আপনার ভৃত্য, আপনারই অধীন।' চন্দ্ররাও ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—

' না, সে আমা অপেক্ষাও সাহসী বলিয়া পরিচিত।'

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন তিনি যাহা ভয় করিতেছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে, —চন্দ্রাও রঘুনাথের উপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ! ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিলেন—

' বালক যদি দোষ করে, আপনি না মার্জ্জনা করিলে কে করিবে?'

চন্দ্ররাও পরুষস্বরে বলিলেন, ' নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের নিকট চন্দ্ররাও পরামর্শ লয় না, বিরক্ত করিও না।'

লক্ষ্মী বুঝিলেন চন্দ্ররাওয়ের শরীরে ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে; অন্য বিষয় হইলে আর একটি কথা কহিতেও সাহস করিতেন না, কিন্তু ভ্রাতার জন্য স্নেহময়ী ভগ্নী কি না করিতে পারে? চন্দ্ররাওয়ের পদে লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিয়া বলিলেন ' দাসীর নিকট প্রতিজ্ঞা করুন রঘুনাথের আপনি কোন অনিষ্ট করিবেন না।'

চন্দ্ররাওয়ের নয়ন আরক্ত হইল, তিনি লক্ষ্মীকে সজোরে পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

তাহার পর চন্দ্ররাও অদ্যই প্রথম বাটি আসিয়াছেন, রঘুনাথের যাত্রা ঘটিয়াছে লক্ষ্মী তাহা জানেন না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় চিন্তাকুল, মুখ ফুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, রজনীতে স্বামী নিদ্রিত হইলে ভৃত্যদিগের নিকট ভ্রাতার সংবাদ লইবেন মনে স্থির করিয়াছিলেন।

চন্দ্ররাওয়ের আহার সমাপন হইল, তিনি শয়নাগারে যাইলেন, লক্ষ্মী তাম্বুল হস্তে তথায় যাইলেন। চন্দ্ররাও তাম্বুল লইয়া বলিলেন—

'এখন যাও,আমার বিশেষ কার্য্য আছে, যখন ডাকিব, তখন আসিও।' লক্ষ্মীর সহিত এই তাঁহার প্রথম সম্ভাষণ। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে যাইলেন, চন্দ্ররাও সতর্ক ভাবে দ্বারকদ্ধ করিলেন।

ধীরে ধীরে একটি গুপ্তস্থান হইতে একটি বাক্স বাহির করিলেন, সেটি খুলিলেন, একখানি পুস্তক বাহির করিলেন। দেখিতে হিসাবের পুস্তক। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে গজপতি কর্ত্তৃক যে দিন সভায় অবমানিত হইয়াছিলেন, সে দিন সেই পুস্তকে একটি ঋণের কথা লিখিয়াছিলেন, সেই পাত খুলিলেন, সুন্দর স্পষ্ট হস্তাক্ষর সেইরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছেঃ—

' মহাজন····গজপতি ;

ঋণ······ অবমাননা ;

পরিশোধ হইবে তাঁহার হৃদয়ের শোণিতে

তাঁহার সম্পত্তি নাশে, তাঁহার বংশের অবমাননায়।

একবার, দুইবার, এই অক্ষরগুলি পড়িলেন ; ঈষৎহাস্য সেই বিকট মুখমণ্ডলে দেখা দিল, সেই স্থানে লিখিলেন।

' অদ্য পরিশোধ হইল।'

তারিখ দিয়া পুস্তক বন্ধ করিলেন।

দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, লক্ষ্মী ভক্তি ভাবে স্বামীর নিকটে আসিলেন ; চন্দ্ররাও লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "অনেক দিনের একটি ঋণ অদ্য পরিশোধ করিয়াছি।'

লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিলেন !

চন্দ্ররাওয়ের সুন্দর অনিন্দনীয় হিসাবে অদ্য একটি ভুল হইল। এ ঋণ পরিশোধকার্য্য অদ্য সমাপ্ত হয় নাই,—আর এক দিন হইবে।

শিক্ষা ও মানসিক পরিবর্ত্তন

কোন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, সমাজের জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য পনের আনা শিক্ষাপ্রসাদাৎ। কৃষকসন্তানে এবং বিজ্ঞানবিৎ তনয়ে এমন কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাকে আমরা স্বভাবজাত পার্থক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। যখন উভয়েই পঞ্চমবর্ষীর বালক মাত্র, তখন উভয়েরই স্বভাব প্রায় একরূপ। একই ধুলাখেলা, প্রায় এক প্রকার দ্রব্যেই অভিরুচি, ঈপ্সিত দ্রব্য না পাইলে উভয়েরই ক্রন্দন ইত্যাদি নানা প্রকার একতা লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু বয়োপ্রাপ্ত হইবা মাত্রই একজন গরু লইয়া মাঠে লাঙ্গল দিতে চলিল, আর অপর বিদ্যালয়ে ঢুকিয়া লেখা পড়া শিখিয়া নিউটন ও হুকের আবিষ্কার সকল পরীক্ষা করিতে লাগিল। এই সন্ধিস্থান হইতেই তাহাদিগের বিভিন্নতার সূত্রপাত। ত্রিশ বৎসর পরে দেখ একজন আকাশস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর নিয়মানুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল, আর অপরের সেই মাঠে সেই গরু লইয়া জ্বালাতন। সুতরাং ইহাদিগের স্বভাবজাত বৈলক্ষণ্য যে কিছু ছিল, ইহা কোন অংশে সপ্রমাণিত হইতেছেনা। কৃষককেও যদি পণ্ডিত সন্তানের সহিত একত্রে লেখা পড়া শিখান যাইত, হয়ত তাহা হইলে সেও তাহার মত বিজ্ঞ হইতে পারিত। প্রতিভার কথা স্বতন্ত্র, কারণ কৃষককে ছাড়িয়া দিয়া সভ্যসমাজ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই যে, এক পণ্ডিতের দুই পুত্র সমান সৌভাগ্যশালী হইতে পারে না। তবে ইহা স্থির হইবে যে সকল অসভ্যজাতিরা মুর্খ হইয়া থাকিব বলিয়া জন্মিয়াছে, এটি ঠিক কথা নহে। সভ্যজাতিদের সহিত যদি তাহারাও লেখা পড়া শিখিতে পায়, সম্ভবতঃ তাহারাও সভ্যদের সহিত সমান আসন অধিকার করিতে পারে। এই জন্যই উক্ত পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, সমাজের জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য পনের আনা শিক্ষাপ্রসাদাৎ। এই মতাবলম্বীরা আরও বলিয়া থাকেন যে বিধাতার পক্ষপাতিত্ব আমরা দেখিতে চাহি না; এবং যাহাতে তাঁহাকে পক্ষপাতী প্রমাণ করে, তাহা বিশ্বাস করিতেও চাহি না। মুল কথা, শিক্ষাই আমাদিগের জ্ঞানগত বৈলক্ষণের কারণ।

এই মতটি ঠিক সত্য নহে ইহা আমরা দেখাইব। প্রথমতঃ এতৎসম্বন্ধে দুই একটি আনুষঙ্গিক কথার অবতারণা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

সকলেই জানেন যে, আমাদিগের মানসিক ভাবের সহিত কতকগুলি শারীরিক অঙ্গভঙ্গির সম্বন্ধ আছে। দুঃখ হইলে আমরা ক্রন্দন করি। ক্রন্দন না করিলেও মুখের অনেকটা বিকৃতি হয়—চক্ষু ছোট হইয়া যায়; চক্ষের তারা প্রায় অদৃশ্য হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবলবেগে বহিতে থাকে; কপোল কুঞ্চিত হয়; মস্তকে ভার বোধ হয় এবং সাধারণতঃ হস্তোপরি মস্তক রাখিয়া থাকি। আহ্লাদ হইলে চক্ষু দীর্ঘ হয়; হনুদ্বয় উচ্চ হইয়া উঠে এবং অল্প অল্প দন্ত বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ মানসিক ভাবের সহিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রক্রিয়ার সম্বন্ধ। * অভ্যাসবশে এই সম্বন্ধ ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়া যায়। কখন কখন আবার কোন কোন অঙ্গচালনা কোন কোন ভাবের সহিত আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক সংলগ্ন করিয়া থাকি। এবং এই অঙ্গচালনাগুলি তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট মানসিক ভাবের সহিত সময়ে এরূপ জড়িত হইয়া যায় যে, যখনি মনে কোন ভাব উদয় হয়, তখনি যেন তদানুষঙ্গিক অঙ্গ চালনাটি আপনি আসিয়া পড়ে। পূর্ব্বে যেটি চেষ্টাসাধ্য ছিল এখন সেটি স্বভাবজাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকের অঙ্গভঙ্গী সম্বন্ধে কতকগুলি কু অভ্যাস আছে, সেগুলি এরূপ স্বাভাবিকমত বোধ হয়, যে কর্ত্তার অজ্ঞাতে এবং কখন কখন অনিচ্ছায় তাহারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা বোধ করি সকলেই দেখিয়াছেন।

আর এক কথা। পাঠক মাত্রেই জানেন, যে আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আমরা বহির্জ্জগতের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। তাহার উপায় এইরূপ। মস্তিষ্ক হইতে আমাদিগের শরীরের চারিদিকে ধমনী সকল (Nerves) প্রবাহিত হইয়াছে। মস্তকটি যেন কেন্দ্র স্বরূপ। পৃষ্ঠ দণ্ড হইতে কতকগুলি ধমনী বাহির হইয়াছে, সে গুলিরও কার্য্য প্রায় মস্তিষ্ক নিঃসারিত ধমনীর মত। ইহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বহির্জ্জগতের সংবাদ মস্তিষ্কে লইয়া যায়। এবং মস্তিষ্ক হইতে সংবাদ লইয়া আসিতে হইলে অপর গুলির প্রয়োজন। হস্তে কোন আঘাত লাগিলে প্রথম শ্রেণীর ধমনী মস্তিষ্কে সংবাদ লইয়া গেল যে, কষ্ট হইতেছে; মন বলিল হস্তকে সরাইয়া লও, এই আজ্ঞা দ্বিতীয় শ্রেণীর ধমনী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পেশী সকলকে কুঞ্চিত করিল—ফল হস্ত নড়িল।

আমরা ধমনী বা অন্য কোন শারীরযন্ত্রের কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান

---

* সুবিজ্ঞ ডার্বিন সাহেব তাঁহার কৃত "Expressions of the Emotions" নামক পুস্তকে মানসিক ভাবের সহিত শরীরের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

করিতে আয়োজন করিয়া বসি নাই। * আমাদিগের মোট কথা এই যে আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্যে ধমনী, পেশী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রের সহায়তা আবশ্যক করে। এক্ষণে হয়ত পাঠক বুঝিয়াছেন যে, মনে কোন ভাব উদয় হইলে আমাদিগের শরীরের যে বিকৃতি জন্মে, তাহার কারণ এই যে, শরীরাভ্যন্তরে পেশীর কুঞ্চন প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য হইতে থাকে।

সেই কুঞ্চন প্রভৃতি কার্য্যগুলি সময়ে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, ভবিষ্যতে সেই পূর্ব্বের ভাব উদয় হইতে না হইতেই সেই কার্য্যগুলি দেখা দেয়। পূর্ব্বে যেখানে চেষ্টার প্রয়োজন হইত, এখন তাহা স্বতঃই হইয়া পড়ে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে শারীরিক যন্ত্র সকল এক কর্ম্ম করিতে করিতে কালক্রমে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বহু বহু বৎসরের পরে এই পরিবর্ত্তন স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

পেশী, ধমনী প্রভৃতি হইতে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন হইলেই প্রকৃত মানসিক পরিবর্ত্তন হইল। ইহাতে কেহ যেন না বুঝেন, যে আমরা মন এক মস্তিষ্ক এক পদার্থ বলিতেছি। হইতে পারে, মন মস্তিষ্কের বিকার বা কার্য্যকারিতা মাত্র, কিন্তু সে মত সমর্থন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তবে কথা এই যে, মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তন হইলে আমরা অনুমান ও চাক্ষুষ প্রমাণের দ্বারা স্থির করিতে পারি যে পরিবর্ত্তনটি সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, এরূপ পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমরা যেরূপ ছিলাম, এখনও ত তাহাই আছি—পরিবর্ত্তিত দেখি না। বৃক্ষ লতা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এখন যেরূপ দেখিতেছি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও তাহারা সেইরূপ ছিল, তাহার কি সন্দেহ আছে? আমরা এই আপত্তি নিরাকরণের জন্য দুই একটি কথা বলিব; এবং ভরসা করি তাহাতেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে। বৃক্ষ লতার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমরা অধিক বাক্য ব্যয় করিয়া প্রস্তাবটিকে পল্লবিত করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ ইহাদিগকে সজীব বলিয়া স্বীকার করিতে অনেকে কুণ্ঠিত। এবং সজীবের পরিবর্ত্তন প্রমাণ করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে যাঁহাদের অভিরুচি হয়, তাঁহারা পণ্ডিতবর ডার্বিন সাহেবকৃত এতৎসম্বন্ধীয় পুস্তক * পাঠ করিবেন। পশুদিগের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। পৃথিবীর গভীরতম গহ্বরে এরূপ অনেক অস্থি

* বহির্জ্জগতের জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য-বিষয় সকল শীঘ্রই স্বতন্ত্র প্রস্তাবে প্রকাশ করা যাইবে।

*The Variation of Animals aud Plauts under Domestication.

পাওয়া গিয়াছে, যাহা আধুনিক কোন প্রাণীর অস্থি বলিয়া বোধ হয় না। ইহা হইতে কি এই অনুমান যুক্তিসিদ্ধ নহে, যে, কতকগুলি প্রাণী কতকগুলি নূতন জীবের জন্ম দিয়া এ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে? অনেকে জানেন বন্যপশুকে গৃহপালিত করিতে পারিলে তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। "কোন ব্যক্তি একটা ব্যাঘ্রশাবক ধৃত করিয়া কিয়ৎকাল শস্য ভক্ষণ করাইয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে সেই ব্যাঘ্রের জীঘাংসা প্রবৃত্তি এপ্রকার দমন হইল যে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলে, সে গৃহের পার্শ্বে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিত, এবং হস্তে করিয়া খাদ্য দ্রব্য দিলে আহার করিত, তাহাতে কাহারও হিংসা করিত না।†" এইরূপ ব্যাঘ্রের বংশাবলী লক্ষ বৎসরের পরে যে বন্য ব্যাঘ্র হইতে ভিন্ন মুর্ত্তিধারণ করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? মনুষ্য সম্বন্ধেই যে পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? অনেকেই জানেন উত্তাপের আদান প্রদানেই এই সংসার চলিতেছে। একখণ্ড উত্তপ্ত লৌহ কিয়ৎক্ষণ বাতাসে রাখিয়া দিলেই উহা শীতল হইয়া যায়। বায়ু লৌহকে উত্তাপ দিতেছে, লৌহ ও বায়ুকে উত্তাপ দিতেছে। কিন্তু লৌহ যে পরিমাণে উত্তাপ দিতেছে সে পরিমাণে পাইতেছে না—এই জন্যই উহা শীতল হইয়া যায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম—উত্তাপের আদান প্রদান। সূর্য্য পৃথিবীকে উত্তাপ দিতেছে, পৃথিবীও সূর্য্যকে উত্তাপ দিতেছে। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে এমন সময় আসিবে যখন সূর্য্য অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীও অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হইবে। সূর্য্যের ও পৃথিবীর তখন সমান উত্তাপ হইবে। তখন আর উত্তাপের আদান প্রদানে পৃথিবী চলিবে না। সুতরাং তখন আমাদের মত প্রাণী আর এ পৃথিবীতে লীলা খেলা করিবে না। এই সংসার তখন কোন নূতনজীবের ক্রীড়াস্থল হইবে। আমরা তাহাদিগের জন্ম দিয়া এ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িব। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যে জীব ভবিষ্যতে আমাদিগের স্থানাধিকার করিবে, তাহারা যদি আমাদিগের হইতে ভিন্ন হয় তাহা হইলে আমরা যাহাদিগের ভবিষ্যত, তাহাদিগের হইতে আমরা কেন ভিন্ন না হইব? বিজ্ঞানবিৎ টিন্‌ডল্ সাহেব বলিয়াছেন, যে যখন দেখা যাইতেছে মনুষ্যের আকার কমিতেছে, পরমায়ু কমিতেছে, কিন্তু বুদ্ধি বাড়িতেছে, ইহাতে কি অনুমান হয় না, যে ভবিষ্যতে শরীর শূন্য জ্ঞানময় জীব সকল (Intellectual beings) এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে?*

† বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার"। প্রথমভাগ—আমিষ ভক্ষণ।

* টিন্‌ডল্ সাহেবের অনুমানের স-

এক্ষণে হয় ত পাঠক বুঝিয়াছেন যে, সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। আমরা আর একটি আপত্তির উল্লেখ করিব। সেটি এই,—কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পরিশ্রমে, শিক্ষায়, বা অন্য কোন উপায়ে যেন একজনের মানসিক পরিবর্ত্তন সম্ঘটিত হয়, কিন্তু কোন্ হিসাবে সন্তানের মানসিক গঠন পিতার মত হয়? ব্যাঘ্রকে শসা খাওয়াইয়া, গৃহপালিত করিয়া তাহার জিঘাংসা প্রবৃত্তিকে বলহীন করিলাম যেন, কিন্তু কোন হিসাবে তাহার সন্তান, স্বজাতীয় স্বাভাবিক হিংসাপ্রবৃত্তিকে লাভ না করিয়া জন্মদাতার কোমল মনবৃত্তিনিচয়কে অনুকরণ করিবে? বিবেচনা করিলে পাঠক দেখিবেন, এই আপত্তিটিতে কিছুমাত্র সার নাই। সন্তান পিতার মানসিক বৃত্তিনিচয়ের উত্তরাধিকারী হইবে, ইহা কিছু নূতন কথা নহে। সন্তানের আন্তরিক গঠন জন্মদাতার আন্তরিক গঠনের মতই হইয়া থাকে, ইহাই সংসারের নিয়ম। আমরা উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কোন ভদ্রলোকের এইরূপ অভ্যাস ছিল যে, যখন সে গভীর নিদ্রা যাইত, সেই সময়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধীরে ধীরে উঠিত। এবং অত্যন্ত উচ্চ হইলে প্রবলবেগে তাঁহার নাসিকার উপরে পড়িত। মাঝে মাঝে এইরূপ ঘটিত, এমন কি, ইহাতে প্রায়ই নাসিকাতে আঘাতজনিত বেদনা হইত এবং বেদনা বৃদ্ধির ভয়ে সময়ে সময়ে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার হস্ত বাঁধিয়া দিতে বাধ্য হইতেন। এই ভদ্রলোকের একপুত্র

ত্যাসভ্যতা সম্বন্ধে পাঠক স্বয়ং বিচার করিবেন। মনুষ্যের আকার ও পরমায়ু সম্বন্ধে আমাদিগের দেশীয় দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিলাম। সত্যযুগে "মজ্জাগতাঃ প্রাণাঃ ইচ্ছামৃত্যুঃ একবিংশতি হস্তপরিমিতো মানবদেহঃ লক্ষবর্ষং পরমায়ুঃ।" ত্রেতায় "অস্থিগতাঃ প্রাণাঃ চতুর্দ্দশহস্তপরিমিতো মানবদেহঃ। দশম সহস্রবর্ষং পরমায়ুঃ" দ্বাপরে রক্তগতাপ্রাণাঃ সপ্তহস্ত পরিমিতো মানবদেহঃ সহস্রাব্দ পরমায়ু।" কলিযুগে "অন্নগতাঃ প্রাণাঃ সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিতো মানবদেহঃ বিংশত্যধিকশতবর্ষ পরমায়ু।" ভাগবতে লিখিত আছে, কলিতে"ধর্ম্ম একপাদঃ। অধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ। আয়ুঃ শতবর্ষাণি। রাজানশ্চ প্রজাভক্ষ্যাঃ।" শেষ কথাটি বড় মিথ্যা নয়। কলির শেষে মনুষ্য "হ্রস্বকায়" হইবে ইহাও লিখিত আছে। পুনশ্চ "ত্রিংশদ্বিশতবর্ষাণি পরমায়ুঃ কলৌ নৃণাং।" আমাদিগের দেশে "এর পরে বেগুণ গাছে আঁকশী (কোটা) দিতে হবে" বলিয়া একটি পৌরাণিকী কথা (কাহার কাহার মতে প্রবাদ) যে প্রচলিত আছে, তাহা বোধ করি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নহে। টিনডল্ সাহেবের মত তাঁহার উত্তাপ সম্বন্ধীয় বক্তৃতাচয়ে বিশিষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; যাহার ইচ্ছা হয় খুলিয়া দেখিবেন।

পিতার এই কুঅভ্যাসের উত্তরাধিকারী হয়। এই পুত্রের আবার এক কন্যা জন্মে, সেও গভীর নিদ্রাকালে ঐরূপ অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইত (১)। এইরূপ আরও অনেক ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং দ্বিতীয় আপত্তির মূলচ্ছেদ হইল।

অতএব ইহা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, সময়ে মনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তন একবারে বা একপুরুষে ঘটিতে পারে না। একজন সভ্য ব্যক্তির পরিবর্ত্তন তাঁহার পূর্ব্বতন শত শত পুরুষ কর্ত্তৃক সময়ানুসারে সংঘটিত হইয়া আসিয়াছে; আর আমেরিকার একজন অসভ্যের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, কারণ তাহার পূর্ব্বতন শত শত পুরুষ লেখা পড়া করিয়া বা অন্য কোন প্রকারে মানসিক পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করে নাই। সুতরাং এক্ষণে সেই সভ্য ও সেই অসভ্য মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা কোনরূপেই একপুরুষে লোপ পাইবার নহে। অসভ্য যতই কেন চেষ্টা করুক না, সভ্যের মত তাহার মানসিক পরিবর্ত্তন কখনই হইবে না। কারণ যাহার জন্য কত শত বংশের প্রয়োজন, তাহা কি একজন্মের চেষ্টায় ঘটা সম্ভবপর? সুতরাং সভ্যে ও অসভ্যে যে প্রভেদ, সে প্রভেদ আমরা দেখিলাম শিক্ষাজনিত প্রভেদ। কিন্তু সে শিক্ষা ব্যক্তিগত নহে, পুরুষগত।

এই জন্যই আমরা পূর্ব্বে যে পণ্ডিতের মত উল্লেখ করিয়াছি, সেটিকে ঠিক সত্য নহে বলিয়াছি। সে মতটিকে আমরা মিথ্যা বলি নাই; কারণ আমাদিগেরও বিশ্বাস সমাজের বৈলক্ষণ্য শিক্ষাপ্রসাদাৎ—কিন্তু সে শিক্ষা ব্যক্তিগত নহে, বংশগত।

আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য আমরা কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করিয়া এপ্রস্তাবের উপসংহার করিব।

(১) সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী লেপ্টেনাণ্ট্ ওয়ালপোল সাহেব লিখিয়াছেন যে, স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপবাসী ছাত্রদিগের সম্বন্ধে তাহাদিগের শিক্ষকেরা এইরূপ বলেন;—প্রথম প্রথম তাহাদিগকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। যতদিন সাধারণ এবং সহজ বিষয় সকল শিক্ষিত হইতে থাকে, ততদিন সকল কথাই তাহাদিগের কণ্ঠস্থ হয়। কিন্তু যেমন শিক্ষিত বিষয়গুলি গভীরতর হইতে থাকে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের বুদ্ধির এবং চিন্তার লঘুতা সপ্রমাণিত হয় *।

(১) এই গল্পটি ডারউইন কৃত "Expressions of the Emitions" নামক পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে। গল্পটিও তাঁহার নিজের নহে। পুস্তকখানি আমাদিগের নিকট এক্ষণে নাই; থাকিলে অবিকল অনুবাদ করিয়া দিতাম।

* সকল দৃষ্টান্তগুলি স্পেন্সার কৃত "Principles of Psychology" দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ, প্রথমখণ্ড হইতে গৃহীত হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধেও এই বিষয় লিখিত আছে।

(২) আমেরিকায় নিগ্রোবালক এবং ইংরাজসন্তানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, প্রথম প্রথম নিগ্রোরা ইংরাজতনয়ের সঙ্গে শিক্ষাসম্বন্ধে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলেও কিয়দ্দূর গিয়া তাহাদের বুদ্ধির আর বিকাশ পায় না। এমন স্থলে আসিয়া দাঁড়ায় যে, সেই স্থল হইতে ইংরাজসন্তানের সহিত একত্রে আর পদক্ষেপ তাহাদের পক্ষে সুকঠিন হয়।

আণ্ডামান ও নবজিলাণ্ড সম্বন্ধেও এই রূপ কথিত আছে।

অস্মদ্দেশীয় হিন্দুদিগের বিদ্যালয় সম্বন্ধেও এইরূপ একটি অপবাদ আছে।



বিষকন্যা ও বিধবা রমণী।

আমরা 'মুদ্রারাক্ষস' পড়িবার সময় একটি আশ্চর্য্য কথা পাইয়াছিলাম।

'রাক্ষসমন্ত্রী, চন্দ্রগুপ্তের বধার্থ একটি পরম সুন্দরী কন্যা প্রেরণ করিলেন, চাণক্য তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিলেন। রাক্ষসের অভিসন্ধি যে, রাজা সেই কন্যার রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাতে আসক্ত হইবেন, সুতরাং শীঘ্র শীঘ্রই তাঁহার দেহ জীর্ণশীর্ণ হইয়া ধ্বস্ত হইবে। এদিকে চাণক্য পণ্ডিতও তেমনি;—সেই যুবতি-শরীরের ঘর্ম্ম পান করিয়া একটি স্বেদভুক্ মক্ষিকা প্রাণত্যাগ করিল, তাহা দেখিয়া তিনি তাহাকে 'বিষকন্যা' স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ দূরীভূত করিয়া দিলেন।'

এই অদৃস্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব অসম্ভবপ্রায় অংশটুকু পাঠ করিয়া মন চমকিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিলাম, এ কি অসম্ভব কথা!—নাটকের মধ্যেও এত অসম্ভব বস্তু বিন্যাস!—অপার ভাবনা-সমুদ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল, অনবরত চিন্তা-স্রোত বহিতে লাগিল, আর কত রকমের কল্পনা ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কতক পরিত্যাগ করিলাম, কতক সঞ্চয় করিলাম, কতক আরও বা ধরিতে পারিলামনা, ভাসিয়া গেল। যেগুলি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, কোন আত্মীয়ের অনুরোধে আজ তাহা প্রকাশ করিলাম। 'বিষকন্যা ও বিধবা রমণী' এই মুকুট পরাইয়া বাহির করিলাম। ইহাতে যদি কাহারও অঙ্গে আঘাত লাগে, কি করিব? উদ্বৃত্ত যৌবনরস যাহাদের শরীরে ধরিতেছে না; যেন ওষ্ঠ, গণ্ড ফাটিয়া বাহির হইতে আসিতেছে, তাঁহাদের কিছুতেই বেদনা লাগে না। সুতরাং আমার এই প্রলাপতুল্য প্র-

বন্ধুটি তাঁহাদিগের নিকট নিরপরাধী।

১ম।—যখন ধমনীতে যৌবনরসের স্রোত বহিতে থাকে, তখন নহে; একটুকু বেগ হ্রাস হইয়া আসিলে অনেকেরই অনুভব হয় যে শরীরটা কেবল মলময়। কতকটা খাদ্য দ্রব্যের বিকার মাত্র; স্বেদ, ক্লেদ, দৌর্গন্ধ্য, শিঙ্ঘাণ প্রভৃতি বিবিধ বিকৃত মলে পরিপূর্ণ। সেই জন্যই বৌদ্ধ দার্শনিকেরা ইহাকে 'পুদ্গল' সংজ্ঞা দিয়াছেন। কখন পুড়িতেছে কখন বা গলিতেছে।

২য়।—শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, যে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার মলেই ক্ষতিকারক পদার্থ আছে। অভ্যন্তরের দূষিত বা বিষাক্ত পদার্থ সকল ঘর্ম্ম দ্বারা, নিশ্বাস দ্বারা ও বিষ্ঠা মূত্রের দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। দৈহিক উষ্ণতাও অন্যের শরীরে ক্ষতিকারক বা ধাতু দূষক হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবেশ করিলে তাহাও ক্রমে ক্রমে শরীরের হানি আনয়ন করে। অধিক কি—'দেহাচ্চৈব চ্যুতা মলাঃ' যাহা যাহা দেহ হইতে প্রচ্যুত হয়, তাহা তাহাই মল এবং তাহা তাহাই ক্ষতিকারক। তবে যে আপনার মল আপনার অনিষ্টকারক হয় না, আত্মদেহের পুতিত্ব আত্মার হানি আনয়ন করেনা তাহার কারণ আছে। কি কারণ? স্বাত্ম্য প্রাপ্তি। বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে, 'বিষমপি স্বাত্ম্যগতংন হন্তাৎ' বিষও স্বাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে নাশক হয় না। স্বাত্ম্য শব্দের অর্থ কি? দৃঢ় অভ্যাস। যাহাকে ভাষায় সহ্য হওয়া বলে তাহারই সংস্কৃত নাম স্বাত্ম্য। এই স্বাত্ম্যের মহিমা বুঝা ভার।

স্থাবর বিষে (কাঠ বিষে) কীট জম্মে। কিন্তু সে বিষ তাহার হানি করেনা। কেননা তাহা তাহার স্বাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই বিষ যদি অন্য কীটের শরীর স্পর্শ করিতে পায় তবে সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আত্ম প্রভাব দেখাইবে সন্দেহ নাই। অতএব বিষ যখন স্বাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে ক্ষতিকারক হয় না, তখন আর স্বাত্ম্য প্রাপ্ত স্বেদ, দৌর্গন্ধ্য, উষ্ণনিশ্বাস প্রভৃতি ক্ষতিকারক হইবে কেন? অন্যেরই বা না হইবে কেন?

৩য়।—পলাণ্ডুভুকদিগের শরীরে এক প্রকার গন্ধ, মাংসাদ মনুষ্যদিগের গাত্রে এক প্রকার গন্ধ, উদ্ভিজভোজীদিগের শরীরে আর এক প্রকার গন্ধ, তাহা স্বেদজ গন্ধ—সকলকারই স্ব স্ব স্বেদ গন্ধাদি সহ্য হইয়া গিয়াছে। এই নিমিত্ত তাহা তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। বিমূত্রের গন্ধ মৈত্রহর (মেথর) দিগের স্বাত্ম্য হইয়া গিয়াছে। সেই কারণে উহা তাহাদিগকে ক্লেশ দিতে পারে না। কিন্তু যাহা যাহার স্বাত্ম্যগত হয় নাই, অবশ্যই তাহা তাহার হানিকারক হইবে।

৪র্থ।—মনুষ্যদেহের রস রক্তাদি ও অন্ন মলাদির পরিণামে দোষ জম্মে। তাহা ঘর্ম্মাদি দ্বারা বাহির হইয়া যায়,

ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু মনু ও সুশ্রুত বলেন যে, কোন কোন মনুষ্যের মূলে অর্থাৎ শুক্র শোণিতের সংযোগ কালে এমন কোন দোষ ঘটনা হইতে পারে যে তাহার প্রভাবে মনুষ্যের আমরণ দেহের বিষাক্ততা থাকিতে পারে। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, উদ্ভিজ্জ মাত্র ভোজন করে, অনুলেপন সেবা করে, তথাপি তাহার দেহের বিকট গন্ধ দূর হয় না। কাহার কাহার গাত্র হইতে ক্ষার গন্ধ বহির্গত হয়। কাহার গাত্রে পাখীর গন্ধ, কাহার ও বা মুখে, নিশ্বাসে, কক্ষ প্রভৃতি ঘর্ম্মস্রাব অঙ্গে পুতি গন্ধ থাকে। তাহা কিছুতেই যায় না। কেন? তাহা তাহাদের বর্ত্তমান অন্ন-পানাদি পরিণামের ফল নহে। বৈজিক, গর্ভিক পরিণামের ফল। এইরূপ দোষ না ঘটে এই অভিপ্রায়ে হিন্দুদিগের মধ্যে শরীরের উপর দশবিধ সংস্কার করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

৫ম।—স্বেদ, ক্লেদ, তাপ, নিশ্বাস, জৃম্ভণ, নেত্রতেজ * প্রভৃতিতে যদি শরীরের ক্ষতিকারক পদার্থ থাকিল—তবেইত সর্ব্বনাশ! কেমন করিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করা যায়।

৬ষ্ঠ।—‘একজনের গাত্রে আর একজনে নিশ্বাস ফেলিলে দোষ হয়।’ ‘হাঁই তুলিয়া দিলে দোষ হয়।’ ‘নিদ্রিত ব্যক্তি গাত্রে অশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলে দোষ হয়।’ ‘অন্যের গাত্রে ঘাম পুঁছিয়া দিলে তাহার পীড়া হয়’ এই সকল জনপ্রবাদ কি সত্য? হইতে পারে।

৭ম।—এরূপ দেখাগিয়াছে যে, একজনের গাত্রমার্জ্জনী ব্যবহার করিয়া অন্য জনের কণ্ডু দদ্রু বা বিচর্চ্চিকা রোগ জন্মিয়াছে। একজনের সহিত নিত্য সহবাস করিয়া অন্যজন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। একজনের সহিত সর্ব্বদা চোকো চোকি থাকিয়া আরএকজন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রেও দেখা যায় ‘যানংবস্ত্র মলঙ্কারং জায়াঽপত্যং কমণ্ডলুম্। আত্মনঃ শুচিরে তানি ন পরেষাং কদাচন।’ ‘দর্শনান্নিত্যসংবাসাদ্দোষমাক্রম্য তিষ্ঠতি’ ‘সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তি’ ‘শরীরজৈঃকর্ম্মদোষৈরণ্যোঽপি ক্লিশ্যতে কচিৎ’ ইত্যাদি।

৮ম। এক শরীরের সহিত অন্য শরীরের এরূপ কঠোর সম্বন্ধ যদি সত্য সত্যই হয়, তবে ত অন্যের শরীর লইয়া আশ্লেষ ক্রীড়া করা বড় সাবধানের কার্য্য। আমরা যে নারী দেহ লইয়া, পুত্র দেহ লইয়া সর্ব্বদাই আশ্লেষ ক্রীড়া করি, তাহাতে কি আমাদের কোন ক্ষতি হইতেছে

* নেত্র তেজ ও প্রাণনাশক আছে। আশীবিষ আর দৃষ্টিবিষ এই দ্বিবিধ জীব তীর্য্যক-যোনি মধ্যেই দৃষ্ট হয়। দৃষ্টিবিষ জীবের নেত্রতেজ অসহ্য। ইহার সংযোগমাত্র ভয়, কম্প, জড়তা প্রভৃতি সমস্তই ঘটিয়া থাকে।

না? জগদীশ্বর কি রোগ, তাপ, জ্বরা, জীর্ণতা প্রবেশ করাইবার জন্যই নারীদেহ-সমাশ্লেষরূপ অলঙ্ঘ্য দ্বার প্রস্তুত রাখিয়াছেন? এসকল যদি অংশতঃও সত্য হয়, তাহা হইলে মুদ্রারাক্ষসের বিষকন্যাও সত্য হইতে পারে। মুদ্রারাক্ষসের কথা সত্য হইলেই বিভ্রাট!

৯ম। আমি বাল্যকালে বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যবিবাহের একদিকে দোষ একদিকে গুণ। দোষ এই যে,—

'ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরঞ্জীবেৎ জীয়েদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥'

ষোড়শ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা নারীর অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশবর্ষ বয়স্ক পুরুষের বীজে গর্ভ হইলে সে সন্তান বাঁচে না। যদি বাঁচে দীর্ঘজীবী হয় না। যদিও দীর্ঘজীবী হয়, তথাপি তাহার ইন্দ্রিয় সকল অতি দুর্ব্বল অবস্থার হইবে। এই ত বাল্যবিবাহের দোষ। কিন্তু গুণ কি? না স্বাত্ম্য-লাভ। আমি ১৬ বৎসর বয়সে অস্টম বর্ষীয়া কুমারী বিবাহ করিয়াছিলাম। তাহার বস্ত্র, শয্যা, নিশ্বাস, গাত্রতাপ, নেত্রতেজ, ঘর্ম্ম প্রভৃতি আমার ক্রমে ক্রমে স্বাত্ম্য হইয়া গিয়াছিল। আমার শরীরের দোষগুণও তাঁহার স্বাত্ম্য হইয়াছিল। তাঁহার দোষ তীব্র হইলে হয়ত তাহা আমার সহ্য হইত না এবং আমার দোষ তীব্র হইলেও হয় ত তাঁহার সহ্য হইত না। এরূপ পরস্পর সামঞ্জস্য না হইলে হয়ত তাঁহাকে পতিঘাতিনী বিধবা হইতে হইত, নতুবা আমাকে 'মাগ খেকো দোজোবর' বলিয়া গালি খাইতে হইত। অন্ততঃ মলিন, কৃশ, জীর্ণ শীর্ণ হইয়া থাকিতে হইত। এমন দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বে ভাল ছিল, পরে দোষবহুল নারীর নিশ্বাসে শুকাইয়া গিয়াছে। না হয়, বিবর্ণ, বিশীর্ণ, রুগ্নস্বভাব, মতিচ্ছন্ন, হইয়া গিয়াছে। আবার ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, পূর্ব্বে রুগ্ন ভুগ্ন ছিল, বিবাহের পরে সে দিব্য নৈরুজ্য লাভ করিয়াছে এবং বুদ্ধিমানও হইয়াছে। শরীরের দোষের ন্যায় গুণও আছে। বিষকন্যা এবং অমৃতকন্যাও আছে। বিষপুরুষ ও অমৃতপুরুষও আছে। যাহা হউক, আমাদিগের এক প্রকার সহ্য হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহারা বিধবা বিবাহ করিবেক, তাহাদের কি এই বিষয় একটুকু সাবধান হওয়া উচিত নয়? স্বামী, নীজের দোষেও মরিতে পারে, ভার্য্যার দোষেও মরিতে পারে। যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী তাহার ভার্য্যার বিষাক্তভায় প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, তবেই ত শঙ্কার বিষয়। অতএব বিবাহের পূর্ব্বে অন্ততঃ ইহা দেখা উচিত যে বিধবার স্বামী কিরূপ অবস্থায় কত দিন ভোগ করিয়া মরিয়াছে। অনুপভুক্তা যুবতী বিধ-

যাকে বিবাহ করিতে ভয় হয়, যেহেতু তাদৃশ দম্পতির দোষ গুণের স্বাত্মসম্পাদন করিবার সময় নাই। নিম্প্রতিবন্ধক বিশেষতঃ সে অবস্থাটি অধৈর্য্যের অবস্থা। যদি কাহারও তীব্রদোষ থাকে, তাহা হইলে হয় ত Honeymoon এর মধ্যেই অন্যতরের অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে।

১০ম। যদি বিধবা বিবাহ করিতে হয়, একটুকু সাবধান হইয়া করাই উচিত। বিধবা রমণী দেখিতে অপ্সরার মত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার গুণে হয় ত বিষ মিশ্রিত থাকিতে পারে। শাস্ত্রকারেরা বলেন, 'তাসামমৃতভোজিত্বাৎ স্বেদ-ক্লেদ-সৌগন্ধ্য-বিষ-শ্বাসাদিরাহিত্যম্।' অপ্সরারা অমৃতভোজিনী বলিয়া তাঁহাদের স্বেদ ক্লেদাদি নাই, তাঁহাদের নিশ্বাসেও বিষ নাই। কিন্তু মনুষ্যরমণীদিগের তাহা আছে। অতএব সাবধান—যেন বিধবা-ভ্রমে পতিঘাতিনী বিবাহ না কর। পতিপুত্রঘাতিনীকে শাস্ত্রকারেরা 'অবীরা' সংজ্ঞার আহ্বান করিয়া থাকেন।

যে রমণীর বাতাসে স্বামী শুকাইয়া যায়, জীর্ণশীর্ণ হইয়া দেহত্যাগ করে, যাহার ক্রোড়ের শিশু মূর্দ্ধশুষ্ক হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করে, ভুবনমোহিনী হইলেও তিনি অবীরা, পতিঘাতিনী, পুত্রঘাতিনী। শাস্ত্রকারেরা ইহার হস্তের অন্ন খাইতেও নিষেধ করিয়াছেন।

যে নারীর দেহে বিষাক্ততাদোষের অল্পতা আছে, অথবা কিঞ্চিৎ অমৃতত্ব আছে, শাস্ত্রকারেরা অনুমান করিয়া তাহার কতকগুলি লক্ষণ লিখিয়া গিয়াছেন। বিষ থাকিলেও তাহা কেমন পুরুষে সহ্য করিতে পারিবে তাহাও লিখিয়া গিয়াছেন।

" নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং
নাধিকাঙ্গীং ন লোমিনীম্। ইত্যাদি।

বড় দুঃখিত হইলাম যে, শ্লোকগুলি সংগ্রহ করি নাই। যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, আবার সংগ্রহ করিয়া উপহার দিব। এক্ষণে নিবেদন এই যে, যদি কেহ গর্ব্বিতা অবীরা পাঠিকা থাকেন, তাঁহারা যেন প্রবন্ধলেখকের উপর ক্রোধ না করেন। দুঃখিনী পাঠিকা থাকেন, আমি তাঁহাকে বেদনা দিলাম এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। সকলই স্বভাবের কার্য্য। পতিপ্রণয়িনী পাঠিকাদিগকেও বলিতেছি, বিষ নাই বলিয়া অহঙ্কারে ফুঁৎকারে ফটমটে হইবেন না!

শ্রীকা—

হিন্দুভূগোল।

প্রথম প্রস্তাব—পৌরাণিক।

বকল বিলক্ষণরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, দেশের নৈসর্গিক অবস্থা, অর্থাৎ জল বায়ুর উষ্ণত্ব ও শীতলত্ব, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, প্রভৃতির দ্বারা দেশস্থ লোকের চরিত্র গঠিত হয়। ভারতে সর্ব্বকালে প্রকৃতি অতি উদার—প্রকৃতি যেন কল্পতরু হইয়া শত হস্তে ভারতকে স্বীয় সম্পত্তি বিতরণ করিয়াছেন। এদেশস্থ ভূমি এত উর্ব্বরা যে অল্পমাত্র পরিশ্রমেই প্রত্যেক পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এইক্ষণ নানা কারণে এদেশ নিরন্ন ও দরিদ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে এদেশ প্রভূত ধনের আধার ছিল; এমনকি ঐশ্বর্য্য প্রভাবে এদেশ ‘স্বর্ণভূমি’ ও ‘রত্ন গর্ভা’ প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছিল।

যখন দেশে প্রভূত ধন সঞ্চিত হয়, তখন সর্ব্ব শ্রেণীস্থ সকল লোকের পরিশ্রম করিবার আবশ্যতা থাকেনা। তখন স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর লোক হন, তাঁহারা জীবনের অধিকতর সময়ই আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করেন; তন্মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি জ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। ভারতবর্ষস্থ প্রাচীন ঋষিগণ এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া, বাহ্যজগত পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্জগতেই মানসিক শক্তির পরিচালনা করিতেন। এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণও ছিল। কারণ যেদেশে অল্প পরিশ্রম বা বিনা পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেদেশে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সম্পাদনে লোকের তত প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইলেই বৈজ্ঞানিক সম্বলের প্রয়োজন, যেদেশে প্রকৃতি বিনা যুদ্ধে পরাজিতা দাসীর ন্যায় আজ্ঞাবহ, সেদেশে তদ্রূপ সম্বলের আবশ্যকতা কি? আর একটি কারণ আছে। বকল স্পেন দেশের অবস্থা বিচার করিতে যাইয়া তথায় ধর্ম্মভাবের এত প্রাধান্য ও যাজক সম্প্রদায়ের এত আধিপত্যের কারণ এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সেখানে প্রকৃতির মূর্ত্তি এত ভয়াবহ যে লোকে স্বভাবতঃই ভীত হয়, এবং সেই সকল মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ দেবমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যে কারণে স্পেনে অবৈধ ধর্ম্ম বিশ্বাসের এত প্রাবল্য, তাদৃশ কারণ এখানে বহুল পরিমাণেই পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান,

সুতরাং প্রাচীন মহর্ষিগণ বিজ্ঞানের চর্চ্চা না করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র ও মনস্তত্ত্বেরই উন্নতি সাধনে জীবন যাপন করিয়াছেন। শুদ্ধ বিজ্ঞান নহে, বিজ্ঞানের সহিত নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত ইতিহাস ভুগোল প্রভৃতির প্রতিও তাঁহারা কিছুমাত্র মনোযোগ করেন নাই। পুরাণাদিতে এই দুই বিষয়ের যে কিঞ্চিৎ চেষ্টা দেখা যায়, তাহা এত কুসংস্কার ও কল্পিতভাবে পরিপূর্ণ যে তাহা হইতে সত্য উপলব্ধি করা যায় না।

এস্থলে একটি কথা বলা প্রয়োজন। আজি কালি এদেশে অনেক স্বদেশহিতৈষী জন্মিয়াছেন, যাঁহারা ন্যায় হৌক বা অন্যায় হৌক, সঙ্গত হৌক, বা অসঙ্গত হৌক, সর্ব্ববিষয়ে এদেশের গৌরব বাড়াইতে ত্রুটি করেন না। যে কোন নূতন তত্ত্বের কথা হৌক না কেন, তাঁহারা অম্লানবদনে কহিবেন, ইহা ভারতে অনেক পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। অধিক কি ভারতে মুদ্রাযন্ত্র ও কামানের ব্যবহার পর্য্যন্ত প্রমাণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। তাঁহাদিগের চেষ্টা মহতী, মনের ভাব উৎকৃষ্ট, তজ্জন্য তাহাদিগকে নমস্কার করি। কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন না হওয়াতে তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণে সাহসী হইতে পারি না। আমরা অদ্য যে প্রস্তাবটির অবতারণা করিতেছি, অনেক দিন তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু আধুনিক বাস্তববৃত্তান্তের সহিত এগুলির সামঞ্জস্য প্রদর্শনে এতদিন বৃথা চেষ্টা করিয়াছি। যাহা হৌক, প্রাচীন পণ্ডিতদিগের ভৌগোলিক মতের সারাংশ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে; যদি ভারতহিতৈষীগণ আধুনিক ভুগোলের সহিত ইহার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন, পরম আপ্যায়িত হইব।

পুরাণে সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনের * বর্ণনা আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বলোকের অধিষ্ঠানভূতা এইযে পৃথিবী, ইহাই ভুলোক নামে খ্যাত। বিষ্ণুপুরাণে ভুলোকের এইরূপ বর্ণনা আছে;—

'পঞ্চাশৎকোটিবিস্তারা সেয়মুর্ব্বি মহামুনে।
সপ্ততিশ্চ সহস্রাণি দ্বিজোচ্ছ্রায়োপি কথ্যতে॥'

অর্থাৎ পৃথিবীর বিস্তার পঞ্চাশৎ কোটি যোজন, এবং ইহার উচ্ছ্রায় (উচ্চতা) সপ্ততি সহস্র যোজন। পরন্তু লিঙ্গপুরাণে—

'পঞ্চাশৎকোটিবিস্তীর্ণা সসমুদ্রাধরা স্মৃতা।
দ্বীপৈশ্চ সপ্তভির্যুক্তা লোকালোকাবৃতা শুভা।'

অর্থাৎ এই পঞ্চাশৎ কোটি যোজনের †

---

* ভুর্লোকোথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ। মহর্জনস্তপশ্চৈব সত্যলোকশ্চ সপ্তমঃ। ইতি শিব পুরাণে॥ অতলং বিতলং তলাতলং মহাতলং রসাতলং পাতালমিতি॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে।

† চতুর্হস্তোধনুস্তস্য সহস্রং ক্রোশ উচ্যতে। ক্রোশদ্বয়ন্তু গব্যুতিদ্দ্বয়ং যোজনং বিদুঃ॥ ইতি যোগিনীতন্ত্রে।

মধ্যেই সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র আছে। পুনশ্চ বৈষ্ণব পুরাণে—

'পাদগম্যন্তু যৎকিঞ্চিদ্বস্ত্বস্তি ধরণীময়ং।
সর্ব্বলোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোস্য ময়োদিতঃ॥'

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আয়তনের মধ্যে যে যে বস্তু পদচালনের যোগ্য ও পৃথিবীময় আছে, তাহারই নাম ভূলোক। অতঃপর পৌরাণিকেরা প্রাগুক্ত সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার বিবরণ করা যাইতেছে। তৎপূর্ব্বে একটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। পৌরাণিক ভূবৃত্তান্তের সহিত আধুনিক ভূবৃত্তান্তের তুলনা করা যে বিড়ম্বনা মাত্র, একটি মাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারাই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। আধুনিক গণনানুসারে পৃথিবীর ব্যাস ৭৯১২ মাইল, বা ৩৯৫৬ ক্রোশ,সুতরাং উহার বিস্তার প্রায় ১১৭১৯ ক্রোশ, কিন্তু পৌরাণিক গণনানুসারে ২,০০০,০০০,০০০ ক্রোশ। এরূপ স্থলে তুলনা করিতে যাওয়াই বাতুলতা মাত্র।

কল্পনা-নিমগ্ন ধ্যানরত মহর্ষিগণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া, নিবিড় নিভৃত বনমধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক, পৃথিবীর জল ও স্থলভাগের যে বিবরণ প্রকটন করিয়াছেন,তাহা ড্রেক কুক,প্রভৃতির জানিবার সম্ভাবনা কি ? ফলকথা, তাহা আকাশকুসুমবৎ অলীক পদার্থ, যথার্থ ভূগোলের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। যদি কেহ বলিতে চাহেন যে এসিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, পলিনেসিয়া ও ওসনিকা, এই সপ্তভূভাগের সহিত পৌরাণিকদিগের সপ্তদ্বীপের মিল আছে; তাঁহাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া আমরা অন্যস্থানে চলিয়া যাইব। কারণ উন্মাদের নিকটস্থ হওয়া অবিধেয়। আমরা কেন যে এরূপ কথা বলিতেছি, পাঠক একবার সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের বিবরণ পাঠ করুন, তবেই বুঝিতে পারিবেন।

সপ্তদ্বীপের নাম যথা,—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর। আর লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্তসমুদ্র। *

'জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেষাং মধ্যসংস্থিতঃ।'†

জম্বুদ্বীপ সপ্তসমুদ্র ও ছয় দ্বীপের মধ্যভাগে সংস্থাপিত। এই দ্বীপে একটি জম্বুবৃক্ষ আছে, তাহার ফলের নামানুসারে এই দ্বীপের নাম হইয়াছে—

'জম্বুদ্বীপস্য সাজম্বুর্নামহেতুর্মহামুনে।'

অপর ছয়টি দ্বীপের নামও তত্তৎদ্বীপস্থিত বৃক্ষবিশেষের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শৈবপুরাণে যথা—

* জম্বুপ্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরোদ্বিজ। কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ॥ এতেদ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ। লবণেক্ষু সুরাসর্পি দধ্যোদানাম নামতঃ। দুগ্ধোদশ্চ প্রসংখ্যাত স্তুতঃ স্বাদূদ উত্তরঃ॥

† ইতি বৈষ্ণবে।

'প্লক্ষদ্বীপে প্লক্ষবৃক্ষঃ শাল্মলৌ শাল্মলিঃ স্মৃতঃ।
কুশদ্বীপে কুশস্তম্বঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহাগিরিঃ॥
শাকদ্বীপে শাকবৃক্ষঃ পুষ্করে পুষ্করঃ স্মৃতঃ॥'

অতঃপর বিষ্ণুপুরাণে সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

'জম্বুদ্বীপং সমাবৃত্য লক্ষযোজনবিস্তরঃ।
মৈত্রেয় বলয়াকারঃ স্থিতঃ ক্ষারোদধির্বহিঃ॥'

লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র বলয়াকারে জম্বুদ্বীপের বহির্ভাগ বেষ্টন করিয়া-আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত আছে যে, জম্বুদ্বীপ বৃত্তাকার ও তাহার ব্যাস লক্ষযোজন *। লবণসমুদ্রের পর পারে দ্বিলক্ষ যোজন প্লক্ষদ্বীপ, তাহা লবণ সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া আছে।

'ক্ষারদেন যথা দ্বীপো জম্বু সংজ্ঞোভিবেষ্টিতঃ। সংবেষ্ট্য ক্ষারমুদধিং প্লক্ষদ্বীপস্তথা স্থিতঃ॥ জম্বুদ্বীপস্য বিস্তারঃ শতসাহস্রসম্মিতঃ। সএব দ্বিগুণো ব্রহ্মণ্ প্লক্ষদ্বীপেহ্ প্যাদাহৃতঃ॥'

প্লক্ষদ্বীপের তুল্যায়তন অর্থাৎ দ্বিলক্ষ যোজন ইক্ষুসমুদ্র উক্ত দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে। আবার চতুর্লক্ষ যোজন বিস্তৃত শাল্মলি দ্বীপ ঐ ইক্ষু সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়াছে।

* লক্ষমেকং যোজনানাং বৃত্তোবিস্তারদৈর্ঘ্যয়ো॥

'প্লক্ষদ্বীপপ্রমাণেন প্লক্ষদ্বীপঃ সমাবৃতঃ।
তথৈবেক্ষুরসোদেন পরিবেশানুকারিণা॥
শাল্মলেন সমুদ্রোঽসৌ দ্বীপেনেক্ষুরসোদকঃ।
বিস্তার দ্বিগুণেনায়ং সর্ব্বতঃ সংবৃতঃ স্থিতঃ॥'

এইরূপে শাল্মলি দ্বীপ চতুর্লক্ষযোজন বিস্তৃত সুরা সমুদ্রের দ্বারা; সুরা সমুদ্র অষ্টলক্ষ যোজন বিস্তৃত কুশদ্বীপ দ্বারা; কুশদ্বীপ অষ্টলক্ষ যোজন বিস্তৃত সর্পিসমুদ্রের দ্বারা; ঘৃতসমুদ্র ষোললক্ষ যোজন বিস্তৃত ক্রৌঞ্চদ্বীপ দ্বারা; ক্রৌঞ্চদ্বীপ ষোললক্ষ যোজন বিস্তৃত দধিসমুদ্রের দ্বারা; দধিসমুদ্র বত্রিশলক্ষ যোজন বিস্তৃত শাকদ্বীপ দ্বারা; শাকদ্বীপ বত্রিশ লক্ষ যোজন বিস্তৃত ক্ষীরসমুদ্র দ্বারা; ক্ষীরসমুদ্র চৌষট্টিলক্ষ যোজন বিস্তৃত পুষ্কর দ্বীপ দ্বারা; পরিশেষে পুষ্করদ্বীপ স্বাদু জলসমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আছে। ঐ জলসমুদ্রের বিস্তারও চৌষট্টিলক্ষ যোজন। *

* সুরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেনসর্ব্বতঃ।
শাল্মলস্যতু বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন প্রমাণতঃ॥
তৎপ্রমাণেন সদ্বীপো ঘৃতোদেন সমাবৃতঃ।
ঘৃতোদশ্চসমুদ্রোসৌক্রৌঞ্চদ্বীপেনসংবৃতঃ॥
কুশদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণোযস্যবিস্তরঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপসমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেনচঃ॥
আবৃতঃ সর্ব্বতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপ তুল্যেন মানতঃ
দধিমণ্ডোদক শ্চাপি শাকদ্বীপেন সংবৃতঃ॥
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারাদ্দ্বিগুণেনপ্রমাণতঃ।

এস্থলে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। ঋষিগণ শুদ্ধ যে ভৌগোলিক বিবরণেই কল্পনার ছড়াছড়ি করিয়াছেন, তাহা নহে। সপ্তদ্বীপ এবং সপ্তসমুদ্রের যেরূপ আয়তন ও সংস্থিতির বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আরব্য উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ গণিতেও ইহাঁদের অগাধ বিদ্যা ছিল। কৃত্তিবাস পণ্ডিত যেমন রামের সৈন্যসংখ্যার গণনা করিতে যাইয়া, উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম চারিদিকের সৈন্যসংখ্যার সমষ্টির বেলা 'বায়ান্নহাজার' বলিয়া, শুভঙ্করের পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন, প্রাচীন মহর্ষিগণও তদ্রূপ, প্রথমে পৃথিবীর পরিমাণ পঞ্চাশৎকোটি যোজন নির্দ্দেশ করিয়া, পরে সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের পরিমাণে এত গোল করিয়াছেন যে, একটির সহিত অপরের কোনও মিল নাই। আমরা ঠিক দিয়া দেখিতেছি যে, সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের পরিমাণ সমষ্টি প্রায় ষোলকোটি যোজনের অধিক হয় না। যদি বল, স্বাদু জলসমুদ্রের পরে একটি দ্বিখণ্ড বিশিষ্ট দেবতার আলয়স্বরূপ স্বর্ণভূমির ও তৎপর লোকালোক পর্ব্বতের উল্লেখ আছে, তাহা লইয়া ভূমণ্ডলের পরিমাণ সম্পূর্ণ; কিন্তু সাতটি দ্বীপ ও সাতটি সমুদ্রের আয়তন ১৬কোটি আর একটি ভূমি ও একটি পর্ব্বতের আয়তন ৩৪ কোটি হইবে, একথা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। অথবা একথা বলাই বাহুল্য, কেন না যাহার আমূল অবিশ্বসনীয়, তাহাতে আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা কি? মহর্ষিগণ কেবল সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের আয়তন ও স্থিতি নিরূপণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই সকল দ্বীপের অধিবাসী, এবং তাহাদের অবস্থা ও ধর্ম্ম প্রভৃতিরও বর্ণনা করিয়াছেন।

শাকদ্বীপস্তু মৈত্রেয় ক্ষীরদেন সমন্ততঃ।
শাকদ্বীপ প্রমাণেন বলয়েনেব বেষ্টিতঃ॥
ক্ষীরাব্ধিঃ সর্ব্বতোব্রহ্মন্ পুষ্করাখ্যেণ বেষ্টিতঃ।
দ্বীপেন শাকদ্বীপাত্তু দ্বিগুণেন সমন্ততঃ॥
স্বাদূদকে নোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেষ্টিতঃ।
সমেন পুষ্করস্যৈব বিস্তারামণ্ডলাত্তথা॥

প্রথমতঃ জম্বুদ্বীপস্থ জম্বুবৃক্ষ হইতে যে ফল পতিত হয়, তাহার রস একত্রীভূত হইয়া সেখানে জম্বুনদী নামে এক মহতী নদী হইয়াছে; সেই নদীর জল 'অমৃতস্বাদুরুচাতে'* অমৃতের ন্যায় মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট। জম্বুদ্বীপনিবাসীরা ঐ নদীর জম্বুরসরূপ জলপান করে। তাহাতে—

'নখেদো নচ দৌর্গন্ধ্যং ন জরা নচেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ।
তৎপানস্বস্থমনসাং জনানাং তত্র জায়তে॥' ইতি বৈষ্ণবে।

তত্তীরবাসিদিগের মন সর্ব্বদা সুস্থ থাকে, কখনও অন্তঃকরণে খেদের উদ্রেক হয় না, শরীরে দুর্গন্ধ হয় না, পুংশক্তির হ্রাস হয় না ও জরা হয় না। সুমেরু পর্ব্বতপ্রভাবে

* শৈবপুরাণে

এইস্থল সাধারণ লোকদিগের অনধিগম্য, কেবল

'তত্রযান্তি জিতক্রোধা জিতলোভা জিতেন্দ্রিয়াঃ।' ইতি শৈবে।

জিতক্রোধ, জিতলোভ এবং জিতেন্দ্রিয় লোকদিগেরই ইহা অধিগম্য।

প্লক্ষদ্বীপে চারি বর্ণ বাস করে। যথা বৈষ্ণবে—

'আর্য্যকাঃ কুরবাশ্চৈব বিবিংশা ভা বিনশ্চয়ে।
বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্তে শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তম॥
ইজ্যতে তত্র ভগবাংস্তৈর্বর্ণৈরার্য্যকাদিভিঃ।
সোমরূপী জগৎস্রষ্টা সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো-হরিঃ॥'

অর্থাৎ আর্য্যক, কুরব, বিবিংশ ও ভাবি; ইহারা জম্বুদ্বীপে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল জাতি চন্দ্রকে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা সর্ব্বেশ্বররূপে পূজা করে।

'শাল্মলে যেতু বর্ণাশ্চ বসন্ত্যেতে মহামুনে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব যজন্তিতং॥
বায়ুভূতং মুখশ্রেষ্ঠৈর্বজ্রিনোযজ্ঞসংজ্ঞিতং।'

শাল্মলি দ্বীপেও ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ অবস্থিতি করেন, তাঁহারা বায়ুকে ঈশ্বর বলিয়া মানেন, এবং তাহাকেই যজ্ঞেশ্বর বলিয়া তদুদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করেন।

এইরূপে কুশদ্বীপে ও চারিবর্ণ আছে, তাহারা নিজানুষ্ঠানতৎপর।

"তত্রতেতু কুশদ্বীপে ব্রহ্মরূপং জনার্দ্দনং।
যজন্তঃ ক্ষয়য়ন্ত্যত্র মধিকার ফলপ্রদং॥"

ইহাঁরা ব্রহ্মারূপি পরমেশ্বরকে হোমাদি দ্বারা যজন করিয়া স্ব স্ব অধিকারানুরূপ কর্ম্মফল সম্ভোগপূর্ব্বক কর্ম্ম ক্ষয় করেন।

ক্রৌঞ্চদ্বীপবাসিগণ 'যাগৈরুদ্রস্বরূপস্থ ইজ্যতে যজ্ঞ সন্নিধৌ।' রুদ্ররূপি ঈশ্বরকে হোমদ্বারা অর্চ্চনা করে।

'শাকদ্বীপেতু তৈবিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপ ধরো-মুনে।
যথোক্তৈরর্চ্যতে সম্যক্ কর্ম্মভির্নিয়তাত্মভিঃ

শাকদ্বীপস্থ অধিবাসিগণ কর্ম্ম দ্বারা সূর্য্যরূপি ভগবানকে অর্চ্চনা করে।

"দশবর্ষ সহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ।
নিরাময় বিশোকাশ্চ রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ॥
তুল্যরূপাস্তু মনুজা দেবৈস্তত্রৈকরূপিণঃ।
বর্ণাশ্রমাচারহীনং ধর্ম্মাহরণ বর্জ্জিতং।

* * * *

ভোজনং পুষ্করদ্বীপে তত্রস্বয়মুপস্থিতং॥"

পুষ্করদ্বীপে অধিবাসীদের আয়ুসংখ্যা দশসহস্র বৎসর; তাহারা নিরাময়, অশোক ও রাগদ্বেষহীন। তাহারা সকলেই তুল্যরূপ এবং দেবতাদিগের সদৃশ। সেখানে বর্ণভেদ নাই, আশ্রমভেদ নাই, আচার নাই, বা কোনও ধর্ম্ম নাই। সেখানে আহারের জন্য চিন্তিত হইতে হয় না, কারণ আহার স্বয়ং উপস্থিত।

অতঃপর কোন কোন পর্ব্বত ও নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে।

" সর্ব্বেষাঞ্চৈব দ্বীপানাং সপ্ত সপ্তৈব পর্ব্বতাঃ।
সপ্তৈব নদ্যস্তেষাস্তু বর্ষাণি সপ্ত সপ্তবৈ ॥
নতু রোগা ন জরা ন শোকা ন পরিশ্রমঃ।
নান্যাং স্ত্রিয়ং বিজানন্তি চক্রবাক সধর্ম্মিণঃ।
ত্রেতাযুগ সমঃকালঃ সর্ব্বদৈব মহামতে।
প্লক্ষদ্বীপাদিষু ব্রহ্মন্ শাকদ্বীপান্তকেষুবৈ ॥
পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি জনাজীবন্ত্য নাময়াঃ ॥ "

প্লক্ষদ্বীপ অবধি শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত পঞ্চদ্বীপে সপ্তসপ্ত পর্ব্বত, সপ্তসপ্ত নদী ও সপ্তসপ্ত বর্ষ আছে। ঐ সমস্ত বর্ষবাসিগণ অরোগ, অশোক, অজর ও অপরিশ্রম। ইহারা অন্যস্ত্রীসঙ্গ করে না, স্বামী স্ত্রী চক্রবাক্ মিথুনের ন্যায়। ত্রেতাযুগে লোকদিগের যেরূপ আয়ুসকাল ছিল, ইহাদেরও তদ্রূপ পঞ্চসহস্রবর্ষ পরমায়ু।

"একস্তত্র মহাভাগ প্রখ্যাতো বর্ষপর্ব্বতঃ।
মানসোত্তর সংজ্ঞোসৌ মধ্যতো বলয়াকৃতিঃ ॥

* * * * *

বর্ষদ্বয়ন্তু মৈত্রেয় ভৌমঃ স্বর্গোহয়মুত্তমং।"

শাক-দ্বীপের মধ্যভাগে বলয়াকারে মানসোত্তর নামে এক বর্ষ পর্ব্বত আছে। উহাতে দ্বীপটীকে বর্ষদ্বয়ে বিভক্ত করিয়াছে, এবং ঐ বর্ষদ্বয় এত সুন্দর যে তাহাদিগকে ভূস্বর্গ বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে যে স্বাদু জল সমুদ্রের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার পর পারে, " সর্ব্বজন্তু বিবর্জ্জিতা " দ্বিখণ্ড এক " কাঞ্চনীভূমিঃ " আছে। তাহার পর পৃথিবীর সীমারূপে এক বৃহৎ শৈল আছে—

" অর্ব্বাচীনেতু তস্যার্দ্ধে চরন্তিরবিরশ্ময়ঃ।
পরার্দ্ধেতু তমোনিত্যং লোকালোকস্ততঃস্মৃতঃ ॥" ইতিলৈঙ্গে।

উহার এক পার্শ্বে রবি রশ্মির গমন, অপর পার্শ্বে সূর্য্য কিরণের গমনাভাব। তৎপ্রযুক্ত ঐ শৈলের নাম লোকালোক পর্ব্বত।

অনেকে অনুমান করেন যে, আধুনিক এসিয়াখণ্ডকেই প্রাচীন আর্য্যেরা জম্বুদ্বীপ কহিতেন ; অপর ছয় দ্বীপের বিবরণ কল্পিত হইলেও জম্বুদ্বীপের বিবরণ তাঁহারা সম্যক্ প্রকারে অবগত ছিলেন, এবং জম্বুদ্বীপ সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্ত প্রকটন ও করিয়া গিয়াছেন। এই অনুমান নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমুলক না হইলেও সম্পুর্ণ অভ্রান্ত নহে। কারণ জম্বুদ্বীপের বিষয়ে আর্য্যেরা অনেক কথা কহিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশেরই আধুনিক তত্ত্বের সহিত ঐক্য নাই। যাহাহউক সে সকল বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া পুরাণে যেরূপ বর্ণন আছে, তাহাই অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত-বিষ্ণুপুরাণে যথা—

" ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিম্পুরুষংস্মৃতং।

হরিবর্ষং তথৈবান্যন্মেরোর্দক্ষিণতো দ্বিজ ॥
রম্যকঞ্চোত্তরং বর্ষং তথৈবানুহিরন্ময়ং।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথাবৈভারতং তথা ॥
ইলাবৃতঞ্চ তন্মধ্যে সৌবর্ণোমেরুরুচ্ছ্রিতঃ।
মেরোঃপূর্ব্বেণভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে।
নবসাহস্র মেকৈকমেতেষাং দ্বিজসত্তম ॥"

জম্বুদ্বীপের দক্ষিণাংশে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষ, তদুত্তরে কিম্পুরুষ, তদুত্তরে হরিবর্ষ, তদুত্তরে সুমেরুর চতুঃপার্শ্বে ইলাবৃতবর্ষ, ইলাবৃতের পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ ও পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, এই তিনবর্ষের উত্তরে রম্যকবর্ষ, তদুত্তরে হিরণ্ময়বর্ষ, এবং তদুত্তরে কুরুবর্ষ। এই নয় বর্ষের প্রত্যেকের পরিমাণ নয় সহস্র যোজন!

উপরে যে হিমালয় ও সুমেরু পর্ব্বতের উল্লেখ হইল,তন্মধ্যে হিমালয়ের বর্ণনা স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে; সুমেরুর বিবরণ বিষ্ণুপুরাণে এই রূপ আছে—

"তস্যাপি মেরুর্মৈত্রেয় মধ্যে কনক পর্ব্বতঃ।
চতুরশীতি সহস্রো যোজনৈস্তস্যচোচ্ছ্রয়ঃ ॥
প্রবিষ্টঃষোড়শাধস্তা দ্দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ।
মূলে ষোড়শসহস্রো বিস্তরাস্তস্য ভূভৃতঃ ॥"

অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে সুমেরু নামে এক কাঞ্চনময় পর্ব্বত আছে। তাহার উচ্চতা চৌরাশি সহস্র যোজন, এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে ষোল সহস্র যোজন প্রোথিত; ইহার শিরোভাগের বিস্তার বত্রিশ সহস্র যোজন; এবং মূলের বিস্তার ষোলসহস্র যোজন। লিঙ্গপুরাণে আছে—

"নতত্র সূর্য্যস্তপতি নচজীর্য্যন্তিমানবাঃ।
চন্দ্রসূর্য্যো সনক্ষত্রৌ প্রকাশেতেনতত্রবৈ॥"

শৈবেচঃ—

'নচবর্ষতি পর্জন্যোগিরেস্তস্য প্রভাবতঃ।'

এই পর্ব্বতে সূর্য্য প্রখর রশ্মিদ্বারা তাপদানে অসমর্থ; এবং ইহার অধিবাসীরা জরাজীর্ণ নহে। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি তথা প্রকাশ হইতে পারে না; এবং মেঘ পর্য্যন্ত সেখানে বারি বর্ষণ করে না।

পুনশ্চ বৈষ্ণবে—

'মেরোশ্চতুর্দ্দিশং তত্র নবসাহস্রবিস্তৃতং।
ইলাবৃতং মহাভাগ চত্বারশ্চত্রে পর্ব্বতাঃ ॥
বিষ্কুম্ভারচিতামেরোর্যোজনাযুত মুচ্ছ্রিতাঃ।
কদম্বস্তেষু জম্বুশ্চ পিপ্পলো বট এবচ।
একাদশ শতায়ামাঃ পাদপাগিরিকেতবঃ ॥'

সুমেরুর চতুর্দ্দিকে নয় সহস্র যোজন বিস্তৃত ইলাবৃতবর্ষ। ঐ বর্ষের চতুঃপার্শ্বে চারিটি পর্ব্বত। সেই প্রাচীর স্বরূপ শৈল চতুষ্টয়ের উপরিভাগে ক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তরদিকে কদম্ব,জম্বু,অশ্বত্থ, ও বট বৃক্ষ আছে। উহার এক এক বৃক্ষের উচ্চতা একাদশ সহস্র যোজন।

মহর্ষিগণ তৎপরে নববর্ষের সীমাপর্ব্বতগুলির এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যে, হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, নীল, শ্বেত, শৃঙ্গবান, মাল্যবাণ ও গন্ধমাদন, ঐ অষ্ট মহাদুর্লংঘ্য পর্ব্বতের দ্বারা নববর্ষ বিভক্ত

হওয়াতে, একবর্ষের লোক অপর বর্ষে যাইতে পারে না। ভারতবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষও হরিবর্ষের উত্তর সীমায় ক্রমে হিমালয়, হেমকুট, এবং নিষধ নামক অদ্রিত্রয় অবস্থিত, ইহাদের দৈর্ঘ্য ক্রমে, ৮০, ৯০, ও ১০০ সহস্র যোজন। কেতুমাল, ইলাবৃত, ও ভদ্রাশ্ব এই বর্ষত্রয়ের উত্তর সীমা নীল পর্ব্বতের দৈর্ঘ্য ও নিষধের ন্যায় লক্ষ যোজন। রম্যকবর্ষের উত্তর সীমা শ্বেত পর্ব্বত নবতি সহস্র যোজন দীর্ঘ ও হিরন্ময় বর্ষের উত্তর সীমা শৃঙ্গবান্ অশীতি সহস্র যোজন দীর্ঘ। এই ছয় পর্ব্বতের প্রত্যেকটি দ্বিসহস্র যোজন উচ্চ ও দ্বিসহস্র যোজন বিস্তৃত। এবং দৈর্ঘ্যে ইহারা পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু জম্বুদ্বীপের গোলতা নিবন্ধন কোথাও দৈর্ঘ্য কিঞ্চিৎ অধিক, কোথাও কিছু ন্যূন। *

* শ্রীমদ্ভাগবতে। যস্মিন্নব বর্ষাণি নবযোজন সহস্রায়ামান্যষ্টভির্ম্মর্য্যাদা গিরিভিঃ সবিভক্তানি ভবন্তি॥ বৈষ্ণবেচ। হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চ স্য দক্ষিণে। নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গীচ উত্তরে বর্ষপর্ব্বতাঃ। লক্ষ প্রমাণৌ দ্বৌমধ্যে দশহীনাস্তথা পরে। সহস্রদ্বিতয়োচ্ছ্রায়াস্তাবদ্বিস্তারিণশ্চতে॥ বারাহে। জম্বুদ্বীপ প্রমাণেন নিষধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ তস্মাচ্চ দশভাগেন হেমকূটঃ প্রহীয়তে। হিমবান্ বিংশভাগেন তস্মাদেব প্রহীয়তে। অশীতি হিমবান্ শৈল আয়াতঃ পূর্ব্বপশ্চিমে। নীলঃ শ্বেতশ্চ

বিষ্ণুপুরাণের স্থলান্তরে লেখা আছে যে, মাল্যবাণ ও গন্ধ মাদন পর্ব্বত, উত্তরে নীল পর্ব্বত ও দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং প্রত্যেকে চল্লিশ সহস্র যোজন উচ্চ।

'আনীল নিষধায়ামৌ মাল্যবদ্ গন্ধমাদনৌ।
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি পরিব্রধ্নৌ মহীতলাৎ।'

তদনন্তর লিঙ্গপুরাণে এই সকল পর্ব্বতের শোভা ও ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি এইরূপে বর্ণিত আছেঃ—

'হিমবৎপ্রমুখাশ্চাষ্টৌ মর্য্যাদাপর্ব্বতাইমে।
নানাধাতু পিনদ্ধাশ্চ নানারত্নাকরা শ্চবৈ॥
নানাপুষ্প ফলোপেতা নানাবৃক্ষগণাবৃতাঃ।
ভূস্বর্গা দেবভোগ্যাশ্চ দুষ্প্রাপ্যা মানবৈর্ভুবি।
হেমকূটেতু গন্ধর্ব্বা বিজ্ঞেয়া শ্চাপ্সরোগণাঃ॥
সর্ব্বে নাগাস্তু নিষধে শেষ বাসুকি তক্ষকাঃ॥
নীলেষু বৈদূর্য্যময়ে সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষয়ো মলাঃ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেত পর্ব্বত উচ্চতে॥
শৃঙ্গবৎ পর্ব্বতে চৈব পিতৃণাং নিলয়াঃ শুভাঃ।
হিমবান্ দক্ষ মুখ্যানাং ভূতানামীশ্বর স্যচ।
সর্ব্বাদ্রিষু মহাদেবো হরিণা ব্রহ্মণা সুরৈঃ॥'

গন্ধমাদন পর্ব্বত সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে—

শৃঙ্গীচ ক্রমেনৈবং প্রমাণকাঃ। অবগাঢ়াস্ত্র্যভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্ব পশ্চিমৌ। দ্বীপস্য মণ্ডলীভাবাদহ্রাস বৃদ্ধি প্রকীর্ত্তিতে॥

'সন্তি বিদ্যাধরাণাঞ্চ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
উদ্যানানি বিচিত্রাণি ভবনানি বহুনিচ ॥
তেষু বিদ্যাধর বরা বিদ্যাধর্য্যশ্চ কৌতু-
কাৎ।
বিহরন্তি সুখং যত্রবায়ুর্ব্বহতি গন্ধবান ॥
সুগন্ধি পুষ্প সম্ভূতান্ গন্ধানাদায় সর্ব্বতঃ।
দেবাদৈত্যাদানবাশ্চ কদাচিদ্ যান্তিত-
ত্রবৈ ॥'

উপরি উদ্ধৃত সংস্কৃত পদগুলি এত সরল যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক বৃন্দের ও সহজে মর্ম্ম গ্রহ হইবে, এই বিশ্বাসে আমরা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিলাম না। এবং বর্ত্তমান শ্রেণীর প্রবন্ধ দীর্ঘ হইলে অনেক পাঠকের নিকটই নীরস বোধ হয়। অতত্রব এস্থলেই প্রথম প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।



সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। "মনোরঞ্জন-স্বপ্ন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত।" গ্রন্থকার এই মনোরঞ্জন-স্বপ্নে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি বহুশাস্ত্রের মূল সত্য এবং সমাজ-রহস্য ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বহুবিষয়ের মূল তত্ত্ব দিব্যচক্ষে দর্শন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন,—কিন্তু তিনি যেরূপ দেখিতে পাইয়াছেন, সেইরূপ দেখাইতে পারেন নাই। তিনি শেষ দেখিয়াছেন এই,— "নিরাকার নির্ব্বিকার পদার্থ ভাবিতে চেষ্টা করিয়া তাহাতে অপারগ হইলে মন যেমন নীচকার্য্যে রত হয়, দেবদেবীর চিন্তা করিলে মন তেমন হয় না। **** অতএব ভক্তির উদয় হইলে যে সাকার মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভক্তিসেবক ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা অনাদি, অনন্ত ও অসীম পদার্থকে কল্পনাবাঞ্ছিত বিদ্যাবিভূষিত সীমাবিশিষ্ট মনে ও পরিমিতবুদ্ধিতে ধ্যান বা ধারণা করা অসম্ভব বিধায় সৃষ্টি স্থিতি লয় দর্শন দ্বারা ঈশ্বরের তিন গুণের উদ্রেক করতঃ তাঁহার প্রতিরূপস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ও তাঁহাদিগ হইতে অপর দেবদেবী কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে দৃঢ়ভক্তি করিবার সূক্ষ্ম ও সুচারুপথ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

এই উদ্ধৃত অংশের শেষভাগটি পড়িবার সময় ইহাকে আদালতের রোবকারি কিংবা পুলিসের রিপোর্ট বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। কারণ প্রচলিত বাঙ্গালায় একই বাক্যে করিয়া করতঃ, হইয়া হওতঃ ইত্যাদিরূপ অনন্তকোটী অসমাপিকা ক্রিয়া এইক্ষণ আর স্থান পায় না, এবং বিধায় প্রভৃতি অর্থশূন্য শব্দও ব্যবহৃত হয় না। রিপোর্ট ও রোবকারিতেই এইরূপ ক্রিয়াপদবৈচিত্র ও বিধায় প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হইয়া

থাকে। উদ্ধৃত অংশে কল্পনাবাঞ্ছিত পদটি কি অর্থে কাহার বিশেষণ তাহা আমাদিগের বুদ্ধিগম্য হইল না। আমরা অবশ্য এজন্য দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি। কেন না, যাহা বুঝি না, তাহার সমালোচনা করা অনুচিত।

২। "শূরবালা—সুরবালা। স্বর্গীয়া স্বর্ণলতা বিরচিত। হরিনাভি সাহিত্য-উৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত।" গ্রন্থকর্ত্রী যখন জীবিত নাই, তখন আমরা নিন্দা করিলেও তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না, প্রশংসা করিলেও সে প্রশংসায় তিনি পুলকিত হইবেন না। সুতরাং আমরা কাহাকে আর কি বলিব? তিনি জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে এইমাত্র বলিতাম যে, নাটক কাহাকে বলে তাহা না বুঝিয়া থাকিলেও তিনি সুললিত পদ্য রচনায় নিপুণ। অৰ্দ্ধশিক্ষিত বালিকার পক্ষে ইহাই বিস্তর প্রশংসা।

৩। "আর্য্য-সংগীত।" এখানি কে আমাদিগকে উপহার দিলেন, তাহা জানি না। কারণ গ্রন্থকার তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। কবিতাটি পড়িয়া বোধ হইল, হেমবাবুর কবিতাবলী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছে। তবে কথা এই, অন্যদীয় কবিতার পদাবলী যেরূপ কণ্ঠস্থ হয়, রস ও মাধুর্য্য সেইরূপ সহজে হৃদ্গত হয় না।

৪। "নিষ্ফলতরু। কোন্নগর নিবাসিনী শ্রীমতী তরঙ্গিণী দাসী বিরচিত। শ্রীভুবনমোহন ঘোষকর্ত্তৃক প্রকাশিত।"—পূর্ণিমার শশী, প্রিয়তমের প্রতি, বিধবার স্বপ্ন এবং বসন্তসমাগম প্রভৃতি কতিপয় গদ্য ও পদ্য রচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি গ্রথিত, গ্রন্থকর্ত্রী বর্ত্তমান কালের নভেল নাটকীয় বাঙ্গালায় মন্দ শিক্ষিত নহেন। তিনি শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিবার কৌশল যেরূপ শিখিয়াছেন, যদি সেইরূপ গাঢ় শিক্ষা পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার লেখা এইরূপ এলান এলান এবং অনেক স্থলেই অর্থশূন্য ও উদ্দেশ্য শূন্য না হইয়া,—যে সকল কথা ইদানীং সকলেই সকল পুস্তকে পড়িতে পায়, শুধু তাহাতেই পরিপূর্ণ না রহিয়া, অধিকতর পাঠযোগ্য হইত। তিনি পিঞ্জর রুদ্ধ সারিকার ন্যায় পরের কথা না কহিয়া নিজের কথা কহিলে, শুনিবার জন্য লোকের অধিকতর আগ্রহ জন্মিত, এবং লোকে বঙ্গীয় কুলবালাদিগের শিক্ষার পরিমাণ বুঝিতে পাইত। এই পুস্তক সেই সকল আশার সাফল্য বিষয়ে,—"নিষ্ফল তরু।"

৫। "প্রণয়পাগল, প্রথমখণ্ড। শ্রীরজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।"—রচনার নমুনা,—

"কামিনি!
পাগল করিলি আমারে
এমন সৌরভ-মধু কে দিল তোমারে?
একটু নয়নান্তর হইলে অমনি
কেন পাগলিনী তুমি হয়ে সুবদনি!
মধুগন্ধ আবাহনে ডাক বারে বারে
পাগল করিলি আমারে।"

পূর্ব্ব বাঙ্গালার কতিপয় ভূস্বামী এই গ্রন্থের মুদ্রণ সাহায্য করিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া পরিচিত এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহা উপহার লইয়াছেন। সকলেরই রুচি পরিমার্জ্জিত !!

৬। "মেয়েলী অর্থাৎ বঙ্গীয় কামিনী-দিগের ব্যবহৃত গার্হস্থ্য শ্লোক ও পদাবলী। প্রথম ভাগ। শ্রীললিতমোহন রায় কর্ত্তৃক সংকলিত।" এই গ্রন্থ হইতে দুই চারিটি মেয়েলী কথা পাঠকবর্গের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কড়ি দিয়া কিনব দই।
গোয়ালিনী আমার কিসের সই॥"

"জামাইর বড় কোচার ফের।
ছয়বুড়ি কড়ি সুতার সের॥"

"মাসিমার আদরে।
পরাণ আমার বিদরে॥"

"যদি থাকে নছিবে।
আপনে আপনে আসিবে॥"

ইহার মধ্যে কতকগুলি উক্তি নিতান্ত অশ্লীল, ও অশ্রাব্য। নিতান্ত জঘন্য জাতীয় স্ত্রীলোক কি পুরুষের মুখে ভিন্ন এরূপ কথা প্রায় কোথাও শুনা যায় না। সংগ্রহকার তাঁহার ২৩৮, ২৩৯ প্রভৃতি নম্বরের উক্তি কোন্ শ্রেণি মেয়েদের মুখে শুনিয়াছেন,তাহা তিনিই বলিতে পারেন। অন্য কতকগুলি নিতান্ত গ্রাম্য ও বীভৎস, যথা ৮৮নম্বর। আর এক কথা এই, যে কথায় যোটক অথবা মেল আছে, তাহাই যে মেয়েলী ইহা তাঁহাকে কে বলিয়াছে। এই গ্রন্থ ময়মনসিংহের এক অতি প্রধান ভূম্যধিকারীকে উৎসর্গ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ উৎসর্গ দেওয়া বঙ্গদেশ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি প্রচলিত আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। উৎসর্গ পত্রের প্রথমেই লেখা আছে,—"আর্য্য! মেয়েলী চিরদিনই আপনার নিকট আদরের জিনিস।" বাঙ্গালি গ্রন্থকার বঙ্গীয় ভূস্বামীকে ইহা না কহিয়া আর কি কহিবে? কিন্তু যাঁহাকে এই গ্রন্থ উপহার দেওয়া হইয়াছে, তিনি উচ্চতর বিষয়ে অনুরাগী বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত।

৭। "বিজনসংগীত। কাব্য, শ্রীযদুনাথ পালিত কর্ত্তৃক প্রণীত।" এখানি সম্প্রতি মুদ্রিত না হইলেই ভাল ছিল। বঙ্গদেশের অনেক বুদ্ধিমান যুবা—জানিনা কি এক প্রলোভনে পড়িয়া, শিক্ষার সময়কে গ্রন্থ রচনায় ব্যয়িত করিতেছেন। সময়ের এইরূপ অপব্যবহার সমাজের অনিষ্টকর। যশঃস্পৃহার অঙ্কুশতাড়না অবশ্যই অনেকের পক্ষে অসহ্য, কিন্তু যাঁহাদিগের সহিষ্ণুতা নাই,তাঁহারা জগতে প্রায়শঃই যশস্বী হন না। বিজনসংগীত রচয়িতাও যদি আর দশ বৎসরকাল অপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত উপকার হইত।

জীবনপ্রভাত।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঈশানী-মন্দীর।

"———————— হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল।"
মধুসূদন দত্ত।

পরাক্রান্ত জায়গীরদার ও জুমলাদার চন্দ্ররাওয়ের বাটী হইতে কএক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটি মন্দির ছিল। অনতি-উচ্চ একটি পর্ব্বত-শৃঙ্গে সেই মন্দির অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দির-সম্মুখে প্রস্তররাশি সোপানরূপে খোদিত ছিল, নীচে একটি পর্ব্বততরঙ্গিণী কুল্ কুল্ শব্দ করিয়া সেই সোপানের পদ প্রক্ষালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরাকাল অবধি অসংখ্য যাত্রী ও উপাসক এই পুণ্য-নদীতে স্নান করিয়া সোপান আরোহণ করিয়া ঈশানীর পূজা দিত, অদ্য পর্য্যন্ত মন্দিরের গৌরব বা যাত্রীসংখ্যা হ্রাস হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে, পর্ব্বতের পৃষ্ঠ-দেশ বহু পুরাতন বৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চূড়া হইতে নীচে সমতল ভূমি পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিবাযোগেও সেই বিশাল বৃক্ষ-শ্রেণী ঈষৎ অন্ধকার করিত, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়াতে ঈশানী-মন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কুটীরে বাস করিত। সেই পুণ্য সুস্নিগ্ধ স্থান দেখিলেই বোধ হয় যেন তথায় শান্তিরস ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদ্রেক হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুরাণ কথা বা বেদমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই পুরাতন পাদপ-বৃন্দ শ্রবণ করে নাই। বহু যুদ্ধ, অসংখ্য হত্যাকাণ্ডে মহা-রাষ্ট্রদেশ ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান কেহই এই ক্ষুদ্র শান্ত পর্ব্বতমন্দির আহবের ভীষণ স্বরে কলুষিত করেন নাই।

রজনী এক প্রহরের সময় একজন পথিক একাকী সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। পথিকের হৃদয় কি উদ্বেগ-পরিপূর্ণ। প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নয়ন হইতে উন্মত্ততার অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। পথিক ক্ষণেক দ্রুতবেগে এদিক ওদিক পদচারণ করিতেছিলেন, ক্ষণেক বা স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রোষে ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিতেছিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইতেছিল। রোষে, জিঘাংসায়, বিষাদে, অদ্য রঘুনাথের হৃদয় একেবারে দগ্ধ করিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের উদ্বেগ নিবারণ হয় না; শ্রান্তিবশতঃ কখন পাদপে ভর দিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করেন, পুনরায় নূতন চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া শ্রান্তি বিস্মৃত হয়েন, পুনরায় শীঘ্র বেগে পদচারণ করেন। রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায়! এ ভীষণ চিন্তার আশু উপশম না হইলে রঘুনাথের বিবেচনাশক্তি বিচলিত বা লুপ্ত হইবে! প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক! এই বিষম সংসারে শেলসম যে দুঃখ হৃদয় বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ ও দাহ করে, যে মানসিক রোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া তাহার উপশম করে। উম্মত্ততাই কত শত হতভাগার আরোগ্য! কত সহস্র হতভাগা এই আরোগ্য দিবানিশি প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না!

শরীর অবসন্ন হইল, রঘুনাথ অগত্যা একটি পাদপতলে উপবেশন করিলেন,—নিশ্চেষ্টভাবে বৃক্ষে ভর দিয়া উপবেশন করিলেন।

সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ করিতেছিলেন। আহা! সেই সঙ্গীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শান্ত নিশীথে শান্ত কাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ গগণ-মণ্ডলে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছিল। এখনও কাশী বা মথুরার পুরাতন মন্দিরে সূর্য্যোদয়ে বা সুস্নিগ্ধ সায়ংকালে সহস্র ব্রাহ্মণে সেই অনন্ত পুরাণ কথা বা বেদমন্ত্র পাঠ করেন; যখন সেই পুণ্যধামে বঙ্গদেশের বহুযাত্রীর সমাগম দেখি, সনাতন মন্দিরে সনাতন-ধর্ম্মের গৌরব দেখি, সায়ংকালের আরতিশব্দ বা শত মন্দিরের ঘণ্টা ও শঙ্খরব গগনে যুগপৎ উত্থিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা চারিদিকে উপবেশন করিয়া গম্ভীরস্বরে বেদপাঠ বা পুরাণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন, তখন আমি নৈশকাল বিস্মৃত হই, আধুনিক সময় ও আধুনিক জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল বিস্মৃত হই, হৃদয়ে নানা স্বপ্নের উদয় হয়, বোধ হয়, যেন সেই প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে বাস করিতেছি, চারিদিকে সেই পুরাকালের লোক, পুরাকালের সমাজ ও সভ্যতা, পুরাকালের শান্তি ও সুস্নিগ্ধতা।

সেই সমস্ত মহৎ কথা,—পুণ্যকথা; শাস্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণমুখোচ্চারিত হইয়া সেই শান্ত নৈশ কাননে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অচেতন পাদপকেও যেন সচেতন করিতে লাগিল, শাখাপত্র যেন সেই গীত কুতূহলে পান করিতে লাগিল, বায়ু সেই গীত বিস্তার করিতে লাগিল, মানবহৃদয় কখন বা প্রফুল্লিত, কখন বা উৎসাহিত, কখন বা গলিত হইতে লাগিল।

কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে! সুন্দর বঙ্গদেশে, তুষারপূর্ণ কৈলাসবেষ্টিত দূর কাশ্মীরে, বীরপ্রসূ রাজ-

স্থান ও মহারাষ্ট্রভূমিতে. সাগরপ্রক্ষালিত কর্ণাট ও দ্রাবিড়ে, সহস্র বৎসর অবধি এই গীত ধ্বনিত হইতেছে। যেন চিরকালই এই গীত ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ শিক্ষা কখন বিস্মৃত না হই। গৌরবের দিনে এই অনন্ত গীতে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, ও অযোধ্যা, মিথিলা, হস্তিনা, মগধ, উজ্জয়িনী, দিল্লী প্রভৃতি দেশ বীরত্বে ও যশে প্লাবিত করিয়াছিল। দুর্দ্দিনে এই গীত গাইয়া সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ, হৃদয়ের শোণিত দিয়াছিলেন, এই মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শিবজী পুনরায় পুরাকালের গৌরব সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। অদ্য ক্ষীণ দুর্ব্বল হিন্দুদিগের আশ্বাসের স্থল, ক্রন্দনের স্থল, এই পূর্ব্ব গীত মাত্র, যেন বিপদে, বিষাদে, দুর্ব্বলতায় আমরা পূর্ব্বকথা না বিস্মৃত হই, যতদিন জীবন থাকে যেন হৃদয় যন্ত্র এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে!

নব্য পাঠক! তুমি ইলিয়দ পাঠ করিয়াছ, দান্তে, সেক্সপীয়র, মিণ্টন্ পাঠ করিয়াছ, সাদী ও ফরদুসী পাঠ করিয়াছ, কিন্তু হৃদয় অন্বেষণ কর, হৃদয়ের অন্তরে কোন্ কথাগুলি সরসভাবপূর্ণ বোধ হয়? হৃদয় কোন্ কথায় অধিকতম আলোড়িত, প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্মাচার্য্যের অপূর্ব্ব বীরত্ব-কথা! দুঃখিনী সীতার অপূর্ব্ব পতিভক্তিকথা! এই কথা হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে,—এ কথা যেন হিন্দুজাতি কখন বিস্মৃত না হয়!

পাঠক! একত্র বসিয়া এক এক বার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক সময়ের রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশে এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে,—নচেৎ পুস্তক দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

শান্ত কাননে পবিত্র পুরাণকথা ও সঙ্গীত রঘুনাথের তপ্ত ললাটে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। উদ্বিগ্নহৃদয় শান্তি সেচন করিতে লাগিল। হতভাগার উন্মত্ততা ক্রমে হ্রাস পাইল, সেই মহৎ কথার নিকট আপনার শোক ও দুঃখ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি ক্ষুদ্র বোধ হইল! ক্রমে চিন্তাহারিণী নিদ্রা রঘুনাথকে অঙ্কেগ্রহণ করিলেন। রঘুনাথের শ্রান্ত অবসন্ন শরীর সেই বৃক্ষমূলে শয়িত হইল।

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আজি কিসের স্বপ্ন? আজি কি গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছেন, দিন দিন পদোন্নতি, দিন দিন বিক্রম ও যশোবিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছেন? হায়! রঘুনাথের জীবনের সে স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে, সে চিন্তা শেষ হইয়াছে, মরীচিকা-পূর্ণ সংসারের সে একটি মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ কি যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখি-

ভেছেন? শত্রুকে বিনাশ করিতেছেন, দুর্গ জয় করিতেছেন, যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন, সেই স্বপ্ন দেখিতেছেন? রঘুনাথের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে।

একে একে যৌবনের উদ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে,আশাদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, এই অন্ধকার রজনীতে শান্ত বন্ধুহীন যুবকের হৃদয়ে বহু দিনের কথা পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতির ন্যায় জাগরিত হইতেছে; শোকভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা, সুখ, গৌরব আমাদের নিকট বিদায় লইলে, বন্ধুহীন জনের যে কথা স্মরণ হয়, রঘুনাথ সেই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে জাগরিত হইল, পিতার দীর্ঘ অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট মনে হইল,বাল্যকালে সেই দূর মাড়ওয়ারে ক্রীড়া করিতেন, হাস্যধ্বনিতে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী, শান্ত, ধীর, প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল; আহা সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি আর এ জীবনে দেখিতে পাইবেন? আজি সে সোণার সংসার কোথায়, সে প্রফুল্ল আশালহরী কোথায়, এই শোকের দিনে, সন্তাপের দিনে, যাহার সান্ত্বনা বাক্যে প্রাণ জুড়াইবে, এরূপ হৃদয়ের সহোদরা কোথায়? নিদ্রিতের মুদিত নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল।

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলিত করিলেন। কি দেখিলেন? বোধ হইল যেন লক্ষ্মী স্বয়ং ভ্রাতার শিরোদেশ আপন অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কোমল শীতল হস্ত ভ্রাতার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিতেছেন, সহোদরার স্নেহ-পূর্ণ নয়নে যেন সহোদরের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। আহা! বোধ হইল যেন শোকে বা চিন্তায়, লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখখানি শুষ্ক হইয়াছে, নয়ন দুইটী সেইরূপ স্থির, প্রশস্ত, স্নিগ্ধ, কিন্তু শোকের আবাসস্থান!

রঘুনাথ নয়ন মুদ্রিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন,—বলিলেন 'ভগবন্ অনেক সহ্য করিয়াছি, কেন বৃথা আশায় হৃদয় ব্যথিত করিতেছ?'—

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রুবিন্দু বিমুক্ত হইল! রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মিলিত করিলেন, এ স্বপ্ন নহে,—তাঁহার প্রাণের সহোদরাই তাঁহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন!

উঃ! রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল; তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটি আপন তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন;—তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না, নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল, অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার শব্দ করিয়া

রোদন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোমাকে কি এ জীবনে আবার দেখিতে পাইলাম? অন্য সুখ দূর হউক, অন্য আশা দূর হউক, লক্ষ্মী তোমার হতভাগা ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এজীবনে আর কিছু চাহে না।' লক্ষ্মী ও শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ভ্রাতার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাঁদিলেন। আহা! এ ক্রন্দনে যে সুখ, জগতে কি রত্ন আছে, স্বর্গে কি সুখ আছে যাহা অভাগাগণ সে সুখের নিকট তুচ্ছজ্ঞান না করে?

পরস্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পরস্পরে অনেকক্ষণ বাকশূন্য হইয়া রহিলেন। বহুদিনের কথা, বাল্যকালের কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, সুখের লহরীর সহিত শোকের লহরী মিশ্রিত হইয়া হৃদয় উছলিতে লাগিল; থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিত ধারায় উভয়ের হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ভগিনীর ন্যায় এজগতে আর স্নেহময়ী কে আছে, ভ্রাতৃস্নেহের ন্যায় আর পবিত্র স্নেহ কি আছে? আমরা সে ভালবাসা বর্ণন করিতে অশক্ত, সহৃদয় পাঠক রঘুনাথ ও লক্ষ্মীর মনের ভাব অনুভব করুন।

অনেকক্ষণ পরে দুইজনের হৃদয় শীতল হইল; তখন লক্ষ্মী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার নয়নের জল মোচন করিয়া বলিলেন, 'ঈশানীর ইচ্ছায় কত অনুসন্ধানের পর আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম, আহা, আজ আমার কি পরম সুখ; দুঃখিনীর কপালে কি এত সুখ ছিল!' ক্ষণেক পর আপন অশ্রুবিন্দু বিমোচন করিয়া বলিলেন, 'ভাই, এই শীতল বাতাসে আর থাকিলে তোমার অসুখ হইবে, চল মন্দিরের ভিতর যাই; আমি আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।' উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

ভ্রাতা ভগিনী মন্দির-অভ্যন্তরে আসিলেন, লক্ষ্মী একটি স্তম্ভের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, শ্রান্ত রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ লক্ষ্মীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন, মৃদুস্বরে উভয়ে গভীর অন্ধকার রজনীতে পূর্ব্ব কথা কহিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে ভ্রাতার ললাটে ও দেহে হস্ত বুলাইয়া লক্ষ্মী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রঘুনাথ তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন। দস্যু-হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া অনাথা বালক কোন্ কোন্ দেশে বিচরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন। কখন মহারাষ্ট্রীয় কৃষকদিগের সহিত চাষ করিতেন, কখন গো বৎস বা মেষপাল রক্ষা করিতেন, মেষের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে, উপত্যকায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন বা নির্জ্জনে বসিয়া চরণদিগের গীত গাইতেন। কখন সায়ংকালে নদীকূলে এ-

কাকী বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই গীত গাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছেন, কখন প্রত্যুষে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন। পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ-প্রদেশে কএক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছেন, একজন মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকের অধীনে কার্য্য করিতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ-ব্যবসায়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অবশেষে মহানুভব শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন। আজি তিন বৎসর হইল সেই কার্য্য করিয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন তিনি কার্য্যে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সেই চন্দ্ররাওয়ের ষড়যন্ত্রে অদ্য অপমানিত হইয়া দেশে দেশে নিরাশ্রয়রূপে ভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্য মাত্র নাই, পিতার ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া এ অসার জগৎ পরিত্যাগ করিবেন।

ভ্রাতার দুঃখ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে স্নেহময়ী ভগিনী নিঃশব্দে অবারিত অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন; তিনি নিজের শোক সহ্য করিতে পারেন, ভ্রাতার দুঃখে একেবারে ব্যাকুল হইলেন। যখন সে কথা শেষ হইল কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিয়া আপনার কি পরিচয় দিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চন্দ্ররাওয়ের উপর ভ্রাতার যে বিজাতীয় ক্রোধ তাহা তিনি বুঝিলেন, চন্দ্ররাওয়ের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলে ভ্রাতার হৃদয়ে কি কষ্ট হইবে, তাহাও বুঝিলেন। ধীরে ধীরে অশ্রুজল মোচন করিয়া বলিলেন;—

"মহারাষ্ট্রদেশে আসিবার অনতিপরেই একজন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্র জায়গীরদার তাঁহাকে বিবাহ করেন। নারী স্বামীর নাম করে না, কিন্তু গগনের শশধরের নামই তাঁহার স্বামীর নাম, গগনের শশধরের ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা ও গৌরবজ্যোতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার বিপুল সংসারে লক্ষ্মী সুখে আছেন, প্রভুও দাসীর উপর অনুগ্রহ করেন, সে অনুগ্রহে দাসী সুখে আছেন। এ জীবনে তাঁহার আর কোন বাসনা নাই, কেবল প্রাণের ভ্রাতাকে সুখে থাকিতে দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হয়।

রঘুনাথের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে পাইতেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্য সেই কামনায় মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন, সহসা মন্দির পার্শ্বে বৃক্ষমূলে প্রাণের ভ্রাতাকে পুনরায় পাইলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া লক্ষ্মী ভ্রাতার হৃদয়ে শেলসম দুঃখ উৎপাটন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী দুঃখিনী, দুঃখের ব্যথা জানিতেন। লক্ষ্মী নারী, দুঃখ সান্ত্বনা করিতে জানিতেন। সহিষ্ণু হইয়া নিজ দুঃখ সহ্য করা ও সান্ত্বনা দিয়া পরের দুঃখ দূর করাই নারীর ধর্ম্ম।

অনেক প্রকার প্রবোধ বাক্য দিয়া ভ্রা-

তার মন শান্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন আমাদিগের জীবনই এইরূপ, সকল দিন সমান থাকেনা। ভগবান্ যেসুখ দেন তাহা আমরা ভোগ করি, যদি একদিন দুঃখ পাই তাহা কি সহ্য করিতে বিমুখ হইব? মানব জন্মই দুঃখময়, যদি আমরা দুঃখ সহ্য না করিব তবে কে করিবে? সুদিন দুর্দ্দিন সকলেরই আছে,—দুর্দ্দিনে যেন আমরা সেই বিধাতার নাম লইয়া নিজ শোক বিস্মৃত হই। তিনিই একদিন পিত্রালয়ে আমাদের সুখ দিয়াছিলেন, তিনিই অদ্য কষ্ট দিয়াছেন, তিনিই পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন।

লক্ষ্মী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

'ভাই! এ নৈরাশ দূর কর; এরূপ অবস্থায় থাকিলে শরীর কত দিন থাকিবে? আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে মনুষ্য-জীবন কত দিন থাকে?'

রঘুনাথ। 'থাকিবার আবশ্যক কি? যে দিন বিদ্রোহী বলিয়া সৈনিকের নামে কলঙ্ক পড়িল, সেই দিন সৈনিকের জীবন গেল না কি জন্য?'

লক্ষ্মী। 'তোমার ভগ্নী লক্ষ্মীকে চিরদুঃখিনী করিবে এই কি ইচ্ছা? দেখ ভাই আমার আর এ জগতে কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, জগৎ সংসারে কেহ নাই। তুমিও কি দুঃখিনী লক্ষ্মীর প্রতি সমস্ত মমতা ভুলিলে? বিধাতা কি এ হতভাগিনীর উপর একেবারে বিমুখ হইলেন?' লক্ষ্মীর নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রঘুনাথ ক্ষুব্ধ হইয়া সস্নেহে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বলিলেন, 'লক্ষ্মী! তুমি আমাকে ভাল বাস, তাহা জানি, তোমাকে যে দিন কষ্ট দিব সে দিন যেন ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু ভগিনি! এ জীবনে আর আমার সুখ নাই,—তুমি স্ত্রীলোক, সৈনিকের শোক বুঝিবে কিরূপে, জীবন অপেক্ষা আমাদিগের সুনাম প্রিয়, মৃত্যু অপেক্ষা কলঙ্ক ও অপযশ সহস্রগুণে কষ্টকর! সেই কলঙ্কে রঘুনাথের নামে কলুষিত হইয়াছে।'

লক্ষ্মী। 'তবে সেই কলঙ্ক দূর করিবার চেস্টায় কেন বিমুখ হও? মহানুভব শিবজীর নিকটে যাও, তাঁহার ক্রোধ দূর হইলে তিনি অবশ্যই তোমার কথা শুনিবেন, তোমার দোষ নাই, বুঝিবেন।'

রঘুনাথ উত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিলেন পিতার অভিমান, পিতার দর্প, পুত্রে বর্ত্তমান। তিনি প্রাণ থাকিতে অন্যায়াচারীর নিকট আবেদন করিবেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ভ্রাতার অন্তরের ভাব বুঝিয়া সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন। বলিলেন, 'মার্জ্জনা কর, আমি স্ত্রীলোক, সমস্ত বুঝি না। কিন্তু যদি শিবজীর নিকট যাইতে অস্বীকার কর, কার্য্যদ্বারা কেন আপন যশ রক্ষা কর না?

পিতা বলিতেন সেনার সাহস ও প্রভু-ভক্তি সমস্ত কার্য্যে প্রকাশ হয়, যদি বিদ্রোহী বলিয়া তোমাকে কেহ সন্দেহ করিয়া থাকে, অসিহস্তে কেন সে সন্দেহ খণ্ডন কর না ? '

উৎসাহে রঘুনাথের নয়ন ধক্ ধক্ করিতে লাগিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ' কিরূপে ? '

লক্ষ্মী। ' শুনিয়াছি শিবজী দিল্লী যাইতেছেন, তথায় সহস্র ঘটনা ঘটিতে পারে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্মপরিচয় দিবার সহস্র উপায় থাকিতে পারে। আমি স্ত্রীলোক, আমি কি জানিব, বল ? কিন্তু তোমার পিতার ন্যায় সাহস, তাঁহারই ন্যায় বীরত্ব-প্রতিজ্ঞা করিলে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য না সফল হইতে পারে ? '

রঘুনাথের যদি অন্য চিন্তার সময় থাকিত তবে বুঝিতেন কনিষ্ঠা লক্ষ্মী মানব-হৃদয়-শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহেন ; যে ঔষধি আজি রঘুনাথের হৃদয়ে ঢালিয়াছিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে শোকসন্তাপ দূর হইল, সৈনিকের হৃদয় পূর্ব্ববৎ উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেকক্ষণ নিষ্পন্দে চিন্তা করিলেন, তাঁহার নয়ন উল্লাসোৎফুল্ল, মুখমণ্ডল সহসা নব গৌরব ধারণ করিল। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—

' লক্ষ্মী ! তুমি বালিকা, কিন্তু তোমার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে নূতন ভাবের উদয় হইল। আমার জীবন আর নিরুদ্দেশ্য নহে, আমার হৃদয় উৎসাহশূন্য নহে। ভগবান সহায় হউন, রঘুনাথজী বিদ্রোহী নহে, ভীরু নহে, একথা জগতে এখন প্রচার হইবে। কিন্তু তুমি বালিকা, তোমার নিকট এসমস্ত কহি কেন, তুমি আমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝিবে ? '

লক্ষ্মী ঈষৎ হাসিলেন, ভাবিলেন ' রোগ নির্ণয় করিলাম আমি, ঔষধি দিলাম আমি, তথাপি কিছু বুঝি না ? ' প্রকাশ্যে বলিলেন, ' ভাই ! তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমি কিরূপে বুঝিব ? কিন্তু যাহাই হউক তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী যত দিন বাঁচিবে, তুমি পূর্ণমনোরথ হও, জগদীশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনাকরিবে।'

রঘুনাথ। ' আর লক্ষ্মী ! আমি যত দিন বাঁচিব, তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা কখন বিস্মৃত হইব না। '

অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মী অধোবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন,—

' আমার আর একটি কথা আছে, কিন্তু কহিতে ভয় হইতেছে।'

রঘু। 'লক্ষ্মী ! আমার নিকট তোমার কি কথা বলিতে ভয় হয় ? আমি তোমার সহোদর, সহোদরের নিকট কি ভয় ?'

লক্ষ্মী। 'চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার বোধ হয় তোমার অপকার করিয়াছেন।'

রঘুনাথের হাস্য দূর হইল, রোষে জি-

জিঘাংসায় ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিলেন। বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

কম্পিতস্বরে দুঃখিনী লক্ষ্মী বলিলেন, 'জিঘাংসা মহল্লোকের অনুচিত। ভাই, অঙ্গীকার কর তাঁহার অনিষ্ট করিবে না।'

রঘুনাথ কর্কশ ভাবে বলিলেন—

'তিনি যদি আমার সহোদর ভ্রাতা হইতেন তথাপি কপটাচারীকে মার্জ্জনা করিতাম না,—এই অসি দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিব। সে পামরের নাম করিয়া কেন তোমার পবিত্র মুখ কলুষিত করিতেছ?'

লক্ষ্মী স্বভাবতঃ স্থিরপ্রকৃতি, শান্তা, ও বুদ্ধিমতী, কিন্তু স্বামীনিন্দা সহ্য করিতে পারিলেননা। সজল নয়নে সরোষে বলিলেন।

'ভ্রাতার নিকট পূর্ব্বে কখনও আমি কোন ভিক্ষা করি নাই; একটি কথা বলিলাম তাহা রাখিলে না; আমি পাপীয়সী, আমরা সকলে পামর; বিদায় দাও, আর জন্মের মত ভগিনীকে দেখিতে পাইবে না।'

সস্নেহে, সজলনয়নে রঘুনাথ বলিলেন,

'লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোমাকে কবে আমি মন্দ কথা বলিয়াছি? চন্দ্ররাওকে আমি মার্জ্জনা করিতে পারি না, কেন সে ভিক্ষা করিতেছ?'

লক্ষ্মী ঝর্ ঝর্ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—'অনাথা ভগিনীর প্রতি কত ভালবাসা আছে তাহাই জানিবার জন্য। ভাই! তাহা জানিলাম। এক্ষণে বিদায় দাও, দুঃখিনীর অন্য ভিক্ষা নাই।'

রঘুনাথ সজলনয়নে অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, 'লক্ষ্মী! চন্দ্ররাওয়ের জন্য তুমি কেন যাচ্ঞা করিতেছ জানি না, তাহাকে কখনও মার্জ্জনা করিব মনে করি নাই; কিন্তু তোমার নিকট অদেয় আমার কিছু নাই। এই ঈশানী-মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি চন্দ্ররাওয়ের অনিষ্ট করিব না। আমি তাহার দোষ মার্জ্জনা করিলাম—জগদীশ্বর তাহাকে মার্জ্জনা করুন।'

লক্ষ্মী হৃদয়ের সহিত বলিলেন 'জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্জ্জনা করুন।'

পূর্ব্বদিকে প্রভাতের আলোকছটা দেখা যাইল। লক্ষ্মী তখন অনেক অশ্রুবর্ষণ করিয়া সস্নেহে ভ্রাতার নিকট বিদায় লইলেন, বলিলেন—'আমার সঙ্গে বাটীর অন্য লোক মন্দিরে আসিয়াছে এখনও সকলে নিদ্রিত আছে, এইক্ষণেই আমি না যাইলে জানিতে পারিবে। এখন চলিলাম, পরমেশ্বর তোমার মনোরথ পূর্ণ করুন।'

'পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন' এই বলিয়া সস্নেহে লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া রঘুনাথও মন্দির হইতে নিক্রান্ত হইলেন। লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইলাম, পাঠক! চল আমরা হতভাগিনী সরযুর নিকট বিদায় লইয়া আইসি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

"যাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিষেক,

* * * *

"যাও যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
"এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণের দিন রঘুনাথের যাইতে কি জন্য বিলম্ব হইয়াছিল পাঠক অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন। সে যুদ্ধ, সে আক্রমণ, অতিশয় সঙ্কটাপন্ন, রঘুনাথ জানিতেন। সঙ্কটের সময় পশ্চাতে থাকা রঘুনাথের অভ্যাস ছিল না, সুতরাং সে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবেন কি না, সন্দেহ। যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে একবার প্রাণভরে হৃদয়ের সরযুকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন,—জীবনের মত একবার সরযূর নিকট বিদায় লইবেন।

সন্ধ্যার সময় ছাদে সরযূ বালা ভ্রমণ করিতেছিলেন,—ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া রঘুনাথ ডাকিলেন 'সরযূ।' সে শোকপূর্ণ স্বর শুনিয়া সরযু শিহরিয়া উঠিলেন, রঘুনাথের অশ্রু-আপ্লুত চক্ষু দুটী দেখিয়া ভীত হইলেন। উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে রঘুনাথের নিকটে আসিয়া দুই হস্তে রঘুনাথের হস্ত ধরিয়া বলিলেন.—

'ছি রঘুনাথ! তোমার চক্ষুতে জল কেন? তোমার কোন কষ্ট হইয়াছে? আমার মাথা খাও, বল না, চক্ষের জল ফেলিতেছ কেন?' নিজের অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষু মুছাইয়া দিলেন,—কিন্তু অগত্যা আপনার চক্ষুতে জল আসিল।

রঘুনাথ যখন আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন,—'না সরযূ, কিছু নহে। তোমাকে যখন দেখি তখনই আমার হৃদয় পূর্ণ হয়, আমি কথা কহিতে পারি না। যে দিন প্রথমবার তোমাকে তোরণ-দুর্গে দেখিয়াছিলাম, সে দিন যেরূপ আমার শরীর হইতে প্রাণ তোমার দিকে ধাবিত হইয়াছিল,—এখন শতবার তোমাকে দেখিয়াছি, দিবানিশি তোমার মুখখানি মনে মনে দেখি,—এখনও প্রাণ সেইরূপ তোমার দিকে ধায় এখনও শরীর সেইরূপ অবসন্ন হয়। জগদীশ্বর! এমন পুণ্য কি করিয়াছি যে এ আনন্দময়ী পুষ্পকে হৃদয়ে ধারণ করিব!'

সরযূ কথা কহিতে পারিলেন না,—রঘুনাথের হস্তে, তাঁহার হস্ত সন্নিবেশিত ছিল, কেবল সেই হস্ত ঘর্ম্মাক্ত ও কম্পিত হইল, দেহযস্টি বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, কমনীয় লজ্জায় রঞ্জিত মুখমণ্ডল হেঁট করিলেন, সুখে চক্ষু দুটি জলে প্লাবিত হইল। উঃ! রঘুনাথের কথায় সরযূর হৃদয়ে যে আনন্দলহরী বহিতেছিল কে বর্ণনা করিতে পারে? জগতে কি আনন্দ আছে, স্বর্গে কি সুখ আছে, যে জন্য সরযু সে মুহূর্ত্তের আনন্দ বিনিময় করিতে চাহেন?

দুই জনে ক্ষণেক পরস্পরের হস্তধারণ

করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; শেষে রঘুনাথ বলিলেন—

'সরযূ! এখন বিদায় দাও।'

সহজ স্বরে এই কথাগুলি কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল,—সরযূ পুনরায় রঘুনাথের হৃদয়ের উদ্বেগ বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—

'রঘুনাথ, তোমার মনে কি কথা আছে আমাকে বলিতেছ না; তাহা না হইলে সন্ধ্যার সময় হঠাৎ আমাকে দেখিয়া চক্ষুর জল ফেলিলে কেন,—তাহা না হইলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই বিদায় চাহিতেছ কেন? ছি ছি তুমি আমার নিকট মনের কথা লুকাইতেছ, রঘুনাথ! সরযূর মনে এমন কথা কি আছে যে তুমি না জান?'

রঘুনাথ অদ্য নিশীথের যুদ্ধকথা গোপন করিবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না, বলিলেন—

'না সরযূ, তোমার নিকট লুকাইবার রঘুনাথের কি আছে,—আজ,—আজ, আজ রাত্রিতে একটি সামান্য যুদ্ধে যাইতেছি সেই জন্য বিদায় লইতে আসিলাম, চিন্তা করিও না, পুনরায় কাল দেখা হইবে!'

সরযূ শিহরিয়া উঠিলেন, দাঁড়াইতে না পারিয়া রঘুনাথের শরীরের উপর হেলিয়া পড়িলেন এবং তাঁহারস্কন্ধে আপন মস্তক স্থাপন করিলেন; কথা কহিতে পারিলেন না; রঘুনাথ দেখিলেন সরযূ নিরব, অজস্র অশ্রুতে তাঁহার স্কন্ধ, বাহু ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে!

রঘুনাথ অনেক কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—ছি সরযূ, তুমি কেন মিথ্যা ভয় করিতেছ; আমি কত যুদ্ধে গিয়াছি, পুনরায় ত তোমার পার্শ্বে আসিয়াছি, অদ্য এটি অতি সামান্য যুদ্ধ মাত্র। আর দেখ, আমরা পরাধীন, ঘৃণিত, অপদার্থ, মুসলমানেরা আমাদের রাজা, আমরা দাস; একথা স্মরণ করিলে কাহার অন্তঃকরণ না বিদীর্ণ হয়, কে না নীরবে রোদন করে? পুনরায় হিন্দুরাজ্যের জন্য আমরা যুদ্ধ করিতেছি, যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্ব্বলের বল, তিনি আমাদের সহায় হইবেন; আর যদিই এ যুদ্ধে হত হই, মনুষ্যভাগ্যে ইহা অপেক্ষা কি সুখ হইতে পারে? তুমি রাজপুত কন্যা, রাজপুতের ন্যায় অদ্য আমাকে বিদায় দাও।'

ক্ষণেক রোদনে সরযূর হৃদয়ের উদ্বেগ শান্ত হইল, তিনি মস্তক তুলিয়া শান্ত নির্ম্মল পবিত্র নয়নে রঘুনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—'রঘুনাথ তোমার মহৎ উদ্দেশ্য জানি, যে দিন অবধি তুমি সেই উদ্দেশ্যের কথা আমাকে বলিয়াছ, সেই দিন অবধি কখনও তোমাকে যুদ্ধে যাইতে বিরত করি নাই। অদ্যও করিব না, কিন্তু নারীর প্রাণ, কখন্ কি ভাব উদয় হয় কে বলিবে, সহসা আমার মনে কেন ব্যথা পাইলাম, সহসা কেন চক্ষুতে

জল আশিল জানি না। যাও রঘুনাথ বিলম্ব করিওনা; তোমার হৃদয় সাহসী, আশয় মহৎ ও উন্নত, যুদ্ধে চিরজয়ী হও, দেশ দেশান্তরে তোমার যশ, তোমার নাম প্রচারিত হউক, সরযূও একাকিনী বসিয়া সেই যশোগীত গাইবে! জগদীশ্বর তোমাকে জয়ী করুন! তিনি জগতের রাজা, যিনি যোদ্ধার চিরবন্ধু, তাঁহাকে প্রণাম করি।'

'তিনি তোমাকে নিরাপদে রাখুন এই বলিয়া রঘুনাথ চলিয়া গেলেন। ছাদে সরযূ একাকিনী দণ্ডায়মানা, রাজপুতবালা সাহস বাক্যে হৃদয়বল্লভকে বিদায় দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শান্ত হইতেছে না, ঝর্ ঝর্ করিয়া নয়ন হইতে নীরবে অশ্রুবিন্দু পড়িতেছে।

কতক্ষণ পর অন্ধকার প্রান্তরে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল; দূরে নিবিড় অন্ধকারে একজন অশ্বারোহীর উন্নত আকৃতি বিলুপ্ত হইল। সরযূ চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, সমস্ত নিস্তব্ধ ও অন্ধকার; তাঁহার হৃদয় শূন্য ও অন্ধকার! ধীরে ধীরে ছাদ হইতে নামিলেন।

সেদিন অন্ধকারে সরযূ নয়নের মণি হারাইলেন, সেই দিন জীবনের জীবন হারাইলেন।

এক দিন, দুই দিন অতিবাহিত হইল, রঘুনাথের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। আশা প্রথমে কাণে কাণে বলিতে লাগিল—'রঘুনাথ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন, রঘুনাথ রাজসম্মানিত হইয়াছেন, বিজয়ী শীঘ্র উল্লাসিত হৃদয়ে সরযূপার্শ্বে আসিবেন, পরম কুতূহলে সরযূর হস্ত ধরিয়া যুদ্ধের গল্প বলিবেন।' অশ্বের ক্ষুরশব্দ হইলেই সরযূর হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ হইত, তিনি গবাক্ষ দিয়া চাহিয়া দেখিতেন, পুনরায় ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিতেন। গৃহে দ্রুত পদবিক্ষেপ শুনিলে সরযূ চমকিয়া উঠিতেন, পুনরায় নীরবে বসিয়া থাকিতেন।

দিন গেল রজনী আসিল, পুনরায় দিবস আসিল, এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, রঘুনাথ আর আসিলেন না। সরযূ সেই পথ চাহিয়া চাহিয়া শ্রান্ত হইলেন, আশা চিন্তায় পরিণত হইল, বালিকার গণ্ডস্থল ক্রমে শুষ্ক হইল, চক্ষুদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে জলপূর্ণ হইতে লাগিল; রঘুনাথ আসিলেন না।

সে চিন্তার অব্যক্তব্য যাতনা প্রকাশ করা যায় না; বালিকা কাহাকে সেকথা বলিবেন? নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, নীরবে গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন, অথবা সায়ংকালে সেই ছাদে উঠিয়া সেই অন্ধকার পরিপূর্ণ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শ্রান্ত হইতেন। সেই উন্নত দেহ কি দূরে দেখা যাইতেছে? সরযূর যোদ্ধা কি যুদ্ধ-উল্লাসে সরযূকে বিস্মৃত হইলেন? যুদ্ধে কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে? সহসা অশ্রুজলে সর-

যূর নয়ন আপ্লুত হইল, শুষ্ক গণ্ডস্থল দিয়া ধারা বহিয়া পড়িতে লাগিল।

সহসা বজ্রেরন্যায় সংবাদ আসিল রঘুনাথ বিদ্রোহী, বিদ্রোহাচরণের জন্য অবমানিত হইয়া দূরীকৃত হইয়াছেন! প্রথম মুহূর্ত্তে সরযূ চকিতের ন্যায় রহিলেন, কথার অর্থ তাঁহার বোধগম্য হইল না। ক্রমে ললাট রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল রঞ্জিত হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। দাসীকে বলিলেন "কি বলিলি, রঘুনাথ বিদ্রোহী? রঘুনাথ মুসলমানদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন? কিন্তু তুই নির্ব্বোধ, তোকে কি বলিব, সম্মুখ হইতে দূর হ!' শান্ত ধীর-স্বভাব সরযূকে এবম্বিধ ক্রুদ্ধ দেখিয়া দাসী বিস্মিত হইল, শশব্যস্তে সরিয়া গেল।

ক্রমে যুদ্ধ হইতে একে একে অনেক সৈন্য আসিতে লাগিল, সকলে বলিতে লাগিল 'রঘুনাথ বিদ্রোহী!' বার বার সরযূ এই কথা শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার সখিগণ সরযূকে এই কথা বলিলেন; বৃদ্ধ জনার্দ্দন সাশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন যে, কে জানে সেই সুন্দর উদারমূর্ত্তি বালকের মনে এরূপ ক্রূরতা ছিল? সরযূ সমস্ত শুনিলেন, কোন উত্তর করিলেন না, রঘুনাথের বীরত্বে ও সত্যব্রততায় সরযূর যে স্থির অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহা বিলুপ্ত হইল না। তিনি কাহাকেও কোন উত্তর দিলেন না, তাঁহার মুখমণ্ডল অত্য আরক্ত, নয়ন জলশূন্য!

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে পর এক দিন সন্ধ্যার সময় সরযূ সরোবরতীরে যাইলেন; হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া ধীরে ধীরে চিন্তিত ভাবে গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

সহসা পথিমধ্যে সেই নৈশ অন্ধকারে জটাজূটধারী দীর্ঘকায় একজন গোস্বামীকে দেখিতে পাইলেন, ঈষৎ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন। যত গোস্বামীর দিকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তেজঃপূর্ণ অবয়ব দেখিয়া সরযূর হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল।

ক্ষণেক পর একটি বিষয় চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'প্রভু! একজন অসহায় নারী আপনার আশ্রয় যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করুন।'

গোস্বামী সরযূর দিকে চাহিলেন, ক্ষণেক স্থির ভাবে দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন।

'রমণি, আপনার উদ্দেশ্য আমি অবগত আছি, কোন যুবক যোদ্ধার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছেন!'

সরযূ অধিকতর ভক্তি সহকারে বলিলেন,—

'ভগবন্ আপনার গণনাশক্তি অসাধারণ,—যদি অনুগ্রহ করিয়া আরও কিছু বলেন তবে বাধিত হই।'

গোস্বা। ‘ জগতে সকলে তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া জানে। ’

সরযূ। ‘ প্রভুর অজ্ঞাত কিছুই নাই। প্রকৃত অবস্থা কি ?’

গোস্বা। ‘ মহরাজ শিবজী তাঁহাকে বিদ্রোহী জানিয়াই দূর করিয়া দিয়াছেন। ’

সরযূর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, আরক্ত নয়নে কহিলেন, ‘ তপস্যা প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করিব, কিন্তু রঘুনাথকে বিদ্রোহী বিশ্বাস করিব না ! গোস্বামিন্ আমি বিদায় হই। ’

গোস্বামীর নয়ন সহসা জলপূর্ণ হইল; —ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘ আরও কিছু আমার বক্তব্য আছে।,

সরযূ। ‘ নিবেদন করুন। ’

গোস্বা। ‘ মনুষ্য হৃদয় অবগত হওয়া মনুষ্যগণনার অসাধ্য, যোদ্ধার হৃদয়ে কি ছিল জানিবার এক মাত্র উপায় আছে।,

“ শাস্ত্রে লিখে প্রণয়িণীর হৃদয় প্রণয়ীর হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ ; যদি রঘুনাথের যথার্থ প্রণয়িনী কেহ থাকে, তাঁহার নিকট গমন করুন, তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে।’ গোস্বামী তীব্রদৃষ্টিতে সরযূর দিকে চাহিতে ছিলেন।

সরযূ। আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ‘ জগদীশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ করি, তুমি আমার হৃদয়ে এতক্ষণে শান্তি দান করিলে। সেই উন্নত চরিত্র যোদ্ধার প্রণয়িনী হইবার যে আশা করে, জীবন থাকিতে রঘুনাথের সত্যব্রততে তাহার স্থির বিশ্বাস বিচলিত হইবে না। হৃদয়েশ ! জগতে তোমার অন্যায় নিন্দা করুক, কিন্তু একজন দুঃখিনী বিপদে সম্পদে চিরকাল তোমার যশোগান গাইবে।’ সরযূর নয়ন যুগল এতক্ষণে জলপূর্ণ হইল, গোস্বামী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন,—তাঁহার দুই নয়ন শুষ্ক ছিলনা, তাপসের শান্ত হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল।

ক্ষণেক পর কষ্টে আত্মসংযম করিয়া গোস্বামী বলিলেন,—

‘ ভদ্রে ! আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, যে আপনিই সেই যোদ্ধার প্রকৃত প্রণয়িনী। আমি দেশে দেশে পর্য্যটন করি, সম্ভবতঃ রঘুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে ;—আপনার তাঁহাকে কিছু বক্তব্য আছে ?’

গোস্বামীর সম্মুখে রঘুনাথকে হৃদয়েশ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, স্মরণ করিয়া সরযূ ঈষৎ লজ্জিত হইলেন ; কিন্তু সে ভাব সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

‘ প্রভুর সহিত তাঁহার সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?’

গোস্বা। ‘ কল্য রজনীতে ঈশানীমন্দিরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল।’

সরযূ। ‘ রঘুনাথ আপাততঃ কি

করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, প্রভু কি অবগত আছেন ?'

গোস্বা। 'নিজ বাহুবলে নিজকার্য্য-গুণে অন্যায় অপযশ তিরোহিত করিবেন অথবা সেই চেষ্টায় প্রাণদান করিবেন।'

সরযূ। 'ধন্য বীরপ্রতিজ্ঞা! প্রভু! যদি তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়, বলিবেন, সরযূ রাজপুতবালা, জীবন অপেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান করে! বলিবেন, সরযূ যতদিন জীবিত থাকিবে রঘুনাথ কে কলঙ্ক শূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই চিন্তা করিবে, তাঁহারই যশোগীত গাইবে,। ভগবান অবশ্য রঘুনাথের যত্ন সফল করিবেন

গোস্বা। 'ভগবান তাহাই করুণ কিন্তু ভদ্রে! সত্যের সর্ব্বদা জয় হয় না,—বিশেষ রঘুনাথ যে দুরূহ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহাতে তাঁহার প্রাণসংশয় ও আছে।'

সরযূর নয়নদ্বয় সহসা জলপূর্ণ হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সদর্পে সে জল মোচন করিয়া বলিলেন,—

'রাজপুতের সেই ধর্ম্ম! আপনি তাঁহাকে জানাইবেন যদি কর্ত্তব্য সাধনে হৃদয়েশের প্রাণ বিয়োগ হয়,—তাঁহার দাসী তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে উল্লাসে নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন দিবে!'

উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; গোস্বামীর বাক্‌শক্তি ছিল না। অনেকক্ষণ পরে সরযূ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রঘুনাথ আর কিছু আপনার নিকট বলিয়াছিলেন ?'

গোস্বামী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উদ্বেগ কম্পিতস্বরে বলিলেন—"আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বিদ্রোহী বলিয়া জগৎ যাহাকে ঘৃণা করিবে আপনি কি তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন ? জগতে যাহার নাম উচ্চারণ করিবে না, আপনি কি মনে মনে তাহার নাম স্মরণ করিবেন ? জগতে কি একজনমাত্র বিদ্রোহী রঘুনাথকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানিবেন ;—ঘৃণিত, অবমানিত, দূরীকৃত রঘুনাথকে ঐ শীতল হৃদয়ে স্থান দিবেন ?' সন্যাসীর কণ্ঠরোধ হইল

সরযূ বলিলেন 'প্রভু! সে বিষয় কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? সরযূ রাজপুতবালা, অবিশ্বাসিনী নহে।'

গোস্বা। 'জগদীশ্বর! তবে আর তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট নাই, লোকে যদি মন্দ বলে তিনি জানিবেন একজন এখনও রঘুনাথকে বিশ্বাস করে!

এক্ষণে বিদায় দিন; আমি এই কথাগুলি বলিলে রঘুনাথের হৃদয়ে শান্তিসেচন হইবে!'

সজল নয়নে সরযূ বলিলেন, 'আরও বলিবেন তাঁহার উন্নত উদ্দেশ্য আমি প্রতিরোধ করিব না, অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদি পুরুষ তিনি তাঁহার সহায় হইবেন! আর যদি এই উদ্যমে তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটে,

জানিবেন, তাঁহার চিরবিশ্বাসিনী সরযূও এ অকিঞ্চিৎকর জীবন বিসর্জ্জন করিবে।'

উভয়ে পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন। সরযূ বলিলেন 'প্রভু! আমার হৃদয় শান্ত করিয়াছেন, প্রভুর নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?'

গোস্বামী চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'সীতাপতি গোস্বামী।'

রজনী জগতে গভীরতর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল! সেই অন্ধকারে একজন গোস্বামী একাকী রায়গড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতেছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রায়গড় দুর্গ।

—·—

"ধিক্ দেব ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে,
দেবত্ব, বিভব, বীর্য্য, সর্ব্ব তেয়াগিয়া,
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি?'
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর, শিবজীর তদানিন্তন রাজধানী রায়গড়ে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি সভা সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিবজীর প্রধান প্রধান সেনাপতি, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী ও দূরদর্শী বিচক্ষণ পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। পরাক্রান্ত যোদ্ধা, ধীশক্তি সম্পন্ন মন্ত্রী, শীর্ণতনু শুক্লকেশ বহুদর্শী ন্যায়শাস্ত্রী, সভাতল সুশোভিত করিয়াছেন; যুদ্ধব্যবসায়ে, বুদ্ধিসঞ্চালনে বা বিদ্যাবলে ইহারাই শিবজীর চিরসহায়তা করিয়াছেন, শিবজীর ন্যায় ইহাঁদের ও হৃদয় স্বদেশানুরাগে পূর্ণ, হিন্দুদিগের গৌরবসাধন জন্য ইহাঁরা দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে অনিদ্র হইয়া চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অদ্য সে চেষ্টা কোথায়, সেই উৎসাহ কোথায়? সভাস্থল নীরব, শিবজী নীরব, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ অদ্য মহারাষ্ট্রীয় গৌরবলক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পর শিবজী সুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

'পেসওয়াজী! আপনি তবে এই পরামর্শ দিতেছেন, সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার অধীন জায়গীরদার হইয়া থাকিব? মহারাষ্ট্রীয় গৌরবরবি চিরান্ধকারে মগ্ন হইবে?'

সুরেশ্বর। 'মনুষ্যের যাহা সাধ্য আপনি তাহা করিয়াছেন, বিধির নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করিতে পারে?'

পুনরায় সভাস্থ সকলে নীরব।

পুনরায় শিবজী বলিলেন—

'স্বর্ণদেব! যখন আপনি আমার আদেশে এই সুন্দর প্রশস্ত রায়গড় দুর্গ নির্ম্মান করিয়াছিলেন, তখন ইহা রাজার রাজধানী স্বরূপ নির্ম্মান করেন, না সামান্য জায়গীরদারের আবাসস্থান বলিয়া নির্ম্মান করেন?'

আবাজী স্বর্ণদেব ক্ষুণ্ণস্বরে উত্তর করিলেন—

'ক্ষত্রিয়রাজ! ভবানীর আদেশে এক দিন স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ভবানীর আদেশে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়াছেন, তাহাতে আক্ষেপ অবিধেয়। যখন রায়গড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম তখন কে জানিত হিন্দুসেনাপতি জয়সিংহ সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইবেন? ঈশানী স্বয়ং হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন।'

অন্নজী দত্ত কহিলেন, 'মহারাজ! পূর্ব্বেই আমরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজা জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছি, সে বিষয় অদ্য পুনরুত্থাপন করিয়া আক্ষেপ করিলে ফল কি? যাহা অনিবার্য্য তাহা হইয়াছে, অধুনা আপনার দিল্লীগমনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিবেচনা করুন।'

শিবজী কহিলেন, 'অন্নজী! আপনার কথা সত্য, কিন্তু যে আশা, যে উৎসাহ, যে চেষ্টা হৃদয়ে বহুকালাবধি স্থান পাইয়াছে, তাহা সহজে উৎপাটিত হয় না;' ক্ষণেক চিন্তার পর বলিলেন, 'ঐ যে উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী চন্দ্রালোকে দৃষ্ট হইতেছে, বাল্য-সুহৃদ্ অন্নজী মালশ্রী! ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া বা উপত্যকায় ভ্রমণ করিয়া হৃদয়ে কত স্বপ্নের আবির্ভাব হইত তাহা কি স্মরণ হয়? পুনরায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হইবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্রের ন্যায় সসাগরা ধরার অধিপতি, হিমালয় হইতে সাগর কূল পর্য্যন্ত সমগ্রদেশ শাসন করিবেন! ঈশানি! যদি এ আশা অলীক স্বপ্নমাত্র, তবে এরূপ স্বপ্নে কেন বালকের হৃদয় চঞ্চল করিয়াছিলে?'

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইল; সকলে নীরব, সভায় শব্দ মাত্র নাই,—সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরের এক প্রান্তে ঈষৎ অন্ধকার স্থান হইতে একটি গম্ভীর-স্বর শ্রুত হইল, 'ঈশানী প্রবঞ্চনা করেন না; রাজন্! তীক্ষ্ণ হস্তে অসি ধারণ করুন, অধ্যবসায় সহিত এই উন্নত পথ অনুসরণ করুন,—স্বপ্ন এখনও সফল হইবে!'

চকিত হইয়া শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, জটাজুটধারী, বিভূতি-ভূষিত-অঙ্গ, নবীন গোস্বামী সীতাপতি!

উৎসাহে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, বলিলেন, 'গোঁসাঞিজী! তুমি বাল্য-উৎসাহ আমার হৃদয়ে পুনরুদ্রেক করিতেছ,—বাল্য-কথা পুনরায় স্মরণ হইতেছে! তাত, দাদাজী কানাইদেব মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইয়া আমাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন 'বৎস! তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তদপেক্ষা মহত্তর চেষ্টা নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর, ব্রাহ্মণ গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয় কলুষিতকারীকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী

যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর।' বিংশতি বৎসর পরে অদ্যাপি দাদাজীর গম্ভীরস্বর আমার কর্ণ-কুহরে শব্দিত হইতেছে,—দাদাজী কি প্রবঞ্চনা বাক্য উচ্চারণ করিয়ায়াছিলেন?'

পুনরায় সেই গোস্বামী সেই গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—'কানাইদেব প্রবঞ্চনা বাক্য উচ্চারণ করেন নাই, উন্নত পথ অনুসরণ করিলে অবশ্যই উন্নত ফললাভ হইবে,—পথমধ্যে যদি আমরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া উদ্দেশ্য হারাইয়া নিরস্ত হই, সে কি তাত, দাদাজী কানাইদেবের প্রবঞ্চনা না আমাদের ভীরুতা?'

'ভীরুতা' শব্দ উচ্চারণ মাত্র সভাতে গোলযোগ উপস্থিত হইল, বীরদিগের কোষে অসি ঝন্‌ঝনা শব্দ করিল,—ক্রোধী চন্দ্ররাও জুমলাদার গোস্বামীর গলদেশ সজোরে ধারণ করিলেন। সীতাপতি ধীর, ভয়শূন্য,—ধীরে ধীরে আপন বজ্রহস্তে চন্দ্ররাওয়ের হস্ত ছাড়াইয়া যেন পতঙ্গবৎ সেই জুমলাদারকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বিস্মিত হইয়া সকলে বুঝিলেন গোস্বামীর চিরজীবন কেবল যাগযজ্ঞে অতিবাহিত হয় নাই!

গোস্বামী পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—

'রাজন্! ব্রাহ্মণের বাচালতা ক্ষমা করুন, যদি অন্যায় কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি ক্ষমা করুন! কিন্তু মদীয় উপদেশ সত্য কি অলীক, ক্ষত্রিয়রাজ! আপন বীর হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করুন। যিনি জায়গীরদারের পদবী হইতে রাজপদবী গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি অসিহস্তে বহু বিপদ, বহু সঙ্কট হইতে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, যিনি পর্ব্বতে, উপত্যকায়, গ্রামে, অটবীতে, বীরত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কি সে বীরত্ব বিস্মরণ হইবেন, সে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিবেন? বালসূর্য্যের ন্যায় যে হিন্দুরাজ্যের তেজ চারিদিকে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া উদয় হইতেছে,—সে সূর্য্য কি অকালে অস্ত যাইবে? রাজন্, হিন্দু-গৌরব-লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিয়াছেন, আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন? আমি ধর্ম্মব্যবসায়ী মাত্র, আমার পরামর্শ দিবার অধিকার নাই, স্বয়ং বিবেচনা করুন।'

সভাস্থ সকলে নীরব,—শিবজী নীরব, কিন্তু তাঁহার নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল!

অনেক ক্ষণ পরে শিবজী গোস্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—

'স্বামিন্! আপনার সহিত অল্পদিনই আমার পরিচয় হইয়াছে,—আপনি দেব কি মনুষ্য জানি না কিন্তু দৈববাণী হইতে আপনার কথা অধিক মিস্ট, হৃদয়ে গভীরতর অঙ্কিত হইতেছে। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি;—হিন্দু-সেনাপতির তুমুল প্রতাপ, তীক্ষ্ণ রণকৌশল, অসংখ্য

রাজপুতসেনা, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে এরূপ সৈন্য আমাদের কোথায় ?'

সীতাপতি। রাজপুতগণ বীরাগ্রগণ্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ ও দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করে না, জয়সিংহ রণপণ্ডিত, কিন্তু শিবজীও ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পরাজয় আশঙ্কা করিলেই পরাজয় হয়। পুরুষসিংহ! বিপদ তুচ্ছ করিয়া, দৈব সংহনন করিয়া, কার্য্যসাধন করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই যে আপনার যশোগান না করিবে, আকাশে এরূপ দেবতা নাই যিনি আপনার সহায়তা না করিবেন!' সভাস্থল পুনঃস্তম্ভিত।

শিবজী। 'মানিলাম, কিন্তু হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ করিয়া রুধিরস্রোতে দেশ প্লাবিত করিবে, সেকি মঙ্গল, সে পুণ্যকর্ম্ম ?'

সীতাপতি—'না—কিন্তু সে পাপে কে পাতকী ? যিনি স্বজাতির জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করেন, না যিনি মুসলমান অর্থভুক্ হইয়া স্বজাতির বৈরতাচরণ করেন, তিনি ?'

শিবজী পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন, প্রায় এক দণ্ড কাল নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিশাল হৃদয় কত ভীষণ চিন্তালহরীতে আলোড়িত হইতে ছিল, কে বলিবে ? এক দণ্ড কাল পর ধীরে২ মস্তক উঠাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

'সীতাপতি! অদ্য জানিলাম মহারাষ্ট্র দেশ এখনও বীরশূন্য হয় নাই, এখনও পরাধীন হইবে না। পুনরায় যুদ্ধ হইবে,—সে যুদ্ধের দিনে আপনা অপেক্ষা বিচক্ষণ মন্ত্রী বা সাহসী সহযোগী আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন এখনও আইসে নাই। আমি পরাজয় আশঙ্কা করিতেছি না, স্বধর্ম্মি-নাশ আশঙ্কা করিতেছি না, অন্য একটি কারণে আপাততঃ যুদ্ধে বিমুখ হইতেছি, শ্রবণ করুন।

'যে মহৎব্রত ধারণ করিয়াছি তাহা সাধনার্থ কত ষড়যন্ত্র, কত গুপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছি, আপনার নিকট অগোচর নাই। কত হত্যা করিয়াছি, কত সন্ধিবাক্য বিস্মরণ হইয়াছি, কত গর্হিত কার্য্যে শিবজীর নাম কলুষিত রহিয়াছে! দেব দেব মহাদেব জানেন আপনার লাভের জন্য এ সমস্ত করিনাই,—হিন্দু-গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হইবে, শিবজীর কেবল এই এক মাত্র উদ্দেশ্য!

'অদ্য হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বনস্বরূপ, হিন্দু প্রতাপের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ মহারাজ জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছি,—শিবজী সে সন্ধি লঙ্ঘন করিতে অপারগ! বিধর্ম্মীর সহিত কপটাচরণ করিয়াছি,—ভগবান্ সে পাপ ক্ষমা করুন,—মহানুভব রাজপুতের সহিত কপটাচরণ শিবজী জীবন থাকিতে করিবে না।

'ধর্ম্মাত্মা এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা না হয় সত্য লঙ্ঘনে হইবে!'

সেকথা অদ্যাপি আমি বিস্মৃত হইনাই, —সে কথা অদ্য বিস্মরণ হইব না।

'সীতাপতি! আরংজীব যদি আমাদের সন্ধির কথা লঙ্ঘন করেন, তখন আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব, তখন শিবজী দুর্ব্বল হস্তে খড়্গ ধরিবে না। কিন্তু জয়সিংহের সহিত এই সন্ধি লঙ্ঘন করিতে শিবজী অপারগ।'

সভাসদ্ সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর অন্নজী বলিলেন—

'মহারাজ! আর একটি কথা আছে —আপনি কি দিল্লি যাওয়া স্থির করিয়াছেন?'

শিবজী। সে বিষয়েও আমি জয়সিংহকে বাক্য দান করিয়াছি।'

অন্নজী। 'মহারাজ! আরংজীবের চতুরতা জানেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস করিবেন? তিনি আপনাকে কি মনোরথে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন না?'

শিবজী। অন্নজী! জয়সিংহ স্বয়ং বাক্য দান করিয়াছেন যে দিল্লী গমনে আমার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না।'

অন্নজী। 'কপটাচারী আরংজীব যদি আপনাকে বন্দী করেন বা হত্যা করেন, তখন জয়সিংহ কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিবেন?'

শিবজী। সন্ধি লঙ্ঘনের ফল তিনি অবশ্যই ভোগ করিবেন। দত্তজী! মহারাষ্ট্রভূমি বীরপ্রসবিনী, আরংজীব এরূপ আচরণ করিলে মহারাষ্ট্র দেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইবে সাগরের জলে তাহা নিবারিত হইবে না, আরংজীব ও সমস্ত দিল্লীর সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে! পাপের ফল নিশ্চয়ই ফলিবে!'

শিবজীকে স্থির প্রতিজ্ঞ দেখিয়া আর কেহ নিষেধ করিলেন না। ক্ষণেক পর শিবজী বলিলেন—

'আর একটি কথা আছে, পেশওয়াজী মুরেশ্বর! আবাজী স্বর্ণদেব! অন্নজী দত্ত! আপনাদিগের ন্যায় প্রকৃত বন্ধু আমার অতি বিরল,—আপনাদিগের ন্যায় কার্য্যক্ষম বিচক্ষণ পণ্ডিত মহারাষ্ট্র দেশে বিরল। আমার অবর্ত্তমানে মহারাষ্ট্র দেশ আপনারা তিন জনে শাসন করিবেন, আপনাদিগের আদেশ আমার আদেশের ন্যায় সকলে পালন করিবে, এরূপ আজ্ঞা দিয়া যাইব।'

মুরেশ্বর, স্বর্ণদেব ও অন্নজী শাসনভার গ্রহণ করিলেন। অন্নজী মালশ্রী তখন বলিলেন, 'ক্ষত্রিয় রাজ! আমার একটি আবেদন আছে। বাল্যকাল হইতে আপনার সঙ্গ ত্যাগ করি নাই, অনুমতি করুন, আপনার সহিত দিল্লী যাত্রা করি।'

সজল নয়নে শিবজী বলিলেন, মালশ্রী! তোমার নিকট আমার অদেয় কিছুই নাই,—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।'

সীতাপতি ক্ষণেক পর বলিলেন 'রাজন্! তবে আমাকে বিদায় দিন, আমার ব্রত সাধনার্থ বহুতীর্থে যাইতে হ-

হইবে। জগদীশ্বর আপনাকে নিরাপদে রাখুন।”

শিবজী। ‘নবীন গোস্বামিন! কুশলে তীর্থযাত্রা করুন! যুদ্ধের সময় আপনাকে পুনরায় স্মরণ করিব, আপনা অপেক্ষা প্রকৃত যোদ্ধা আমি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। আপনার মত অল্প বয়সেই এরূপ তেজঃ, সাহস ও বীরত্ব আমি আর কাহারও দেখি নাই।”

পরে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অপরিস্ফুটস্বরে বলিলেন—‘কেবল আর এক জনকে জানিতাম!’

সভা ভঙ্গ হইল। শিবজী শয়নাগারে যাইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, নবীন গোস্বামীর উৎসাহবাক্য বার বার মনে উদ্রেক হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর নিদ্রিত হইলেন, নিদ্রায়ও যেন সেই উৎসাহবাক্য শুনিতে লাগিলেন, সেই বীরভঙ্গী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বপ্নে সকল ঠিক দেখা যায় না, অবস্থা ও রূপের পরিবর্ত্তন হয়। শিবজী স্বপ্নে সেই উত্তেজনা বাক্য শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু বক্তা যেন সে নবীন গোস্বামী নহে, বক্তা রঘুনাথজী হাবেলদার!



আর্য্যায়ুর্ব্বেদ

অভাব ও প্রয়োজনীয়তাই যাবতীয় বিজ্ঞান ও আবিষ্ক্রিয়ার জনক জননী। অন্যথা নদীমাতৃক মিসর দেশে জ্যামিতির বহুল প্রচার ও কৃপণ-প্রকৃতি শীতকটীবন্ধে কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পযন্ত্রাদির আদি উদ্ভাবন দৃষ্ট হইত না। জগতে যখনই যে জাতি পরিতস্থ অপরাপর জাতি অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে, তখনই সেই জাতি, দেশ কাল ও জলবায়ুর ক্রিয়াভেদে, স্বীয় বিশেষ বিশেষ অভাব মোচনার্থ নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া, অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির শিক্ষক হইয়াছে। উপরে যে শাস্ত্রের নামাঙ্কিত হইল,তাহা যে কোন জাতি বিশেষের প্রয়োজনীয় মাত্র এমত নহে; উহা শরীরিমাত্রের সাধারণ প্রয়োজনভূত। প্রাচীনকালেও, যে সকল জাতি অতীব অসভ্যাবস্থায় ছিল, তাহাদেরও তৎকালে এইশাস্ত্র কিয়ৎপরিমাণে বিদিত ছিল। যাহার শরীর আছে, তিনিই ইঁহার জন্য কখনও না কখন ব্যাকুল হইয়াছেন। আয়ুর্ব্বিদ্যা ও তৎক্রিয়াধিকরণভূত মানবশরীর এইরূপ অখণ্ড্য নিয়মে সংবদ্ধ যে, একের অস্তিত্ব অপরের পরিচায়ক। কিন্তু তাদৃশ আবহমান অকিঞ্চিৎকর অসংবদ্ধ ভেষজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

ইতিহাসালোকবর্ত্তী হস্তে করিয়া কালের অন্ধকার পথে যে পর্য্যন্ত গমন করা

যায়, তন্মধ্যে ভারতের বেদ ও পরস্থানোদীচ্য প্রদেশের নিমরদই প্রাচীনতম। এতদপেক্ষা দূরগতকালে কি ছিল, ভাষা তাহার কিছু পরিচয় দেয় না। আমরা আদৌ প্রাচীনতম ঋগ্বেদের কয়েকটি প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া দেখাইব যে পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি আর্য্যগণ তখনই প্রায় শাস্ত্রনামোচিত আয়ুর্ব্বিজ্ঞান উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

উপাসনাবৃত্তি যেমন মনুষ্যের প্রকৃতিগত, মনুষ্য ইহা একেবারে ছাড়িতে পারে নাই, বোধ হয় পারিবেও না, রোগোৎপত্তিও তদ্রূপ মানবপ্রকৃতির আদিবিকারজনিত; এজন্যই বেদকবি বলিয়াছেন, বেদ নিত্য ও আদিপুরুষ ব্রহ্মার কীর্ত্তিত। আবার তাদৃশ হেতু নিবন্ধনই আর্য্যগণ ব্রহ্মাকেই আয়ুর্ব্বেদের আদিবক্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন।

পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ প্রথিত আছে যে, সত্যযুগে লোকসকল নীরোগী ছিল। ত্রেতার প্রারম্ভে ও সত্যের শেষভাগে রোগ সঞ্জাত হয়। অনেক নব্যশিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী, হয়ত, প্রোক্ত পৌরাণিক বাক্য শুদ্ধ কল্পনাসম্ভূত ও একেবারে অন্তঃসারশূন্য বলিয়া উপহাস করিবেন; কিন্তু একটুকু প্রীতির সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে, তিনি নিশ্চয়ই উহার সারবত্তা অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা ভ্রমেও একথা বলিব না যে, সেইকালে সমস্ত মনুষ্য একেবারে সুস্থ ছিল; কদাপি কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গজনিত ক্লেশ পাইতে হয় নাই; বরং ইহাই দেখাইব যে অতীব প্রাচীন ভারতসমাজেও রোগ শোক বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু, কথা এই যে, সত্যে নিরাময়ত্ব সম্বন্ধে পৌরাণিক বাক্য একেবারে তাৎপর্য্যবিহীন নহে। যখন মানবসমাজ শিশু, যখন পল্লীগ্রামে প্রতি বর্গক্রোশে দ্বিসহস্র লোকও থাকে নাই; যখন মানবজাতি প্রাচীনা বলিয়া জগতে পরিচিত হয় নাই; বাল্যবিবাহ, মদ্যপান ও অপরাপর সভ্যতাসূচক বিলাসসামগ্রী যখন ভারতক্ষেত্রে দুর্ব্বলতার বীজ বপন করে নাই, যখন ঢাকার অতি সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র বিনিময়ে দৃঢ়তর বল্কল, বাসুশোভন ছত্রবিনিময়ে বৃক্ষচ্ছায়া সেবন করিয়া আর্য্যঋষি ক্লান্ত হয়েন নাই, সেই সময়ে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দির বহুবিধ রোগের অস্তিত্ব ছিল না, অতি সাধারণ রকমের কোন কোন পীড়া ব্যতীত প্রায়ই রোগ প্রাচুর্য্য ছিল না। এস্থলে ‘নিরোগী’ এই পদটি রোগহীনত্বসূচক নহে; নঞের অল্পত্ব অর্থই এস্থলে প্রয়োজ্য।

মানব সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে অনেক সুখ ও আসিয়াছে, অনেক দুঃখ ও আসিয়াছে। যে দেশ যত জনাকীর্ণ হইয়াছে, সাধারণতঃ সেই দেশই তত পীড়ার জ্বালায় জ্বলিয়াছে।

ঋগ্বেদের পূর্ব্বে ও তৎসম কালে যে অল্পে২ আয়ুর্বেদ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে-

ছিল বেদের বহুবিধ প্রার্থনা তাহার পরিচয় দিতেছে। এই কালে আয়ুর্বেদ একটি শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল এমত বোধ হয় না। যাহা হউক ইহাই আয়ুর্বেদের ভিত্তি ভূমি। আমরা এই কালকে বেদায়ুর্বেদ বা দেবায়ুর্বেদ নামে অভিহিত করিলাম। এই কালের আদি গুরু ব্রহ্মা শেষ গুরু ইন্দ্র। ইন্দ্র হইতে ভরদ্বাজ ও ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদ লাভ করেন; ইহাঁরাই দ্বিতীয় কালের প্রবর্ত্তক; ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য প্রধানতঃ চিকিৎসক ছিলেন বলিয়া, ইহার নাম ব্রাহ্মণ বৈদ্যায়ুর্বেদ বা মিশ্রায়ুর্বেদ। মিশ্রায়ুর্বেদই কাল ক্রমে বৈদ্যায়ুর্বেদ রূপে পরিণত হয়। শেষ কাল বা সর্ব্বায়ুর্বেদ মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়; এবং আজ পর্য্যন্ত উন্নতি বা অবনতির সোপানে বিচরণ করিতেছে।

আমরা পরবর্ত্তি কয়েক পৃষ্ঠায় এই চারিটি বিভাগের যথা প্রাপ্ত বিবরণ প্রকটিত করিব। সত্য বটে স্থানে২ বর্ত্তমান কালের বিশ্বাসাতীত দুই একটি প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইবেক; কিন্তু কি করিব, ভারতের কোন ও ঐতিহাসিক বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করিতে গেলে জানিয়া শুনিয়া ও এই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। পাঠক এতাদৃশ স্থলে, অভিপ্রায় গ্রহণ করিবেন, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া ইহার প্রতি অক্ষর গ্রহণ করিতে যাইয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

দেবায়ুর্বেদ।
বা
বেদায়ুর্বেদ।

ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত আয়ুর্বেদবিৎ পণ্ডিত ব্রহ্মাকে আয়ুর্বেদের আদি গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এরূপ বিবৃত আছে যে তিনি লক্ষ শ্লোকে সমস্ত আয়ুর্বেদ প্রণয়ণ করেন, ও সহস্র অধ্যায়ে বিভাগ করিয়া ইহাকে অথর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ রূপে নিবেশিত করেন। কালান্তরে, যখন মানব গণ অল্পায়ুষ্ক ও অল্প মেধস্ক নিবন্ধন, তদধ্যয়নে অক্ষম হইয়া উঠিল, পরদুঃখকাতর পিতামহ অমনি অতি সংক্ষেপে সমস্ত আয়ুর্বেদতত্ত্ব আট ভাগে প্রণয়ন করে *। ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষ হইতে আশ্বিন দ্বয়, আশ্বিন্ হ-

* ইহ খল্বায়ুর্বেদো নাম যদুপাঙ্গ মথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোক শত সহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভূঃ। ততোঽল্পায়ুষ্টমল্পমেধস্তঞ্চাবলোক্য নরাণাং ভূয়োষ্টধা প্রণীতবান্। সুশ্রুত ১অ সূত্রস্থান।

ব্রহ্মা প্রোবাচ ততঃ প্রজাপতিরধিজগে। তস্মাদশ্বিনাবশ্বিভ্যামিন্দ্রঃ ইন্দ্রাদহং, ময়াত্বিহপ্রদেয়মর্থিভ্যঃ প্রজাহিতহেতোঃ। ব্রহ্মণাহি যদা প্রোক্তমায়ুর্ব্বেদং প্রজাপতিঃ জগ্রাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌতু পুনস্ততঃ অশ্বিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদেহ কেবলম্। চরকসংহিতায়াং।

ইতে ইন্দ্র আয়ুর্বেদ লাভ করেন। আশ্বিন দিগের অপর নাম সনত্কুমার। প্রথিত আছে ইহারাই স্বর্গবৈদ্য ছিলেন। ধন্বন্তরি ও ভরদ্বাজ ইন্দ্র হইতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে শারীর বিজ্ঞানের আদি প্রচারক হয়েন। আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে পাঁচ জন গুরু পরম্পরা পর্য্যন্ত, স্বর্গে আয়ুর্বেদ প্রচারিত থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে দৃষ্ট হইবে যে ঋগ্বেদ কালে ইঁহারাই বৈদ্য বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। সুতরাং স্বর্গায়ুর্বেদ কালকে বৈদিক কাল বলাতে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, দীর্ঘ বৈদিক কালে যে সকল ভেষজতত্ত্ব বেদকবিদের বহু গবেষণাতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাই অল্পেং ধন্বন্তরি ও ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক এক অত্যুৎকৃষ্ট শাস্ত্র রূপে পরিণত হয়। বেদকবি মেধাতিথি বলিয়াছেন " জলেতেই অমৃত, জলেতেই সমস্ত রোগনাশক ওষধি বর্ত্তমান।" * " হে সোম তুমিই আমাদের প্রশংসার পাত্র, তুমিই ওষধি তরুর প্রভু।" এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে জলের অসাধারণ রোগনিবারিণী শক্তি অতি প্রাচীন কালেই ভারত সমাজে বিদিত ছিল।

পুনশ্চ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্তোত্রে সোমকন্দের নিকট রোগদৃঢ়করণার্থ প্রার্থনা বিদ্যমান দেখা যায়। সোমকন্দ যে শুদ্ধ বলকর ও মাদক এমত নহে. ইহা যে বহুবিধ জরাজীর্ণাপহারক তাহাও সেই পুরাকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, এই প্রার্থনা সোমদেবের নিকট, কারণ পরবর্ত্তিস্তোত্রেই ' হে সোম তুমি অন্যতরুর সহিত বহু আবর্ত্তনে পরিবর্দ্ধিত হও ' এরূপ বাক্যে সোমপদ কদাপি চন্দ্র নামান্তর নহে। সোমকে আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থানক্রিয়াদিভেদে চতুর্বিংশতিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন *। তাঁহারাও ইহার অসাধারণ জরাপহারিণী শক্তি দেখিয়া ইহাকে ওষধিপতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন †। পুনরপি ২০শ সূক্তে " সোম আমাকে বলিয়াছেন যে জলেতেই সমস্ত ওষধি * * * *। হে জল তুমি আমাদের শরীরের নিমিত্ত রোগ নিবারক ভেষজ সৃষ্টিকর। ২১ সূক্ত। ‡ এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে তৎকালে অধিকাংশ ভেষজই জলজ ছিল; জল যে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত

অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সুভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে। ঋগ্বেদসংহিতায়াং।

* এক এব ভগবান্ সোমঃস্থানক্রিয়াভেদেন চতুর্বিংশতিধাভিদ্যতে যথা অংশুমান্ ভুঞ্জবাংশ্চৈব চন্দ্রমা রজতপ্রভঃ। **

† ঔষধীনাং পতিং সোমমুপভুজ্য বিচক্ষণঃ। সুশ্রুত

দশবর্ষ সহস্রাণিনবান্ ধরিয়তি তনুম্॥ ঐ

‡ অপমুমে সোমোঽব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজাঃ। অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবমাপশ্চ বিশ্ব ভেষজীঃ। আপপৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বেমম। * * *

হইত তাহারও সন্দেহই নাই। এস্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বেদ কবিগণ সোমলতার অধিষ্ঠানভূত দেবের ও কল্পনা করিয়াছেন ; কারণ অনেক সূক্তে সোমদেবের প্রার্থনা ও বিদ্যমান আছে * আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ অশ্বিন্ রুদ্রাদির ন্যায় সোমকে কদাপি চিকিৎসক বলিয়া বর্ণন করেন নাই ; শুদ্ধ ওষধিপতি বলিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। ঋকে স্থানে স্থানে স্বাস্থ্য ও বললাভের নিমিত্ত রুদ্রদেবের প্রার্থনা বর্ত্তমান দেখা যায় : পরবর্ত্তিগ্রন্থাদিতে " স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতম্ " বলিয়া অনেক তৈলবটিকার প্রশংসাধ্বনিও বিদ্যমান্ আছে। অন্যতর বেদ কবি গৃৎসমদ বলিয়াছেন ' হে রুদ্র ! ত্বৎপ্রদত্ত স্বাস্থ্যরক্ষক ঔষধি দ্বারা যেন আমরা শত শত শীত বাঁচিয়া থাকি। ওষধিতক দ্বারা তুমি আমাদের সন্তানগণকে বলান্বিত কর। কারণ শুনিতে পাই তুমিই চিকিৎসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ '। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে আত্রের ধন্বন্তরি, সুশ্রুত এমন কি বাভটগুপ্ত পর্য্যন্ত ইহাঁকে অশ্বিন্ ইন্দ্রাদির ন্যায় বৈদ্যশ্রেণীভুক্ত করেন নাই। কিন্তু রসেন্দ্র সারসংগ্রহাদি অনেক আধুনিক গ্রন্থে ইহার ভূরি ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ অনুমিত হয় যে তন্ত্রকারগণ পূর্ব্বাচার্য্যদের এই ভ্রমানুসন্ধান পাইয়া বেদোল্লিখিত রুদ্রদেবকে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী ও মহাদেবকে পরম বৈদ্য বলিয়া আপনাদিগের আরাধ্যদেবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভূপতিগণ যে অতি প্রাচীন কাল হইতে এতদ্ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইতেন ঋকেই তাহার আভাস্ পাওয়া যায় * বাস্তব, যে প্রণালীতে ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পদপল্লব ফল পুষ্পাদিতে সুশোভিত হইয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, তাহার মূল সূত্র—আধার উর্ব্বরতা বিধায়ক সার বীজাদি ঋকের সময়েই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বাভিপ্সিত গণনানুসারে ঋকের কাল খৃঃ জন্মের পূর্ব্ব ২০০০ বৎসরের অনূন বলেন। সুতরাং যে আয়ুর্বেদের দুই একটি গলিত পত্র আজও প্রাপ্ত হইতেছি, অন্ততঃ ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে তাহার বীজ বপন সম্পন্ন হইয়াছিল। রোগ মাত্র সাধারণতঃ জলের উপাদেয়তা, বহুবিধ জলজ পদার্থের রোগাপহারিনী শক্তি, উর্দ্ধজত্রুগত রোগচিকিৎসা, বিশেষতঃ চক্ষুরোগাপনয়ন, ও রাজার আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে তত্ত্বাবধানের আবশ্য-

* মানঃ শংসো অররুষো ধূর্ত্তিঃ প্রণঙ্মর্ত্তস্য রক্ষাণো ব্রহ্মণস্পতে। সধাবীরো ন বিষ্যাতি যমিন্দ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ সোমো হিনোতি মর্ত্যংয়ো রেবান্যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ মনঃসিবক্তু যন্তুরঃ। ঋগ্বেদ সংহিতায়াং।

* শতন্তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্ব্বী গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু * * * ষষ্টোনুবাকঃ।

কতা, সেই পুরাকালেই আর্য্যমনস্বিদের নির্ম্মল জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। তখন জাতিভেদও হয় নাই, ব্যবসায় ভেদও হয় নাই। একই ব্যক্তির সন্তান স্ব স্ব রুচি অনুসারে উপজীবিকার উপায় অবলম্বন করিতেন। জনৈক বেদ কবি এই বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, 'আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা তণ্ডুল প্রস্তুতকারিণী এবং আমি কবি।' ভারতে ব্রাহ্মণ সন্তান কেবল যাজনাধ্যায়নাদি ব্যতীত ব্যবসায়ন্তর অবলম্বন করিতে পারিবেন না, তৎকালে এমন কোনও সামাজিক অনুশাসন ছিলনা। কে কি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিল, সমাজ তদনুসন্ধানে কাহাকে প্রশংসা বা নিন্দা করিবার জন্য আকুলিত হইত না।

ব্রাহ্মণ বৈদ্যায়ুর্ব্বেদ

বা

মিশ্রায়ুর্ব্বেদ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সত্যের শেষভাগে ত্রেতার প্রারম্ভে রোগোৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে সত্যের অনাময়ত্ব, রোগহীনত্ব বোধক নহে, রোগের বিরলত্ব ব্যঞ্জক; এস্থলেও রোগোৎপত্তি রোগবাহুল্য বোধক জ্ঞান করিতে হইবেক। এই সময়েই ভগবান্ ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করেন। ধন্বন্তরির জন্ম বিবরণ পৌরাণিক কল্পনা মিশ্রিত হইলেও উহার কাল্পনিকাংশে কবি প্রতিভা (Poetical genius) ও সমুদায়ে ঐতিহাসিক সারবত্তা বিলক্ষণ বিদ্যমান আছে। আর্য্যভূমিতে ধন্বন্তরিই আদি বৈদ্য।

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে যে কালে সমস্তগ্রাম, নগর, উপনগর, নানাবিধ মহামারিতে ব্যতিব্যস্ত, নিরুপায় আতুর অসহ্য ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে মুক্তহইবার কোনও পন্থা না দেখিয়া একেবারে হতাশ, সেই সময়েই অতি কুশল করুণাপরায়ণ বৈদ্যলাভ, সমস্ত প্রাণীর ভয়ানক পীড়া নিবারণের অমোঘপ্রায় উপায় লাভ, ভারতক্ষেত্রের ধর্ম্মশীল মনুষ্য হৃদয়ে দয়ারনিধান মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিশেষ করুণা বলিয়া প্রতীত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। ভারতবাসী এই জন্যই ধন্বন্তরিকে অযোনিসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন। ধন্বন্তরির অমানুষী প্রতিভাই তাঁহাকে নারায়ণরূপী বলিয়া ভারতের পূজোপহার প্রদান করিয়াছিল। একই ব্যক্তির দ্বারা এক সময়ে বহুস্থানব্যাপক মারী নিবারণ অসম্ভব; সুতরাং বাধ্য হইয়াই শীঘ্র শীঘ্র অনেক আর্য্যঋষি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তদ্ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বহু লোকের বিপদ্‌শান্তি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ক্ষত্রিয় দ্বিজ মাত্রই আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন; কিন্তু কালান্বয়ে ধন্বন্তরির সন্তান পরম্পরা বংশবাহুল্য হওয়াতে ও ব্যবহারজীবিদের অনুশাসন ভয়ে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি তদ্ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। যাহা হউক এই সময়ের প্রথমভাগ ব্রাহ্ম-

ণাদি দ্বিজগণ ও পরভাগে বৈদ্যগণ তদ্ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া ইহাকে মিশ্রকাল নামে অভিহিত করা গেল।

ধন্বন্তরি অমৃতাচার্য্য।

স্কন্দ, গারুর ও মার্কণ্ডেয় পুরাণানুসারে ভগবান্ ধন্বন্তরি ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে সমুদ্ভূত হয়েন। এইরূপ প্রথিত আছে যে, একদা মহর্ষি গালব * সমিৎকুশাহরণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বনোপান্তে উপস্থিত হইলেন। অধ্বশ্রান্ত মুনি তৃষ্ণাতুর হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, বনবহির্ভাগে একটি কন্যা জলপূর্ণকুম্ভ কক্ষে করিয়া গৃহে যাইতেছে। মুনিবর তদ্দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন হে কন্যে! আমি নিতান্ত তৃষ্ণাতুর, জলদান করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। ব্রাহ্মণভক্তিপরায়ণা জলকুম্ভ প্রদান করিলে মহর্ষি গালব স্নান করিয়া যথেষ্ট

* যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধন্বন্তরির্মহাভাগ অমরেশঃ কথং পুরা।
অভবচ্ছর্ব্বতো বিজ্ঞস্তন্মে বদ মহামুনে॥
　মৈত্রেয় উবাচ।
ভোরাজেন্দ্র যথা জাতো ধন্বন্তরিরিহৈবতু।
মহর্ষির্গালবো নাম কাষ্ঠদর্ভাহরোবনম্॥
জগাম তত্রভ্রমণাদতিশ্রান্তোবভূব সঃ।
ততোনিরীক্ষয়ামাস তৃষ্ণাতুর কলেবরঃ॥
বনস্যচ বহির্ভাগে কন্যামেকাং দদর্শ সঃ।
জলপূর্ণ ঘটং নীত্বা গচ্ছন্তীং পিতৃমন্দিরং॥
তাংদৃষ্টাহৃষ্টচিত্তোঽসৌ বভাসে মুনিপুঙ্গবঃ।
হে কন্যে ত্বংজলং দেহি প্রাণরক্ষাং কুরুষ্মে।
ততঃসা কলশং ভূমৌ নিধায়াতিষ্ঠদুত্তমা।
গালবশ্চার্দ্ধতোয়েন স্নাত্বা তোয়ং পপৌচতৎ।
প্রোবাচ চাপি হে কন্যে ত্বং সৎপুত্রবতীভব॥
ততঃপ্রোক্তবতী কন্যা ন মে পাণিগ্রহোঽভবৎ।
ততোমুনিবরশ্চাহ কাত্বং কিংনাম তে বদ।
উবাচ পুনরন্যেষা বৈশ্যাকন্যাহ্যহং বিভো।
বীরভদ্রাভিধানাচ জানীহি মুনিপুঙ্গবঃ॥
ততো বিচিন্ত্য স মুনি স্তামাদায় জগামহ।
ঋষীণামগ্রতো নীত্বা বৃত্তান্ত মবদত্তদা
আকর্ণ তে মহারাজ উচুর্হর্ষিত মানসঃ
তদ্রং কৃতং মনে নূনমানীতেয়ং যতস্তুয়া।
বৈশ্যায়াং বীরভদ্রায়াং ধন্বন্তরির্ভবিষ্যতি
ইত্যুক্ত্বা তেঽপি মনুয়ঃ কুসপুত্তলিকাং ততঃ
কৃত্বা ক্রোড়ে দদুস্তস্যা বেদমুচ্চার্য্যতৎকুশে
প্রাণপ্রতিষ্ঠামপ্যস্যাচক্রুঃ পুরুষকারুতিম্।
ততোঽভবৎ কাঞ্চনরাশি গৌরং
বালোতি সৌম্যাকৃতিরেব তস্যাঃ
ক্রোড়ে বিলোক্যৈব সুতং মুনীন্দ্রাঃ
প্রাপুর্মুদং বেদতঃ এব জাতঃ।
বৈদ্য স্ততোঽয়ং জননী কুলেচ
স্থিত স্ততোঽম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ
এবমুক্ত্বা ততঃসর্ব্বেমুনয়ো দেবরূপিণঃ
অমৃতাচার্য্যমস্যাখ্যাং চক্রু বৈশ্যাভিধানকম্॥
*　　*　　*　　অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকোদ্ধৃত পুরাণ বচনানি।

জল পান করিলেন। এবং অতি পরিতোষ লাভ করিয়া বলিলেন হে কন্যে আমার পরিতোষ হেতু তোমার সৎপুত্র লাভ হউক। কন্যা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্ আমার যে বিবাহ হয় নাই। গালব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বৈশ্যকন্যা বলিলেন, আমার নাম বীরভদ্রা, আমি বৈশ্যকন্যা। ঋষিবর তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া মুনিসমাজে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, সকলে হর্ষিত হইয়া বলিলেন, মুনিবর, আপনি বড় মঙ্গল করিয়াছেন এই বীরভদ্রার গর্ভে ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করিবেন এই বলিয়া সকলে কুশপুত্তলিকা নির্ম্মাণকরতঃ বীরভদ্রার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন ও বেদমন্ত্র জপ করিয়া ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অমনি অতি সৌম্যাকৃতি কাঞ্চনরাশি গৌর বীরবালক বীরভদ্রার ক্রোড়দেশ আলোকিত করিল। মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে বেদ হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম বৈদ্য রাখিলেন, এবং জননীক্রোড়ে স্থিত বলিয়া ইনি অম্বষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

সহৃদয় সদ্বিবেচক পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে অম্বষ্ঠ বংশ প্রবর্ত্তক ভগবান্ ধন্বন্তরির জন্মবিবরণ কেন পুরাণ কবি এবম্বিধ অলৌকিক উপান্যাস ও অলঙ্কারমিশ্রিত করিয়া বিবৃত করিয়াছেন। যিনি অসাধারণ অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন, সকলেই তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় অলৌকিক বলিয়া মনে করে। পুরাণ কবি এজন্যই ধন্বন্তরিকে অযোনিসম্ভব ও নারায়ণাংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন *। যাহা হউক এবম্বিধ পুরাণ ইতিহাস হইতে সার গ্রহণ করিলে সংক্ষেপতঃ এই মাত্র জানা যায় যে তৃষ্ণাতুর মহর্ষি গালবের পিপাসা শান্তি করিয়া সুশীলা বৈশ্যকন্যা গালব দত্ত পুত্রলাভরূপ বর প্রাপ্ত হয়েন †। কিন্তু স্বয়ং অবিবাহিত এবং মহর্ষি বাক্যও মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং সমাজ কলঙ্ক অবশ্যম্ভাবী ; ইত্যাকার চিন্তা করিয়া সবিনয়ে সমস্ত মনঃশঙ্কা গালবকে নিবেদন করিলেন। গালব অপরাপর মহর্ষিদিগের পরামর্শানুসারে বীর ভদ্রাকে বিবাহ করিলেন। বলা বাহুল্য যে তৎকালে ব্রাহ্মণাদির অন্তরজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ শাস্ত্র সঙ্গত ছিল। ধন্বন্তরি এই বীর ভদ্রার গর্ভে ও গালব ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহর্ষিগণ একত্র হইয়া ইঁহাকে আয়ুর্বেদ ব্যবসায় দান করেন। মহৌজা অমৃতাচার্য্য এইরূপ ইন্দ্র হইতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া বৈদ্য বংশের মূল সংস্থাপক হয়েন।

* ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যোনারায়ণঃস্বয়ম্।

† পাঠক মনে রাখিবেন যে সেইকালে কন্যাগণ সর্ব্বদাই অল্প বয়সে বিবাহিত হইতেন না।

বয়ঃসন্ধি।



So our lines glide on: the river ends we don't know where, and the sea begins, and then there is nomore jumping ashore. George Eliot.

একাকী বসিয়া সান্ধ্যগগণের মধুর শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। সুবর্ণ রঞ্জিত সহস্র মেঘখণ্ড আকাশে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ছিল। নীলাকাশে দুগ্ধফেণ শুভ্র বলাকাপংক্তি কালিন্দীর নির্ব্বাত বক্ষে শ্বেতকুসুমদামবৎ ভাসিয়া যাইতেছিল। মৃদু পবনসঞ্চারে মেঘখণ্ড বিশেষ ঈষৎ অপসারিত হইল। পাঠক, স্বর্ণ-সীঁথি বিভূষিত কোন প্রিয় শ্যামাঙ্গীর মুখ-কান্তি অতৃপ্ত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছ? নিটোল ললাট প্রদেশে, যেখানে উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি শ্যাম মাধুরীতে মিশিয়া যায়, সেই স্থানের সেই শোভা কি কখনও দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবে আমি সেই আসন্ন প্রদোষ সময়ে গঙ্গা পুলীনে বসিয়া মেঘপ্রান্তে নীলাকাশের যে প্রশস্ত শোভা দেখিতেছিলাম তাহার আভাস পাইবে।

আরও তো অনেকবার সান্ধ্যাকাশের এই পরম রমণীয় শোভা দর্শন করিয়াছি; তবে আজি এ বিহ্বলতা কেন? চিত্তের এ মৃদু চাঞ্চল্য, চক্ষুর এ অপূর্ব্ব রাগব্যক্তি কেন? বহুদিন গত হইল আর একবার এই শোভার নবীনত্বে মোহিত হইয়াছিলাম। সে দিবস আমার জীবনে এক চিরস্মরণীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। গভীর নিশিথে তমসাবৃত কক্ষের গবাক্ষ উন্মুক্ত করিলে যেমন স্ফুরৎচন্দ্রিকারাশি অকস্মাৎ কক্ষ আলোকিত করে;—অদূরবিকশিত কুসুমসৌরভবাহী মৃদুবায়ুস্রোত কক্ষ আমোদিত করে; সে দিবস আমার হৃদয়ের নিগূঢ় প্রদেশে সেইরূপ শারদচন্দ্রমাস্নিগ্ধ, ফুল্ল-কুসুম-সুরভিত, অব্যক্তপ্রকৃতি এক নূতন ভাবের সঞ্চার হয়। সে দিবস আমি কৈশোরসীমা অতিক্রম করিয়া, যৌবরাজ্যে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছিলাম; সে দিবস আমার জীবনে নির্ঝরনদীসঙ্গমবৎ অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হয়। নীলাকাশে বিদ্যুৎরেখাবৎ আজি তাহার মধুর স্মৃতি ক্ষণকালের জন্য হৃদয় আলোকিত করিয়াছে।

এখন আমি কৈশোরসীমা অতিক্রম করিয়া যৌবরাজ্যের অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। আমার জীবনের এক অঙ্ক

অভিনীত হইয়াছে, দ্বিতীয় অঙ্ক এখনও শেষ হয় নাই। উচ্ছৃঙ্খলবৃত্তি ভাবরাগ লইয়া এখনও রঙ্গভূমিতে বিচরণ করিতেছি। সাধু প্রকৃতির মৃদুশাসনে সুকার্য্য করিয়া কখনও নরজীবনে দৈবসুষমা প্রদর্শন করিতেছি; এবং গভীর রজনীতে হৃদয়ের নিগুঢ়প্রদেশে আত্মপ্রসাদের বিমলজ্যোতি অনুভব করিয়া একাকী আমোদোৎসব করিতেছি; কখনও বা কূট প্রকৃতির দুর্ব্বার প্ররোচনায় দ্রুত পরিচালিত হইয়া মানবচরিত্রে নরকসুলভ কলঙ্কক্ষেপ করিতেছি, এবং অনুতাপের মুর্ম্মুরদাহে বিদগ্ধ হইতেছি, এই ভাবে জীবন যাইতেছে। কিন্তু হৃদয় আজি কিছু বিচলিত হইয়াছে; ভূতকালের এক মধুর দৃশ্য আজি অকস্মাৎ উহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

কোটি কোটি লোকেরতো কিশোর বয়স চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেহ কি বিরলে নীরবে মনোসংযোগে একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, কোন্ অলক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া যৌবনভাব তোমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে? তোমার অজ্ঞাতসারে কোন্ সময়ে তোমার হৃদয় কুট্মলভাব পরিহার করিয়া যৌবন কুসুমের নববিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে? আজি তোমার হৃদয় যৌবনগর্ব্বোচ্ছাসিত ভাদ্র গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গে বিহ্বল; কিন্তু তুমি কি বলিতে পার, কোন্ সময়ে নবপ্রাবৃটের প্রথম ধারা তোমার চিত্তভূমি সিঞ্চিত করিয়া প্রথমে ক্ষীণ প্রবাহিত হইয়াছিল? অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, তাই বলিয়া কি জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা স্বরূপ এই সরিৎসাগরসঙ্গম কখন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করিবে না?

মানব জীবনে বয়ঃসন্ধি নিরূপিত করিবার কি কোন নির্দ্দিষ্ট রেখা আছে? এমন কি কোন নির্দ্দিষ্ট কাল, চিহ্ন কিম্বা কার্য্য আছে যে, যাহা লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক জীবনের এই অভূতপুর্ব্ব, অপুনঃসম্ভাবী সন্ধিস্থল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? বয়োধিক্যতা প্রকৃত যৌবনের পরিচায়ক নহে; তুমি বিংশতিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছ বলিয়াই যে তুমি যৌবরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ এমত নহে। সংসারে নির্জ্জীব, ক্ষীণায়তন, এবং আজন্মরোগক্লিষ্ট কত লোক আছে, কিন্তু কেহই তাহাদিগকে যৌবনশালী বলিয়া উপহাস করিবে না। শরীরপুষ্টি যৌবনসূচক নহে। কেহবা পঞ্চবিংশবর্ষ বয়সে নৈসর্গিক কারণে পঞ্চদশবর্ষীর বালকের ন্যায় ক্ষীণাঙ্গ; কেহবা পঞ্চদশবর্ষ বয়সেই সর্ব্বপ্রকার শারীরিক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। তবে কি বিদ্যা এবং বুদ্ধিকেই যৌবনের আনেতা বলিব? তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। একবিংশতি বর্ষে কেহ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইতেছেন; কেহবা আবার্দ্ধক্য নিবিষ্টমনে জীবন উৎসর্গ করিয়াও অভিলষিত সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না। তখন কি বলিব যে

পশ্চাদুক্ত হতভাগ্য আমরণ যৌবরাজ্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই? কেহ কেহ বলিবেন যে, জীবনে ধর্ম্মভাবের গভীরতা লাভই যৌবনপ্রাপ্তিসূচক, এ নির্দ্দেশও নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। তাহা হইলে ধ্রুব এবং প্রহ্লাদ অপগণ্ড বয়সেই প্রাপ্ত যৌবন হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। আর উদ্গত শ্মশ্রু, উদ্ধতবিক্রম রত্নাকরকে বালক বলিতে হয়! তবে দেখা যাইতেছে যে, বয়স, বিদ্যা, বুদ্ধি কিংবা ধর্ম্মভাব প্রভৃতি মানবজীবনে যৌবনভাব আনয়ন করে না।

তবে সর্ব্বজন স্পৃহণীয় এই কমনীয় সময়ের আনেতা কে? কোন্ ঘটনা, কোন্ চিহ্ন অবলম্বন করিয়া আমরা এই মধুর রসসঞ্চার গণনা করিব।

আমি নরনারীর জীবনে যৌবনভাব সঞ্চারের এক মাত্র কারণ ও সময় অবধারণ করিয়াছি; তাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক। স্ত্রী কিংবা পুরুষ বিশেষের প্রতি অকপট দৃষ্টিতে হঠাৎ যখন একের হৃদয়ে অন্যতরের প্রতি কোন অভূতপূর্ব্ব, অজ্ঞাত প্রকৃতি নবভাবের সঞ্চার হয়, তখন হইতেই যৌবন প্রারম্ভ গণনা করিতে হইবে। সে ভাব, না প্রীতি সম্ভূত, না প্রেম প্রণোদিত; তাহা স্নেহ হইতে স্বতঃনির্গত নহে, কিম্বা ভক্তিপ্রসূত অথবা ভীতিদীপ্ত নহে, অথচ তাহাতে পরস্পর গাঢ় সংশ্লিষ্ট এই সকল বৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। ভাবুক সেই নবোদিত ভাবের প্রকৃতি বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

অন্যে এই ভাবের কি সংজ্ঞা প্রদান করিবে, বলিতে পারি না; কিন্তু আমি ইহাকে পূর্ব্বরাগ বলিয়া থাকি। পূর্ব্বরাগ বলিলে আধুনিক সংস্কৃত সমাজে অনেকের নিকট কেবল প্রাপ্ত বয়স্ক নর নারীর মধ্যে অন্যান্যের প্রতি প্রেমাভিলাষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমি পূর্ব্বরাগের এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নহি। পূর্ব্বরাগ প্রণয়ে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বরাগ প্রণয় নহে। প্রীতি সঙ্কোচভাব পরিশূন্য। কিন্তু পূর্ব্বরাগ অন্যান্যের মধ্যে লজ্জার মৃদু প্রভাব অনুভূত করাইবে। যে কখনও পূর্ব্বরাগের আভাস অনুভব করে নাই, সে ভাবি প্রণয়পাত্রের নিকট গমন করিতে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আত্মীয়স্বজন জ্ঞানে নিয়মিত এবং সরল আচরণে সে কখন লজ্জার অনুপ্রভাবেও আকৃষ্ট হইবে না। কিন্তু যখনই কৌমারসুলভ স্বচ্ছহৃদয়ে পূর্ব্বরাগের আভাস আসিয়া পতিত হইবে, তখনই তাহার মুখলাবণ্য অন্তঃস্মিত প্রভাসিত হইয়া উঠিবে। অনির্দ্দিষ্টহেতু মৃদু লজ্জার কম আবরণে অকৃত্রিম নয়নবিভ্রম লুক্কায়িত হইবে। এবং হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রশান্ত প্রদেশে এই আকস্মিক আবেগের সাক্ষাৎ কারণ আবিষ্কার করিতে সে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইবে। প্রকৃত প্রণয়ে লজ্জার আধিপত্য নাই। প্রণয়ী অম্লানচিত্তে, স্মিতমুখে প্রণয়ভাজনের সম্মুখীন হইবে এবং অন্যান্যের

প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। সংসারের বাধা, গুরুগঞ্জনা, সমাজের লাঞ্ছনা তাহাকে বিরত করিতে পারিবে না। স্রোতস্বতী পর্ব্বত প্রান্ত হইতে যদি একবার বেগে প্রধাবিতা হয়, তুঙ্গশৈল সংবাধা প্রাপ্ত হইলেও দুর্ব্বার বেগ জলপ্রপাতরূপে তাহা অতিক্রম করিয়া সহস্রোত্তর বিক্রমে পুনর্ব্বার নিজ পন্থার অনুসরণ করে। আমি এমত বলিতেছি না যে, সকল প্রণয়ীই কুল, মান আত্মীয় কুটুম্ব, গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত পাত্রের অনুসরণ করিবে। কিন্তু হৃদয় আত্মবশ নহে, প্রণয়ের অধীন। প্রণয় যেখানে, হৃদয় সেখানে স্বতঃ প্রধাবিত হইবে। শরীর পিঞ্জরবদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের স্বচ্ছন্দবিহার নরশাসনবহির্ভূত। তবে এমন মহাপ্রণয়ী থাকিতে পারেন, যিনি প্রণয়োৎসবে আত্মসুখোৎসর্গ করিয়াও চিত্তের স্থৈর্য্য এবং শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন। যিনি পূর্ব্বরাগ অনুভব করিয়াছেন. তিনি রাগ ভাজনকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানে মনে মনে তাঁহার আরাধনা করিবেন; আর যিনি প্রণয়ী হইয়াছেন, তিনি প্রণয় পাত্রের সমকক্ষ, অথবা তাঁহাকে সমকক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করেন। পূর্ব্বরাগ যেরূপ প্রীতি কিম্বা প্রেম নহে, তেমনি উহা শুধু ভক্তি, ভীতি কিংবা স্নেহসম্ভূতও নহে।

নর নারীর জীবনে কখন যে এই মাহেন্দ্রমূহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই। কেহবা লৌকিক যৌবন অনেক দিন লাভ করিয়াও এই অপূর্ব্বভাবের অধিকারী হয় না। আবার কেহবা অতি অল্প বয়সেই উহার মোহন প্রভাবে উদ্দীপ্তহৃদয় হইয়া উঠে। কিন্তু যে বয়সেই হউক না কেন, মানব যে মুহূর্ত্তে ইহার আভাস অনুভূত করে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার স্বল্পপ্রসব জীবনস্রোত মৃদুসংলাপী নির্ঝরপ্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া উত্তালতরঙ্গক্ষুব্ধা পূর্ণ গঙ্গার কলপ্রবাহে উদ্বেলিত হয়। কৈশোর সুলভ মুগ্ধভাব, অস্ফুটপ্রকৃতির পরানুবর্ত্তন, যৌবনোদ্গমে সংসারপর্য্যবেক্ষণে এবং স্বাবলম্বনে পরিণত হয়। আশু সন্তুষ্ট কৌমারভাব নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভূতকালে বিলীন হইয়া যায়; এবং সংসারভার মস্তকে ধারণ করিয়া হাস্যমুখে নবযৌবন মানবহৃদয় অধিকার করে। কল্য বালক ছিলে, আজি যুবা হইলে! আজি হইতে শারদচন্দ্রমার কলঙ্ক থাকিবে না; এবং শিতরশ্মী শীতলতর অনুভূত হইবে। আজি হইতে স্ফুটকুসুমে নবরাগব্যক্তি ও গভীরতর সুরভি নিঃসৃত হইবে; এবং বনবিহঙ্গ নিনাদে নূতন তন্ত্রীর মধুরালাপ শ্রুত হইবে।

যদি পুরুষ হও, তাহা হইলে কামিনীর মুখমণ্ডলে নূতন শোভা দেখিতে পাইবে। এত দিন যেখানে সাধারণ সৌন্দর্য্য দেখিতে, আজি প্রকৃতির শিরোভূষণ ক-

পিণী সেই স্ত্রীমূর্ত্তিতে স্বর্গীয় মহিমা, দৈববৈভব. লোকোত্তর মাধুর্য্য, অলৌকিক লাবণ্যলীলা প্রথম দেখিতে পাইবে। সেই সর্ব্বলোকসম্পূজনীয়া মোহিনীমূর্ত্তির সম্মুখে তোমার পুরুষসুলভ ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার প্রভৃতি সমুদায় চলিয়া যাইবে; তোমার উন্নত মস্তক তোমার অজ্ঞাতসারে স্বতঃ অবনত হইবে। আর যদি স্ত্রী হও, পুরুষের সৌভাগ্যগম্ভীর মুখচ্ছবি দেখিয়া তোমার অস্ফুটহৃদয় প্রমোদোৎফুল্ল হইয়া উঠিবে; প্রেমপ্রীতি, স্বর্গশান্তি, ভূত এবং ভবিষ্যৎ একত্রে মিশিয়া তোমার নয়নসম্মুখে আশার সমোজ্জল স্নিগ্ধকিরণরঞ্জিত সুন্দর ইন্দ্রচাপ রচনা করিবে।

আজি এই শুভদিবসে ভাবিজীবনের মধুর প্রারম্ভই তোমার নয়ন সম্মুখে ন্যস্ত করিলাম। ভবিষ্যৎগর্ভে পর্ব্বতাকারে তোমার জন্য যে কত পরীক্ষা—দুঃখ দারিদ্র, ভীতি আশঙ্কা, কত প্রলোভন—রূপগুণ, ধন সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহার বিশদ চিত্র অঙ্কিত করিয়া তোমার উৎসাহপূর্ণ, আবেগশালী নূতন হৃদয় অবসন্ন করিতে চাই না। বীচিবিক্ষিপ্তা কল্লোলিনীর ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া যে নাবিক বহিত্র পরিত্যাগ করিয়া, অদৃষ্টে নির্ভর করে, সে কাপুরুষ। অনিশ্চিতপ্রকৃতি ভাবি বিপদ স্মরণ করিয়া সুখের সময় অবসাদতমসাবৃত করিও না। অথচ যে স্বচ্ছ প্রসন্ন হৃদয় লইয়া আজি এ নূতন জীবনে প্রবেশ করিলে, সংসারের ঘূর্ণাবাতে পড়িয়া তাহা আবিলময় করিও না।

সোমরস ও তাহার সেবনবিধি

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিলে, "সোমরস" নামে এক প্রকার পদার্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের অতি প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে, আর আধুনিক তন্ত্র ও পুরাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে, "সোমরস" শব্দের ভূরি ব্যবহার দেখা যায়। এই সোমরস প্রাচীন ভারতে এরূপ আদৃত ও প্রচলিত ছিল যে, উপন্যাস লেখক, নাটককার, কবি এমন কি ইতিহাসবেত্তা ও আলঙ্কারিকেরা পর্য্যন্ত ইহার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই সোমরস কি, এবং কোথায় পাওয়া যায় এ বিষয় লইয়া বহু দিন পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্বজ্ঞসমাজে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, এবং কলিকাতা ও বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাবিদ্ পণ্ডিতেরা এবিষয়ে ৫। ৭ বৎসর কাল ক্রমিক তর্ক বিতর্ক করেন, এবং এই অজ্ঞাত পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ার্থ বহুস্থান পর্য্যটন করেন।

সম্প্রতি কলিকাতার আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যেরা সোমরস সম্বন্ধে পুনরায় বাদানুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা উক্ত সোসাইটির সাময়িক পত্রিকার * প্রত্যেক পৃষ্ঠাই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। এবং বর্ত্তমান আন্দোলনে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা ভবিষ্যতের তমসাময়ী গুহায় নিহিত। সে যাহা হউক, আমরা বহু দিন হইতে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা এবং নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, সোমরস সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই সুযোগে, বর্ত্তমান প্রস্তাবে, তাহা বিশেষ করিয়া প্রতিপাদ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বহুদিনের অপ্রতিহত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের পর, সোমরস সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি,তাহা বান্ধবের পাঠকগণ এবং আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যদিগের নিকট উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, এই ভরসায় আমরা এ গুরুতর প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

সোমরস, আর্য্যঋষিদিগের একপ্রকার পানীয় দ্রব্য। ইহা সকল শ্রেণীর লোকদিগেরই সেব্য ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণই ইহা পান করিত। সংসারত্যাগী, যোগী, সন্ন্যাসীদিগেরও ইহা পান করিতে নিষেধ ছিল না, বরং যোগসাধনে ইহার ব্যবহার ছিল। যথা—

"যুগে যুগেঽপি কর্ত্তব্যো যোগিনো যোগসাধনে। পিয়েৎ সোমরসং তন্ত্রে আয়ুর্ম্মেধাবলপ্রদং॥" (শিবসংহিতা)

পূর্ব্ব কালে সোমরস যজ্ঞস্থলে ব্যবহৃত হইত। সোমরস কাহারও গৃহে পান করিবার নিয়ম ছিল না। দেবতা মন্দিরে, কোন পীঠ স্থানে, না হয় যজ্ঞস্থলে ইহা পান করিতে হইত, তদ্ভিন্ন অন্যত্র পান করিবার নিষিদ্ধ নিয়ম ছিল। যদি কেহ কোন স্থলে, সোমরস পান করিবার জন্য অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই স্থলে দেবারাধনা করিয়া সেই স্থানটিকে পবিত্র করিয়া লইতে হইত। অথবা যজ্ঞের আয়োজন করিয়া লইতে হইত। যজ্ঞে যে সকল দ্রব্য দেবোদ্দেশে প্রদান করা হইত, তাহার মধ্যে সোমরস প্রধান। অগ্রে সোমরস প্রদান না করিলে যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত না। সকল যজ্ঞেই যে সোমরস প্রদান করা হইত এমত নহে। কোন্ কোন্ যজ্ঞে দেওয়ার রীতি ছিল, তাহা পরে বলা হইতেছে।

আর্য্যদিগের মধ্যে নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত ছিল। তন্ত্রে দেখা যায় প্রাচীন ভারতে ৬৭ প্রকার যজ্ঞ ছিল। সেই সকল যজ্ঞ আবার ১০৩ ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহাদের নাম 'ব্রত'। এই ৬৭ প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের

* Journal of the Asiatic Society, Bengal.

জন্য বিশেষ বিশেষ বেদী ছিল। সেই সকল বেদীর আকার মোটে ৬ প্রকার, যথা, এককোণী, ত্রিকোণী, চতুষ্কোণী, অষ্টকোণী, বৃত্ত। এবং দন্তী। বেদীর আকার এই ছয় প্রকার। ইহার মধ্যে এককোণী, ত্রিকোণী, চতুষ্কোণী ও দন্তী এই ৪ প্রকার বেদী যে যে যজ্ঞে নির্ম্মিত হইত, তাহাতেই সোমরসের ব্যবহার ছিল। অন্য যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত না। বেদীর মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড থাকে। ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) বেদীর এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি মধ্যে সোমরস নিক্ষেপ করিতেন। তদনন্তর সোমরসের পূজা ও সোমদেবতার আরাধনা করিবার অন্যান্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হইত। যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হইলে, আর্য্যগণ সকলে মিলিয়া * সোমরস পান করিতেন। সোমরস একটি পাত্রে ফেলিয়া, তাহাতে বেদী মধ্যস্থ অগ্নিকুণ্ডের কিঞ্চিৎ ভস্মাবশেষ মিশ্রিত করা হইত, তাহার পরে তাহা পান করা হইত।

যজ্ঞের পুরোহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড মধ্যে সোমরস নিক্ষিপ্ত করিয়া সোমদেবতার আরাধনা করিতেন, এবং অপরাপর দেবতার নামোল্লেখ করিতেন। কোন দেবতার উদ্দেশে যে উপাসনা করা হইত; তাহার অর্থ এইরূপ 'হে সোম! তুমি আমাদের রক্ষক, তুমি আমাদের প্রভু। তুমি যজ্ঞস্থলে দিব্য রথসহ উপস্থিত হও। আমরা সোমরস গ্রহণ করি।' ইত্যাদি। এই সকল ছন্দোবদ্ধ শ্লোক বা উপাসনার শ্লোক ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গান করা হইত। উপগীয়মান স্বরগ্রামের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অতি শুদ্ধ স্বরসংযোগে উচ্চারণবৈষম্য সংঘটিত হইলে, তাঁহারা আপনাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও প্রনষ্ট-শক্তি মনে করিতেন এবং তদ্ধেতু সোমরস পানে তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না। * এই উপাসনার গানে তাঁহারা তিন প্রকার বৈদিক স্বর ব্যবহার করিতেন। তাহা এই—উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। এখনকার উদারা, মুদারা ও তারাকে ইহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। উদাত্ত—নিগ, অনুদাত্ত—ঋধ এবং স্বরিত—সা ও ম, এই গুলির সহিত ঐক্য হয়।' স্বরিত কখন কখন ষড়্জ ও পঞ্চমের সহিত ঐক্য হয়। এইরূপ একটি চিহ্ন (।) বেদের মন্ত্রের উপরে থাকিলে উদাত্ত সঙ্কেত বুঝিতে হইবে। এইরূপ একটি চিহ্ন (—) যদি বৈদিক মন্ত্রের উপরে থাকে তাহা হইলে স্বরিত এবং যদি নিম্নে থাকে তাহা হইলে অনুদাত্ত বুঝিতে হইবে। আবার এই গান করিবার সময় বাদ্যেরও প্রচলন ছিল। তখন যদিও বিশুদ্ধ বাদ্যের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু ঋগ্বেদে দেখা যায় তৎকালীন মহর্ষিরা সোমরস আরাধনাকালীন এবং

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

* Muir's Sanskrit Text.

সোমরস পানকালীন পুলোকিত চিত্তে গীত বাদ্য করিতেন। বৈদিক বাদ্যের তালের কিছু নমুনা আমরা দিতেছি।— যথা হা, হী হী হা ; হা হী হী হী হী হা ; হাং হীং বুহা ! পম্ পশো পং পং ; হাং উং হুং, ইত্যাদি। এই প্রকার গীত বাদ্য করিতে করিতে আমোদে সোমরস পান করা হইত।

যাহা হউক, এক্ষণে, সোমরস জিনিষটা কি এবং কোথায় পাওয়া যায়, দেখা আবশ্যক। এ বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে নানা. প্রকার মত ভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ ইউরোপীয় কুলও স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া গতানুগতিক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে ও ছাড়েন নাই। আবার কেহ কেহ বা একেবারে হাস্যকর মতাবলীর সৃষ্টি করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। যাহা হউক, সোমরসসম্বন্ধে কতিপয় সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের মত এ স্থলে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করিলে বোধ হয় অযুক্তিসঙ্গত হইবে না।

পণ্ডিতবর স্যারউইলিয়ম জোন্স ও হোরেশ উইলশন সাহেব বলেন, সোমরস এক প্রকার বৃক্ষের পাতার রস। সুপ্রসিদ্ধ রাজস্থানইতিহাসলেখক টড্ সাহেব নির্দ্দেশ করেন যে, ইহা এক প্রকার বৃক্ষের মূলের রস *। মান্দ্রাজবাসী জনৈক তৈলাঙ্গী পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'গুড়ূচী' প্রাচীন কালে সোমরস বলিয়া অভিহিত হইত। আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধানে, বামুনহাটী অথবা ব্রহ্মীশাক সোমলতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাহারও মতে সোমরস ফলবিশেষের রস মাত্র। সুযোগ্য ইংলিশম্যান্ সম্পাদক বলেন, রক্তবর্ণের এক প্রকার লতা সোমলতা বলিয়া উল্লিখিত হয়। ঐ লতার রস স্নিগ্ধ, সুগন্ধ, এবং অম্লমধুর * অধ্যাপক গ্রীন সাহেব গ্রীসদেশীয় সূর্য্যলতার (Sunplant) সহিত এই সোমলতা ও সোমরসের তুলনা করিয়াছেন। এই রসে মাদকতা শক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহা উত্তেজক এবং প্রচণ্ড সুরার (Strong wine) ন্যায় কার্য্য করে। † একজন অধ্যাপক বলিয়াছেন, সোমরস কল্পিত দ্রব্য মাত্র ! আর একজন মহাত্মা বলেন, সোমরস— চন্দ্র কিরণ !! বেদে লিখিত আছে,সোমলতার রস তৃপ্তিকর,মাদক,হর্ষজনক পুষ্টিকারক, রোগ নাশক এবং সুমিষ্ট। যথা—

* ভারতীয় গ্রন্থাবলী। ১ম খণ্ড। ১৮ পৃষ্ঠা।

* "The 'some' plant of the Vedas was the Asclepias Acida of Roxburgh, now known as the twining plant with few leaves ; and with clusters of small and fragrant flowers. It yields a mild, acid, milky juice, and grows in various parts of India." The Englishman, 23rd July, 1873. And also Vide "Lecture on the Religious sects of India" P 32. by R. N. Datta.

† Green's Vedic literature. V, I P 2.

(ক) প্রবোমিয়স্ত ইদং বোমৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ। ত্রপ্স্যা মধ্বশ্চ মুষদঃ।

(খ) গয়স্কানো অমিহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।

পণ্ডিত কালীকমল সার্ব্বভৌম বলেন, "সোমলতা নামক লতাবিশেষের মুল হইতে সোমরস নির্গত হয়। ইহা দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত ও তরল। *** ইহা রীতিমত সেবন করিলে, মনুষ্য লাবণ্যযুক্ত ও দীর্ঘজীবী হয়। এবং প্রতুল ক্ষমতাশালী ও পুস্টকায় হয়।" অধ্যাপক ওয়েবর কহেন, "রীতিমত ঔষধের ন্যায় সোমরস সেবন করিলে শরীর কন্দর্পের ন্যায় কান্তি ধারণ করে এবং শরীরে প্রভুত বল হয়। একবার সোমরস সেবন করিয়া এক দমে ৫।৬ ক্রোশ যাওয়া যায়।" * বেদ পাঠে জানা যায়, সোমরসের বর্ণ জলের ন্যায় তরল এবং দুগ্ধের ন্যায় গাঢ়। বেদের "সন্তে পয়াংসি সমুযন্ত রাজা" এবং "রাজ্ঞোনুতে বরুণস্য ব্রতানি বৃহস্পাতেবং তব সোমধাম"— প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা ইহার দুগ্ধের ন্যায় গাঢ়ত্ব এবং জলের ন্যায় তরলত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

সোমরস যে সোমনামধেয় এক প্রকার লতার রস এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। এই লতা পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। বেদে ও ইহা পার্ব্বতীয় বলিয়া কথিত আছে যথা ;—"যৎসানোঃ সানুমারুহৎ ভুর্য্যা স্পষ্ট কর্ত্বং। তদিন্দ্রোর্থং চেতুতি যুথেন বৃষ্টি রেজতি।" এই সোমরস উজ্বল (Sparkling) এবং দেখিতে সুন্দর। মহর্ষি বাল্মীকি, রামচন্দ্রের রূপ বর্ণনার স্থলে বলিয়াছেন, "সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।" অর্থাৎ সোমের ন্যায় দেখিতে সুন্দর। এতদ্দ্বারা সোমলতা ও সোমরসের সুন্দর শ্রীত্ব প্রতিপাদ্য হইতেছে। হরিবংশ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে ও এইরূপ উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে লিখিত আছে, স্বর্গে যেরূপ অমৃত, মর্ত্তে সেইরূপ সোমরস। যোগ শাস্ত্রে আছে, "পবনাভ্যাসযোগ সাধনা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, একবার সোমরস সেবন করিলে তদ্রূপ ফল পাওয়া যায়।"

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, সোমলতা বা সোমরস এখন আর পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। সোমাভাবে পার্থিবামৃতকে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়।' এই পার্থিবামৃত কি দেখা উচিত। পার্থিবামৃত শব্দে পৃথিবীর অমৃত শাস্ত্রে, পার্থিবামৃত শব্দে জল বলিয়া লিখিত আছে। অমরকোষে এবং ঋগ্বেদে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—(ক) "পয়ঃ কিলালমমৃত মিত্যমরকোষঃ। (খ) অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপ্সু তেজঃপ্রশস্তয়েদেবা ভবতবাজিনঃ। ঋগ্বেদ। ১। ২৩। ১৯ (গ) অপ্সুমে সোমো অব্রবীদন্ত বিশ্বানি ভেষজা অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবং আ-

* Vedio Indica, No IX. PP. 17-28.

পশ্চ বিশ্বভেষজীঃ। ১। ২৩। ২০ঋগ্বেদ" তবে, এত অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের পর সোমরস কি জল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল? ইহা বিশ্বাস করিতে বুদ্ধি প্রতিহত হয়, হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। শাস্ত্রে, পার্থিবামৃত অর্থে জল বলিয়া উল্লেখ আছে কিন্তু সোমরস যে জল তাহা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। সোমাভাবে জলের ব্যবহারের কথাও কোথাও দেখিনাই। অতএব এ মতটি বিশ্বাস্য বা সংযুক্তিসঙ্গত নহে।

জর্ম্মণ দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত, Ascipa Acidia কেই সোমলতা বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলিতে পারি না। অপর কেহ কেহ সোমলতাকে পুঁইশাক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সামবেদের ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে যে, সোমলতা পৃথিবীতে আর উৎপন্ন হয় না। এজন্য অন্য দ্রব্যকে ইহার প্রতিনিধি করিয়া যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিতে হয়। শ্রুতি গ্রন্থে সোমাভাবে পুতিকা (পুঁই) শাকের বিধি আছে। যথা—"সোমাভাবে পুতিকামভিসুনুয়াৎ।' ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে সোমাভাবে পুতিকাবিধানের অনেক শ্লোক আছে। অথর্ব্ববেদের একস্থলে 'পুতিকরজ্জুলতা' সোমলতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদে সোমলতার আকার যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পুঁইশাক বলিয়াই আপাততঃ বিশ্বাস জন্মে। পুতিকা শাকের যেরূপ তন্তু (আঁশ) থাকে সোমলতার তাহাই ছিল। ইহাকে সোমতন্তু কহে। যথা—'অপ্যায়স্ব মন্দিতম সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ। ভবানঃ সুশ্রবস্তমঃসখাবৃধে।' (১৪অধ্যায়। ১০ সূক্তঃ।) অধ্যাপক হাগ সাহেব পুনা হইতে যে সোমলতা আনিয়া ছিলেন, তাহার আকার পুতিকা শাকের সহিত অনেকটা ঐক্য হইয়াছিল। কিন্তু* তাহার আস্বাদ অতীব তিক্ত এবং দুর্গন্ধ যুক্ত। * অনেকে বলিয়াছেন ইহা প্রকৃত বৈদিককালীন সোমলতা নহে। †।

সে যাহাহউক, আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, সোমলতার আকার বন-পুঁই শাকের ন্যায়। কিছুদিন পুর্ব্বে আমি কতিপয় পণ্ডিতের সহিত বেলগাছিয়ায় গিয়াছিলাম; তথায় সোমরসের উল্লেখ হওয়াতে, বানিয়ালাল বাক্তি নামধেয় জনৈক পার্ব্বত্য দেশীয় মোহান্ত আমাদিগকে এক লতা দেখাইয়া ছিলেন, তাহা আকৃতিতে কোমল পুতিকা শাকের মত। আমরা ৪। ৫ জনে উহা আস্বাদন করিয়া ছিলাম, তাহার স্বাদ ঈষৎ অম্ল মধুর বলিয়া বোধ হইল। উহার পত্র পুতিকা শাকের পাতার মত; কিন্তু তত বৃহৎ নহে। আমি, ভ্রম বশতঃ, উহাকে প্রথমেপুঁইশাক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহা পুঁইজাতীয় বটে, ॥

* Aid. Br, Vol II P 439.

† Edinburgh Revew Vol LX, No IV

বন-পুঁইয়ের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। (*) ঐ মোহান্ত প্রতিদিন উহার রস প্রায় একছটাক পরিমাণে পান করেন, তাহাতে তাঁহার নেশা হয়। তিনি পূর্ব্বে গাঁজা, চরস, এবং অহিফেন সেবন করিতেন, কিন্তু এই রস সেবন করা অবধি তাঁহার এ সকলের আর প্রয়োজন হয় না। মোহান্ত আমাকে উহা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। আমি তাহা ভারতবর্ষীয় সুশিক্ষোন্নতি সভার (†) বিলাতস্থ পৃষ্টপোষক শ্রীযুক্ত মে স্যুয়ার্শ হুইট্‌নি বড্ এবং কোম্পানীকে লণ্ডনে পাঠাইয়া ছিলাম। তাঁহারা বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা বলিয়াছেন ইহা প্রকৃত বৈদিক কালীন সোমলতা বটে। (‡) সম্প্রতি পাণ্ডুয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী এদিনা মস্‌জিদের নিকট এক প্রকার লতা দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ লতা তীর্ব্বত দেশীয় এক প্রকার লতার সহিত ঐক্য হয়। তীর্ব্বত দেশীয় লোকেরা ঐ লতাকে বৈদিককালীন লতা বলিয়া বিশ্বাস করে। তীর্ব্বত দেশে ঐ লতার নাম "মানীর"। * তত্রত্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা মানিরের যেরূপ রূপ ও গুণ বর্ণনা করেন, পাণ্ডুয়ার প্রাপ্য লতা অনেকাংশে তদ্রূপ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর জনৈক গার্ড উহা প্রাপ্ত হইয়া তদীয় রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। উহার আকৃতি ও প্রকৃতি সোমরসের ন্যায় প্রতীত হয়। ইহার স্বাদ অম্লমধুর। ইহা মাদক, ক্ষুৎ-পিপাসোদ্দীপক, উদরের পীড়ানাশক, বিষঘ্ন এবং তৃপ্তিজনক। ইউরোপীয়েরা ইহাকে Semita genia কহিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। আমি উহা রীতিমত আস্বাদন এবং পরীক্ষা করিয়া উহাকে Genus moiintee বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বানিয়া লাল বাজির প্রদর্শিত সোমরসের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক, সোমলতার আকার অনেকটা যে বনপুঁই শাকের মত সে বিষয়ে আমার কিছুই সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালে নানা প্রকার সোমলতা ছিল। এক্ষণে যতদূর অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখিয়াছি, এখনও ২৪ প্রকার সোমলতা পাওয়া যায়। অন্বেষণ করিলে ইহা মিলিতে পারে। এই ২৪ প্রকারের নাম এই,—অংশুমান, ভুঞ্জমান, চন্দ্রমা, রাজতপ্রভা, দুর্ব্বাসোম, কনীয়ান, শ্বেতাক্ষ, কণকপ্রভা, প্রতানবান,

* History of Thibet, by Colonel Rayne P 86, and Buddha in Thibet, P 17

† সোমপ্রকাশ। ৯ই আশ্বিন ১২৮৪।

‡ ভারতীয় গ্রন্থাবলী। ১ম খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা এবং Proceedings of the preliminary meeting of the I. E. Improvement Society, P 7

* History of Thibet, by Colonel Rayne, P 93.

তালবৃন্ত, করবীর, অংশবান, স্বয়ম্প্রভ, মহাসোম, গারুড়াহৃত, গায়ত্রাইষ্ট্রৈষ্টভ, পাণ্ডুরু, জাগত, শঙ্কর, অগ্নিষ্টোম, রৈবত, ত্রিপদীযুক্তা, গায়ত্রী, উড়ুপতি। এই সকল সোমলতার প্রত্যেকের ১৫টির অধিক পত্র হয় না। লতা ও আকারে বড় দীর্ঘ নহে কিন্তু বড় স্থূল ও সরস। "মহাসোম" নামক সোমলতার বিংশতিটি পত্র দেখা গিয়াছে। এই সকল লতার পাতা শুক্ল পক্ষে জন্মে এবং কৃষ্ণ পক্ষে পতিত হয়। অমাবস্যাতে সমুদায় পত্র নষ্ট হইয়া কেবল মাত্র লতাবশিষ্ট থাকে। এই সকল লতার তেজ শরৎকালে কিছু প্রখর হয়।

শাস্ত্রে আছে, হিমালয়, সহ্য, মাহেন্দ্র, মলয়, শ্রী, দেবগিরি, পারিপাত্র, বিন্ধ্য এবং বিতস্তা নাম্নী নদীর উত্তরে যে সকল পর্ব্বত আছে, তথায় সোমলতা পাওয়া যায়। সিন্ধু নামক মহানদে, কাশ্মীরের মানসসরোবর, দেবসুন্দ নামক হ্রদে সোমলতা প্রাপ্ত হইবার কথা অথর্ব্ব বেদে দেখা যায়। তন্ত্রে আছে, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থানে, বিশেষ মহাবনে কিম্বা কোন বনময় প্রদেশে ইহা পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদে আছে, ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে সোমলতা জন্মায়। পশ্চিম ভারতে সোমতীর্থ নামে একটি স্থানও প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু তথায় অনুসন্ধান করিয়া সোমলতা পাওয়া যায় নাই। ফলতঃ যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, সোমলতা জল এবং স্থল উভয় স্থানেই জন্মায়। (ক্রমশঃ)

ভারতে আর্য্যজাতি

যে আর্য্যজাতির গৌরব-প্রভায় অদ্যাপি ভারত গৌরবান্বিত, যে আর্য্যজাতির বিদ্যা ও নীতিজ্ঞান জগৎপ্রথিত, যে আর্য্যজাতির বিন্দুমাত্র বিবরণ অদ্যাপি অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞের হৃদয়ে কৌতূহল-শিখা প্রদীপ্ত করে, যে আর্য্যজাতির তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের কণিকামাত্র উদ্ধারার্থ কত কত মহামনীষী জীবনের সার সময় অকাতরে ব্যয় করিতেছেন, এবং যে আর্য্যজাতির সন্তান বলিয়া আমরা সংসারে চিরদিন সমাদৃত রহিয়াছি, সেই আর্য্যজাতি কোথা হইতে কিরূপে ভারতবর্ষে শুভাগমন করিলেন তাহা জানিতে কাহার না প্রবৃত্তি জন্মে? সেই প্রবৃত্তি কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করাই উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বহুতর গ্রন্থে আর্য্য শব্দের উল্লেখ আছে। তৎসমস্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আর্য্য এবং শূ-

দ্রেরা অনার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যথা, কাত্যায়ন-কৃত সূত্রের ভাষ্যে—

"শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণঃ আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ।"

এবম্বিধ বর্ণ-বিভাগ দৃষ্টে অনুমান হয় যে, আর্য্যদিগের আগমনের পূর্ব্বে ভারতে যে সমস্ত জাতি বাস করিত, তন্মধ্যে শূদ্রেরাই প্রধান। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ইহার প্রাচীন অধিবাসীদিগকে বিজিত ও বিদূরিত করেন; সম্ভবতঃ শূদ্র-দিগের নিরীহতা বা অন্যগুণে বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে গ্রহণ করেন। সে যাহাহউক হিন্দুশা-স্ত্রের ন্যায় অন্যান্য অনেক জাতির গ্রন্থা-দিতে আর্য্যনামের উল্লেখ দেখা যায়, এবং ঐসমস্ত জাতিরাও আপনাদিগকে আর্য্যনামে পরিচিত করেন। হিন্দু, পারসীক, গ্রীক, রোমক, জর্ম্মণ, কেল্‌ট্ প্রভৃতি কয়েকটি জাতিকে আর্য্য-বংশোদ্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। উল্লিখিত জাতিসমূহের ভাষা পর্য্যা-লোচনা করিলে তন্মধ্যে কতকগুলি শব্দের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তদ্দৃষ্টে এইরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত গণের গবেষণাদ্বারা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সংস্কৃত, আবস্তীক, গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মণ প্রভৃতি কতিপয় ভাষা এক মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন। যদিও ঐ মূল ভাষা অ-দ্যাপি বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না, ত-থাপি ঐ কয় ভাষার সাদৃশ্যদর্শনে উহাদি-গকে একবীজোৎপন্ন বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। অনেকে এরূপ কহিতে পারেন যে, সংস্কৃত হইতেই ঐ ভাষা সমস্তের উৎপত্তি হই-য়াছে; তাহাহইলে অবশ্যই সকলে আপন আপন ভাষার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে যত্নবান্ হইবে এবং পরিশেষে উদ্দেশ্যবিষয়ের সি-দ্ধান্ত করা দুরূহ হইয়া উঠিবে। পূর্ব্বোক্ত ভাষাগুলির পরস্পরের সৌসাদৃশ্য দর্শনে এক হইতে অন্যের উৎপত্তি প্রতীয়মান হয় না। যাঁহারা ঐ ভাষাগুলির সম্যক্ অনু-শীলন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা নিঃ-সংশয় বুঝিতে পারেন যে, উহারা একই ভাষা, কেবল স্থানভেদে উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে। এসম্বন্ধে অধিক স্থানব্যয় বা অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়ো-জন নাই সুতরাং আমরা এবম্বিধ দুইটিমাত্র শব্দ উল্লেখ করিব।

	সম্পর্কবাচক	সংখ্যাবাচক
সংস্কৃত—	পিতৃ	সপ্তন্
লাটিন্—	পাটর্	সেপ্টেম্
গ্রীক—	পাটর্	হেপ্‌টা
জর্ম্মণ—	ফাতের	সেপ্‌ত্
আবস্তীক *	পৌতর	হপ্তন্

আর্য্যদিগের যে সময়ের কথা হই-তেছে তখন তাঁহারা উচ্চ সভ্যতার আদর্শ ছিলেন না; কিন্তু মানব সমাজ যতই কেন

* পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের নাম অবস্তা। কেহ কেহ উহাকে জেন্দা-বেস্তা বলেন। উহা যেরূপ ভাষায় লি-খিত তাহা পারসীক ভাষা হইতে বহুল বি-ভিন্ন। অবস্তার ভাষা আবস্তীক বলিয়া উল্লিখিত হইল।

অসভ্য হউক না, ভাষা-সৃষ্টির প্রথমেই তাহাদের সম্পর্কসূচক ও সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োজন হইবে। এই কারণে আমরা সম্পর্ক ও সংখ্যা প্রতিপাদক দুইটি মাত্র শব্দের উল্লেখ করিলাম।

এতদ্রূপে ভাষার প্রকৃতি আলোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে, মূলে উক্ত জাতিসমূহ একস্থানে থাকিয়া এক ভাষায় কথোপকথন করিতেন। ক্রমশঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় স্থানের অসংকুলান জন্য তাঁহারা নানা দিগ্দেশে প্রস্থান করেন। স্থান পরিবর্ত্তন সহ, ঘটনাপরম্পরা যাঁহাদের প্রতি যাদৃশ অনুকূল হয়, তাঁহারা তাদৃশ জাতীয়োন্নতি সাধনে সমর্থ হন। জাতীয়উন্নতিসহ জাতীয়ভাষাও বিস্তর রূপান্তরিত হইয়া থাকে। অধুনা এই সমস্ত ভাষার যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, উহাই তাহার হেতু। যৎকালে প্রাচীন জাতি একান্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় একস্থানে বাস করিতেন, সে সময় তাঁহাদের ভাষার যে সকল শব্দের বহুল প্রয়োজন ছিল, অধুনা দেখা যায় তদ্রূপ শব্দ নিশ্চয়ই দূরদেশগত আর্য্যগণের ভাষাসমূহে সমভাবেই রহিয়াছে। সুতরাং শব্দবিদ্যার অপার মহিমাবলে * ইহা স্থির হইয়াছে যে, প্রাচীন কালে আর্য্যজাতি একস্থানেই বাস করিতেন। এক্ষণে দেখা আবশ্যক সেই স্থান কোথায় সন্নিবিষ্ট ছিল।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, আসিয়াখণ্ডই মনুষ্যজাতির আদিম নিবাস স্থল। এখান হইতেই অন্যান্য খণ্ডে মনুষ্য অবতার হইয়াছে। যদি এক জাতি মনুষ্যই ইউরোপখণ্ডে গ্রীস, ইটালী, জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশে এবং আসিয়াখণ্ডের পারস্য ও ভারতবর্ষে অবতারিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহারা এই সমস্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে বাস করিতেন। সে স্থান কোথায়? আর্য্যগণ আসিয়াখণ্ডের অন্তর্ভূত কোন শীতপ্রধান দেশে বাস করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। এখনও দূরদেশবাসী আর্য্যগণের ভাষায় শীতবাচক শব্দের সমধিক বাহুল্য ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ঐ স্থান ভারতবর্ষের উত্তরদিকে সংস্থিত। কারণ, ভারতীয় বহুগ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, ভারতের পশ্চিমোত্তরদিক দিয়াই আর্য্যেরা এখানে আসিয়াছিলেন। ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে গ্রীক ও রোমকেরা উত্তরপূর্ব্ব দেশ হইতে গমন করিয়া গ্রীস ও ইটালী দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন * সুতরাং আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান নির্ণয় করিতে হইলে, আসিয়া মহাদেশে ভার-

* শব্দ-বিদ্যা বা ভাষাতত্ত্বের অসাধারণ চমৎকারিতা হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত আমরা পাঠকগণকে Maxmuller's Lectures on the Scince of Languages নামক ২খণ্ড মনোহর পুস্তক অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

* Prichard's Physical History of mankind Vols III & VI দেখ।

তের উত্তর পশ্চিমস্থ এবং গ্রীস ইটালীর পূর্ব্বোত্তরস্থ কোন শীতপ্রধান স্থান নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। সম্ভবতঃ বেলুর্টাগ পর্ব্বতের পশ্চিমে ও অম্বু নদীর প্রস্রবণের সন্নিধানে যে শীতপ্রধান ও উন্নত ভূভাগ দৃষ্ট হয়, তাহাই আর্য্যগণের আদিম নিবাসভূমি। প্রণিধানসহ ভূচিত্র দর্শন করিলেও একথা মনে উদয় হয়। সেই হিমানীপরিবৃত মানবকুলের আদিম বাসস্থান হইতে আর্য্যগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ দেশ দেশান্তরে অবস্থান করেন।

কোন্ পথ দিয়া আর্য্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তাহাই এক্ষণে নির্ণয় করা বিধেয়। পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থে আইর্ম্মণ-বত্রজো নামে একস্থান সৃষ্টির প্রথম দেশ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ঐস্থান আমু ও সাইহুন নদী সন্নিহিত। আর্য্যেরা প্রথমে যে দেশে বাস করেন তাহাই সৃষ্ট স্থান মধ্যে প্রথম বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। আর্য্যেরা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানোদ্দেশে প্রস্থান করেন। উক্ত গ্রন্থে সেরূপ অনেক স্থানের নামোল্লেখ আছে। সেই গ্রন্থেই ভারতীয় অন্যান্য স্থানের প্রসঙ্গ করিবার পূর্ব্বে, হপ্তহিন্দু ও হরখ্ইতি নামক দুইটি ভারতবর্ষীয় স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। সপ্তসিন্ধু ও সরস্বতী আধুনিক হপ্তহিন্দু ও হরখইতি নামদ্বয়ের রূপান্তর ভিন্ন কিছুই নহে। সুতরাং পঞ্জাব প্রদেশেই যে আর্য্যগণ প্রথম পদার্পণ করেন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বেদে অন্যান্য স্থানের নামোল্লেখের পূর্ব্বে সপ্তসিন্ধু নাম পাওয়া যায়* পঞ্জাবের পশ্চিমে গান্ধার † ও উত্তরে বাহ্লীক ‡ দেশে প্রাচীন কালে হিন্দু সমাগম ছিল তাহার নিদর্শন আছে। অদ্যাপি হিন্দুকুশ পর্ব্বতে সিয়াপোশ নামে এক হিন্দুজাতি দৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা আর্য্যগণের ভারতের উত্তরপশ্চিমদিক দিয়া প্রথমে পঞ্জাবে অধিবাস স্থাপন ঘটনা সুচারুরূপে সমর্থিত হইতেছে।

পঞ্জাবে আর্য্যসম্প্রদায় মধ্যে ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে ঘোরতর মতান্তর উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে দারুণ কলহ ও বিচ্ছেদের আবির্ভাব হয়। পুরাণে ও কয়েকখানি বৈদিক ব্রাহ্মণে যে দেবাসুরের যুদ্ধপ্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, তাহা আর্য্যগণের এই গৃহকলহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কলহ

* সিন্ধু, তাহার পঞ্চ শাখা এবং স্বরস্বতী এই সপ্ত নদীর বিদ্যমানতা হেতু পঞ্জাবের সপ্তসিন্ধু বা হপ্তহিন্দু নাম হইয়াছে।

† গান্ধার অধুনা কাণ্ডাহার। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধাররাজ তনয়া গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

‡ বাহ্লীক অধুনাতন বাল্ক। এই দেশে শান্তনু রাজার ভ্রাতা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জন্য কতকগুলি মতান্তরিত আর্য্য, ভারত ত্যাগ করিয়া, পারস্য দেশে গমন করেন; তাঁহারা পারসীক নামে খ্যাত। অবশিষ্ট আর্য্যেরা ক্রমশঃ ভারতবর্ষে বসতি বিস্তার করিয়া, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও বিদ্যার আলোচনায় ধন-ধান্যে পরিবৃত হইয়া সুখসচ্ছন্দে কাল যাপন করেন।*

কালের কি অপরিসীম ক্ষমতা! প্রকৃতির কি বিস্ময়াবহ আবর্ত্তন! পরিবর্ত্তনের কি অমোঘ গতি! কোথায় গঙ্গা-যমুনা ভগ্নীদ্বয়ের লীলাভূমি আর্য্যাবর্ত্ত, কোথায় টাইবার-সলিলবিধৌত রোম রাজ্য! কোথায় চির-তুষারাবৃত অভ্রংকশ হিমাদ্রির মালভূমি, কোথায় গিরিবর আল্পস্‌বিশোভিত জার্ম্মনি দেশ! কোথায় পুণ্য সলিল-সম্বেষ্টিত, জ্ঞানধর্ম্মনিকেতন পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্র, কোথায় বিলাস-আবাস-ভূমি প্রকৃতির প্রিয় বক্ষস্থল সিরাজ নগর! কি আশ্চর্য্য! কি বিস্ময়জনক! সুবিস্তীর্ণ বীচিমালা বিক্ষোভিত অনন্ত সাগর, সমুন্নত সুদূর বিস্তৃত ভূধর, দূরব্যাপী দুরন্ত মরুভূমি, ভয়াল জন্তু সমাকুল গহন কানন, কলনাদিনী স্রোতস্বতী, প্রকৃতির পরম রমণীয়তার ভাণ্ডার স্বরূপ মনোহর হ্রদ সমূহ আর্য্যজাতির অধুনাতন নিবাসভূমি সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ফলতঃ তৎসমস্তই একজাতীয় লোকের নিবাসস্থল। তত্রত্য অধিকাংশ মানবের শিরায় একই শোণিত প্রবাহিত। একই স্থান হইতে সেই মানববৃন্দ সঞ্চারিত। তাঁহারা একই ভাষায় কথোপকথন করিতেন, একই সামাজিক নিয়মে সঞ্চালিত হইতেন, একই রাজ-শাসনের অধীন ছিলেন, একইরূপ কার্য্যে সকলের আসক্তি ছিল। কিন্তু কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! অদ্য আর সে মানবগণ মধ্যে কয়েকটি শব্দের সাদৃশ্য ভিন্ন আর কিছুরই সাম্য নাই। আজ আমরা কেহ কাহাকে আপনার বলিয়া চিনি না। আজ্‌ আমরা পরস্পর পরস্পরকে পর হইতেও পর বলিয়া মনে করি। আজ্‌ আমাদের ধর্ম্ম, সমাজনিয়ম, রীতি, নীতি, সমস্তই বিজাতীয় পরিবর্ত্তন পরিগ্রহ করিয়াছে। এখন তাঁহাদের ভাষা শুনিলে আমরা পক্ষীর ভাষা মনে করিয়া স্থির নয়নে চাহিয়া থাকি, তাঁহাদের উন্নতি ভাবিলে স্তম্ভিত হই। আমাদের অধোগতি স্মরণ করিলে ব্যথিত হই। আজ পরস্পর আর্য্য-শোণিত-সমুৎপন্ন জাতি সমূহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আজ্‌ তাঁহাদের মধ্যে সহানুভূতি নাই, ভ্রাতৃভাব নাই। অধিক কথা কি, আমাদের বোম্বাই ও মান্দ্রাজস্থ পারসীক ভ্রাতৃগণের সহিত আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; তাঁহারা তাহাই জানেন কই? আমরাই বা তাহা জানি কই? কিন্তু এ সকল জাতিতে স্থানের বিভিন্নতা ব্যতিত অন্য কোন পার্থক্য নাই, থাকাও উচিত নহে। হিন্দু, জর্ম্মণ, গ্রীক, পারসীক প্রভৃতি জাতি সমূহ একই জাতি। আমাদের সকলের পরস্পর চির কালের

নিমিত্ত ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ থাকিবার সম্পর্ক। আমাদের সম্পর্ক উচ্ছেদ করিবার নহে, অস্বীকার করিবার নহে, বিলুপ্ত হইবার নহে। তবে এ ভিন্নভাব কেন? আইস স্বদেশীয়গণ আমরা আমাদের বিদেশস্থ স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের সহিত মমতা সংস্থাপনে প্রযত্ন করি, তাঁহাদের সহিত মিশিয়া যাই, তাঁহাদিগকে আমাদের সহিত মিশাইয়া লই, আমাদিগের হর্ষে তাঁহাদিগকে হাসাই, তাঁহাদিগের বিপদে আমরা কাঁদি। আইস সকলে মিলিয়া আর্য্য নামে পুনরায় জগত মাতাইয়া তুলি,—বসুধা আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া শ্লাঘ্য মনে করুন।



জয়পুর।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের শাসনসময়াবধি একটি কুপ্রথার প্রচলন হইয়া আসিতেছে। তদনুসারে রাজধানী কি প্রধান নগরের নামেই রাজ্য বা প্রদেশের নামকরণ হইয়া থাকে। করদ বা মিত্ররাজ্যগুলি ইংরেজশাসনের সম্পূর্ণ অধীন না হইয়াও তাহাদের সংস্রবে ঐ কুপ্রথার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। রাজপুতানা প্রদেশে মাড়বার ও মিবার রাজ্য যথাক্রমে তত্তৎ প্রদেশের রাজধানী যোধপুর ও উদয়পুর নামে সর্ব্বসাধারণ সমীপে পরিচিত। জয়পুর নগরের নাম হইতে যে রাজ্যটিকে জয়পুর রাজ্য বলিয়া সকলে অবগত আছেন, তাহার প্রকৃত নাম ঢুণ্ডার। অম্বকেশ্বর মহাদেবের নাম হইতে উহার আর একটি নাম অম্বর হইয়াছে। ফলতঃ রাজপুতগণের মধ্যে ঢুণ্ডার ও অম্বর নামই সমধিক প্রসিদ্ধ।

ঢুণ্ডার বা জয়পুর মিবাররাজ্য সদৃশ প্রাচীন নহে সত্য, কিন্তু মানসম্ভ্রম সম্বন্ধে তদপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। উভয় রাজ্যের অধিনায়কই সূর্য্যবংশাবতংশ রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের বংশজাত। লববংশীয় নরপতিবর্গ মিবার রাজ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অধিকার বিস্তার করিয়া বাস করেন এবং কুশবংশীয় নৃপতি বিশেষদ্বারা ঢুণ্ডার রাজ্য সংস্থাপিত হইয়া অদ্যাপি কালের উপর রাজত্ব করিতেছে।

রাজপুতকুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থানুসারে নিরূপিত হইতেছে যে কুশবংশীয় নৃপতিবিশেষ পৈতৃক রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোননদীর তটে রোটস্ নামে এক দুর্গ সংস্থাপন করিয়া বাস করেন। কিন্তু কোন্ সময়ে ঐ দুর্গ সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ঐ দুর্গে কতিপয়

পুরুষ পরম্পরা বাসের পর ৩৫১ সম্বৎসরে (খৃঃ ২৯৫) কুশসন্তানগণের মধ্যে নল * নামে জনৈক প্রসিদ্ধ নামা ভুপতি নিষধ নামে এক নগর সংস্থাপন করেন, অধুনা ঐ নগর নরবার নামে প্রসিদ্ধ। ঐপ্রদেশে এরূপ কিম্বদন্তীও প্রচলিত আছে যে, কুশসন্তানগণ কর্ত্তৃক রোটস্ দুর্গ এবং নিষধ নগর সংস্থাপনের মধ্যবর্ত্তী কালে তাহারা আর দুইটি নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমটির নাম লাহার এবং দ্বিতীয়টির নাম গোয়ালিয়র। এই কিম্বদন্তী নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এক জনের বহু পরিবার কখনই চিরদিন এক-স্থানে একত্রে বাস করিতে পারে না। তন্মধ্যে কাহারও স্বতন্ত্র বাসের ইচ্ছা হইলেই তিনি স্থানান্তর অনুসন্ধান করিবেন ইহাতে বিচিত্র কি ? সে যাহা হউক, কোন্ ব্যক্তি দ্বারা লাহার ও গোয়ালিয়র সংস্থাপিত হয়, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। নিষধ নগরে নলরাজ হইতে ত্রয়োস্ত্রিংশ পুরুষ পাল উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সুখে বাস করেন। কোন্ নরপতি এই নূতন উপাধি স্বীয় নামে সংযোজিত করেন, তাহা কোন ইতিবৃত্তে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। * কিন্তু কুশসন্তানগণ কচ্‌বহ † বংশ নামে বিখ্যাত। কচ্‌বহেরা প্রতি বৎসর মহাসমারোহে সূর্য্যের আরাধনা করিয়া থাকে। নিয়মিত দিবসে তাহারা অষ্ট-অশ্ব-সংযোজিত রথে সূর্য্যমূর্ত্তি আরোহণ করাইয়া নগর মধ্যে অতি সমারোহ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে।

নলরাজ হইতে ত্রয়োস্ত্রিংশ পুরুষ নরপতি সোরা সিংহ একটি অপগণ্ড পুত্র সন্তান রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই শিশুকে বঞ্চনা করিয়া নরবার রাজসিংহাসন অপহরণ করিলেন। সোরাসিংহের মহিষী পুত্রের ভাবি অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহাকে মস্তকে লইয়া অতি দীনবেশে নগর হইতে

* সংস্কৃত ভাষায় নলরাজ ও তদীয় মহিষী দময়ন্তীর যে অপূর্ব্ব উপাখ্যান প্রচারিত আছে, আকবর বাদসাহের আজ্ঞানুসারে আবুল ফজলের ভ্রাতা ফৈজি ঐ উপাখ্যান পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। বার্লিন নিবাসী পণ্ডিতাগ্রগণ্য বপ্ ঐ অনুবাদ দৃষ্টে ঐ অপূর্ব্ব উপাখ্যান ইউরোপে প্রথম প্রচার করেন। সংস্কৃতানুরাগী ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ তাহার পর মূলগ্রন্থ প্রাপ্ত হন।

* লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল টড বলেন, অতি প্রাচীন রাজপুত জাতীয়েরা পাল উপাধি দ্বারা অভিহিত হইতেন।

† কচ্ছপ হইতে "কচ্‌বহ" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কুশসন্তান দিগের মধ্যে কোন্ প্রাচীন পুরুষ কচ্ছপের সংঅবাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। টড কহেন অজমীরের রাজপুত্তেরা ঐ নামে বিশেষ বিখ্যাত। বোধ হয় বিবাহ সূত্রে ঐ নাম অম্বকেশ্বরে সংলগ্ন হইয়া থাকিবে।

বহির্গত হইলেন। রাজমহিষী এইরূপ দীনভাবে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত বোধ হওয়ায় খোগাং নগরের নিকট পথপ্রান্তে শিশু সন্তান রক্ষা করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণমানসে ফল মূল আহরণে চেষ্টিত হইলেন। ইত্যবসরে এক কাল সর্প আসিয়া বালকের শিরে ফণা বিস্তরণ পূর্ব্বক ছত্রবৎ আচ্ছাদন করিয়াছে। রাজমহিষী হঠাৎ আসিয়া এই ভীষণ অবস্থা দর্শনে ভীতিসংবলিত চিৎকার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এই ব্যাপার এক ব্রাহ্মণেরও নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। তিনি ইহাকে কোনমতে দুর্লক্ষণ মনে করিলেন না। তিনি ভয়ার্ত্তা শিশুজননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন " কল্যাণি! এই ব্যাপারকে দুর্নিমিত্ত মনে করিয়া ভীত হইও না। এ সুলক্ষণ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ইহাকে সম্পূর্ণ সুলক্ষণ মনে করিয়া পুলকিত হওয়া উচিত। এই লক্ষণ দর্শনে প্রতীতি হইতেছে যে, ভবিষ্যতে এই বালক রাজা ও তুমি রাজমাতা হইবে। * " মহিষী কহিলেন " উপস্থিত বিপদে আমি যার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছি, ক্ষুধা তৃষ্ণায় মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছি, ভবিষ্যতের ভাবনায় আমার কি হইবে। আপাততঃ প্রাণ রক্ষার কোন উপায় দেখিতেছি না " দয়ার্দ্রচিত্ত ব্রাহ্মণ, মহিষীর এবম্বিধ কাতর বচন শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে খোগাং নগরের পথ দেখাইয়া দিলেন। রাজমহিলা পুত্রসহ খোগাং নগরে উপনীত হইয়া পথিমধ্যে তত্রত্য রাজমহিষীর পরিচারিকার সাক্ষাৎ পাইয়া তৎসঙ্গে রাজবাটীতে উপনীত হইলেন এবং আপনার অত্যন্ত হীনাবস্থা জ্ঞাত করিয়া তথায় দাসী হইয়াছিলেন, সেই অবধি এই লক্ষণের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। বনবিষ্ণুপুরের রাজাদের সম্বন্ধেও ঐরূপ একটি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। এ প্রদেশের অনেক শ্রীমন্ত লোক সম্বন্ধেও ঐ রূপ গল্প প্রচলিত আছে। নাটোরের রাজা ও নড়াইলের রতন বাবুদের সম্বন্ধেও অনেক অসম্ভব কথা শুনা গিয়াছে। মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ও নিতান্ত অবিশ্বসনীয় ব্যাপারঘটিত পরিণাম শুভ ঘটনা সন্দর্শনে এরূপ গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। নক্ষত্রপাত দর্শনে অশুভ, ভেকে সর্পগ্রাস করিতেছে তদ্দর্শনে শুভ প্রভৃতি ব্যাপার সমূহে যে শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়, সর্পের ছত্র ধারণে রাজসিংহাসন লাভ সেই শাস্ত্রেরই পত্রান্তরে অঙ্কিত বলিয়া বিবেচিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে।

* যাহার মস্তকে সর্পে ছত্রধারণ করে সে রাজা হয়, অনেকেরই এরূপ একটি সংস্কার বদ্ধমূল আছে। এই শুভলক্ষণের কিছুই মূল পাওয়া যায় না। অনুমান হয় যখন বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রাখিতে যাইতেছিলেন সেই সময় যে পাতাল হইতে অনন্ত দেব আসিয়া তাঁহার মস্তকে ফণা বিস্তরণ পূর্ব্বক ছত্রধারণ করি-

স্মৃতি অবলম্বনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রলুন্সি নামক অসভ্য মীনা জাতীয় এক রাজা খোগংএর রাজসিংহাসনের শোভা সম্পাদন করিতেছিলেন। সেই অসভ্য মীনারাজার গৃহে সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

একদা মীনারাজের পাচক অনুপস্থিত থাকায় ঐ রাজপুতমহিলা পাক কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং মীনারাজ সেই সুপক্ক দ্রব্যাদি আহার করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া পাচিকাকে নিজ সমীপে আহ্বান করত তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। রাজমহিষী মীনারাজ সমীপে কিছুই গোপন করিলেন না। তিনি তাঁহার দুরবস্থার সকল কথাই প্রকাশ করিয়া কহিলেন। মীনারাজ সেই পরিচয়ে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং তদবধি নরবার রাজমহিষীও তৎপুত্রকে ভগিনী ও ভাগিনেয়রূপে সযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই বালকের নাম চোল রায়। বালক বয়োবৃদ্ধিসহকারে নিজ সদ্ব্যবহার দ্বারা মীনারাজ ও অপরাপর পৌরজনের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে তুয়ারবংশীয় নৃপতিবিশেষ উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য রাজবর্গ ঐ তুয়ার বংশীয় দিল্লীশ্বরকে রাজাধিরাজ বলিয়া পূজা করিতেন, এবং তাঁহার তুষ্টির জন্য অনেকে কর প্রদানও করিতেন। মীনা রাজও যথাযোগ্য কর প্রদানপূর্ব্বক সুখে রাজ্য ভোগ করিতেন। একদা মীনারাজ স্বয়ং দিল্লী গমনে অসমর্থ হওয়ায় রাজকর প্রদানের জন্য প্রিয়তম চোল রায়কে প্রেরণ করিলেন।

মীনরাজ কি অশুভক্ষণেই কচ্বহ যুবক চোল রায়কে দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নিমেষের জন্যও তাঁহার মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় নাই যে, কিছু দিন পরে ঐ যুবককর্ত্তৃক তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। তিনি দুগ্ধ দিয়া কাল সর্প পোষণ করিয়াছিলেন! তিনি অমৃতভ্রমে কালকূট পান করিয়াছিলেন!

কচ্বহ-যুবক একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল দিল্লীনগরে মীনারাজের প্রতিনিধিস্বরূপ বাস করেন। এই সময়ে তিনি খোগংএর সিংহাসনের প্রতি লোলুপ হন। মীনারাজ যে তাঁহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছেন তাহা একবারে বিস্মৃত হইয়া, তিনি তাঁহার দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কতকগুলি স্বজাতীয় উদ্ধতস্বভাব সহচর সংগ্রহ করেন। এই পররাজ্যাপহারক দস্যু চোল রায় সেই সকল অনুচর সমভিব্যাহারে খোগং নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। চোল রায়ের দলবল দেখিয়াও মীনারাজের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। সৎকর্ম্মের সহচর সচরাচর মিলিয়া উঠে

না, কিন্তু দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে লোকের অভাব নাই। মীনারাজের কুলাচার্য্য আসিয়া অকৃতজ্ঞ চোল রায়ের মন্ত্রী হইল। তাহারই—সেই মহাপাষণ্ডেরই—মন্ত্রণায় দিবালীর দিন সেই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার সংকল্প স্থির হইল। প্রাচীন প্রথানুসারে রলুন্সিরাজ দিবালীপর্ব্বোপলক্ষে স্বগণসমভিব্যাহারে এক সরোবরে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি ভ্রমেও জানিতে পারেন নাই যে তাঁহার জন্মের মত জলক্রীড়া শেষ হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এদিকে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া অকৃতজ্ঞ কচ্‌বহ যুবক স্বগণ-সমভিব্যাহারে ঐ সরোবরে সমুপস্থিত হইলেন এবং হঠাৎ আক্রমণ পূর্ব্বক মীনারাজকে সবংশে নির্ব্বংশ করিয়া খোগং নগর অধিকার করিলেন। বিশ্বাসঘাতক কুলাচার্য্যও তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। "যে ব্যক্তি একজন উপকারকের প্রতি অবিশ্বাসী হইতে পারে, সে অপরের নিকট কোন অংশেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।" এই কথা বলিয়া চোল রায় স্বহস্তে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। আমরা বলি কুলাচার্য্য মহাশয়ের উপযুক্ত পুরস্কার হইয়াছিল। তিনি যেমন নরাধম, তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে পরিণামে বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। সহস্র সৎকর্ম্মেও এ কলঙ্ক-টীকা অপনীত হইবার নহে। চোলরায় এবম্প্রকারে কলঙ্ক-ডালি শিরে ধারণ করিয়া ঢুণ্ডার রাজ্যের সূত্রপাত করিলেন। ঢুণ্ডারের অধিকাংশ স্বস্ব প্রধান মীনাজাতীয় অধ্যক্ষের অধীন ছিল, খোগং পতনে সমগ্র রাজ্যের মূলভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল।

বর্ত্তমান জয়পুর নগরের প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে বানগঙ্গা নদীতটে দেওসা নগরে একজন বগুজর বংশীয় রাজপুত রাজা রাজ্য করিতেন। তাঁহার একমাত্র দুহিতা ছিল, চোলরায় তাঁহার পাণিগ্রহণ প্রার্থনায় তথায় উপস্থিত হইলেন। দেওসারাজ এই বলিয়া চোল রায়ের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন, 'আমরা উভয়েই সূর্য্যবংশীয়, এবং অদ্যাপি এক শত পুরুষ অতিক্রান্ত হয় নাই। অতএব এবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। আমি এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম অনুমোদন করিতে পারি না'। * পরিশেষে বিচার দ্বারা শাস্ত্র বি-

* বগুজর বংশীয়েরা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র লবের বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়। বগুজর কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে রাম হইতে বিক্রম পর্য্যন্ত ছাপ্পান্ন পুরুষ এবং নল হইতে চোল রায় পর্য্যন্ত তেত্রিশ পুরুষ বলিয়া লিখিত আছে। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, ৩৫১ সংবৎ অর্থাৎ বিক্রমের ৩৫১ বৎসর পরে নলরাজ নিষধ নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষণে দেখা উচিত যে বিক্রম হইতে নল পর্য্যন্ত কয় পুরুষ হইতে পারে। যদি প্রত্যেক রাজার রাজত্ব কালের গড়্পড়্তা বাইশ বৎসর ধরা যায় (এই রূপই প্রায় সমস্ত রাজ্যে ধরা হইয়া থাকে)

রোধিতার অপনয়ন হইলে দেওসাধিপতি চোল রায়ের সহিত আপনার রূপলাবণ্য-বতী কন্যার বিবাহ দিলেন, এবং পুত্র সন্তানের অভাবপ্রযুক্ত জামাতাকে রাজ্য পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন। এক্ষণে চোল রায় খোগং ও দেওসা উভয় সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। সুতরাং তাঁহার দল-বলও অত্যন্ত প্রবল হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যলাভ লালসা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে মীনাজাতীয় সেরো সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ নাথুরাও মৌচ নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়া সুখে রাজ্য করিতেন। তৎপ্রতি চোল রায়ের লোভ পড়িল। দলবলসহ মৌচ নগর আক্রমণ করিয়া জয়ী হইলেন, এবং খোগং অপেক্ষা মৌচ নগরের সমধিক শোভা দর্শনে তথায় রা-জপাট সংস্থাপন করিলেন, এবং পূর্ব্ব-পুরুষ পুরুষ-প্রধান রামচন্দ্রের নামে ঐ নগরের নাম রামগড় রাখিলেন। এক্ষণে চোল রায় চুণ্ডার রাজ্যের মধ্যে খোগং, দেওসা ও মৌচপ্রদেশের অধিকারী হইলেন।

ইহার পর চোলরায় আজমীরাধিপ-তির রূপলাবণ্যবতী দুহিতা মরোণীর পা-ণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পত্নী এ সময়ে জীবিতা ছিলেন কিনা তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। আমরা তাঁহার গর্ভস্থ কোন সন্তানের ও পরিচয় পাই নাই। একদা চোল রায় মরোণী মহিলাসহ জম্বাহী-মাতা দেবীর পূজাবন্দ-নাদি করিতে গমন করিয়া ছিলেন। মীনা-জাতিদিগের তাঁহার উপর জাতক্রোধ ছিল তাহারা উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া এ-কাদশ সহস্র সৈন্য সমবেত করিয়াছিল। তাহারা সকলে প্রত্যাগমন কালে চোল রায়কে আক্রমণ করিল। তাঁহার সহিত অধিক সৈন্যসামন্ত ছিলনা, তথাপি প-লায়নপরাঙ্মুখ হইয়া রাজপুতবীর্য্য শত্রু-দলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। শত্রুশোণিতে সমরাঙ্গন প্লা-বিত করিয়া অবশেষে তাহাদের হস্তেই জীবনলীলা সমাপন করিলেন। মরোণী স্বামীশোকে নিতান্ত ক্লান্তা হইয়া অব-শিষ্ট সহচরগণ সমভিব্যাহারে স্বদেশে পলায়ন করিলেন। তৎকালে তিনি অ-ন্তর্বত্নী ছিলেন। কনখল নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চুণ্ডারদেশের অনেক অংশ মীনাদিগের হস্ত হইতে অপহরণ করেন। তাঁহার পুত্র মৈদল রাও পিতৃদৃষ্টান্তানুসারে চুণ্ডারের অনেক অংশ হস্তান্তর করেন। মীনাজা-তীয় প্রধান সম্প্রদায়ের নাম সুসাবত. ঐ সুসাবতসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ভট্টরাও অম্বরে বাস করিতেন, তিনিই মীনাজাতীয় সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। মৈদলরাও তাঁ-

---

তাহাহইলে ষোড়শ পুরুষ মাত্র ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ৫৬+১৬+৩৩=১০৫ পুরুষ হইল। রাম হইতে চোল রায় পর্য্যন্ত একশত পাঁচ পুরুষ ব্রুণ্ডজর বংশে বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

হাকে পরাজিত করিয়া অম্বর অধিকার করেন এবং মীনাজাতীয় মন্দল সম্প্রদয়কে পরাভূত করিয়া গাটুরঘাটী প্রদেশ নিজ অধিকারে সংযোজিত করিলেন।

মৈদলরাও পরলোক গমন করিলে পর তদীয়পুত্র হুনদেব সিংহাসনে আরোহন করিলেন। তিনিও পিতৃপুরুষদিগের দৃষ্টান্তানুসারে অনেক মীনাসম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ করিলেন। তদীয় পুত্র কুন্তলদেব রাজধানীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া ছিলেন। তিনি ভট্টবর প্রদেশের চোহান বংশীয় নরপতির কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষে তথায় গমন করিতে উদ্যত হইলে তাহার মীনা প্রজারা একবাক্যে কহিল যে অধিকারের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে নহবৎ প্রভৃতি রাজচিহ্ন তাহাদের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। কুন্তলদেব এতদ্বাক্যে অস্বীকৃত হইলে একটি সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে মীনা জাতীর সমগ্র ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই সময় হইতে সমগ্র চুণ্ডার রাজ্য মধ্যে চোলরায়ের বংশীয়দিগের আর দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দী রহিল না। (ক্রমশঃ।)

অমৃতে গরল

জগতের নিয়ম অতি অদ্ভূত। যাহা যত আবশ্যকীয় সংসারে তাহার তত অনাদর, আর যাহা যত অপ্রয়োজনীয় তাহার মূল্য ও আদর তত অধিক। মৃত্তিকা তৃণ লৌহ এবং হীরক, কাচ ও মূল্যবান প্রস্তর তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা মুহূর্ত্ত জন্য মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিতে পারি না, ভূমি আমাদের আধার, অবলম্বন ও চিরসঙ্গী। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া মানব গণ আজীবন ভূমিতেই বিচরণ করে, গৃহ নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া আহার্য্য বস্তুর উৎপাদনাদি জীবন ধারণোপযোগী সমস্তই মৃত্তিকায় সম্পন্ন হয়, অথচ মৃত্তিকার কত অনাদর। ঘৃণনীয় বস্তু সকলের উপমেয় ' মাটি বা কাদা ' অনাদৃত পদার্থ ' লোষ্ট্র '। প্রকৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্তিকাকে পদ মর্দ্দিত ও অনাদৃত হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। লৌহ আর একটি উপকারী বস্তু। যে গৃহে বসিয়া আছি তাহা প্রস্তুত করিতে, যে অন্নে শরীর রক্ষা করিতেছি তাহা ভূমি হইতে উৎপাদন করিতে, যাহাতে আত্মরক্ষা হয় এমন অস্ত্র গঠনে, এমন কি যে লেখনীটি হস্তে লইয়া লিখিতেছি, যে বাক্সটির উপর কাগজ রাখিয়াছি, যে কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছি এ সমস্ত বস্তু প্রয়োজনোপযোগী করিতে লৌহই প্রধান সাধন। অথচ লৌহের মূল্য অল্প, লৌহ

অপরিস্কৃত ও অনাদৃত। কুরূপ পুরুষ 'লোহার কার্ত্তিক!' কঠিন হৃদয় 'লৌহ হৃদয়!' এইরূপ তৃণ ও আমাদের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের অবলম্বন হইয়া ও অনাদৃত ও অবমানিত হইয়া আছে। তৃণ এত সামান্য যে যাহা আমরা সামান্য বোধ করি তাতাহাই তৃণ। আবার অন্যদিকে হীরকাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। হীরক দুষ্প্রাপ্য ও বহু মূল্য। বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ভিন্ন তাহার গুণ নাই, কাচ কাটা ভিন্ন কার্য্য নাই; অথচ সম্রাটগণ পরম যত্নে তাহা মস্তকে ধারণ করেন। কাচ এবং মরকতাদি প্রস্তরের ও সেই অবস্থা।

অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর অনাদর দেখিয়া চিন্তাশীল চিত্ত ব্যথিত হয়, এইমাত্র। তাহাতে সমস্ত জগতের ক্লেশ হয় না। কিন্তু অমৃতে গরল উৎপাদন হইলে তাহাতে পৃথিবীর সকলেরই ক্ষোভ ও পরিতাপের কারণ হয়। কবিগণ প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্পের সৌন্দর্য্যে ও সুগন্ধে মোহিত হইয়া সরল হৃদয়া গুণবতী ললনার হসিত. মুখশ্রীর সহিত তুলনা করেন, আবার বৃক্ষে ও বৃন্তে কণ্টক নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয় পরিতপ্ত হয়। সৌদামিনীর ভুবনমোহিনী রূপরাশি মেঘ মধ্যে লীন হইলে, পূর্ণচন্দ্র রাহুগ্রস্ত দেখিলে, অথবা সবুজ শোভিত ক্ষেত্র সকল নৈদাঘ তাপে দগ্ধ ও হতশ্রী হইয়া গেলে তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়। প্রাবৃটের পূর্ণ সরোবর হইতে জল কমিয়া গেলে তিনি মনে কষ্ট অনুভব করেন, শিশিরে বৃক্ষসকল পত্রহীন হইলে তাঁহার মন ক্লিষ্ট হয়। গাঢ় অন্ধকার রজনীর অথবা গভীর গিরিগহ্বরের গম্ভীর ভাব যখন তাঁহার হৃদয়কে উন্নত চিন্তায় নিমগ্ন করে, তখন তিনি দূর নিকুঞ্জের কোকিল কুজনে কর্ণপাত করিতে অনিচ্ছুক হন, এবং প্রকৃতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থায় নূতন নূতন সুখ ও বিবিধ প্রকার ক্লেশ অনুভব করেন। তিনি কবি, বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ উভয়ই তাঁহার ক্রীড়ার নিকেতন। তাঁহার চিন্তা ও ভাব সকল সামান্য বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কাব্যের সাহায্য না লইয়া কবির প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করিয়া, এই গদ্যময় পৃথিবীর কার্য্যকলাপের প্রত্যেক অধ্যায় পদ্যময় মহাকাব্য অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ, অনেক আমোদজনক ও দুঃখ জনক বিষয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে একথা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই সুখাগার সংসারামৃতে কত গরল আছে তাহার পরিমাণ করিয়া উঠা কঠিন। কিন্তু ভ্রান্ত মানব আজীবন সে গরলই অমৃত বলিয়া সেবন করে।

দম্পতী অপত্য লালসায় সর্ব্বদা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন। দয়াময় পরমেশ্বর সদয় হইয়া একটি পুত্র সন্তান প্রদান করিলেন। বালকটি এক দুই তিন দিন করিয়া বাড়িতে লাগিল। তাহার শান্তোজ্জ্বল রূপরাশি, সুধাময়ী দৃষ্টি এবং

বিশ্ববিমোহন সহাস্য বদন জনক জননীকে প্রফুল্ল করিতে লাগিল। প্রস্ফুটোন্মুখ পঙ্কজের মনোহারিণী শোভার ন্যায় শোভমান বদনকমলে, সুকোমল পলাসপুষ্পের পলাসবৎ রক্তিমাভ অধরে যখন মৃদু মধুর আধ আধ মা, বা প্রভৃতি সুধাকণা প্রকাশ পাইতে লাগিল তখন তাহার ভাগ্যবতী জননী ও সৌভাগ্যশালী জনক যে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন তাহা অভিনব কুমারলাভকারী ব্যক্তিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন; আর ঈশ্বর যাহাদিগকে সেই অপার্থীব রত্নে বঞ্চিত করিয়াছেন কল্পনার অতুল্য তুলীতে সেই চিত্র চিত্রিত করিয়া তাঁহারা আরও অধিক বুঝিতে পারেন। সেই পার্থিব স্বর্গ, সেই নন্দন কানন, সেই জীবন-পারিজাত তাঁহাদের জীবনের অমৃতসিন্ধু,—অনন্ত, স্রোতময় এবং নিত্য। কিন্তু হায়! সেই অমৃতসমুদ্র মথিত হইয়া যে গরল উঠিতে পারে সংসারসার মানবগণের তাহা কি মনে হয়? নির্দ্দয় কালকীট তাঁহাদের হৃদয়নিহীত ঐ কুসুমটির বৃন্ত ছিন্ন করিলে তাঁহাদের যে কি অবস্থা হইবে তাহা কি তাঁহারা স্মরণ করেন? লোকে মক্ষিকার বৃথা দোষ দেয়, মক্ষিকা অমৃতভাণ্ডে অন্ধের ন্যায় প্রবেশ করিয়া লোভজন্য আত্মজীবন বিনাশ করে, মানবগণ কি তাহা করে না? সংসার সেই অমৃতভাণ্ড, ইহাতে যে প্রবেশ করিয়াছে তাহারই জীবন মোহে পর্য্যবসিত হইবে।

আবার দেখ, সেই তনয়টি বড় হইতে লাগিল। জ্ঞান ও ধর্ম্মে তাহার আত্মা উন্নত হইল। সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপন জনক জননীর সেবা করিতে লাগিল। তাঁহাদের হৃদয়ে কেমন সুখ! 'বালভাষিত' ও 'পুত্রপণ্ডিত' উভয়ই অমৃত। কিন্তু অমৃতেও গরল আছে। হঠাৎ তাহার হৃদয়ে দুষ্প্রবৃত্তি ও দুরাশার সঞ্চার হইল। পিতৃভক্তি হৃদয়ে আর স্থান পায়না, কৃতজ্ঞতার ভাব আর মনে হয় না। এই রূপে, পাপাত্মা আরংজিব যখন নিশীথ সময়ে প্রজাবৎসল শান্তস্বভাব ধার্ম্মিক সম্রাট আপন জনক বৃদ্ধ সাজেহানকে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের জন্য কারারুদ্ধ করিয়াছিল তখন কি পিতৃহৃদয়ের অমৃতসমুদ্রে গরল উত্থিত হয় নাই? যখন ভ্রান্তবুদ্ধি উদ্ধতস্বভাব পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্য, দয়া, ধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, মমতা বিসর্জ্জন দিয়া আপন জননীর শিরে কুঠারাঘাত করিয়াছিল; যখন পাপপরায়ণ রোমসম্রাট অজাতশ্মশ্রু অনাগতবুদ্ধি বালক রাজ্যলালসায় আপন জননীর শিরচ্ছেদ করিয়াছিল তখন কি অমৃতে গরল প্রকাশ পায় নাই? যেমন প্রদীপের এক পিঠ আলো, তেমনই জগতের একদিকে অমৃত অন্য দিকে গরল। এই কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাওয়া অসাধ্য। বালক বালিকাগণ পিতা মাতার স্নেহসাগরে ভাষমান হইয়া যে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করে তাহাও সর্ব্বদা অবিকৃত নয়। জগ-

ত্তের এই অখণ্ডনীয় নিয়মের সত্যতাপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ কতশত বালক বালিকা যে অসময়ে সংসারানলের অসহ্য তাপ তাপিত হইয়াছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বিমাতার বিপরীত মন্ত্রণায় ভক্তিভাজন জনকের আজ্ঞাক্রমে নব যৌবনের প্রথম সময়, সুখের প্রত্যুষকাল, শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত মহারণ্যে যাপন করিলেন। যে পিতা জ্ঞানোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তনয়ের হৃদয় কন্দর আলোকিত করিবেন, ধর্ম্মবিষয় শিক্ষাদান করিয়া পার্থিব অমৃত পান করাইবেন তিনি কত সময়ে আপন সন্তানদিগকে দুরাশামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এবং অসৎবিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের সুখামৃতে গরল উৎপাদন করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে দুর্য্যোধনাদির পতন এবং হস্তীনার রাজবংশ বিনাশ এ সমস্তই ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রণার বিষময় ফল। সংসার এমনই আশ্চর্য্যস্থান যে ইহাতে জননী কর্ত্তৃক পুত্রহত্যাও অনেক সময় প্রত্যক্ষ হয়।

বাল্যকাল অজ্ঞানাবস্থায় অতিবাহিত হয়। যদি বল "বালক সুখ দুঃখ কিছুই বুঝিতে পারে না, ক্ষুধাপাইলে ক্রন্দন করে, নতুবা অন্যের দুঃখের সময় ও হাসিতে থাকে। সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী" তাহা হইলে মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ থাকে না। অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের ন্যায় বৃদ্ধের জ্ঞান অপেক্ষাকৃত স্থির, শান্ত এবং সুন্দর হইলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী বলিয়া এবং রক্তিমাভ মেঘমিশ্র কিরণ মালারন্যায় সেই অভিজ্ঞতা চিন্তামিশ্র বলিয়া সুখকর নহে। মানব জীবনে যদি সুখের সময় থাকে তবে সে যৌবনকাল। যৌবনই মানব জীবনের অমৃত। যখন জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল থাকে, মনোবৃত্তি গুলি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, মধ্যাহ্নের প্রকৃতির ন্যায় জীবনের চতুষ্পার্শ্ব উজ্জ্বল বোধ হয় সেই সময়ই সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সময়। শরীর বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম, মন সতেজ ও প্রফুল্ল, আশা অনন্ত, সকলই মনোহর, সুতরাং মানব জীবনে যৌবন সুখের কাল। যুবক যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে, অসাধ্য সাধন করিতে পারে সুতরাং সে সুখী, তাহার জীবন অমৃতময়।

কিন্তু যে কবি প্রমিথিয়সের ও ইপিমিথিয়সের সহিত মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় করিয়াছেন, যিনি আদমের স্ত্রী ইভের প্রলোভনে আদমের সহিত পৃথিবীস্থ সকলের জীবনের পাপ ও দুঃখ আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানিতেন যৌবনামৃতেও গরল আছে। যেখানে যত সুখ সেখানে তত দুঃখ, যত হাসি তত কান্না, অমৃত যত গরলও তত। যৌবনে সৎপ্রবৃত্তি সতেজ হয় সত্য, কিন্তু কুপ্রবৃত্তি নিদ্রিত থাকে না। পাপপথ সহজ, সেদিকের আকর্ষণও অধিক। এই জন্য যৌবনে অধিকাংশ লোকের চিত্ত কলুষিত হয়। গ্রীসের রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত

পেরিক্লিশ এল্‌সিবাইডেস নামক একটি রূপবান ও বুদ্ধিমান বালককে প্রতিপালন করেন। তাঁহাকে শিক্ষিত করিতে সক্রেটিশের বিজ্ঞান বুদ্ধি ও তাঁহার রাজনীতি শাস্ত্র উভয় মিলিত হইয়াছিল। এল্‌সিবাইডেসের ন্যায় বীর সদ্বক্তা, সুশ্রী, সুচতুর পুরুষ গ্রীসে আর ছিল না। তিনি যেখানে যাইতেন সেইখানেই দেবোপম পূজালাভ করিতেন। তাহার সুখ সরোবর পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। দেশশুদ্ধ সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু সে সুখের সাগরে তরঙ্গ বাঁধিল, সে চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইল, সে সুখতরণী ডুবিয়া গেল। যে বুদ্ধি সুপথে ছিল তাহা কুপথে ধাবিত হইল; তিনি আপন দেশের হিতব্রত পরিত্যাগ করিয়া স্বজাতীয় সকলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। পরিশেষে সেই গৌরবও পাপময় জীবন, কলঙ্কিত পূর্ণচন্দ্র ফ্রিজিয়ার ক্ষুদ্র পল্লীতে হৃদয়বিদারিণী অবস্থায় পর্য্যবসিত হইল। আথেন্সবাসী টাইমন যে ভাবে মনুষ্যগণের বন্ধু হইয়াও পরিশেষে তাহাদের শত্রু হইয়াছিলেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। বাইরণের জীবন আর একটি দৃষ্টান্ত। এইরূপে মানবজীবনের বসন্ত কালেও দুঃখশিশিরসম্পাত সম্ভবপর। সেই পবিত্র অমৃতেও গরল উঠে।

স্বামী পুত্র কন্যাদি পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে যে কিছু সুখ কল্পনা করা যায় সকলই সম্ভোগ করিলেন। সম্মুখে যোগ্য পুত্র তাঁহার জীবনের আশ্রয়স্বরূপ, তাঁহার সমস্ত আশার সজীব প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। কিন্তু সহসা সেই সুখের আকাশে কাল মেঘ উঠিল চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া, মৃত্যু ভীষণবেশে শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দণ্ডচালনা করিতে লাগিল। পূর্ব্ব স্মৃতি অভ্রান্ত দর্পণের ন্যায় জীবনের অনুষ্ঠিত পাপকার্য্য গুলি একটি একটি করিয়া নয়নের সম্মুখে উপস্থিত করিতে লাগিল। ওঃ! কি শোচনীয় অবস্থা! জীবনের সহায়, চিরবিশ্বাসী স্মৃতিশক্তির কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা, কি ভয়ঙ্কর কার্য্য। যে জীবন এতকাল শারদীয় রজনীর ন্যায় শরৎসখীর কৌমুদী সম্ভোগ করিতেছিল, নিদাঘের পবনমাধুর্য্যে, বসন্তের কুসুমসুষমায় প্রীত হইতেছিল তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তাহার জীবনামৃত গরলময় হইল। 'উল্‌সি' 'ক্রমোয়েল' 'ধৃতরাষ্ট্র' প্রভৃতির পরিণাম এইরূপই হইয়াছিল।

সমুদ্র মধ্যদিয়া অর্ণবারোহণে গমন সময়ে অনুকূল বায়ুতে যেরূপ সহায়তা করে এই সংসার সমুদ্রে প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীর পক্ষে অনুকূল স্থিরপ্রসাদ স্বামী ও তদ্রূপ। প্রাণেশ্বর সরল ও সদয় হইলে স্ত্রীর যে কত সুখ তাহা প্রতিকূল স্বামীর সতী স্ত্রী ভিন্ন অন্যের বুদ্ধিগত হইবার নয়। যাহার মর্ম্মস্থলে তদভাবজনিত ক্লেশ অনুভূত হইয়াছে সে ভিন্ন অন্যে কেমন

করিয়া বুঝিবে ? যে চিরকাল অনুকূল স্বামীর স্নেহ-সুখ অনুভব করে, স্বামী প্রতিকূল হইলে যে তাহার কত ক্লেশ হইত সে তাহা বুঝিতে পারে না। সুখীর সুখ বুঝিতে দুঃখীর কল্পনাই উপযুক্ত মধ্যস্থ।

যে পুণ্যশীল মহাত্মা সুন্দরী সতী সহধর্ম্মিণীর সারল্যশোভিত হৃদয়রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি প্রিয়বাদিনী ও প্রিয়কারিণী প্রণয়িণীর শরীরের ও মনের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত থাকেন, যাঁহার সুখ বিশুদ্ধ ও হৃদয় পবিত্র, তাঁহার কি দেবজনকমনীয় অবস্থা। প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীর অবিরামবাহিনী ধারাসকল তমালতালীবিরাজিত লবঙ্গলতাপরিবেস্টিত নিভৃত নিকুঞ্জ প্রফুল্ল করিয়া যেমন তরতর নাদে প্রবাহিত হয়,সেই ললনার প্রণয়ধারা প্রবলকান্তের শান্তি নিকেতন হৃদয় তেমনই স্নিগ্ধ ও উৎফুল্ল করিয়া অবিরামধারায় বহিতে থাকে। প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় অপার্থিব মহারত্ন। সেইরত্ন রাজার গৃহেও দুর্লভ,অথচ তাহাতে সময়ে সময়ে অতি সামান্য পর্ণকুটীরও আলোকিত হয়। জায়া পতি উভয়ে উভয়ের সর্ব্বস্ব, উভয়ে উভয়ের শিরোরত্ন। "ভক্তস্য কিমপিদ্রব্যং যোহহি যস্য প্রিয়োজনঃ।" যখন নবীন প্রণয়ের প্রমত্ত করমাধুর্য্য নবপরিণীত দম্পতীকে পৃথিবীতে স্বর্গসুখ প্রদান করে, যখন স্বাতিনক্ষত্রের বারিবিন্দুবৎ সামান্য কথা গুলিও পরস্পরের নিকট প্রত্যেক শব্দ মুল্যবান করিয়া তুলে, তখন কি অনির্ব্বচনীয় সুখ। প্রিয়তমার শরীর স্পর্শে প্রেমবিহ্বল রামচন্দ্র যেমন বলিয়াছিলেন—

"বিনিশ্চেতুং শক্যোন সুখমিতিবা দুঃখমিতিবা
প্রবোধং নিদ্রাবা কিমু বিষবিসর্পং কিমুমদং।
তবস্পর্শে স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ।"

পবিত্র প্রণয়ী অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে সেইরূপ ভাব সর্ব্বদাই অনুভব করেন।

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু য
দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যোরসঃ
কালেনাবরণত্যয়া পরিণতে যৎস্নেহসারেস্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হিতৎপ্রাপ্যতে।"

এই দেবদুর্লভ প্রণয় কি অনির্ব্বচনীয় পদার্থ! প্রণয়ীযুগলের শরীর ভিন্ন হইয়াও মনের মিলনে দুইকে কেমন এক করিয়া ফেলে! পরস্পরের অস্তিত্ব কেমন পরস্পরে লীন! যেমন তারসংযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের একটি তার করস্পৃষ্ট হইলে সমীপস্থ অপরটিও ধ্বনিত হইয়া উঠে, শোক, দুঃখ, সুখ, সম্ভোগ, হর্ষ, বিষাদ, আমোদ, প্রমোদ প্রভৃতি সেইরূপ উভয়ের হৃদয় এক ভাবে যুগপৎ ব্যাপ্ত করে। বিদ্যা-

ত্তের গতি, চক্ষুর নিমেষ, কল্পনার রথ কিছুই তত দ্রুত নয়। এরূপ সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কাহার স্বর্গ লাভের বাসনা হয়? পার্থিবসুখের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া কে আর অন্য বিষয় মনে করে? যখন প্রণয়ের গম্ভীর নদী প্রশান্তভাবে প্রবাহিত হয়, তখন সৈকতস্থ চিন্তাকণা সকল কেন না বিধৌত ও বিদূরিত হইবে? সেই আতটপূর্ণা কল্লোলিনীর সৌম্যমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া কে তাহায় তটাভিঘাতিনী মনে করে?

কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে সে নদীতেও তরঙ্গ আছে, সে আকাশেও বজ্র আছে, সে অমৃতেও গরল আছে।

মহারাজ রামচন্দ্র পার্থিব সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াও আপন প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পত্নীর বিরহযন্ত্রণায় কত দগ্ধবিদগ্ধ হইয়াছিলেন, রোমাধিরাজ টাইটস্‌ও লোকরঞ্জনানুরোধে প্রিয়া ইহুদিতনয়াকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া অপরিসীম কষ্ট পাইয়াছিলেন।

প্রণয়ের রম্যকাননের পবিত্রপুষ্প সুন্দর হইলেও অনিত্য; সুগন্ধি হইলেও কণ্টকযুক্ত, মধুময় হইলেও বিষমিশ্র। সন্দেহ ও ঈর্ষার বায়ুতে অনবরতঃ আন্দোলিত এবং বিরহাদি নির্ম্মম কীট সকলের ভীষণ দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া সেই কুসুমগুলি অকালে শুষ্ক হইয়া যায়। আবিলার্ডের জন্য সমস্ত সুখ উৎসর্গ করিয়া ইলাইজার কি অবস্থা হইয়াছিল। অথেলোর হৃদয়শশী ডেসিডিমোনা কিরূপে অস্তমিত হইয়াছিল, এবং রোমিও ও জুলিয়েট্‌ কিরূপ অবস্থায় জীবনের অবসান করেন পাঠক মনে করিয়া দেখুন। অমৃতের প্রতিবিন্দুই গরলমিশ্র।

মৈসরললনা ক্লিয়োপেট্রার পঙ্কিলজীবনসরোবরের অচিরস্থায়ী সুখকমল শীঘ্রই পর্য্যুসিত হইয়াছিল; রাজ্ঞী মেরীও আপাতমধুর পরিণামবিষে জীবন উৎসর্গ করিয়া পৃথিবীর নিকট অকালে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একদিকে পবিত্র আদর্শ পতিব্রতা পদ্মিনী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে সেরখাঁ আফগানের সুন্দরী ললনা স্বামীবধের কারণ হইয়া বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিলেন। কিন্তু যে যেরূপ ভাবেই অমৃতপান করুন না কেন পরিণামবিষ সকলের ভাগ্যেই ঘটিল!

দৃষ্টান্তবাহুল্যে প্রয়োজন নাই। যে সকল শোচনীয় অবস্থা প্রতিদিন আমাদের নয়নগোচর হইতেছে, তাহাতে অমৃতে গরল কে না দেখিতে পান? বালবিধবার বারিশূন্য মরুময়জীবনে সুখবারির অভাবে হৃদয়ভেদী ত্রাহি ত্রাহি শব্দে কাহার না চিত্ত ব্যথিত হয়। সেই অতুল্য বেলপুষ্প নিদাঘরবির প্রচণ্ডকিরণে শুষ্ক দেখিয়া কে না ক্লেশ অনুভব করে। জীবনের সুখপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া যে সমস্ত হতভাগ্য যুবক উন্মত্তবৎ দেশে দেশে বিচরণ করে, তাহাদের সুখময় অতীতজীবনের তুলনায় সেই ভয়াবহ সময় কি গরলময় নয়?

কালের কঠোরশাসনে জীবনবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেলে প্রণয়ীযুগলমধ্যে যে জীবিত থাকে তাহার অবস্থা যত কষ্টকর, উভয়ে জীবিত থাকার সময় একে অন্যকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও অনাদৃত হইলে তাহা হইতেও অধিক কষ্ট। সে যন্ত্রণা অসহ্য,—ভীষণ নরকাগ্নি। শিখণ্ডক নামক আপন প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই হতভাগিনীর হৃদয়ে যত না কষ্ট হইয়াছিল, এণ্টনিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অক্টেভিয়ার কষ্ট তদপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। হেলেনের জগদ্বিখ্যাত রূপমাধুরীতে মেনিলসের জীবন যে পরিমাণে মধুময় হইয়াছিল, পেরিসের আচরণে তাহার সহিত তুলনায় শতগুণাধিক ক্লেশ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। জীবনের সমস্ত সুখ উৎসর্গ করিয়া যাহাকে আপন বলিয়া উপাসনা করা যায়, যে অভীষ্ট দেবতার অনুগ্রহের করে আত্মসমর্পণ করিয়াও তৃপ্তি জন্মেনা এবং যাহার প্রসাদ লাভ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়, সে অকারণে অনাদর করিয়া অন্যের হইলে, উঃ কি ভয়ানক পরিতাপের বিষয় হয়!

"হায়! মরমের কথা আমার স্নেহের লতা
পতিভাবে অন্যজনে প্রাণনাথ বলিল
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।"

সংসারের এই অমৃতময় অংশের এক পার্শ্বে এইরূপ ভয়ানক গরল, অন্য পার্শ্বেও হলাহল।

"সখি! কি কব মরম কথা।
প্রণয় ভাবিয়া পাষাণ চাপিয়া
মরমে পাইনু ব্যথা।
কুসুম কলিকা জিনিয়া বালিকা
ছিলাম যখন সই
প্রণয় কেমন জানি নাই আমি
শৈশব আমোদ বই।
মধুকর ভ্রমে বিকাশিনু দল
ভাসিয়া যৌবন জলে
নিদারুণ কীট পশিয়া মরমে
শুকাল বিকচ দলে।
সখি! যায় প্রাণ যায় দংশন জ্বালায়
বাঁচিনে পরাণে আর
জীবন মৃণাল এই ছুরিকায়
কাটিব করেছি সার।"

দুই পার্শ্বে বিষ, মধ্যস্থলে যে অমৃত তাহা নির্ব্বিঘ্নে কে কতক্ষণ পান করিতে পায়? হতাশের আক্ষেপ, বিরহীর বিলাপ, নিরাশ প্রণয়ের আর্ত্তনাদ, বিধবার মর্ম্মঘাতি শোকবাক্য, অনাদৃত প্রণয়ীর পরিণাম, এ সমস্তই হলাহল। কোন্ সৌভাগ্যশীল পুরুষ অথবা সৌভাগ্যশালিনী রমণী এই সমস্ত যন্ত্রণার একটি দ্বারাও পীড়িত না হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে পারেন? দূর হইতে এই রাজ্য শান্তি নিকেতন বোধ হয় সত্য, কিন্তু ঈর্ষা, দ্বেষ, অসন্তুষ্টি, সন্দেহ, ভয়, বিশ্বাসঘাতকতা, কলহ প্রভৃতিতে এ রাজ্য এত উচ্ছৃঙ্খল, যে অনেকের অদৃষ্টে প্রণয়রাজ্যে বিশুদ্ধ শান্তি সুখ সম্ভবে না। এ অমৃতে হলাহল।

অন্তরের জ্বালা নিবারণ করিতে সৎ-বন্ধুর আশ্রয় লইলাম। ঝটিকার সময় নৌকা যেমন 'কোল' প্রাপ্তে নিরাপদ হয়, প্রবল বাত্যায় আন্দোলিত সংসার সাগরে বন্ধুর আশ্রয়ও তেমনই নিরাপদ স্থান। যখন হৃদয় নানা কারণে উত্যক্ত ও উত্তপ্ত, তখন মৃদুমন্দসমীরণবাহি পুষ্প সৌরভের মধুরতায় এবং মলয়ানিলের শৈত্যে বন্ধুর বচনপরম্পরা হৃদয় স্নিগ্ধ করিল। মাতা যাহা পারেন নাই, পিতা যাহা করেন নাই, নিরূপম ভ্রাতৃস্নেহের মধুময় ভাবেও যাহা সাধিত হয় নাই, প্রণয়িণীর প্রণয়োপহারেও যাহা লাভ করা যায় নাই, বন্ধুর সুধাময় বচন মাধুর্য্যে তাহাই সম্পাদিত হইল। সে সুকোমল বাহু যুগলের উষ্ণভাবের সুশীতল আলিঙ্গনে শরীর শীতল হইয়া গেল। "দরিতাম্বন-বঞ্চিতং নৃণাং, নখলু প্রেমচলং সুহৃজ্জনে।" হৃদয় সখার প্রেমালিঙ্গন জগতে অতুল্য পদার্থ। সুহৃদের তুলনা নাই। চক্ষু যাহাকে সুন্দর দেখে, যাহাকে প্রিয়ভাষী জ্ঞানে কর্ণ সেই বচন সুধা সতৃষ্ণভাবে পান করে, হৃদয় যাহার হৃদয়ের অনুপমের মধুর চিত্র আগ্রহের সহিত ধারণ করে, সে কতদূর রমণীয় পদার্থ। বন্ধুর অনাদরও মধুময়।

"স্থূলদৃষ্টে অনাদর, দেখায় না মনোহর
অনাদর যদিও কর্কশ
প্রেমমাখা অনাদর বড়ই মধুর।"

যে অকপট প্রকৃত বন্ধু আত্মপর ভাব ক্ষণেকের জন্যও হৃদয়ে ধারণ না করিয়া সুহৃদ্‌কে অভিন্ন পরমাত্মবৎ মনে করেন এই পৃথিবীতে তাঁহার জন্ম হইলেও তিনি স্বর্গবাসী। মর্ত্ত্য লোকে ভাগস্বীকার কদাচিৎ সম্ভবে। যে সৌভাগ্যশীল পুরুষ সেই সুখ লাভ করেন, তিনিও দেব।

মনুষ্যের কপালদোষে সে মধুও বিষমিশ্র। বীরকুলাগ্রগণ্য জুলিয়স সিজরের পবিত্র বক্ষঃস্থল তাঁহার আশ্রিত এবং তাঁহার অনুগ্রহে প্রতিপালিত ব্রুটস্ যখন শানিত শস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়াছিল; নিশীথ সময়ে আপন গৃহে অতিথি ভাবে উপস্থিত নিদ্রিত স্বীয় প্রভু ডনকানকে যখন দুরাচার ম্যাকবেথ্ অতি নৃশংসের ন্যায় হত্যা করিয়াছিল; যখন য়ুনানীর বীরকুঞ্জর কেশরী নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আত্ম সমর্পণ করিলে সেই কর্দ্দমনিপতিত কেশরীকে চিরদিনের জন্য কোন দুরাচার স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়াছিল, তখন কি সে অমৃতে গরল উঠে নাই? মির জাফরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করায় অদূরদর্শী সিরাজের পতন হইল; আরংজিবের প্রতি সর্ব্বথা সন্দেহশূন্য সুতরাং অসতর্ক থাকায় তাঁহার ভ্রাতৃগণ অকালে কাল সদনে গমন করিলেন।

ভ্রাতৃ স্নেহ ও ভ্রাতৃবৎসলতা অমৃতের সরোবর হইলেও তাহা হইতেও গরল উত্থিত হয়। শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের প্রতি অপরিসীম বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াও যখন লঙ্কাসমরাবসানে গৃহে গমন করিয়া-

ছিলেন, যখন সেই দক্ষিণ হস্ত সদৃশ, জীবনের অবলম্বন পরমোপকারী ভ্রাতার সাহায্য পূর্ব্বের ন্যায় আর আবশ্যকীয় রহিল না তখন তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়া এই বিশুদ্ধ সুধায়ও বিষ উৎপাদন করিয়াছিলেন।

মানবগণের অন্য একটি সুখের কারণ রাজার অনুগ্রহ ও রাজভক্তি। রাজার প্রতি প্রজার যত ভক্তি হইবে এবং প্রজার প্রতি রাজার যতই দয়া প্রকাশ হইতে থাকিবে ততই সেই সম্বন্ধ সুখকর হইবে। ধর্ম্মময় যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসনসময়ে প্রজাগণ অতিশয় সুখে সময় যাপন করিয়াছিল বলিয়া সেই পূত সময়ের কথা এখনও সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। আকবর ও সাজেহান বাদসাহের শাসন সময়ের উৎকৃষ্ট অংশের সহিত কোন্ ভূপতি না নিজের শাসনকাল বিনিময় করিতে বাসনা করেন? লর্ডক্যানিং মহোদয়ের সময়টি কেনা ভক্তির সহিত স্মরণ করে? আবার ঐ সমস্ত সুখের সময়ের সঙ্গে জঙ্গীস্, তৈমুর, নাদীর, আমেদ প্রভৃতির এবং ভয়ানক বিপ্লব বিদ্রোহ অরাজকতা প্রভৃতির তুলনা করিয়া দেখ। শেষের অংশ গরল, প্রথমাংশ অমৃত। যে সময়ে উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল ফরাসি জনসাধারণের মস্তিষ্ক শূন্য মস্তকের আলোড়নে এবং ভ্রান্তি-বুদ্ধির পরিচালনায় সমস্ত ইয়োরোপ কম্পিত হইল, সমস্ত পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল; যখন ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুইর মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল, ফরাসির রাজসিংহাসন রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া গেল তখন কি রাজা প্রজার মিলন সুখ রূপ অমৃতে গরল উঠে নাই? বিশ্বাস সেই অমৃতের জীবন। রাজা প্রজাকে বিশ্বাস না করিলে সেই অমৃত উভয়ের মধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে না। অন্যদিকে প্রজা রাজাকে ভক্তি না করিলে সেই অমৃত কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। উভয়ের চেষ্টায় উৎপাদিত সুধাকণা যেমন মধুর উভয়ের অপ্রণয়ে তৎসমুদয় আবার সেই পরিমাণে হলাহল।

এই রূপে দেখা যাইতে পারে যে, যাহা যত আদর ও আগ্রহের সামগ্রী তাহাতে তত অসুখ উৎপাদন করে। প্রথমে বলা হইয়াছে যে, আবশ্যকীয় বস্তুর জগতে অনাদর; এক্ষণে দেখা গেল যাহার আদর আছে তাহাতে সাময়িক সুখ হইলেও অসুখ উৎপাদন করে। মুখপ্রিয় স্বাদুবস্তুগুলিন তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত লইয়া প্রয়োজন কি? আঁধার থাকিলেই আলো আছে, দুঃখ থাকিলেই সুখ আছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। অদৃষ্টচক্রের নেমির আবর্ত্তনে মানবভাগ্যও ভাল মন্দ দুই অবস্থায়ই উপনীত হয়। সংসারের এক পার্শ্বে পরমরমণীয় বিলাসগৃহে অথবা গম্ভীর জ্ঞানালোচনার পবিত্রমন্দিরে সহস্র সহস্র ব্যক্তি যেমন আনন্দস্রোতে ভাসিতেছে; জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা, স-

মস্ত অসুখ বিস্মৃত হইয়া সেই অবিরামবাহি সুখস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া অনন্ত অভিমুখে গমণ করিতেছে, অপর পার্শ্বে তেমনই আবার ভীষণ ও ভীষণতর শ্মশান সমুহ জগৎ আঁধার আঁধার আঁধার করিয়া মৃতের হৃদয়েও যেন ভীতি উৎপাদন করিতেছে। একস্থানে নবপ্রসূত বালকের কল্যাণার্থ মাঙ্গল্য বাদ্য বাজিতেছে, নবদম্পতীর পরিণয় জন্য আমোদে, আনন্দমিশ্র কোলাহলে দশদিক উল্লসিত ও ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে; আবার অন্যস্থানে পুত্রশোকাতুরা জননীর হৃদয়বিদারক শোকসূচক ক্রন্দনধ্বনিতে অথবা নববৈধব্যবিদগ্ধবালিকার হাহাকার শব্দে সংসার উদাস করিয়া উঠাইতেছে। কোন স্থলে প্রণয়ের সুখময়মিলনপ্রতীক্ষায় সুখের দিবাস্বপ্নে দিনযামিনীতে ইতর বিশেষ না করিয়া প্রণয়ীগণ সময় উদ্যাপন করিতেছে, অন্যত্র নিরাশ প্রণয়ের হতাশ শব্দে অথবা অনাদৃত অবমানিত ও কলঙ্কিত প্রণয়ের পঙ্কিল পরিণামে কাহারও জীবন ঘৃণায় অবসাদিত হইতেছে। একদিকে আশা মৃদুমন্দ পাদক্ষেপে স্বর্গীয় বিদ্যাধরীর ন্যায় মধুর হাসি হাসিয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছেন, পুলকবিস্ফারিত নয়নের মোহিনী ভঙ্গিতে সকলের মন মোহন করিতেছেন, অন্যদিকে কপোল দেশে হস্তার্পণ করিয়া আকাশন্যস্তনয়নে নিরাশার শীর্ণ বিশীর্ণ ধুসরিত কলেবর সকলের মনে ভীতি উৎপাদন করিতেছে। একদিকে প্রকৃতির প্রিয়তম প্রদেশ সকল জাতি, জুতি, বকুল, মালতী, গোলাপ, পঙ্কজ প্রভৃতি মনোমদ কুসুম শয্যায় সুশোভিত আছে, পুংস্কোকিলের মধুর কুজনে শামা বুলবুলের মোহন ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক উৎফুল্ল করিতেছে, অন্যদিকে সাহারার ভীষণ মরুভূমিতে জল পিপাসায় ত্রাহি ত্রাহি শব্দে হত ভাগ্য পথিক আর্ত্তনাদ করিতেছে। নিদাঘের নির্ম্মল দিবা ঝটিকায় বিশ্রী করিতেছে, শরতের সুধার কৌমুদী কালমেঘে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। রজনী প্রভাত হইতেছে দিবাভাগ আবার তমসীরজনীতে লীন হইতেছে। সংসারে চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অমৃত কণারও অভাব নাই, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে হলাহলও প্রচুর রহিয়াছে। ছায়া যেমন বস্তুর অনুগামী দুঃখও তেমনই সুখের অনুগামী। যে অর্ব্বাচীন ব্যক্তি এই পরীক্ষা ভূমি সংসার ক্ষেত্রে অবিরত ভাবে বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগের বাসনা করে তাহার চিত্ত কখনও সুখী হইতে পারে না। যাহা কখনও হইবার নয় এরূপ বিষয়ে আশা করিয়া জীবন শান্তিহীন করিলে পাপ ব্যতীত পুণ্য লাভ হয় না, তৃষ্ণা বৃদ্ধি ব্যতীত তাহার সমতা হয় না। যদি সুধাপান করিতে বাসনা থাকে তবে সুদর্শন চক্র দেখিয়া ভীত হইওনা, তাহা হইলে

" সুধা সুরগণ ভোগ্য
অসুরের পরিশ্রম সার
বিকসিত তামরসে অলিগণ উড়ে বসে

ভেক ভাগ্যে কেবল চীৎকার।”

এই কবিতাটি সার্থক হইবে,—চীৎকার করিয়া জীবন ভেকবৎ অতিবাহিত করিতে হইবে। যদি অমৃতপান করিতে অভিলাষ থাকে তবে গরলপানে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হও। এই সংসারে সুধাপায়ী ধৈর্য্যশীল মহাপুরুষ মাত্রই নীলকণ্ঠ।

শ্রী—

জীবনপ্রভাত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পৃথুরায়ের দুর্গ।

“চলেছে চাহিয়া দেখ,
যোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।
* * * *
জন্মিবে পুরুষগণ,
বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম ক্ষিতিপৃষ্ঠে আঁকিয়া।”
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬৬৬ খৃঃ অব্দের বসন্তকালে পঞ্চশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক মাত্র লইয়া শিবজী দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেনাগণ বিশ্রাম করিতেছে শিবজী চিন্তিত মনে এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী আসিয়া কি ভাল করিয়াছেন? মুসলমানেরা অধীনতা স্বীকার করা কি বীরোচিত কার্য্য হইয়াছে? এখনও কি প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই? এইরূপ সহস্র চিন্তা শিবজীর মহৎ হৃদয় আলোড়িত করিতেছে। যোদ্ধার মুখমণ্ডলও গম্ভীর ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত,—বিপদকালে, যুদ্ধকালেও কেহ শিবজীর মুখমণ্ডল এরূপ চিন্তাঙ্কিত দেখে নাই।

শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে কেবল তাঁহার তেজস্বী উগ্রস্বভাব নয় বৎসরের বালক শম্ভুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক একবার পিতার গম্ভীর মুখমণ্ডলেরদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিতেছিলেন।

রঘুনাথপন্থ ন্যায়শাস্ত্রী নামক শিবজীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

দুইজনে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিতেছিলেন। শিবজীর হৃদয় ভীষণ চিন্তায় বাতিব্যস্ত ও উৎক্ষিপ্ত। অনেকক্ষণ পর তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ন্যায়শাস্ত্রী আপনি কখনও দিল্লীতে আসিয়াছিলেন।’

রঘুনাথ। 'বাল্যকালে দিল্লীনগর দেখিয়াছিলাম।'

শিব। 'তবে সম্মুখে ঐ বহু বিস্তীর্ণ প্রাচীরের ন্যায় কি দেখা যাইতেছে বলিতে পারেন। আপনি অনন্যমনা হইয়া ঐদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন কি জন্য ?'

রঘুনাথ। 'মহারাজ! ভারতবর্ষের শেষ হিন্দুরাজা পৃথুরায়ের দুর্গ প্রাচীর দেখা যাইতেছে।'

শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'হায়! এই সে পৃথুরায়ের দুর্গ! এই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল! এই স্থানে তিনি একবার ঘোরীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হা! ন্যায়শাস্ত্রী!

'সেদিন ঐ প্রাচীরের প্রত্যেক স্তম্ভ হইতে বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল ঐ মরুভূমিস্থলে প্রশস্তনগর বিজয়বাদ্য শব্দিত হইয়াছিল, সমরবিজয়ী হিন্দুসেনার কোলাহলে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইয়াছিল। সে দিন, হিমালয় হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত হিন্দুবীরগণ সবল হস্তে স্বাধীনতা রক্ষা করিত,—হিন্দুললনাগণ উল্লাসে স্বাধীনতা গান গাইত! কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় সেদিন গত হইয়াছে, ঐ পুরাতন দুর্গের নিকট পৃথুরায় অন্যায় সমরে হত হইলেন, পুণ্য ভারতস্থান অন্ধকারে আবৃত হইল! দিবসের আলোক গত হয়, পুনরায় দিবস আইসে, শীতকালে বিলুপ্ত পত্র কুসুম বসন্তে আবার দেখা যায়, ভারতের গৌরব দিন কি আর দেখা দিবে না? একদিন ভরসা করিয়াছিলাম, সেই গৌরবের দিন আবার আসিবে, সে আশা কি ফলবতী হইবে?'

শিবজী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয় চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'দেবদেব মহাদেব! যে দিন যবনগণ জয়লাভ করিল, সে দিন তোমার হস্তে প্রচণ্ড ত্রিশূল নিশ্চেষ্ট বা নিদ্রিত ছিল? সংহারক! কেন ধর্মবিনাশিদিগকে সংহার করিলে না?'

রঘুনাথ। 'কে বলিবে, কেন? যাহারা হিন্দুরাজ্য বিনাশ করিলেন, তাঁহারা হিন্দু-দেবমণ্ডলীর ও অবমাননা করিতে ত্রুটী করেন নাই;—সেই ভীষণপাতকের প্রমাণ অক্ষয় প্রস্তরে খোদিত আছে, সে পাপের প্রতিশোধ এখনও হয় নাই।'

কম্পিতস্বরে শিবজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ন্যায়শাস্ত্রী! আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কোথায় সে প্রমাণ খোদিত আছে?'

রঘুনাথ, 'সন্নিকটে' এই বলিয়া অনতিদূরে একটি পুরাতন প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমন্দিরে শিবজীকে লইয়া গেলেন, বলিলেন, চারিদিক অবলোকন করুন।'

শিবজী। 'দেখিতেছি মধ্যে প্রাঙ্গন, চারিদিকে সুন্দর প্রস্তরস্তম্ভসার! একটি সুন্দর দেবমন্দির ছিল,—কালে ভগ্ন হইয়াছে। দেবের অবমাননা-চিহ্ন কোথায় খোদিত আছে?'

রঘুনাথ। "তীক্ষ্ণদৃষ্টি করুন, এই সুন্দর স্তম্ভসারের একটি স্তম্ভ ভগ্ন হয় নাই, —তাহার উপর অঙ্কিত দেবমূর্ত্তিগুলিও ভগ্ন হয় নাই, কিন্তু নিরীক্ষণ করুন, একটী মূর্ত্তির ও মুখমণ্ডল দৃষ্ট হইবে না। কালে স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিত, ধর্ম্ম-বিদ্বেষী যবনেরা স্তম্ভগুলি রাখিয়াছে কিন্তু সহস্র দেবমূর্ত্তির মধ্যে প্রত্যেক মূর্ত্তির মুখমণ্ডল মাত্র স্বহস্তে ভগ্ন করিয়াছে! বাসনা, যে দেশ বিদেশ হইতে লোক আসিয়া চিরকাল দেখিতে পাইবে, যবনগণ হিন্দুদেবের অবমাননা করিয়াছেন,—যত দিন এই অক্ষয় স্তম্ভসার থাকিবে, তত দিন জগতে হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা ঘোষণা করিবে!

"অদ্যাপি সেই পুরাতন মন্দিরের সুন্দর স্তম্ভসার বিদ্যমান রহিয়াছে, অদ্যাপি প্রতিস্তম্ভে বহু দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে,—প্রত্যেক মূর্ত্তির মুখমণ্ডল বিকৃত বা ভগ্ন, প্রথম মুসলমান আক্রমণকারীদিগের ভীষণ ধর্ম্ম-বিদ্বেষের পরিচয় দিতেছে!"

শিবজীর স্বভাবতঃই হিন্দুধর্ম্মে অতিশয় ভক্তি ছিল, এই স্তম্ভসার দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী আরও বলিতে লাগিলেন,—

"এ দিকে হিন্দুর অবমাননা, অন্য দিকে যবনের গৌরব! এই যে সম্মুখে উন্নত স্তম্ভ আকাশ ভেদ এটী কুতবমিনার, কুতবদ্দীনের বিজয় হিন্দুদিগের পরাজয় জগৎমণ্ডলে ঘোষণা করিতেছে! এই দেখুন আলতমশ্ প্রভৃতি যবন রাজাদিগের গোরস্থানের উপর কিরূপ উন্নত সুন্দর প্রস্তর হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছে; এই একটী মসজীদ্ প্রস্তুত হইতেছিল, ঐ পুরাতন হিন্দু-দেবালয় ভগ্ন হইয়া উহারই প্রস্তর দ্বারা মসজীদ্ উঠিতেছিল! সমগ্র ভারতবর্ষে এইরূপ! সকল স্থানে পরাভূত হিন্দুদিগের গৌরবচিহ্ন একে একে বিলীন হইতেছে, তাহার উপর বিজয়ী যবনের গৌরবস্তম্ভ উত্থিত হইতেছে। এই কুতবমিনারের উপর আরোহণ করুন, মসজীদ্, গোরস্থানের পরে গোরস্থান,—দূরে দিল্লীর অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যাবলী লক্ষিত হইবে কিন্তু পুরাকালের হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপুরীতুল্য ইন্দ্রপ্রস্থ বিলীন হইয়াছে,—তাহার একটী স্তম্ভ বা একটী মন্দিরও নয়নগোচর হইবে না।"

নিঃশব্দে শিবজী ও শম্ভুজী ও রঘুনাথপন্ত কুতবমিনারের উপর উঠিলেন,—সেরূপ উন্নত স্তম্ভ বোধ হয় জগতে আর নাই। নিঃশব্দে পূর্ণহৃদয়ে শিবজী চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন;—এই স্থানে কি জগৎবিখ্যাত হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল, এস্থানে কি প্রাতঃস্মরণীয় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃসহ বাস করিয়াছিলেন,—এস্থানে কি সেই পুণ্যকালে সেই পুণ্যশ্লোক রাজত্ব করিয়া সসাগরা ধরায় আর্য্য-গৌরব বি-

,স্থার করিয়াছিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস কি এই স্থানে অধিবাস করিতেন ? ভীষ্মাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অর্জ্জুন, ভারতের অতুল বীরবৃন্দ কি ইহারই নিকট আপন২ বীর্য্য প্রকাশ করিয়া অক্ষয় যশোলাভ করিয়াছেন,—কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া ললনাগণ কি এই স্থান পবিত্র করিয়াছিলেন ?—শিবজীর বাক্‌শক্তি রোধ হইল, দুই নয়ন দিয়া জল বহিতে লাগিল,—গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিলেন,—

'দেবতুল্য পূর্ব্বপুরুষগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করি! আমাদের বাহু বলশূন্য, আমাদের নয়ন তিমিরাবৃত, আমাদের হৃদয় ক্ষীণ! ঐ নীল নভোমণ্ডল হইতে প্রসন্ন হইয়া আলোক দান করুন,—যেন হিন্দুনাম পুনর্ব্বার উন্নত করিতে পারি,—নচেৎ সেই উদ্যমেই যেন মৃত্যু হয়! এ জীবনে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই!'

শম্ভুজীর হৃদয় ও পূর্ণ হইল, তাঁহারও নয়ন হইতে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

শিবজী চারিদিক দেখিতে লাগিলেন, ছয় শত বৎসরাবধি মুসলমানগণ রাজ্য করিয়াছেন, তাহার চিহ্ন যেন সেই স্থানে অঙ্কিত রহিয়াছে! অসংখ্য মস্‌জীদ্‌, অসংখ্য মুসলমান সম্রাটের গোরস্থান, অথবা অসংখ্য ভগ্ন ও চূর্ণ প্রাসাদের অবশিষ্টাংশ সেই কুতবমিনার হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত ছয় ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া দেখা যাইতেছে। করাল কাল, হিন্দু ও যবনের মধ্যে বিভিন্নতা জানে না,—শত শত বৎসরে সহস্র সহস্র মানবকীটে যে সমস্ত হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করে, হেলায় ভূমিসাৎ করিয়া যায়।

সেদিক হইতে নয়ন ফিরাইয়া শিবজী পুনরায় সেই পৃথুর দুর্গ প্রাচীরেরদিকে দেখিলেন, অনেক ক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া রঘুনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—

'ন্যায়শাস্ত্রী! বাল্যকালে কঙ্কণ প্রদেশের কথা শুনিতাম, পৃথুরায়ের বিষয় যে যে কথা শুনিতাম, অদ্য যেন তাহা নয়নে দেখিতেছি! বোধ হইতেছে যেন ঐ ভগ্ন দুর্গ প্রাসাদপূর্ণ, বহুজনাকীর্ণ, পতাকা ও তোরণ-শোভিত একটি বিস্তীর্ণ নগর! যেন রাজসভায় পাত্রমিত্রবেষ্টিত হইয়া রাজা বসিয়া আছেন—বাহিরে যত দূর দেখা যায়,— পথে, ঘাটে, বাটীতে প্রাঙ্গনে, নদী-তীরে নাগরিকগণ আনন্দে উৎসব করিতেছে! যেন বহুবিস্তীর্ণ বাজারে ক্রেয়বিক্রয় হইতেছে,—উদ্যানে লোকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, সরোবর হইতে ললনাগণ কলস করিয়া জল লইয়া যাইতেছে, প্রাসাদ সম্মুখে সেনাগণ সসজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, অশ্ব, হস্তী, রথ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও বাদ্যকর সানন্দে বাদ্য করিতেছে! যেন প্রভাতের সূর্য্য এই অপরূপ দৃশ্যের উপর সুন্দর রশ্মি বর্ষণ করিতেছেন,—যেন এমত সময়ে মহম্মদঘোরির দূত রাজসভায় প্রবেশ করিল। ||

'অন্যান্য কথার পর দূত বলিল, 'মহারাজ! মহম্মদ ঘোর আপনার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন তাহাতে আপনার কি মত?'

'মহানুভব চোহান্ উত্তর করিলেন—

'যবে সূর্য্যদেব আকাশে অন্য একটি সূর্য্যকে স্থান দিবেন,—পৃথুরায় সেই দিন স্বীয় রাজ্যে অন্য রাজাকে স্থান দিবেন!' রাজবাক্য শ্রবণে জয় জয় নাদে সেই প্রশস্ত প্রাসাদ শব্দিত হইল,—জয় জয় নাদে প্রশস্ত নগর পরিপূরিত হইল!

'দূত পুনরায় বলিল 'মহারাজ! আপনার শ্বশুর মহাশয় মহম্মদ ঘোরের সহিত সন্ধি করিয়াছেন,—আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান ও রাঠোর সৈন্য একত্রিত দেখিতে পাইবেন।'

'পৃথুরায় উত্তর করিলেন, 'শ্বশুর মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাইবেন ও বলিবেন, আমিও স্বয়ং যাইতেছি,—অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধুলি গ্রহণ করিব!'

'অবিলম্বে চোহান সৈন্য ঐ প্রশস্ত দুর্গ হইতে নিক্রান্ত হইল,—তেরৌরীর যুদ্ধে যবন ও রাঠোর সৈন্য পৃথুরায়ের সম্মুখে, বায়ুতাড়িত ধূলিবৎ উড়িয়া গেল,— আহত ঘোরী কষ্টে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।'

ক্ষণেক পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'রঘুনাথ! সে দিন আমাদের গিয়াছে; কিন্তু তথাপি এস্থানে দণ্ডায়মান হইলে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্মরণ করিলে স্বপ্নের ন্যায় নব নব আশা মনে উদয় হয়। এই বিশাল কীর্ত্তিক্ষেত্র চিরদিন তিমিরাবৃত থাকিবে না; ভারতের পূর্ব্বদিন এখনও উদিত হইতে পারে। জগদীশ্বর রুগ্নকে আরোগ্য দান করেন, দুর্ব্বলকে বলদান করেন, জীর্ণ পদদলিত ভারতসন্তানকে তিনিই উন্নত করিতে পারেন।'

নিঃশব্দে সকলে কুতবমিনার হইতে অবতীর্ণ হইলেন; নিঃশব্দে শিবিরাভিমুখে যাইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামসিংহ।

'বাপের সদৃশ বীর, সমান সমান'

কাশীরাম দাস।

শিবজী ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজী শিবিরে উপবেশন করিয়া আছেন এমত সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া বলিলেন,—

'মহারাজ জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ অন্য একজন সৈনিক সহিত সম্রাট-আদেশে মহারাজকে দিল্লীতে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন। উভয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন।

শিব। 'সাদরে লইয়া আইস।'

উগ্রস্বভাব শম্ভুজী বলিলেন, 'পিতঃ,

আপনাকে আহ্বান করিতে আরংজীব কেবল দুইজন মাত্র দূত পাঠাইয়াছেন? এ অবমাননা সহ্য করিবেন?'

শিবজীও আরংজীবকৃত এই অবমাননায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। ক্ষণেক পরই রামসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুতযুবক পিতার ন্যায় তেজস্বী ও বীর, পিতার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী যুবকের মুখমণ্ডল দেখিয়াই তাঁহার উদার ও অকপট চরিত্র বুঝিলেন, তথাপি আরংজীবের কোন কু-অভিসন্ধি আছে কি না, দিল্লী প্রবেশে বিপদ আছে কি না, কথাচ্ছলে জানিবার প্রয়াস করিলেন। রামসিংহ পিতার নিকট শিবজীর বীর্য্য ও প্রতাপের কথা অনেক শুনিয়াছেন, সবিস্ময় নয়নে মহারাষ্ট্র বীর পুরুষের দিকে অবলোকন করিলেন। শিবজী রামসিংহকে আলিঙ্গন ও যথোচিত সম্মানপুরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন। ক্ষণেক পর রামসিংহ কহিলেন—

'মহারাজকে পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই, কিন্তু পিতার নিকট আপনার যশোবার্ত্তা বিস্তর শুনিয়াছি, অদ্য আপনার ন্যায় স্বদেশপ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ বীরপুরুষকে দেখিয়া আমার নয়ন সার্থক হইল।'

শিব। 'আমারও অদ্য পরম সৌভাগ্য। আপনার পিতার তুল্য বিচক্ষণ, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যপ্রিয় বীরপুরুষ রাজস্থানেও বিরল, দিল্লী আগমনের সময় যে তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই।'

রাম। 'মহাশয় দিল্লী আগমন করিতেছেন শুনিয়াই সম্রাট আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, কখন্ নগর প্রবেশ করিতে অভিলাষ করেন?'

শিব। 'প্রবেশ সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন?' শিবজী তীক্ষ্ণ নয়নে রামসিংহের দিকে চাহিতেছিলেন।

অকপট স্বরে রামসিংহ উত্তর করিলেন—

'আমার বিবেচনায় এইক্ষণই প্রবেশ করা বিধেয়, বিলম্ব হইলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, গ্রীষ্ম দুঃসহনীয় হইবে।'

রামসিংহের সরল উত্তর শুনিয়া শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

'সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনি দিল্লীতে অধুনা বাস করিতেছেন, আপনার নিকট কোনও সংবাদ অবিদিত নাই, আমার পক্ষে দিল্লীপ্রবেশ কতদূর বুদ্ধির কার্য্য তাহা আপনি অবশ্যই জানেন।'

উদারচেতা রামসিংহ এতক্ষণ পর শিবজীর মনোগত ভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

'ক্ষমা করুন, আমি আপনার উদ্দেশ্য পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি আপনার অবস্থায় হইলে চিরকাল পর্য্যন্ত

বাস করিতাম, নিজের অসির উপর নির্ভর করিতাম, অসির তুল্য প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কিন্তু এ বিষয়ে অজ্ঞমাত্র,—পিতা আপনাকে যখন দিল্লী আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন তখন আপনি আসিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত তাঁহার পরামর্শ কখনও ব্যর্থ হয় না।'

শিবজী বুঝিলেন দিল্লীতে তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার জন্য কোনও কল্পনা হয় নাই, অথবা যদি হইয়া থাকে রামসিংহ তাহা জানেন না। তখন পুনরায় বলিলেন—

'হাঁ আপনার পিতাই আমাকে আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন,—আমার আসিবার সময় তিনি আরও বাক্য দান করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় আপনি অবগত আছেন।'

রামসিংহ.—'আছি। দিল্লী আগমনে আপনার কোনও বিপদ হইবে না, কোনও অনিষ্ট হইবে না, সে বিষয়ে তিনি আপনাকে বাক্যদান করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি আমাকেও আদেশ করিয়াছেন।'

শিব। 'তাহাতে আপনার কি মত?'

রাম। 'পিতার আদেশ অবশ্য পালনীয়, রাজপুতের বাক্য লঙ্ঘন না হয়,—পিতার বাক্য যাহাতে লঙ্ঘন না হয়, আপনি নিরাপদে স্বদেশে যাইতে পারেন, সে. বিষয়ে দাসের যত্নের কোনও ত্রুটী হইবে না।'

শিবজীর মন নিরুদ্বেগ হইল। আর সন্দেহ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

'তবে আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করিব; বিলম্ব করিলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, চলুন এইক্ষণই দিল্লী প্রবেশ করি।'

অচিরে সকলে দিল্লীর অভিমুখে চলিলেন।

সমস্ত পথ পুরাতন মুসলমান প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। প্রথম মুসলমানেরা দিল্লী জয় করিয়া পৃথুরায়ের পুরাতন দুর্গের নিকট আপনাদিগের রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রথম সম্রাটদিগের মসজীদ, প্রাসাদ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট সেই স্থানে দৃষ্ট হয়। কালক্রমে নূতন নূতন সম্রাট আরও উত্তরে নূতন নূতন প্রাসাদ ও রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নগর উত্তরাভিমুখে চলিল। শিবজী যাইতে যাইতে কত প্রাসাদ কত মসজীদ ও মিনার, কত স্তম্ভ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলেন, তাহা গণনা করিতে পারিলেন না। রামসিংহ শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন ও নানা স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়ের গুণের পরিচয় পাইলেন, উভয়ের মধ্যে অচিরে সৌহৃদ্য জন্মিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী স্থির করিলেন, যদি দিল্লীতে কোনও বিপদ হয়, একজন প্রকৃত বন্ধু পাইব।

পথিমধ্যে লোদীবংশীয় সম্রাটদিগের

প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির সকল দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক রাজার কবরের উপর এক একটী গম্বুজ ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। আফগানদিগের গৌরব-সূর্য্য যখন অস্তমিত হয়, তখন এই স্থানে দিল্লী ছিল, পরে আরও উত্তরে সরিয়া গিয়াছে।

তাহার পর হুমাউনের প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির। তাহার পরে "চৌবটখম্বা" অর্থাৎ শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত চতুঃষষ্টি স্তম্ভযুক্ত প্রকাণ্ড সুন্দর অট্টালিকা। তাহার পশ্চাতে অসংখ্য গোরস্থান। পৃথুরায়ের দুর্গ হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে শিবজীর বোধ হইল যেন সেই পথেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এক একটি প্রাসাদ বা অট্টালিকা সেই ইতিহাসের এক একটি পত্র, এক একটি গোরস্থান এক একটি অক্ষর, করাল কাল সেই ইতিহাসলেখক; নচেৎ এরূপ অক্ষরে ইতিহাস কেন লিখিত হইবে?

শিবজী আরও আসিতে লাগিলেন। দিল্লীর প্রাচীরের নিকটে আসিলে রামসিংহ সগর্ব্বে একটি মন্দির দেখাইয়া বলিলেন,—

'রাজন্, ঐ যে মন্দির দেখিতেছেন,—পিতা জ্যোতিষ গণনার্থ ঐ মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন; বহুদেশের পণ্ডিতেরা ঐ মন্দিরে আসিয়া রজনীতে নক্ষত্র গণনা করেন।'

শিব। 'আপনার পিতা যেরূপ বিজ্ঞ, জগতে এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন লোক অতি বিরল; শুনিয়াছি পুণা কাশীনামেও তিনি ঐরূপ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।'

রাম। 'যাহা আজ্ঞা করিলেন সত্য' অচিরে দিল্লীর প্রাচীরের ভিতর সকলে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিবার সময় শিবজীর ঈষৎ হৃদ্‌কম্প হইল,—তিনি অশ্ব থামাইলেন। একবার পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন, একবার মনে চিন্তা উদয় হইল যে 'এখনও স্বাধীন আছি, পরক্ষণেই বন্দী হইতে পারি!' তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মপরায়ণ জয়সিংহের নিকট যে বাক্যদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল, জয়সিংহের পুত্রের উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন,—ভবানীর নাম লইলেন ও নিজ কোষে 'ভবানী' নামক অসিকে মনে মনে স্মরণ করিয়া দিল্লীদ্বার প্রবেশ করিলেন।

স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা সেই মুহূর্ত্তে বন্দী হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীনগর।

"ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী—
খল খল খল হাসি মধুরঅধরে!

কেহ বা স্মরতে রত কেহ শীধুপানে।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফলফুলে
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতী ;
জনস্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে।”

মধুসূদন দত্ত।

দিল্লী অদ্য মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। আরংজীব স্বয়ং জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজকার্য্য সাধনার্থ সময়ে সময়ে জাঁকজমক আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। অদ্য শিবজী দরিদ্র মহারাষ্ট্রদেশ হইতে বিপুল অর্থশালী মোগল রাজধানীতে আনিয়াছেন ; মোগলদিগের ক্ষমতা সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য্য দেখিলে শিবজী আপন হীনতা বুঝিতে পারিবেন, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিতা বুঝিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আরংজীব অদ্য প্রচুর জাঁকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশে দিল্লীনগরী উৎসবের দিনে কুল-ললনার ন্যায় অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছে!

শিবজী ও রামসিংহ একত্রে রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। পথ দিয়া অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক গমনাগমন করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে। বণিকগণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য রাশি করিয়া রাখিয়াছে ; উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বহুমূল্য স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, অপূর্ব্ব খাদ্য সামগ্রী, অপর্য্যাপ্ত গৃহানুকরণ দ্রব্য দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। কোথাও গৃহের উপর দিয়া নিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপরিচ্ছদে গৃহস্থেরা বারন্দায় বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা গবাক্ষ দিয়া কুলকামিনীগণ প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র যোদ্ধাকে দেখিতেছে। পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা হস্তী ও অশ্ব ; রাজা মনসবদার, সেখ, আমীর ও ওমরাহগণ গমনাগমন করিতেছেন ; অশ্বারোহীগণ তীব্রবেগে যেন নগর কাঁপাইয়া যাইতেছে ; সুন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া শুণ্ড নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগামনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া যাইতেছে ; হুহুঙ্কার শব্দে শিবিকাবাহকগণ যেন আরোহীর পদমর্য্যাদা চীৎকার শব্দের দ্বারা প্রচার করিয়া চলিয়া যাইতেছে! শিবজী এরূপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা রায়গড়! যাইতে যাইতে রামসিংহ দূরে তিনটি শ্বেত গম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন—

‘ঐ দেখুন জুম্মা মস্‌জীদ্! সম্রাট শাহজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া ঐ উন্নত প্রশস্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—শুনিয়াছি ওরূপ মস্‌জীদ্ জগতে আর নাই।’ শিবজী বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে দেখিলেন রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া মস্‌জীদের প্রাচীর দেখা যাইতেছে, তাহার উপর সুন্দর শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত তিনটি গম্বুজ ও দুই দিকে দুই মিনার যেন গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে।

এই অপরূপ মস্‌জীদের সম্মুখেই রাজ-

প্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দুর্গের পশ্চাতে যমুনা নদী, সম্মুখে দুর্গ ও মস্‌জীদের মধ্যে, বিস্তীর্ণ রাজপথ শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য। সেই স্থানের ন্যায় আর একটি স্থান ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল কি না, সন্দেহ। দুর্গের প্রাচীরের উপর সহস্র নিশান বায়ুপথে উড়িতেছে, যেন জগতে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে! দুর্গদ্বারে একজন প্রধান মন্‌সবদারের প্রশস্ত শিবির; মন্‌সবদার দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। সম্মুখে সেনা রেখায় রেখায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বন্দুকের কিরিচশ্রেণী সূর্য্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, প্রত্যেক কিরিচ হইতে রক্তবস্ত্রের নিশান বায়ুমার্গে উড়িতেছে। দুর্গ সম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গপ্রাচীর হইতে মসজীদ্‌প্রাচীর পর্য্যন্ত ও উত্তর দক্ষিণে যতদূর পথ দেখা যায় সমস্ত শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য! অশ্বারোহী, গজারোহী বা শিবিকারোহী ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পদাভিষিক্ত পুরুষ বহুলোকসমন্বিত হইয়া বহু সমারোহে সর্ব্বদাই দুর্গদ্বার দিয়া ভিতর বা বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ-শোভায় নয়ন ঝলসিত হইতেছে, লোকের কলরবে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে! সকল শব্দকে নিমগ্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে শিবিরের মধ্য হইতে কামানের শব্দ নগর কম্পিত করিতেছে ও রাজাধিরাজ আলমগীর অর্থাৎ জগতের অধিপতির ক্ষমতাবার্ত্তা জগৎসংসারে প্রচার করিতেছে!

বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে ক্ষণেক এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শিবজী রামসিংহের সহিত দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গ প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া শিবজী যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ "কারখানায়" অসংখ্য শিল্পকারগণ রাজ-ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে,—অপূর্ব্ব সুবর্ণ ও রৌপ্য খচিত বস্ত্র, মল্‌মল্ মসলিন বা ছিট,—বহুমূল্য গালিচা, চন্দ্রাতপ, তাম্বু বা পরদা, সুন্দর পরিধেয়, উষ্ণীষ, শাল, বা গাত্রাবরণ, অপরূপ সুবর্ণ রৌপ্য ও মণিমাণিক্যের বেগম-পরিধেয় অলঙ্কার, সুন্দর চিত্র, সুন্দর কারুকার্য্য, সুন্দর কাষ্ঠ বা শ্বেত প্রস্তরের গৃহানুকরণ দ্রব্য, রাশি রাশি নীল, পীত, রক্তবর্ণ বা হরিদ্বর্ণ প্রস্তরের নানারূপ খেলনা দ্রব্য, কত বর্ণনা করিব! ভারতবর্ষে যত অপূর্ব্ব শিল্পকার ছিল, সম্রাট-আদেশে তাহারা মাসিক বেতন পাইয়া প্রতিদিন দুর্গে কার্য্য করিতে আসিত। সম্রাট রাজকার্য্যার্থ বা নিজ প্রয়োজনের জন্য যে কোন বস্তু আবশ্যক বোধ করিতেন, বিলাসিনী বেগমগণ যতরূপ অপূর্ব্ব 'ফরমায়েশ' করিতেন, প্রাসাদবাসিদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, সমস্ত এই স্থানে প্রস্তুত হইত।

শিবজী এ সমস্ত দেখিবার সময় পাইলেন না। অসংখ্য লোকের মধ্য দিয়া "দেওয়ান আম" নামক উন্নত প্রশস্ত রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাসাদের নিকট আসিলেন। সম্রাট সচরাচর এই স্থানেই সভা অধিবেশন করেন,—কিন্তু অদ্য যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গৌরব দেখাইবার জন্যই,—আরও ভিতরে সুন্দর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত, নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত জগতে অতুল্য "দেওয়ান খাস" নামক প্রাসাদে সভা অধিবেশন করিয়াছিলেন। শিবজী সেই স্থানে যাইলেন, দেখিলেন প্রাসাদের ভিতর রত্নমাণিক্য-বিনির্ম্মিত সূর্য্যরশ্মি প্রতিঘাতী ময়ূর-সিংহাসনের উপর সম্রাট আরংজীব উপবেশন করিয়া আছেন, সম্রাটের চারি দিকে রৌপ্যবিনির্ম্মিত রেল,তাহার সম্মুখে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মনসবদার, ওমরাহ ও বীরপুরুষ এবং অসংখ্য লোক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রামসিংহ শিবজীর পরিচয় দান করিয়া রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

শিবজী অদ্য দিল্লীনগরের অসাধারণ শোভা দেখিয়াই আরংজীবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজসদনে আসিয়া সেই বিষয় আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। যিনি বিংশতি বৎসর তুমুল যুদ্ধ করিয়া আপনার ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সম্প্রতি সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, যিনি এতদূর স্বীকার করিয়া মহারাষ্ট্রদেশ হইতে সম্রাটকে দর্শন করিতে দিল্লী পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, সম্রাট্ তাঁহাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন ? সামান্য সেনাপতিকেও ইহা অপেক্ষা সম্মান করিতেন, শিবজী অদ্য একজন সামান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় নম্রভাবে রাজ-সদনে দণ্ডায়মান ! শিবজীর ধমনীতে উষ্ণ শোণিত বহিতে লাগিল,—কিন্তু এক্ষণে নিরুপায় ! সামান্য রাজকর্ম্মচারীর ন্যায় সম্রাটকে 'তসলীম' করিয়া রীতিমত 'নজর' দান করিলেন। আরংজীবের দূর উদ্দেশ্য সাধন হইল,—জগৎ সংসার জানিল, শিবজী জানিল, শিবজী ও আরংজীব সমকক্ষ নহেন, দাসের প্রভুর সহিত, ক্ষীণের বলিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করা মূর্খতা।

এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আরংজীব 'নজর' গ্রহণ করিয়া কোন বিশেষ সমাদর না, করিয়া শিবজীকে 'পাঁচ হাজারী' অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতিদিগের মধ্যে স্থান দিলেন। শিবজীর নয়ন তখন অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল,তিনি ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিলেন, অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন শিবজী পাঁচ হাজারী ? সম্রাট্ যখন মহারাষ্ট্রে যাইবেন, দেখিবেন শিবজীর অধীনে কত পাঁচ হাজারী আছে ! দেখিবেন, তাহারা দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না !" শিবজীর পার্শ্বস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ

এই কথা শুনিতে পাইল, সম্রাটের কাণে এ কথা উঠিল।

অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন হইলে সভা ভঙ্গ হইল। সম্রাট গাত্রোত্থান করিয়া পার্শ্বস্থ উচ্চ শ্বেত-প্রস্তরবিনির্ম্মিত বেগম মহলে গেলেন, নদীর স্রোতের ন্যায় দুর্গ হইতে অসংখ্য লোকস্রোত নির্গত হইতে লাগিল, যে যাহার আবাস স্থানে যাইল, সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ দল্লীনগরেঅচিরে লোকস্রোত লীন হইয়া গেল।

শিবজীর আবাসের জন্য একটি বাটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; রোষে, অভিমানে সন্ধ্যার সময় শিবজী সেই বাটিতে আসিলেন, একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পর রাজসদন হইতে সংবাদ আসিল যে অদ্য সম্রাটের সম্মুখে শিবজী যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সম্রাট তাহা শুনিয়াছেন। সম্রাট শিবজীকে অন্য দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ভবিষ্যতে শিবজী রাজসাক্ষাৎ পাইবেন না, রাজসভায় স্থান পাইবেন না।

শিবজী বুঝিলেন ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে; ব্যাধে যেরূপ সিংহকে ধরিবার জন্য জালপাতে, ক্রুর দুষ্টবুদ্ধি আরংজীব সেইরূপ ধীরে ধীরে শিবজীকে বন্দী করিবার জন্য মন্ত্রণাজাল পাতিতেছেন! 'এ জাল বিদীর্ণ করিয়া কি পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিব?' পুনরায় নীরবে প্রায় এক দণ্ডকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'হা সীতাপতি গোস্বামিন্! মিত্রপ্রবর! চির যুদ্ধের পরামর্শ তুমিই দিয়াছিলে,—তখন তোমার পরামর্শ গ্রাহ্য করিলাম না, তোমার গরীয়সী কথা এখনও আমার কর্ণে শব্দিত হইতেছে!—আরংজীব! সাবধান! শিবজী এ পর্য্যন্ত তোমার নিকট সত্য পালন করিয়াছে,—তাহার সহিত অসত্য বা খল আচরণ করিও না, কেননা শিবজীও সে বিদ্যায় শিশু নহেন। যদি কর, ভবানী সাক্ষী থাকুন, মহারাষ্ট্রদেশে যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিব, তাহাতে এই সুন্দর দিল্লীনগর, এই বিপুল মুসলমান সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া যাইবে!'

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশীথে আগন্তুক।

"কে তুমি——
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ।"

মধুসূদন দত্ত।

কয়েক দিনের মধ্যে শিবজী আরংজীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন; শিবজী আর স্বদেশে না যাইতে পারেন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কখনও স্বাধীন না হয়, এই আরংজীবের উদ্দেশ্য! শিবজী সম্রা-

টের এই কপটাচরণে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ পন্ত ন্যায়শাস্ত্রী সর্ব্বদা শিবজীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন, ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন।

অনেক যুক্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে প্রথমে দেশ প্রত্যাগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা বিধেয়,—অনুমতি না দিলে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।

ন্যায়শাস্ত্রী পণ্ডিতপ্রবর, ও বাক্‌পটুতায় অগ্রগণ্য, তিনি শিবজীর আবেদন রাজ-সদনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন—

আবেদন পত্রে শিবজী যে যে কারণে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল। শিবজী মোগল সৈন্যের সহায়তা করিয়া যে যে কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, আরংজীব যে যে বিষয় অস্বীকার করিয়া শিবজীকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাও স্পষ্টাক্ষরে দর্শিত হইল। তাহার পর শিবজী প্রার্থনা করিলেন যে, 'আমি যে কার্য্য সাধন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা এখনও সাধন করিতে প্রস্তুত আছি, বিজয়পুর ও গালখন্দ-রাজ্য সম্রাটের অধীনে আনিতে যতদূর সাধ্য সাহায্য করিব। অথবা যদি সম্রাট আমার সহায়তা গ্রহণ না করেন, অনুমতি দিন আমি নিজের জায়গীরে প্রত্যাবর্ত্তন করি, কেন না হিন্দুস্থানের জল বায়ু আমার পক্ষে ও আমার সঙ্গীয় সেনার পক্ষে যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর, এদেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে।' রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী এইরূপ আবেদন পত্র সম্রাটসদনে উপস্থিত করিলেন, সম্রাট উত্তর পাঠাইলেন, উত্তরে নানা কথা লিখা আছে কিন্তু শিবজীর প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি নাই। শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন তাঁহাকে চিরবন্দী করাই সম্রাটের একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন দিন দিন পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উপরি উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর এক দিন সন্ধ্যার সময় শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিন্তিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই, রাজপথ দিয়া লোকের স্রোত এখনও অবিরত বহিয়া যাইতেছে। কত দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছদে কত কার্য্যে এই রাজধানীতে আসিয়াছে! দিল্লী অসংখ্য সৈনিকের বাসস্থান.সর্ব্বদাই প্রশস্ত পথ দিয়া দুই এক জন সৈনিক যাইতে দেখা যাইতেছে। কখন কখন দুই এক জন শ্বেতাঙ্গ মোগল সদর্পে যাইতেছেন, অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ শত শত দেশীয় হিন্দু বা মুসলমান সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, দুই এক জন কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীও কখন কখন দেখা যাইতেছে। পারস্য আ-

রব, তাতার ও তুরস্ক দেশ হইতে বণিক বা মসাফের এই সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন করিতেছে, মুসলমান বা হিন্দু সেনাপতি রাজা বা মন্‌সবদার বহুলোকসমন্বিত হইয়া মহাসমারোহে হস্তী বা অশ্ব বা শিবিকায় আরোহণ করিয়া যাইতেছেন, তদপেক্ষা উচ্চরবে বিক্রেতাগণ আপন আপন পণ্য দ্রব্য মস্তকে লইয়া চীৎকার করিতেছে, এতদ্ভিন্ন সহস্র অন্যান্য লোক সহস্র কার্য্যে জলের স্রোতের ন্যায় যাতায়াত করিতেছে!

ক্রমে এই জনস্রোত হ্রাস পাইতে লাগিল। দিল্লীর অসংখ্য দোকানদার আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লাগিল। নগরের অনন্ত কলরব যেন ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইল, দুই একটী বাটীর গবাক্ষ ভিতর হইতে দীপশিখা দেখা যাইতে লাগিল, অনন্ত হর্ম্ম্যশ্রেণীর মধ্যে দূরস্থ অট্টালিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল। আকাশে দুই একটী তারা দেখা দিল, পশ্চিমদিকে রক্তিমাচ্ছটা আর নাই, শিবজী পূর্ব্বদিকে চাহিলেন;—দিল্লীর উন্নত প্রাচীর, তাহার পর শান্ত বিস্তীর্ণ দিগন্তপ্রবাহিণী যমুনা নদী সায়ংকালের নিস্তব্ধতায় অনন্ত সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে!

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জুম্মা মস্‌জীদ হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উত্থিত হইল, যেন সে গম্ভীর শব্দ ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে মানবের মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উত্থিত হইতে লাগিল! শিবজী মুসলমান-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও স্তব্ধ হইয়া সেই সায়ংকালীন সুদূর উচ্চারিত গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে পুনরায় চাহিলেন, কেবল জুম্মা মসজীদের শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত গম্বুজ সুনীল আকাশপটে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেবল প্রাসাদের রক্তবর্ণ উন্নত প্রাচীর যেন দূরে পর্ব্বতশ্রেণীর মত দৃষ্ট হইতেছে! এতদ্ভিন্ন সমস্ত নগর অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ নিস্তব্ধতায় স্তব্ধ!

রজনী গভীর হইল, কিন্তু শিবজীর চিন্তাসূত্র এখনও ছিন্ন হইল না। অদ্য পূর্ব্ব কথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছিল। বাল্যকালের সুহৃদ্বর্গ, বাল্যকালের আশা, ভরসা, উদ্যম;—সাহসী উন্নতচরিত্র পিতা শাহজী, পিতৃতুল্য বাল্যসুহৃদ্‌ দাদাজী কানাইদেব, গরীয়সী মাতা জীজী!—যিনি মহারাষ্ট্রের জয়ের ভবিষ্যদ্বাণি বলিয়াছিলেন, যিনি বীরমাতার ন্যায় বালককে বীরকার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন, বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আহবে উৎসাহ দিয়াছেন!

তাহার পর যৌবনের উন্নত আশা, ভীষণ কার্য্য-পরম্পরা, দুর্গ-বিজয়, দেশ-বিজয়, রাজ্য-বিজয়, বিপদের পর বিপদ্‌, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপূর্ব্ব জয়লাভ, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ! বিংশ বৎসর পর্য্যালোচনা করিলেন, প্রতি বৎ-

সব অপূর্ব্ব বিক্রমে বা অসমসাহসী কার্য্যে অঙ্কিত ও সমুজ্জ্বল!

সে কার্য্য-পরম্পরা কি ব্যর্থ? সে আশা কি মায়াবিনী?—না এখনও ভবিষ্যৎ-আকাশে গৌরব-নক্ষত্র লীন রহিয়াছে, এখনও ভারতবর্ষে যবন রাজ্যের অবসান হইবে, হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তির মস্তকের উপর রাজচ্ছত্র উন্মীলিত হইবে?

এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে দ্বিপ্রহর রজনীর ঘটা বাজিল, রাজপ্রাসাদের নাগরাখানা হইতে সে শব্দ উত্থিত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগর ব্যাপ্ত হইল, নৈশ নিস্তব্ধতার গম্ভীর শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইল।

আকাশগর্ভে সে শব্দ এখনও লীন হয় নাই, এরূপ সময়ে শিবজী উন্মীলিত গবাক্ষদ্বারে একটি দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আকাশ-পটে যেন দীর্ঘ-নিশ্চেষ্ট প্রতিকৃতি!

বিস্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হইলেন, সেই আকৃতির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিলেন, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত করিলেন। অপরিচিত আগন্তুক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, লক্ষ্য না করিয়া, ধীরে ধীরে গবাক্ষ ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, ধীরে ধীরে ললাট ও ভ্রূযুগলের উপর হইতে নৈশ শিশির মোচন করিলেন।

শিবজী তীক্ষ্ণ-নয়নে দেখিলেন, আগন্তুকের মস্তকে জটাজুট, শরীরে বিভূতি; হস্তে বা কোষে অসি বা ছুরিকা বা কোন ও প্রকার অস্ত্র নাই;—তবে আগন্তুক শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য সম্রাট-প্রেরিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে?

তীক্ষ্ণনয়নে অন্ধকার ঘরের ভিতরও শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন,—

'মহারাজের জয় হউক!'

অন্ধকারে আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠশব্দ শ্রবণমাত্র চিনিতে পারিলেন। জগতে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল, বিপদের সময়, চিন্তার সময় এরূপ বন্ধুকে পাইলে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজী সীতাপতি গোস্বামীকে প্রণাম ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন, একটি দীপ জ্বালিলেন, পরে অতিশয় উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

'বন্ধুপ্রবর! রায়গড়ের সংবাদ কি? আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসিলেন? এতদূরেই বা কি প্রয়োজনে আসিলেন, ও অদ্য নিশীথে সহসা গবাক্ষদ্বার দিয়া আসিবারই বা অর্থ কি?'

সীতাপতি উত্তর করিলেন, 'মহারাজ! রায়গড়ের সংবাদ সমস্ত কুশল; আপনি যে সচিব প্রবরের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছেন তাহাতে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এ বিষয় আমি বিশেষ জানি না, কেন না আপনি রায়-

গড় পরিত্যাগ করিবার পরে অধিক কাল আমি তথায় ছিলাম না। পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার কঠোর ব্রত সাধনার্থে আমাকে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে হয়—সেই প্রয়োজনেই মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনার্থ দিল্লী আসিয়াছি। প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করি তখনই আমার সৌভাগ্য, দিবাই কি, নিশাই কি ?'

শিব। 'তথাপি কোনও বিশেষ কারণ না থাকিলে গবাক্ষ দিয়া দ্বিপ্রহর নিশীথে আসিতেন না। কি কারণ প্রকাশ করিয়া বলুন।'

সীতা। 'নিবেদন করিতেছি। কিন্তু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি প্রভু আসিয়া অবধি কুশলে আছেন ?'

শিব। 'শারীরিক কুশলে আছি,—শত্রুমধ্যে মনের কুশল কোথায় ?'

সীতা। 'প্রভুর সহিত ত সম্রাটের সন্ধিই আছে, আপনার শত্রু কোথায় ?'

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'সর্পের সহিত ভেকের সহিত সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী ? সীতাপতি ! আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। যদি রায়গড়ে আপনার বীরোপযোগী পরামর্শ শুনিতাম তাহা হইলে কঙ্কণদেশের ভীষণ পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের জন্য অদ্যাপি ও যুদ্ধ করিতে পরিতাম, খল সম্রাটের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার মধ্যে পড়িতাম না;—দিল্লীনগরে বন্দী হইতাম না।'

সীতা। 'প্রভু আত্মতিরস্কার করিবেন না, মনুষ্যমাত্রই ভ্রান্তির অধীন, এ জগৎ ভ্রমপরিপূর্ণ। বিশেষ এ বিষয়ে আপনার দোষ মাত্র নাই, আপনি সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সদাচরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক এ স্থানে আসিয়াছেন, তিনি অসদাচরণ ও কপটাচরণে দোষী, জগদীশ্বর অবশ্য তাঁহার সমুচিত দণ্ড দিবেন। প্রভু! খলতার জয় নাই,—অদ্য আরংজীব যে পাপ করিয়া আপনাকে রুদ্ধ করিবার আশা করিয়াছেন সেই পাপে সবংশে নিধন হইবেন। মহরাজ ! আপনি রায়গড়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রদেশে সে কথা এখনও কেহ বিস্মরণ হয় নাই;—আরংজীব যদি কপটাচরণ করেন তবে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে।'

উৎসাহে, উল্লাসে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন,—

'সীতাপতি! সে ভরসা এখনও লোপ হয় নাই। এখনও আরংজীব দেখিবেন মহারাষ্ট্রজীবন লোপ পায় নাই! কিন্তু হায়! যে সময়ে আমার বীরাগ্রগণ্য সৈন্যেরা মোগলদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর দিল্লীনগরে নিশ্চেষ্ট বন্দী স্বরূপ থাকিব ?'

সীতা। 'যবে গগনসঞ্চারী বায়ুকে আরংজীব জালদ্বারা বদ্ধ করিতে পারি-

বেন, তখন আপনাকে বন্দী রাখিতে পারিবেন, তাহার পূর্ব্বে নহে।'

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিলেন; পরে ধীরে ধীরে বলিলেন 'তবে বোধ করি আপনি কোন পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য এরূপ গুপ্তভাবে অদ্য রজনীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন।'

সীতা। 'প্রভু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি এরূপ সম্ভাবনা নাই।'

শিব। 'সে উপায় কি?'

সীতা। 'অন্ধকার রজনীতে প্রভু অনায়াসে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন। দিল্লীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, কিন্তু পূর্ব্বদিকে একস্থানে সেই প্রাচীরে লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারাষ্ট্রীয় বীরের অসাধ্য নহে। অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে অষ্টজন বাহক আছে নিমেষ মধ্যে মথুরায় পঁহুছিবেন। তথায় প্রভুর অনেক বন্ধু আছে, অনেক হিন্দু-দেবালয়ে অনেক ধর্ম্মাত্মা পুরোহিত আছেন, তথা হইতে প্রভু অনায়াসে স্বদেশে যাইতে পারিবেন।'

শিব। 'আমি আপনার উদ্যোগে যথেষ্ট বাধিত হইলাম, আপনি যে প্রকৃত বন্ধু তাহার আর একটি নিদর্শন পাইলাম। কিন্তু মনে করুন প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় কেহ আমাকে দেখিতে পাইল, তখন পলায়ন দুঃসাধ্য,—আরংজীব হস্তে নিশ্চয় মৃত্যু।'

সীতা। 'প্রাচীরের যে স্থানে লৌহশলাকা দেওয়া আছে তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশজন খড়্গহস্তে ছদ্মবেশে লুকায়িত আছে। যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায় বা গতিরোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।'

শিব। 'ভাল, নৌকায় গমন কালে তীরস্থ কোন প্রহরী যদি সন্দেহ প্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে?'

সীতা। 'অষ্টজন নৌকাবাহক ছদ্মবেশী আপনারই অষ্টজন যোদ্ধা। তাহাদিগের শরীর বর্ম্মাচ্ছাদিত, তূণ পরিপূর্ণ। সহসা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে তাহার সম্ভাবনা নাই।'

শিব। 'মথুরায় পঁহুছিয়া যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই?"

সীতা। 'আপনার পেশওয়ার ভগিনীপতি মথুরায় আছেন, তিনি আপনার চির-পরিচিত ও বিশ্বস্ত তাহা আপনিই জানেন। আমি অদ্য তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি, তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাঁহার পত্র পাঠ করুন।'

বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া শিবজীর হস্তে দিলেন। শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—

'আপনি পাঠ করিয়া শুনান।' সীতাপতি লজ্জিত হইলেন, তাঁহার তখন স্ম-

ষ্মণ হইল যে শিবজী আপন নামে লিখিতেও জানিতেন না, কখনও লেখাপড়া শিখেন নাই।’

সীতাপতি পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। যাহা যাহা আবশ্যক, মুরেশ্বরের কুটুম্ব সমস্ত স্থির করিয়াছেন পত্রে বিস্তীর্ণ লিখা আছে। শুনিয়া শিবজী বলিলেন—

‘গোস্বামিন্! আপনার সমস্ত জীবন যাগযজ্ঞে অতিবাহিত হইয়াছে কখনই বোধ হয় না, শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনার অপেক্ষা সুন্দররূপে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না। কিন্তু এখনও একটি কথা আছে। আমি পলাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ পন্ত, প্রিয় সুহৃদ্ অন্নজী মালশ্রী,—আমার সেনাগণ কোথায় থাকিবে? ইহারা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে?’

সীতা। ‘আপনার পুত্র, প্রিয় সুহৃদ্ ও মন্ত্রীবর আপনার সহিত অদ্য রজনীতেই যাইতে পারে;—আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলে হানি নাই,—আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করিবেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।’

শিব। ‘সীতাপতি! আপনি আরংজীবকে জানেন না; তিনি ভ্রাতৃদিগকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।’

সীতা। ‘যদি আপনার সেনাগনের উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহারাষ্ট্র এরূপ ভীরু যে আপনার নিরাপদ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উল্লাসের সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন না করিবে?’

শিবজী ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিলেন। পরে মহানুভব ধীরে ধীরে বলিলেন—

‘গোস্বামিন্! আমি আপনার চেষ্টা আপনার উদ্যোগের জন্য আপনার নিকট চিরবাধিত হইলাম, কিন্তু শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও চিরপালিত ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না; এরূপ ভীরুতার কার্য্য কখনও করিবে না। সীতাপতি! অন্য উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ চেষ্টা ত্যাগ করুন!’

সীতা। ‘অন্য উপায় নাই!’

শিব। ‘তবে সময় দিন, শিবজীর এই প্রথম বিপদ নহে, উপায় উদ্ভাবনে কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই।’

সীতা। ‘সময় নাই! অদ্য রজনীতে প্রভু পলায়ন করুন; নতুবা কল্য আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ!

শিব। ‘আপনি কোন্ যোগবলে এরূপ জানিলেন জানি না, কিন্তু আপনার গণনা যদি যথার্থ ও হয় তথাপি শিবজীর অন্য উত্তর নাই;—শিবজী আশ্রিত প্রতিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আত্মপরিত্রাণ করিবে না। গোস্বামিন্! এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।’

সীতা। ‘প্রভু! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, আরংজী-

বকে শান্তিদান করুন,—সেইদুর মহারাষ্ট্র দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, তথা হইতে সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমরতরঙ্গ প্রবাহিত করুন, অচিরে আরংজীবের সুখস্বপ্ন ভগ্ন হইবে, অচিরে এই পাপপূর্ণ সাম্রাজ্য অতল জলে মগ্ন হইবে।'

শিব। 'সীতাপতি! যিনি জগতের রাজা তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিবেন, আমার কথা অবধারণা করুন, তাহার অধিক বিলম্ব নাই;—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না।'

সীতা। 'প্রভু! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন; কল্য বিবেচনার সময় থাকিবে না,—কল্য আপনি বন্দী!'

শিব। 'তাহাই হউক;—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না, শিবজীর প্রতিজ্ঞা অবিচলিত!'

সীতা। 'তবে আদেশ দিন, আমি বিদায় হই।' অতিশয় ক্ষীণ দুঃখের স্বরে সীতাপতি এই কথাগুলি বলিলেন। শিবজী চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার নয়নে জলবিন্দু।

তখন সস্নেহে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন—"গোস্বামিন্! দোষ গ্রহণ করিবেন না; আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে ভুলিব না; রায়গড়ে আপনার বীর পরামর্শ, দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থ আপনার এতদূর উদ্যোগ চিরকাল আমার হৃদয়ে জাগরিত থাকিবে! বিদায় কি জন্য? যতদিন দিল্লীতে থাকিবেন আমার এই অট্টালিকায় থাকুন, এস্থানে আমার বিপদ আছে, আপনার নাই।'

সীতা। 'প্রভু! আপনার মিষ্টবাক্যে যথোচিত পুরস্কৃত হইলাম; জগদীশ্বর জানেন আপনার সঙ্গে থাকা ভিন্ন আমার আর অন্য অভিলাষ নাই; কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়, ব্রত সাধনের জন্য নানাস্থানে নানাকার্য্যে যাইতে হয়, এখানে অবস্থিতি অসম্ভব।'

শিব। 'এ কি অসাধারণ ব্রত আমি না। কিন্তু দিবসে এক দিনও আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম না; রজনীযোগে অন্ধকারে এইরূপ রক্তচন্দনাবৃত হইয়া জটা ধারণ করিয়া এক এক বার দেখা দেন, দুই একটি বাক্যে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত করেন, পুনরায় কোথায় চলিয়া যান আর দেখিতে পাই না! সীতাপতি! এ কি কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছেন?'

সীতা। 'সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটি অঙ্গ এই যে, দিবসে রাজদর্শন নিষিদ্ধ!'

শিব। 'ভাল এ ব্রত কি উদ্দেশ্যে ধারণ করিয়াছেন?'

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সীতাপতি বলিলেন,—'আমার ললাটে একটি অমঙ্গল লিখন আছে,—আমার ইষ্টদেবতা, যাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে প্রাণের সহিত পূজা করিয়াছি, যাঁহার নাম জপ

করিয়া জীবন দিতে আমি আনন্দ বোধ করিব, বিধির নির্ব্বন্ধে তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট ! সেই অসন্তোষ খণ্ডনার্থ এই ব্রত ধারণ করিয়াছি।'

শিব। 'এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল ? কেবা আপনাকে অমঙ্গল খণ্ডনার্থ এ ব্রত ধারণ করিতে বলিল ?'

সীতা। 'কার্য্যবশতঃ আমি স্বয়ংই প্রথমটি জানিতে পারিলাম ; ঈশানী-মন্দিরে একজন সতী সাধ্বী যোগিনী আমাকে এই ব্রত ধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, তবে সে ভগিনীসম স্নেহময়ীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব ; যদি কৃতার্থ না হই তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ত্যাগ করিব। যাঁহার সন্তোষার্থ জীবনধারণ করিতেছি, তিনি অসন্তুষ্ট থাকিলে এ জীবনে আবশ্যক কি ?'

শিবজী দেখিলেন, গোস্বামীর নয়নে জলবিন্দু,—তাঁহার নিজের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না ; বলিলেন—

'সীতাপতি ! যাহা বলিলেন যথার্থ ; যাহার জন্য প্রাণপণ করি তাঁহার তিরস্কার, তাঁহার অসন্তোষ অপেক্ষা জগতে মর্ম্মভেদী দুঃখ আর নাই।'

সীতা। 'প্রভু কি এ যাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন' ?

শিব। 'জগদীশ্বর আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি একজন নির্দ্দোষী বীরপুরুষকে এই যাতনা দিয়াছি ;—সে বালকের কথা মনে হইলে এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।'

প্রায় উদ্বেগ-রুদ্ধকণ্ঠে সীতাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তাঁহার নাম কি ?'

শিবজী বলিলেন, 'রঘুনাথজী হাবেলদার।'

শিবজী বলিলেন, 'রঘুনাথজী হাবেলদার !' ঘরের দীপ সহসা নির্ব্বাণ হইল।

শিবজী প্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় অতি কষ্টোচ্চারিত স্বরে সীতাপতি বলিলেন, 'দীপ অনাবশ্যক,—বলুন,—শ্রবণ করিতেছি।'

শিব। 'আর কি বলিব ! তিন বৎসর অতীত হইয়াছে সেই বালকবেশী পুরুষ আমার নিকট আইসে ও সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উদার। সীতাপতি ! আপনারই ন্যায় তাহার উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনা অপেক্ষা অল্প ; আপনার ন্যায় বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার ন্যায়ই দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব ও অকুতোভয়তা সর্ব্বদা বিরাজ করিত ! আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেখি,—আপনার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, আপনার বীরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা তখনই হৃদয়ে জাগরিত হয় !'

'তাহার পর ?'

'সেই বালককে যে দিন প্রথম দেখি-

লাম, সেই দিন প্রকৃত বীর বলিয়া চিনিলাম ; সেই দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম ;—রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের সময় সর্ব্বদা আমার ছায়ার ন্যায় নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুরেখা ভেদ করিয়া মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া সিংহনাদে অগ্রসর হইত ! এখনও বোধ হয় তাহার সেই বীর আকৃতি সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন, আমি দেখিতে পাইতেছি।

'তাহার পর।'

'এক যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, অন্য এক যুদ্ধে তাহারই বিক্রমে দুর্গ জয় হইয়াছিল, কত যুদ্ধে আপন অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল ! '

'তাহার পর '

'আর জিজ্ঞাসা করেন কি জন্য ; আমি একদিন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই চিরবিশ্বাসী অনুচরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিলাম ; শেষ পর্য্যন্তও রঘুনাথ একটিও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই ; যাইবার সময়ও আমারদিকে মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেল।' শিবজীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিলেন না ; অনেকক্ষণ পরে সীতাপতি বলিলেন—

'আক্ষেপের কারণ কি ? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম্ম। '

'শিব। 'দোষী ! রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি কুক্ষণে ভ্রান্ত হইলাম, জানি না। রঘুনাথের যুদ্ধস্থানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিলাম। মহানুভব জয়সিংহ পরে এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন,—জানিয়াছেন যে তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ যুদ্ধপূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ লইতে গিয়াছিল, সেই জন্যই বিলম্ব হইয়াছিল। নির্দ্দোষীকে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম,শুনিয়াছি সেই অবমাননায় রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধে সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছি। '

শিবজীর কথা সাঙ্গ হইল ; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন—'সীতাপতি ! ' কোনও উত্তর পাইলেন না। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন,—সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই। সীতাপতি গোস্বামী সহসা অদৃশ্য হইলেন কি জন্য ? সীতাপতি গোস্বামী কে ?

জীর্ণোদ্ধার।

অর্থাৎ।

প্রাচীন আর্য্যজাতির জ্ঞান সমালোচনা

সলিল।

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুরাতন আর্য্যদিগের জ্ঞানানুসন্ধান মানসে আমরা ‘ জীর্ণোদ্ধার ’ ইত্যভিধেয় মুকুটার্পণ করিয়া একটি প্রস্তাব আরম্ভ করি। * নানা কারণে প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। সম্প্রতি তাহার পুনরারম্ভ করিলাম।

তৎকালে উহা কি পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার আংশিক পরিচয় প্রদান করিতেছি; ফল, প্রস্তাবপাঠের পূর্ব্বে পাঠকবর্গ একবার সেই প্রস্তাবটি দেখিয়া লইবেন ইহা আমাদিগের অনুরোধ। দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে এরূপ আকারের অর্থাৎ খণ্ড প্রস্তাব বলিয়া অধৈর্য্য বা অবধীরণার বশ হইবেন না।

বৃষ্টির কারণ, মেঘের স্তর ও স্তরীভূত মেঘের নাম ঐরাবত, এই সকল বিষয় পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ‘ মেঘস্যোপরি যো মেঘঃ স ঐরাবত উচ্যতে ’ এই শাস্ত্র বচন দ্বারা জানা যাইতেছে যে ঐরাবত হস্তির জল বর্ষণ আর স্তরীভূত মেঘের জল বর্ষণ অভিন্ন কথা। হস্তি শব্দটি স্তরীভূত মেঘের রূপক মাত্র। জলবর্ষণকারী তাদৃশ মেঘেরই রূপক নাম ঐরাবত, অপর নাম ‘ অভ্রমাতঙ্গ।’

‘ জলানামাকরোর্ণবঃ ’—জল মাত্রেরই প্রধান আকর সমুদ্র। ভূ—বাষ্প ও সামুদ্রিক জল সূর্য্যকিরণ দ্বারা বাষ্পীভূত ও মেঘরূপে পরিণত হইয়া কালে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হয়, এই ব্যাপার তৎকালীয় কোন আর্য্যেরই অজ্ঞাত ছিল না।

তরল পদার্থ মাত্রেই নিম্নগামী; সুতরাং পর্ব্বতাদি উচ্চস্থানের প্রবিষ্ট জলরাশি একত্রিত হইয়া নিম্নে প্রধাবিত হয় বলিয়া তাহাদিগের নাম ‘ নিম্নগা।’ প্রবাহের অল্পত্ব ও ঘনত্ব অনুসারে কেহ নদ কেহ নদী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইহা মনে করিবেন না যে বৃষ্টির জলই নদ নদীর একমাত্র কারণ। কোন কোন নদী, উৎস-প্রবাহ দ্বারাও উৎপন্ন

* ১২৮৩ শালের কার্ত্তিক। অগ্রহায়ন মাসের বান্ধব দেখ।—

হইয়া থাকে। যেসকল জল, পৃথিবীর অন্তরাকর্ষণ শক্তি দ্বারা অভ্যন্তর-প্রবিষ্ট না হইয়া ছিদ্রময় পথে সর্ব্বদা স্রবিত হয়, তাহাই কোন বিশেষ ছিদ্র দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইলে উৎস নামে অভিহিত হয়। এই উৎস কোন স্থানে ফোয়ারার ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিয়া ভূমিতে পুনঃপতিত হইয়া নিম্নে গমন করে, কোথাও বা কুণ্ডরূপে পরিণত হইয়া তথা হইতে অধোগমন করে। পরন্তু যেস্থানে উৎস উৎপন্ন হয়, সেই স্থানটিই নদীর যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি ভূমি। নদীসকল যেস্থানে প্রথম উৎপন্না হয়, সে স্থানে তাহার আয়তন অতি অল্প থাকে। ক্রমে অগ্রসারিণী হইয়া অন্যান্য প্রবাহের সংযোগ ও কোমল মৃত্তিকার ভেদ হেতু বিপুল বিস্তারতা লাভ করে।

কোন কোন নদী পথিমধ্যে অন্তর্হিতা হইয়া কিয়দ্দূর গমনকরতঃ পুনরায় প্রকাশ্য প্রবাহে আত্মশরীর প্রকাশ করে। পুরাকালের আর্য্যেরা এইরূপ নদীকে ‘ অন্তর্বাহিনী ’ এবং যেস্থান দিয়া উহারা প্রবাহিত হয় সেই স্থানগুলিকে ‘ বিনশন ’ আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইয়ুরোপীয় ভূতত্ত্ববেত্তারা বলিয়া থাকেন, যে নদী পথিমধ্যে নিম্নে কোমল মৃত্তিকা ও উপরে অতি দৃঢ় পর্ব্বতখণ্ড প্রাপ্ত হয়, সেই সকল নদীই তৎস্থানে নিম্নস্থ কোমল মৃত্তিকা ধৌত করিয়া পৃথিবীর অন্তর্ভাগ দিয়া প্রবাহিত হয়।

পুরাতন আর্য্যেরা যখন বিশেষ বিশেষ প্রবাহের নামকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রবাহের উপর নদী আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ‘ যে জলপ্রবাহ উচ্চস্থান হইতে নির্গত হইয়া অষ্ট সহস্র ধনু অর্থাৎ অন্যূন দুই ক্রোশ স্থান ব্যাপ্ত হইতেছে তাহারা নদী। এতদপেক্ষা ন্যূন প্রবেশগামী প্রবাহ, নদী নামের যোগ্য নহে। ’

নদী সমূহের গতি সরল নহে। ভূমির দৃঢ়তা ও তরল পদার্থের স্বভাব অনুসারে নদী সকলের গতি সর্পের ন্যায় কুটিল হইয়া থাকে। শ্রবন্তী সমূহের গতি যদি কুটিল না হইত, তাহা হইলে তাহাদের বেগের এরূপ প্রাখর্য্য জন্মিত যে তদ্দ্বারা দেশের বহুতর অনিষ্ট সংঘটিত হইত।

বর্ত্তমানকালীয় দ্বৈপায়ন পুরুষেরা নদী সকলের বিশেষ বর্ণনার নিমিত্ত তদীয় প্রবাহের গতি বিশেষকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন। এক পার্ব্বত্যাংশ —ইহা পর্ব্বত তটে পরিবেষ্টিত ও সমধিক বেগ বিশিষ্ট; দ্বিতীয় মধ্যাংশ—ইহা সমভূমি স্থিত মধ্য বেগ বিশিষ্ট ও সর্পের ন্যায় কুটিলগামী। তৃতীয় সঙ্গমাংস—ইহা লঘু বেগান্বিত এবং গম্যস্থান সকল কোমল মৃত্তিকা বিশিষ্ট হওয়ায় তাহারা সঙ্গম কালে প্রায় বহুধারা-বিভক্ত ও তথায় ত্রিকোণ ভূমির উৎপাদক।

এতদ্দেশীয় পুরাতন পণ্ডিতেরা তিন ভাগ না করিয়া চারিভাগ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শীঘ্রবহা, তির্য্যকস্রোতা, মৃ-

দুবাহিনী ও অন্তঃসলিলবাহিনী বা বিনশন। ভারতবর্ষে—যত নদ নদী আছে, পুরাতন পণ্ডিতেরা তত্তাবতের বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ছিলেন। কোন্ নদী কিরূপ স্বভাব বিশিষ্ট এবং কিম্বিধ গুণাক্রান্ত তাহা তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণদ্বারা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিমালয়-প্রভব নদী সকলের জল অদুষ্ট এবং বিন্ধ্য ও সহ্য প্রভৃতি পর্ব্বত-প্রভব নদীর জল বিশেষ রোগজনক,ইত্যাদি গুণাগুণবর্ণনা শুশ্রুতগ্রন্থের ৪৫ অধ্যায়ে বহুপরিমাণে আছে এবং কোন্ নদী কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও বর্ণিত আছে; বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয় সংগ্রহ করিলাম না এবং সেরূপ সংগ্রহ এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্যও নহে।

সলিলের সহিত চন্দ্রমণ্ডলের এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে। এই আশ্চর্য্য সম্বন্ধের প্রকৃত রূপ ও কারণ কি? ইহা আমরা জানি না। তিথি-বিশেষে যেমন সমুদ্রজল উচ্ছ্বসিত হয়, তেমনি মনুষ্য শরীরের রস নামক জলও উচ্ছ্বসিত হয়। সুস্থ ব্যক্তি ইহা অনুভব করিতে পাকন বা না পাকন, জলীয় পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। চন্দ্র-কলার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সাগর-জলের হ্রাস বৃদ্ধি (স্ফীতোপচয়তা) হয়, পুরাতন আর্য্যেরা যে দিন ইহা জানিতে পারিয়া ছিলেন, সেই দিনেই জলরাশি সাগরের "সমুদ্র" এই আখ্যা প্রদান করিয়া ছিলেন। ইহা 'সমুদ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা অবগত হওয়া যায়। পরন্তু চন্দ্রের সহিত সলিলের যে সম্বন্ধ আছে এবং কিরূপ চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধ্যনুসারে সিন্ধু সলিলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, ইহার স্পষ্ট বিবরণ আমরা সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে অদ্যাপি দেখিতে পাই নাই। যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা অলীক কল্পনা বলিয়াই উপলব্ধি হইল। শ্বেতদ্বীপের পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, চন্দ্রের আকর্ষণ দ্বারাই সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হয়। ইঁহারা আরও বলেন যে, পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েরই আকর্ষণ শক্তি আছে; চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আপন কক্ষায় পরিভ্রমণ করেন। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। পরন্তু চন্দ্রের আকর্ষণেই পৃথিবীর গাত্র-লগ্ন সমুদ্রের-জল তরল পদার্থ বলিয়া উচ্ছ্বসিত হয়।

পৃথিবীর যে ভাগ যখন চন্দ্রের নিম্নে অবস্থিতি করে, তখন সেই ভাগস্থিত সমুদ্র-জল উচ্ছ্বসিত হয়। পরন্তু ঠিক্ এই রূপ না হইলে অহোরাত্রের মধ্যে একবার মাত্র জোয়ার হইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ উক্ত কালের মধ্যে দুইবার জোয়ার হওয়া সর্ব্ব প্রত্যক্ষ। সুতরাং উহার মধ্যে অপর একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকা নির্ণয় করিতে হইবে। তাহা এই—

পৃথিবীর যেভাগ যখন চন্দ্রের ঠিক নিম্নে থাকে, তখন তাহার সেইভাগ, অন্য ভাগ অপেক্ষা নিকট হয়; সুতরাং সেই ভাগস্থ জল চন্দ্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়

এবং তাহার নিম্নভাগস্থ জল আকর্ষণের অক্ষমতা প্রযুক্ত নত হয়। এই নিমিত্ত উভয় স্থানেই এক সময়ে জোয়ার উৎপন্ন হয় এবং উক্ত জোয়ারের পার্শ্বের জল সরিয়া গেলেই পার্শ্বদ্বয়ে ভাঁটা হইয়া থাকে। এই রূপেই দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার জোয়ার হয়। অপিচ, যে সময়ে জোয়ার হয়, সেই সময়ে উক্তরূপে পৃথিবীর উভয় ভাগের জল মত ও উন্নত হইলে পৃথিবী অণ্ডাকৃতি ধারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু চন্দ্রের নিয়ত গমন ও পৃথিবীর নিয়ত ঘূর্ণন হেতু সমুদ্রের এক স্থানের জল চন্দ্রমণ্ডলের আকর্ষণ দ্বারা স্ফীত হইতে হইতে চন্দ্র অন্য স্থানের উপর উদিত হয়; সুতরাং সমুদ্র জলের স্ফীততা ক্ষণকালের অধিক স্থিরীভূত হইতে পারেনা। এজন্যই তৎকালে পৃথিবী অণ্ডাকৃতি ধারণ করিতে পারেনা।

দ্বৈপায়ন জাতির এবম্বিধ বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা বোধ হয় কোন সস্কৃত গ্রন্থে নাই। আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তদনুসারেই ইহা বলিতেছি। ফল, চন্দ্রমণ্ডল যে সমুদ্রজলস্ফীততার কারণ, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জল ও চন্দ্রমণ্ডল ঘটিত অন্যান্য বিষয়গুলি 'চন্দ্রমণ্ডল' নামক প্রস্তাবে ব্যক্ত করিব। এক্ষণে চিকিৎসার উপযোগী কতিপয় জল গুণ বর্ণনা করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

চিকিৎসা শাস্ত্র, জলকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। আন্তরীক্ষ ও ভৌম। আকাশাগত বৃষ্টি-জলের নাম 'আন্তরীক্ষ' আর তাহা পৃথিবীস্থ হইলে 'ভৌম' বলিয়া আখ্যাত হয়। আন্তরীক্ষ জলের কি রস আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলা যায় না। ফল, এই আন্তরীক্ষ জল, অমৃততুল্য উপকারক।—আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর, তৃপ্তিকর, ধাতুপোষক, মনঃস্থৈর্য্যকারক, শ্রমনাশক, এবং ক্লান্তি ও পিপাসাহর—ইত্যাদি বহুগুণসমাযুক্ত। ভৌমজল স্থানবিশেষে, বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে; তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইমাত্র নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে যে, মৃত্তিকাসংস্পৃষ্ট হয় বলিয়া অনেক পরিমাণে মৃত্তিকার গুণ বর্ত্তে; সুতরাং যে দেশের বা যে স্থানের মৃত্তিকার যেরূপ গুণ, তত্রস্থ জল ও কিয়দংশে তদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জানিতে হইবেক। আন্তরীক্ষ জলই সর্ব্বোত্তম হিতকারী, অভাবে আকাশ-গুণ-বহুল-স্থান জল সুপথ্য। আকাশ-গুণপ্রধান স্থানের জলে কোন বিশেষরূপ রসবত্তা অনুভব হয় না এবং তাহা লঘু হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোল্লিখিত 'অন্তরীক্ষ' জলের আবার চারি প্রকার প্রভেদ আছে। 'ধার' 'কার' 'তৌষার' এবং 'হৈম'।

ধার—বৃষ্টিধারার জল। কার—কৃত্রিম জল। * তৌষার—কুঝটিকা। হৈম

* এস্থলে কৃত্রিম জল কি! তাহা বুঝি না। প্রাচীন কালেও কি বাষ্প জমাইয়া জল করিবার প্রথা ছিল?

বরফের জল। এই চতুর্ব্বিধ জলের মধ্যে 'ধার' জলই পথ্য ও সেবনীয়। অন্যগুলি অপথ্য ও প্রায়শঃই সেবার অযোগ্য।

ধার জল দুই প্রকার। গাঙ্গ ও সামুদ্র। সমস্ত বর্ষাকাল ব্যাপিয়া যে বৃষ্টিধারা পতিত হয়, মনে করিবেন না সকল সময়ের বৃষ্টির জল সমান। মেঘেরাও ভিন্ন ভিন্ন মাসে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জল বর্ষণ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মেঘেরা 'গাঙ্গজল' প্রায় আশ্বীন মাসেই বর্ষণ করিয়া থাকে ; এবং অন্যান্য মাসে কখন২ বর্ষণ করে।

'আশ্বিন মাসের বৃষ্টির জল, গাঙ্গজল, আর ভাদ্র মাসের বৃষ্টির জল সমুদ্রের জল , একথা কিরূপ বিশ্বাস হইবে। কিরূপেই বা জানা যাইবে ?

'দ্বয়োরপি পরীক্ষণং কুর্ব্বীত'—দুই প্রকার জলেরই পরীক্ষা করিবে, পরীক্ষা করিলেই গাঙ্গজল কি সামুদ্রজল জানা যাইবে। বৃষ্টিজলের গাঙ্গত্ব ও সামুদ্রত্ব অবরোধের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পরীক্ষা নির্ব্বাচিত আছে। যথা—

শালি ধান্যের পরিস্কার তণ্ডুল লইয়া তাহা না এঁবে যায় এরূপ করিয়া পাক কর। সেই অন্ন পিণ্ডাকৃতি করিয়া তাহা চাঁদি রূপার পাত্রে রাখ। টাট্‌কা থাকিতে থাকিতে তাহা বৃষ্টির সময় বাহিরে রাখিয়া দাও। এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ অন্যূন দুই দণ্ড রাখিলেও যদি সেই অন্নপিণ্ডের রঙ্‌ ঠিক্‌ থাকে এবং অন্য কোন প্রকার ক্লেদ ভাব লক্ষ্য না হয়, তবেই সেই বৃষ্টির জলকে " গাঙ্গ ' বলিয়া গ্রহণ কর। আর যদি শীঘ্র শীঘ্রই বিবর্ণ হইয়া যায় সিক্‌থ (মোম) ও ক্লেদের মত কোন প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে বৃষ্টির জল " সামুদ্র " জানিয়া পরিত্যাগ কর। গাঙ্গ বর্ষণের জল উপকারী আর সমুদ্র বর্ষণের জল অপকারী। কিন্তু অন্যান্য মাস অপেক্ষা আশ্বিন মাসের সমুদ্রজলবর্ষণ অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ হয়। এখন সকল মাসেই সমুদ্র জলবর্ষণ হয়, মেঘেরাই এক্ষণে মলারিষ্ট বায়ু (ম্যালেরিয়া) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শীত, গ্রীষ্মাদি কালের নিমিত্ত 'ধার' জল ধরিয়া রাখা আবশ্যক। রাখিবার নিয়ম এইরূপ—বৃষ্টির সময় উত্তম পরিষ্কার শুভ্র বস্ত্র টানাইয়া দাও। নীচে সুবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র কি মৃণ্ময়পাত্র অথবা কাঁচপাত্র রাখ। জলপূর্ণ হইলে তুলিয়া রাখ,কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হইবে না। সুপরিষ্কৃত হর্ম্ম্যপৃষ্ঠ হইতে ধৃত করিলেও হইতে পারে।

এরূপ জলের অভাবে কাযে কাযেই 'ভৌম' জল ব্যবহার করিতে হয় ; সুতরাং ভৌম জলের বিবরণও কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করা যাইতেছে। ভৌমজল প্রধানতঃ সপ্তপ্রকার। সপ্তবিধ ভৌমজলের দোষ গুণ ও জল পরিষ্কার নিয়মাদি আগামী প্রস্তাবে ব্যক্ত করা যাইবেক।

প্রেততত্ত্ব।

(প্রথমপ্রস্তাব)

আজি কালি সভ্যসমাজে প্রেততত্ত্ব লইয়া মহা গোলযোগ বাঁধিয়াছে। একদিকে ইয়োরোপ ও অপরদিকে আমেরিকা এই ভৌতিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছেন। যোগনিরত ঋষিগণও বড় সাধারণ লোক নহেন। তাঁহারা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও সভ্যসমাজের আদর্শ স্থল। তাঁহাদিগের বিজ্ঞান ও দর্শনজ্ঞানে সভ্যজগৎ মুগ্ধ। সুতরাং শীঘ্রই যে তাঁহারা তাঁহাদিগের কঠোর তপস্যার ফল পাইবেন, এরূপ আশা বড় অসম্ভব নয়। তাঁহারা আশানুরূপ ফল পাউন বা নাই পাউন, কিন্তু যে টুকু পাইয়াছেন তাহাতেই মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। দেহশূন্য আত্মার সহিত তাঁহারা কথা কহিতে পারেন। এবং সেই আত্মার সহায়েই ভূত, ভবিষ্যৎ ইহকাল ও পরকালের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারেন। ব্যাপারটি বড় সাধারণ নয়। মুনি ঋষিগণ যে পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির করিয়া কখন বলিতে পারিলেন না যে, পরকাল আছে বা পরকাল নাই, সেই পরকালের নাড়ী নক্ষত্র পর্য্যন্ত এই সকল বিদেশীয় পণ্ডিতেরা অল্পদিনেই জানিতে পারিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে; এই সকল আত্মারা উক্ত পণ্ডিতদিগের একান্ত বাধ্য। আহূত হইবা মাত্রই তাঁহারা পণ্ডিতদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হন। এবং তাঁহাদিগের ইচ্ছানুরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া চলিয়া যান।

উপর্য্যুক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকেই যে সন্দিহান হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। অনেকে ভাবিবেন, ঘটনা কিয়ৎপরিমাণে অতিরঞ্জিত হইয়াছে। হয় প্রস্তাবলেখক নয় প্রস্তাবের মূলপুস্তকলেখক, যাহা হউক, একটা কারখানা করিয়াছেন। যাঁহারা এরূপ মনে করিবেন, তাঁহাদিগকে এইমাত্র বক্তব্য, যে তাঁহারা কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমাদিগের প্রস্তাবের সারার্থ ব্যাখ্যার জন্য আমরা যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিব, এবং প্রেতসম্বন্ধীয় যে সকল দৃষ্টান্ত দিব, তাহাতেই তাহাদের এ ভ্রম দূর হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু একদিকে যেমন প্রেতপক্ষসমর্থনার্থ আগ্রহ জন্মিয়াছে, অন্যদিকে আবার কতকগুলি ব্যক্তি এই মতের উচ্ছেদসাধন জন্য খড়্গহস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের কয়েকজন প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি ঘটনা অলীক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। উভয় পক্ষেই কৃতি এবং

উভয় পক্ষেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ আছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের কোন পক্ষই অবলম্বন না করিয়া আমরা সাধারণতঃ প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস জনসমাজে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই সকল সময়ে সকল প্রদেশে প্রেতের প্রতি যথেষ্ট সম্মান করিয়া আসিতেছেন। বিশেষ বাঙ্গালীর ঘরে ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির বড় অনুগ্রহ। অশ্বত্থ বৃক্ষ, বটবৃক্ষ বা কোন নিম্ববৃক্ষ ইহাদিগের বাসস্থান। এবং যে সকল বাটীতে এই প্রকারের বৃক্ষ আছে সেবাটির স্ত্রীলোকদিগকে বড় সশঙ্কিত থাকিতে হয়। কোনরূপে অপদস্থ হইলে ইহারা গৃহস্থদিগের কাহারও না কাহারও স্কন্ধে চাপিয়া এ অপমানের প্রতিহিংসা লন। এইরূপ পিশাচাক্রান্তদিগের রোজা নামধারী একপ্রকার চিকিৎসকও আছেন। তাঁহারা মন্ত্রপ্রভাবে গৃহের মঙ্গল স্থাপন করিতে পারেন। এবং প্রেতের চতুর্দ্দশ পুরুষ যাহাতে গৃহের ত্রিসীমায় আর আসিতে না পারে সেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে বঙ্গীয়ভূত এবং রোজায় বিশ্বাস শিক্ষিতদিগের মধ্যে নাই বলিলেই হয়। তাঁহাদিগের একাধিপত্য স্ত্রীলোক এবং অশিক্ষিতের মধ্যে। অশিক্ষিতদিগের মধ্যেও অনেকে আবার ইহার মূলতত্ত্ব জানে। বঙ্গীয় ভূত যে বাস্তবিক দুষ্ট মনুষ্য, এবং রোজামহাশয়েরা যঞ্চুকহরি, ইহা অনেক পূর্ব্ব হইতে বঙ্গের সাধারণ বিশ্বাস*। বাটিতে ভূতের উৎপাৎ হয় বলিলেই অনেকে বলিয়া থাকেন, বাটির স্ত্রীলোকদিগকে সাবধান করিও।

কিন্তু কোন ব্যাপার যত কেন মিথ্যা হউক না, তাহার অভ্যন্তরে কিছু না কিছু সত্য থাকিবেই থাকিবে†। সত্যশূন্য মিথ্যা এজগতে সম্ভবে না। আমরা দেখিতেছি, যেখানে একদল কোন মতকে ক্ষিপ্ত মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, আর দল সেই মতেরই বিশেষ পক্ষপাতী। সুতরাং সেই মতের মধ্যে কিছু না কিছু সত্য অবশ্য আছে, নহিলে এত লোক তাহারভক্ত হইত না।

এই জন্যই আমাদিগের জিজ্ঞাস্য যে, বঙ্গীয় ভূতদিগের কোনরূপ অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাসের জন্ম কোথা হইতে থাকিল? এই বিশ্বাসের মূল আত্মার অমরত্ব। দেহমধ্যে

* কিছু দিবস পূর্ব্বে কোন রোজা এক গৃহে ভূত ছাড়াইতে গিয়া ভূতের আহারের জন্য দধি প্রার্থনা করিয়াছিল। গৃহস্বামী ভূতকে বিশেষ জব্দ করিবার জন্য দধিতে পারা মিশাইয়া দিয়াছিল, পরদিবস দেখিল যে রোজা মুখে লাল কাটিতেছে। এই ঘটনাটি কোন সপ্তাহিক সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হয়। এরূপ ঘটনার অপ্রতুল নাই।

† "Falsity has a nucleus of reality"——H. Spencer.

আত্মা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ থাকে কি না? যদি থাকে সে কোথায় থাকে, কেন থাকে, কি উদ্দেশে থাকে? তাহার কোন প্রমাণ আছে কি না? এসকল প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদিগের সময় নাই, সাধ্যও নাই। যাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত, তাহার মীমাংসা কে করিবে? এই কথা মীমাংসার জন্য কোন দুই পণ্ডিতের মত ঠিক মিলিল না। কথাই আছে ' নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং "। এই জন্য আত্মার অস্তিত্বসম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ আমরা দিব না। তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস সাধারণ বিশ্বাস। সকল সমাজের অভ্যন্তরেই এই বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। হয়ত দুই চারি জন এই বিশ্বাসের শত্রু, কিন্তু দুই চারিজনের মত ধর্ত্তব্য নহে। তাহাদিগের মত সমাজের মত নহে। সমাজ তাহার জন্য দায়ী হইতে পারেন না। সাধারণের মতই সমাজের মত।

সুতরাং মৃত্যুর পর যদি আত্মা থাকে, তবে সে কোন না কোন স্থানে থাকিবেই থাকিবে। যদি এতদূর হয়, তবে মানুষের সহিত সাক্ষাৎ কেন না করিবে? যে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যের সহিত আলাপ করিয়া এতদিন কাটাইল, সে কি একদিনে সব ভুলিয়া যাইবে। যেই ইহলোক ছাড়িল, অমনি কি সকলকে স্মৃতির অন্ধকারগহ্বরে নিক্ষেপ করিবে। মানুষ ডাকিলে সে কেন না আসিবে? কিন্তু যে-সে ডাকিলে আসিবে না। সে যাহাকে ভাল বাসে সেই ডাকিলেই আসিবে। বাঙ্গালায় রোজা না ডাকিলে আসিবে না; বিলাতে ও ইউনাইটেডষ্টেটে মধ্যস্থ (Medium) না ডাকিলে আসিবে না। আবার যেমন তেমন করিয়া ডাকিলে আসিবেনা। আয়োজন করিয়া ডাকা চাই। এই কারণে প্রেতাহ্বানের জন্য নানা স্থলে নানারূপ আয়োজন হইয়া থাকে।

আমরা রোজাদিগকে পূর্ব্বে যে পরিহাস করিয়াছি, ইহাতে হয়ত অনেকে মনে করিয়াছেন, রোজাদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে বাঙ্গালায় জন্মিয়াছে। বিলাতে জন্মিলে তাহারাও ' গণ্ডায় ' ' গুা ' দিয়া চলিয়া যাইত। লেখকের বিশ্বাস আছে যে, বিলাতের সকলই ভাল, বাঙ্গালির কিছুই ভাল নহে ইত্যাদি। বাস্তবিক তাহা নহে। বাঙ্গালায়ও আমরা দুই চারি জন সন্ন্যাসীর কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, এবং আরও অনেকের কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি। ইহারা পিশাচসিদ্ধ নামে পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদিগের ঘটনাবলী দেখিলে শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমরা যথাস্থানে ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিব। অন্যদিকে আবার বিলাতের সকলই যে ভাল তাহা নহে। ইচ্ছা করিলে আমরা ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমরা একত্রীভূত রাজ্য (United States) হইতে একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। ক্লিণ্ট নামক একজন

সাহেব উক্তস্থানে একজন মধ্যস্থ বলিয়া পরিচিত। প্রেতের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয়, এবং এই ব্যবসায়ে তিনি বিপুল অর্থোপার্জ্জনও করিয়াছেন। তিনি পরলোক হইতে সংবাদাদি আনিয়া দেন। জীবিত মনুষ্যেরা যদি তাহাদিগের মৃত বন্ধু, পিতা, মাতা, প্রণয়িণী প্রভৃতি স্বজনদিগের সহিত কথোপকথন করিতে ইচ্ছা করেন, ফ্লিট সাহেব তাহার মধ্যস্থ হইয়া সহায়তা করিতে পারেন। তাঁহার সাহায্যের পদ্ধতিটা এইরূপ—যাহার কথা কহিবার প্রয়োজন, তিনি পরলোকস্থ আত্মীয়ের নামে পত্র লিখিয়া উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া ফ্লিটের হস্তে দেন। পরদিন পত্র ফিরিয়া পান। পত্র বহির্দ্দিকে পূর্ব্বমত বন্ধ। কিন্তু পত্র খুলিয়া দেখেন যে, পত্রের সহিত মৃত আত্মীয়ের উত্তর রহিয়াছে। কেহ প্রণয়িণীকে লিখিতেছেন, কবে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে; কেহ পিতাকে লিখিতেছেন, আমার জীবনপথ সুখপূর্ণ বা কণ্টকময় ইত্যাদি; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথাসম্ভব উত্তর পাইয়া থাকেন। সম্প্রতি এই ঘটনার একটি ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা প্রকাশের কারণ ফ্লিট সাহেবের সহিত তাঁহার বনিতার মনবিচ্ছেদ। বিশ্বাসঘাতিনী বনিতা এক্ষণে সাধারণকে জানাইতেছেন যে, তাঁহার স্বামী পত্র খুলিবার একটি অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এবং তদ্দ্বারা সকল পত্র খুলিয়া আপন মনোমত উত্তর লিখিয়া পত্র পুনশ্চ পূর্ব্বমত বন্ধ করিয়া পত্রপ্রেরককে ফিরিয়া দেন *। এইত গেল আধুনিক সভ্যতম জাতিদিগের প্রেততত্ত্ব। যদি এতদূর হয়, তবে দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে যে রোজাদিগের সময়ে সময়ে পশার হইবে তাহার আশ্চর্য্যতা কি? বিদেশীয়দিগের সকলই ভাল, এ কথা আমরা বলি না, যাঁহারা বলেন তাঁহাদিগেরই জন্য এই দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম। ইচ্ছা থাকিলে এই মত আরও কতশত উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

প্রেততত্ত্ববাদীরা ক্ষমা করিবেন, সকলেই যে এইরূপ এ কথা আমরা বলিতেছি না। বিলাতে ও ইউনাইটেড-ষ্টেটেও এক সম্প্রদায় আছে, যাঁহাদিগের শিক্ষা ও অধ্যবসায়ে বাস্তবিক আমরা মুগ্ধ। পৃথিবীতে ভাল মন্দ উভয়ই একত্র মিলে। ভাল মন্দ না হইলে কিছুই হইতে পারে না। যে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ অক্ষয় যশঃ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কতলোক পাপ সোপানে অবতরণ করিতেছে। যে তীর্থে ভক্ত পূজা করিতে যায়; সেই খানেই পাপের ছড়াছড়ি। দেবতা সান্নিধ্যে পাপ হয় না বলিয়া দুষ্ট ভক্তের নামে কালি দেয়। যেখানে মহাত্মা রামমোহন রায়ের নাম, সেখানে এখন কি বলিতে লজ্জা করে।

* Indian Mirror—Saturday—2nd June. 1877—সম্পাদকীয় স্তম্ভ।

কিন্তু যাঁহারা এই মন্দের জন্য ভালর নিন্দা করেন তাঁহারাও ভ্রান্ত। যাঁহারা তীর্থস্থানের পাপ দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করেন, বা আধুনিক গোঁড়া ব্রাহ্মদলের আচরণ দেখিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগকে আমরা কি বলিয়া ডাকিব ? এই জন্যই প্রেততত্ত্বমধ্যে এত ভণ্ডামি দেখিয়াও সকলেই যে এইরূপ ভণ্ড তাহা আমরা বলিতেছি না। রবার্ট হেয়ার *, সারজণ্ট, ফক্স, জেডেভিস প্রভৃতি মহাত্মারা যে সজ্ঞানে সাধারণকে বঞ্চনা করিবেন ইহা আমরা স্বপ্নেও বিশ্বাস করি না।

আমরা পুর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রেততত্ত্ববাদীদিগের মুলমন্ত্র দেহশূন্য আত্মার সহিত কথোপকথন। এই তত্ত্বাবিষ্কারের প্রারম্ভেই ইউনাইটেড্ ষ্টেটে এক ভয়ানক আন্দোলন হয়। যখন মেসমার (Mesmer) সাহেব প্রথমতঃ ভৌতিক শক্তির দ্বারা মনুষ্যকে অজ্ঞান করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন, সেই সময়ের আন্দোলনও প্রায় এইরূপ হইয়াছিল ; প্রথমে মেসমারকে কত লোকে কত কথা বলিয়াছিল, কত পরিহাস করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার উদ্ভাবিত মত এখন পর্য্যন্তও সমান অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে †। প্রেততত্ত্ববাদীরা বলেন দেখ আমাদিগের মত প্রথমে ইউনাইটেড-ষ্টেটে উদ্ভাবিত হয় ; তখন লোকে শুনিলে হাসিত, পরিহাস করিত। এখন সেইমত বিলাতে ইন্‌ডেণ্ট হইয়াছে। মাল সাচ্চা না হইলে কি বিলাতে যায় * এক দিন মেসমেরিসমের মত আমাদিগের প্রেততত্ত্ব ও পূজিত হইবে।

যখন কেহ কোন ঘটনা দেখিয়া তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়, তখন প্রধানতঃ দেখা উচিত ঘটনাটি সত্য কি না ? মৃত দার্শনিক হ্যামিলটন সাহেব † বলিয়াছেন যে, এক বার শিক্ষিতদিগের মধ্যে মহা গোলযোগ বাধিয়াছিল। জীবিত মৎস্য অপেক্ষা মৃত মৎস্য ওজনে ভারী কেন ? এই প্রশ্ন লইয়া নানা মুনির নানা রূপ মত প্রকাশিত হইল। কিন্তু কোন উত্তরই সন্তোষজনক হইল না। শেষে একজন সাহেব ঘটনাটি সত্য কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখেন সর্ব্বমিথ্যা। মেসমেরিস্‌ম্ যখন আবিষ্কৃত হইল, তখন পণ্ডিত মণ্ডলী ঘটনা সত্য কিনা প্রথমতঃ পরীক্ষা সভার সভাপতি হইয়া মেসমেরিসম (Mesmerism) সম্বন্ধে কতকগুলি সুন্দর উপদেশ দেন। বাহুল্য ভয়ে সেগুলি এখানে উদ্ধৃত হইল না। দ্রষ্টব্য The Indian Daily News —27th January-1877—Extracts.

* Robert Hare M D. Professer of Clemistry in the University of Pennsylvania-

† সুবিখ্যাত কক্স সাহেব একটি

* ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পরে ইউনাইটেড ষ্টেট হইতে প্রেততত্ত্ব বিলাতে যায়।

† Lectures on metaphysics.

আরম্ভ করেন, যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, ঘটনা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না; তখন নানা মুনির নানারূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ। পরিশেষে সুবিখ্যাত ব্রেড (Mr. Braid) সাহেবের ব্যাখ্যাই ইহার মূলকারণ প্রকাশ করিয়া দেয়।

প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেকগুলি ঘটনা পরীক্ষিত হইয়াছে। কতকগুলি পরীক্ষার তীক্ষ্ণাস্ত্র সহ্য করিতে পারে নাই। যেগুলি সহ্য করিয়াছে তাহার অনেকরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেততত্ত্ববাদীদিগের ব্যাখ্যা এই যে, সে সকল প্রেতের কার্য্য। আমরা অন্যান্য ব্যাখ্যাগুলির সারবত্তা ভবিষ্যতে বিবেচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ঘটনাগুলি পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। তাঁহারা দেখুন ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত,না ক্ষিপ্ত মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা মাত্র।

আমরা এপ্রবন্ধ শেষ করিলাম। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিব, তাহা এই উন্নম সম্প্রদায়কেই বুঝাইবে। প্রবঞ্চকদিগের সহিত আমাদিগের কোনও সম্বন্ধ নাই।

শ্রীম,লা,শেঠ।

সংক্ষিপ্তসমালোচন

১। "ভারত গান। ভারতের প্রাচীন এবং বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধীয় এবং স্বদেশানুরাগোদ্দীপক একশত গীত। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।"—এই গীতমালা একটি উপাদেয় বস্তু। ইহাতে যে সকল গীত নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রশংসার্হ;—রচনা প্রাঞ্জল, শব্দবিন্যাস মধুর এবং সমস্তই অক্লেশ-রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,এই গীতগুলি অন্যান্য অংশে এইরূপ প্রশংসনীয় হইয়াও, উদ্দীপনার অভাবে প্রাণশূন্য হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি কোন অপরিচিতনামা নূতন ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে আমরা একথা বলিতাম না। তাদৃশ স্থলে শুধু প্রশংসা দ্বারাই আমরা গ্রন্থকারের অভিবাদন করিতাম। কিন্তু আমাদিগের বহুদিনের পরিচিত সুহৃদ্ বাবু রাজকৃষ্ণ রায় যখন এই গ্রন্থের রচয়িতা, তখন ন্যায়ের অনুরোধে এবং বোধ হয় প্রণয়েরও অনুরোধে, তাঁহাকে ইহা জানান আবশ্যক যে, ভারতগানের কোথাও প্রকৃত উদ্দীপনার স্ফূর্ত্তি নাই, এবং উদ্দীপনার অভাবে ইহার মাধুর্য্যে মদিরা নাই, ইহার বিলাপে বেদনা নাই, এবং ইহার ললিতপদাবলীতে প্রায় অধিকাংশস্থলেই কবিতার প্রকৃত প্রাণনাই।

বাগ্মী সকল সময়েই উদ্দীপনার উপাসক। কারণ যে বক্তৃতায় উদ্দীপনা নাই, তাহা যার পর নাই শ্রুতিমধুর হইলেও প্রাণের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কবি সকল সময়ে উদ্দীপনার উপাসনা করেন না। সাধারণতঃ, সৌন্দর্য্যই তাঁহার আরাধ্য বস্তু, এবং স্বকীয় চিত্রতু-

লিকায় সৌন্দর্য্য ফলাইতে পারিলেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। কিন্তু যে সময়ে কবি, কোন বিষয়ের বর্ণনা করিতে না যাইয়া, জাতীয়হৃদয়ের নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নিকে পুনরুদ্দীপন করিতে অভিলাষী হন, তখন উদ্দীপনাই তাঁহার উপাস্য দেবতা। রাজকৃষ্ণ বাবুর ভারতগানে উদ্দীপনার মোহময়ী মদিরা আছে কি না, তাহা পাঠকবর্গ নিম্নোদ্ধৃত গীতগুলি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলেই অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

আড়ানা-বাহার—রূপক।

এখনো কি হেতু, শশী! মুখভরা মৃদু হাসি
নিরখি তোমার, বল, কি এর কারণ?
সপ্ত সত বর্ষ আগে তুমি যে উজ্জ্বল রাগে
রঞ্জিতে ভারত-কায় আছো কি তেমন?
কথারাখ, মাথাখাও, চিরতরে ফিরেযাও,
কাঁদিবার দিনেহাস, ছি ছি একেমন?
কৃষ্ণরেখা কিছু নয়, কলঙ্কের পরিচয়
এহাসে প্রকাশ হ'ল;—হেস না এমন। ৬

সারঙ্গ—একতালা।

হে দিবাকর! সর সর সর,
জলদে লুকাও নিজ কলেবর,
দিবা দ্বিপ্রহরে ভারত কাতর,
অধীর পরাণ, আকুল কায়;
একে আঁখি-বারি ঝর ঝর ঝরে,
তাহে দেহে স্বেদ ঝরে তব করে,
বল দেখি, রবি! ক্ষীণ কলেবরে
কেমনে ভারত বাঁচিবে, হায়!
কণ্ঠ শুকা'য়েছে দারুণ পিয়াসে,
দেহ শুকা'য়েছে চিন্তার হুতাশে,
হৃদি শুকা'য়েছে শোকের নিশ্বাসে,
আশা শুকা'য়েছে নিরাশা-বায়;
এ হেন বিপদে—এ হেন দশায়,
কেন তুমি, ভানু! আকাশের গায়?
সর সর সর;—মর-মর-প্রায়
ভারত জননী কাতরে চায়। ১৬

ভৈরব—আড়াচৌতাল।

যা উড়ে পাখি রে! ডেক না, ডেক না
ও মধুর বোলে তমালে;
জাগিবে ভারত, জাগিবে হৃত শোক,
ভাসিবে আঁখি জলজালে।
দুখের প্রভাতে সুখের সঙ্গীত
কেন তোর গল, বল, ঢালে;—
এবে রে তোমার সুধার সুধার
বিষধার ভারত-ভালে। ১১

রামকেলী—স্বপ্নখিতালী (ঢিমা তেতালা)।

অয়ি কুলকুলরাণি মধুমুখি কমলিনি!
ফুটিয়ে হেস না আর সরসে রে সুহাসিনি!
তুমি যে সরসী-জলে হাসি'ছ বদন তুলে,
ও যে ভারতের অশ্রু,উথলে দিনযামিনী।
মম অনুরোধে আজ,কর,মুন! এই কাজ,—
হাসির বদলে কাঁদ, মুদিয়া নয়ন;—
ভারতাশ্রুসরসীতে,তোমার সুধাশ্রু তা'তে
কেবল মিশিতে থাক্;—কাঁদ খালি, রে
নলিনি! ৪

এই শেষোদ্ধৃত গীত দুটি সুন্দর ও সুললিত

'কবিতা। প্রথমোক্ত দুইটিও কাব্যাংশে নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। কিন্তু ইহার একটিতেও কি উদ্দীপনার লেশমাত্র অনুভূত হয়? উদ্দীপনা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, উহা ফুলের মধু নহে;—উদ্দীপনা মূর্ত্তিমতী তাড়িত-শক্তি, উহা আবেশময়ী জ্যোৎস্না নহে। যদি ভারতসংগীতেও সেই উদ্দীপনা পরিস্ফুট না হইল, তবে উহা আর কিসে স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে? ভারতমাতার দুঃখ সমুদ্রের ন্যায় গভীর। সে গভীর দুঃখগীতি সমুদ্রের শোকোম্মত্ত তরঙ্গমালার ন্যায় গভীর নিঃস্বনে বিলাপ করিবে;—সমুদ্রতটবাহি নৈশসমীরণের ন্যায় অলৌকিক নিঃস্বনে রোদন করিতে রহিবে। নহিলে তাহা ভারতগান নহে।

জাতীয় উদ্দীপনার এইরূপ সংগীত কোন দেশেই সকল সময়ে ফোটে না; বিরহের গীত, মানের গীত অথবা তরল দুঃখের তরল গীতের ন্যায়, সেই সকল অন্তর্ভেদি অপূর্ব্ব গীত যখন তখন এবং যেখানে সেখানেই বাহির হয় না। কিন্তু তাদৃশ জাতীয় গীত, ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের মার্শেলিস নামক গীতের ন্যায়, মনুষ্য কণ্ঠ হইতে যখনই নিঃসৃত হয়, তখনই তাহা হৃদয়ের পর হৃদয়ে আহত ও প্রতিহত হইয়া, প্রমত্ত বহ্নিশিখার ন্যায় সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া পড়ে, এবং যাহার শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকেই উন্মাদিত করিয়া তুলে।

২। "কৃষিতত্ত্ব। মাসিক পত্রিকা। পাইক পাড়া মর্শারি হইতে প্রকাশিত।" আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পত্রিকা খানির প্রথম সংখ্যা দেখিতে পাই নাই। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা মাত্র পড়িয়াই আমরা নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত হওয়া কর্ত্তব্য, এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রয়োজনোপযোগী সাময়িক পত্রিকার আদর হওয়া উচিত।

৩। "তত্ত্বকৌমুদী, পাক্ষিক পত্রিকা। কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।" আমরা এই পত্রের মতামত লইয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু ইহার বাঙ্গালা এমনই বিশুদ্ধ ও মধুর, প্রাঞ্জল ও প্রীতিপ্রদ যে, আমরা সাধারণ সাহিত্য সমাজের নিকট ইহার যশোগান না করিয়া নিবৃত্ত থাকিতে পরিলাম না। শুনিয়াছি, বাবু শিবনাথ শাস্ত্রি প্রভৃতি কতিপয় সুনিপুণ লেখকের সহিত এই পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যদি সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয়, তাহা হইলে দিন দিন ইহার অধিকতর উন্নতি হইবে। তাদৃশ সুরুচিসম্পন্ন, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইহার সম্পাদকতায় নিযুক্ত থাকিলে, ধর্ম্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িক পত্রিকাও সুপাঠ্য হইতে পারে।

৪। "দৈব-লজ্জা। ঢাকা, সুলভযন্ত্রে মুদ্রিত"। এই গ্রন্থে চরিত্র, কর্ত্তব্য, রাজভক্তি, ত্যাগস্বীকার ও সহানুভূতি প্রভৃতি

বিবিধ বিষয়ের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ নিবেশিত হইয়াছে। রচনা এইরূপ,—

"স্বরের আ এবং ময়েতে হ্রস্ব ইকারে মি, এই কি আমি"?—"বিশ্বাস-যানে, চিন্তার অতীত, বুদ্ধির অগ্রাহ্য, কল্পনার অগোচর ব্যাপার ইহলোকে পরলোকে আত্যাগত্যা করিতে লাগিল।"—পুনশ্চ, "সহানুভূতি বিশ্বাসের স্কন্ধে চড়িয়া লোক হইতে লোকান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। বিশ্বাসের যান না চলিলে সহানুভূতিও চলে না।"—

গ্রন্থকারের মত ও উপদেশ এইরূপ,—

"এই যে আমরা ইংরেজগবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে অবস্থান করিতেছি,ইহাই আমাদিগের সার্ব্বভৌমিক উন্নতির প্রচুর নিদান। এতৎপ্রভাবে যদি আমাদের অন্তরে রাজভক্তির কুসুম না ফুটে,তবে আমাদিগের কোন্ নরকে যে বসতি হইবে, তাহা নরকাধিপই অবগত রহিয়াছেন। আমরা যে এখনও তাহা জানি না, ইহাই আমাদিগের তৃপ্তির হেতু।"

এইরূপ গ্রন্থ, গ্রন্থের এইরূপ রচনা এবং রচনার এইরূপ ভাবাদি সম্বন্ধে সমালোচকের অনেক কথা বক্তব্য থাকিতে পারে। বক্তব্য কিছু না থাকুক,অন্ততঃ 'আত্যাগত্যা' প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি,—এবং গ্রন্থকার কাহাকে নরকাধিপ বলেন, আর সেই নরকাধিপই বা কিরূপে 'অবগত রহিয়াছেন' ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থকারের নিকট উপদেশ লইবারও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু পরিণামদর্শী সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার তাহারও পথ রাখেন নাই। তিনি বিজ্ঞাপনে প্রথমেই লিখিয়া রাখিয়াছেন যে,

"যে সমুদয় রচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা স্বকপোলকল্পিত বলিয়া গ্রন্থকার অনুভব করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, ঐশ্বরিক প্রক্রিয়া ভিন্ন এমন রচনার উৎপত্তি হইতে পারিত না"।

এই কথার উপর আর কথা নাই। মহম্মদ যেমন কোরাণকে ঐশ্বরিক প্রক্রিয়ার রচনা বলিয়াছেন, গ্রন্থকারও যখন তাঁহার এই গ্রন্থখানিকে সেইরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন কে এমন সাহসী, কে এমন উদ্ধত, কে এমন ধর্ম্মভয়শূন্য,—এবং হায়! কেই বা চক্ষুঃস্বত্বে এইরূপ অন্ধ যে, এবম্ভূত অলৌকিক বস্তুর সমালোচনা করিতে গিয়া আপনা হইতে বিপদে পড়িবে? কিন্তু তথাপি এই একটিমাত্র কথা আমাদিগের বক্তব্য যে, গ্রন্থের নামটি সর্ব্বাংশেই সাহিত্যবিষয়ক সুরুচির বিরুদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা লৌকিক সাহিত্য পড়িয়া ভাষা শিক্ষা করেন, তাঁহাদিগের বিবেচনায় দৈবলতার পরিবর্ত্তে ইহার নাম দিব্যলতা হওয়া উচিত ছিল। কারণ, যদিও দৈবশব্দের এক অর্থ 'দেবতাসম্বন্ধীয়'— কিন্তু ইহার আর এক অর্থ উৎপাত, এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই অর্থই অধিকতর প্রচলিত।

অগ্নি।

ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্‌ব্যোম—অর্থাৎ মৃত্তিকা জল তেজ অগ্নি এবং আকাশ, এই কএকটি মূল বা অমিশ্র পদার্থ বলিয়া স্থিরিকৃত হইয়াছিল। রসায়ণ শাস্ত্রের উন্নতির পূর্ব্বে এ মহা ভ্রম কেবল যে হিন্দুদিগের ছিল তাহা নহে। হিন্দুরা ব্রহ্মার পূজা করেন, পারশিকেরা ও তাহারই উপাশক, গ্রিক বা রোমকেরাও অগ্নির পূজা করিতেন। পূর্ব্বের লোকের বিশ্বাস ছিল এই ভ্রমাত্মক পঞ্চভূত, ঈশ্বরের অবতার, এবং মুর্ত্তিমান্ দেবতা। সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস বা ইহাদিগের প্রবল স্বাভাবিক শক্তির উপর লক্ষ করিয়া আধুনীক মানবগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ ইহাদিগের প্রতি মহা শ্রদ্ধা করিতেন। আমাদিগের কথা দূরে থাকুক, পেরিপেট্রমিয়ন * দিগের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতেও ইহারা আদীম, অবিনশ্বর অমিশ্র এবং মূল পদার্থ বলিয়া গণনীয় হইয়া ছিল। এমন কি মিলটন্ পর্য্যন্তও ইহাদিগের মৌলিকত্ব এবং অমিশ্রত্ব স্বীকার করিতেন। পাঠকগণ 'প্যারাডাইসলষ্টের' দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩৪ শ্লোকটি পাঠ করিয়া দেখিবেন। মেল সাহেবের অনুবাদিত, কোরাণের ২য় খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—" অবিশ্বাসীরা জানেনা, যে পৃথিবী কেবল একটি পরমাণুপুঞ্জ মাত্র, কঠিন পদার্থ সর্ব্ব ব্যাপৃত অনন্ত জলরাশীর এক পার্শ্বে পড়িয়া ছিল, এবং সেই জল দ্বারা বৃক্ষাদি ও ভূচর ক্ষেচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীর মজ্জা আমি করিয়াছি "—ফলতঃ এ মহাভ্রমের হস্ত হইতে মুসলমান দেবতা মহম্মুদের ও নিষ্কৃতি ছিলনা। কিন্তু কালের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে ক্রমেই এসকল কুসংস্কার তিরোহিত হইতেছে। জল যে গর্ব্ব করিতেন আমি আদি, আমি অমিশ্র, অমর, এবং স্বাধীন, হাইড্রযান, এবং অক্সিযান ইহার জন্মদাতা বলিয়া আবিষ্কৃত হওয়াতে সে গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে। যাহাহউক জল, বায়ু, পৃথিবী প্রভৃতি মিশ্র না হইলেও প্রকৃতিভূত পদার্থ। বুঝিলাম, জল তবে পদার্থ, স্বীকার করিলাম মৃত্তিকাও তবে পদার্থ, এবং বায়ুও বটে, কিন্তু অগ্নি কি ? অগ্নির রহস্য ভেদ বহুকাল পর্য্যন্ত হয় নাই, আজিও এসম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, তাহাতেই আমরা বলি অগ্নি তবে কি? যে অগ্নি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেও জল মৃত্তিকাদির ন্যায় একটি পদার্থ ছিল,—এখন নাকি আর তাহা মূলে পদার্থই নয়। ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন, যে কোন প্রকারের অগ্নিই হউক না কেন, (স্বাভাবিক

* অরিষ্টোটেল এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ।

কৃত্রিম, ঘর্ষিত, বা উত্তাপজ) উহা নিরতিশয় সূক্ষ্ম তরল, বিক্রমশীল, সদা-গতিবান্ অত্যন্ত প্রসরণক্ষম, অতীব স্থিতিস্থাপক, পদার্থ মাত্রকেই সংকোচন বা বিস্তার করিবার ক্ষমতাযুক্ত, সর্ব্বশরীরে প্রবেশক্ষম, এবং তাহাদিগকে রূপান্তর করিবার গুণযুক্ত, ও তাহাদিগের যোগবিধানক্ষম, এবং তাহার পর প্রদর্শিত সমস্তগুণপরিহার ক্ষম। বাহ্য বস্তু সমূহের সহিত অগ্নির এই স্বভাবের নাম (Stahl) ষ্টাঁ সাহেব (Phlogistion) নিত্যাগ্নি রাখিয়াছেন, অপর পণ্ডিতেরা (Fixed fire) বদ্ধ অগ্নি কহেন। ষ্টাঁ সাহেবের মত এই, মনে কর একখানী চকমকী পাথর আছে উহাতে লৌহদ্বারা আঘাত করিলে অগ্নি নির্গত হয়, ঐ অগ্নি কোথা হইতে আসিল, যদি বল, আঘাতে পরমাণুর সংঘাত হইয়াছে তাহাতেই তেজকণার উৎপত্তি হইয়াছে। ষ্টাঁ সাহেব বলিবেন তবে স্বীকার করিতে হইবে চকমকী জ্বলনীয় পদার্থ, তবে যে উহা জ্বলিয়া উঠে না, ইহার কারণ কি ? সুতরাং উহা গৌণ অগ্নি, অর্থাৎ উহার পরমাণুসমূহ অগ্নিপূরিত। ষ্টাঁ সাহেবের সমকালে এক দলে বলিতেন, উহা অগ্নির পরমাণু এবং এক প্রকার কাঁচ জাতীয় মৃত্তিকায় সংগঠিত, অপর দল বলিতেন উহা শুদ্ধ অগ্নির অণুতে নির্ম্মিত। আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন যে উহা অগ্নি উৎপাদন করিবার আপেক্ষিক কারণ,—পরমাণুতে পরমাণুতে সংঘাত লাগিয়া ভয়ানক বেগে যখন সেই সমস্ত পরমাণুর গতি হয়, সেই গতিজনিত উত্তাপই অগ্নি। যতক্ষণ পরমাণুগণ স্থির না হইবে ততক্ষণ তাহার কার্য্য প্রকাশ হইতে থাকিবে, সুতরাং যে পরিমাণ আঘাতে চকমকী হইতে অগ্নি নির্গত হয়, উহাতে উহার সমস্ত পরমাণুর তুমুল গতি হয় না। ঐ চকমকীর একদেশে কর্ম্ম যতটুকু হয়, ক্রিয়া ততটুকু প্রমাণে প্রকাশ পায়। অল্প বা অধিক পরিমাণে সকল বস্তুতেই জ্বলন কার্য্য প্রকাশমান হইয়া থাকে। উহা তদ্ বস্তুর রাসায়নীক সংযোগের বৈলক্ষণ্য প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে।

যাহা হউক, ষ্টাঁসাহেবের (Phlogistion) কি তাহাই আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। সকল বস্তুরই অধিক কি অল্প পরিমাণ অগ্নি উৎপাদন বা অগ্নি ধারণ করিবার স্বভাব আছে বস্তুর যে গুণ থাকাতে ঐরূপ হয় তাহারই নাম (Phlogistion) বাঙ্গলায় জ্বলনীয় কিমিয় বা রাসায়নীক রস বলিলেও উহার প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। যাহাহউক উহাকে আরো ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তীক্ষ্ণধার তরল (Fluid) ব্যতীত কিছুই গলিত হইতে পারে না। কিন্তু স্বভাবে অগ্নি অপেক্ষায় দ্রবকারী আর কিছুই নাই। অতএব অগ্নিই দ্রব-বীজ, বা দ্রবজীবন। জল যে দ্রবগুণসম্পন্ন, এবং অন্যকেও দ্রব করিতে পারে তাহাও কেবল মাত্র অগ্নি হইতে। অগ্নি ক্রিয়ার ঐ

রূপ ফল যাহাতেই স্থিতি করে তাহাই Phlogistion বদ্ধ অগ্নি। পারদ স্বর্ণের সহিত মিলিতে, জল লবণকে গুলিতে যাহা, দ্রবকে জ্বলনশীল করিবার জন্য থা সাহেবের Phlogistion ও তাহাই। ইহার কার্য্য গন্ধক, তৈল, এবং পাথরিয়া কয়লাতে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়, সুতরাং উহারাই থাঁ সাহেবের মতে অগ্নি-ধারক। তবেই তাহার মতে, অগ্নি স্থায়ী, নিত্য, এবং পদার্থহৃদয়বাসী বলিয়া প্রতি-পন্ন হইতেছে।

(Boerhave) বোয়েরহেভে সাহেব অগ্নির দুইপ্রকার প্রকার-ভেদ করেন। এ-কটি মুল অগ্নি, অর্থাৎ শুদ্ধ অগ্নি, এবং অ-নপেক্ষিক, অপরটী আপেক্ষিকী, অর্থাৎ অন্য বস্তুর যোগে কার্য্য প্রকাশ করে। তাঁহার মতে উত্তাপের মুখ্যকারণই মূলাগ্নি। উত্তাপ অগ্নি হইতে বিভেদ্য নহে। উত্তা-পের পরিমাণ, অগ্নির পরিমাণ বিশেষ। যাহা অগ্নি তাহাই উত্তাপ। কঠিন বস্তুর অনুপ্রসরণ, এবং দ্রব বস্তুর অনুসংকোচন, ক্রিয়া মুলাগ্নির দ্বিতীয় ফল। একখানি লৌহ উত্তপ্ত হইলে, ইহার বিস্তৃতি বর্দ্ধিত হয়, এবং উত্তাপ অধিকপরিমাণে দিলে পুনরায় আরো বর্দ্ধিত হয়, আবার স্নিগ্ধ হইলে, সংস্কুচিত হয়। এবং পূর্ব্বে যত বড় ছিল তাহাই হয়। স্বর্ণকে গ-লাইলে পুর্ব্ব হইতে অধিক স্থান গ্রহণ করে। একটি সরু নলের ভিতরে পা-রদ রাখিয়া উত্তাপ দিলে, পুর্ব্বে যতটুকু স্থান লইয়া ছিল, তাহার ত্রিংশত গুণ অধিক উচ্চে উঠিবে।

বস্তুর এরূপ বিস্তৃতির কারণ বোয়েরহেভে সাহেবই আবিষ্কার করেন। প্রথমতঃ যথা। দ্রব দ্রব্য যতটুকু সময়ে, যে পরিমাণ অ-গ্নিতে যত অধিক বিস্তৃতি লাভ করিবে, কঠিন দ্রব্য, ঠিক সেই পরিমাণ সময়ে, এবং সেই পরিমাণ অগ্নিতে সেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিবে না। এই নিয়মের অন্যথা হইলে তাপমাপক যন্ত্র কার্য্যকারী হইতে পারিত না, কেননা, তাহা হইলে যে সময়ে এবং যে উত্তাপে পারদ বিস্তৃতি লাভ করিত, নলের অভ্যন্তরস্থ রন্ধ্র ও তবে ঠিক ঐ সময়ে এবং ঐ উত্তাপে আপনি বিস্তৃত হইত। দ্বিতীয়তঃ। দ্রব দ্রব্য যত লঘু হইবে, অগ্নি তাপে উহার তত বিস্তার হইবে। তিনি বলেন, বায়ুর ন্যায় লঘু বস্তু বিরল, অথচ উহার ন্যায় আর কোন দ্রব্য অধিক ছড়াইয়া পড়েনা। বায়ুর প-রেই ঐ গুণ সুরাসার বা স্পিরিট্ অব্ ও-য়াইনের অধিক। তিনি আরো বলেন, প্র-কৃতিতে যত প্রকার শক্তি এবং গতির উৎ-পত্তি হয়, অগ্নিই তাহার কারণ। তাহা হইতে অগ্নিকে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে সমস্ত যত পদার্থ অচল হইয়া পড়িয়া থাকিত। এবং অগ্নির অভাবে, জল, তৈল, সুরাসার জীব-দেহ, উদ্ভিদ সমস্তই কঠিন, জীবনহীন এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইত। যদি অসাধা-রণ শীতপ্রবাহে, জগতের সমস্ত অগ্নি, বিনাশ হইয়া যায় তাহা হইলে, এই জড়-

জগৎ স্বর্ণ ও হিরকের ন্যায় মহা কাঠিণ্যময় একটি স্তুপাকার বস্তু হইয়া পড়িয়া থাকিবে। এবং অগ্নিপ্রয়োগে পুনরায় উহা প্রকিতিস্থ হইবে।

বোয়েরহেভের কথিত, মুলাগ্নি সংরক্ষণ বা গ্রহণ করিতে হইলে, সে আগুণের আহার বা বায়ু যোগাইতে হয় না। যদি কিয়ৎপরিমাণ কোন সৌগন্ধিক তৈলসার, শূন্য হইতে যবক্ষারিক সুরায় ঢালা যায়,তৎক্ষণাৎ (উহা হইতে ভয়ানক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। তিনি বলেন কতক গুলিন উপায়ে মুল অগ্নির ফল জানা যাইতে পারে। যথা সকলেই জানে, চকমকী ও লৌহের ঘর্ষণে, অগ্নি উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ এক দ্রব্যে অন্য দ্রব্য কর্ত্তৃক বিষম সংঘাত পাইলেই তাহা হইতে অগ্নি উঠিবে, এই জন্য দুগ্ধ টানিলে নবনীত তাহা হইতে স্বতন্ত্র হয়। ছুরি কি ক্ষুর সানাইবার সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়,—এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, অগ্নি মৌলীক পদার্থ। নতুবা যাহাতে অগ্নি ছিল না তাহা হইতে অগ্নি কখনই জাত হইবার সম্ভাবনা নহে।

যদি অত্যন্ত শীতের দিনে একখানি স্বর্ণথালী আর একখানি স্বর্ণথালীর সহিত বলপুর্ব্বক ঘর্ষণ করা যায়, তবে ঘর্ষণে ঘর্ষণে মহাউত্তপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ এবং পরে গলিবার উপক্রম হইলেও কিঞ্চিম্মাত্রায় ও তাহার গুরুত্বের ধ্বংশ হইবে না, কেবল আয়তনে বৃদ্ধি হইবে, বা স্ফীত হইবে, ইহাতে এই উপলব্ধি হয় যে, সংঘর্ষণে স্বর্ণের একটিমাত্র অনুও অগ্নিরূপে পরিণত বা পরিবর্ত্তিত হয় না।—কেন না অগ্নি উহাতে পূর্ব্ব হইতেই আছে। ঘর্ষণ মর্দ্দনের ফলে এইমাত্র হয় যে, যাহা পূর্ব্ব হইতে স্থিতি করিতেছে তাহারই কিয়দংশ সংগ্রহ করিতে বা আনিতে পারা যায়, উহার ফল এরূপ নহে যে, উহা হইতে অগ্নি জন্মাইতে বা করিতে পারা যায়। তবে, আমরা এই পর্য্যন্ত করি যে অপ্রজ্বলিতকে জ্বালিত করি, এবং বহুস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া কোন সঙ্কীর্ণস্থানে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য স্থাপন করি।

এতদ্ব্যতীত বোএরহেভে সাহেব আরো বলেন যে, যেরূপ নিত্যাগ্নি অনন্তকাল হইতে অহরহ সর্ব্বদ্রব্যে দ্রব্যে স্থিতি করিতেছে উহা মৃত্তিকার অভ্যন্তরেও তদনুরূপ অবস্থায় বিরাজিত আছে। তিনি বলেন ৪০ বা ৫০ ফিট মৃত্তিকার নিম্নদেশ এত উষ্ণ যে তথায় বরফ থাকিতে পারে না, তাহা হইতে আরো গভীরতর প্রদেশ এতাধিক উষ্ণ যে তথায় ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারা যায় না। মৃত্তিকার গভীরতম প্রদেশের এই উষ্ণ ভাব দৃষ্টে তিনি বলেন, যে ভূগর্ভে আর একটি অগ্নির আকর বা সূর্য্য আছে। তাহাতেই, যাহারা ভূগর্ভে বা পৃষ্ঠে জন্মে তাহাদের জীবন রক্ষা এবং গতি বিধান করিতেছে এমন কি ভূকেন্দ্রে কেবল অগ্নি ব্যতিত আর কিছুই নাই। এবং এই মহা অনল, অনন্ত কাল

হইতে বিরাজ করিতেছে। তিনি ইহাও বলেন, ভূচর, খেচর, জলচর, প্রভৃতির ন্যায় অগ্নিচর জীব পর্য্যন্ত আছে। বহুকাল পোষিত বৃহৎ অনল কুণ্ড, অত্যুৎকৃষ্ট আতশ পাথর দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই সকল জীব দেখা যায়, এই সকল অনলবাসী জীবের নাম (Salamander) সালামাণ্ডর। এখন দেখা যাইবে বোএরহেভে সাহেবের যুক্তি নিয়ম কতদূর সুসঙ্গত।

তাহার পরবর্ত্তী রসায়ণবিদেরা আগ্নেয় কার্য্যের চারিটি তাপাংশ পরিমাণ করিয়াছেন। প্রথমটি মানবশরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতার তুল্য, বা যে পরিমাণ উষ্ণত্বে কপোত ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হয়। ডিম্বের সহিত একটি তাপ পরিমাপক যন্ত্র রাখিয়া তদুপরি একটি কপোতিনীকে বসাইয়া এই তাপাংশ পরিমিত হইয়াছে। কোন কোন রাসায়নিক আবার এই পরিমাণ উত্তপ্ত দায়ক আগুন, কপোতিনীর পরিবর্ত্তে ডিম্বের চতুর্দ্দিগে রাখিয়া তদ্দ্বারা ডিম ফুটাইয়াছেন। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় সূর্য্য কীরণ শরীরে লাগিলে জ্বালা করে, বা যে পরিমাণ উত্তাপে চর্ম্মে বেদনা হয়, অথবা যে পরিমাণ উত্তাপে চর্ম্মে ফোস্কা পড়ে, কিন্তু তদ্দারা শরীরের কোন অংশের ধ্বংশ বা অভাব হয় না, ইহাই তাপের দ্বিতীয় পরিমাণ। এই পরিমাণ তাপেই মনুষ্যরক্তে শ্লেষ্মবৎ এক পদার্থ (Serum) জম্মে এবং ডিম্বের—দ্রবীভূত ধবলাংশ কঠিন হয়, সময়ে সময়ে এই পরিমাণ উত্তাপেই আবার ভয়ানক গাত্র দাহ হইতে পারে, ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে পরিমাণ উত্তাপে জল অতিশয় গরম হয়, ইহাই উত্তাপের তৃতীয় পরিমাণ। তাহারা বিবেচনা করেন উত্তাপের এই পরিমাণই সম্পূর্ণ অটল। কেন না, জল যত উত্তাপ সহিতে পারে অর্থাৎ পূর্ণমাত্রার উত্তাপে উষ্ম করিলে (পাত্রের মুখ খুলিয়া বাষ্প উঠিতে দিলেও) যে পরিমাণ তাহার উত্তাপ বৃদ্ধি হইবে, আর হাজার কাষ্ঠ দগ্ধ করিলে, কি আরো উত্তাপ দিলে কিছুতেই তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে না। এই সকল প্রাচীন রাসায়নিক বোধ হয় জানিতেন না যে, সমুদ্র সমতল স্থানের উষ্ণ জলের উত্তাপ, ব্লাঙ্ক গিরির উপরিভাগের উত্তপ্ত জলের উত্তাপ হইতে ন্যূনতর। আর পেপিন * সাহেব উত্তাপের পরিমাণ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার যুক্তিনিচয় ও সম্ভবতঃ সিদ্ধ বা পরীক্ষিত নহে। যে উত্তাপে ধাতু বা অন্য কোন দ্রব্যকে ধ্বংশ বা দ্রবীভূত করিতে পারে, তাহা উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ।

উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ যে কিরূপে নিরূপিত হইল বুঝিতে পারা যায় না। তাপপরিমাপক যন্ত্র ও বোধ হয়, এত প্রচণ্ড উত্তাপে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যে সময়ে এই সকল মত প্রচলিত হয় বোধ

* প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে এই ভয়ে উক্ত ভ্রমাত্মক মত অপ্রকাশিত রহিল।

হয় ওএজউডের অনলপরিমাপক যন্ত্রের (Wedge wood's Pyrometer) সর্জ্জন, বা সেবিষয়ের চিন্তা কাহারও মনে উদয় হয় নাই, ইহাতেই অনুমিত হইতে পারে যে উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ কেবল মাত্র অনুমান এবং ধাতুর দ্রবত্বাবস্থা দেখিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। উষ্ণ জলের উত্তাপ যেমন বৃদ্ধি হইতে পারে না, কিন্তু দ্রবীভূত ধাতুর উত্তাপ-পরিমাণ জানিবার যদি তাহাদিগের কোন উপায় ছিল না তবে ইহা তাঁহার কিরূপে জানিলেন ?— যাহাহউক প্রাচীন রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ মণ্ডলীর মতে উত্তাপের এই শেষ পরিমাণ। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী বিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞসম্প্রদায়,আর একটি পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া,উত্তাপের পঞ্চম পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। এই উত্তাপে, স্বর্ণ হইতে ধুম এবং বাষ্প নির্গত করায়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে মন্স্যুর সিরাঙ্গহোসেণ্ড (M. Tschirnhausen) প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্বর্ণ উত্তাপে একেবারে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে। তাহার পর এই অগ্নিময় দৃশ্যে, তাপক (Caloric) নামে এক সূক্ষ্ম দ্রব্য লীলা করিতে থাকে। সিরাঙ্গহসেণ্ডের পরে তাপকই অগ্নিজনক বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হয়। যাহাতে, উত্তাপের অনুভূতি প্রকাশমান করে, তাহারই নাম "তাপক" রাখা হইয়াছিল। এই তাপকই বরফকে গলিত করে, জল উত্তপ্ত করে এবং লৌহকে রক্তোত্তপ্ত করিয়া তুলে। তবে এই উত্তাপক কি ? ইহাকে কি তবে পদার্থ বলিব, না কি বলিব ? উত্তাপসম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে তন্মধ্যে কেবল দুইটি পরীক্ষিত এবং প্রমাণ্য বলিয়া, অদ্যাপি মানবের বিশ্বাসক্ষেত্রে সজীব রহিয়াছে। একটি (Theory of Emission) উৎক্ষেপণ অনুমান, দ্বিতীয়টি (Theory of Undulation) গতিতরঙ্গ অনুমান।

প্রথম অনুমান। উত্তাপের কারণ ভুতাত্মক, বায়ুর ন্যায় বা বায়ু হইতে উহা সূক্ষ্ম তরল এক শরীর হইতে শরীরান্তরে গমনক্ষম, এবং উহার পরমাণু নিচয় অবিশ্রান্ত অন্বাকর্শণাবস্থাপন্ন।(In a state of repulsion) এই সূক্ষ্ম ধার তরল, সকল দ্রব্যেরই মুল পরমাণুর সহিত বাস করে, অথচ কাহারও সহিত প্রকৃতরূপ সুযুক্ত হয় না। এই হিসাবে উত্তাপক নামক যে সুক্ষ্ম ধার তরল, তাহা বস্তু, কিন্তু ভৌতিক উত্তাপক প্রমাণতঃ দিন দিন জীর্ণাবস্থা পাইতেছে। তাপকের পরিমাণ বা মূর্ত্তি পরিমাপনীয় নহে। এমন মহা সূক্ষ্ম কোন যন্ত্র অদ্যাপি মানববুদ্ধিতে প্রস্তুত হয় নাই যাহাতে উহার পরিমাণ করা যাইতে পারে বা উহার স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়। আমাদিগের ক্ষমতায় যখন উহার পরিমাণ করিবার সাধ্য নাই তখন আমাদিগের ইহাও বলা উচিত নহে, যে উহার গুরুত্ব নাই। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এখন অনেকেই বলেন যে মুলেই উহার গুরুত্ব নাস্তি।

গতি-তরঙ্গ, বা দ্বিতীয় অনুমান এই যে—পদার্থের পরমাণুর উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতে,—উত্তাপ উপস্থিত করে। সে তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া, অত্যন্ত লঘু, এবং স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট একটি তরল পদার্থের সাহায্যে অন্য বস্তুর পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়, ইহাকেই ইথর (Ether) বলে। যেরূপ বায়ু মণ্ডলে শব্দতরঙ্গ ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, সেইরূপ ইথর মণ্ডলে পরমাণু তরঙ্গোৎপাদিত উত্তাপও নৃত্য করিয়া বেড়ায়। যে দ্রব্যের পরমাণুতরঙ্গ তবে যত বিস্তারময় এবং যত দ্রুতবেগবিশিষ্ট, সেই বস্তুর শরীর তত অধিক উত্তাপযুক্ত হয়। উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি কেবল পরমাণুতরঙ্গের গতির অনুপাতানুসারেই হইয়া থাকে, আর কিছুই নহে। প্রথম অনুমান মতে, উত্তাপক জড় পদার্থকে পরিত্যাগ করিলেই তাহার স্নিগ্ধত্ব সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয় অনুমানসিদ্ধ ফল তাহা নহে। পরমাণুগণ তরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত মুর্ত্তি ধারণ করিলেই তত্তৎ শরীরির দেহ শীতল হয়। এই দ্বিতীয় অনুমানে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শব্দের ন্যায়, অগ্নিও বস্তুত্ব সম্পন্ন নহে। কেবল বায়বীয় তরঙ্গাভিঘাতের অনুভূতি বা দমক মাত্র। 'শব্দ' ও গতি ব্যতীত কিছু নহে। যদিও প্রাচীন ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রে * শব্দ এবং গতির মূল নির্দ্দিষ্ট নাই—তথাপি 'শব্দ' গতি (Motion) মাত্র বলিয়া অনুমিত হওয়া সর্ব্বথাই যুক্তিসঙ্গত। শ্রবণ সম্বন্ধে যিনি কিঞ্চিত অভিনিবেশ প্রদান করিবেন—উহার উৎপত্তি যে কেবল সাধারণ গতি হইতে, তাহারই মনে এরূপ একটি ভাব উপলব্ধি হইবে। যদিও শব্দ কেবল মাত্র গতি তথাপি আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি—শব্দ যাইতেছে, শব্দ উত্থিত হইতেছে। উত্তাপ, আলো, বিদ্যুৎ ইহারা যে কেবল গতি মাত্র এবং বস্তু নহে তাহা কাহারও মনে ধারণা করাইবার জন্য এখন বোধ হয় আর আমাদিগকে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

গতিতারঙ্গিক, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মতে অগ্নি বস্তু নহে, কার্য্য, পরিবর্ত্তন, বা গতি। ইহা কি ভৌতিক পদার্থ, কি রাসায়নিক পদার্থ, কি বৃহৎ, কি ক্ষুদ্র, কি ভার, কি লঘু, কি তরল, কি দ্রব, কিছুই নহে। ইহার সংস্পর্শে ইথর (Ether) অনুতরঙ্গমালা হইতে উত্তাপকে বহন করিয়া তাহার সমষ্টিতে অনল রচনা করে।

অগ্নি বলিতে গেলেই একবারে স্বভাবের কতগুলিন প্রকৃতিকে বুঝায়—যথা—উত্তাপ, রূপান্তরক্রিয়া, বিস্তারক্রিয়া, এবং বাষ্পিয়ক্রিয়া প্রভৃতি। কাহারও মতানুসারে ইহা (Caloric) উত্তাপকের কার্য্য। এবং কাহারও মতে—কেবল পরমাণুর তরঙ্গে বা গতিতে এরূপ হইয়া

* এদেশীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের কোন কথা আমি অবগত নহি। লেখক।

থাকে। দহনশীল পদার্থের দহন ক্রিয়াকেই অগ্নি বলিতে হইবে। যাহাতে ইথর সংমিশ্র অম্লজান (অকসিজন) কিছু অধিক পরিমাণে থাকে, বা কৌশলে কোনও বস্তুকে উক্ত ধর্ম্মাক্রান্ত করা যায় তাহাই দহনশীল পদার্থ।—তাই বলিয়া যে ঐ বস্তু বায়ুর মধ্যে রাখিয়া দিলে যে আপনি জ্বলিয়া উঠিবে তাহা নহে। যাহাতে এমন গুণ আছে যে অল্প বা অধিক গৌণে ইহার পরিপুষ্ট অক্‌সিজন বায়ু শোষণ করিতে পারে, বা উহার ক্ষতি কিম্বা প্রজ্বলন ক্রিয়ার অভাব ঘটাইতে পারে, তাহাও এক প্রকার দাহ্য। এমন বস্তু কি সচরাচর আমরা দেখিতে পাই না যাহার প্রচণ্ড উত্তাপ আছে, অথচ যাহা ধীরে২ এমন ভাবে জ্বলে যে তাহাতে শিখা, বা অন্য কোনরূপ জ্বলন ক্রিয়া প্রকাশ না পাইয়া কেবল মাত্র তাহার শারীরিক দহনীয় বস্তু টুকু নিঃশেষিত হইয়া যায়? তাহাতে অগ্নিশিখার অনুপস্থিতি স্বত্বেও তাহা সামান্য দহনশীল পদার্থ নহে।

এরূপ স্তিমিত দহন ক্রিয়া সমস্ত উষ্ণ রক্তসম্পন্ন জীব জন্তু শরীরেও হইতেছে। অনাহারে জীবদেহের উত্তাপকে ক্ষীণতর করে, এবং তাহারা দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও, যত দিন দেহের দাহ্য পদার্থ নিঃশেষিত না হয়, ততদিন পুড়িতে থাকে, যখন দাহ্য সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয় তখনই জীবদেহ ভয়ঙ্কর শীতলভাব ধারণ করে তাহাই তাহার মৃত্যু। জীবদেহের শক্তি ও কেবল, অঙ্গারক (Carbon) এবং উদ্‌জান, (Hydrogen) তাহাদের, আহারীয় দ্রব্যে প্রচুর থাকে বলিয়া ষ্টিমার কয়লাব্যতিত যেরূপ শক্তি বিহীন হইয়া পড়ে, ঘোটকেরও ঘাস এবং যব বা বুটের অভাবে তদবস্থপন্ন হইতে হয়। এবং দস্তা না থাকিলে বোল্‌তাইক * যন্ত্রেরও শক্তি লোপ হয়।—কোন২ রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যেখানে ধাতু দ্রব্যাদি গলান যায়, সেখানে ১০ হইতে ২০ গুণ পর্য্যন্ত কাষ্ঠ দাহন করিয়া ঐ স্থান জীব দেহের তুল্য উত্তপ্ত হয়। মেচুসী (Muthuici) সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বোল্‌তাইক যন্ত্রে দস্তার অভাবেও তৎক্ষণাৎ একটি ভেক মারিয়া তাহা হইতে অধিক পরিমাণে রসায়নিক কার্য্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে। (ভেক জীবিত থাকিলে কার্য্য আরো অধিক পরিমাণে প্রকাশমান করা যাইতে পারে) যাহাহউক ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দহনক্রিয়া হইতেছে অথচ অনেক সময় আমরা বস্তুর বাহ্য অবয়ব দেখিয়া বুঝিতে পারি না। দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, যে রসায়ন প্রভাবে কেমন আশ্চর্য্য আলো বিক্ষিপ্ত হইয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করে অথচ ঐ রসায়নিক অনল প্রকৃত পক্ষে কোনরূপ পদার্থ

* (Volta) বোল্‌তা সাহেব যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রস্তুত করেন তাহারই নাম বলতাইক ব্যাটারী।

দহন করে না ইহা কেবলমাত্র রাসায়নিক যোগের এবং দাহ্যের সহিত অম্লাত্মক বায়ুর (অক্‌সিজনের) সামীপ্যাকর্ষণোৎপাদিত ফল।

অগ্নি বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, সুতরাং আকর্ষণ বা শক্তি ইহার মূল কারণ। আমরা সচরাচর মাধ্যাকর্ষণেরই কার্য্য স্বভাব উপলব্ধি করিতে পারি, ইহা ব্যতীত অন্যান্য আকর্ষণশক্তির প্রভাব তত স্পষ্ট অনুভূত হয় না। বৈদ্যুতিক সাধন, রসায়ন উদ্ভাবন, এবং পরীক্ষা প্রভৃতি দ্বারা মাত্র বুঝা যায়।

তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, চৌম্বক, রাসায়নিক সংযোগ, এবং গতি ইহারাই নৈসর্গিক শক্তি বলিয়া স্বীকার্য্য। সুতরাং অগ্নি এই সমস্ত শক্তির অন্যতরের পরিস্ফুট ক্রিয়া মাত্র। পণ্ডিতগণ আরও বলেন, যে এই সকল শক্তির যে কেবল বিশেষ পারস্পারিক সম্বন্ধ আছে তাহা নহে, ইহারা সকলেই এক সূত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এবং ইহাও অনুমিত হইয়াছে যে ইহাদের যে কোন একটি আপনার সমশক্তি আর একটি শক্তি সঞ্জাত করিতে পারে। বিদ্যুতে, রসায়ন যোগ, চুম্বকের শক্তি, উত্তাপ বা গতি, উৎপাদন করিতে পারে। আবার গতিতেও উত্তাপ জন্মাইতে পারে। যথা ঘর্ষণে, সকটচক্রে আগুণ লাগিতে পারে, পাথরে ক্ষুর সানাইলে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় ; কলের সহায়তায় বা একটুক্‌রা চাম্দরূষ কোটের (ধাতুময়) বোতামের সহিত ঘর্ষণ করিলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আবার আলোকে বিদ্যুৎ, গতি, এবং শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে। এবং উত্তাপেও যথাক্রমে আলো, বিদ্যুৎ এবং গতির উৎপাদন করিতে পারে। নৈসর্গিক শক্তি পরিবর্ত্তন সহকারে যেরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, বীজগণিতের পরিবর্ত্তন এবং যোগসাধন-প্রক্রিয়াতে (Ths Law of permulation and combination) তাহার সীমা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। আপাততঃ প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে আমরা তাহার প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত রহিলাম, কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক পত্র ব্যতীত, উহা সাহিত্যিক পত্রিকার উপযুক্তও নহে।

এইক্ষণ আবার বলিতেছি অগ্নি কি ? উত্তর। উহা প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের একটি প্রকাশমান ক্রিয়া মাত্র। উত্তাপের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলেই, ঐ উত্তাপের শক্তিও বৃদ্ধি হয়, অবশেষে এই মহাশক্তি হইতে শিখা এবং ধূম উদ্গীরিত হইতে থাকে।

আমরা শক্তির কারণ ব্যাখ্যা করিলাম না বলিয়া যদি পাঠকগণ, এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়েন, তথাপি অন্ততঃ তাঁহাদিগের এইটি ধারণা হইবে যে, বস্তু গুণ সম্পন্ন, নিত্যাগ্নি, ও তাপক প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীনগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভ্রমসঙ্কুল।

আমরা যাহা জানি বা দেখি সমস্তই আকর্ষণোৎপাদিত শক্তির ফল,—কিন্তু

আমরা শক্তি দেখি না। আমরা কেবল, গতি এবং গতিজনিত কার্য্য দেখি। আমরা কোন বস্তুর কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরিত অবস্থা জানিতে পারি— এবং তাহারই একটি পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরশীলতার নাম সাধারণ উত্তাপ। সেই উত্তাপের প্রকৃত স্বরূপ অদ্যাপি অপ্রকাশিত আছে—।

* মহামায়ার চিত্রপট।

সুরভি পবন-রথে ধীরে ধীরে
করি আরোহণ,
উত্তরিল ব্রহ্মপুরে আরতির প্রতিধ্বনি
মধুর নিক্কণ।
ভারতীর আসন বেড়িয়া,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
ভ্রমিতে লাগিল পার্থিব শবদ
যেন পথ হারাইয়া।
কল্পনা সুন্দরী
আপনার করপদ্ম দু'টি
ধীরে ধীরে একত্রিত করি, কহিল,
" বৎসরান্তে পুনঃ, দেবি, ভারতে তোমায়
ভারতবাসীরা স্মরিল।"
ভারতীর ইন্দিবর আঁখি দুটি
ঈষদ কুটিল ;
অতুল অধরপ্রান্তে, উষার রেখার ন্যায়
হাসি প্রকাশিল।
ইন্দ্রধনুঃ বিনি বরণ
অমনি স্যন্দন,
বক্ষে তুলি সে শুভ্র প্রতিমা খানি
অনন্ত শূন্যে ছুটিল তখন।
জ্যোতিহীনা তারা ;
অভ্র অঙ্গে বহিল গলিত স্বর্ণের শতধারা,
সুন্দর ;
মুহূর্ত্তে নামিল রথ শ্যামলবসনা
চারু বঙ্গের উপর।

অমনি চৌদিকে কিরণ ছুটিল,
সংগীততরঙ্গে দিগন্ত ডুবিল,
স্বর্গীয় সৌরভে ভুবন ভরিল,
আহা কি আনন্দ আজ!
বহুদিন পরে অশ্রু-জল মুছি
পরেছে বঙ্গ মোহন সাজ!
সাজিল বঙ্গ কি সুন্দর সাজে!
মরি কি মধুর আরতি বাজে!
উচ্চে বাজিছে ঝাঁঝর শঙ্খ,
টিণ্ টিণ্ টিণ্ ঘনটা বোলে,
আহা মরি যেন মায়ের অঙ্কে
নিদ্রিত শিশুর নূপুর দোলে!
আহা কি আনন্দ আজ!
ত্যজিয়া জীর্ণ মলিন বসন
পরেছে বঙ্গ কুসুমসাজ!

* ময়মনসিংহ সারস্বত উৎসব উপলক্ষে লিখিত।

বাছিয়া বাছিয়া অঞ্জলী ভরিয়া
চন্দনচর্চ্চিত কুসুম লইয়া,
ভক্তিরসে গ'লে, ঢালিছে সকলে,
ভারতীর চারু চরণ কমলে।
ঘরে ঘরে যেন জ্যোৎস্নাবসনা, শান্তি
সুধাময়ী করিছে বিরাজ!
আহা কি আনন্দ আজ!

মহামায়া মায়া কল্পনারে
করিয়া সহায়,
মুহূর্ত্তে সে রঙ্গভূমি অপরূপ
করিয়া সাজায়!
পদ্মের আকারে
পদ্ম পুষ্পে গড়ে
পরিষ্কার করি সুন্দর আসন,
লতা পাতা দিয়ে
সুন্দর করিয়ে
গড়ে শুভ্রাবলী নয়নরঞ্জন।
তদুপরি নীল অপরাজিতায়
শারদ নিশার আকাশের প্রায়
চারু চন্দ্রাতপ ঝুলাইল;
মধ্যে মধ্যে তার গুচ্ছ গুচ্ছ বেলি
নক্ষত্রের ন্যায় বসাইল।
লইয়া গোলাপি গোলাপের কলি
তার চারি ধারে, সারি সারি,
বসাইয়া ফুটন্ত চামেলী
ঝুলা'ল ঝালর তায়;
নন্দন কুসুমে নয়নাভিরাম
শোভিলা মুহূর্ত্তে বাণী
মায়ার মায়ায়!

ওই শুন শুন! কে গাইছে গান।
তন্ত্রে তন্ত্রে নাচে তান লয় মান!
ছয় রাগ সহ ছত্রিশ রাগিণী
আহা কি সুন্দর মিলিল রে!
জরা মৃত্যু পাপ জঞ্জাল জড়িত
ভব মরুভূমে কেরে আচম্বিত,
এহেন সুধার সংগীতলহরী
জুড়াইতে প্রাণ উঠাল—রে!

তেজস্বী মুরতি, যেন দ্বিবাস্পতি
মহাঋষি আসি প্রণাম করিলা,
দেবতাবাঞ্ছিত পাদপদ্ম দু'টি
ধীরে মাতা তার শিরে ছোঁয়াইলা।
মহর্ষির শিরে শোভে জটাভার,
শুভ্র শ্মশ্রু আসি পড়েছে উরসে;
মুখে রাম রাম শব্দ অনিবার,
ঢল ঢল দেহ যেন ভক্তিরসে!
তাহার পশ্চাতে মেঘের বরণ
মহাকায় এক মহর্ষি আসিয়া
ধীরে বরদার বন্দিলা চরণ;
আশীষিলা মাতা ঈষদ হাসিয়া।
রসে অঙ্গ ভরা নয়ন চটুল,
সংগীত সলিলে স্নিগ্ধ করি প্রাণ
মুঞ্জরিয়া লতা ফুটাইয়া ফুল
দেখা দিলা পরে যুবক ধীমান্।
সাষ্টাঙ্গে যুবক প্রণাম করিলা।
আপনার বীণা সুকর কমলে
তুলি বীণাপাণী যুবকে অর্পিলা।
হে যুবক! তুমি ধন্য ধরাতলে!
মৃদুল মধুর বীণা বাজাইয়া,

ভগ্নকণ্ঠে গায়ি বিরহ সংগীত,
কে আইল ? শোক তরঙ্গ তুলিয়া
প্রকৃতিরে আজ করিল প্লাবিত।
তাহার পশ্চাতে কৃষ্ণবর্ণ কায়,
বিদেশীর বেশে ওকে দেখা দিল ?
অভিনব তানে কি মধুর গায় !
মৃত বঙ্গে যেন চেতনা ঢালিল !

সমস্বরে সবে বাঁধি স্বীয় স্বীয়
তন্ত্রী তার
গাইল হর্ষে, মহামায়ার মায়া
বোঝা ভার !

অমনি সম্মুখে শোভিল অতুল
সুখধাম বনস্থলী।
স্তবকে স্তবকে ফুল আছে ফুটি
শাখে শাখে ফল ঝুলি।
প্রকৃতির সেই সোহাগের বনে
একিরে একিরে হেরি !
কক্ষভ্রষ্ঠ ধ্রুব নক্ষত্রের প্রায়
ধরাসনে এক নারী।
এদিকে দেখনা ঐ কি ভীষণ
রণস্থলে দেখা যায় !
ওই দেখ মহা জ্যোতিষ্মান যোদ্ধা
শুইয়া শরশয্যায় !
অন্যদিকে ফিরাইয়া আঁখি, কর
একবার নিরক্ষণ,
ঘোর বনে সুরভি কুসুমে ঘেরা
ওই শান্তি নিকেতন।
স্বভাবের ছবি ভুবন মোহিনী
বৃক্ষছালে তনু ঢাকা,
আলবালে জল করিছে সিঞ্চন
বদনে লজ্জার রেখা।
আবার এদিকে শ্যামলপুলিনা
যমুনা বহিছে ধীরে ;
পাগলিনী প্রায় ঐক রমণী ওই
কাঁদে বসি তার তীরে !
মহামায়া একি দেখালে স্বপন
এমনত দেখি নাই !
বাজি পৃষ্ঠে শত বীর্য্যবতী নারী
দেখে মনে ভয় পাই।
কটীদেশে আঁটা শরাসন ; শিরে
রতন চুড়া নাচিছে।
রহি রহি রোষে ধনুক টঙ্কারে
হস্তে শূল আস্ফালিছে।

মহামায়া মায়া বোঝা ভার !
পরিবর্ত্তিল দৃশ্য পুনর্ব্বার।
নিবিল দেউটী হ'ল আঁধার।

হস্তে ভাঙ্গা লাঠি,
অঙ্গে মাখা মাটি,
উক্ষ খুক্ষ কেশ,
পাগলিনী বেশ,
অঞ্চল ধরায়,
হেলায় লুটায়,
দেহ লতা শীর্ণ,
শরীর বিবর্ণ,
জ্যোতিহীন তারা,
অপাঙ্গেতে ধারা,

কাঁপিতে কাঁপিতে,
পড়িতে পড়িতে,
একটি রমণী আইল তথায় ।
সজল নয়নে সুধাইলা বাণী ;—
' কে তুমি মা ? তুমি কাহার রমণী ?
তব দশা দেখে বুক ফেটে যায় ! '
মুছি অশ্রু জল,
চাপি বক্ষস্থল,
যষ্ঠির উপর,
রাখি-অঙ্গ ভর,
ভগ্ন স্বরে মরি
কহিলা সুন্দরী ;—
"আমার কাহিনী
শুনিবে কি বাণী ?
আমার বেদনা
কেহত বোঝে না !
তুমি কি বুঝিবে ?
মোরে কি চিনিবে ?
' স্মৃতি' নাম ধরে এই অভাগিনী !'
যদি মোর প্রতি এত দয়া তব
এসো সঙ্গে মোর, এসো বীণাপাণি,
গত দৃশ্য কিছু তোমারে দেখাব ।'
ঈষদ হাসিয়া, কহিলা ভারতী
'দেবতা আমরা ;
দিব্য চক্ষু ধরি, এক দৃষ্টে হেরি,
সসাগরা ধরা।
সেই দিব্য চক্ষু তোমারেও আমি
করিনু প্রদান,
দূর দৃশ্য স্মৃতি দেখিবে এখন
যেন চক্ষে বিদ্যমান ।

অশ্রু জল মুছি ভগ্ন কণ্ঠে স্মৃতি
কহিলা বাণীর কাছে ;
' অলকা সদৃশ ভারত ভূমির
আর কি সেদিন আছে !
ওই দেখ মাগো যমুনা বহিছে
আঁধারে ঢাকিয়া কায় !
বীচিরবচ্ছলে কালিন্দী কাতরে
বিষাদ সংগীত গায় ।
এই যমুনার স্ফটিক সলিলে
প্রভাতে সন্ধ্যায় মরি,
মন্দাকিনী জলে বিদ্যাধরী প্রায়
ভেসেছে প্রমোদ-তরী !
এই যমুনার শ্যামল পুলিনে
বিচিত্র চিত্রিত কত,
শত সৌধমালা ছিল দাঁড়াইয়া
স্বর্গীয় পরীর মত !
সেই যমুনার সেই সে পুলিনে
আজি কি দেখিতে পাই।
মহা মরুভূমি অনন্ত শ্মশান
শূন্য শূন্য সব ঠাঁই !
যেখানে সেখানে ভগ্ন অট্টালিকা
পড়ে আছে স্তূপাকার !
লতা পাতা ঘেরা এই স্তূপোপরি
ফিরাও আঁখি তোমার ।
ওই স্তূপে বসি অশ্রুময়ী শোক,
কাঁদিয়া জুড়ায় প্রাণ !
ছিন্ন তন্ত্র কষ্টে ভগ্ন বীণে বাঁধি
ভগ্ন কণ্ঠে করে গান !
ওই দেখ মাগো মহা তীর্থ স্থান
কুরুক্ষেত্র দেখ ওই,

কুরুক্ষেত্র আছে বল মা আমায়
সে কুরু পাণ্ডব কই ?
কই সে অর্জ্জুন ? বীর্য্য মূর্ত্তিমান্,
ভীমসেন মহাকায় ;
সত্য সত্য কি মা ভীষ্ম মহাবীর
নিদ্রিত চির নিদ্রায় ?
দেখ প্রান্তরের প্রান্তভাগে ওই
ম্রিয়মান মহাবীর,
ধূলায় লুটায় পর্ব্বতের প্রায়
তার প্রকাণ্ড শরীর।
ভীম শরাসন শতখণ্ড হয়ে
পড়িয়া রয়েছে ভূমে ;
কভু যেন বীর নয়ন মুদিয়া
অচেতন ঘোর ঘুমে !
কভু যেন ক্রোধে ভগ্ন কটি আঁটি
উঠিয়া বসিতে চায় ;
ভগ্ন বাহু ভাঙ্গি তখনি আবার
ভূতলে পড়িয়া যায় !
এই হতভাগ্য এক দিন মাগো
ভারত ঈশ্বর ছিল !
'বীর রস' নাম কালচক্রে পড়ি
ইহার এদশা হলো ! '

এই শোক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে
অপাঙ্গে বাণীর অশ্রু দেখা দিল ;
মায়ার মায়ায় আঁধার নাশিতে
জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আসি দাঁড়াইল।

ভুবন মোহিনী
আইলা রমণী
তনুময় যেন মাধুরী মাখা !
শতচন্দ্র যিনি
সে বদনখানি
নিবিড় কুন্তলে অর্দ্ধেক ঢাকা।
আস্য ভরা হাসি,
হেন জ্যোৎস্না রাশি,
অপাঙ্গে বিজলি জ্বলে !
কোহিনুরে হায়
পরাজি প্রভায়
একটি হীরক গলে !
মহা মূল্য কত
রত্ন শত শত
জ্বলিছে সর্ব্বাঙ্গে তার,
খচিত রতনে
কৌশিকি বসনে
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা বামার !
স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না রাশি,
ঘেরে মুখশশি
হস্তে বিদ্যুত মশাল।
মুহূর্ত্তে সে আলো
দিশি উজলিল
হরি আঁধার ভয়াল।
অন্য এক করে
রত্ন বীণা ধরে,
দাঁড়াল প্রতিমা স্থির ;
স্বীয় পাদমূলে
পুতিয়া মশালে
ধীরে নোয়াইল শির।
সম্মোহন মন্ত্রে,
বাঁধি বীণা যন্ত্রে

দিল সে তন্ত্রে ঝঙ্কার ;
আরম্ভিল গান
মোহিল পরাণ
ঘুচিল বিষাদ ভার !

' উঠ উঠ মাগো !
ধরাসন ত্যাগো।
তব দশা হেরে হৃদি ফেটে যায়।
চিরদিন কারু সমান না যায় !
ঝাড় ধুলি ঝাড়
নব বস্ত্র পড়
রাজরাণী তুমি কেন হেন বেশ।
কেন ধুলিমাখা এ চাঁচর কেশ !
তব পায়ে ধরি
মুছ অশ্রুবারি।
বিশুষ্ক অধরে একবার হাসো !
একবার সুখ তরঙ্গেতে ভাসো !

উঠ উঠ মাগো !
দেখ পূর্ব্বভাগো !
তপ্ত কাঞ্চনের আভায় শোভিল !
কাল নিশি তব বুঝি মা পহাল !
বলি যা শোনো মা !
কেঁদোনা কেঁদোনা !
মোর কথা রাখ ' আশা ' মোর নাম
ধৈর্য্যধর পূর্ণ হবে মনস্কাম।
নিরবিলা বীণা। ক্রোধ ভরে
ভগ্নবাহু যুগে করি বশ
ভগ্ন ধনুঃখণ্ড—যোড়া দিয়ে
উঠিতে চাহিল বীর রস,
নির্দ্দয় বিধির কি বিচার
হায় হস্ত ভাঙ্গি পড়ি গেল !
অন্তর্দ্ধান আশা বাণী সব
যাঃ রে মায়ার মায়া ফুরাল।

শ্রীদী—

জীবনপ্রভাত।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আরংজীব।

—•—

' আপনি কাটারি মারি আপনার পায়।
অহঙ্কার করে ডিঙ্গা ডুবালি দরিয়ায় ॥
বুদ্ধিমান হয়ে জ্ঞান হারালি হতভাগা।
শিরেকৈলে সর্পাঘাত কোথা বাঁধ্‌বি তাগা।
সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি বেটা হলি হতমুর্খ।
বল্লে কথা বুঝিস নাহি এই বড় দুঃখ ॥ '

কীর্ত্তিবাস ওঝা।

পর দিন প্রায় এক প্রহর বেলার সময় শিবজীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, জাগরিত হইয়াই রাজপথে একটি গোলযোগ শুনিলেন, উঠিয়া গবাক্ষ দিয়া নিম্নদিকে চাহিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন,—

দেখিলেন বাটির পশ্চাতে দুই পার্শ্বে, সম্মুখ দ্বারে অস্ত্রহস্তে প্রহরীগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বিশেষ পরিচয় না পাইলে বাহিরের লোককে গৃহে প্রবেশ করিতে দি-

ভেছে না, গৃহের লোককে বাহিরে যাইতে দিতেছে না। দেখিয়া সীতাপতির কথা স্মরণ হইল, কল্য তিনি পলাইতে পারিতেন, অদ্য আরংজীবের বন্দী!

তখন বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; জানিলেন যে, তিনি সম্রাটের নিকট স্বদেশ যাইবার প্রার্থনা করিয়া অবধি আরংজীবের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, সেই সন্দেহপ্রযুক্তই সম্রাট নগরের কোতোয়ালকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে শিবজীর বাটীর চতুর্দ্দিকে দিবারাত্র প্রহরী থাকিবে, শিবজী বাটী হইতে কোথাও যাইলে সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে। শিবজী তখন বুঝিতে পারিলেন যে, হিতৈষী সীতাপতি গোস্বামী গণনা দ্বারা বা কোনও অনুসন্ধানে আরংজীবের এই আদেশের কথা জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই শিবজীর পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়া রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন। মনে২ সীতাপতিকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আরংজীবের কপটাচারিতা এত দিনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। প্রথমে শিবজীকে বহু সমাদর পূর্ব্বক পত্র লিখিয়া দিল্লিতে আহ্বান করিলেন,—শিবজী আসিলে তাঁহাকে রাজ সভায় অবমাননা করিলেন, পরে রাজসভায় যাইতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে প্রকৃত বন্দী করিলেন। কোন কোন অজগর সর্প গো মহিষাদি ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে যেরূপ আপন দীর্ঘ শরীর ভক্ষ্যের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া জড়াইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে, পরে ইচ্ছানুসারে দংশন করে, ক্রূর আরংজীবও সেইরূপ কপটতাজালে শিবজীকে ক্রমে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মানসচক্ষে অতীত ও বর্ত্তমান সমুদায় ঘটনা মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টি করিয়া শিবজী শত্রুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া রোষে অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। দ্রুতপদনিক্ষেপে সেই গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অধরৌষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপিত রহিয়াছে, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন—

'আরংজীব! শিবজীকে এখনও জান না; চতুরতায় আপনাকে অদ্বিতীয় মনে কর, কিন্তু শিবজীও সে বিদ্যায় বালক নহে। ** এই ঋণ এক দিন পরিশোধ করিব,—দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে!'

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্তকে ডাকাইলেন। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রী উপস্থিত হইলেন, শিবজীর আজ্ঞায় সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

শিবজী বলিলেন—'পণ্ডিত প্রবর! আপনি আরংজীবের খেলা দেখিতেছেন;—এই খেলা আমাদেরও খেলিতে হইবে;

আপনার প্রসাদে শিবজী এ খেলায় অপরিপক্ক নহে,—খেলিবে।

‘অদ্য আমরা বন্দী হইয়াছি, আমি কল্য রজনীতে ইহার সংবাদ পাইয়াছিলাম; কিন্তু অনুচরবর্গকে পূর্ব্বে পরিত্রাণ না করিয়া আমার আত্মপরিত্রাণের ইচ্ছা নাই, সে বিষয়ে আপনার উপদেশ কি ?’

ন্যায়শাস্ত্রী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—‘আপনার অনুচরদিগের স্বদেশ গমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করুন, এক্ষণে আপনাকে বন্দী করিয়াছেন, আপনার অনুচরসংখ্যা যত হ্রাস হয় তাহাতে সম্রাট আহ্লাদিত ভিন্ন দুঃখিত হইবেন না। আমি বিবেচনা করি অনুমতি চাহিলেই পাইবেন।’

শিবজী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—‘মন্ত্রিবর, আপনার পরামর্শই শ্রেয়ঃ, আমারও বোধ হয় ধূর্ত্ত আরংজীব এবিষয়ে আপত্তি করিবেন না।’

সেই মর্ম্মে একখানি আবেদন পত্র প্রস্তুত হইল; শিবজী যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল; শিবজীর অনুচর সকল দিল্লী হইতে প্রস্থান করিবে শুনিয়া সম্রাট আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগের সকলকে এক একখানি অনুমতি-পত্র দান করিলেন। শিবজী কএক দিন মধ্যে সেই সমস্ত অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হইলেন, মনে মনে বলিলেন,—

‘মূর্খ! শিবজীকে বন্দী রাখিবে ? এখন একজন অনুচরের বেশ ধরিয়া ইহার মধ্যে একখানি অনুমতিপত্র লইয়া দিল্লী ত্যাগ করিলে কি করিতে পার ? যাহা হউক অনুচরবর্গ এখন নিরাপদে যাইবে, শিবজী আপনার জন্য উপায় উদ্ভাবনা করিতে সক্ষম।’

*　*　*　*

পাঠক! যিনি অসাধারণ চতুরতা বুদ্ধিকৌশল ও রণনৈপুণ্যে ভ্রাতৃগণকে পরাস্ত করিয়া, বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া দিল্লীর ময়ূরসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, যিনি কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি হইয়াও পুনরায় দাক্ষিণাত্যদেশ জয় করিয়া সমগ্র ভারতের একাধীশ্বর হইবার মহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যিনি অদ্য চতুরতার দ্বারা মহাবীর শিবজীকেও বন্দী করিয়াছিলেন, চল একবার সেই ক্রূর, কপটাচারী, অথচ সাহসী, দূরদর্শী আরংজীবের প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের ভাবগুলি নিরীক্ষণ করি!

রাজকার্য্য সমাধা হইয়াছে, আরংজীব ‘গোসলখানা’ নামক সভাগৃহের পার্শ্বস্থ একটি ঘরে উপবেশন করিয়া আছেন। সেটি মন্ত্রিদিগের সহিত গুপ্ত পরামর্শের স্থল, কিন্তু অদ্য আরংজীব একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, কখন কখন ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখা যাইতেছে, কখন বা উজ্জ্বল নয়নে ও কম্পিত অধরে রোষ, অভিমান বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, কখন বা মন্ত্রণা-স-

ফলভাজনিত সন্তোষে সেই ওষ্ঠপ্রান্ত হাস্যরেখায় অঙ্কিত হইতেছে। সম্রাট কি করিতেছেন? আপন বুদ্ধিবলে সমস্ত হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর হইয়াছেন, সেই কথা স্মরণ করিতেছেন? হিন্দু ধর্ম্মের আরও অবমাননা অথবা রাজপুত বা মহারাষ্ট্রদিগকে আরও পদদলিত করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন? শিবজীকে বন্দী করিয়া মনে মনে উল্লাসিত হইতেছেন? জানি না সম্রাটের কি চিন্তা। তাঁহার সভার মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও লোক, কোনও সেনাপতি, কোনও মন্ত্রীকে সন্দিগ্ধমনা আরংজীব কখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না,—মনের ভাব বলিতেন না। নিজের বুদ্ধি প্রাখর্য্যে সকলকে পুত্তলিকার ন্যায় চালাইবেন, সমগ্র দেশ সুন্দর শাসন করিবেন, আরংজীবের এই উদ্দেশ্য। বাসুকী যেরূপ নিজ মস্তকে এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, বিশ্রাম চাহেন না, কাহারও সহায়তা চাহেন না, আরংজীব নিজের অসাধারণ মানসিক বলে ভারতসাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য একাকী বহনকরিবার মানস করিয়াছিলেন, কাহারও পরামর্শ চাহিতেননা।

অনেকক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন, এরূপ সময় একজন সৈনিক তস্‌লীম করিয়া বলিল—

'সম্রাটের জয় হউক! জহাঁপনা! দানেশমন্দ্ নামক আপনার সভাসদ্ আপনার সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।'

সম্রাট্ দানেশমন্দকে আসিতে আজ্ঞা দিলেন, চিন্তারেখাগুলি ললাট হইতে অপসৃত করিলেন, সুন্দর হাস্য মুখে ধারণ করিলেন।

দানেশমন্দ্ আরংজীবের মন্ত্রী ছিলেন না, রাজকার্য্যে পরামর্শ দিতে সাহস করিতেন না। তবে তিনি পারস্য ও আরবী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, সুতরাং সম্রাট তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন, কখন কখন কোন কোন কথায় বাক্যচ্ছলে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। উদারচেতা দানেশমন্দ্ প্রায়ই উদার সরল পরামর্শ দিতেন; আরংজীবের জ্যেষ্ঠ দারা যখন বন্দী হয়েন, দানেশমন্দ্ তাঁহার প্রাণরক্ষার পরামর্শই দিয়াছিলেন। এবম্বিধ পরামর্শ কুটিল আরংজীবের মনোগত হইতনা,—আরংজীব তাঁহাকে অল্পবুদ্ধি ও অদূরদর্শী বলিয়া মনে করিতেন,—তথাপি তাঁহার বিদ্যা ও ধন ও পদ-মর্য্যাদার জন্য সম্যক্ আদর করিতেন। সরলস্বভাব বৃদ্ধ দানেশমন্দ্ সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন।

বলিলেন—

'এ সময়ে জহাঁপানার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা দাসের ধৃষ্টতা,—কেন না এ সময় সম্রাট রাজকার্য্যের পর বিশ্রাম করেন। তবে যে আসিয়াছি,—কেবল আপনি অনুগ্রহ করেন এই নিমিত্ত; পারস্য কবি সুন্দর লিখিয়াছে, 'সূর্য্যের দিকে জগতের সকল প্রাণী সকল সময়ে চাহিয়া

দেখে, সূর্য্য কি তাহাতে বিরক্ত বা কিরণ দানে বিরত হয়' ? ”

সম্রাট সহাস্য বদনে বলিলেন, ‘দানেশমন্দ্‌! অন্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক, আপনি সর্ব্ব সময়েই সমাদরের পাত্র।’

এইরূপ মিষ্টালাপ ক্ষণেক হইলে পর দানেশমন্দ্‌ অন্য কথা আনিলেন ;. বলিলেন,—

‘জহাঁপনা! ‘আলমগীর’ নাম সার্থক করিবেন! সমস্ত হিন্দুস্থান আপনার পদতলে রহিয়াছে, এক্ষণে দাক্ষিণাত্য জয় করিতেও বড় বিলম্ব নাই।’

ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন—

‘কেন, সে বিষয়ে আমার কি উদ্যোগ দেখিলেন ?’

দানে। ‘দক্ষিণদেশের প্রধান শত্রু আপনার পদতলে।’

আরং। ‘শিবজীর কথা বলিতেছেন ? হাঁ ইন্দুর কলে পড়িয়াছে!’ তৎক্ষণাৎ আপন মন্ত্রণা গোপনার্থে বলিলেন, ‘দানেশমন্দ্‌ আপনি আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই জানেন, দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই সম্মান করা আমার উদ্দেশ্য। শিবজী ধূর্ত্ত বিদ্রোহী হউক, যোদ্ধা বটে তাহাকে সম্মানার্থই দিল্লীতে আনিয়াছিলাম। রাজসভায় সমুচিত সম্মান করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে এরূপ মূর্খ যে রাজসভায় অসদাচরণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বন্দী করিতে বা তাহার প্রাণ লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং অন্য শাস্তি না দিয়া কেবল রাজসভায় আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন শুনিতেছি, যে দিল্লীর মধ্যেই সে অনেক সন্ন্যাসী ও বিদ্রোহীর সহিত পরামর্শ করে সুতরাং কোনও রূপ অনিষ্ট করিতে না পারে এই জন্যই কোতওয়ালকে দৃষ্টি রাখিতে কহিয়াছি। কয়েকদিন পর সম্মান পূর্ব্বক বিদায় দিব।’

দানে। ‘সম্রাটের এ আদেশ শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।’

আরং। ‘কেন ?’ আরংজীবের মুখে সেইরূপ হাস্য,—কিন্তু তীক্ষ্ণ নয়নে দানেশমন্দের মুখের দিকে চাহিতেছিলেন, তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিবার চেস্টা করিতেছিলেন।

উদারচেতা দানেশমন্দ্‌ বলিলেন, ‘সম্রাটকে পরামর্শ দি আমার কি সাধ্য, কিন্তু জহাঁপনা! যদি শিবজীর প্রতি দয়ালু আচরণ না করিতেন, তাহা হইলে মন্দ লোকে নানারূপ অখ্যাতি করিত, বলিত, যে শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্ধ করা ন্যায়সঙ্গত নহে।’

আরংজীব ঈষৎ কোপ সঙ্গোপন করিয়া সেইরূপ হাস্যবদনে বলিলেন,—

‘দানেশমন্দ্‌, মন্দ লোকের কথায় দিল্লীশ্বরের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তবে সুবিচার ও দয়া সিংহাসনের শোভন, সুবিচার করিয়া শিবজীর দোষের জন্য তাহাকে স-

তর্ক করিয়া দিব, পরে দয়াপ্রকাশে তাহাকে সসম্মানে বিদায় দিব।'

দানে। 'এরূপ সদাচরণেই জহাঁপনার প্রপিতামহ আকবর দেশ শাসন করিয়াছিলেন, এরূপ সদাচরণে আপনারও খ্যাতি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।'

আরং। 'সে কিরূপ?'

দানে। 'সম্রাটের অগোচর কিছুই নাই। দেখুন, আকবরশাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সমস্ত সাম্রাজ্য শত্রু-সঙ্কুল ছিল; রাজস্থানে, বিহারে, দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বস্থানেই বিদ্রোহী ছিল, দিল্লীর সন্নিকট স্থানও শত্রুশূন্য ছিল না। তাঁহার মৃত্যুকালে, সমস্ত সাম্রাজ্য নিঃশত্রু ও নির্ব্বিরোধ হইয়াছিল,—যাহারা পূর্ব্বে পরম শত্রু ছিল, সেই রাজপুত্রেরাই বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে! এ জয়সাধন কিরূপে হইয়াছিল? কেবল বাহুবলে? কেবল সাহসে? তৈমুরের বংশে কাহারও সাহস বা বাহুবলের অভাব নাই,—তবে আর কেহ এরূপ জয়সাধন করিতে পারেন নাই কি জন্য? না জহাঁপনা! কেবল সদাচরণেই এরূপ জয়লাভ হইয়াছিল। তিনি শত্রুদিগের প্রতি সদাচরণ করিতেন, অধীন হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিতেন, হিন্দুরাও এবম্বিধ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিত, মানসিংহ, টোডর মল্ল, বীরবল প্রভৃতি হিন্দুগণই মুসলমান সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ হইয়াছিলেন। উত্তম ব্যক্তিকেও অবিশ্বাস করিলে সে ক্রমে অধম হইয়া যায়, অধম কাফেরের প্রতি ও সদাচরণ ও বিশ্বাস করিলে, তাহারা ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হয়; মানবের এই প্রকৃতি,—শাস্ত্রের এই লিখন। আমাদের দক্ষিণদেশের যুদ্ধে শিবজী অনেক সহায়তা করিয়াছেন, জহাঁপনা! তাঁহাকে সম্মান করিলে তিনি যত দিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন তিনি দক্ষিণদেশে মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ থাকিবেন!'

দানেশমন্দ কি জন্য সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, পাঠক, বোধ হয়, এতক্ষণে বুঝিয়াছেন। দিল্লীশ্বর শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্দী করায় জ্ঞানী ও সদাচারী মুসলমান সভাসদ্ মাত্রেই লজ্জিত হইয়াছিলেন; দানেশমন্দ্‌কে সম্রাট সমাদর করিতেন, তিনি কোনরূপে কথাচ্ছলে সম্রাটের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ উদ্দেশ্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। শিবজীর প্রতি ভদ্রাচরণ করিয়া সম্রাট তাঁহাকে স্বদেশে যাইতে দেন, দানেশমন্দ্ এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। দানেশমন্দ্ জানিতেন না যে হস্তদ্বারা প্রকাণ্ড ভূধরকে বিচলিত করা যায়, কিন্তু পরামর্শ দ্বারা আরংজীবের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও গভীর উদ্দেশ্যগুলি বিচলিত করা যায় না।

দানেশমন্দের উদার সারগর্ভ কথা-

গুলি কুটিল আরংজীবের নিকট অতিশয় নির্ব্বোধের কথার ন্যায় বোধ হইল। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—

'হাঁ, দানেশমন্দ্! আপনি যেরূপ শাস্ত্রবিশারদ, মানব-হৃদয়ও সেইরূপ পাঠ করিয়াছেন,দেখিতেছি। দক্ষিণদিকে শিবজী স্তম্ভ স্থাপিত করিবেন, রাজস্থানে ত বিদ্রোহিগণ স্তম্ভ স্থাপন পূর্ব্বেই করিয়াছে; কাশ্মীর পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিব, ও বঙ্গদেশে পাঠানদিগকে পুনরায় সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিব,—এই চতুঃস্তম্ভের উপর মোগল সাম্রাজ্য সুন্দর ও সুদৃঢ় স্থাপিত হইবে।'

দানেশমন্দের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'সম্রাটের পিতা দাসকে অনুগ্রহ করিতেন, সম্রাটও যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, সেই জন্য কখন কখন মনের কথা বলি,—নচেৎ জহাঁপনাকে পরামর্শ দি,এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি নাই।'

আরংজীব দানেশমন্দ্কে নির্ব্বোধ সরল জানিয়াও; তাঁহার সেই সরলতার জন্য তাঁহাকে ভাল বাসিতেন,—তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছেন দেখিয়া বলিলেন,—

'দানেশমন্দ্! আমার কথার দোষ গ্রহণ করিও না। আকবরশাহ বুদ্ধিমান ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাফের ও মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখিয়া তিনি কি ধর্ম্ম-সঙ্গত আচরণ করিয়াছিলেন? আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমাদের সামান্য দৈনিক কার্য্য সম্পাদনকালেও দেখিতে পাই যে, আপনি করিলে যেরূপ কার্য্য হয় পরের হস্তে সেরূপ হয় না। এরূপ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন কার্য্যও সেইরূপ পরের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং সম্পাদন করিলে কি ভাল হয় না? নিজ বাহুবলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিতে সমর্থ হই, কি জন্য ঘৃণিত কাফেরদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব? আরংজীব বাল্যাবস্থা অবধি নিজ অসির উপর নির্ভর করিয়াছে, নিজ অসি দ্বারা সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিয়াছে,নিজ অসিদ্বারা দেশ শাসন করিবে, কাহারও সহায়তা চাহিবে না, কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না।'

দানে। 'জহাঁপনা! স্বহস্তে দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়, কিন্তু এরূপ সাম্রাজ্য শাসন কি সহায়তা ভিন্ন সম্পাদিত হয়? বঙ্গদেশ, দক্ষিণদেশ প্রভৃতি স্থানে কি সর্ব্ব সময়ে আপনি বর্ত্তমান থাকিতে পারেন? অন্য কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইবে?'

আরং। 'অবশ্য ভৃত্য নিযুক্ত করিব, কিন্তু তাহারা চিরকাল ভৃত্যের ন্যায় থাকিবে, যেন প্রভু হইতে না চাহে। অদ্য আমি যাহাকে অধিক ক্ষমতা দিব, কল্য সে সেই ক্ষমতা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারে। অদ্য যাহাকে অধিক বিশ্বাস করিব, কল্য সে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে; এ অবস্থায় ক্ষমতা

ও বিশ্বাস অন্যে ন্যস্ত না করিয়া আপনাতে রাখাই ভাল। দানেশমন্দ্‌! তুমি যখন অশ্বে আরোহণ কর, অশ্বকে বল্‌গা ও গুণের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত কর, যেদিকে ফিরাও সেই দিকে যাইতে বাধ্য হয়। সম্রাটেরও সেইরূপে শাসন করা উচিত, কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, কাহারও হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিও না, সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিবে, কর্ম্মচারী ও সেনাপতিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীকরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট কার্য্য গ্রহণ করিবে।'

দানে। 'প্রভু! মনুষ্যত অশ্ব নহে, তাহাদিগের মহত্ত্ব আছে, নিজ নিজ সম্মান-জ্ঞান আছে।'

আরং। 'মনুস্য অশ্ব নহে তাহা জানি; সেই জন্যই অশ্বকে বল্‌গাদ্বারা চালাই, মনুষ্যকে উন্নতির আশা ও শাস্তির ভয়ের দ্বারা চালাই। যে উত্তম কার্য্য করিবে তাহাকে পুরস্কার দিব, যে অধম কার্য্য করিবে তাহাকে শাস্তি দিব। পুরস্কার-আশা ও শাস্তি-ভয়ে সকলে কার্য্য করিবে; ক্ষমতা, বিশ্বাস, মন্ত্রণা, আরংজীব নিজ হৃদয়ে ও নিজ বাহুবলে ন্যস্ত রাখিবে।'

দানে। 'প্রভু! পুরস্কার-আশা ও শাস্তি-ভয় ভিন্ন মনুষ্যহৃদয়ে ত অন্য ভাবও আছে। মনুষ্যের মহত্ত্ব আছে, উচ্চাভিলাষ আছে, নিজ সম্মান-জ্ঞান আছে! যে শাস্তি-ভয়ে কার্য্য করে, সে কোন রূপে কেবল কার্য্য সমাপ্ত করিয়া নিরস্ত থাকে; কিন্তু যাহাকে আপনি সম্মান করেন, সমাদর করেন, ক্ষমতা দিয়া বিশ্বাস করেন, সে আপনাকে সেই সমাদর ও বিশ্বাসের উপযোগী প্রমাণ করিবার জন্য প্রভুকার্য্যে নিজের ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়াছে, এরূপ উদাহরণ ও শাস্ত্রে দেখা যায়।'

আরংজীব সহাস্যে বলিলেন,—

'দানেশমন্দ! আমি তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ নহি; কবিতায় যাহা লিখে তাহা বিশ্বাস করি না। মানবপ্রকৃতি আমার শাস্ত্র; মানবের মহত্ত্ব আমি অল্প দেখিয়াছি। শঠতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা অনেক দেখিয়াছি। সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজ হস্তে ক্ষমতা রাখিতে শিখিয়াছি, সেই জন্য কাফেরদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছি, বিদ্রোহোন্মুখ রাজপুতদিগের উপর কঠোর শাসন করিব, মহারাষ্ট্রদেশ নিঃশত্রু করিব, বিজয়পুর ও গলখন্দ জয় করিব, হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত আরংজীব একাকী শাসন করিবে, কাহার ও সহায়তা লইবে না, আলমগীর নিজের নাম সার্থক করিবে।'

উৎসাহে সম্রাটের নয়ন উজ্জ্বল হইয়াছিল, তিনি মনের গভীর অভীষ্ট কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, অদ্য কথায় কথায় অনেকটা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দা-

নেশমন্দের উদার চরিত্র জানিতেন, তাঁহার নিকট দুই একটি কথা কহিলে কোনও হানি নাই, জানিতেন।

ক্ষণেক পর ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন,—'সরলস্বভাব বন্ধু! অদ্য আমার অভীষ্ট ও মন্ত্রণা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলে ?'

তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরংজীব যদি আপনার গভীর মন্ত্রণা কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া সেই দিন সরল দানেশমন্দের সরল পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য বোধ হয় এত শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না!

এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন এমন সময়ে সৈনিক পুনরায় আসিয়া সংবাদ দিল—

'রামসিংহ জহাঁপানার সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।'

সম্রাট আদেশ করিলেন,—'আসিতে দাও।'

ক্ষণেক পর রাজা জয়সিংহের পুত্র রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

রামসিংহের সহিত পাঠকের পূর্ব্বেই পরিচয় হইয়াছে। আকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত, ললাট প্রশস্ত, নয়নযুগল উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ, সমস্ত অবয়ব যৌবনকান্তিতে শোভিত, যৌবন বলে বলিষ্ঠ। যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন—

'সম্রাটের সহিত এরূপ সময়ে সাক্ষাৎ করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অবিধেয়, কিন্তু পিতার নিকট হইতে অতিশয় গুরু সংবাদ আসিয়াছে, প্রভুকে জানাইতে আসিলাম।'

আরং। 'আপনার পিতার নিকট হইতে আমরাও অদ্য পত্র পাইয়াছি ও সমস্ত সংবাদ অবগত আছি।'

রাম। 'তবে সম্রাট অবগত আছেন যে পিতা সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া, শত্রুদেশ বিদীর্ণ করিয়া রাজধানী বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সৈন্যের অল্পতা বশতঃ সে নগর এপর্য্যন্ত হস্তগত করিতে পারেন নাই, বিশেষ গলখন্দের সুলতান বিজয়পুরের সহায়ার্থ নেকনাম খাঁ নামক সেনাপতিকে বহুসংখ্যক সৈন্যসমেত প্রেরণ করিয়াছেন।'

আরং। 'সমস্ত অবগত হইয়াছি।'

রাম। 'চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া পিতা সম্রাটের আদেশে এখনও যুদ্ধ করিতেছেন কিন্তু এ যুদ্ধে জয় অসম্ভব, প্রভুর নিকট আর অল্পসংখ্যক সৈন্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।'

আরং। 'আপনার পিতা বীরাগ্রগণ্য! তিনি নিজের সৈন্যে বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিবেন না ?'

রাম। 'মনুষ্যের যাহা সাধ্য, পিতা তাহা করিবেন; শিবজী পূর্ব্বে পরাস্ত হয়েন নাই, পিতা তাঁহাকে পরাস্ত করাছেন; বিজয়পুর পূর্ব্বে আক্রান্ত হয় নাই, পিতা ততদূর যাইয়া সেই নগর আক্রমণ করিয়াছেন, এখন আপনার নিকট

অল্পমাত্র সৈন্য-সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। তাহা হইলেই সমস্ত কার্য্য শেষ হয়, দক্ষিণদেশে মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও দৃঢ়ীভূত হয়।'

এরূপ অবস্থায় অন্য কোন সম্রাট সেই সহায়তা প্রেরণ করিয়া দাক্ষিণাত্য-দেশবিজয়কার্য্য সমাধা করিতেন। আরংজীব আপনাকে বহুদূরদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনে করিতেন, তিনি সে সহায়তা প্রেরণ করিলেন না—বলিলেন—

'রামসিংহ! আপনার পিতা আমাদের সুহৃদ্‌প্রবর, তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলাম, তাঁহাকে পত্র লিখিবেন যে, তিনি নিজের অসাধারণ বাহুবলে জয় সাধন করিবেন, সম্রাট দিবানিশি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন; কিন্তু এখন দিল্লীতে সেনাসংখ্যা অতি অল্প, আমি সহায়তা প্রেরণ করিতে অক্ষম।'

রামসিংহ কাতরস্বরে বলিলেন, 'জহাঁপনা! পিতা দিল্লীশ্বরের পুরাতন দাস, আপনার কালে, আপনার পিতার কালে অসংখ্য যুদ্ধ যুঝিয়াছেন, অনেক কার্য্য সাধন করিয়াছেন; দিল্লীশ্বরের কার্য্যসাধন ভিন্ন তাঁহার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই ঘোর বিপদে আপনি কিঞ্চিৎ সাহায্য দান না করিলে, তিনি বোধ হয়, সসৈন্যে নিধনপ্রাপ্ত হইবেন।' রামসিংহের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তাঁহার নয়নে জলবিন্দু উদিত হইল।

বালক! জলবিন্দুতে আরংজীবের গভীর উদ্দেশ্য, দৃঢ়মন্ত্রণা বিচলিত হয় না।

সে উদ্দেশ্য—সে মন্ত্রণা কি? রাজা জয়সিংহ অতিশয় ক্ষমতাশালী প্রতাপান্বিত সেনাপতি, তাঁহার অসংখ্য সৈন্য, বিস্তীর্ণ যশ, অনন্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ! আজীবন তিনি নিষ্কলঙ্কে দিল্লীশ্বরের কার্য্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত ক্ষমতা কোন সেনাপতির থাকা বিধেয় নহে; সম্রাট এতদূর জয়সিংহকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। এযুদ্ধে যদি জয়সিংহ সার্থকতা লাভ করিতে না পারিয়া অবমানিত হয়েন, তবে সে প্রতাপ ও যশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে। যদি সসৈন্যে বিজয়পুর সম্মুখে নষ্ট হয়েন, দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের একটি কণ্টকোদ্ধার হইবে! উর্ণনাভের জালের ন্যায় আরংজীবের উদ্দেশ্যগুলি বহুবিস্তীর্ণ ও অব্যর্থ, অদ্য জয়সিংহ-কীট তাহাতে পড়িয়াছেন, উদ্ধার নাই।

জয়সিংহ বহুকালাবধি দিল্লীশ্বরের কার্য্যে জীবন পণ করিয়াছেন বটে, সে জন্য কি সূক্ষ্ম মন্ত্রণাজাল অদ্য ব্যর্থ হইবে?

জয়সিংহের উদারচরিত্র যুবকপুত্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছে বটে, বালকের রোদনের জন্য কি দূরদর্শী সম্রাট উদ্দেশ্য ত্যাগ করিবেন?

দয়া মায়া প্রভৃতি সুকুমার মনোবৃত্তিসমূহ আরংজীব বিশ্বাস করিতেন না, নিজ হৃদয়েও স্থান দিতেন না; আত্মপথ পরিষ্কারার্থ অদ্য একটি পতঙ্গ সরাইয়া ফেলি-

লেন, কল্য একজন সহোদর ভ্রাতাকে হনন করিলেন, উভয় কার্য্যই একই প্রকার ধীর নিরুদ্বেগ হৃদয়ে করিতেন ! একদিন পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র আত্মীয়বর্গ সেই উন্নতিপথে পড়িয়াছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। পিতাকে মায়াবশতঃ জীবিত রাখেন নাই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে ক্রোধবশতঃ হত্যা করেন নাই, সে সমস্ত বালকোচিত মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। পিতা জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই, আপন উদ্দেশ্যসাধনে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না, তিনি জীবিত থাকুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত থাকিলে উদ্দেশ্যসাধনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে ; জল্লাদ ! তাহাকে সরাইয়া সম্রাট আলমগীরের পথ পরিষ্কার করিয়া দাও !

মন্ত্রণাসাধনের জন্য অদ্য আবশ্যক যে জয়সিংহ সসৈন্য হত হইবেন ; তিনি ভাল কি মন্দ, বিশ্বাসী কি বিদ্রোহী অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই, তিনি সসৈন্যে মরিবেন। এই পরিচ্ছেদ-বিবৃতি সময়ের পর কএক মাসের মধ্যেই দিল্লীতে সংবাদ আসিল, অবমানিত, অকৃতার্থ জয়সিংহ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামসিংহ বলিলেন—

‘ প্রভু আমার একটি যাচ্ঞা আছে। ’

আরং। ‘ নিবেদন করুন। ’

রাম। ‘ শিবজী যখন দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকে বাক্যদান করিয়াছিলেন যে দিল্লীতে শিবজীর কোনও আপদ ঘটিবে না। ’

আরং। ‘ আপনার পিতা সে কথা আমাদের অবগত করাইয়াছেন। ’

রাম। ‘ রাজপুতদিগের মধ্যে বাক্যদান করিয়া তাহা লঙ্ঘন হইলে অতিশয় নিন্দার বিষয়। পিতার প্রার্থনা ও দাসের প্রার্থনা যে প্রভু শিবজীর যে কোনও দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিন।’

আরংজীব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, সম্রাটের যাহা উচিত কার্য্য সম্রাট তাহা করিবেন, সে বিষয়ে আপনি চিন্তিত হইবেন না।’

আরও ক্ষণেক দানেশমন্দের সহিত কথোপকথনের পর সম্রাট বেগমমহলে যাইলেন, দানেশমন্দ্ ও রামসিংহ ক্ষুণ্নমনে প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শিবজীনামে দ্বিতীয় একটি কীট সম্রাটের সেই বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজালে পতিত হইয়াছেন ; দানেশমন্দ্ ও রামসিংহ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

জয়সিংহের যে দোষ শিবজীরও সেই দোষ ; শিবজীও সন্ধিস্থাপনাবধি প্রাণপণে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছেন নিজ সৈন্য দ্বারা অনেক দুর্গ দিল্লীর অধীনে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারও বিপুল ক্ষমতা ; আরংজীব কোনও ভৃত্যের উপর বিপুল

ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারেন না, কাহাকেও বিশ্বাস করেন না।

যাহাকে অবিশ্বাস করা যায়, তাহারা ক্রমে অবিশ্বাসের যোগ্য হয়। আরংজীবের জীবিতকালের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়েরা ও দিল্লীর চিরবিশ্বস্ত রাজপুতেরা, দিল্লীর বিরুদ্ধে যে ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিল, মোগল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া গেল।



সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া।



" দূরে গেল জটাজুট।

মধুসূদন দত্ত।

শিবজীর অতিশয় সঙ্কটজনক পীড়া হইয়াছে, সমগ্র দিল্লীনগরে এ সংবাদ প্রচারিত হইল। দিবা নিশি শিবজীর গৃহের গবাক্ষ ও দ্বার রুদ্ধ, দিবানিশি চিকিৎসক আসিতেছেন। এ ভীষণ রোগের উপশম সন্দেহস্থল, অদ্য যেরূপ রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকা অসম্ভব। কখন কখন বা সংবাদ রাষ্ট্র হইতেছে যে শিবজী আর নাই! রাজপথ দিয়া বহুসংখ্যক লোক গমনাগমন করিত ও সেই রুদ্ধ গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিত, অশ্বারোহী সৈনিক ও সেনাপতিগণ ক্ষণেক অশ্ব থামাইয়া প্রহরীদিগের নিকট শিবজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন; শিবিকারোহী রাজা বা মনসব্দার শিবজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া একবার উঠিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন; শিবজী কিরূপ আছেন, তিনি উদ্ধার পাইবেন কি না, তিনি কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন কি না, এইরূপ নানা কথা নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে, ঘাটে, সর্ব্বসময়ে আন্দোলন করিত। আরংজীব সর্ব্বদাই শিবজীর রোগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, তথাপি গৃহের চারিদিকে যে প্রহরী সন্নিবেশিত ছিল তাহা পূর্ব্বমত রাখিলেন। লোকের নিকট শিবজীর রোগের বিষয় আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, মনে মনে সর্ব্বদাই ভাবিতেন, " যদি এই রোগেই শিবজীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোন নিন্দা না হইয়াই অনায়াসে কণ্টকোদ্ধার হইবে!'

সন্ধ্যাকাল সমাগত, এরূপ সময়ে একজন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলমান হাকিম শিবির হইতে শিবজীর গৃহদ্বারের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা করিল, ' কি উদ্দেশে শিবজীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।' হাকিম উত্তর করিলেন, ' সম্রাটের আদেশ অনুসারে রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি।' সসম্মানে প্রহরীগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

শিবজী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার ভৃত্য সম্বাদ দিল যে সম্রাট একজন হাকিম পাঠাইয়া দিয়াছেন। তীক্ষ্ণ

বুদ্ধি শিবজী তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করিলেন, কোনরূপ বিষপ্রয়োগের জন্য সম্রাট এ কাণ্ড করিতেছেন; ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—

'হাকিমকে আমার সেলাম জানাইও ও বলিও হিন্দু কবিরাজে আমার চিকিৎসা করিতেছে, আমি হিন্দু, অন্যরূপ চিকিৎসা ইচ্ছা করি না। সম্রাটের এই অনুগ্রহের জন্য আমার কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাইবেন।' কিন্তু ভৃত্য এই আদেশ লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই হাকিম অনাহূত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শিবজীর হৃদয়ে ক্রোধ সঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা সঙ্গোপন করিয়া অতি ক্ষীণ মৃদুস্বরে হাকিমকে অভ্যর্থনা করিলেন, ও শয্যাপার্শ্বে বসিতে আদেশ দিলেন। হাকিম উপবেশন করিলেন।

আকৃতি দেখিলে এরূপ লোকের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। বয়স অনেক হইয়াছে, অতি শুক্ল শ্মশ্রু লম্বিত হইয়া উরঃস্থল আবৃত করিয়াছে; মস্তকোপরি প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, হাকিমের স্বর ধীর ও গম্ভীর। বলিলেন—

'মহাশয়! ভৃত্যকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রুত হইয়াছি, আমার চিকিৎসা ইচ্ছা করেন না; তথাপি মানবজীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম, আমি স্বধর্ম্মসাধন করিব।'

শিবজী মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, ভাবিলেন এ বিপদ কোথা হইতে আসিল? কিছু বলিলেন না।

হাকিম। 'আপনার পীড়া কি?'

কাতর স্বরে শিবজী বলিলেন, 'জানি না এ কি ভীষণ পীড়া; শরীর সর্ব্বদাই অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, হৃদয়ে বেদনা, সর্ব্বস্থানে বেদনা।'

হাকিম গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'পীড়া অপেক্ষা জিঘাংসায় শরীর অধিক জ্বলে, হৃদয়ের বেদনা অনেক সময় মানসিকক্লেশসঞ্জাত; আপনার কি সেই পীড়া?'

বিস্মিত ও ভীত হইয়া শিবজী এই অপরূপ হাকিমের দিকে চাহিলেন; মুখ সেইরূপ গম্ভীর, কোনও ভাবই লক্ষিত হইল না। শিবজী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। হাকিম তাঁহার হস্ত ও শরীর দেখিতে চাহিলেন।

শিবজী আরও ভীত হইলেন, অগত্যা হস্ত ও শরীর দেখাইলেন।

অনেকক্ষণ অতিশয় মনোনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া হাকিম উত্তর করিলেন,—

'আপনার বচন যেরূপ ক্ষীণ, নাড়ীত সেরূপ ক্ষীণ নহে, ধমনীতে শোণিত সজোরে সঞ্চালিত হইতেছে, পেশীগুলি পূর্ব্ববৎ দৃঢ়বদ্ধ। আপনার এসমস্ত কি প্রবঞ্চনা মাত্র?'

পুনরায় বিস্মিত হইয়া শিবজী এই অপূর্ব্ব চিকিৎসকের দিকে চাহিলেন, চিকিৎসকের মুখ মণ্ডল গম্ভীর ও অকম্পিত, কোনও ভাব লক্ষিত হইল না। শিব-

জীর শরীরে ক্রমে উষ্ণ শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া পুনরায় ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—

আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, অন্যান্য চিকিৎসকগণও সেইরূপ বলেন ; এ মহৎ পীড়া বাহ্যলক্ষণশূন্য, কিন্তু দিনে দিনে তিল তিল করিয়া আমার জীবন নাশ করিতেছে ।'

হাকিম ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

'আলফলায়লা ও লায়লুন' নামক আমাদের যে প্রকাণ্ড চিকিৎসাশাস্ত্র আছে তাহাতে এক সহস্র এক পীড়ার বিষয় নির্দ্দেশ আছে ; তাহার মধ্যে কয়েকটি বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়ার কথা লিখিত আছে। একটির নাম 'আকল্‌তু সামাকাতা হওয়া রাশি হা'। বালকেরা এই পীড়া ভাণ করিয়া চুরি করিয়া মৎস ভক্ষণ করে, ইহার চিকিৎসা প্রহার। আর একটির নাম 'বকুস্‌তনে আসিরী ইশারৎ কর্দ্দ, কয়েদীগণ কাজ না করিবার জন্য এই পীড়া ভাণ করে, ইহার চিকিৎসা শিরচ্ছেদন। তৃতীয় এক প্রকার বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়া আছে, শত্রুহস্ত হইতে পলাতুকাম বন্দীদিগের সেই পীড়া ঘটে, তাহারও ঔষধি নির্দ্দেশ আছে ; আমি তাহাই আপনাকে দিতেছি।'

শিবজী এ সমস্ত শাস্ত্রকথা বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু হাকিম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুর, শিবজীর মনের ভাব বুঝিয়াছেন তাহা শিবজী বুঝিতে পারিলেন। ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে ঔষধি কি ?'

হাকিম উত্তর করিলেন, 'সে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধিও বটে, উৎকট্‌ বিষও বটে রব্বুল আলমিনার নাম লইয়া তাহাই আপনাকে দিব, যদি রোগ যথার্থ হয়, অব্যর্থ ঔষধিতে তৎক্ষণাৎ পীড়া আরোগ্য হইবে, যদি প্রতারণা হয় অব্যর্থ বিষে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে।' এই বলিয়া হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন ;

শিবজীর হৃৎকম্প হইল, ললাট হইতে স্বেদবিন্দু পড়িতে লাগিল ! ঔষধি সেবনে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার প্রতারণা প্রচারিত হইবে, সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু !

হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিয়া আনিল, শিবজী বলিলেন, 'মুসলমানের পৃক্ত পানীয় আমি পান করিব না ;' সজোরহস্তসঞ্চালনে পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

হাকিম কিছুমাত্র রুষ্ট হইলেন না। ধীরে ধীরে বলিলেন, 'এরূপ সজোর হস্ত সঞ্চালন ক্ষীণতার লক্ষণ নহে !'

শিবজী অনেক্ষণ অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। সহসা উঠিয়া বসিলেন, 'রোগীকে উপহাস করিবার এই শাস্তি,' বলিয়া মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন ও হাকিমের শুক্ল শ্মশ্রু সজোরে আকর্ষণ করিলেন।

বিস্মিত হইয়া দেখিলেন সেই মিথ্যা শ্মশ্রু সমস্ত খসিয়া আসিল, চপেটাঘাতে

উষ্ণীষ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাঁহার বাল্য সুহৃদ্ তন্নজী মালশ্রী খিল্ খিল্ করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল!

কষ্টে অনেক্ষণপর হাস্য সম্বরণ করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পরে শিবজীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন,—

'প্রভু কি সর্ব্বদাই চিকিৎসককে এইরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকেন? তাহা হইলে রোগীর মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশের চিকিৎসক নিঃশেষিত হইবে! বজ্রসম চপেটাঘাতে এখনও মস্তক ঘুর্ণিত হইতেছে!'

শিবজী সহাস্যে বলিলেন, 'বন্ধু, সিংহের সহিত খেলা করিলে কখন কখন আহত হইতে হয়। যাহা হউক তোমাকে দেখিয়া কতদূর আহ্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না, এ কয়দিনই তোমাকে প্রত্যাশা করিতেছিলাম, এখন সংবাদ কি বল।'

তন্ন। 'প্রভুর সমস্ত আদেশ সম্পাদিত করিয়াছি, একে একে নিবেদন করিতেছি।

'সম্রাট যে অনুমতি পত্র দিয়াছিলেন তদ্দ্বারা আপনার অনুচরবর্গ সমস্তই নিরাপদে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে।'

শিব। 'সে জন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করি। এখন আমার মন শান্ত হইল, আমি আপনার পলায়নের জন্য তত ভাবি না; গগনবিহারী গরুড়পক্ষী সামান্য পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকে না।'

তন্ন। 'সেই সমস্ত অনুচর দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গোস্বামীর বেশধরিয়া মথুরা ও বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছে; মথুরায় অনেক দেবালয়ে পুরোহিতগণও প্রত্যহ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে! আমি দিল্লী হইতে মথুরার পথ বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়াছি, যে যে স্থানে যেরূপ লোক সন্নিবেশিত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন তাহাও করিয়াছি।'

শিব। 'চির বন্ধু! তুমি যেরূপ কার্য্যদক্ষ অবশ্যই আমরা নিরাপদে স্বদেশ যাইতে পারিব।'

তন্ন। 'দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে আপনি যেরূপ একটি তীব্রগতি অশ্ব রাখিতে বলিয়াছিলেন তাহাও রাখিয়াছি, যে দিন স্থির করিবেন, সেই দিনে সমস্ত প্রস্তুত থাকিবে।'

শিব। 'ভাল।'

তন্ন। 'রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার পিতা আপনাকে যে বাক্যদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। রামসিংহ পিতার ন্যায় সত্যপ্রিয় ও উদারচেতা, শুনিয়াছি স্বয়ং সম্রাটের নিকট যাইয়া আপনার জন্য সাশ্রুনয়নে আবেদন করিয়াছিলেন।'

শিব। 'সম্রাট কি বলিলেন?,

তন্ন। 'বলিলেন সম্রাটের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন।'

শিব। 'বিশ্বাসঘাতক! কপটা-

চারী! এখনও একদিন শিবজী ইহার প্রতিশোধ দিবে!'

তন্ন। ' রামসিংহ সে বিষয়ে বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু যুবক সরোষে আমার নিকট বলিলেন, যে রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না, অর্থ দ্বারা সৈন্যদ্বারা যেরূপে পারেন, তিনি আপনার সহায়তা করিবেন, তাহাতে যদি তাঁহার প্রাণ যায় তাহাতেও স্বীকার আছেন।'

শিব। ' পিতার উপযুক্ত পুত্র! কিন্তু আমি তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে চাহি না, আমি পলায়নের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি তাহা তুমি তাঁহাকে জানাইয়াছ?'

তন্ন। ' জানাইয়াছি, তিনি জানিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আপনার সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শিব। ' ভাল।'

তন্ন। ' এতদ্ভিন্ন দানেশমন্দ্‌ প্রভৃতি যাবতীয় আরংজীবের সভাসদকে মিষ্ট কথায় বা অর্থদ্বারা, বা নজর দিয়া আপনার পক্ষবর্ত্তী করিয়াছি। দিল্লীতে হিন্দু কি মুসলমান এরূপ বড় লোক কেহ নাই, যিনি আপনার পক্ষবর্ত্তী নহেন; কিন্তু আরংজীব কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করেন না।'

শিব। ' তবে সমস্ত প্রস্তুত! আমি আরোগ্য লাভ করিতে পারি?'

সহাস্যে তন্নজী বলিলেন, ' আমার ন্যায় বিজ্ঞ হাকিম যখন আপনার পীড়ার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন পীড়া কি থাকিতে পারে? কিন্তু আপনার পানের জন্য সুন্দর মিষ্ট শরবৎ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সমস্তটা নষ্ট করিলেন?'

শিবজী বলিলেন, ' বন্ধু, আর এক পাত্র প্রস্তুত কর।' তন্নজী সেই পাত্র লইয়া পুনরায় শরবৎ প্রস্তুত করিলেন; শিবজী পান করিলেন,—সহাস্যে বলিলেন, ' চিকিৎসক! আপনার ঔষধি যেরূপ মিষ্ট সেইরূপ ফলদায়ী, আমার পীড়া একেবারে আরাম হইয়াছে।

তন্ন। ' তবে এখন প্রস্থান করি।' শিবজীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় উষ্ণীষ ও শ্মশ্রু ধারণ করিয়া তন্নজী গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

দ্বারদেশে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, ' পীড়া কিরূপ দেখিলেন?'

হাকিম উত্তর করিলেন, ' পীড়া অতিশয় সঙ্কটজনক, কিন্তু আমার অব্যর্থ ঔষধিতে অনেক উপশম হইয়াছে; বোধ করি অল্পদিনের মধ্যেই শিবজী এ ক্লেশ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।'

হাকিম শিবিকাযোগে চলিয়া গেলেন; এক প্রহরী অন্যকে বলিল,—

' এ হাকিম বড় ভাল, এত বৈদ্যে যে পীড়া আরাম করিতে পারিল না,—হাকিম একদিনে তাহা আরাম করিল কিরূপে?'

দ্বিতীয় প্রহরী উত্তর করিল, ' হবে না কেন, এ যে রাজবাটির হাকিম?'

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আরোগ্য।

' এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে॥
হে বীর, কমল চক্ষে কর পরিহার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার॥

কাশীরাম দাস।

উপরি উক্ত ঘটনার কএকদিন পর নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে শিবজীর পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে। নগরে পুনরায় ধুমধাম পড়িয়া গেল ; সকলেই সেই কথা কহিতে লাগিল। কেহ কেহ শিবজীর আরোগ্যে দুঃখিত হইলেন; কোন কোন মহদাশয় মুসলমান এই সংবাদ পাইয়া সুখী হইলেন। পথে, ঘাটে, দোকানে, মস্‌জীদে সকলেই এই কথা কহিতে লাগিল ; আরংজীব এ সংবাদ শুনিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন !

নগরে ধুমধাম পড়িয়া গেল ! শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি মুদ্রা দান করিতে লাগিলেন, দেবালয়ে পূজা পাঠাইতে লাগিলেন,চিকিৎসক সকলকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিলেন। বাজারে আর মিষ্টান্ন রহিল না, শিবজী রাশি রাশি মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া দিল্লীর সমস্ত বড় লোকের বাটিতে পাঠাইতে লাগিলেন। পরিচিত সমস্ত লোকের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন, এমন কি প্রতি মস্‌জীদে ফকীরগণের সেবনার্থ প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন ! সম্রাটের মনে যাহাই থাকুক, অন্য সকলেই শিবজীর এই বদান্যতা ও সদাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ' দিল্লীকালাড্ডু'র ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, তাহাতে আর কেহ ' পস্তাইয়া ' ছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আরংজীব অতি শীঘ্রই পস্তাইয়াছিলেন !

শিবজী কেবল মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, মিষ্টান্ন ক্রয় করাইয়া নিজের গৃহে আনিতেন ও অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আধার সমস্ত নির্ম্মাণ করাইয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন সাজাইয়া প্রেরণ করিতেন। সে আধার কখন কখন তিন চারিহাত দীর্ঘ হইত, ৮ কি ১০ জন লোকে বহিয়া লইয়া যাইত। কএক দিন এইরূপে মিষ্টান্ন বিতরিত হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ দুইটি প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের আধার শিবজীর গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা করিল,—

' এ কাহার বাটিতে যাইবে ?' বাহকেরা উত্তর করিল, ' রাজা জয়সিংহ-সদনে।'

প্রহ। ' তোমাদের প্রভু আর কত দিন এরূপ মিষ্টান্ন পাঠাইবেন।'

বাহ। ' এই অদ্যই শেষ ! '

মিষ্টান্নের ভার লইয়া বাহকগণ চলিয়া গেল।

কতক পথ যাইয়া একটি অতি সঙ্গুপ্ত

স্থানে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দুইটি আধার নামাইল। বাহকগণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জনমাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, কেবল সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে? বাহকেরা একটি ইঙ্গিত করিল, একটি আধার হইতে শিবজী, অপরটি হইতে শম্ভুজী বাহির হইলেন; উভয়ে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

বিলম্ব না করিয়া উভয়ে ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচীরাভিমুখে যাইলেন। সন্ধ্যার সময় লোক অতি অল্প, তথাপি, রাজপথে এক একজন লোক যখন নিকট দিয়া যায় শম্ভুজীর হৃদয় ভয়ে, উদ্বেগে, নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজীর চিরজীবন একরূপ বিপদপূর্ণ, তাঁহার পক্ষে কিছুই নূতন নহে; তথাপি তাঁহার ও হৃদয় উদ্বেগশূন্য ছিল না।

কম্পিত হৃদয়ে প্রাচীর পার হইলেন, একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, 'কে যায়?'

শিবজী উত্তর করিলেন, 'গোস্বামী। হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণাম কেবলং।'

'কোথা যাইতেছ?'

'মথুরা তীর্থস্থানে। কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।,

প্রাচীর পার হইলেন।

প্রাচীরের বাহিরেও অনেক হর্ম্ম্যাদি ছিল, অনেক ধনাঢ্য ও উচ্চপদাভিষিক্ত লোক বাস করিতেন। সে সকল দুই পার্শ্বে রাখিয়া শিবজী ও সম্ভুজী ত্বরিতে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। 'হরের্ণাম হরের্ণাম—ইত্যাদি!,

দূরে একটি বৃক্ষতলে একটি অশ্ব বদ্ধ রহিয়াছে দেখিলেন। অতি সতর্কভাবে সেইদিকে যাইলেন, দেখিলেন, তন্নজী-বর্ণিত অশ্বই বটে।

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই, অশ্বরক্ষক! তোমার নাম কি?,

'জানকীনাথ,

'কোথায় যাইবে?,

'মথুরা,

শিবজী বলিলেন, 'হাঁ এই অশ্ব বটে।, শিবজী অশ্বে আরোহণ করিলেন, পশ্চাতে শম্ভুজীকে উঠাইয়া লইলেন, মথুরার দিকে চলিলেন। অশ্বরক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলিতে লাগিল।

অন্ধকার নিশীথে, নিঃশব্দ পল্লী বা প্রান্ত দিয়া নির্ব্বাক হইয়া শিবজী পলায়ন করিতেছেন। আকাশে নক্ষত্রগুলি মিট্‌মিট্ করিতেছে, অল্প অল্প মেঘ এক একবার গগন আচ্ছাদিত করিতেছে, বর্ষাকালে পূর্ণ কলেবরা যমুনা নদী প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে, পথ ঘাট কর্দ্দম বা জলপূর্ণ। শিবজী উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে পলায়ন করিতেছেন।

দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল; শিবজী লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে স্থানে বৃক্ষ বা কুটির নাই, অগত্যা পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন।

তিন জন অশ্বারোহী বেগে দিল্লী

অভিমুখে আসিতেছেন; তাহাদিগের কোষে অসি, হস্তে বর্শা। দূর হইতে শিবজীর অশ্ব দেখিতে পাইয়া সেই দিকে অশ্ব প্রধাবিত করিলেন। শিবজীর হৃদয় উদ্বেগে দুরু দুরু করিতে লাগিল।

নিকটে আসিয়া একজন অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিলেন—' কে যায় ?'

শিব। ' গোস্বামী।'

অশ্বারোহী। ' কোথাহইতে আসিতেছ ?'

শিব। ' দিল্লীনগর হইতে।'

অশ্বারোহী। ' আমরা দিল্লীনগর যাইব; কিন্তু পথ হারাইয়াছি, আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া পথ দেখাইয়া দাও, পরে মথুরায় যাইও।'

শিবজীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; দিল্লী যাইতে অস্বীকার করিলে সৈনিকেরা বল প্রকাশ করিবে, বিবাদের সময় সহসা শিবজীকে চিনিলেও চিনিতে পারে; কেননা দিল্লীতে এরূপ সৈনিক ছিল না যে শিবজীকে দেখে নাই। আর দিল্লীতে পুনর্গমন করিলে সহস্র বিপদ! ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন অশ্বারোহী সম্মুখে আসিয়া শিবজীর সহিত কথা কহিয়াছিল, অপর দুইজন অস্পষ্টস্বরে পরামর্শ করিতেছিল। কি পরামর্শ ?

একজন বলিল, ' এ স্বর আমি জানি,—আমি দক্ষিণদেশে শায়েস্তাখাঁর অধীনে অনেক দিন যুদ্ধ করিয়াছি, আমি নিশ্চয় বলিতেছি পথিক গোস্বামী নহে।

অপর জন বলিল, ' তবে কে ?'

' আমি সন্দেহ করি এ স্বয়ং শিবজী, দুইজন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর ঠিক একরূপ হয় না।'

' দূর মূর্খ! শিবজী দিল্লীতে বন্দী হইয়াছে।'

' সেইরূপ আমরাও মনে করিয়াছিলাম যে শিবজী সিংহগড় দুর্গে আছে, সহসা একদিন রজনীযোগে পুনা ধ্বংস করিয়া গিয়াছিল।,

' ভাল, মস্তকের বস্ত্র তুলিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে,

সহসা একজন অশ্বারোহী আসিয়া শিবজীর উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিল, শিবজী চিনিলেন শায়েস্তাখাঁর অধীনস্থ একজন প্রধান সেনানী!

যদি হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিত শিবজী একাকী তিনজনকে হত করিবার চেষ্টা করিতেন। রিক্তহস্তেও একজনকে মুষ্টি আঘাতে অচেতন করিলেন, এমন সময় আর দুইজন অসি হস্তে নিকটে আসিয়া শিবজীকে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিল।

শিবজী নির্ব্বাক! ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতেছিলেন। আবার বন্দী হইবেন, বিদেশে বন্ধুশূন্য হইয়া আরংজীব কর্ত্তৃক হত হইবেন, এই চিন্তা করিতেছিলেন। শম্ভুজীর দিকে নয়ন পড়িল, চক্ষু

জলে আপ্লুত হইল। বলিলেন, ‘ দেব দেব মহাদেব, জীবনে একমনে আপনার পূজা করিয়াছি, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার যাহা উদ্দেশ্য থাকে তাহাই করুন।, আশা, ভরসা, উদ্যম এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলুপ্ত হইল।

সহসা একটি শব্দ হইল, শিবজী দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী তীরবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। আর একটি তীর, আর একটি তীর; শিবজীর তিন জন শত্রুই ভূতলশায়ী! তিন জনই গতজীবন!

যে দিক হইতে তীর আসিল, শিবজী সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন অশ্বরক্ষক জানকীনাথ!

অশ্বরক্ষক নিকটে আসিল;—শিবজী বিস্মিত হইয়া দেখিলেন অশ্বরক্ষকবেশে সীতাপতি গোস্বামী!

সাশ্রুনয়নে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন ‘ শিবজীর প্রকৃত বন্ধু! আপনি না হইলে এদাসকে কে রক্ষা করে? সুহৃদবর সীতাপতি! অশ্বরক্ষক বলিয়া যদি ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া থাকি ক্ষমা করুন, অদ্য শিবজী আপনার কৃপায় জীবন দান পাইল।,

অশ্বরক্ষকবেশধারী ধীরে ধীরে শিবজীর পদতলে পতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন।

‘ প্রভু ছদ্মবেশ ক্ষমা করুন; আমি অশ্বরক্ষকও নহি, গোস্বামীও নহি,—আপনার পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথজী হাবেলদার!, প্রভুর নিকট শত অপরাধ করিয়াছি কিন্তু প্রভু ক্ষমা না করিলে আর কে ক্ষমা করিবে?,

শিবজী আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—বালিকার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া রঘুনাথকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন, কহিলেন ‘ রঘুনাথ! রঘুনাথ! তোমার নিকট যে পাপ করিয়াছি তাহার ক্ষমা নাই, তোমার ঋণের পরিশোধ নাই! শিবজীর জীবনের বন্ধু! আর যেন শিবজী এজীবনে তোমাকে না হারায়!,

অদ্য নিশীথে রঘুনাথের ব্রত উদ্যাপন হইল, শিবজীর ক্ষোভ দূর হইল,—পরস্পরের হৃদয়ে পরস্পর শান্তি লাভ করিলেন।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদে।

" কি দারুণ বুকের ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ
পিরিতের কথা॥
সই! কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া কাঁদিয়া
জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া যে ধনী
পিরিতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া
মরে॥

হায় বিনোদিনী, এ দুঃখে দুঃখিনী, প্রেমে
ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, সে গতি হইয়া, পরাণ
সংশয় দেখি॥"

চণ্ডীদাস।

নিশীথে সীতাপতি গোস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া রাজপুতবালা গৃহে আসিলেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া সরযু দেখিলেন হৃদয় শূন্য! কে না জানে প্রথম কষ্ট যদিও অতিশয় ভীষণ ও দুর্ব্বহনীয়, কিন্তু তাহার পর সেই কথা স্মরণ করিলে হৃদয়ে যে দুঃখ উছলিতে থাকে, নীরবে নয়ন হইতে যে অশ্রু বহির্গত হইতে থাকে সেই শোক অধিক মর্ম্মভেদী। জগতের মধ্যে প্রিয়জনের প্রথম বিচ্ছেদ ঘটিলে আমরা বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠি, জ্ঞানশূন্যের ন্যায় ভূমিতে গড়াগড়ি দি,—সে প্রথম শোক-উচ্ছ্বাস সেই আর্ত্তনাদেই নিবারিত হয়। কিন্তু দিবস যাইলে, মাস গত হইলে, বৎসর অতিবাহিত হইলে, সেই প্রিয়জনের কথা যখন স্মরণ হয়, নীরবে রজনীর অন্ধকারে যখন হৃদয় আপনি শোকপারাবারে ভাসিতে থাকে, নয়নের দ্বার যখন উদ্‌ঘাটিত হয়, নীরবে অশ্রুবিন্দু পড়িতে থাকে,—উঃ মনুষ্যজীবনে সেই যাতনাই অসহ্য! প্রিয়জনের মুখ মনে পড়ে, তাহার বাক্যগুলি, কার্য্যপরম্পরা, স্নেহ, ভালবাসা, একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতে থাকে, নিস্তব্ধ রজনীতে সেই পূর্ব্ব কথা একে একে উদয় হইতে থাকে, তখনই হৃদয় শূন্য হয়, আমরা বালিকার ন্যায় নিরাশ্রয় হইয়া নীরবে রোদন করিতে থাকি!

দিন গেল, সপ্তাহ গত হইল, মাস অতিবাহিত হইল, সরযুর চিন্তা দিনে দিনে মর্ম্মভেদী হইতে লাগিল। অন্ধকার নিশীথে কখন কখন বালিকা একাকী গবাক্ষপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কত চিন্তা করিত কে বলিবে? কত কথা একে একে স্মরণ হইত, কতবার নীরবে নয়ন হইতে ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু প্রবাহিত হইত। নীরবে সেই গবাক্ষ দিয়া পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া হৃদয়বল্লভ আর আসিলেন না!

কখন বা সেই পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণদেশ মনে জাগরিত হইত, সেই তোরণ-দুর্গ মনে উদয় হইত। সরযু একাকী ছাদে আসীন রহিয়াছেন, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গগন ও জগৎ আবৃত করিতেছে, সন্ধ্যার বায়ু বহিয়া বহিয়া সরযুর কেশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে;—এমত সময় সেই দীর্ঘাকার উদার মূর্ত্তি যুবক যেন আকাশপটে দেবচিত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইল। সরযুর হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, বালিকার হৃদয় নব নব ভাবে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অদ্য তিন বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু সে মূর্ত্তি সরযুর হৃদয় হইতে অপনীত হয় নাই।

তাহার পরদিন সেই পুরুষসিংহ যে

স্নেহগদ্‌গদ স্বরে সরযুর নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, সভয়ে ধীরে ধীরে সরযূর কণ্ঠে যে কণ্ঠমালা দোলাইয়া দিয়াছিলেন, জীবন থাকিতে সরযু কি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন? পুনরায় কি সে বীর সরযুর কণ্ঠে কণ্ঠমালা পরাইয়া দিবেন, পুনরায় কি সরযু সেই হৃদয়বল্লভকে দেখিতে পাইবেন?—নীরবে সরযু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, নীরবে গণ্ডস্থল দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল।

কখন বা অপরাহ্লে একাকী সরযু আম্রকাননে ভ্রমণ করিতেন, ভ্রমণ করিতে করিতে কত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত। বৃক্ষের উপর হইতে কপোত কপোতী মৃদুস্বরে প্রেমগীত গাইতেছে, সেই গীত শুনিয়া একদিন রঘুনাথ কাণে কাণে সরযুকে কি কথা বলিয়াছিলেন স্মরণ হইল; সরযুর মুখে বিষাদের হাসি আসিল। আর এক দিন ঐ বিশাল আম্র বৃক্ষতলে বসিয়া রঘুনাথ ও সরযূ একত্রে একটি সুমিস্ট আম্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন, খাইতেছিলেন আর পরস্পরে পরস্পরের দিকে সস্নেহে চাহিতে ছিলেন, সে কথা হৃদয়ে জাগরিত হইল। ঐ কণ্টক বনের ভিতর দিয়া আর এক দিন রঘুনাথ স্বয়ং ক্ষতবিক্ষত হইয়াও একটি সুন্দর বন্যপুষ্প চয়ন করিয়া সরযূর কেশে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, পরে কি মিস্টস্বরে বলিয়াছিলেন, 'সরযু! কি অপরূপ বনদেবীর রূপ ধারণ করিয়াছ!' আহা! সে সুমধুর স্বর কি সরযু আর শুনিবেন, পুনরায় কি রঘুনাথ দুঃখিনীর জন্য পুষ্প চয়ন করিবেন, হতভাগিনীর ভাগ্যে কি এরূপ সুখ আছে? সরযূ শোকে বিবশা হইলেন, নয়ন হইতে দুই চারি বিন্দু জল টস্ টস্ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল, নীরবে আপনার অঞ্চল দিয়া নয়ন মুছিলেন। বৃথা চেস্টা, আবার চিন্তা আসিল, আবার নয়ন পূর্ণ হইল।

কখন কখন রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সহসা হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইত, ভাদ্র মাসের নদীর ন্যায় শোকপারাবার উথলিয়া উঠিত। তখন কেহ দেখিবার নাই, সরযু প্রাণভরে কাঁদিতেন, শ্রাবণ মাসের ধারার ন্যায় নয়ন হইতে অজস্র বারিধারা বহিতে থাকিত। রঘুনাথের মধুময় মুখ, মধুময় কথা মনে পড়িত, একটি কথার পর অন্য কথা মনে উদয় হইত, শোকতরঙ্গের পর শোকতরঙ্গ হৃদয়ের উপর বহিয়া যাইত,—উপাধানে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বালিকা বিবশা ব্যাকুলহৃদয়া হইয়া দরবিগলিত ধারায় উপাধান সিক্ত করিত। রজনী প্রভাত হইত, প্রাতঃকালের রক্তিমচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিত; বালিকা তখনও চিন্তাবিদগ্ধা, অথবা শোকে বিবশা হইয়া লুণ্ঠিত রহিয়াছেন!

প্রাতঃকালে পুষ্প চয়ন করিতে উদ্যানে যাইতেন, প্রফুল্ল পুষ্পগুলি একে একে চয়ন করিতেন, হৃদয়ে স্থাপন করিতেন, আর কি চিন্তা করিতেন কে বলিবে? চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় পুষ্পের

দিকে চাহিতেন, পুষ্পদলগত প্রাতঃশিশিরবিন্দুর সহিত দুই একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু মিশাইয়া যাইত। সায়ংকালে বীণা হস্তে করিয়া কখন কখন গীত গাইতেন;—আহা সে যে শোকের গীত, শ্রোতৃদিগের নয়নেও জল আসিত। বাল্যকালে রাজপুত চরণদিগের নিকট যত শোকের গীত শিখিয়াছিলেন তাহাই গাইতেন, ভিখারিণীর গীত গাইতেন, দুঃখিনীর গীত গাইতেন, অনাথিনীর গীত গাইতেন, সায়ংকালের নিস্তব্ধতায় সেই গীত ছাদ হইতে ধীরে ধীরে নৈশ আকাশে উত্থিত হইত, ধীরে ধীরে বায়ুমার্গে বিস্তৃত হইত, গীতের সহিত গায়কীর নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু জল নির্গত হইত, অথবা শোকপারাবার সহসা উথলিয়া উঠিত, গায়কীর কণ্ঠরুদ্ধ হইত, গীত সহসা লীন হইয়া যাইত।

দিবারাত্রি শোকচিন্তা শেষ হইত না, দিবারাত্রি সেই পথেরদিকে সরযুবালা চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া হৃদয়বল্লভ আর আসিলেন না।

বসন্তকালে রঘুনাথ বিদায় হইয়াছেন, সে বসন্তকাল অতিবাহিত হইল, সুকণ্ঠ পক্ষীগুলি একে একে কুলায় হইতে উড়িয়া গেল। বৃক্ষসমূহে সুন্দর পুষ্পগুলি একে একে অদৃশ্য হইল, গ্রীষ্মকাল নানারূপ সুস্বাদু ফল আনিয়া মানব হৃদয় আনন্দিত করিল, জগৎকে সুশোভিত করিল। সরযুবালা সেই পথ চাহিয়া রহিয়াছেন,—সে পথে রঘুনাথ দর্শন দিলেন না।

আকাশে মেঘাড়ম্বর হইল, ক্রমে বর্ষার ধারা আরম্ভ হইল, নদ নদী জলাশয় পূর্ণকলেবর হইল, ক্ষেত্রে সুন্দর শস্য শোভা পাইতে লাগিল, জলে মাঠ, বিল, প্রান্তর প্লাবিত হইল। সেই প্রান্তরের উপর সরযু একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন, হৃদয়েশ কি এখনও কার্য্যসিদ্ধি লাভ করেন নাই, হৃদয়েশের কি এখনও সরযুকে মনে আছে? হৃদয়েশ কি কুশলে আছেন? জলে নয়ন প্লাবিত হইল,—আর দেখিতে পাইলেন না।

ক্রমে ক্রমে বর্ষার জল অপসৃত হইল, আকাশ পরিষ্কার হইল, নিশীথে শরচ্চন্দ্র উদয় হইয়া গগণে ও জগতে জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে লাগিল। সরযুর হৃদয়াকাশ কবে পরিষ্কার হইবে, হৃদয়নাথ কবে নিশানাথের ন্যায় উদয় হইয়া সরযুর মনে আনন্দজ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন? সরযু পথ চাহিয়া রহিলেন, হৃদয়নাথ আসিলেন না!

এরূপ ভীষণ চিন্তায় ক্রমে সরযুর শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন কালিমাবেষ্টিত হইল! সরলস্বভাব জনার্দ্দন এখনও সরযুর হৃদয়ের কথা কিছু জানেন না, কিন্তু সরযুর শরীরের অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন, কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

নারীর নিকট নারীর মনের কথা গুপ্ত থাকে না, সরযূ অনেক যত্নে শোক সঙ্গোপন করিলেও তাঁহার সখী ও দাসীগণ তাঁহার গুপ্তকথা কিছু কিছু অনুমান করিয়াছিল, ক্রমে সেই কথা বৃদ্ধ জনার্দ্দনের কর্ণে উঠিল।

যদিও তিনি সরল ও নির্ম্মলচরিত্র, তথাপি জনার্দ্দন রাজপুত, সকল রাজপুত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় অতিশয় বংশমর্য্যাদাগর্ব্বী। যখন শুনিলেন, আপনার একমাত্র দুহিতা একজন সামান্য মহারাষ্ট্রী সৈনিককে বিবাহ করিতে চাহে, বিদ্রোহীর সহিত বিবাহ করিয়া কুলে কলঙ্ক আনিতে চাহে; তখন জনার্দ্দনের নয়ন আরক্ত হইল, বৃদ্ধের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া বালিকাকে 'পাপীয়সী' 'পীশাচী' বলিয়া গালিদিলেন, সরযু পিতার তিরস্কার নীরবে সহ্য করিলেন, জগতে এরূপ কি যাতনা আছে হৃদয়বল্লভের জন্য নারী যে যাতনা সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ?

বৃদ্ধ, বাতুলের ন্যায় একমাত্র দুহিতাকে শোকার্ত্ত নীরব দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলেন, সরযুকে ক্রোড়ে লইয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন—

'দেখ দেখি মা! আমার মস্তকে একটি কেশও কৃষ্ণ নাই, এই বৃদ্ধ বয়সে কি তুমি আমাকে যাতনা দিবে?' উঃ! সে সস্নেহ ভৎর্সনা সরযু সহ্য করিতে পারিলেন না, পিতার কণ্ঠ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, পিতাও রোদন করিলেন।

বৃদ্ধ সরযুর সখীদিগের দ্বারা সরযুকে অনেক বুঝাইলেন, অন্য যুবকের সহিত সরযুর বিবাহ স্থির করিতে চাহিলেন, নিজের কুল-গৌরবের কথা অনেক বলিলেন।

সরযুর একই উত্তর 'পিতাকে বলিও আমার বিবাহে রুচি নাই, চিরকাল অবিবাহিত থাকিয়া তাঁহারই পদসেবা করিব।'

বৃদ্ধ ক্ষণেক ক্ষণেক শোকার্ত্ত হইতেন, ক্ষণে ক্ষণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন। একদিন ক্রোধপরবশ হইয়া সরযুকে বলিলেন—

'সরযু! আমি রাজপুত, রাজপুতেরা কন্যার অবমাননা দেখিবার পুর্ব্বে কন্যার হৃদয়ে ছুরিকা স্থাপন করে, চরণদিগের গীতে এরূপ শুনিয়া থাকিবে।'

ধীরে ধীরে সরযু উত্তর করিলেন—

'পিতা, সেইরূপ জনকই যথার্থ দয়ালু! পিতা আপনিও যদি সেইরূপ আচরণে আমার হৃদয়ের অসহ্য বেদনা শান্ত করেন, আমি জন্মে জন্মে আপনার দয়ার কীর্ত্তন করিব।'—বৃদ্ধ অশ্রুনয়নে গৃহত্যাগ করিলেন।

ক্রমে চারিদিকে এ কথা বিস্তার হইতে লাগিল, মন্দ লোকে আরও দুই একটি কথা বাড়াইল,—কেহ কেহ বলিতে লাগিল, জনার্দ্দনের কন্যা ব্যাভিচারিণী; তাহার বিবাহ হইতেছে না।

যেদিন জনার্দ্দন এই কথা শুনিলেন, তাঁহার কলেবর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল ; গৃহে আসিয়া কন্যাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

'পাপীয়সি, তোর জন্য কি আমি এই বৃদ্ধ বয়সে অবমানিত হইব ? তুই আমার নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিবি ? আমার বাটি হইতে দূর হ।'

ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণনয়নে সরযু উত্তর করিলেন—

'পিতা! আমি অবোধ, যদি আপনার নিকট কখন কোনও দোষ করিয়া থাকি মার্জ্জনা করুন, কিন্তু জগদীশ্বর আমার সহায় হউন, আমাহইতে আপনার অবমাননা হইবে না।'

এ কথার অর্থ তখন জনার্দ্দন বুঝিলেন না, এ কথার অর্থ তাহার পর দিন বৃদ্ধ বুঝিতে পারিলেন।

সেই দিন অন্ধকার নিশীথে সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা একাকিনী পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন, একাকিনী সংসারের বিস্তীর্ণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

কুটীরে।

দুঃখে সুখে খুল্লনা শরৎকাল ভাবে।
আশ্বিনে আসিবেন প্রভু দেবীর উৎসবে॥
কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের প্রকাশ।
গৃহে নাহি প্রাণনাথ করি বনবাস॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

শরৎকালের প্রাতের কমনীয় আলোকে বেগবতী নীরা নদী বহিয়া যাইতেছে, সূর্য্যকিরণে জলের হিল্লোল কম্প ... সা করিতে করিতে যাইতেছে। সেই সুন্দর নদীর উভয় পার্শ্বে সুন্দর শস্যক্ষেত্র বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, কৃষকের পুত্রার ... সন্তুষ্ট হইয়া মেদিনী সেই হরিৎ পরিচ্ছদে হাস্য করিতেছে। উত্তর ও পূর্ব্বদিকে সেইরূপ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র অথবা সুদূরে দুই একটি গ্রাম দৃষ্ট হইতেছে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পর্ব্বতরাশির উপর পর্ব্বতরাশি বালসূর্য্যকিরণে অপরূপ শোভা ধারণ করিতেছে।

সেই নদীকূলে শ্যামলক্ষেত্রবেষ্টিত একটি সুন্দর গ্রাম সন্নিবেশিত ছিল, গ্রামের এক প্রান্তে একটি কৃষকের কুটীরের নিকট একটি বালিকা নদীকূলে খেলা করিতেছে, নিকটে একজন দাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কৃষকপত্নী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে।

গৃহ দেখিলে কৃষককে সম্ভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়। প্রাঙ্গণে দুই একটি গোলাঘর রহিয়াছে, পার্শ্বে চারি পাঁচটি গরু বাঁধা রহিয়াছে, বাটির ভিতর তিন চারিখানি ঘর, বাহিরে একখানি বড় ঘর। দেখিলেই বোধ হয় গৃহস্বামী কৃষক হইলেও গ্রামের মধ্যে একজন 'মাতব্বর' লোক,—ব্যবসা ও মহাজনী কার্য্যও কিছু কিছু করিয়া থাকে।

বালিকা সপ্তমবর্ষীয়া, শ্যামবর্ণ, চঞ্চল,

প্রফুল্ল ও উজ্জ্বলনয়না। একবার নদীকূলে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে একবার মাতা যে ঘরে রন্ধন করিতেছেন, তথায় দৌড়াইয়া যাইতেছে, এক একবার বা দাসীর নিকট আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া কোন কথা কহিতেছে অথবা প্রফুল্লতার হাস্য হাসিতেছে।

বালিকা বলিল, 'দিদি, আর মা কালুকের মত ঘাটে যাই, কাপড় দিয়া মাছ ধরিব ,'

দাসী। 'না দিদি, মা বারণ করিয়াছেন, ঘাটে যেও না।'

বালিকা। 'মা টের পাবে না।'

দাসী। 'না ছি, মা যা বারণ করেন তা করিতে নাই, মার কথা কি অন্যথা করে।'

বালিকা। 'আচ্ছা দিদি, মা কি তোরও মা হয়?'

দাসী হাসিয়া বলিল—'হয় বৈ কি?'

বালিকা। 'না সত্য করিয়া বল।'

দাসী। 'সত্যই মা হয়।'

বালিকা। 'না দিদি, তুই যে বামুণের মেয়ে, আমরা তো বামুণ নয়।'

দাসী বালিকাকে চুম্বন করিয়া বলিল 'এতদূর যদি জান তবে জিজ্ঞাসা কর কেন?'

বালিকা। 'জিজ্ঞাসা করি, তবে তুই মাকে মা বলিস্ কেন?'

দাসী। 'যিনি আমাকে খাইতে পরিতে দিতেছেন, যিনি আমাকে থাকিবার স্থান দিয়াছেন,—যিনি আমাকে মেয়ের মত লালনপালন করেন তাঁকে মা বলিব না ত কি বলিব? এ জগতে আমার অন্য স্থান নাই, মা আমাকে জগতে স্থান দিয়াছেন।'

বালিকা। 'ছি দিদি, তোর চক্ষে জল কেন, তুই কথায় কথায় কাঁদিস্ কেন দিদি?'

দাসী। 'না দিদি কাঁদ্‌ব কেন।,

বালিকা। 'তোর চক্ষে জল দেখ্‌লে আমার চক্ষে জল আসে কেন দিদি?'

দাসী বালিকাকে পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিল,—'তুমি যে আমাকে ভাল বাস।'

বালিকা। 'আর তুই আমাকে ভাল বাসিস্?'

দাসী। 'বাসি বৈ কি।'

বালিকা। 'বরাবর ভাল বাস্‌বি, কখনও আমাকে ভুল্‌বি নি?'

দাসী। 'না, আর তুমি, দিদি তুমি আমাকে ভাল বাস্‌বে, কখনও ভুলিবে না?

বালিকা। 'না।'

দাসী। 'হাঁ তুমি আমাকে একদিন ভুল্‌বে।'

বালিকা। 'কবে?'

দাসী। 'যবে তোমার বর আস্‌বে।'

বালিকা। 'সে কবে?'

দাসী। 'আর দুই এক বৎসরের মধ্যেই।'

বালিকা। 'না দিদি, তখনও তোকে ভুলিব না, বরের চেয়ে তোকে অধিক ভাল বাস্‌ব। আর তুই দিদি,—তোর যখন বর আস্‌বে তখন আমাকে ভুল্‌বিনি ?'

দাসীর চক্ষে পুনরায় জল আসিল, তাহা মোচন করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,—

'না তখনও ভুল্‌ব না।'

বালিকা। 'বরের চেয়ে আমাকে অধিক ভাল বাস্‌বি ?'

দাসী হাস্য করিয়া বলিল 'সমান সমান।'

বালিকা। 'তোর বর কবে আস্‌বে দিদি ?'

দাসী। 'ভগবান্ জানেন! ছাড়, রান্নার বেলা হইয়াছে, আমি যাই।' দাসী অন্ন প্রস্তুত করিতে গেল।

পাঠক বলা অনাবশ্যক যে, অনাথিনী সরযুবালা জগতে আর স্থান না পাইয়া একজন কৃষকের বাটীতে দাস্যবৃত্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। কৃষকের কিছু সম্পত্তি ছিল, মহাজনি ছিল, নাম গোকর্ণনাথ। গোকর্ণের অন্তঃকরণ সরল ও স্নেহযুক্ত, নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণকন্যাকে নিজের বাটীতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। গোকর্ণের গৃহিণীও স্বামীর উপযুক্ত; নিরাশ্রয় ভদ্র ব্রাহ্মণকন্যাকে দেখিয়া অবধি নিজের কন্যার ন্যায় লালন পালন করিতেন। সরযুও কৃতজ্ঞ হইয়া গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রীর যথোচিত সমাদর করিতেন, নিজে দুই-বেলা অন্ন প্রস্তুত করিতেন, বালিকার তত্ত্বাবধারণ করিতেন, সুতরাং কৃষক ও কৃষকপত্নীর কার্য্যের অনেক লাঘব হইল, তাঁহারাও দিন দিন সরযুর উপর অধিক প্রসন্ন হইতে লাগিলেন।

রঘুনাথের অবর্ত্তমানে যদি সরযুর কোথাও সুখের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উদারস্বভাব গোকর্ণনাথ ও তাঁহার সরল গৃহিণীর বাটিতে থাকিয়া সরযু পরম সুখ লাভ করিতে পারিতেন। গোকর্ণের বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইবে কিন্তু চিরকাল নিয়মিত পরিশ্রম করিতেন বলিয়া এখনও শরীর সুবদ্ধ ও বলিষ্ঠ। গোকর্ণের একটি পুত্র শিবজীর সৈনিক, বহুদিন অবধি বাটি ত্যাগ করিয়াছে; শেষে যে একটি কন্যা হইয়াছিল, পিতামাতা উভয়েই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। প্রাতঃকালে গোকর্ণ কৃষিকার্য্যে বা অন্য কার্য্যে বাহির হইয়া যাইতেন, সরযু গৃহের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গৃহিণী অনেক সময় বলিতেন, 'বাছা, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, এরূপ পরিশ্রম করিলে তোমার শরীর থাকিবে কেন? তোমার করিতে হইবে না, আমিই করিব।' সরযু সস্নেহে উত্তর করিতেন, 'মা, তুমি আমাকে যেরূপ যত্ন কর, তোমার কাজ করিতে পরিশ্রম হয় না, আমি জন্ম জন্ম তোমার সেবা করিব, তুমি আমাকে এইরূপ স্নেহ করিও।" স্নেহবাক্যে সরলস্বভাব বৃদ্ধ গৃহিণীর নয়নে জল আসিত, চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতেন,

'সরযু ! বাছা তোর মত মেয়ে কখনও দেখি নাই, তোমার মত আমাদের জাতির একটি মেয়ে পাই, তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দি।' পুত্র অনেক দিন গৃহ ত্যাগ করিয়াছে, সে কথা স্মরণ করিয়া প্রাচীনা ক্ষণেক রোদন করিতেন।

দ্বিপ্রহরের সময় যখন গোকর্ণ ও তাঁহার গৃহিনী গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিশ্রাম করিতেন, সরযু বালিকাকে ঘুম পাড়াইতেন, পরে ধীরে ধীরে স্বয়ং গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী সুন্দর বিশাল একটি আম্রকাননের তলে বসিয়া কখন বা সূতা কাটিতেন, অনেক ক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিতেন। বিশাল আম্রকাননের ছায়া অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিত, দ্বিপ্রহরের মৃদু বায়ু পত্র হইতে সুস্নিগ্ধ মর্ম্মর শব্দ আকর্ষণ করিত, দুই একটি কপোত বা ঘুঘু সেই ছায়ার ডালে উপবেশন করিয়া মৃদুস্বরে গীত গাইতে থাকিত, সেই সুস্নিগ্ধ শান্ত পাদপচ্ছায়ায় সরযু একাকিনী বসিয়া অনন্ত চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। ছয় মাস অতীত হইয়াছে হৃদয়বল্লভ স্বকার্য্যসাধনে গিয়াছেন, রঘুনাথ কবে আসিবেন, অনাথিনী কত দিন পথ চাহিয়া থাকিবেন? এত দিন কি সরযুকে স্মরণ আছে? যুদ্ধকালে, বিজয়ের কালে কি একবার স্মরণ করেন যে, দূর মহারাষ্ট্র দেশে একজন অভাগিনী তাঁহার পথ চাহিয়া আছেন, তাঁহার আশায় জীবনা ধারণ করিয়া আছেন? দিল্লীর অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত সুখ! সে সুখে রত হইয়া কি হৃদয়েশ্বর বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন?

তৎক্ষণাৎ বিদায়ের কথা স্মরণ হইল, বিদায়ের সময় সরযুর হস্ত ধরিয়া রঘুনাথ যে সস্নেহের কথা গুলি বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল। না, রঘুনাথ দাসীকে ভুলিবেন না, তাঁহার প্রণয় অবিচলিত! কার্য্যসিদ্ধ হইলেই আসিবেন।

ঐ বৃক্ষের পক্ষীর মত সরযু যদি একবার পক্ষ পায়, তাহা হইলে এই ক্ষণেই সেই দূর দিল্লীতে উড়িয়া যায়, যথায় হৃদয়েশ বসিয়া আছেন তথায় যায়, তাঁহার হৃদয়ে মস্তকখানি রাখিয়া সরযু একবার প্রাণভরে ক্রন্দন করে।

এই রূপ নানা চিন্তায় দিবস অতিবাহিত হইত, বৈকালে পুনরায় গৃহকার্য্য করিতেন, সায়ংকালে যখন গোকর্ণ পরিবারের মধ্যে বসিয়া পুত্রের কথা, যুদ্ধের কথা কহিতেন, অবগুণ্ঠনবতী সরযু বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া মনোনিবেশ করিয়া সেই কথা শুনিতেন।

এইরূপে এক মাস, দুই মাস অতিবাহিত হইল। এক দিন সায়ংকালে গোকর্ণনাথ গৃহিণীর নিকট বসিয়াছেন, এক প্রান্তে সরযু বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণ বলিলেন,—

'গৃহিনী, শান্ত হও, আজ সুসংবাদ আছে।'

গৃহিনী। 'আহা! তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, বাছা ভীমজীর কোন সংবাদ পাইয়াছ?'

গোক। 'শীঘ্রই পাইব, পুত্র শিবজীর সহিত দিল্লী গিয়াছিল,—অদ্য শুনিলাম দুষ্ট বাদশাহের হস্ত হইতে পলাইয়াছেন, দেশে আসিতেছেন, আমাদের ভীমজী অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আসিবেন।'

গৃহিনী। 'আহা ভগবান্ তাহাই করুন, প্রায় একবৎসর হইল বাছাকে না দেখিয়া যে মন কি অবস্থায় আছে তাহা ভগবানই জানেন।'

গোক। 'ভীমজী অবশ্যই আসিবে, সে রঘুনাথজী হাবেলদারের অধীনে কার্য্য করিত, রঘুনাথজীর সম্বাদ পাইয়াছি।'

সরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, উদ্বেগে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তিনি গোকর্ণের কথা শুনিতে লাগিলেন। গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন,—

'যে দিন রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিয়া শিবজী দূর করিয়া দেন সে দিন পুত্র আমাদের কি বলিয়াছিল মনে আছে?'

গৃহিনী। 'আমি মেয়ে মানুষ আমার কি অত মনে থাকে?'

গোক। 'পুত্র বলিয়াছিল 'পিতা, রঘুনাথজী যদি বিদ্রোহী হয়েন তাহা হইলে আমি যেন কখনও খড়্গ ধারণ করিতে না পারি। আমি হাবেলদারকে চিনি, তাঁহার ন্যায় বীর শিবজীর সৈন্যে আর নাই, কি ভ্রমে পতিত হইয়া রাজা তাঁহার অবমাননা করিলেন,—পশ্চাৎ জানিবেন, তখন রঘুনাথের গুণ জানিতে পারিবেন' পুত্রের কথা এত দিনে সত্য হইল।'

সরযুর হৃদয় উল্লাসে উদ্বেগে দুরু দুরু করিতে লাগিল, তিনি ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, তাঁহার মস্তক হইতে স্বেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল। এ উদ্বেগ অসহ্য।

গোকর্ণনাথ বলিতে লাগিলেন—

'রঘুনাথজী ছদ্মবেশে রাজার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী গিয়াছিলেন, আপন কৌশলে রাজাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আপন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন; শুনিয়াছি শিবজী সাশ্রুনয়নে আপন দোষের ক্ষমা চাহিয়াছেন, রঘুনাথকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, হাবেলদারের পদ হইতে একেবারে 'পাঁচ হাজারী' করিয়া দিয়াছেন। সহরে অন্য কথা নাই, হাটে বাজারে অন্য কথা নাই, গ্রামে অন্য কথা নাই, কেবল রঘুনাথের বীরত্ব কথা শুনিয়া সকলে জয় জয় নাদে ধন্যবাদ দিতেছে।'

আনন্দে, উল্লাসে সরযুর হৃদয় একেবারে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল,—রমণী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, চীৎকার শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন!

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন দর্শন।

" বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ
হইও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল
প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন লইয়া নিশ্চয় হ-
ইলাম দাসী ॥
ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর
কেহ মোর কাছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব
কাহার কাছে ॥
একুলে ওকুলে গোকুলে দুকুলে,
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটি
কমল পায়?"

চণ্ডীদাস।

অনেক শুশ্রূষায় সরযু চেতনা প্রাপ্ত হইলেন, হৃদয়ে সহসা বেদনা পাইয়াছিলেন বলিয়া গোকর্ণও তাঁহার স্ত্রীকে ভুলাইলেন কিন্তু সেই অবধি উদ্বেগে সরযুর আহার নিদ্রা নিয়মানুসারে হইত না, দিন গণিতেন, প্রহর গণিতেন, দণ্ড গণিতেন, সময়ে সময়ে পদ শব্দে চকিত হইতেন। চিন্তায় ও অতিশয় উদ্বেগে শরীরে রোগের সঞ্চার হইতে লাগিল।

এক দিন, দুই দিন, দশ দিন, একমাস অতিবাহিত হইল, রঘুনাথ আসিলেন না। তখন সরযু আর সহ্য করিতে পারিলেন না; চিন্তায় শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে শরীর জ্বালা করিত, মধ্যে মধ্যে মুর্চ্ছা যাইতেন।

রঘুনাথ জীবিত আছেন সরযু তাহা জানিলেন, রঘুনাথ তবে আসেন না কেন? সরযুকে কি বিস্মৃত হইয়াছেন! বজ্রাঘাতের ন্যায় সরযুর হৃদয়ে এই ভীষণ চিন্তার আঘাত হইল।

দিন দিন এই নূতন চিন্তা প্রবলতর হইতে লাগিল, অবশেষে সরযু স্থির বুঝিলেন, বিজয়ী, গৌরবান্বিত রঘুনাথ অভাগিনী দুঃখিনীকে আর চাহেন না! উঃ শেলসম এ চিন্তা প্রণয়িনীর হৃদয়কে ব্যথিত করে! সরযুর পক্ষে জগৎ অদ্য শূন্য! জীবন অদ্য অন্ধকারময়!

উন্মাদিনী ভূমিতে লুটাইয়া বলিতেন —' হৃদয়েশ! কেন বাল্যকালে সুমিষ্ট কথায় বালিকার মন ভুলাইয়াছিলে? কেন বিদায়কালে সুমধুর আশাবাক্যে অবলাকে বুঝাইয়াছিলে? তুমি পুরুষ, অদ্য তোমার পদোন্নতির সহিত নব নব উদ্দেশ্য হইতেছে, নূতন উদ্যম, নূতন আশা উদয় হইতেছে—জগৎ প্রশস্ত, তোমার কার্য্যপরম্পরাও বিস্তীর্ণ ও অবারিত। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? হৃদয়ে হৃদয়ে যে আশা তুমি স্থাপন করিয়াছ, অভাগিনী সেই আশা এখনও চিন্তা করিতেছে। মৃত্যুকাল অবধি সেই আশা সযতনে গোপন করিবে। বালিকার প্রেম

লইয়া যৌবনে একদিন খেলা করিয়া অচিরে সে কথা বিস্মৃত হইলে, বালিকা সে কথা বিস্মৃত হইতে পারে না; পুরুষের খেলা,—রমণীর মৃত্যু।'

কখন বা দ্বিপ্রহর রজনীতে শোকার্ত্তবালা ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন,বলিতেন—

'হা নাথ! জগত যখন আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল, লোকে যখন নিন্দা করিয়াছিল, পিতা যখন তিরস্কার করিয়াছিলেন, তখন আমি সহ্য করিয়াছিলাম। হৃদয়েশ্বর! শেষে কি তুমিও অভাগিনীকে ত্যাগ করিলে? দুঃখিনী তোমার নিকট কি দোষে দোষী? তুমি আমার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়াছ। নাথ! আমি কি কষ্ট স্বীকার করি নাই? পিতা গালি দিয়াছেন, অন্য লোকে মন্দ বলিয়াছে, হৃদয়েশ! তোমার কথা স্মরণ করিয়া সকল সহ্য করিয়াছি। তোমার জন্য সংসার হারাইয়াছিলাম,জগৎ তুচ্ছ করিলাম, পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলাম, দেশে দেশে দাসীবেশে ভিক্ষা করিয়াছি; এখন কি শেষ আশা ছিন্ন হইল! বিধাতা, তুমিও কি অভাগিনীকে ত্যাগ করিলে?'

পুনরায় বলিলেন, 'বিধাতা যদি চিরদুঃখিনী করিতেন, কায়িক পরিশ্রমে যদি জীবন ধারণ করিতে হইত, ভগ্নকুটীরে যদি বাস করিতে হইত, ভিক্ষা করিয়া যদি দিন যাপন করিতে হইত, হৃদয়েশ! সরযু তোমাকে পাইলে এ সমস্ত উল্লাসে সহ্য করিত! পিতা দূর করিয়াছেন, মাতা বাল্যকালে ত্যাগ করিয়াছেন, হৃদয়নাথ, তাহা সহ্য করিয়াছি! লোকে আমাকে কলঙ্কিনী বলিয়াছে, জগতে নিন্দা করিয়াছে, নাথ, তাহাও সহ্য করিয়াছি, তোমার চিন্তা করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছি, জগতে এরূপ কি আছে অভাগিনী তোমার জন্য যাহা সহ্য করিতে না পারে? রোগ, শোক, পরিতাপ, বিধাতা যে কোন ক্লেশ এ দুঃখিনীকে দিতেন, নাথ! তোমাকে পাইলে সমস্ত সহ্য করিতে পারিতাম। কিন্তু সরযুর জীবন এখন শূন্য! নাথ, চিরজীবী হও, তোমার যশ, তোমার মান, তোমার ধনের সীমা থাকিবে না, অনেক দাসী পাইবে, কিন্তু সরযুর ন্যায় কেহ ভাল বাসিতে পারিবে না! আমার আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।' নয়নজলে বালিকা শরীর আর্দ্র করিল। শেষে শ্রান্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'বাল্যকালে মাতাকে হারাইলাম, যৌবনে ধর্ম্মপরায়ণ পিতা হারাইলাম। নাথ! অদ্য তুমিও অভাগিনীকে পায়ে ঠেলিলে। তোমাকে নিন্দা করি না, জীবিত থাকিতে সরযু যেন তোমার নিন্দা না করে। অদ্য তুমি বড় লোক, অনেক ভাগ্যবতী তোমার পার্শ্বে বসিবে, অভাগিনী সরযুর বাল্যকালে মনে একদিন একটি আশার উদয় হইয়াছিল, দুঃখিনী তাহা ত্যাগ করিয়াছে, অচীরে জীবন ত্যাগ করিবে।'

এই রূপ দিবানিশি চিন্তা করিতেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভূমিতে লুটাইতেন, অথবা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিতেন।

গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রী অনেক শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সরযুর হৃদয় শান্ত হইল না; তাঁহার হৃদয়ের কথাও কেহ জানিতে পারিল না। হৃদয়ে অতিশয় বেদনা, প্রায় নয় মাস হইতে এইরূপ পীড়া হইয়াছে, বেদনা আসিলে রোদন না করিয়া থাকিতে পারেন না, কেবল এইমাত্র সরযু বলিতেন। সরল স্বভাব গৃহিনী তাহাই বিশ্বাস করিতেন।

এক দিন সন্ধ্যার সময় সরযু নদীকূলে একাকিনী বসিয়া রহিয়াছেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণের কন্যা আসিয়া ধীরে ধীরে সরযুর পার্শ্বে বসিয়া বলিল,—

'দিদি! তোর বুকে বেদনা হইয়াছে তবে তুই অত ভাবিস্ কেন? ভাব্‌লেই ও বেদনা বৃদ্ধি হয়।'

সরযু। 'না দিদি, ভাব্‌লে বেদনা একটু কমে, সেই জন্য ভাবি।'

বালিকা। 'তুই কি ভাবিস্ দিদি? তোর বরের কথা বুঝি ভাবিস্?'

সরযু। সজল নয়নে ঈষৎ হাসিয়া বলিল 'হাঁ বরের কথাই ভাবি।'

বালি। 'বর কবে আস্‌বে?'

সর। 'বর আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে।' সরযুর মুখে হাসা, চক্ষে জলবিন্দু!

বালি। 'তবে কি হবে?'

সর। 'আর একজন বন্ধু আমাকে বিবাহ করিবে।'

বালি। 'সে কে দিদি?'

সর। 'যম।'

বালি। 'সে কে?'

সর। 'আমার মত যাহাদের বরে ভুলিয়া যায়, যম তাহাকে বিবাহ করে।'

বালি। 'তাহার ত বড় দয়ার শরীর।'

সর। 'অতিশয় দয়ার শরীর; আহা! কবে সে আমাকে নেবে?'

বালি! 'সে তোকে বিবাহ করিলে তোর পীড়া আর থাকিবে না?'

সর। 'না; সমস্ত কষ্ট নিবারণ হবে। হা জগদীশ্বর!'

বালি। 'সে কবে আসিবে?'

সর। 'আজ রাত্রিতে!'

ক্ষণেক এইরূপ কথার পর বালিকা শয়ন করিতে গেল,—সরযু একাকিনী সেই নদীকূলে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

রজনী জগতে গভীর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল, আকাশে তারাগুলি মিট্ মিট্ করিতেছে, সুখে নদী কুল কুল শব্দ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। সরযু নদীর দিকে চাহিলেন, পার্শ্বস্থ কুঞ্জবনের দিকে চাহিলেন। শেষে সেই নৈশ আকাশেরদিকে চাহিলেন। অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—

' জীবিতনাথ ! সরযুর লীলাখেলা শেষ হইল, সরযুকে বিদায় দাও ! বাল্যকালে একদিন ঐ দেবমূর্ত্তি দেখিয়া বালিকার মন ব্যাকুল হইয়াছিল, এক্ষণে সরযুর হৃদয় শান্ত। শান্ত—কিন্তু সেই অবয়ব এখনও হৃদয় ধারণ করিতেছে, যতদিন সরযু জীবিত থাকিবে সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিবে। রঘুনাথ ! অভাগিনীর মৃত্যুর বিলম্ব নাই, কিন্তু মৃত্যুর সময়ও ঐ দেবমূর্ত্তি সরযূ নয়নে দেখিতে থাকিবে, ঐ মধুময় কথাগুলি কর্ণে শুনিতে থাকিবে, তোমার মধুময় নাম উচ্চারণ করিবে, তোমার সুন্দর মুখচ্ছবি হৃদয়ে স্মরণ করিবে ! বাল্যকালে যে আশা দিয়াছিলে, তাহা যদি সফল হইত, জীবিতেশ্বর ! দাসী তোমার সেবার ত্রুটি করিত না, দাসী বিশ্বাসঘাতিনী হইত না। কিন্তু সে কথায় কায নাই, সে আশা দূর করিয়াছি, মৃত্যুর প্রাক্কালে জগদীশ্বরের নিকট সরযূর প্রার্থনা যেন তুমি চিরজীবী হও, যেন জগদীশ্বর তোমাকে চিরসুখে রাখেন। আর সরযূর হৃদয়ে খেদ নাই। জীবিতনাথ ! সরযুকে বিদায় দাও, যদি কষ্ট না হয়, তোমার মুখচ্ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া যে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, কখন কখন সে অভাগিনীকে স্মরণ করিও।"

অভাগিনী নয়ন মুদিত করিলেন ; অনেকক্ষণ সেই দেবনিন্দিত পুরুষের রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আহা ! সেই মধুময় কথাগুলি যেন এখনও সরযূ শুনিতেছেন ' সরযূ ! সরযূ ! আমি তোমার রঘুনাথ !"

নয়ন উন্মীলিত করিলেন,—সহসা তারকালোকে সেই দীর্ঘাকার বীরপুরুষকে দণ্ডায়মান দেখিলেন ;—বাহুদ্বয় সরযূর দিকে প্রসারিত, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ !

এ কি রোগীর স্বপ্ন মাত্র ? বিধাতা ! এ বিড়ম্বনা কি জন্য ? সরযূ নয়ন পুনরায় মুদিত করিলেন।

এ স্বপ্ন নহে, এ বিড়ম্বনা নহে ! সরযূ পুনরায় চাহিলেন, কি দেখিলেন ?

দেখিলেন হৃদয়নাথ অভাগিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, উঃ ! সরযূর তপ্তহৃদয় সেই প্রশান্ত হৃদয়ে শীতল হইল, সরযূর ঘনশ্বাসের সহিত রঘুনাথের নিশ্বাস মিশ্রিত হইল সরযূর কম্পিত ওষ্ঠদ্বয় রঘুনাথের ওষ্ঠ স্পর্শ করিল !

উঃ। সে স্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল, বালিকা সংজ্ঞাশূন্য! একি প্রকৃত না স্বপ্ন ?

আনন্দভরে বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরযূ মনে মনে বলিলেন 'জগদীশ্বর ! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ সুখ নিদ্রা হইতে কখনও না জাগরিত হই !'

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জীবন নির্ব্বাণ।

হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন।
ধর্ম্ম অনুসারে জয় ঈশ্বর বচন।

কাশীরাম দাস।

মহারাষ্ট্রদেশে মহাসমারোহ আরম্ভ হইল ! শিবজী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, পুনরায় আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, ম্লেচ্ছদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবেন। নগরে গ্রামে পথে ঘাটে এই জনরব হইতে লাগিল।

এদিকে রাজা জয়সিংহ বিজয়পুর নগর আক্রমণ করিয়াও সে স্থান হস্তগত করিতে পারিলেন না। তিনি বার বার দিল্লীর সম্রাটের নিকট সহায়তার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাও বিফল হইল, অবশেষে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, যে তাঁহার সৈন্য সমেত বিনাশ ভিন্ন আরংজীবের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন বিজয়পুর ত্যাগ করিয়া আরঙ্গাবাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত আরংজীবের বিশ্বস্ত অনুচরের ন্যায় কার্য্য করিলেন। আরংজীব তাঁহার প্রতি এরূপ অভদ্র আচরণ করিয়াছেন বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও সম্রাটের কার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন না। যখন নিশ্চয় দেখিলেন মহারাষ্ট্র দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে তখন পর্য্যন্ত যতদূর সাধ্য সম্রাটের ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টা করিলেন। লৌহগড়, সিংহগড় পুরন্দর প্রভৃতি স্থানে, সম্রাটের সেনা সন্নিবেশিত করিলেন, তদ্ভিন্ন যে যে দুর্গ অধিকারে রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না, সে সমস্ত একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন যেন শত্রুরা ব্যবহার করিতে না পারে।

কিন্তু এ জগতে এরূপ বিশ্বস্ত কার্য্যের পুরস্কার নাই; জয়সিংহ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া আরংজীব যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, আরও অবমানিত করিবার জন্য তাঁহাকে দক্ষিণ দেশের সেনাপতিত্ব হইতে অপসৃত করিয়া দিল্লীতে 'তলব' করিলেন, যশোবন্ত সিংহকে তাঁহার স্থলে পাঠাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ সেনাপতি আজীবন সাধ্যমতে দিল্লীর কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন; শেষ দশায় এ অবমাননায় তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল, তিনি পথেই মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইলেন।

অবমানিত, পীড়িত, বৃদ্ধ জয়সিংহ মৃত্যুশয্যায় শয়িত রহিয়াছেন, এরূপ সময় একজন দূত সংবাদ দিলেন—

'মহারাজ! একজন মহারাষ্ট্র সেনানী আপনার দর্শনাভিলাষী। তিনি বলিলেন যে তিনি আপনার চরণোপান্তে বসিয়া এক দিন উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক দিন উপদেশ পাইবার আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন।'

রাজা উত্তর করিলেন—

'সম্মানপূর্ব্বক লইয়া আইস। তিনি দিল্লীর শত্রু কিন্তু দূতরূপে আসিতেছেন, আমি তাঁহাকে নির্ভয় দিতেছি, রাজপুতের বাক্যের অন্যথা হয় না।'

ক্ষণেক পর একজন মহারাষ্ট্র ছদ্মবেশে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রাজা তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলি-লেন—

'সুহৃদ্বর শিবজী! মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার দেখা হইল, চরিতার্থ হইলাম। উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবার ক্ষমতা নাই, দোষ গ্রহণ করিবেন না, আসন গ্রহণ করুন।'

সজলনয়নে শিবজী বলিলেন, 'পি-তঃ! যখন শেষ আপনার নিকট বিদায় লইয়াছিলাম তখন আপনাকে এত শীঘ্র এরূপ অবস্থায় দেখিব কখন মনে করি নাই।'

জয়। 'রাজন্! মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহাতে বিস্ময় কি।' ক্ষণেক পর দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন 'শিবজী, আমাদের শেষ যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমরা মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব দেখি-য়াছিলাম; এখন কি দেখিতেছ?,

শিব। 'মহারাজ সেই সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন, আপনাকে যখন এ অবস্থায় দেখিতেছি, তখন মোগল সাম্রাজ্যের আর আশা নাই।'

জয়। 'বৎস! তাহা নহে। রাজ-স্থানভূমি বীরপ্রসবিনী, জয়সিংহ মরিলে অন্য জয়সিংহ হইবে, জয়সিংহের ন্যায় সহস্র যোদ্ধা এখনও বর্ত্তমান আছেন। মাদৃশ একজন লোকের মৃত্যুতে সাম্রা-জ্যের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।'

শিব। 'আপনার অমঙ্গল অপেক্ষা সা-ম্রাজ্যের অধিক কি অনিষ্ট হইতে পারে?'

জয়। 'শিবজী! একজন যোদ্ধা যাইলে অন্য যোদ্ধা হয়, কিন্তু পাতকে যে ক্ষয়সাধন করে তাহার পুনঃসংস্কার হয় না! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যথায় পাপ ও কপটাচারিতা, তথায় অবনতি ও মৃত্যু। এক্ষণে প্রত্যক্ষ তাহা অবলোকন করুন।'

শিব। 'নিবেদন করুন।'

জয়। 'যখন আপনাকে আমি দিল্লী পাঠাইয়াছিলাম তখন আপনার হৃদয়ও দিল্লীশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল; আ-পনার স্থির সঙ্কল্প ছিল, দিল্লীশ্বর যত দিন আপনাকে বিশ্বাস করিবেন, আপনি তত দিন বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আ-পনার প্রতি সদাচরণ করিলে সম্রাটের দক্ষিণ দেশে একজন পরাক্রান্ত বন্ধু থা-কিত, কপটাচরণ বশতঃ সেই স্থানে এক-জন দুর্দ্দমনীয় শত্রু হইয়াছেন।'

শিব। 'মহারাজ! আপনার বুদ্ধি অসাধারণ ও বহুদূরদর্শী, জগতে যথার্থই জয়সিংহকে বিজ্ঞ বলিয়া জানে।'

জয়। 'আরও শ্রবণ করুন। আমি আরংজীবের পিতার সময় হইতে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছি। বিপদে, যুদ্ধসময়ে, যত দূর সাধ্য, দিল্লীশ্বরের উপকার করিয়াছি। স্বজাতি, বিজাতি বিবেচনা করি নাই, আত্মপর বিবেচনা করি নাই, যাঁহার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি জীবন পণ করিয়া তাঁহার কার্য্যসাধন করিয়াছি। বৃদ্ধকালে সম্রাট্ আমার প্রতি প্রথমে অসদাচরণ করিলেন,

পরে অবমাননা করিলেন। সে জন্য আমার কার্য্যে বৈলক্ষণ্য নাই, আমি যে সমস্ত সৈন্য প্রধান প্রধান দুর্গে রাখিয়া যাইলাম, শিবজী, তাহারা বিনা যুদ্ধে আপনাকে দুর্গ হস্তগত করিতে দিবে না। কিন্তু এ আচরণে আরংজীব স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। অম্বরাধিপেরা দিল্লীশ্বরের চিরবিশ্বস্ত অনুচর ও সহায়, অম্বরের ভবিষ্যৎ রাজগণ দিল্লীর প্রধান শত্রু হইবে।'

ক্রোধে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, মহাত্মা জয়সিংহ সে ক্রোধ নিবারণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

'দুইটি উদাহরণ দিলাম, মহারাষ্ট্র দেশের ও অম্বর দেশের। সমস্ত ভারতবর্ষে এইরূপ। শিবজী! আরংজীব সমস্ত ভারতবর্ষে বিশ্বস্ত অনুচরের অবমাননা করিতেছেন, মিত্রদিগকে শত্রু করিতেছেন, বারাণসী মন্দির বিনষ্ট করিয়া তথায় মস্জীদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, রাজস্থানে, সর্ব্বদেশে হিন্দুদিগের অবমাননা করিতেছেন, হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া করস্থাপন করিতেছেন।' ক্ষণেক পরে নয়ন মুদিত করিয়া অতি গম্ভীর স্বরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন—যেন মৃত্যুশয্যায় মহাত্মার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল, সেই চক্ষুতে ভবিষ্যৎ দেখিয়াই যেন রাজর্ষি কহিতে লাগিলেন,—'শিবজী! আমি দেখিতেছি যে, এই কপটাচারিতায় চারি দিকে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইল, রাজস্থানে অনল প্রজ্বলিত হইল, মহারাষ্ট্রে অনল জ্বলিল, পূর্ব্ব দিকে অনল জ্বলিল! আরংজীব বিংশতি বৎসর যত্ন করিয়া সে অনল নির্ব্বাণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাঁহার অসামান্য কৌশল, তাঁহার অসাধারণ সাহস ব্যর্থ হইল; বৃদ্ধ বয়সে পশ্চাৎ তাপ করিয়া দিল্লীশ্বর প্রাণত্যাগ করিলেন! অনল আরও প্রবলবেগে জ্বলিতেছে, চারিদিক হইতে ধূধূ শব্দে জ্বলিতেছে, সেই অনলে মোগল সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেল! তাহার পর? তাহার পর মহারাষ্ট্র জাতির নক্ষত্র উন্নতিশীল, মহারাষ্ট্রীয়গণ! অগ্রসর হও, দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে উপবেশন কর।'

রাজার বচন রোধ হইল। চিকিৎসকেরা পার্শ্বে ছিলেন তাঁহারা নানা ঔষধি দিলেন, কিন্তু জয়সিংহ অনেকক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় রহিলেন।

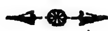
অনেকক্ষণ পর মৃদুস্বরে বলিলেন, 'কপটাচারী আপনাকেই শাস্তিদান করে; সত্যমেব জয়তি।'

শ্বাস রোধ হইল, শরীর হইতে প্রাণ নির্গত হইল।

শিবজী বালিকার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; মৃত জয়সিংহের পদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জীবন প্রভাত।



'ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে!,

মধুসূদন দত্ত।

রজনী এক প্রহর মাত্র আছে এরূপ সময়ে শিবজী রাজপুতশিবির ত্যাগ করিলেন। বাহিরে আসিয়া একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন, চিনিলেন তিনি রাজা জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলিলেন, 'রাজন্! মহারাজা জয়সিংহ আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে তাঁহার মৃত্যুর পর আপনার হস্তে এই সমস্ত কাগজ দিব। এত দিন এ সমস্ত সাবধানে রাখিয়াছিলাম, আপনি এক্ষণে গ্রহণ করুন।

শিবজী সে সময়ে অতিশয় শোকার্ত্ত ছিলেন; কোন উত্তর না করিয়া সেই কাগজ লইয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রাতঃকালের পূর্ব্বেই প্রধান প্রধান সেনানী ও অমাত্যদিগকে একত্র করিলেন। ক্ষণেক পরামর্শ করিলেন, পরে শিবিরের বাহিরে আসিয়া আপনার সমস্ত সৈন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন—

' বন্ধুগণ! প্রায় একবৎসর হইল আমরা আরংজীবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলাম; আরংজীবের নিজের দোষে ও কপটাচারিতায় সে সন্ধি খণ্ডন হইয়াছে; অদ্য আমরা সে কপট আচরণের পরিশোধ করিব,—মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিব।

' যিনি আরংজীবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ঈশানীদেবী যাঁহার সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছিলেন; যাহার নিকট শিবজী বিনা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন; অদ্য নিশীথে সেই মহাত্মা রাজা জয়সিংহ আরংজীবের অসদাচরণে ভগ্নচেতা হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। সৈন্যগণ! দিল্লীতে আমার কারাবরোধ, হিন্দুপ্রবর জয়সিংহের মৃত্যু, এ সমস্ত এক্ষণে আমরা পরিশোধ করিব।

' চারিদিকে চাহিয়া দেখ, চারিদিকে হিন্দুর অবমাননা,—হিন্দুদেবের অবমাননা দেবালয়ের অবমাননা। হিন্দুগণ, অদ্য আমরা এ অবমাননা দূর করিব; এশোক, এ অবমাননার যদি পরিশোধ থাকে, বীরগণ! রণরঙ্গে আমরা ইহার পরিশোধ করিব।

' মৃত্যুশয্যায় রাজা জয়সিংহের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল, তিনি দেখিলেন মোগলদিগের ভাগ্যনক্ষত্র অবনতিশীল,—মহারাষ্ট্রদিগের ভাগ্যনক্ষত্র উন্নতিশীল,—দিল্লীর সিংহাসন ত্বরায় শূন্য হইবে; বন্ধুগণ অগ্রসর হও, যুধিষ্ঠির ও পৃথুরায়ের সিংহাসন আমরা অধিকার করিব।

' পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখিতে পা-

ইতেছ, ও প্রভাতের রক্তিমাচ্ছটা। কিন্তু ও আমাদিগের পক্ষে সামান্য প্রভাত নহে; মহারাষ্ট্রগণ! হিন্দুগণ! অদ্য আমাদের **জীবনপ্রভাত**!”

সমস্ত সেনানী ও সৈন্যগণ এই মহৎ বাক্য শুনিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, ‘অদ্য আমাদের **জীবনপ্রভাত**!”

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ

বিচার।

‘পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত।’

কাশীরাম দাস।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ একাকী নদীতীরে পদচারণা করিতেছিলেন; আপনার পদোন্নতি, সরযুর সহিত পুনর্মিলন, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ, হিন্দুদিগের ভাবী স্বাধীনতা, এইরূপ নব বিষয়ের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে একজন ডাকিলেন—

‘রঘুনাথ!’

রঘুনাথ পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিলেন চন্দ্ররাও জুম্‌লাদার! রোষে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু ঈশানীমন্দিরের প্রতিজ্ঞা তিনি বিস্মিত হয়েন নাই।

চন্দ্ররাও বলিলেন, ‘রঘুনাথ! এজগতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই, একজন মরিব।’

রঘুনাথ রোষ সম্বরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, ‘চন্দ্ররাও! কপটাচারী, মিত্রহন্তা চন্দ্ররাও! তোমার উপযুক্ত শাস্তি শিরশ্ছেদন, কিন্তু রঘুনাথ তোমাকে ক্ষমা করিলেন,—জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।’

চন্দ্র। ‘বালকের ক্ষমা গ্রহণ করা আমার অভ্যাস নাই। তোমার আর অধিক জীবিত থাকিবার সময় নাই, মন দিয়া আমার কথা শুন।

‘জন্ম অবধি তুমি আমার পরম শত্রু, আমি তোমার পরম শত্রু। বাল্যকালে তোমাকে আমি দিব্যচক্ষুতে দেখিতাম, সহস্রবার প্রস্তরের উপর তোমার মস্তক আঘাত করিবার সঙ্কল্প মনে উদয় হইয়াছে! তাহা করি নাই, কিন্তু তোমার বিষয় নাশ করিয়াছি, তোমাকে দেশত্যাগী করিয়াছি, তোমাকে বিদ্রোহী বলিয়া অবমানিত ও দূরীকৃত করিয়াছি! চন্দ্ররাওয়ের ভীষণ জিঘাংসা তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইয়াছিল।

তোমার ভাগ্য মন্দ, পুনরায় উন্নত পদ লাভ করিয়া সৈন্যমধ্যে আসিয়াছ। চন্দ্ররাওয়ের স্থির প্রতিজ্ঞা জীবনে কখনও নিষ্ফল হয় নাই, এখনও হইবে না। অন্য উপায় ত্যাগ করিলাম, এই অসি দ্বারা তোর হৃদয় বিদ্ধ করিব, হৃদয়ের শোণিত পান করিয়া এ ভীষণ পিপাসা নির্ব্বাণ করিব। ভীরু! তোর অদ্য আমার হস্তে রক্ষা নাই।’

রোষে রঘুনাথের নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিতেছিল, কম্পিতস্বরে বলিলেন ‘ পামর ! সম্মুখ হইতে দুর হ, নচেৎ আমি পবিত্র প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইব,সহসা তোর পাপের দণ্ড দিব । ’

চন্দ্র । ‘ ভীরু ! এখনও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, তবে আরও শোন্ । উজ্জয়িনীর যুদ্ধে যে তীরে তোর পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল সে শত্রুনিক্ষিপ্ত নহে, চন্দ্ররাও তোর পিতৃহন্তা ! ’

রঘুনাথ আর নয়নে কিছু দেখিতে পাইলেন না,কর্ণে শুনিতে পাইলেন না,রোষে অসি নিষ্কোষিত করিয়া চন্দ্ররাওকে আক্রমণ করিলেন। চন্দ্ররাও ও ক্ষীণহস্তে অসি ধারণ করেন নাই, অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, উভয়ের অসিতে উভয়ের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, বর্ষার ধারার ন্যায় উভয়ের শরীর দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল। চন্দ্ররাও বলে ন্যূন নহেন, কিন্তু রঘুনাথ দিল্লীতে চমৎকার অসিযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন, অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর চন্দ্ররাওকে পরাস্ত করিলেন, তাঁহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে জানু স্থাপিত করিলেন ; বলিলেন—

‘ পামর ! অদ্য তোর পাপরাশির শেষ হইল, পিতা ! আপনার মৃত্যুর পরিশোধ হইল । ’

মৃত্যুর সময়েও চন্দ্ররাও নির্ভীক ; বিকট হাস্য হাসিয়া বলিলেন, ‘ আর তোর ভগ্নী বিধবা হইল, সে চিন্তা করিয়া সুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব ।’ পুনরায় হাস্য করিয়া উঠিলেন ।

বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত কথা তখন রঘুনাথের মনে উপলব্ধি হইল ! এই জন্য লক্ষ্মী স্বামীর নাম করেন নাই, এই জন্য চন্দ্ররাওয়ের অনিষ্ট না হয়, প্রার্থনা করিয়াছিলেন ! পিতৃহন্তা রক্তপিশাচ চন্দ্ররাও বলপূর্ব্বক প্রাণের লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়াছে ! রোষে রঘুনাথের নয়ন দিয়া অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল ; দন্ত কড়মড় করিল ; কিন্তু তাঁহার উন্নত অসি চন্দ্ররাওয়ের হৃদয়ে স্থাপিত হইল না ; তিনি ধীরে ধীরে চন্দ্ররাওকে ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ।

কম্পিতস্বরে কহিলেন ‘ পিশাচ ! তোর পাপ জগদীশ্বর বিচার করুন, রঘুনাথ তোর দণ্ড দিতে অক্ষম !

‘ দোষের, বিদ্রোহিতার দণ্ড দিতে অক্ষম নহি, বলিয়া পশ্চাৎ হইতে একজন লোক নিকটে আসিলেন, রঘুনাথ চাহিয়া দেখিলেন শিবজী !

শিবজী ইঙ্গিত করাতে অন্তরাল হইতে চারিজন সৈনিক আসিল,চন্দ্ররাওয়ের হস্ত বদ্ধ করিয়া তাহাকে বন্দীস্বরূপ লইয়া গেল।

পর দিন প্রাতে চন্দ্ররাওয়ের বিচার । রঘুনাথের পিতাকে হনন করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে ; রঘুনাথকে কল্য অন্যায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে ; রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণের পুর্ব্বে শত্রু রহমৎখাঁকে গুপ্ত সংবাদ

দিয়াছিলেন, পরে সে দোষে রঘুনাথকে দোষী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অদ্য তাহারই বিচার !

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আফগান সেনাপতি রহমৎখাঁ রুদ্রমণ্ডলে বন্দী হইলে পর শিবজী তাঁহাকে ভদ্রাচরণ পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, রহমৎখাঁও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। জয়সিংহ যখন বিজয়পুর আক্রমণ করেন তখন রহমৎখাঁ আপন নৈসর্গিক সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন, একটি যুদ্ধে অতিশয় আহত হইয়া জয়সিংহের বন্দী হয়েন। জয়সিংহ তাঁহাকে আপন শিবিরে আনাইয়া অনেক যত্ন ও শুশ্রূষা করাইয়াছিলেন, কিন্তু সে রোগ আরাম হইল না, তাহাতেই রহমৎখাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন জয়সিংহ রহমৎখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খাঁ সাহেব ! আপনার আর অধিক পরমায়ু নাই, আমার সমস্ত যত্ন ও চিকিৎসা বৃথা হইল। এক্ষণে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।'

রহমৎখাঁ বলিলেন—'আমার মরণের জন্য আক্ষেপ নাই, কিন্তু শত্রু হইয়া আমার প্রতি যেরূপ সদাচরণ করিয়াছেন তাহার পরিশোধ করিতে পারিলাম না এই আক্ষেপ রহিল। কি জিজ্ঞাসা করিবেন করুন, আপনার নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই।'

রাজা জয়সিংহ বলিলেন, 'রুদ্রমণ্ডল আক্রমণের পূর্ব্বে একজন শিবজীর সেনানী আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল ; সে কে আমরা জানি না, আমার বোধ হয় একজন অন্যায় দণ্ডিত হইয়াছে।'

রহমৎ। 'আমি জীবিত থাকিতে সে নাম প্রকাশ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। রাজপুত ! আপনার ভদ্রাচরণে আমি অতিশয় সম্মানিত হইয়াছি কিন্তু পাঠানপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অশক্ত।'

জয়সিংহ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'যোদ্ধা ! আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আমি বলিতেছি না, কিন্তু যদি কোনও নিদর্শন থাকে তাহা আমাকে দিতে আপত্তি আছে ?

রহমৎ। 'প্রতিজ্ঞা করুন সে নিদর্শন আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে পাঠ করিবেন না।'

জয়সিংহ তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন ; তখন রহমৎখাঁ তাঁহাকে কতকগুলি কাগজ দিলেন।

রহমতের মৃত্যুর পরে রাজা জয়সিংহ সেই সমস্ত পত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহী চন্দ্ররাও !

চন্দ্ররাও রহমৎখাঁকে স্বহস্ত লিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা রাজা পড়িলেন, সে সম্বন্ধে অন্যান্য যে যে কাগজ ছিল তাহাও পাঠ করিলেন, চন্দ্ররাও পাঠানদিগের নিকট যে পারিতোষিক পা-

ইয়াছিলেন তাহার প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্ত রাজা জয়সিংহ দেখিলেন।

জয়সিংহের মৃত্যুর দিনে তাঁহার মন্ত্রী সেই সমস্ত কাগজ শিবজীকে দিয়াছিলেন।

বিচার কার্য্যে অধিক সময় আবশ্যক হইল না। শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী একে একে সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন, যখন পাঠ সমাধা হইল তখন রোষে সমস্ত সেনানীগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্ররাও বিদ্রোহী, স্বয়ং শত্রুদিগকে সংবাদ দিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দোষে নির্দ্দোষী নিষ্কলঙ্ক বীর রঘুনাথের প্রাণদণ্ডের প্রয়াস পাইয়াছিলেন একথা সকলে জানিতে পারিয়া রোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

তখন শিবজী বলিলেন—'পাপাচারী বিদ্রোহি তোর মৃত্যু সন্নিকট, তোর কিছু বলিবার আছে।'

মৃত্যুর সময়ও চন্দ্ররাও নির্ভীক, তাঁহার দুর্দ্দমনীয় দর্প ও অভিমান এখনও পূর্ব্ববৎ। বলিলেন—

'আমি আর কি বলিব ? আপনার বিচার ক্ষমতা প্রসিদ্ধ! এক দিন এই দোষে রঘুনাথকে দণ্ড দিয়াছিলেন, অদ্য আমাকে দণ্ড দিতেছেন, আমার মৃত্যুর পর আর এক দিন আর এক জনকে দণ্ড দিবেন, তখন জানিবেন চন্দ্ররাও এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানে না, এসমস্ত প্রমাণ মিথ্যা।'

এই বিদ্রূপে শিবজী মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন—

'জল্লাদ, চন্দ্ররাওয়ের দুই হস্ত ছেদন কর ; তাহা হইলে আর ঘুষ লইতে পারিবে না, তাহার পর তপ্ত লৌহদ্বারা ললাটে 'বিশ্বাসঘাতক' অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।'

জল্লাদ এই নৃশংস আদেশ পালন করিতে যাইতেছিল, এরূপ সময় রঘুনাথ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে।'

শিব। 'রঘুনাথ! এ বিষয়ে তোমার নিবেদন আমরা অবশ্য শুনিব, কেন না এই পামর তোমারই প্রাণনাশের যত্ন করিয়াছিল ; তাহার কি প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছা কর, নিবেদন কর।'

রঘুনাথ। 'মহারাজের অঙ্গীকার অলঙ্ঘ্য, আমি এই প্রতিহিংসা যাচ্ঞা করি, যে চন্দ্ররাওয়ের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে ;—অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিনা দণ্ডে মুক্ত দিন!'

সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ!

শিবজী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন—

'তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল,—তোমার অনুরোধে সে জন্য চন্দ্ররাওকে রক্ষা করিলাম। রাজ-বিদ্রোহাচরণের শাস্তি দিবার অধিকারী রাজা। সে শাস্তির আদেশ করিয়াছি জল্লাদ আপন কার্য্য কর।'

রঘু। 'মহারাজের বিচার অনিন্দনীয়, কিন্তু দাস প্রভুর নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্তি দান করুন।,

শিব। 'এ ভিক্ষা দানে আমি অসমর্থ, রঘুনাথ তোমাকে এবার ক্ষমা করিলাম,—অন্যকে এতদূর ক্ষমা করিতাম না।, শিবজীর নয়ন প্রজ্বলিত হইতেছিল।

রঘু। 'প্রভু দুই একটি যুদ্ধে এ দাস প্রভুর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল, প্রভুও দাসকে অভিলষিত পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, অদ্য সেই পুরস্কার চাহিতেছি, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্ত করুন।,

রোষে শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতেছিল; গর্জ্জন করিয়া বলিলেন 'রঘুনাথ! রঘুনাথ! কখন কখন আমাদের উপকার করিয়াছিলে বলিয়া অদ্য আমাদিগের বিচার অন্যথা করিতে চাহ? রাজ-আদেশ অন্যথা হয় না; তুমিও আপনার বীরত্বের কথা আপনি বলিতে ক্ষান্ত হও।

এ তিরস্কার বাক্যে রঘুনাথের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; ধীরে ধীরে কম্পিত স্বরে উত্তর করিলেন,—

'প্রভু! পুরস্কার চাহা দাসের অভ্যাস নাই। অদ্য জীবনের মধ্যে প্রথমবার পুরস্কার চাহিয়াছি, প্রভু যদি এ পুরস্কার দানে অসম্মত হয়েন, দাস দ্বিতীয়বার চাহিবে না। দাসের কেবল এইমাত্র ভিক্ষা, প্রভু সদয় হইয়া তাহাকে বিদায় দিন, রঘুনাথ সৈনিকের ব্রত ত্যাগ করিবে, পুনরায় গোস্বামী হইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিতে থাকিবে।'

শিবজী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, রঘুনাথের নিকট কত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন স্মরণ করিলেন,—রঘুনাথের চক্ষুতে জল দেখিয়া কাতর হইলেন, ক্রোধ বিলুপ্ত হইল, ধীরে ধীরে বলিলেন,—

'রঘুনাথ! তোমার যাচ্ঞা দান করিলাম; চন্দ্ররাওকে মুক্ত করিলাম; রঘুনাথ! যে ব্রত ধারণ করিয়াছ তাহাতেই অবস্থিতি কর,—চিরকাল শিবজীর দক্ষিণ হস্তের ন্যায় হইয়া থাকিও!'

সভাসদ্ সকলে নিস্তব্ধ! সকলে ঘৃণার সহিত চন্দ্ররাওয়ের দিকে চাহিলেন,—

ঘোর অভিমানী চন্দ্ররাও সাধারণের এ ঘৃণা ও নিন্দাবাক্য সহ্য করিতে পারিলেন না, রঘুনাথের দয়াতে তাঁহার রক্ষা হইল এ কথা সহ্য করিতে পারিলেন না।

চন্দ্ররাও ভীরু নহেন। ধীর ধীরে ক্রোধ-জর্জ্জরিত শরীরে রঘুনাথের নিকট যাইয়া বলিলেন—

'বালক! তোর দয়া আমি চাহি না, তোর দেওয়া জীবন আমি তুচ্ছ করি, তোর অনুগ্রহে আমি এইরূপে পদাঘাত করি, বলিতে বলিতে রঘুনাথের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। পরে ক্ষণে আপন ছুরিকা নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া অ-

ভিমানী জীবণপ্রতিজ্ঞ চন্দ্ররাও জুমলাদার সাধারণের ঘৃণা হইতে আপনার চিরনিষ্কৃতি সাধন করিলেন। জীবনশূন্য দেহ সভাস্থলে পতিত হইল!

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতা ভগিনী।

' সুত পরিবার,
কেবা বল কার,
যেমত বৃক্ষের ছায়া।
জলবিম্ব প্রায়,
সকল মিছাময়,
কেবল ভবের মায়া॥

কীৰ্ত্তিবাস ওঝা।

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইয়াছে; এক্ষণে নায়ক নায়িকাদিগের বিষয় দুই একটি কথা বলিয়া পাঠক মহাশয়ের নিকট বিদায় লইব।

বৃদ্ধ জনার্দ্দন কন্যাকে হারাইয়া বাতুলের ন্যায় হইয়াছিলেন, পুনরায় সরযুকে পাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ' সরযু! সরযু! তোমার ন্যায় রত্ন আমি ত্যাগ করিয়াছিলাম? তোমাকে ত্যাগ করিয়া কি একদিনও জীবন ধারণ করিতে পারি?' সরযুও পিতার গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—' পিতঃ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, জীবন থাকিতে আর কখনও আপনার ছাড়া হইব না।'

পুলকিত হৃদয়ে বৃদ্ধ শুনিলেন যে রঘুনাথ রাজপুত-সন্তান, অতি উন্নত ব্রাহ্মণবংশীয় বীরপ্রবর গজপতি সিংহের পুত্র; সানন্দহৃদয়ে শুভদিনে কন্যা দান করিলেন। সরযুর সুখ কে বর্ণনা করিবে? চারি বৎসর যে দেবকান্তির জপ করিয়াছিলেন, সেই পুরুষ-দেবকে যখন আপন কোমলহৃদয়ে ধারণ করিলেন, তাঁহার ওষ্ঠে যখন উষ্ণ ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তখন সরযু সুখে উন্মাদিনী হইলেন। যাহারা সে সুখ ভোগ করিয়াছ, অনুভব কর, লেখক বর্ণনায় অক্ষম!

আর রঘুনাথ?—রঘুনাথ তোরণদুর্গে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা কি অদ্য সার্থক হইল? সেই প্রিয় কণ্ঠমালা বার বার সরযুর হৃদয়ে দোলাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনিন্দিত দেহ হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সেই বিশাল স্নেহপূর্ণনয়নের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উন্মত্ত প্রায় হইলেন!

সরযু তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া ' দিদি ' কে বিস্মৃত হইলেন না। রঘুনাথের অনুরোধে শিবজী গোকর্ণকে একটি জায়গীর দান করিলেন ও গোকর্ণের পুত্র ভীমজীকে উন্নতি দান করিয়া হাবেলদার পদে নিযুক্ত করিলেন।

সরযু দিদিকে সর্ব্বদাই আপন গৃহে রাখিতেন, ও বরের সহিত ' স্নামন সমান' ভাল বাসিতেন,—কয়েক বৎসর পরে একটি সদ্বংশীয় সুচরিত্র পাত্র দেখিয়া দিদির বিবাহ দিলেন। বিবাহ দিবসে স-

রঘু ও রঘুনাথ স্বয়ং উপস্থিত রহিলেন; সরযু কন্যার কাণে কাণে বলিলেন,—'দেখিও দিদি! যাহা বলিয়াছিলে সে কথা যেন রাখিও,—বরের চেয়ে আমাকে ভাল বাসিবে!'

রঘুনাথ আখ্যায়িকাবিবৃত্ত সময়ের পর ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। যশোবন্ত সিংহ যখন জানিতে পারিলেন রঘুনাথ তাঁহারই প্রিয় অনুচর গজপতি সিংহের পুত্র, তখন রঘুনাথকে পৈতৃক ভূমি সমস্ত ছাড়িয়া দিলেন, তাহা ভিন্ন অনেক জায়গীর দান করিলেন। কিন্তু শিবজী রঘুনাথকে দেশে যাইতে দিলেন না, যতদিন জীবিত ছিলেন রঘুনাথকে নিকটে রাখিলেন। পরে যখন ১৬৮০ খৃঃ অব্দে চৈত্র মাসে শিবজীর মৃত্যু হয়, যখন অযোগ্য পুত্র শম্ভুজী পিতার পুরাতন ভৃত্যদিগকে একে একে অবমানিত বা কারারুদ্ধ করিতে লাগিলেন; রঘুনাথ আর মহারাষ্ট্রে থাকিলে উপকার নাই দেখিয়া সরযু ও জনার্দ্দনের সহিত স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, পৈতৃক জায়গীর অধিকার করিলেন, পৈতৃক প্রশস্ত গৃহ রঘুনাথ ও সরযুর বালকবালিকাদিগের ক্রীড়াশব্দ ও হাস্যধ্বনিতে শব্দিত হইতে লাগিল!

পাঠক! ইচ্ছা এই স্থানেই আপনার নিকট বিদায় লই, কিন্তু আর এক জনের কথা বলিতে বাকি আছে; শান্ত চিরসহিষ্ণু লক্ষ্মীরূপিণী লক্ষ্মীর কি হইল?

যেদিন চন্দ্ররাও আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ অনতিবিলম্বে ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন; যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। দেখিলেন, শবের পার্শ্বে লক্ষ্মী আলুলায়িত বেশে গড়াগড়ি দিতেছেন, ঘন ঘন মোহ যাইতেছেন, সময়ে সময়ে হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে ঘর পরিপূরিত করিতেছেন। হিন্দুরমণীর পতির মৃত্যুতে যে ভীষণ যাতনা হয়, কে বর্ণনা করিতে পারে? অদ্য লক্ষ্মীর নয়নের আলোক নির্ব্বাণ হইয়াছে, হৃদয় শূন্য হইয়াছে, জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে! শোকে, বিষাদে, নৈরাশে, নব বৈধব্যের অসহ্য যাতনায়, বিধবা ঘন ঘন আর্ত্তনাদ করিতেছে।

রঘুনাথ সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন, সান্ত্বনা দূরে থাকুক লক্ষ্মী প্রাণের ভ্রাতাকে চিনিতেও পারিলেন না। ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে রঘুনাথ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় পুনরায় ভগিনীকে দেখিতে আসিলেন, লক্ষ্মীর ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন লক্ষ্মীর নয়নে জল নাই, ধীরে ধীরে স্বামীর মৃতদেহ সুন্দর শুভ্র সুগন্ধ পুষ্প দিয়া সাজাইতেছেন। বালিকা যেরূপ মনোনিবেশ করিয়া পুত্তলি সাজায়, লক্ষ্মী সেইরূপ মনোনিবেশ পূর্ব্বক মৃতদেহ সাজাইতেছেন।

রঘুনাথ গৃহে আসিলে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে রঘুনাথের নিকটে আসিলেন, অতি মৃদুপদবিক্ষেপে আসিলেন, যেন শব্দ হইলে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইবে! অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—

'ভাই রঘুনাথ! তোমার সঙ্গে যে আর একবার দেখা হইল আমার পরম ভাগ্য, এখন আর আমার মনে কোনও কষ্ট থাকিল না।,

সাশ্রুনয়নে রঘুনাথ বলিলেন—'প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মী, আমি তোমার সঙ্গে এ সময়ে দেখা না করিয়া কি থাকিতে পারি?,

লক্ষ্মী অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষের জল মোচন করিয়া বলিলেন—

'সত্য ভাই, তোমার দয়ার শরীর, তুমি হৃদয়েশ্বরের জন্য রাজার নিকট যে আবেদন করিয়াছিলে শুনিয়াছি! আমার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।' নিজের চক্ষু হইতে এক বিন্দু জল মোচন করিলেন।

রঘু। 'লক্ষ্মী! তুমি বুদ্ধিমতী আমি চিরকাল জানি, অসহ্য শোক কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়াছ দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। মনুষ্যের জীবন শোকময়, তোমার কপালে যাহা ছিল ঘটিয়াছে, সে শোক সহিষ্ণু হইয়া বহন কর, আইস আমার গৃহে আইস, ভ্রাতার ভালবাসায় ভ্রাতার যত্নে যদি সন্তোষ দান করিতে পারে, লক্ষ্মী, আমি ত্রুটী করিবনা

লক্ষ্মী একটু হাসিলেন, সে হাস্য দেখিয়া রঘুনাথের প্রাণ শুকাইয়া গেল। ঈষৎ হাসিয়া লক্ষ্মী বলিলেন,—

'ভ্রাতা, তোমার দয়ার শরীর, কিন্তু লক্ষ্মীকে জগদীশ্বরই স্বয়ং সান্ত্বনা করিয়াছেন, শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। হৃদয়েশ্বর চির নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন, তিনি জীবদ্দশায় দাসীকে অতিশয় ভালবাসিতেন, দাসী জীবনে তাঁহার প্রণয়িনী ছিল, মরণে তাঁহার সঙ্গিনী হইবে।'

রঘুনাথের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীর ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীর শান্ত ভাবের হেতু বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মী সহমরণে স্থির সঙ্কল্প হইয়াছেন।

তখন অনেকক্ষণ অবধি লক্ষ্মীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অনেক ক্রন্দন করিলেন, এক প্রহর রজনী পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর সহিত তর্ক করিলেন; ধীর শান্ত লক্ষ্মীর একই উত্তর 'হৃদয়েশ্বর আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।'

অবশেষে রঘুনাথ সজলনয়নে বলিলেন,—

'লক্ষ্মী, একদিন আমার জীবন নৈরাশে পূর্ণ হইয়াছিল, আমি জীবনত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ভগিনী তোমার প্রবোধে, তোমার স্নেহময় কথায় সে সঙ্কল্প ছাড়িলাম, পুনরায় কার্য্যজগতে প্রবেশ করিলাম। লক্ষ্মী, তুমি কি ভ্রা-

তার কথা রাখিবে না? তুমি কি ভ্রাতাকে ভালবাস না?'

লক্ষ্মী পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে উত্তর করিলেন—

'ভাই সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই, তুমি লক্ষ্মীকে ভালবাস, লক্ষ্মীর কথা শুনিয়াছিলে,তাহা বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ পুরুষের অনেক আশা, অনেক উদ্যম, অনেক অবলম্বন, একটি যাইলে অন্যটি থাকে, একটি চেষ্টা নিষ্ফল হইলে দ্বিতীয়টি সফল হয়। ভাই তুমি সেদিন ভগিনীর কথাটি রাখিয়াছিলে,অদ্য তোমার কলঙ্ক দুরীভূত হইয়াছে, ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে, সুযশ দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? অদ্য আমি যে নয়নের মণিটি হারাইয়াছি তাহা কি জীবনে আর পাইব? যে মহাত্মা দাসীকে এত ভালবাসিতেন, এত অনুগ্রহ করিতেন, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে কি আর পাইব? ভাই! তুমি লক্ষ্মীকে বাল্যকাল হইতে বড় ভালবাসিয়াছ, অদ্য সদয় হও, লক্ষ্মীর একমাত্র সুখের পথে কাঁটা দিও না, যিনি দাসীকে এত ভালবাসিতেন তাঁহার সহিত যাইতে দাও!'

রঘুনাথ নিরস্ত হইলেন; স্নেহময়ী ভগিনীর অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া বালিকার ন্যায় ঝর ঝরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ অসার কপট সংসারে ভ্রাতা ভগিনীর অখণ্ডনীয় প্রণয়ের ন্যায় পবিত্র স্নিগ্ধ প্রণয় আর কি আছে? স্নেহময়ভ্রাতা বা স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায় অমূল্য রত্ন এ বিস্তীর্ণ জগতে আর কোথায় যাইলে পাইব?

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চিতা প্রস্তুত হইল, চন্দ্ররাওয়ের শব তাহার উপর স্থাপিত হইল, হাস্যবদনা লক্ষ্মী সুন্দর পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। চিতা পার্শ্বে আসিলেন, দাসীদিগকে অলঙ্কার, রত্ন, মুক্তা বিতরণ করিতে লাগিলেন, স্বহস্তে তাহাদিগের নয়নের জল মোচন করিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, জ্ঞাতি কুটুম্বিনীদিগের নিকট বিদায় লইলেন, গুরুদিগের পদধূলি লইলেন, সপত্নীদিগের আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন, সকলের নয়নের জল অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন, মধুময় বাক্য দ্বারা সকলকে প্রবোধ দিলেন।

শেষে রঘুনাথের নিকট আসিলেন—

বলিলেন 'ভাই! বাল্যকাল অবধি তোমার লক্ষ্মীকে তুমি বড় ভালবাসিতে, অদ্য লক্ষ্মী ভাগ্যবতী, অদ্য চিরসুখিনী হইবে, একবার ভালবাসার কাজ কর— সস্নেহে কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিদায় দাও, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।'

রঘুনাথ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, লক্ষ্মীর দুটি হাত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন! লক্ষ্মীরও চক্ষুতে জল আসিল।

সস্নেহে ভ্রাতার চক্ষুর জল মুছাইয়া লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন—

‘ ছি ভাই শুভকার্য্যে চক্ষুর জল ফেল কি জন্য ? পিতার ন্যায় তোমার সাহস, পিতার ন্যায় তোমার মহৎ অন্তঃকরণ, জগদীশ্বর তোমার আরও সম্মান বৃদ্ধি করিবেন; জগৎ তোমার যশে পূর্ণ হইবে ! লক্ষ্মীর শেষ বাসনা এই,জগদীশ্বর যেন রঘুনাথকে সুখে রাখেন ! ভাই, বিদায় দাও, দাসীর জন্য স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন।’

কাতরস্বরে রঘুনাথ বলিলেন—

‘ লক্ষ্মী, তোমা বিনা জগৎ তুচ্ছজ্ঞান হইতেছে, জগতে আর রঘুনাথের কি আছে ? প্রাণের লক্ষ্মী ! তোকে কিরূপে বিদায় দিব, তোকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব ?’ আর্ত্তনাদ করিয়া রঘুনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন।

অনেক যত্ন করিয়া লক্ষ্মী রঘুনাথকে উঠাইলেন, পুনরায় চক্ষুর জল মুছিয়া দিলেন, অনেক সান্ত্বনা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, ‘ভ্রাতঃ তুমি বীরশ্রেষ্ঠ ! পুরুষের যাহা ধর্ম্ম তাহা তুমি পালন করিতেছ, তোমার লক্ষ্মীকে নারীর ধর্ম্ম পালন করিতে দাও। আর বিলম্ব করিও না, বাধা দিও না ; ঐ দেখ পূর্ব্বদিকে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।’

গদ্ গদ স্বরে রঘুনাথ বলিলেন—

‘ লক্ষ্মী, প্রাণের লক্ষ্মী, এজগতে তোমাকে বিদায় দিলাম, ঐ আকাশে ঐ পুণ্যধামে আর একবার তোমাকে পাইব। সে পর্য্যন্ত জীবন্মৃত হইয়া রহিলাম।’

ভ্রাতার চরণধূলি লইয়া লক্ষ্মী চিতাপার্শ্বে যাইলেন, স্বামীর পদদ্বয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া বলিলেন ‘ হৃদয়েশ্বর ! জীবনে তুমি দাসীকে বড় ভাল বাসিতে,এখন অনুগ্রহ কর, যেন তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার সঙ্গে যাইতে পারি। জন্ম জন্ম যেন তোমাকে স্বামী পাই,—জন্ম জন্ম যেন লক্ষ্মী তোমার পদসেবা করিতে পায়। জগদীশ্বর ! লক্ষ্মীর অন্য কামনা নাই।’

ধীরে ধীরে চিতা আরোহণ করিলেন, স্বামীর পদপ্রান্তে বসিলেন, পদদ্বয় ভক্তিভাবে অঙ্কের উপর উঠাইয়া লইলেন। নয়ন মুদ্রিত করিলেন,—বোধ হইল যেনসেই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্মীর আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করিল।

অগ্নি জ্বলিল , অতিশয় ঘৃত থাকায় শীঘ্র অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমে অগ্নিজিহ্বা লক্ষ্মীর পবিত্র শরীর লেহন করিতে লাগিল, শীঘ্রই সতেজে চারি দিক বেষ্টন করিয়া লক্ষ্মীর মস্তকের উপর উঠিল. নৈশ গগনের দিকে মহাশব্দে ধাবমান হইল। লক্ষ্মীর একটি অঙ্গ নড়িল না, একটি কেশ কম্পিত হইল না !

এক প্রহরের মধ্যে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল ; কিন্তু সেই ভীষণ দৃশ্য, চিতার সেই নৈরাশজনক ধূ ধূ শব্দ রঘুনাথ জীবনে বিস্মৃত হইলেন না।

আর্য্যায়ুর্ব্বেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এ দেশের প্রায় সমস্ত গ্রন্থকারই 'কবিচিত্ত ফুলবনমধু কল্পনার' মাধুর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন। কেবল স্মৃতিশাস্ত্রকারগণই এই কল্পনাস্পৃহা কিয়ৎ পরিমাণে সংযত করিতে পারিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহারাও জগদুৎপত্তি প্রকরণাদিতে অসামান্য কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক অপরাপর সামাজিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে স্মৃতিকারগণ বড় একটা উপন্যাস বা অলঙ্কারের ছটা প্রকাশ করিয়া কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিতে ব্যাকুল হন নাই। দেখা যাউক অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরির সম্বন্ধে ইঁহারা কি বলেন।

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠোনাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃপরাশব উচ্যতে।
মনুঃ।

বিপ্রান্মুর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ-
স্ত্রিয়াম্
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাংনিষাদোজাতঃ পারশবোঽপিবা ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোহি মুনিসত্তমঃ।
ব্রাহ্মণাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ পরাশরঃ।

বেদাজ্জাতোহি বৈদ্যঃস্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ ॥ শঙ্খঃ।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি সকল স্মৃতিকারই একবাক্যে অম্বষ্ঠবংশপ্রবর্ত্তককে ব্রাহ্মণবিবাহিতা বৈশ্যার সন্তান বলিয়াছেন। সুতরাং প্রাগুক্ত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত হইতে আমরা যে ঐতিহাসিক সারসঙ্কলন করিলাম তাহার সহিত প্রায় সমস্ত স্মৃতিকারদিগের ঐকমত্য দেখা যায় অতএব প্রাগুক্ত বিবরণই আমরা ধন্বন্তরির প্রকৃত জন্মবিবরণ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। পুরাণ কবি আরও বলেন যে ধন্বন্তরি স্বর্গবৈদ্য অশ্বিন্ দ্বয়ের মানবীকন্যাত্রয়ের পাণিগ্রহণ করেন। অশ্বিনদিগের অপর নাম সনৎকুমার। সিদ্ধবিদ্যাদি এই তিন স্ত্রীর গর্ভে ধন্বন্তরির সেন দাসাদি চতুর্দ্দশ পুত্র জন্মে। অশ্বিনদ্বয় মানসপুত্র, চিরকুমার ছিলেন বলিয়াই, বোধ হয়, পুরাণ কবি ইঁহাদের মানসী কন্যার কল্পনা করিয়াছেন। যাহা-হউক, উপন্যাস ত্যাগ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ধন্বন্তরির তিন পাণিগ্রহের সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। মহৌজা গালব-সুনু স্বকীয় প্রতি-

ভাবলে বয়োবৃদ্ধি সহকারে মুনি সমাজে অতীব খ্যাতিলাভ করিতে লাগিলেন। পুত্রগণও পিতার অনুবর্ত্তন করিয়া উত্তরোত্তর বংশোজ্জ্বল করিতে লাগিলেন। আমরা পাঠকগণকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করি যে তাঁহারা যেন বর্ত্তমান কালের বৈদ্যকুলকুঠার নিরক্ষর ভিষক্‌নামধারীদিগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া প্রাচীন ভিষক্‌বংশের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত না করেন। বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণবৈদ্য দেখিয়া পুরাকালের ব্রাহ্মণ বৈদ্যের ছায়া অঙ্কনপ্রারম্ভ বিরম্বনা মাত্র। স্মৃতিকারগণ বলেন যে আনুলোমিক জাতির মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ ঔরসে ও বৈশ্যাগর্ভে জন্মিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বেদ বেদাঙ্গ পারগ ও মুনি বলিয়া খ্যাত। *

ধন্বন্তরিসন্তান ব্যতীত মহামতী অগ্নিবেশ অপর একপ্রকার অম্বষ্ঠের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিপ্রপুত্র অম্বষ্ঠের ঔরসে ও বিপ্রকন্যা অম্বষ্ঠার গর্ভে যে সন্তান জন্মে সেও অম্বষ্ঠ † ব্রাহ্মণের সহিত তাহার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডত্ব। তিনি ব্যবহারশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণত্যক্ত ধনাদির ও অধিকারী। যাহা হউক বর্ত্তমানকালে এবম্বিধ অম্বষ্ঠসন্তানদিগকে ধন্বন্তরিসন্তান হইতে নির্দ্দেশ করা সুকঠিন; প্রত্যুত অসম্ভব ব্যাপার। বিশেষতঃ যখন উভয়েই একজাতিভুক্ত, তখন তদর্থে যত্নের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না। হারীত স্বপ্রণীত সংহিতায় বলিয়াছেন ' ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারাই দ্বিজ এবং ইহাদের যথাপূর্ব্ব গৌরব। * অগ্নিবেশও পদমর্য্যাদানিবন্ধনকালে বলিয়াছেন, ইহারা সত্যে পিতৃতুল্য, ত্রেতাতে তদ্রূপ, দ্বাপরে ক্ষত্রিয়বৎ, কলিতে বৈশ্যোপম † এই সমস্ত প্রাচীন সংহিতাবচনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অমৃতাচার্য্যের বংশপরম্পরা অনেকেই সেই দেবতুল্য মহাপ্রভাববান্ পিতৃপুরুষের কুলের অলঙ্কার ছিলেন। কিন্তু, বিচারাসনে বসিয়া কে বলিতে পারে যে এই বৈদ্যনামধারী অদৃষ্টায়ুর্ব্বেদ বৈদ্যকুলকণ্টক কবিরাজ মহাশয়েরা তাহাদেরই বংশধর এবং তাদৃশ সম্মান ও ভক্তির পাত্র ?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ধন্বন্তরি ইন্দ্র হইতে আয়ুর্ব্বেদ লাভ করেন এবং ব্রাহ্ম-

---

* তত্র বৈশ্য সুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী। সর্ব্বেতে মুনয়ঃখ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥

† একমেকস্য বিপ্রস্যাম্বষ্ঠজাত্যা স্বজ্ঞাৎসুতঃ। সোঽন্যবিপ্রস্য কন্যায়ামম্বষ্ঠায়াস্তথাভবৎ। ব্রাহ্মণেন সপিণ্ডত্বং তেষাং ত্রৈপুরুষাবধিঃ। দারপ্রাপ্তিশ্চ বিপ্রস্য ধর্মশাস্ত্রানুসারতঃ ॥ অগ্নিবেশঃ।

* ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃক্ষত্রবিশাবপি। অমীপঞ্চদ্বিজা এবাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্। হারীতঃ।

† সত্যে বৈদ্যাঃ পিতুস্তুল্যা স্ত্রেতায়াঞ্চতথাস্মৃতা। দ্বাপরে ক্ষত্রবৎপ্রোক্তাঃ কলৌবৈশ্যোপমস্মৃতাঃ। অগ্নিবেশঃ।

ণগণ বৈদ্যদিগকে আয়ুর্ব্বেদব্যবসায় সম্প্রদান করেন। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে এরূপ প্রতীত হয় যে, ব্রাহ্মণাদিও তৎকালে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন। কারণ, যে কাল পর্য্যন্ত সমাজস্থ সকলের চিকিৎসোপযোগী বৈদ্যের সংখ্যাধিক্য হয় নাই সেই পর্য্যন্ত বৈদ্যেতরজাতিকেও বাধ্য হইয়া তদ্ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক এবম্বিধ প্রয়োজনপ্রণোদিত বৈদ্যব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ কদাচ অনুযোগার্হ নহেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় অনেক ব্রাহ্মণ বৈদ্যবাহুল্য হইলেও লোভপরায়ণ হইয়া বৈদ্যব্যবসায় অবলম্বন করিতেন। যৎকালে চরক অগ্নিবেশতন্ত্র প্রতিসংস্কার করেন, অথবা যে সময়ে অগ্নিবেশ স্বয়ং আয়ুর্ব্বেদসংহিতা প্রণয়ন করেন সেই সময়েও ব্রাহ্মণের বৈদ্যবেশ ধারণ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি দীর্ঘঞ্জীবিত নামাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে পীড়িত ব্যক্তি বৈদ্যবেশধারী ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইবেক না * সুতরাং তৎসময়ে এরূপ প্রথা প্রচলিতথাকার কোনও সন্দেহ নাই। ব্যবহারশাস্ত্রকারগণও এবম্বিধ প্রতারণা নিবারণোপায়ে স্বপ্রণীত সংহিতায় বিবিধ অনুশাসনবাক্য নিবদ্ধ করিয়াছেন। বৈদ্যবেশধারী ব্রাহ্মণ দেখিবামাত্র সবস্ত্র স্নান করিবেক, এইবাক্য আজও আমাদের দেশে সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় *। যে ব্রাহ্মণ চিকিৎসক তাহার অন্ন পূয়বৎ, যিনি কুসীদগ্রহণকারী, তাহার অন্ন বিষ্ঠা ইত্যাদি *। অনুশাসনবাক্যে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া অন্য জাতির ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যদিগকে চিকিৎসা ব্যবসায়ের সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এক চেটিয়া রূপে দান করেন নাই। স্মৃতি পুরাণাদিতে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এরূপ হইলে আত্রেয় ভরদ্বাজাদির আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপন ধর্ম্মবিগর্হিত হইয়া উঠে। ইহাও অনুসন্ধেয় যে তৎকালে তাহাদের চিকিৎসা ব্যবসায়ও বিচার করিতে গেলে অসঙ্গত প্রতীয়মান হয় না। কারণ ধন্বন্তরির আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায় লাভ ভরদ্বাজের সময়ে ঘটে। সুতরাং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আত্রেয়ের চিকিৎসাব্যবসায় দত্তাপহারীত্বদোষসঙ্কুল নহে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান ধন্বন্তরি ইন্দ্র হইতে আয়ুর্ব্বেদ লাভ করিয়া ভরদ্বাজ ও গালব প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিবর্গের

* নচক্ষুদ্রব্রতাং বেশবিভ্রতাং শরণং গতাঃ ॥ চরকে।

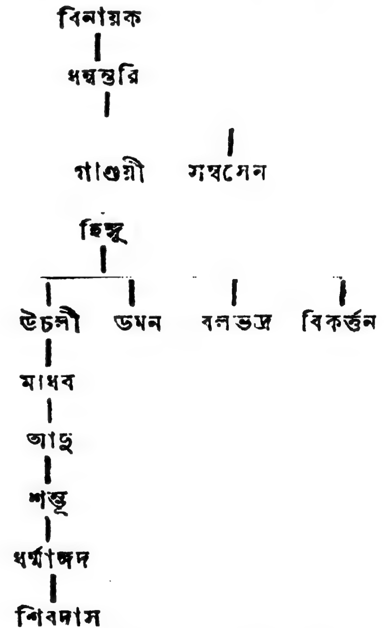
* ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং জলমাবিশেৎ।

† পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্তুন্নমিন্দ্রিয়ম্।
বিষ্ঠা বার্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্॥

সম্মতি অনুসারে আপন সন্তানদিগকে তদ্ব্যবসায়ে অধিকারী করেন। এবং উত্তরকালের শিক্ষাসৌকর্য্যার্থে স্বয়ং একখানা সংহিতা প্রণয়ন করেন। আয়ুর্ব্বেদের যত সংহিতা প্রণীত হইয়াছে তন্মধ্যে আত্রেয় ও ধন্বন্তরিকৃত সংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অমিতপ্রতিভ ধন্বন্তরি অতীব অধ্যবসায়বলে মানবশরীরতত্ত্ব, লতা, গুল্মাদি, ওষধি ও ইতর প্রাণীর সহিত মানবদেহের সম্বন্ধপরম্পরা অতি সংক্ষেপে স্বপ্রণীত সংহিতায় নিবন্ধ করিয়াছিলেন। নানাবিধ রোগের নিদান, চিকিৎসা ও রোগহেতু নির্ণয় করিয়া মানবজাতির পরম বান্ধবের কার্য্য করিয়াছেন। আজ কাল ধন্বন্তরিসংহিতা এতদ্দেশে প্রচলিত আছে কিনা সন্দেহস্থল; প্রস্তাবলেখক যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছেন তাহাতে তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। যদিও কেহ কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সেই সকল খণ্ডিত অংশ একত্র করিলেও মূলগ্রন্থের ছায়ামাত্রও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সুতরাং আদিসংহিতা সম্প্রতি যে একেবারে অপ্রাপ্য না হইলেও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

কতকাল হইল ধন্বন্তরিসংহিতা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্থিরসিদ্ধান্ত করা সুকঠিন। আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক গ্রন্থের ব্যাখ্যানকালে কোন কোন অম্বষ্ঠরত্ন ধন্বন্তরিসংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া আমরা এতদ্বিষয়ের কথঞ্চিৎ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

বল্লালসেনসংস্থাপিত আটজন অম্বষ্ঠকুলতিলকেরই একতমের অধস্তন সন্তান পণ্ডিতবর শিবদাস মহামতি চক্রপাণিদত্তকৃতসংগ্রহের টীকা ও ব্যাখ্যানকালে ধন্বন্তরিসংহিতার অনেক শ্লোক গ্রহণ করিয়া প্রমাণ ও মতান্তর সমর্থন করিয়াছেন। বিনায়ক সেন বল্লাল সংস্থাপিত বৈদ্যরত্নের একতম ব্যক্তি। * নিম্নলিখিত বংশপরম্পরায় দৃষ্ট হয় যে শিবদাস বিনায়ক হইতে দশম পুরুষ।



* দুহির্বিনায়কশ্চায়ুঃ কায়ুঃ পাস্থ ত্রিপুরকঃ।
শিয়ালো গরিরিহাস্টৌ রাঢ়েবঙ্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ। কবিকণ্ঠহার।

ইহাদের প্রত্যেক পুরুষের স্থিতিকাল গড়ে ৩০বৎসর ধরিলে বিনায়ক হইতে শিবদাস পর্য্যন্ত ৩০০ বৎসর গত হইয়াছিল। বল্লাল সেন ও খৃঃ১১শ শতাব্দির প্রারম্ভে বর্ত্তমান থাকার সম্ভব। এই গণনানুসারে শিবদাস খৃঃ১৪শ শতাব্দির লোক বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং ধন্বন্তরিসংহিতা অম্লান ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ শিবদাসকৃত টীকাতে বহুল পরিমাণে ধন্বন্তরির ধ্বনি থাকাতে এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে যে উক্ত সংহিতা তৎকালে সাধারণের মধ্যে বিশেষ মান্য ছিল। এবংবিধ গ্রন্থের বিরলপ্রচার হইতে ও অন্ততঃ শতবৎসর কাল গত হওয়ার সম্ভব। সুতরাং যখন পাঠানকরতলস্থ বঙ্গদেশ মোগলদের আক্রমণে উপর্য্যুপরি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, যে সময়ে বঙ্গবাসী এক দিকে স্বদেশীয় পাঠান কর্ত্তৃক উপদ্রুত, অপরদিকে দিল্লীর সম্রাটদিগের প্রেরিত সেনা দ্বারা ভূয়োভূয়ঃ লুণ্ঠিত, সেই অরাজকের সময়ই অল্পে২ আয়ুর্ব্বেদের এই প্রাচীন গ্রন্থও অপরাপর শাস্ত্রের সঙ্গে২ বিলুপ্ত হইতে থাকে।

ধন্বন্তরি অমৃতাচার্য্যও গালবঔরষে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবকাল হইতেই কঠোর তপশ্চর্য্যাতে ও আয়ুর্ব্বেদানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন; বিশেষতঃ তাহার জন্মবৈচিত্র ও আয়ুর্ব্বেদীয় অসামান্য প্রতিভা তাহাকে সহজেই মৌনব্রতে প্রণোদিত করিয়াছিল। গৃহী হইয়াও তিনি সংসারে নিতান্ত বীতস্পৃহ ছিলেন। তাহার এইরূপ সহজ বৈরাগ্য অপনয়নমানসে ব্রহ্মার অনুরোধে ভরদ্বাজ গালব প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিবর্গ তাঁহাকে কাশীরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু যাহার জীবন মানবজাতির মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, তিনি রোগসন্তপ্ত মনুষ্যের নিদারুণ যন্ত্রণায় মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেন, তাহার জীবন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইবার নহে। তিনি নামে মাত্র কাশীপতি রহিলেন, তাহার সমস্ত সময় আয়ুর্ব্বেদ অনুশীলনেই পর্য্যবসিত হইত। কাশীর আশ্রমে বসিয়া তিনি বহু শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিতে লাগিলেন। সমাগত শিষ্যমণ্ডলীকে তিনি শরীরবিজ্ঞানে বক্তৃতাদ্বারা উপদেশ দিতেন। শিষ্যগণ যথোচিত যত্নসহকারে তদুপদেশ সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়া স্মরণসৌকর্য্যার্থে এক এক খানা সংহিতার প্রণয়ন করেন। বারাণশীর আশ্রমে তিনি ১০০ শিষ্যকে উপনীত করেন। তিনিই প্রথমতঃ মানবশরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া শরীরস্থানের ব্যাখ্যা করেন ও শিষ্যদিগকে তদর্থে যত্নবান্ হইতে আদেশ করেন। (১)

(১) তস্মান্নিঃসংশয়ংজ্ঞানংহর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতংদেহং দ্রষ্টব্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়ঃ॥
প্রত্যক্ষতোহিযদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চযদ্ভবেৎ।
সমাসত স্তদুভয়ং ভূয়োজ্ঞানবিবর্দ্ধনম্॥

তিনি প্রকৃষ্ট যুক্তিসহকারে শল্য তন্ত্রের মুখ্য প্রয়োজনীয়তা ও অপরাপর অঙ্গের অপেক্ষা ইহার প্রাধান্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। * যাহা হউক, যে মহাত্মার সংহিতায় আমরা এক্ষণ ধন্বন্তরির উপদেশ পাঠ করি, তাহার কৃতিবিবরণকালেই আমরা অমৃতাচার্য্যের অন্যান্য উপদেশ সংক্ষেপে বিবৃত করিব। সম্প্রতি আদি বৈদ্যের সময়সম্পর্কে কএকটি কথা বলিয়া এই অংশের উপসংহার করিতে চাই।

ধন্বন্তরি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিরাকরণ করা বড় সুকঠিন। প্রাচীন সংস্কৃতের যত গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে বেদসংহিতার পরই মনুর প্রাচীনত্ব ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, মনু খৃঃ জন্মের ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তিনি ধন্বন্তরির নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তিনি অম্বষ্ঠের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক, পরে দৃষ্ট হইবে যে, ধন্বন্তরি কোন শরীরীমনুষ্যের নাম নহে, পুরাণকর্ত্তারা কল্পিতস্বর্গবৈদ্যের ধন্বন্তরি-উপাধিই অম্বষ্ঠকে প্রদান করেন। সুতরাং আদিবৈদ্য মনুরও পূর্ব্ববর্ত্তী। মনু যে বংশের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সেই বংশ অন্ততঃ ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। অন্যথা ব্যবহারশাস্ত্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার নামোল্লেখ করিতেন না। একটি লোকের বংশপরম্পরা যেপরিমাণে অধিকসংখ্যক হইলে তাহা সমাজের একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, সেপরিমাণ হইতে অন্যূন ২০০।৩০০ বৎসর গত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং অম্বষ্ঠবংশের আদি পুরুষ অন্ততঃ খৃঃ জন্মের ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ধন্বন্তরির এই সময় আমরা ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতানুসরণ করিয়া নির্ব্বাচন করিলাম। কিন্তু এলফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতি যে যুক্তিমার্গে গমন করিয়া মনুর সময় নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। তিনি স্বয়ংই বলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন খৃঃ জন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন। পরাশর তাহার পিতা; সুতরাং তিনিও অবশ্য ঐ কালের পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং যে মনুর প্রাধান্য, প-

তস্মাচ্ছমস্তগাত্রমবিষোপহত মদীর্ঘায়ুধিপীড়িতমবর্য শতিকং নিঃসৃষ্টমূত্রপুরীষপুরুষমবহস্যামাপগায়াং নিবদ্ধংপঞ্জরস্থং মুঞ্জবল্কলকুশশণাদীনামন্যতমেনাবেষ্টিতাঙ্গম প্রকাশে দেশে কোথয়েৎ। সম্যক্ প্রকুথিতঞ্চোদ্ধৃত্য ততোদেহং সপ্তরাত্রাদুশীর বালবেণুবল্কলকূর্চানামন্যতমেন শনৈঃ শনৈরবধর্ষয়ং স্তগাদীন্ সর্ব্বানেব লক্ষয়ে চ্চক্ষুষা।

* শল্যাঙ্গমঙ্গেরপরৈ রুপেতং প্রাপ্তোঽস্মি গাংভূয় ইহোপদেষ্টুম্ সর্বেষু আয়ুর্ব্বেদতন্ত্রেষু এতদেবাধিকমভিমতং যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিপ্রণিধানাৎ আশু ক্রিয়াকরণাৎ সর্ব্বতন্ত্র সামান্যাচ্চ। সৌশ্রুতে।

রাশর, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই মনু যে কেমন করিয়া ৯০০ খৃঃ পূঃ আবির্ভূত হইবেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সুতরাং বেদের সংগ্রহকাল হইতে গণনা করিলে অশ্বত্থের কাল ১৪০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে আসিয়া পড়ে।

এস্থলে এলফিনষ্টোন্ ও মার্শমেন্ প্রভৃতি ভারতইতিহাসলেখকদের বেদের সংগ্রহকাল নির্ব্বাচনসম্পর্কেও দুই একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। বড় লোকের ভুল অনুসন্ধান আমাদের ধৃষ্টতা ; পাঠক মাপ করিবেন।

ইহাঁরা বলেন যে ' প্রত্যেক বেদেই জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি অংশ আছে। ইহাতে Solsticial বিন্দুর যে অবস্থান আছে, খৃঃ জন্মের ১০০০ বৎসর পূর্ব্বেও তাহাদের ঐ অবস্থান ছিল। * সুতরাং বেদ বিভাগ ঐ সময়ে ঘটিয়াছিল। এই গণনার বল কত, পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইহা অন্ততঃ দুটি স্থাপনার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবেক যে, বেদের ঐ গণনা দ্বৈপায়নের সমকালবর্ত্তী কোন ব্যক্তি করিয়াছিলেন ; দ্বিতীয়তঃ সূর্য্যের কর্কট রাশিতে গমন (Solsticial Point) একাধিক সময়ে ঘটিতে পারে না। অনেকেই জানেন যে ঐ চক্রেরও গতি আছে। সুতরাং খ্রীঃ জন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যেস্থানে (Solsticial) বিন্দু ছিল, ঐ চক্রের সম্পূর্ণ একবার আবর্ত্তনে যত সময় লাগে, তৎপূর্ব্বেও তাহাদের সেই অবস্থান ছিল। তিনি কেন যে এরূপ কষ্টকল্পনার বশবর্ত্তী হইলেন, অথচ রাজতরঙ্গিণীর নির্দ্দিষ্ট কুরুপাণ্ডবদের সময় হইতে দ্বৈপায়নের সময় নির্ব্বাচিত করিলেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ রাজতরঙ্গিণীর নির্ব্বাচিত কুরুপাণ্ডবের সময়ের সহিত কালিদাসকৃত জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থের সহিত সাম্যতা দেখাযায়। তদনুসারে বেদবিভাগ অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ের ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

ধন্বন্তরিসম্পর্কে পুরাণ ও ভাবপ্রকাশের মতদ্বৈধ আছে। ভাবপ্রকাশ একখানা পরবর্ত্তী সংগ্রহ। গ্রন্থকর্ত্তাকে আমরা জানি না, কেহ কেহ বলেন ভাবমিশ্র ইহার প্রণেতা। যাহা হউক, ভাবপ্রকাশ বলেন ধন্বন্তরি বাহুজ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সুশ্রুত প্রভৃতি শত শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাদেন। তিনি দিবোদাস ও কাশীরাজ নামে খ্যাত। * এমত

* But the decisive argument is that the place assigned to the Solsticial points in the treatises is that in which those Points were situated in the 14th Century before Christ. Elphinstone's History of India. Append

* অধীতাচাযুষো বেদ মিশ্রাদ্ধন্বন্তরিঃ পুরা। আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং জাতো বাহুজবেশ্মনী। নাম্নাতু সোহভবৎ খ্যাতো

অবস্থায় আমরা কোন্ কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। যদি হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিচার করিতে যাই তবে অবিচলিত চিত্তে পুরাণই মানিতে হইবেক, কারণ আদৌ শ্রুতি, তৎপর স্মৃতি, ও তৎপর পুরাণই প্রামাণ্য। যাহা হউক এবংবিধ অনৈক্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়া আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই দেখা যাউক।

বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে কাশীরাজগোত্রে ধন্বন্তরি নামে একজন রাজা ছিলেন। ভাবপ্রকাশকার বোধ হয় তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এবং পুরাণোল্লিখিত ধন্বন্তরির অলৌকিক জন্মবৃত্তান্তে অনাস্থা হওয়াতেই তাদৃশ বিবরণ লিখিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণোক্ত ক্ষত্রিয় ধন্বন্তরিকে বৈদ্যধন্বন্তরি গ্রহণ করিলে কতকগুলি গোলযোগ আসিয়া পড়ে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও চরক ঐ ধন্বন্তরির পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি, ক্ষত্রিয়রাজা ধন্বন্তরি হইলে চরক কোন মতেই স্ব-পুনঃসংস্কৃত অগ্নিবেশসংহিতাতে ধন্বন্তরির মতগ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু চরকসংহিতাতে ধন্বন্তরির মত গ্রহণ দৃষ্ট হয়। * বিশেষতঃ যদি বিষ্ণুপুরাণোক্ত বংশাবলী গ্রহণ করা যায়, তবে ধন্বন্তরির দিবোদাস নাম অসঙ্গত হইয়া উঠে। কাশীরাজের পৌত্র ধন্বন্তরি নামে এক রাজা ছিলেন; বিষ্ণুপুরাণে তাহার নামান্তর দিবোদাস উল্লিখিত নাই। কিন্তু ধন্বন্তরি-প্রপৌত্র দিবোদাস নামে একরাজা ছিলেন। সুতরাং সুশ্রুতগুরু ধন্বন্তরিকে ক্ষত্রিয় ধন্বন্তরি গ্রহণ করিলে এও আর একটি অসঙ্গতি হইয়া উঠে। কারণ, ইহার কাশীরাজ আখ্যা সঙ্গত হইলেও দিবোদাস নাম সঙ্গত হইয়া উঠে না। অপিচ, যদি আয়ুর্বেত্তা ধন্বন্তরি ক্ষত্রিয়সন্তান হইতেন, তবে সৌশ্রুতায়ুর্ব্বেদে তাঁহাকে নিমিত্তান্তর ভূমিপ বলিয়া কীর্ত্তিত † হইত না। রাজত্বই ক্ষত্রিয়ের সহজ ব্যবসায়; বিশেষতঃ কাশীরাজ পৌত্রজাতীয় ব্যবসায় ও উত্তাধিকারীত্ব উভয় সূত্রেই রাজা। সুতরাং, এ আর একটি তৃতীয় দোষ আসিয়া পড়ে।

দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ। বালএব বিরক্তোহভূচ্চচার সুমহত্তপং। যত্নেন মহতা ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোন্নৃপম্। * *

বিশ্বামিত্র মুনিস্তেষু পুত্রং সুশ্রুমুক্তবান্। তত্রনাম্না দিবোদাসঃ কাশীরাজোস্তি বাহুজঃ। সহিধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্ব্বেদবিদাংবরঃ। * * * ভাবপ্রকাশঃ।

* সর্ব্বাঙ্গনিবৃত্তি যুগপদিতি ধন্বন্তরিস্তু তদুপপন্নং সর্ব্বাঙ্গানাং তুল্যকালানিবর্ত্তিত্বাৎ * *। চরকে।

† সর্ব্বামরগুরুঃ শ্রীমান্ নিমিত্তান্তরভূমিপঃ। শিষ্যায়োবাচ নিখিলমিদং বিপ্রধিলক্ষণম্॥ সৌশ্রুতে।

নিশীথ-চিন্তা।

আশার ছলনা।

"আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিনু,
হায়! তাই ভাবি মনে।"

এই তৃষিত মেদিনী যেমন আজি আশামাত্র অবলম্বনে আকাশের পানে চাহিয়া রহিয়াছে, এবং আশা করিয়া সহস্রগুণে অধিকতর ক্লেশ পাইতেছে; আমার এই মরুময় দগ্ধ হৃদয়ও সেইরূপ আশাপথপানে ঊর্দ্ধনয়নে চাহিয়া আছে, এবং হায়! আশার আশ্বাসপ্রদ মধুরকণ্ঠে বিশ্বাস করিয়াই জীবনে এত যন্ত্রণা ও এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। এ আশা কি মৃগতৃষ্ণিকা?

আশা ছিল জ্ঞানার্ণবে সাঁতার দিয়া সুখী হইব,—জ্ঞানের অনুস্তল পর্য্যন্ত দর্শন করিবার জন্য এপ্রাণ মন বিসর্জ্জন করিব। কিন্তু আমার সে আশা কি আর সফল হইবে? যে জ্ঞানে এতদিন আমার এত অনুরাগ ছিল, সেই জ্ঞানে এইক্ষণ আমার বিরাগ। বুদ্ধি আরও কি জ্ঞানের অনুসরণ করিয়া বিড়ম্বিত হইতে চাহিবে?—জ্ঞান আর অজ্ঞান সমান কথা, অন্ধকার আর আলোক এক। হে জ্ঞানাভিমানি ধীর! তুমি কি ইহা অস্বীকার করিতে পার? তোমার জ্ঞানে তুমি কি পাইয়াছ?—না নৈরাশ্যের অন্ধতম অবিশ্বাস,—অন্ধকারের শূন্যতা। তুমি এই শূন্যময় অন্ধকারে কোন্ প্রাণে আর কিরূপে নিরালম্ব অবস্থান করিবে?—তোমার ঐ জ্ঞান সমুদ্রের অতলজলে ডুবাইয়া দেও। জ্ঞানী সে, যে অজ্ঞান;—জানে সে, যে জানিতে চাহে না। তুমি জানিতে যাইয়াই, জানিতে পাইলে না। আমিও এই জন্যই আর জানিতে চাহি না। আমার মন বহুদিনের চিন্তাশ্রমে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া এইক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, জ্ঞান আর অজ্ঞান সমান কথা, অন্ধকার আর আলোক এক। ঐ যে বায়ু, কখনও মৃদু হিল্লোলে, কখনও ঝঞ্ঝাবেগে, প্রবাহিত হইতেছে, জান আর উহার প্রস্রবণ কোথায়?—এই যে আলোক, চক্ষুর সম্মুখীন হইয়া গতিপথ প্রদর্শন করিতেছে জান উহা কি? কোন্ সময় হইতে কালের আরম্ভ, আর কোথায় গিয়া দেশের শেষ সীমা? সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিয়া যাই। কিন্তু সৌন্দর্য্য এমন সুন্দর কেন? এবং চিত্তই বা কেন উহার জন্য লালায়িত

হয় ? জগতে অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য প্রাণ লইয়া, ভোগ্যবস্তুর জন্য চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত রহিয়াছে, এবং ভোগতৃষ্ণার পরিতৃপ্তিতে সুখে উৎফুল্ল, অথবা অভাবজন্য দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতেছে। এই প্রাণ আর সুখ দুঃখ, সমস্তই কি স্বপ্নলীলা নহে ? হায় ! এই সকল সামান্যতত্ত্বের অন্ত পাই না ; যাহা অসামান্য, তাহা আমি কিরূপে জানিব ?

তবে কি জ্ঞানে সুখ ? শৈশবের সরলা বুদ্ধি একথাই মানিয়া লইত। কিন্তু প্রতারণার পর প্রতারণায়, বিড়ম্বনার পর বিড়ম্বনায়, বুদ্ধির সে সরলমতি বিনষ্ট হইয়াছে। উহা এইক্ষণ আর এ সকল কথায় ভুলিয়া যায় না। জ্ঞানে যদি সুখ তবে সংসারে অসুখ আর কি ? কোন্ জ্ঞানী এই অবনীমণ্ডলে সুখী হইয়াছে ?

যাহার চক্ষু ফোটে নাই, যে সংসারে আজও কিছু দেখে নাই, কিংবা দেখিবার জন্য উৎসুক হয় নাই, সেই দুঃখের হলাহলকে সুখের অমৃতধারা বলিয়া পান করে, কালকূটময়ী ভুজঙ্গীকে চন্দন-লতাজ্ঞানে কণ্ঠহার করিয়া লয়, বিপদকে সম্পদ বলিয়া আলিঙ্গন দেয়, এবং বারুদগৃহে শয়ান হইয়াও সুখে নিদ্রা যায়। কি নিশ্চিন্ত নির্ভরের ভাব ! কি অনির্ব্বচনীয় শান্তি ! কিন্তু যাহার চক্ষু, পূর্ণ দৃষ্টিতে বঞ্চিত রহিয়াও, একটুকু একটুকু দেখিতে শিখিয়াছে, আলোক কি তাহা না জানিয়াও আলোকের আভামাত্র দর্শনেই অতৃপ্তির অন্তর্দাহে উন্মাদিত হইয়াছে, ঐ শান্তি আর ঐ নির্ভরের ভাব আর কি তাহার অন্তরে অবস্থান করিতে পারে ? জ্ঞানেই বেদনা এবং বেদনাই সমস্ত দুঃখের বীজ। যে দুঃখ হইতে দূরে রহিতে চাহে, সে যেন প্ররোচিত পতঙ্গের মত জ্ঞানের শোভাময়ী বহ্নি-শিখায় ঝাঁপ দিয়া গিয়া না পড়ে ! মনুষ্যের হৃদয় নিভৃত নির্জ্জনে এবং স্বপ্নে ও জাগরণে, সর্ব্বদাই অতি গোপনে বিলাপ করে। কিন্তু সেই বিলাপের সার কথা কি ?—না, হায় ! কেন দেখিলাম, হায় ! কেন জানিলাম, হায় ! কেন অন্ধকার ছাড়িয়া আলোর জন্য প্রধাবিত হইলাম ! কি যোগী, কি ভোগী, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেরই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ঐ অপরিস্ফুট বিলাপধ্বনি। আমরা যে সকল সময়ে উহা শুনিতে পাই না, সে কেবল সংসার-চক্রের আবর্ত্তকোলাহলে। ইহার পরও কি আশা করিব যে, জ্ঞানে আমার সুখ হইবে, এবং সেই আশায় আমি অধীর রহিব ? সুখী আমার ঐ অজ্ঞান মনু। উহার হাতে তোমরা জ্ঞানের নিষিদ্ধ ফল তুলিয়া দিও না। ঐ যে অবোধ, পৃথিবীর কোন ভাবনা না ভাবিয়া, কোন তত্ত্ব না জানিয়া, ধূলায় পড়িয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছে, উহাকে ক্ষণকাল ঐ নিদ্রা-সুখ ভোগ করিতে দেও। যদি আশার ছলনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, মনুষ্য বুদ্ধির দুরধিগম্য অজ্ঞের জ্ঞান-তত্ত্বের জন্য

উন্মাদগ্রস্ত না হইতাম, তাহা হইলে হয়ত আমিও আজি উহার মত ধূলি শয্যার পড়িয়া থাকিয়াই কুসুমাস্তীর্ণ দেবশয্যার সুখানুভব করিতাম, এবং আশাভঙ্গের অরুন্তুদ বেদনা হইতে মুক্ত রহিয়া, আপনাকে আপনি সুখী বলিতাম। কখনও ইহা কহিয়া পরিতাপ করিতাম না,—

"কেন আশা ছলিলি আমায় ?"—

আশাছিল, গৃহবাসে থাকিয়া হৃদয়ের সকল তৃষ্ণা পূর্ণ করিব,—মনুষ্যকে ভাল বাসিব এবং মনুষ্যের ভালবাসা আকণ্ঠ পান করিয়া, তৃপ্তির পরিপূর্ণতায় কৃতার্থ হইব। এ আশা বাল্যে প্রথম বিকশিত হইয়াছে, যৌবনে প্রমত্ত স্ফূর্ত্তিতে ক্রীড়া করিয়াছে, এবং আজি বার্দ্ধক্যের শীতসমাগমে সঙ্কুচিত হইয়া, আমাকে দূর হইতে অতি ক্ষীণ স্বরে যেন 'না না' বলিয়া হতাশ করিতেছে। হৃদয়! পৃথিবীর গৃহবাস যে নিরয়নিবাসের পূর্ব্বচ্ছবি, তাহা কি তুমি এখনও অনুভব করিতে সমর্থ হও নাই ? যেখানে মনুষ্য সর্পের মত মনুষ্যকে দংশন করে, জলৌকার মত মনুষ্যের শোণিত শোষণ করে, এবং শক্তি থাকিলে বজ্রের মত মনুষ্যকে আক্রমণ করে, তুমি কি এখনও সেই গৃহবাসের জন্য লালায়িত ? যেখানে প্রাতঃসময়ের কুসুম প্রীতি, প্রাতঃকালীন পদ্মকান্তির ন্যায়, ক্ষণকালমাত্র নয়ন বিনোদন করিয়া, সন্ধ্যা না হইতেই শুষ্ক ও মলিন হয়,—অদ্যকার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ কল্যই অকৃত্রিম শত্রুতাতে পরিণতি পায়, ক্লিওপেট্রা কৈশোরের গ্রাসে এণ্টনীকে বলিস্বরূপ উপহার দিয়া আপনার প্রাণ লইয়া আপনি পলায়ন করে এবং অরঙ্গজীবের মত পুত্রও পুণ্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া সকলের পূজা পাইয়া থাকে, তুমি কি সেই গৃহবাসের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত ? যেখানে স্বার্থসেবার নাম সংসার-হিতৈষণা, ধর্ম্ম লইয়া বাণিজ্যের নাম ধর্ম্মপ্রচার, যশঃস্পৃহার কণ্ডূয়নের নাম অধ্যাত্ম-উদ্দীপনা এবং পরপীড়নের নাম পৃথিবীর মঙ্গল-সাধন, তুমি কি অদ্যাপি সেই গৃহবাসের জন্য আকুলিত ?

গৃহবাস কি ? পার্থিব গৃহবাস প্রায় সকলের পক্ষেই বনবাস! বনে ব্যাঘ্র ভল্লুক; গৃহে হিংসা দ্বেষ। হায়! যখন দেখিয়াছি যে, পুত্রশোকাতুরা জননী, এই মুহূর্ত্তে পুত্রের জন্য আর্ত্তনাদ করিয়া, পর মুহূর্ত্তেই পুত্রের ত্যজ্য সম্পত্তির জন্য প্রতিবেশী কি বিধবা পুত্রবধূর সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্তা হইয়াছে, আমি তখনই বলিয়াছি পৃথিবীর এ গৃহবাসে সুখের আশা বৃথা। যখন দেখিয়াছি যে, ভ্রাতা ভ্রাতার বক্ষে আঘাত করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় দেখিয়াছে, ভগিনী বিষয়-বাসনার তৃপ্তির নিমিত্ত ভ্রাতৃবিয়োগের দিন গণনা করিয়াছে এবং প্রাণাধিক প্রিয়তমা প্রেম-বিহ্বলা ভার্য্যা প্রভুত্বের নূতন মদিরা পানেই নববৈধব্যের সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছে, আমি তখনই

বলিয়াছি, পৃথিবীর এ গৃহবাসে সুখের আশা বৃথা। যখন দেখিয়াছি যে, মনুষ্য যে তরুর ছায়া অবলম্বন করিয়া দগ্ধদেহ শীতল করিয়াছে, সেই তরুরই মূলোচ্ছেদে যত্ন পাইয়াছে, যে হস্ত রোগ, শোক কি বিপদের সময়ে তাহার মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়াছে, সেই হস্তই সে বিষদন্তে দংশন করিয়াছে, এবং কৃতজ্ঞতা, এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া, মনুষ্যনিবাস হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ও ত্রাহিরবে পলাইয়া যাইতেছে, আমি তখনই বলিয়াছি, পৃথিবীর এ গৃহবাসে সুখের আশা বৃথা। যখন দেখিয়াছি যে, লোকে দেবতার অঙ্গে ধূলি কর্দ্দম দিয়া, পিশাচের পদধূলি লইয়া অঙ্গে মাখিতেছে, বিপন্ন মহত্ত্বের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, পাপপঙ্কে নিমগ্ন পাপাত্মা সম্পদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভক্তের মত দলবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে, এবং দিনকে রাত্রি, সত্যকে অসত্য এবং আলোককে অন্ধকারে পরিণত করিয়া কুটিলবুদ্ধির কূট অভিসন্ধি সম্পূরণ করিতেছে, আমি তখনই বলিয়াছি, পৃথিবীর এগৃহবাসে সুখের আশা বৃথা। যখন দেখিয়াছি যে, যাহার জন্য বিরলে বসিয়া অশ্রুপাত করিয়াছি, সে বিরলে বসিয়া অভিসম্পাত করিয়াছে, যাহাকে দেখিবার জন্য আকুল হইয়া নিকটে গিয়াছি, সে দেখা দিতে না হয় এজন্য বিরাগভরে দূরে গিয়াছে, এবং যাহাদিগের জন্য ভিকারী বনিয়াছি, করে মুষ্টিমিত ভিক্ষান্ন তুলিয়া দিতেও পরিশেষে তাহারা কৃপণ ও কাতর হইয়াছে, আমি তখনই সহস্রজিহ্বায় বলিয়াছি যে, পৃথিবীর এগৃহবাসে সুখের আশা বৃথা।

তবে কেন পড়িয়া রহিয়াছি?—আশা তুমিই এই প্রশ্নের উত্তর দাও। মনুষ্যকে ত্যাগ করিয়াও তুমি ত্যাগ কর না এবং মনুষ্যের প্রলুব্ধ প্রাণ পুনঃ পুনঃ তোমায় পরিত্যাগ করিয়াও একেবারে তোমায় পরিত্যাগ করিতে পারে না। দীপ নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তথাপি আশা আছে, আবার উহা জ্বলিয়া উঠিবে,—হৃদয় তুষানলে ভস্ম হইয়া যায়, তথাপি আশা করি, আবার উহা অমৃতরসে সিক্ত হইবে। আশার কণ্ঠধ্বনি এমনই উন্মাদিনী!

ঐ শুন আশার মোহন মুরলী এই গম্ভীর নিশীথে কি অপূর্ব্ব মাধুরীতে নিনাদিত হইতেছে এবং সেই মৃদুমোহনমধুরলহরী, নিদ্রা-মৃত মনুষ্য-হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া, মনুষ্যকে কিরূপ আকুল, উৎফুল্ল এবং উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। ঐ বিরহবিধুরা দুঃখিনী, অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণায় অন্তরে জর্জ্জরিত হইয়া, নিদ্রার আবেশে দীনবেশে পড়িয়া রহিয়াছে, আশা তাহার কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে কহিতেছে, 'নিদাঘের পর বারিধারা, দুঃখের পর সুখ'। ঐ যে ক্ষীণকলেবর সুন্দর যুবা, জীবনসংগ্রামে অবসন্ন এবং জীবনের সমস্ত উদ্যমে ব্যর্থ হইয়া, আছে কি নাই এইভাবে নিপতিত দৃষ্ট হইতেছে, আশা তাহার কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে কহিতেছে, 'অন্ধকারের পর

জ্যোৎস্না, দুঃখের পর সুখ'। ঐ যে অ-ধীনস্বত্ব অভিমানী পুরুষ, পৃথিবীতে পৌ-রুষ ও প্রতিভার বিড়ম্বনা এবং নীচতা ও ক্ষুদ্রতারই পরিপুষ্টি দেখিয়া, অপমানের বিষদাহে নিদ্রার মধ্যেও পুনঃ পুনঃ প্রতপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, আশা তাহার কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে কহিতেছে,—'শী-তের পর বসন্তশ্রী, দুঃখের পর সুখ'। আর ঐ যে জগদগ্রগণ্যা, জগন্মান্যা 'মলিনমু-রতি' ভারতলক্ষ্মী, অযোধ্যায় রামলক্ষ্মণকে সরযুর জলে ভাসাইয়া দিয়া, হস্তিনার ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণার্জ্জুন এবং তাহাদের পৃষ্ঠপূ-রক অক্ষৌহিণী কুরুক্ষেত্রের শ্মশানানলে ভস্ম করিয়া, রাজপথের কাঙ্গালিনীর মত আজি এই ঘোর যামিনীতে ভারত-শ্মশানে পরিভ্রমণ করিতেছেন,—সেই শোভা নাই, সেই মহিমা নাই—তথাপি সেই পু-রাতন গৌরবের ছটায় গর্ব্বিত রহিয়া, অ-ন্ধকারে পাগলিনীর ন্যায় কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, আশা, ভয়ে ভয়ে, ভীত-পদবিক্ষেপে, তাঁহারও সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, ভীতি-রুদ্ধ অস্ফুটস্বরে কহিতেছে,—

'রাত্রির পর প্রভাতসূর্য্য,
দুঃখের পর সুখ।'

(উদাসীন)

বিজ্ঞাপনী

১।

চাই

একখানি পরশ পাথর,—

যাহা ছুইলে তামা, কাঁসা, পিতল প্রভৃতি সমস্ত বস্তু সোণা হয়,—বিষন্ন মন প্রসন্ন হইয়া উঠে, জরাজীর্ণ ভগ্নদেহে চির-যৌবন ও চির-বসন্ত বিরাজ করে, এইরূপ একখানি অমূল্য পাথর। বিনা মূল্যে পাইলে ক্রয় করিতে ইচ্ছা আছে।

২।

চাই

একটি উত্তমা স্ত্রী চাই।

একজন অল্পবয়স্ক অরসিক বৃদ্ধের জন্য অতি বড় ভাল একটি ভার্য্যা চাই।

কথায় অকথায় ঝঙ্কার না দেন, বর্ষা-কালীন মেঘের মত সর্ব্বদাই মুখ ভার ক-রিয়া বসিয়া না থাকেন, কল্পদ্রুদয়া পিতা-মহীর মত আমোদ প্রমোদে সকল সম-য়েই ভারমুখে তিরস্কার না করেন, ছোট

খাট একটি মুরব্বি অথবা আধুনিক পাদ-রীদিগের মত সানুনাসিক স্বরে লেক্‌চার দিতে অগ্রসর না হন, এবং গোবিন্দপুরের গোস্বামিনীদিগের মত আলতামাখা পা দুখানি সম্মুখে প্রসারণ করিয়া তাহাতে পুষ্পাঞ্জলি দিতে না বলেন, এইরূপ একটি যারপর নাই ভাল, অমৃতময়ী অবলা চাই।

তাঁহার কণ্ঠস্বর, কোকিল কণ্ঠের মত উন্মাদ, ভ্রমরগুঞ্জনের মত নিদ্রাপ্রদ, এবং ত্রিতন্ত্রীর মৃদুলহরীর মত সুললিত না হইলেও, স্নেহরসসিক্ত মধুর হইবে,—অর্থাৎ তিনি যখন বালক বালিকাদিগের উপর গর্জ্জিয়া উঠিবেন, তখন যেন আমার কষ্টলব্ধ নিদ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া না যায়, এবং তিনি যখন প্রতিবেশিনীদিগের সহিত ভৈরবীর মত বাহুতাড়নসহকারে বিবাদ করিতে প্রবৃত্তা হইবেন, আমার এই চিন্তাকাতর প্রাণ যেন তখন ভয়ে না চমকিয়া উঠে।

তাঁহার হৃদয় ধুতুরার মত ধবল, নবনীতের মত কোমল এবং পারিজাত পুষ্পের মত পৃথ্বীদুর্ল্লভ না হইলেও উহাতে অন্ততঃ গোলাপের সৌন্দর্য্য ও গোলাপের সৌরভ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ আমি যেন সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর গৃহে আসিয়া হিংসার তুষানলে জর্জ্জরিত এবং নীচতার অসহ্য দুর্গন্ধে ক্লিষ্ট না হই;—আর লোকে যে স্বর্গলাভের জন্য এত তপস্যা ও এত সাধনা করে, আমার এই অলস আত্মা যেন বিনা তপস্যায় ও বিনা সাধনায় স্বগৃহে বসিয়াই সেই সুদূর স্বর্গের পূর্ব্বস্বাদ প্রাপ্ত হয়।

অপিচ, তাঁহাতে অভিমানের মোহন মাধুরী থাকিবে, কিন্তু অহঙ্কারের মদগর্ব্ব থাকিবে না;—সংসারের উপযোগিনী সুতীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধি থাকিবে, কিন্তু বিষয়ীর জঘন্য সংসার-লিপ্সা কোন মতে স্থান পাইতে পারিবে না। তিনি কবি না হইলেও কল্পনার লীলাময়ী সহচরীর ন্যায় চিত্তবিনোদিনী হইবেন; ভাগীরথী গঙ্গার ন্যায় গভীরসলিলা না হইলেও, নিত্য নূতন তরঙ্গে তরঙ্গময়ী রহিবেন; এবং সুখে সোহাগ, দুঃখে শান্তি, জ্ঞানে শিষ্যা, প্রেমে গুরু, এবং সম্পদে শোভা ও বিপদে বল স্বরূপ হইয়া, জ্যোৎস্না ও অন্ধকার সকল সময়েই—হৃদয়ের সান্নিধ্যে, হৃদয়ের হৃদয় মধ্যে অবস্থান করিবেন।

পৃথিবীর ধন মান বৈভবে,—অর্থাৎ কাচ কাঞ্চন তাম্র রজতে তাঁহার অনুরাগ থাকিলে পোষাইবে না। কারণ, আমি পোদ্দার কি দোকানদার নহি। এবং তিনি ক্ষুদ্র-সুখ-লোলুপা বিড়ালাক্ষী বণিগ্‌বধূ অর্থাৎ কটাচক্ষুশালিনী বেণে বৌ হইলেও আমার চলিবে না। কারণ, আমি একমাত্র মহত্ত্বেরই উপাসক। তাঁহাকে লইয়া মুদী কি বেণের ব্যবসায় অবলম্বন করা আমার অভিপ্রেত নহে।

পরন্তু তাঁহাতে ধার্ম্মিকার ভাণ ও ভ্রুকুটি থাকিবে না, কিন্তু ধর্ম্ম থাকিবে;—

প্রেমিকার আবিলতা থাকিবে না, কিন্তু প্রেমের প্রমত্ত প্রবাহ থাকিবে;—এবং পাণ্ডিত্যের ঘনঘটা থাকিবে না, কিন্তু বিদ্যার বিনোদ কান্তিতে প্রকৃত অনুরাগ থাকিবে।

যদি কেহ এইরূপ একটি অবলারত্নের সংবাদ পাইয়া থাকেন, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর নিকট সারস্বতাশ্রমের ঠিকানায় ব্যারিং পত্র লিখিবেন। মূল্য,—চিরজীবনের জন্য একজন সরলপ্রাণ মনুষ্যের মনঃপ্রাণ,—সর্ব্বস্ব।

৩

অর্থপুস্তক ! !

অর্থপুস্তক ! অর্থপুস্তক ! অর্থপুস্তক !

প্রথমভাগ বর্ণপরিচয়ের প্রথম পরিচ্ছেদের অর্থপুস্তক।

ইহাতে স্বরের অ আ, এবং ক খ প্রভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণের এবং কট মট খট ঘট প্রভৃতি কঠিন শব্দ সমূহের অর্থ অতি বিশদ ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।—সুকুমারমতি শিশুদিগের বিশেষ উপযোগি,—বঙ্গবিদ্যালয় সমূহে বিশেষ ব্যবহারের উপযুক্ত এবং বিজ্ঞ বিজ্ঞ ডিপুটীইন্‌স্পেক্টর বাবুদিগের দ্বারা বিশেষ রূপে প্রশংসিত। মূল্য চারিআনা মাত্র। যাহার প্রয়োজন হয়, তিনি ঢাকা, বাবুর বাজার ছি ছি আই আই বানরজী এণ্ড কোর শিশুগ্রাসিনী নামক সুপ্রসিদ্ধ লাইব্রেরীতে পত্র লিখিবেন। কেহ এক সঙ্গে ২৫ খণ্ডের অধিক ক্রয় করিলে, শতকরা সোয়াশত টাকা হিসাবে কমিসন পাইবেন।

গ্রন্থকারস্য।

৪।

কুন্তলবৃষ্য বৃকভানুনন্দিনী।

আশ্চর্য্য তৈল ! আশ্চর্য্য তৈল !

প্রতিশিশী একটাকা। পেকেট খরচ পাঁচসিকা। ইহা একমাসকাল মস্তকে ব্যবহার করিলে চল্লিশের অনধিক বয়স্ক অকালপক্ক বৃদ্ধের শ্বেত কেশ ‘নিবিড় কৃষ্ণ’ কালো হয়, এবং আধ-বৃদ্ধা আধ-যুবতী, ভ্রূকুটিময়ী ভামিনীদিগের ‘ভ্রমরকৃষ্ণ’ চূর্ণকুন্তল শঙ্খ কি তুষারেরমত শাদা হইয়া যায়। কলিকাতা, পাটুয়াটুলী জাতীয় স্বাধীনতার মেডিকেল ডিপজিটেরীতে প্রাপ্তব্য।

৫।

প্রেম-জ্বর-হর-গজেন্দ্র-কেশরী বটিকা।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত মহা মহৌষধ !

ইহার ৩টি মাত্র বটিকা সেবনে একাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও সাপ্তাহিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ প্রেমজ্বর একবারে বিনষ্ট হয়। বহুদিনের পুরাতন পৈত্তিক প্রেম এবং তৎসংক্রান্ত জ্বালা ও গাত্র দাহ

প্রভৃতি উপসর্গ সকল সম্পূর্ণরূপে বিলোপ পায়,—আর অতি বড় কঠিন ও সাধারণতঃ চিকিৎসার অসাধ্য মেলেরিয়ার প্রেমও এই বটিকা সেবনে উম্মূলিত হইয়া যায়। কলিকাতা, বটতলা, গোবিন্দচন্দ্র কবিভূষণ কিংবা কবিরাজ চূড়ামণি দাশরথি রায়ের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য প্রত্যেক বটিকা পাঁচপয়সা মাত্র।

৬।

সাহিত্য বিকাশিনী লাইব্রেরী।

ঢাকা, তাঁতিবাজার, ১২ নং বাটী।

মুখরজী এবং কো কর্ত্তৃক সংস্থাপিত।

আমাদিগের দোকানে নিম্নলিখিত নূতন পুস্তক সকল বিক্রয়ার্থ আগত হইয়াছে।

রাই-রঙ্গ-তরঙ্গ-ভঙ্গি-বিলাসিনী নাটক।
ব্রজেন্দ্র-চন্দ্র-জীমূত-মন্দ্র-গর্জ্জিনী নাটক।
প্রত্নকত্র নন্দিনী।
স্পেলিঙের কি (?)
ফাষ্টবুকের কি (?)
থার্ডবুকের অর্থপুস্তকে কি (?)
দুরন্ত-বসন্ত-কৃতান্ত-শান্তকারিণী নাটক।

ঘুমের ঔষধ।

অব্যর্থ! অব্যর্থ! অব্যর্থ!

আবু গওহরের আবিষ্কৃত,—

পারস্যের শৈলাধিপতি কর্ত্তৃক,

প্রথম ব্যবহৃত,

মস্টিকুষ্টের পরীক্ষিত,

কমলাকান্তের চির-বাঞ্ছিত, চিরসেবিত।

বিনামূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে।

অঘুমন্তের ঘুম হয়,
অলসের আলস্য যায়,
অকবি কবিত্ব লাভ করে,
আকাশের চাঁদ হাতে আসে,
আঁধার ঘরে তারা ফোটে।

যিনি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়া সকলকে উম্মাদিত করিতে চান, এই ঔষধ তাঁহার জন্য। যিনি ভাষার স্রোতে তরঙ্গ তুলিয়া, পাল উড়াইয়া, চলিয়া যাইতে চাহেন, এই ঔষধ তাঁহার জন্য। যিনি ঝিনুক দিয়া সমুদ্র সেচিতে ইচ্ছা করেন, এই ঔষধ তাঁহার জন্য। যিনি নীরবজগতে ঝিল্লিরব শুনিতে অভিলাষী হন, এই ঔষধ তাঁহার জন্য। যিনি কমলাকান্ত শর্ম্মার মত ঝিমিয়া ঝিমিয়া রসের কথা লিখিতে ভাল বাসেন, এই ঔষধ তাঁহার জন্য। আর, যিনি বয়সে বৃদ্ধ হইলেও হৃদয়ে চিরযৌবন

পুষিয়া রাখিতে আকাঙ্ক্ষী, এই অমোঘ অমূল্য ঔষধ তাঁহার জন্য।

শ্রীঅমৃতকান্ত বসু
উদয়পুর পোষ্টআফিশ হইয়া,
বিনোদগঞ্জের বঙ্গবিদ্যালয়।

৮

নূতন নাটক।

রসের চটক।

না মিষ্টি না টক।

অতি চমৎকার রচনা।

একজন অত্যতিবিখ্যাত কবিকর্ত্তৃক বিরচিত।

ইহাতে

ভ্রমরের গুন্ গুন্, ভোমরার ভন্ ভন্,
কোকিলের কুহু কুহু, উকীলের আহা উহু,
বিরহীর দশ দশা, বসন্তের মাছি মশা,
মারামারি কাটাকাটি, ধরাধরি ঝাঁটাঝাঁটি,
জাতি যুতি ফুল
পাপিয়া বুল্ বুল্
প্রভৃতি।

উৎকৃষ্ট নাটকের সমস্ত উপকরণ আছে।
মূল্য অল্প, মূল্য নগদ, মূল্য এক টাকা।

কলিকাতা, ভবানীপুর, রামদাস শর্ম্মার ভারত উদ্ধার নামক ভারতবিখ্যাত ডাক্তরখানায় প্রাপ্তব্য।

৯।

কর্ম্মখালি।

কুশধ্বজপুরস্থ রাজবাটীর প্রধান চাটুকারের পদ অল্প দিন হইল খালি হইয়াছে। বেতন মাসিক ১২৫৲টাকা। যিনি এই পদে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে নিম্নলিখিত কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইবে।—

১। কর্ত্তার একটি ত্রিলোক বাছা অলোক-সামান্য ছেলে আছে। উহার আকৃতি ছোট একটি ভল্লুকের মত। প্রকৃতি মর্কটের মত,এবং কণ্ঠস্বর ঠিক একটি দীর্ঘশ্মশ্রু অজের মত। প্রধান চাটুকার ঐ বালককে দণ্ডে দশবার সজলনয়নে ও গদ্গদ বচনে দশরথের রামচন্দ্র এবং নন্দের গোপাল হইতেও উৎকৃষ্ট বালক বলিয়া সকলের কাছে ব্যাখ্যা করিবেন; যখন ঐ কম-কান্তি কার্ত্তিকের স্কুলের ছেলেদের কাগজ কি কেতাব চুরি করে, হালুই দোকানের মিঠাই লইয়া দৌড় দেয়, অথবা প্রতিবেশী কোন বালকের উপর অকারণ অত্যাচার করে,তখন তিনি যাহার কেতাব কি কাগজ চুরি গেল, দৌড়িয়া তাহাকে মারিতে যাইবেন,—যাহার মিঠাই অপহৃত হইল, তাহাকে দণ্ড করিবার জন্য দেওয়ানকে অনুরোধ করিতে থাকিবেন, এবং পাড়ার যে বালক বিনাকারণে লাথী কীল খাইল, তাহার চৌদ্দ পুরুষকে উচ্চৈঃস্বরে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

২। কর্ত্তার একখানি অতি কদর্য্য পুরাণ গাড়ি আছে, সে খানিকে তিনি লাট সাহেবের আট ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা সুন্দর বলিবেন;—কর্ত্তা মধ্যে মধ্যে কপিঝম্প তালে, ঋষভ রাগে বিরহের টপ্পা গাইয়া থাকেন, তখন তিনি নরম মু-

দিয়া ফোটা ফোটা অশ্রুজল ফেলিবেন,—আর কর্ত্তার একটি গৃহপ্রতিষ্ঠিতা পিশাচী আছে, সেটিকে তিনি ধর্ম্মের ভগিনী বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন।

৩। কর্ত্তা আপনার বিদ্যা প্রকাশের জন্য মধ্যে মধ্যে বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র লইয়া সভাস্থ অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের সহিত তর্ক করিয়া থাকেন। যিনি দুঃসাহসে ভর করিয়া তর্কে কর্ত্তাকে পরাভব করেন, প্রধান চাটুকার, সমক্ষে তাঁহার প্রতি আরক্ত লোচনে চাহিয়া থাকিয়া, পরোক্ষে তাঁহাকে খ্রিস্টান ও মূর্খ বলিয়া গালি দিবেন;—এবং কর্ত্তা যদি গ্রীষ্মাতিশয্যেও একটু শিরঃপীড়া অনুভব করেন, তাহা হইলে তিনি, ডাক্তার ও কবিরাজ মহলে এক হট্‌গোল ঘটাইয়া, সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকিবেন। তাঁহার উপদেশ মতে সে দিন স্কুল, আফিশ, ডাক্তার খানা, ও হাট বাজার বন্ধ থাকিবে।

বলা বাহুল্য যে, যিনি এইরূপ প্রথম শ্রেণীর কর্ত্তাভজা নহেন, তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। শ্রীবিলাসরঞ্জন রায়।

১০

নিবেদন।

যিনি একঘণ্টার মধ্যে স্বকীয় মনোমন্দিরে জীবাত্মার আবির্ভাব অনুভব করিয়া, দুইঘণ্টার মধ্যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তিনি আমার নিকট পেইড্ পত্রদ্বারা সবিশেষ লিখিবেন, এবং সেই পত্রের সহিত আধআনা মূল্যের একটাকার ডাকের টিকিট পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীগিরিজাকান্ত গুহ।
সাং জানকীপুর।

১১।

কোন্দলের বীজ।

আশ্চর্য্য চীজ।

তন্ত্রমতে মন্ত্রপূত তামার তাবিজ।

হিংসুকের কটা চক্ষু, কেউটে সাপের দাঁত,
নিন্দুকের জিহ্বা আর ইন্দুরের আঁত;—
সাত সতিনের শাদা চুল, শেঁউতি ফুলের কাঁটা,
সাত পুকুরের পচা জল, শ্বেতকরবীর আঁটা,
শকুনের নখ আর বোলতার হুল;
অমাবস্যার রাত্রে তোলা রক্তজবা ফুল।

এই সমস্ত বস্তু মন্ত্রসংস্কৃত হইয়া উক্ত তাবিজে আছে। যে সকল গৃহলক্ষ্মীরা ইহা ব্যবহার করিতে চাহেন, তাঁহারা, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে রাত্রি ঠিক্ দুই প্রহরের সময়, পেঁচার ডাকে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবেন;—এবং অঘাট আঁধি পুকুরের জলে, এলোচুলে একডুবে স্নান করিয়া, আর্দ্র আঁচলের সুতাদিয়া ইহা কণ্ঠে ধারণ করিবেন। এই তাবিজ কুমিল্লার জেলায় মেহারের কালীবাড়ী, শ্রীমদ্‌ভৈরবগিরি মোহন্ত ঠাকুরের নিকট মন্ত্রশোধনের জন্য একবোতল সামগ্রী মাত্র পাঠাইয়া দিলেই পাওয়া যায়।

১২

খট্টাঙ্গপুরাণ ত্রয়োদশ স্কন্ধ

বিনামূল্যে বিতরণ।

ডাকমাশুলও দিতে হইবে না।

যাঁহার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি পাকেট খরচ প্রভৃতি অপরিহার্য্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মাত্র ১০৲ টাকার একখানি বেঙ্ক নোট পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীঅদ্ভুতচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।
—— সাং পঞ্চকরণ।

১৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য, শতবার দেখিতব্য,

অতি নূতন উপন্যাস।

অতি পুরাতন গীত।

"কাব্য কথা।"

মূল্য বার্ষিক ৩।৶ আনা মাত্র।

ইহার বিজ্ঞাপনে লেখা আছে "যাঁহাদিগের নিকট বান্ধবের হাল বকেয়া মূল্য বাকি, তাঁহারা দয়ার অনুরোধে, দাক্ষিণ্যের অনুরোধে, এবং দয়া ধর্ম্ম না থাকিলে ভদ্রতার অনুরোধে, তাহা পাঠাইয়া দিবেন। ইহাতে কোনমতে,—লৌকিক কি অলৌকিক কোন হেতুতে বিলম্ব না হয়।—যাঁহারা এতদিন বান্ধবের মিত্র ছিলেন, তাঁহারা প্রেমের অনুরোধে ইহার গাঢ়তর মিত্র হইবেন;—যাঁহারা এতদিন বান্ধবের শত্রু ছিলেন, তাঁহারা আমাদিগের মিনতি বিনতি প্রণতি অথবা বাঙ্গালির একতা এবং বাঙ্গলার উন্নতির অনুরোধে, এইক্ষণ ইহার মিত্র হইয়া দাঁড়াইবেন। আর যাঁহারা বান্ধবের গ্রাহক নহেন, তাঁহারা নূতন বৎসরে নূতন গ্রাহক হইয়া নিজেরা কৃতার্থ হইবেন, এবং আমাদিগকেও চরিতার্থ করিবেন।"

সমালোচনা।

১। "কবি-কাহিনী। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।" শব্দে কবিতার শরীর গঠন, ছন্দে উহার ভঙ্গি কিংবা গতির ঠাম, কিন্তু ভাবগত রসই উহার প্রাণ। নিম্নলিখিত পদাবলীতে কবিতার শব্দ আছে ও ছন্দ আছে, কিন্তু প্রকৃত কবিতা নাই। যথা—

"আয়লো আলি, সবায় মিলি
কুসুম তুলি, মনের সুখে।"

অথবা—

"বকুল বনে, আকুল মনে
দুকুল উড়ায় গোকুল চোরে।
বাজলো বাঁশী, গলায় ফাঁসি,
ঘরে আসি কেমন ক'রে॥"

এইরূপ ললিত পদাবলীতে শ্রুতিরঞ্জন হয়, কিন্তু মানব-হৃদয়ের অন্তস্তল কখনও স্পৃষ্ট কিংবা আলোড়িত হয় না। বাঙ্গালি, দুর্ভাগ্যবশতঃ, তরলমতি বালিকাদিগের মত, এইরূপ পদাবলীরই ভক্ত এবং এই নিমিত্তই এদেশে ঈশ্বরগুপ্ত ও হরিশ মিত্র প্রভৃতি ললিতপদ-ব্যবসায়িদিগের এত আদর ছিল। আর এক শ্রেণীর পাঠক ললিত পদ অপেক্ষা পদ-বিন্যাসের মুন্সিয়ানা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। তাঁহারা "আয়লো আলি কুসুম তুলি" শুনিবার জন্য অধীর হন না, এবং বকুল বনেও দুকূল উড়াইতে ভাল বাসেন না। তাঁহাদের রুচি 'নিপট কপট শঠ লম্পট ঝম্পটে।' দাসুরায় তাঁহাদিগের কালিদাস, গোবিন্দ অধিকারী তাঁহাদিগের জয়দেব এবং বর্ত্তমান কালের যাত্রাওয়ালাবর্গ তাঁহাদিগের কবিসম্প্রদায়। এই তিন শ্রেণীর পাঠক রবীন্দ্রনাথের কবি-কাহিনীতে অণুমাত্রও সুখানুভব করিবেন না। কিন্তু যাঁহারা শব্দ ও ছন্দ অপেক্ষা কাব্যগত ভাবেরই সমধিক আদর করেন, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালা ভাষার নূতন একখানি আভরণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ইহাতে যথার্থই কবিতা আছে। যে কবিতা ঘনান্ধ নভোমণ্ডলে দামিনীর মত রূপের ছটায় নয়ন ধাঁধা দেয়, রবীন্দ্রনাথের লেখায় সে কবিতা দৃষ্ট হইবে না। যে কবিতা প্রগল্‌ভা রসিকার মত আপনার ভারে আপনি ঢলিয়া পড়ে, ইহাতে তাহার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে না। কিন্তু যে কবিতা, শিশির-সিক্ত কমল-কলির মত কথা না কহিয়াও মনুষ্য-হৃদয়ের সহিত নীরবে কথোপকথন করে;—যে কবিতা ফোটে ফোটে হইয়াও ফোটে না, অথচ অপরিস্ফুট সৌন্দর্য্যে মনঃ প্রাণ কাড়িয়া লয়, এই কবি-কাহিনীর প্রায় সর্ব্বত্রই সেইরূপ প্রীতিময়ী পবিত্র কবিতা সুরুচিসম্পন্ন পাঠকের চিত্তবিনোদন করিবে। এদেশের কত সহস্র কবিই ভালবাসা প্রসঙ্গে কত সহস্র কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু কবি-কাহিনীতে অতি অল্প কএকটি পংক্তিতে ভালবাসা কিরূপ বর্ণিত ও সুচারুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করুন।

"একি দেবি কলপনা, এতসুখ প্রণয়ে যে
আগে তাহা জানিতাম না ত!
কি এক অমৃতধারা ঢেলেছ প্রাণের পরে
হে প্রণয় কহিব কেমনে?
অন্য এক হৃদয়েরে হৃদয় করা গো দান,
সে কি এক স্বর্গীয় আমোদ।
এক গান গায় যদি, দুইটি হৃদয়ে মিলি
দেখে যদি একই স্বপন,
এক চিন্তা এক আশা, এক ইচ্ছা দুজনার
একভাবে দুজনে পাগল,
হৃদয়ে হৃদয়ে হয়, সে কি গো সুখের মিল,
এজনমে ভাঙ্গিবেনা তাহা।
আমাদের দুজনের হৃদয়ে হৃদয়ে দেবি,
তেমনি মিশিয়া যায় যদি—

একসাথে এক স্বপ্ন দেখি যদি দুইজনে
তা হইলে কি হয় সুন্দর !
নরকে বা স্বর্গে থাকি,অরণ্যে বা কারাগারে
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা হয়ে—
কিছুভয় করি নাকো—বিহ্বল প্রণয়ঘোরে
থাকি সদা মরমে মজিয়া !
তাই হোক্—হোক্ দেবি আমাদের দুইজনে
সেই প্রেম এক কোরে দিক্।
মজি স্বপনের যোরে, হৃদয়ের খেলা খেলি
যেন যায় জীবন কাটিয়া।"

পুনশ্চ,

"নিশীথে একেলা হোলে, এইরূপ কতগান
বিরলে গাইত কবি বসিয়া বসিয়া।
সুখ বা দুখের কথা, বুকের ভিতরে যাহা
দিন রাত্রি করিতেছে আলোড়িত প্রায়,
প্রকাশ না হোলে তাহা, মরমের গুরুভারে,
জীবন হইয়া পড়ে দারুণ ব্যথিত।
কবি তার মরমের প্রণয় উচ্ছ্বাস কথা
কি করি যে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া।
পৃথিবীতে হেন ভাষা নাইক, মনের কথা
পারে যাহা পূর্ণভাবে করিতে প্রকাশ।
ভাব যত গাঢ় হয়, প্রকাশ করিতে গিয়া,
কথা তত নাহি পায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
বিষাদ যতই হয়, দারুণ অন্তর্ ভেদী
অশ্রুজল তত যায় শুকায়ে যেমন !"

বাবু রবীন্দ্র নাথ প্রকৃতির শোভা বর্ণনেও প্রশংসনীয়। গ্রন্থারম্ভে মহা প্রকৃতির যে একটি স্তোত্র রহিয়াছে, তাহা উচ্চ শ্রেণীর কবিযোগ্য না হইলেও মনোহর ; কিন্তু আমরা সেটি উদ্ধৃত না করিয়া, হিমাচল বর্ণনার আরম্ভভাগ নিম্নে তুলিয়া দিলাম। যাহাদিগের চক্ষু আছে, এবং হৃদয়ে প্রকৃতির প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি আছে, তাঁহারা এই বর্ণনা পাঠ করিয়া মোহিত হইবেন।

"কি সুন্দর সাজিয়াছে ওগো হিমালয়,
তোমার বিশালতম শিখরের শিরে
একটি সন্ধ্যার তারা ! সুনীল গগন
ভেদিয়া, তুষার শুভ্র মস্তক তোমার !
সরল পাদপরাজি আঁধার করিয়া
উঠেছে তাহার পরে ; সে ঘোর অরণ্য
ঘেরিয়া হুহুহু করি তীব্র শীত বায়ু
দিবানিশি ফেলিতেছে বিষণ্ণ নিশ্বাস !
শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল
অস্তমান তপনের আরক্ত কিরণে
প্রদীপ্ত জলদ-চূর্ণ। শিখরে শিখরে
মলিন হইয়া এল উজ্জ্বল তুষার,
শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল
আঁধারের যবনিকা ধীরে ধীরে ধীরে !
পর্ব্বতের বনে বনে গাঢ়তর হোল
ঘুমময় অন্ধকার। গভীর নীরব !
সাড়া শব্দ নাই মুখে অতি ধীরে ধীরে
অতি ভয়ে ভয়ে যেন চলেছে তটিনী
সুগম্ভীর পর্ব্বতের পদতল দিয়া !
কি মহান্ ! কি প্রশান্ত ! কি গম্ভীর ভাব
ধরার সকল হোতে উপরে উঠিয়া
স্বর্গের সীমায় রাখি ধবল জটায়
জড়িত মস্তক তব, ওগো হিমালয়,
নীরব ভাষায় তুমি কি যেন একটি
গম্ভীর আদেশ যেন করিছ প্রচার !

সমস্ত পৃথিবী তাই নীরব হইয়া
শুনিছে অনন্য মনে সভয়ে বিস্ময়ে।
আমিও একাকী হেথা রয়েছি পড়িয়া,
আঁধার মহা-সমুদ্রে গিয়াছে মিশায়ে,
ক্ষুদ্রহোতে ক্ষুদ্র নর আমি, শৈলরাজ!
অকূল সমুদ্রে ক্ষুদ্র তৃণটির মত
হারাইয়া দিগ্বিদিক্, হারাইয়া পথ,
সভয়ে বিস্ময়ে হোয়ে হত জ্ঞান প্রায়
তোমার চরণ তলে রয়েছি পড়িয়া।
উর্দ্ধমুখে চেয়ে দেখি ভেদিয়া আঁধার
শূন্যে শূন্যে শত শত উজ্জ্বল তারকা,
অনিমিষ নেত্রগুলি মেলিয়া যেন রে
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।
ওগো হিমালয়, তুমি কি গম্ভীর ভাবে
দাঁড়ায়ে রয়েছ হেথা অচল অটল,
দেখিছ কালের লীলা, করিছ গণনা,
কালচক্র কতবার আইল ফিরিয়া!
সিন্ধুর বেলার বক্ষে গড়ায় যেমন
অযুত তরঙ্গ, কিছু লক্ষ্য না করিয়া,
কতকাল আইলরে, গেল কতকাল
হিমাদ্রি, তোমার ওই চক্ষের উপরি।
মাথার উপর দিয়া কত দিবাকর
উলটি কালের পৃষ্ঠা গিয়াছে চলিয়া।
গম্ভীর আঁধারে ঢাকি তোমার ও দেহ
কতরাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে পোহায়ে
কিন্তু বল দেখি ওগো হিমালয় গিরি,
মানুষ-সৃষ্টির অতি আরম্ভ হইতে
কি দেখিছ এই খানে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে?
যা'দেখিছ যা'দেখেছ, তাতে কি এখনো
সর্ব্বাঙ্গ তোমার গিরি,উঠেনি শিহরি?'

বাঙ্গালা কবিতার পঙ্কিল জলে এইরূপ নির্ম্মল পুষ্প কি প্রীতি-প্রদ। ইহাতে সৌন্দর্য্য আছে, অথচ সে সৌন্দর্য্যে কোন অংশেও রুচির বিকার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে সৌরভ আছে, অথচ সে সৌরভে কোন অংশেও মানসিক স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা নাই। ভাষা ইহার কোথাও শোভা বর্দ্ধনের জন্য কৃত্রিম কারুকার্য্যে বিভূষিতা হয় নাই; এবং ভাব-লহরী ক্ষীণসলিলা পয়স্বিনীর ক্ষীণলহরীর মত, যার পর নাই মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইলেও,কোন স্থানে প্রাণ-শূন্য হইয়া পড়ে নাই। এইরূপ নির্ম্মল কবিতায় অনুরাগ জন্মিলে বঙ্গীয় কাব্যশাস্ত্রের অধোগতি না হইয়া উপকার হইবে, এবং যাঁহারা কবিতায় ইদানীং বীত-স্পৃহ, তাঁহাদিগের শুষ্ক মনেও কাব্যে পুনরায় প্রীতির সঞ্চার হইতে থাকিবে।

কবি-কাহিনী-রচয়িতা অমিত্রাক্ষর পদ্য রচনায় মাইকেলের ন্যায় সর্ব্বত্র মিল্টনের অনুসরণ এবং হেম বাবুর ন্যায় সংস্কৃত কবিদিগের ছন্দানুবর্ত্তন না করিয়া, কোন কোন স্থানে কিয়ৎপরিমাণে এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। যদি তাঁহার কবিতা সুন্দর না হইত, তাহা হইলে এইরূপ পদ্য কাহারও নিকট ভাল লাগিত না। কিন্তু তাঁহার পদ্য যেমনই কেন না হউক. উহা কবিতার গুণে উদ্ধার পাইয়া গিয়াছে।

২। "নিশীথচিন্তা। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।" কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবু এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি বান্ধবসম্পাদককে উপ-

হার দিয়া, বান্ধবের সহিত আমরা কে যে ব্যক্তি সংসৃষ্ট আছি, আমাদিগের সকলকেই নিতান্ত বাধিত করিয়াছেন। ইহার লেখা নিন্দনীয় হইলেও সামাজিকতার অনুরোধে প্রশংসা করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য হইত। কিন্তু বড়ই আহ্লাদের বিষয় যে, আমাদিগকে এইরূপ হৃদয়শূন্য সামাজিকতা করিতে হইবে না। সুযোগ্য সাধারণীসম্পাদক যেরূপ বলিয়াছেন যে, "এখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে" আমরাও সেইরূপ নির্ম্মুক্তচিত্তে বলিতে পারি যে, বস্তুতঃই এখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার রচনা রাজকৃষ্ণ বাবুর অন্যান্য রচনা অপেক্ষা অধিকতর গাঢ় এবং অলঙ্কারবিন্যাসে স্থানে স্থানে দোষ লক্ষিত হইলেও ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব নিতান্ত সুন্দর। আমরা নিম্নে ষষ্ঠ ও সপ্তম এই দুইটিমাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। বোধ হয় অনেকেই এই দুইটি কবিতায় মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের মিশ্রণ দেখিয়া পুলকিত হইবেন। কিন্তু নিশীথচিন্তার প্রায় সমস্ত কবিতাই এইরূপ মধুর ও গম্ভীর।

৬—"পরিশ্রান্ত বিশ্ব এবে ঘুমে অচেতন
চলে না সংসার-চক্র—অনড়—অচল।
অন্ধকার-জলে সবি হ'য়েছে মগন;
মায়াবলে স্বর্গ যেন ঘোর রসাতল।
কিংবা হেন বোধ হয়, এ-ভাব দেখিয়া,
জগৎ-সৃজন-পুর্ব্ব-কল্পিত-সময়;
ছিল না এ বিশ্ব-মূর্ত্তি; কেবল ডুবিয়া
আছিল শূন্যতা-তমে ঘোর তমোময়।
হইলেও হ'তে পারে—কেনই না হ'বে,
কল্পনাই যেইকালে সকলি প্রসবে?

৭—অহো, কি অচিন্ত্য দৃশ্য নিশীথ সময়ে,
সাগর, ভূধর, আর মরুভূ, কানন
একাকার একভাবে; বসুধা-হৃদয়ে
নিপুণ নটের কি এ পট-আবর্ত্তন?
কোথায় সে দিবসের ঘোর কোলাহল?
কোথায় সে তরু-শাখে বিহঙ্গের ধ্বনি?
কোথায় সে বিভাময় নীল নভস্তল?
কোথায় সে তমোহর দীপ্ত দিনমণি?
দিবসে উজ্জ্বল আলো—নিশীথে আঁধার,
সুখের পরেতে ঠিক্ দুঃখের সঞ্চার।"

৩। "নাট্যসম্ভব। উপরূপক। বঙ্গ রঙ্গভূমিতে অভিনয়জন্য শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।"—সত্য কথা বলিতে কি, নিশীথচিন্তার উচ্চতার পর এই সাড়ে সাইত্রিশ পংক্তির নাট্যসম্ভব আমাদিগের নিকট ভাল লাগে নাই। ইহার লেখা প্রাঞ্জল বটে, কিন্তু ঐ প্রাঞ্জলতা মাত্রই উহার গুণ। এই নাট্যসম্ভবে শচীবিরহ-কাতর ইন্দ্রের দুঃখে কাহারও দুঃখ বোধ হয় না, এবং নাটক রচনার আদিগুরু বাণীগুণগায়ক ভরতমুনি ইন্দ্রকে যে ভাবে সান্ত্বনা দিতেছেন, তাহাতেও কাহারও চিত্তে কোনরূপ সহানুভূতির সঞ্চার হয় না। "ভরত ইন্দ্রকে দেখিয়া বিস্মিতচিত্তেবলিতেছেন"--

"দেবরাজ, কেন আজ হেন সাজ দেখি হে?
মুখ তুলে, কও খুলে, কেন এত দুখী হে?"

এইরূপ কবিতা বাসর ঘরের বিলাসিনীদিগের মুখেই শোভা পায়। ভরত

মুনির মুখে, অমরাধিপতি দেবাদিদেব ইন্দ্রের প্রতি সম্ভাষণে এইরূপ কবিতা বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ অসুরাপহৃতা শচীর বিরহে ইন্দ্র তখন হৃদয়ে যেমন জর্জ্জরিত, তেমনই আবার অপমানের অরুন্তুদ যন্ত্রণায় অন্তরের অন্তস্তলে আহত। এদিকে ভরত মুনিও নাকি "বিস্মিতচিত্ত।"

ইহার পর অমরাবতীর ইন্দ্রসভা। সেই ইন্দ্রসভায় নাটকাভিনয়ের কি হইল?—না—কতকগুলি নর্ত্তকী আসিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ভেবা গঙ্গারাম ইন্দ্র তাহাতেই শচীর বিরহ এবং শত্রুর পদাঘাত ভুলিয়া গেলেন এবং ভরত যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কহ সুর! দুখ দূর হইল কি না হইল?"
ইন্দ্রও তেমনই হাবা ছেলের মত উত্তর করিলেন,—

"অবশ্য মানিব সুখ—হৃদিমনে প্রবাহিল।"

৪। "বীণা।—নানা বিষয়িণী কবিতাপ্রসবিনী মাসিক পত্রিকা। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত।" বীণা বিবিধ-সুরে, বিবিধ তালে এক বৎসর কাল নানাবিধ গীত গাইয়া আর এক বৎসরে প্রবেশ করিল। নিরন্তর কবিতা বর্ষণ করিতে গেলে নিরন্তর পুষ্প বর্ষণ হয় না। কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে যে, 'অবসর সরোজিনী' প্রভৃতি কাব্য রচনা দ্বারা রাজকৃষ্ণ বাবু যে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা উপার্জ্জন করিয়াছেন, বীণায় তাহার অপচয় হয় নাই। বীণা নিতান্ত খর্ব্বায়তনা হইয়াছে। ইহার আকার পরিবর্ত্ত হইলে ভাল হয়।

৫। "কৌমুদী।—বিবিধ সঙ্গীত ও নানাবিষয়িণী কবিতা বিকাশিনী মাসিক পত্রিকা। শ্রীরুক্মিণী কান্ত ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" কৌমুদী উপেক্ষার বস্তু নহে। ইহাতে যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই প্রশংসার্হ। বীণা অপেক্ষা কৌমুদীর লেখা সাধারণতঃ অধিকতর গভীর, কিন্তু কৌমুদীতে পরকীয় লেখার যে পরিমাণ অনুকরণ দৃষ্ট হয়, বীণায় তাহা হয় না। বিগত ফাল্গুণের কৌমুদীতে কম্পানিয়া নামক কবিতার আরম্ভ এইরূপ,—

"দ্বিতীয় প্রহর নিশি; নীরব অবনী;
নিবিড় জলদ পূর্ণ গগণ মণ্ডল;
বিকাশি ভুবন-দীপ্তি—হাস্য-বিমোহিনী
খেলিছে জলদ প্রান্তে বিজলী চঞ্চল!
যেন রোম-লক্ষ্মী পশি ভবিতব্য গেহে,
দেখিলা বিষাদবর্ণে ভবিষ্য চিত্রিত!"

এই বর্ণনাটির প্রথম চারি পংক্তি নিতান্ত সুন্দর। কিন্তু সুন্দর হইলেও উহা পড়িবার সময়ে লেখকের কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা প্রিয়তম নবীন চন্দ্রকে স্মরণ করিয়াছি। শেষ দুই পংক্তিতে অলঙ্কার ও অর্থের কিরূপ অন্বয় হইল, তাহা আমরা বুঝি নাই।

কৌমুদীও বীণার মত বর্ষ কাল অতিক্রম করিয়া বর্ষান্তরে প্রবেশ করিতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, গুণ-গ্রাহী (?)

গ্রাহকদিগের দয়ার ক্রটিতে ইহার তিষ্ঠি-বার স্থান এখন পর্য্যন্তও দৃঢ় হইতেছে না। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার অনুরাগী, তাঁহারা কৌমুদীতে আর কোন উপকার লাভ না করুন, ইহার সরস মধুর পদাবলীতে অবশ্যই প্রীতি লাভ করিবেন ;—এবং যাঁহারা ভূতপূর্ব্ব রবিনসনের আইন কানুন ও হাইকোর্টের নজীর মাত্র পড়িয়া বাঙ্গালায় 'মূর্ত্তিমান্' হইয়াছেন, তাঁহারা কৌমুদীর কবিতা পড়িলে ভাষা-শিক্ষা-বিষয়ে নিশ্চয় উপকৃত হইবেন। ভাবে কৌমুদী অনেক স্থলে অনুকারিণী হইলেও, ভাষায় অনুকরণীয়া।

আমরা নিদর্শনের জন্য আশ্বিনের কৌমুদী হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। বোধহয় এরূপ রচনা বহুলোকের হৃদয়-গ্রাহিণী হইবে।

"এস বঙ্গ-গৃহ লক্ষ্মি!—ফুল্লেন্দু-বদনা!
নিসর্গপুষ্করজাত হৈম মৃণালিনি!
কজ্জল চর্চ্চিত চারু—বিলোললোচনা!
বঙ্গ হৃদি-পিঞ্জরের স্বর্ণ বিহঙ্গিনী!"
"কেন ভূমি-তলে অই লুটাও অঞ্চল!
উঠাও উঠাও দেবি! উঠাও উহায়!
অই মাত্র বাঙ্গালির জীবন সম্বল;
যাতনা নিস্থত-অশ্রু মার্জ্জন উপায়!"

অন্যত্র,

"প্রকৃতি-বিনোদ-চিত্র!—নিসর্গের খেলা।"
দেখিতে দেখিতে প্রাণ হইল অবশ;
চিন্তার বিদ্যুৎ বেগ—রুধির ফুটিয়ে
হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্রে,—হইল চঞ্চল!
মরমের তন্ত্রচয়, একতানে হ'ল লয়,
গভীর সঙ্গীত ধ্বনি সহসা জাগিল,
"কে আমি?"—এ মহাধ্বনি ধ্বনিত হইল!'

৬। "কামিনী কুঞ্জ। গীতিকাব্য। জাতীয় নাট্যশালার নিমিত্ত,—শ্রীগোপালচন্দ্র মুখপাধ্যায় প্রণীত।" এই কামিনী কুঞ্জের বিষয় ব্রজবিলাসিনী রাধার মানভঞ্জন, গোপাল বাবু ব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়া কেন শেষটায় এই মানভঞ্জনের পালা গাইতে গেলেন, তাহা আমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। ইহার কাহিনী সেই সন্তরশ তিরনব্বই সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহু পূর্ব্বের ব্রজের কাহিনী;—ইহার কথা, সেই যাত্রাওয়ালাদিগের চির-চর্ব্বিত পুরাণ কথা; এবং ইহার রসও সেই বটতলার অতি পুরাতন আদিরস, একদিকে রাধা, আর একদিকে চন্দ্রাবলী,—মধ্যে আমাদিগের পীতবাস শ্রীনিবাস। আশার যামিনী যখন প্রভাত হইয়া আইসে, তখন শ্রীরাধা গাইতেছেন,—

"কৈ এল সই!
আমার শ্যাম গুণমণি?
অস্তাচলে চলে শশী পোহাল রজনী!
শঠ কালাচাঁদ, পাতি প্রেমফাঁদ,
বিষম প্রমাদ, হরিষে বিষাদ, ঘটালে
সজনী।"

এই গীতের সহিত পাঠক গোবিন্দ-অধিকারীর নিম্নোদ্ধৃত গীত তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন।—

"বৃন্দে! কৈলো কৈ

কুঞ্জে এলো শ্রীহরি।
চেয়ে দেখলো,পোহাইল শর্ব্বরী। ইত্যাদি

রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতে কৃষ্ণকমল গোস্বামীই এইরূপ বঙ্গে অদ্বিতীয়। তাঁহার 'নিপট কপট' এবং 'আটি পাটী শাটি বাটীতে' মধ্যে মধ্যে প্রাণান্ত হইলেও, সাধারণতঃ তাঁহার গীত গুলি রসভাবে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণকমলের বিচিত্রবিলাসে যাহা আছে, দুঃখের বিষয় এই যে, কামিনীকুঞ্জে তাহাও আমরা পাইলাম না। যিনি "যৌবনে যোগিনী"ও"পাষাণ প্রতিমা"র রচয়িতা, তাঁহার কেন এই বুদ্ধি,এই মতি? অথবা করকণ্ডূয়নই বর্ত্তমান বঙ্গীয় যুবার প্রধান রোগ'।

৩। "নবাব সেরাজুদ্দৌলা। ঐতিহাসিক নাটক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।" বাঙ্গালা ভাষায় অনেক প্রকারের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিত হইয়া থাকিলেও, আজি পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালি একখানি প্রকৃত নাটক লিখিয়া জাতীয় ভাষার গৌরববর্দ্ধনে সমর্থ হন নাই। এদেশে অনেকেরই এইরূপ ধারণা যে, কথার সহিত কথা গাঁথিয়া কথোপকথনচ্ছলে উপন্যাস লিখিলেই তাহার নাম নাটক, এবং যিনি তাহা লিখিলেন, তাঁহার নাম কালিদাস। দুর্ভাগ্যবশতঃ এইরূপ কালিদাসের সংখ্যা ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান ছাড়িয়া বঙ্গে দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং সেই সকল কালিদাসেরা অহোরাত্র এত নাটক লিখিতেছেন যে, আমরা হতভাগ্য মল্লিনাথেরা এইক্ষণ আর টীকা করিব কি—মূলগ্রন্থ পড়িয়া উঠাই আমাদিগের অসাধ্য হইয়াছে। বাবু লক্ষ্মীনারায়ণের ইহাই যার পর নাই প্রশংসার কথা যে, তিনি বঙ্গের কালিদাস নহেন। বাঙ্গালায় ভাল নাটক না থাকুক, সাহিত্য সমাজ মন্দের ভাল বলিয়া যে কয়খানি নাটককে আদর করিয়াছেন, "সেরাজুদ্দৌলা, সর্ব্বথা তন্মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য;—এবং বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও উপেন্দ্রনাথ দাস যে শ্রেণীর নাটককার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, শক্তি ও ক্ষমতার বহুতারতম্য থাকিলেও, বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী সেই শ্রেণীরই অনতিদূরে আসন পাইবার উপযুক্ত। যদিও আমরা তাঁহার আর কোন নাটক পড়ি নাই; কিন্তু এই একখানি মাত্র পড়িয়াই বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পাইয়াছি যে, তিনি একজন সুলেখক ও সহৃদয় কবি। এইরূপ লোকের আদর হওয়া উচিত।

সেরাজুদ্দৌলার কাহিনী এদেশে প্রায় সকলেরই একপ্রকার কণ্ঠস্থ আছে। মার্শমেনের ইংরেজী ইতিহাস, বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালা ইতিহাস, রাজকৃষ্ণ বাবুর নূতন ইতিহাস এবং আরও অনেকের নানাবিধ ইতিহাসের প্রসাদাৎ সকলেই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের কথার মত ক্লাইব ও সিরাজুদ্দৌলার কথা অবগত আছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু সেই পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত পুরাতন কথাতেও যে নূতনরস ঢালিতে পারিয়াছেন, এবং গ্রন্থখানিকে সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের

পাঠযোগ্য করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার গুণবত্তার প্রচুর-প্রমাণ। তাঁহার লেখা পড়িতে কাহারও বিরক্তি জন্মিবে না, এবং ক্রমশঃ ঔৎসুক্যের বৃদ্ধি হইবে, এবং ইতিহাসের সেরাজুদ্দৌলাকে নাটকের নিপুণ তুলিকায় চিত্রিত দেখিয়া সকলেই নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিবে।

কিন্তু চিত্রে বহুদোষ আছে এবং চিত্র অপেক্ষাও পটে সকলগুলি চিত্রের বিন্যাস বিষয়ে গ্রন্থকারের অধিকতব দোষ প্রকাশ পাইয়াছে! সেরাজুদ্দৌলার পতন এবং সেই পতনের সঙ্গে ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রথম প্রতিষ্ঠা একটি সামান্য ঘটনা নহে। সমগ্র ইতিহাসে না হউক, বোধ হয় আধুনিক ইতিহাসে এইরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ নাই। আমাদিগের নাটককার সেই অসামান্য ঘটনাকে একটি সামান্য ঘটনার ন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন, এবং যে অভিনয়ে ভারতের বর্ত্তমান বিপ্লব, যে অভিনয়ে এসিয়ার বর্ত্তমান পরিবর্ত্ত, গোঁসাইদাস নামক একটি অপমানিত ব্রাহ্মণ এবং সত্যবতী নাম্নী একটি অপহৃতা ব্রাহ্মণ কন্যার হস্তে তাহার মুলসূত্র বাঁধিয়া দিয়া, আর সকলকে অন্ধকারে ফেলিয়াছেন। রাজনগরের মহারাজা রাজবল্লভ, তাঁহার পুত্র কুমার কৃষ্ণদাস, মন্ত্রিমুখ্য মহারাজ মহেন্দ্র রায়দুর্ল্লভ, মাতাব রায়, জগতশেঠ, পাটনার প্রতিনিধি রাজা রামনারায়ণ, এবং অবলা বলিয়া নগণ্যা হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অগ্রগণ্যা অন্নপূর্ণা রাণী ভবানী প্রভৃতি তদানীন্তন প্রধান ব্যক্তিরা যে তমোময় ষড়যন্ত্র করেন, তাহাতেই সেরাজুদ্দৌলা রাজ্যভ্রষ্ট হয়। তাঁহাদিগের অভিমানে আঘাত করিয়া বাঙ্গালার সুবেদার ধনে প্রাণে বিনাশ পায়। কিন্তু আমরা এই নাটকে তাঁহাদিগের কাহাকেও উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত দেখি না। তাঁহারা সকলেই অজ্ঞাত নাম গোঁসাই দাসের করধৃত ক্রীড়া পুতুল এবং গোঁসাইদাসের কৃত্রিম জ্যোতিতে লজ্জায় হীনপ্রভ। গোঁসাইদাস যাহা বলায় তাহা তাঁহারা বলেন, গোঁসাইদাস যাহা করায় তাহা তাঁহারা করেন। নাটকের আদি, মধ্য, অন্ত সর্ব্বত্রই সেই গোঁসাইদাস, অথচ গোঁসাইদাস যে একটা কেমনতর কি, তাহাও নাটকে আমরা ভাল করিয়া দেখিতে পাই না, এবং যে গোঁসাইদাস সমুদ্র লঙ্ঘন, লঙ্কাদাহন এবং সীতা উদ্ধার প্রভৃতি এতকাণ্ড করিল, গ্রন্থকার তাহাকেও একবার ভাল করিয়া দেখিতে ও চিনিতে দিলেন না।

এদিকে নবাবের অন্তঃপুরে গোঁসাই দাসের রূপাভিমানিনী অথচ পতিপ্রেমানুরাগিণী ভার্য্যা, ধর্ম্মশীলা সত্যবতী। সত্যবতীর জন্য মীরণ, মীরণের জন্য মিরজাফর, এবং মিরজাফরের জন্য ক্লাইব। সত্যবতীর ছবিটি অতি সুন্দর হইয়াছে, সত্যবতী যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহা যেন মাধুর্য্যগুণে আমাদিগের কর্ণে একে-

বারে লাগিয়া রহিয়াছে। অমন প্রীতি-মধুর প্রিয়কণ্ঠ একবার শুনিলে, শীঘ্র কেহ ভুলিতে পারে না। কিন্তু হায়! সেখানেও আবার কত্তিমা! আর সেই কত্তিমা কে? না, প্রচ্ছন্নরূপী গোঁসাইদাস। বস্তুতঃ গ্রন্থকার এক গোঁসাইদাসের কথা ও কাণ্ড লইয়াই গ্রন্থের সর্ব্বত্র ব্যাপৃত রহিয়াছেন, এবং গোঁসাইদাসকে ভাবিতে ভাবিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া ক্লাইবের ছবি চিত্র করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন। যেমন কৃষ্ণকথাশূন্য শিশুপালবধ, তেমনই ক্লাইবের কথাশূন্য সেরাজবধ। ক্লাইবের চিত্র সুচারুরূপে ফলিত না হইবায় গ্রন্থের এক অংশই যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এইরূপ অপূর্ণতা ও দোষ আরও অনেক আছে।

কিন্তু অপূর্ণতা ও দোষ সত্ত্বেও এই নাটকখানি প্রশংসাযোগ্য;—রচনা শব্দাড়ম্বরশূন্য অথচ মধুর, বর্ণনা মনোহারিণী, এবং প্রায় সমস্ত অংশই ভাবুকতার পরিচায়ক। শব্দবিন্যাসে অনেক স্থলে ভ্রমপ্রমাদ আছে। যথা;—"সে আপনাকে সমূহ মান্য করে"—"বাঙ্গালির সহাগুণ" ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু গুণের ভাগ অধিক হইলে এ সমস্ত সামান্য দোষ প্রায়শঃ গণনায় আইসে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালায় ভাল নাটক নাই। যে সকল নাটক একদিনে কল্পিত, দুই দিনে লিখিত এবং তিন দিনে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া সমালোচনার জন্য সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়া থাকে, যদি সে গুলি অন্ততঃ এই শ্রেণীর নাটক হইত, তাহাহইলে আমাদিগের ক্লেশের ভার বিস্তর লঘু হইয়া পড়িত। আমরা গ্রন্থগুলি পড়িতে পারিতাম, পড়িলে সমালোচনা করিতেও সক্ষম হইতাম। যে সকল গ্রন্থ পড়িয়া উঠাই এক বিষম যন্ত্রণা, তাহার সমালোচনা করা কিরূপ ব্যাপার তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। সমালোচ্য নাটকখানি সম্বন্ধে এ কথা আমরা পুনরপি বলা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেছি যে, নাটকাংশে ইহার যাহাই দোষ গুণ থাকুক, ইহা একখানি সুপাঠ্য ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ।

৮। "ব্যবস্থা বিজ্ঞান। প্রথমভাগ। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসাখ, বিএ বিএল প্রণীত।"—এই পুস্তক খানি আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে ব্যবস্থা শাস্ত্রের ইতিহাস ও মূলসূত্রসম্পর্কিত অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আছে। ব্যবস্থাশাস্ত্রের ইংরেজী গ্রন্থ পড়া যাঁহাদিগের অসাধ্য, তাঁহারা ইহা পড়িলে উপকৃত হইবেন। যাঁহারা ইংরেজী না শিখিয়া ওকালতি করিতেছেন, এই ঊনপঞ্চাশৎ পৃষ্ঠাত্মক পুস্তক খানিকে তাঁহাদিগের অবশ্যই একবার পড়িয়া ফেলা উচিত।

৯। "গৃহ-চিকিৎসা। প্রথমভাগ। সচিত্র চিকিৎসা সূত্র। শ্রীবসন্তকুমার দত্ত প্রণীত।"—পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাবিজ্ঞানের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এখানির সম্বন্ধেও আমাদিগের প্রায় তাহাই বক্তব্য। অ-

র্থাৎ যাঁহারা ইংরেজীতে হোমিওপেথিক কোন পুস্তক পড়েন নাই, এখানিতে তাঁহাদিগের বিস্তর উপকার দর্শিবে, এবং একটি ঔষধের বাক্স ঘরে থাকিলে গৃহস্থের পক্ষেও এই গ্রন্থ উপকারে আসিবে। আমরা বসন্ত বাবুর অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ দি। হোমিওপেথিতে যদি কিছু সত্য থাকে, তবে তাহা বঙ্গদেশে প্রচার করা কর্ত্তব্য, এবং এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশ সেই প্রচারের অন্যতম পথ।

বিবিধ

আলস্যের পোষকতা।

যে অলস, সে সমাজের গলগ্রহ। তবে তাহার পোষকতা কর কেন? যে অলস, সে পাপের প্রিয়নিকেতন,—পৃথিবীর ভগ্নদন্ত, দুষ্কৃতির মুর্ত্তিমান্ অবতার, পথের কণ্টক, উন্নতির অন্তরায় এবং অনন্ত দোষের আবাসস্থল; তবে তাহাকে প্রশ্রয় দাও কেন?—যখন অকার্য্যই তাহার এক মাত্র কার্য্য, তখন তাহার কার্য্যে আবার অনুরাগ ও উৎসাহ কেন?

জড়পিণ্ড প্রকৃত প্রস্তাবে অলস নহে। কারণ জড়পিণ্ড জড়পিণ্ডের উপর কার্য্য করে, জড়জগতের স্থিতি ও গতি রক্ষা রূপ চিন্তার অগম্য মহান্ ব্যাপারে ব্যাপৃত রহে। উহাকে কে অলস বলিবে? হিমাচল হইতে বালুকণা, অতলবারিধি হইতে বারিবিন্দু,—জড়জগতের এই সমস্ত বস্তুই প্রকৃতির অভিপ্সিত কোন না কোন কার্য্য করিতেছে। উহারা না থাকিলে জগদ্‌যন্ত্র থাকে না,—জগদ্‌যন্ত্র চলে না। সুতরাং উহাদিগের নিন্দা নাই।

পশু পক্ষীও অলস নহে। কবির প্রিয় এবং কাব্যের চির আদরের ধন মধুকর যেমন ফুলে ফুলে বিচরণ করিয়া ফুলের মধু সঞ্চয়ন করে, প্রাণিজগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত জীবই সেইরূপ আত্মদেহ রক্ষার নিমিত্ত অহোরাত্র নানাবিধ চেষ্টায় রহে। কেহই বসিয়া থাকে না। কেহই বসিয়া বসিয়া, কথা মাত্র কহিয়া, আপনার ও পরের সময় ধ্বংস করিবার জন্য সমুদ্রের ঢেউ গণে না। তাহাদিগের নাম ব্যাঘ্র হউক, আর ভল্লুক হউক, বৃথা কেন তাহাদিগকে অপবাদ দিবে?

জগতে আলস্যের অপবাদ যদি কাহাতেও প্রযুজ্য হইতে পারে, তবে তাহা কেবল এক অকৃতী ও অক্রিয়ান্বিত মনুষ্যে। জানি না সমাজ কেন ইহাদিগের ভার বহন করেন।

বঙ্গদেশ ছয়কোটি লোকের বাসভূমি। এই ছয়কোটির মধ্যে অন্ততঃ দুই কোটি লোক আলস্য মাত্র ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালির রক্তশোষণ করি-

তেছে। বৃটিশশাসনাধীন ভারতবর্ষে ন্যূন কল্পে আটকোটি লোক আলস্যে ডুবিয়া, মনুষ্যগণনার বাহিরে গিয়াছে। যদি ইহারা প্রত্যেকে আপনার আহার্য্যসমেত দশটি টাকা উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে বাঙ্গালার সাধারণসম্পত্তিতে বৎসরে বিশ কোটি, এবং ভারতবর্ষের সম্পত্তিতে বৎসরে আশী কোটি টাকা সমাগত হয়। যাঁহারা এদেশের দারিদ্রদুঃখ, অন্নক্লেশ এবং দুর্ভিক্ষের হাহাকারে আকুল হইয়া স্বজাতির জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন, তাঁহারা কি এই গণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন?—যাঁহারা ভারতের উদ্ধার-সাধনের জন্য নবরসের নাটক লিখেন, অথবা কবিতার কোমলকুসুমে মালা গাঁথিয়া ভারতবাসীকে বীর-বেশে বিভূষিত করেন, তাঁহারা কি এই সামান্য কথাটিকে ক্ষণকালের জন্যও মনে আনেন?—ভারতের অকর্ম্মা আট কোটি যদি আশী কোটি টাকা বৎসরে ঘরে আনে, তাহা হইলে বোধ হয়, বিনা নাটক, বিনা নবন্যাস, এবং বিনা কবিতার রসের উচ্ছ্বাসেও ভারতভূমি উদ্ধার পাইয়া যায়,—এবং ভারতভূমি উদ্ধার না পাউক, অন্ততঃ ভারতবাসী উদরে অন্ন এবং অঙ্গে বস্ত্র দিয়া পৃথিবীতে দাঁড়াইবার স্থান পায়। ভারতে কেহই কি যোগতত্ত্ব ছাড়িয়া বিয়োগতত্ত্বের এসকল কথা লইয়া আলোচনা করিবে না?

যে ভারতভূমি রত্নেরখনি এবং কুবেরের ভাণ্ডার বলিয়া ইউরোপে পরিচিত ছিল, এবার সেই ভারতভূমি বিলাতীয় বিজ্ঞলোক ও বণিক্‌দিগের নিকট অন্নের কাঙ্গালিনী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। আমরা যদি আলস্যকেই আমাদিগের পুষ্পশয্যা জ্ঞান করি,—অলস ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জায় ম্রিয়মাণ না হই, এবং দেশের সমস্ত ব্যক্তিকে সমাজের সুদৃঢ় শাসনে বাধ্য করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে পাঠাইয়া না দি, তাহা হইলে বোধ হয় ঐ পুষ্পশয্যাই অচিরে আমাদিগের শবশয্যা হইবে। ভারতবাসী, সাবধান!

পিপিলিকা রাজ্য।

স্যার জে লাবক নামে একজন পণ্ডিত তাঁহার জীবতত্ত্ব নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, পিপিলিকাগণের অবস্থা এবং সামাজিক ব্যবহারের প্রতি অভিনিবেশপূর্ব্বক অনুধ্যান করিলে বোধ হয়, উহারা কোন অংশে সভ্যতার অভিমানী মানবসন্তানগণ হইতে নিকৃষ্ট নহে। পিপিলিকার ক্ষুদ্র সংসার স্নেহ দয়া,আশ্রয়দান, শুশ্রূষা প্রভৃতি সদ্গুণের আধার। উহারা একে অন্যকে সাহায্য করে, পীড়া হইলে আহার বিধান করে, এবং পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া বেড়ায়। লক্ষাধিক পিপিলিকায় এক একটি উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া বাস করে, উহারা পরস্পর সকলকেই চিনিতে পারে। অথচ মুহূর্ত্তের জন্য বিবাদ করে না। শিশুগণ এবং রোগী ও

বৃদ্ধগণ গৃহে থাকে, যাহারা বলবান্ তাহারা আহারান্বেষণ করিয়া আনে। যদি দূর হইতে অপর একটি বাসার পিপিলিকাকে আর এক নূতন পিপিলিকার দলে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, উহারা ঐ বিদেশীকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে এবং আপন করিয়া লয়। এক বাসা হইতে একটি পিপিলিকাডিম্ব, আর এক বাসায় রাখিলে, ঐ বাসার পিপিলিকা আপন ডিম্বের ন্যায় নিস্বার্থ স্নেহ ও যত্নের সহিত প্রাণ পণে উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। লাবক সাহেব বলেন তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পিপিলিকাগণ পাঁচ বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে। তিনি একাদশটি পিপিলিকা ১৮৭০ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে ১৮৭৪ খৃস্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত পালন করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে নয়টির মৃত্যু হইয়াছিল, দুইটি জীবিতছিল, কিন্তু তাহারা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পরে তাহাদিগকে তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

উদ্ভট।

যত দুখ আছে বিধি
দাও তাহা সহিব,
মরমে পুড়িব তবু
মুখে নাহি কহিব ;—
অরসিকে রসালাপ,
এযে এক যাতনা,
ললাটে লিখ'না মোর
ললাটেতে লিখ'না।

বনের বিহঙ্গ আমি
বনে বনে উড়িব,
বন-বিটপীতে বসি
প্রিয়-নাম গাইব ;—
বনফুল, বনফল
বন্য এই পরিমল,
ইহাই সম্পদ মম,
ইহা লয়ে রহিব ;—
প্রিয়-বিচ্ছেদের দুঃখ
বনবাসে ভুলিব।

হায়! কেন না হইনু
মেঘের মতন,
পরার্থ ঢালিয়া দিতে
নিজের জীবন।
দামিনী দুলিত অঙ্গে
থাকিতাম সুখ সঙ্গে
খেলিতাম রঙ্গে লয়ে
মত্ত প্রভঞ্জন।
তুষিতে পরের প্রাণ,
করিতাম প্রাণ দান,
বজ্রাঘাতে নিজ দেহ
করি বিদারণ।

লজ্জাবতীলতা।

লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ কর, বঙ্গীয় নব বধূর ন্যায় লাজে উহা মৃয়মাণা হইবে।

এই জন্যই কবিগণ ইহার নাম লজ্জাবতী-গণের উপমার স্থলে ব্যবহার করেন যথা, "কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা, মৃতপ্রায় পর-পরশনে"—যাহা হউক বধূগণের লজ্জার কারণ আছে, তাই-বলিয়া বনের লতা লজ্জায় মাথা লুকাইবে কেন? হেন্‌ফ্রে এবং মাস্টারস প্রভৃতি উদ্‌ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞেরা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, লজ্জাবতীর পত্র-দণ্ডের অভ্যন্তরে ছিদ্র আছে, ঐ সকল ছিদ্রের মধ্যে প্রতি পত্রের নিম্নদেশে ক্রুশের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এক একটি অতি মৃদুপ্রাণ স্প্রিঙ্‌ আছে, অতএব উক্ত লতাকে স্পর্শ করিলেই ঐ স্প্রিঙ্গ কুঞ্চিত হইয়া যায়, সুতরাং উহার পত্র নিচয় টলিয়া পড়ে॥

শিক্ষিত শুক পাখী।

সুপ্রসিদ্ধ জুলিয়স্‌ সিজরের আনন্দ বিধানার্থ কয়েক জন রোমক, তাঁহাকে শিক্ষিত শুক পক্ষী উপঢৌকন দিয়াছিলেন। পাখিগণ সিজরকে দেখিলেই "মহাবীর সিজর তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ কর" এইরূপ বলিত।—সিজর সন্তুষ্ট হইয়া এক একটি পাখীর জন্য এক এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দেন। ইহা দেখিয়া আর এক ব্যক্তি একটি শিক্ষিত শুক পক্ষী উক্ত মহাত্মাকে উপহার দান করেন, কিন্তু জুলিয়স তাহা গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে ঐ ব্যক্তি দুঃখিত হইয়া পক্ষীটিকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং ছাড়িয়া দিবার সময় এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, যে, "হায়, দুঃখী দেখিয়া সিজর আমায় উপেক্ষা করিলেন!"—এই ঘটনার দুইদিন পরে সিজর একদিন তাঁহার বিলাসকাননে বেড়াইতে যান, যেই প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি শুনিতে পাইলেন কে যেন বলিতেছে, "হায়, দুঃখী দেখিয়া সিজর আমায় উপেক্ষা করিলেন!" তিনি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখেন, নিকটে তরুশাখায় বসিয়া একটি ক্ষুদ্র শুক-শিশু মধুর স্বরে অনবরতঃ ঐ কথা বলিতেছে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শুক-শিক্ষককে ডাকিয়া দুই সহস্র টাকা পুরস্কার দান করিলেন। তৃতীয় (লুই) নিপলিয়নের উদ্যান সমূহেও এইরূপ অনেক শিক্ষিত পক্ষী ছিল। ইহারা ফরাসী বিজয়-গীতি পর্য্যন্ত গান করিয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিত। আমাদিগের দেশে পাখিগণকে রাধাকৃষ্ণ নাম শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্বদেশ বৎসল কপোত।

গত ফ্রাঙ্ক প্রুশিয়ন যুদ্ধের সময় জর্ম্মাণগণ প্যারে নগর অবরোধ করিলে, সূক্ষ্মবুদ্ধি ফরাসীরা, শিক্ষিত কপোত দ্বারা, নগরের বাহিরে আত্মীয়গণের নিকট সংবাদ পাঠাইতেন। জর্ম্মাণগণ, শিক্ষিত বাজ পক্ষী দ্বারা ঐ সকল কপোতগণকে ধৃত করিয়া, বিপক্ষের গুপ্ত সংবাদ পাঠ করিতেন।—এই সময়ে একটি

কপোত যেরূপ অসাধারণ প্রভুভক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা মনে করিলে মানবগণকেও ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। একদা একটি কপোত দুর্গ হইতে এক খানী পত্র * মুখে করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে বিপক্ষের বাজপক্ষী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। কপোত বিপক্ষের হস্তগত হইলে,তাহারা উহার চঞ্চু হইতে পত্র লইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কপোত তাহা দিল না। অবশেষে সে যখন দেখিল, ঠোটে করিয়া দীর্ঘকাল উহা রাখা অসম্ভব এবং বিপক্ষে উহা লইবে, তখন বুদ্ধিমান্ কপোত উহা গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। জর্মাণেরা কপোতের কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিল। ফরাসী নগরে একটি রমণী একটি কবিতা লিখিয়া এই স্বদেশবৎসল মহাত্মা কপোতবরকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে নরাধম ব্যক্তিরও দেশানুরাগ হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়। যে কুলাঙ্গারগণের দেশের জন্য মায়া মমতা নাই, তাহারা এই সাধু কপোতের নিকট নীতি শিক্ষা করুক।

* চারি বর্গইঞ্চি পরিমিত অতি সূক্ষ্ম কাগজে প্রায় ২০০০ হাজার শব্দ থাকিত, এবং তাহা কেবল যন্ত্রের সাহায্যে পাঠ করা যাইত।

বিনাফুলে ফল।

আমাদিগের দেশে একটি প্রহেলিকা প্রচলিত আছে,—তাহার তাৎপর্য্য এই "বিনাফুলে ফল ধরে, কোন্ কোন্ বৃক্ষে?" এই প্রহেলিকা যাঁহাকেই হউক না কেন জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি মীমাংসা করিয়া দিবেন যে—'ডুমুর প্রভৃতি।' ফলতঃ এ সিদ্ধান্ত ভুল, এবং এ প্রহেলিকাগত প্রশ্নটিও বিষম ভ্রমাত্মক। ডুমুর প্রভৃতি বাস্তব ফল নহে উহারা ফুল,। এই জাতীয় ফুল হইবার উপক্রম হইতেই ইহাদিগের বোটার ত্বক এবং মাংস এত পুষ্ট এবং বৃদ্ধি হইয়া থাকে যে,উহাতে ফুলকে একবারে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই সকল ফলাকৃতি ফুল দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া দেখিলেই ফল কি ফুল ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ডুমুর প্রভৃতিকে কর্ত্তন করিলে উহাদের অভ্যন্তর প্রদেশে পরাগকেশর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বুদ্ধিমান্ দরিদ্র।

এক দরিদ্র ব্যক্তির কোনও প্রকারেই দিনপাত হইত না। তিনি একদা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট একঘণ্টাকালের জন্য একখানি উৎকৃষ্টশাল এবং তদনুরূপ অন্যান্য বস্ত্রাদি চাহিলেন, তাহাতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি ইহা একঘণ্টা কালের জন্য পরিধান করিয়া কি উপকার পাইবে?—দরিদ্র ব্যক্তি বলিলেন, গরিব অবস্থা দেখিলে সকলেই ঘৃণা

করে। অতএব বড় মানুষ সাজিয়া গেলে ধনিগণ আহ্লাদসহকারে আমার উপকার করিতে যত্নশীল হইবেন, সংসারের এই রীতি।

আশ্চর্য্য-যান।

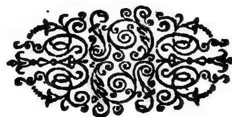
এক ব্যক্তি আর এক বিদেশী ব্যক্তির সহিত কোন দূরস্থানে যাইতেছেন, যাইতে যাইতে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল মহাশয়, কার্ত্তিক,গণেশ, নারায়ণ প্রভৃতি, পাখী এবং ক্ষুদ্র জন্তুর পৃষ্ঠারোহণ পূর্ব্বক কিরূপে বেড়াইতেন? বিদেশী বলিলেন, তাঁহারা ত দেবতা ছিলেন, ইচ্ছা করিলে যানব্যতীত শূন্যেও যাইতে পারিতেন। আমাদিগের দেশের রাজারা গাধায় চাপিয়া বেড়ান। তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কেন, তাঁহাদের কি হয়, হস্তী প্রভৃতি কিছুই নাই। বিদেশী ব্যক্তি হাসিয়া বলিলেন, পূর্ব্বে ছিল, রাজা হইয়া অবধি আর নাই। তাঁহার সঙ্গী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? বিদেশী ব্যক্তি বলিলেন, "আরে এখন যে তাঁহারা আহার কমাইয়াছেন—সুতরাং শরীরও কমিয়াছে, এখন গাধাই অনায়াসে তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে।" তাঁহার বন্ধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আহার কমানই বা কেন? বিদেশী বলিলেন, শুনিয়াছি আহার কমাইলে নাকি সুক্ষ্মবুদ্ধি হয়।

চতুরঙ্গ।

এতদ্দেশে ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে বিশেষতঃ পল্লিগ্রামস্থ জমীদার বর্গের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ প্রায় সকলেই কিছু না কিছু চতুরঙ্গ খেলায় অভ্যস্ত আছেন। আজি কালি এমন কোন সভ্যদেশ নাই যেখানে চতুরঙ্গ খেলা একবারে অজ্ঞাত অথবা অনাদৃত। আমাদের দেশে কিংবদন্তী আছে যে, রাবণ স্বর্গ বিজয়ের পর যখন সংগ্রাম করিতে আর প্রতিদ্বন্দ্বী খুজিয়া পাইলেন না, তখন এই অবসর সময়ের অলসতা পরিহার এবং সমরলিপ্সু চিত্তের অসহ্য কণ্ডূয়ন নিবারণ করিবার জন্য তিনি এই অপূর্ব্ব চতুরঙ্গ খেলার সৃষ্টি করেন। গ্রীকদিগের মধ্যেও এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, লিডো এবং টাইরিনো নামক বীর-ভ্রাতৃদ্বয় দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া তজ্জনিত দারুণ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবার জন্য এই খেলার উদ্ভাবন করিয়াছিল। কিন্তু ইহা অবিসংবাদিত যে, হিন্দুরাই এই খেলার প্রথম পথ-প্রদর্শক। সর উইলিয়ম জোন্স্ তাঁহার গভীর গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,চতুরঙ্গ খেলা হিন্দুদিগের দ্বারা প্রথম উদ্ভাবিত হইয়া ভারত বিজয়ের পর আফগানজাতি কর্ত্তৃক তাহাদের দেশে নীত হয়, এবং সেইখান হইতেই মুসলমানজাতিরা শিক্ষা করিয়া সমস্ত ইউরোপে ইহা বিস্তৃত করে। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চারি অঙ্গে বি-

ভক্ত বলিয়া এই খেলার নাম চতুরঙ্গ, আফগানগণ এই শব্দটির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার নাম সেৎরঞ্জ্ রাখিয়াছেন। পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন হইয়া অবশেষে এই শব্দ হইতে ইংলণ্ডীয় Check এবং Exchequer শব্দ বহির্গত হইয়াছে।

আমাদের দেশে তাস পাশা প্রভৃতি যে সকল বৈঠকী খেলা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে চতুরঙ্গ খেলাই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধি-সাপেক্ষ। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজ পুরুষেরা ইহাতে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এমন কি অনেকের এই খেলায় সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত, তথাপি তাঁহারা ভ্রুক্ষেপও করিতেন না। মহাভারতে পাণ্ডুবগণের রাজ্য নির্ব্বাসন, বিরাট সভায় যুধিষ্ঠিরের অক্ষাঘাতে রক্তপাত প্রভৃতি পাশক্রীড়ার অনেক গর্হিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই চতুরঙ্গ খেলাসম্বন্ধে পুরাণাদিতে কোন বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। কিন্তু ইউরোপে এই খেলায় রাজ্যবিপ্লব পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। টাইমুরলেন যখন তুরুষ্ক আক্রমণ করেন, তখন তুরুষ্কের সম্রাট বাজেজাত্ এই খেলায় এইরূপ মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশ বিলুণ্ঠিত হইল, তথাপি তিনি নিজের অথবা প্রজাপুঞ্জের রক্ষার্থ কোন চেষ্টাবলম্বন করিতে পারিলেন না। স্পেন যখন মুরদিগের অধিকৃত ছিল, তখন উক্তবংশীয় কোন রাজপুরুষ অনেক হত্যাকাণ্ডের পর সিংহাসন অধিকার করিয়াও দেখিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বে উহা তাঁহার বংশধরের উপভোগ্য হইবে না। তখন তিনি তাহারও বধসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তদর্থ এক দূত প্রেরণ করেন। এই সময়ে তিনি কোন বন্ধুর সহিত চতুরঙ্গ খেলায় প্রবৃত্ত ছিলেন। দূত যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, তৎক্ষণাৎ এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তিনি অনেক মিনতি করিয়া আরব্ধ খেলার পরিসমাপ্তির কালটুকু পর্য্যন্ত বাঁচিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। খেলার অবসান হইলে যখন তাঁহাকে বধ্যভূমিতে নেওয়ার উপক্রম হইতেছিল, তখন আর এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে এবং তিনি প্রজাপুঞ্জের সম্মতি অনুসারে সিংহাসনপ্রাপ্ত হইয়াছেন।



বঙ্গভাষার উচ্চারণের অভিধান

মনে বড় সাধ মাতৃভাষার সেবা করি। কিন্তু একে শক্তি অল্প, তাহাতে আবার অবকাশ কম। আজ একটু অবসর সৃষ্টি করিয়া দুটা কথা লিখিতে সংকল্প করিলাম। সম্মুখে অনতিদূরে একখানি ইংরেজী ভাষার উচ্চারণের অভিধান পড়িয়া আছে। ভাবিলাম, বঙ্গভাষায় কি কোন দিন উচ্চারণের অভিধানের প্রয়োজন হইবে?

উচ্চারণের অভিধান বর্ণমালার অভাবের উপরেই সংস্থাপিত। যে ভাষার বর্ণমালা পূর্ণাবয়বা সে ভাষায় উচ্চারণের অভিধান প্রয়োজনীয় নহে। বঙ্গভাষার বর্ণমালার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বঙ্গভাষা রাণীর কন্যা; স্ত্রীধনে সম্পৎশালিনী ও গৌরবান্বিতা। দেখিলাম বর্ণমালা সমগ্রই জননী সংস্কৃত হইতে পাইয়াছেন। অতি সুন্দর বর্ণমালা, বৈজ্ঞানিকসূত্রে শ্রেণীবদ্ধ। ক্রমনির্ণয়ে কত না পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ব্যঞ্জনে প্রথমেই উচ্চারণে বায়ুর প্রাধান্য অপ্রাধান্য লইয়া বর্ণবিভাগ। সর্ব্বাগ্রে স্পর্শ বর্ণ, পরে অন্তঃস্থ বর্ণ, ও শেষে উষ্মবর্ণ। স্পর্শবর্ণে জিহ্বাস্পর্শে বায়ু রুদ্ধ ও উচ্চারণ স্থগিত হয়। অন্তঃস্থবর্ণে বায়ু রুদ্ধ বা উচ্চারণ স্থগিত না হইয়া অপ্রতিহতভাবে বাহির হইয়া যায়। এবং উষ্মবর্ণে বায়ু অর্দ্ধরুদ্ধ হইয়া শিষ দেওয়ার ন্যায় বহিয়া যায়। স্পর্শবর্ণ পর্য্যালোচনা করিলাম, দেখিলাম উচ্চারণ স্থানভেদে কেমন বর্গে বর্গে বিভক্ত রহিয়াছে। অন্তর্দ্দেশ হইতে ক্রমশঃ বহির্দ্দেশে আসিলে প্রথমেই কণ্ঠ,পরে ক্রমশঃ তালু, মূর্দ্ধা ও দন্ত,ও শেষে ওষ্ঠ। বর্ণমালায়ও প্রথমে কণ্ঠ্য কবর্গ, পরে তালব্য চবর্গ, মূর্দ্ধন্য টবর্গ, দন্ত্য তবর্গ ও শেষে ওষ্ঠ্য পবর্গ। সর্ব্বশেষে একটি বর্গের আলোচনা করিলাম। দেখি প্রথমে তীক্ষ্ণ ক খ, পরে স্থূল গ ঘ, ও শেষে নাসিক্য ঙ। ক, খ এবং গ, ঘর মধ্যে প্রথম কোমল ক ও গ, ও পরে কর্কশ খ ও ঘ।

স্বরবর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখি প্রথমে কণ্ঠ্য অ আ, পরে তালব্য ই ঈ এবং তৎপরে ওষ্ঠ্য উ ঊ। শেষে মিশ্র উচ্চারিত কণ্ঠতালব্য এ এবং কণ্ঠোষ্ঠ ও। ঋ ৠ ৯ ঐ ঔ এই পাঁচবর্ণের কথা পরে কহিব।

যে কএকটি ভাষার বর্ণমালা জানি তাহাদের সহিত বঙ্গভাষার তুলনা করিলাম। দেখিলাম তাহাদিগের বর্ণমালা বালকের ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খলভাবে

বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্বরের মধ্যে ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জনের মধ্যে স্বর, ঔষ্ঠ্যবর্ণের পরে কণ্ঠ্যবর্ণ এবং স্পর্শবর্ণের মধ্যে অন্তঃস্থ বা উষ্মবর্ণ। লাটিন ও গ্রীক এবং তন্নিষ্ঠ ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষা, আরবী ও পারসী সকল ভাষার বর্ণমালাই এরূপ বিশৃঙ্খল ও যথেচ্ছ ন্যস্ত।

বঙ্গভাষার বর্ণমালায় যে কেবল ক্রমবিন্যাসের অতুল বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য্য রহিয়াছে তাহা নহে, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিও অতিশয় পরিপুষ্ট। উহা পুর্ণাবয়বা নহে কিন্তু প্রায় পুর্ণাবয়বা। দুই চারিটি দোষ ও অভাব যাহা দেখিলাম তাহা বলিতেছি।

১। দেখিলাম ঋ ঋৄ ৯ ঐ ঔ এই পাঁচটি বর্ণ অনাবশ্যক। স্বরব্যঞ্জনে কিম্বা দুইটি স্বরে উহাদের কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে। তদ্ভিন্ন উহাদের উচ্চারণ যৌগিক। যৌগিক উচ্চারণের জন্য অসংযুক্ত বর্ণ থাকিলে তাহাকে কিরূপে নির্দ্দোষ কহিব?

২। দেখিলাম অবহেলায় অন্তঃস্থ ব ও মূর্দ্ধণ্য ণ ও ষ এবং দন্ত্য স মৃতপ্রায় হইয়াছে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের আর তারতম্য নাই। দুই একটি সংস্কৃত ধরণে রচিত শ্লোক পাঠের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে প্রায় হ্রস্ব দীর্ঘের পার্থক্য থাকে না। মাতঃ বঙ্গভাষা, নিজে উপার্জ্জন করা দূরে থাকুক, স্ত্রীধনে প্রাপ্ত সম্পত্তিও যে খোয়াইতে বসিয়াছ? বাঙ্গালীরা দুঃখের মর্ম্মস্পৃক্ বেদনাতেও একতাবদ্ধ হয় না। তোমার সম্পত্তি রক্ষার জন্য কি একতাবদ্ধ হইবে? আশা করিতে পারি না। তবে সরস্বতীর কৃপা।

৩। দেখিলাম পদান্ত অকার অনেক স্থলে উচ্চারিত হয় না। একারের উচ্চারণ দুইটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এত, মেথর, কেন, দেও, নেও ইত্যাদি শব্দে একারের উচ্চারণ সাধারণ উচ্চারণ হইতে বিভিন্ন।

প্রথম ও দ্বিতীয় দোষের সহিত আমার চিন্তার বিষয়ের সম্বন্ধ অল্প, কিন্তু যদি অকার কোথায় উচ্চারিত, কোথায় বা অনুচ্চারিত হয়, এবং একারের যদি দুইটি বিভিন্ন উচ্চারণ হয়, তাহা হইলে ক্রমেই উচ্চারণের অভিধানের উপকরণ সংগৃহীত হইতে থাকিবে। ইংরেজী উচ্চারণ পুরুষে পুরুষে যুগে যুগে এমন কি বৎসরে বৎসরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আর পারি না। সেই উৎপাত কি বঙ্গভাষায় প্রবেশ লাভ করিবে? আগে শুনিয়াছি ডাইভোর্স, এজুকেশন, নেচার, মাইনরিটি, বেঞ্চ, এখন শুনি ডিভোর্স, এডুকেশন, নেটিয়ুর্, মিনরিটি, বেন্শ্। উদাহরণ যথেচ্ছ বৃদ্ধি করা যায়। নূতন কলেজের ছাত্রের নিকট ইংরাজী কহিতে ভয় হয়, পাছে আমার বিনা সম্মতিতে ও অজ্ঞাতে পরিবর্ত্তিত কোন উচ্চারণের জন্য পুরাতন মুর্খ মধ্যে পরিগণিত হই।

ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার উচ্চারণের অ-

ভিধান আবশ্যক না হয় তাহার কি কোন চেষ্টা করা যাইতে পারে? এত, মেথর, কেন,দেও ইত্যাদি শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণ একারের উচ্চারণ স্থিরতর রাখা সম্ভব নহে। ভাষা ব্যবহারের দাসী। ব্যবহারকে ভাষার দাসী করা সঙ্গতও নহে এবং সম্ভবও নহে। সম্ভব হইলে একার একারই থাকিত হ্রস্ব (এ) হইত না। তবে ইহার একটি উপায় আছে। উর্দ্দু ভাষায় আবশ্যক মত পারস্য বর্ণমালার অতিরিক্ত টে, ডাল প্রভৃতি কএকটি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গলায় সেইরূপ একটি নূতন অক্ষর সৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অকারের উপদ্রব আর ও ভয়ানক। লুপ্ত অকারের পুনরুদ্ধার অসম্ভব ও তাহার চেষ্টা বৃথা। * উচ্চারণের অনুকরণে পদান্ত বর্ণ হসন্ত লিখিলে কি চলিবে? না, তাহা হইলে সমুদয় সন্ধি সূত্র পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কএকটি সাধারণ সূত্রে কি পদান্ত অকারের উচ্চারণ অনুচ্চারণ নিয়মবদ্ধ করা যায়? নিয়ম বদ্ধ করা সম্ভব হইলেও সাধারণ বিধি হইতে বর্জ্জিত বিধি অধিক হইবে; এবং সমুদায়গুলি একত্র বহুসংখ্যক হইয়া পড়িবে। সূত্র বহুসংখ্যক হইলে উচ্চারণের অভিধানের প্রায় সমুদয় দোষ ও অসুবিধা রহিল। অতএব ইহাতে বিশেষ কোন লাভ দৃষ্ট হয় না।

কতগুলি কথা আছে যাহার অন্ত্য অকার কখন বা উচ্চারিত হয় কখন বা অনুচ্চারিত থাকে। যেখানে উচ্চারিত হয় সেই সমস্ত স্থল কোন কোন পুস্তকে'ও'বর্ণ সন্নিবেশ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে; যথা, কোন, কোনও। অকারকে বিদায় দিয়া ওকারের আশ্রয় গ্রহণ করা কতদূর সঙ্গত তাহার বিচারে লেখনীকে ব্যায়ামক্লিষ্ট না করিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উক্ত প্রণালীতে আমাদিগের প্রদর্শিত অসুবিধার অতি অল্পাংশে মাত্র সাহায্য হয়। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার একটি মাত্র সহজ উপায় আছে। পদান্ত অকারের অধিকাংশই অনুচ্চারিত থাকে, অল্প সংখ্যক মাত্র উচ্চারিত হয়। উচ্চারিত পদান্ত অকারের একটি চিহ্ন সৃষ্টি করিলে উচ্চারণের অভিধানের দুঃসহ জ্বালা হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। কমা, কোলন, সেমিকোলন, প্রশ্নের চিহ্ন, বিস্ময়ের চিহ্ন, ইত্যাদি তো অতি অল্পদিন হইল বঙ্গভাষায় গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে, উচ্চারিত অকারের একটি চিহ্ন করিলে তাহাও যে অতি অল্পকাল মধ্যে প্রচলিত হইবে সন্দেহ নাই।

প্রথমেই বলিয়াছি যে বর্ণমালা পূর্ণ হইলে উচ্চারণের অভিধানের প্রয়োজন

* যদি কেহ 'অতএব এক্ষণ তোমার নাম কহ' (৫ সূ দেখ) এই কথাটির সমুদয় পদান্ত অকারের উচ্চারণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে উড়িষ্যাবাসী বলিয়া ভ্রম হইবার একান্ত সম্ভাবনা।

হয় না। বঙ্গভাষায় যে দুইটি অভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা উপরে নির্দ্দেশ করিলাম। ভবিষ্যতে আরও অভাব হইতে পারে। অভাব মোচনের জন্য যদি বর্ণমালা বর্দ্ধিত না হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ উচ্চারণের অভিধান আবশ্যক হইবে। উপরে যে একটি বর্ণের ও একটি চিহ্নের সৃষ্টির কথা কহিলাম তাহা এক জনের কার্য্য নহে, সমস্ত সাহিত্য সমাজের কার্য্য। এক ব্যক্তি প্রথম পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাকে অনুসরণ না করিলে সাহিত্য সমাজ ভবিষ্য বংশের নিকট বিশেষ ধন্য বাদার্হ হইবেন না। ইংলণ্ডে কতকগুলি লোক ইংরেজী শব্দের উচ্চারণানুসারে বর্ণবিন্যাস করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের বর্ণবিন্যাসের প্রণালীর নাম ফনেটিক সিস্‌টেম্। এই সম্প্রদায়ের চেষ্টা যে সফল হইবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। তাঁহারা বিফলপ্রযত্ন হউন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ও উদ্যমে প্রমাণিত হইতেছে বর্ণমালার অভাবে ভাষায় কি অকথ্য বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করে। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ যদি বর্ণমালা পরিবর্দ্ধিত না করেন তাহা হইলে আধুনিক ইংরেজেরা উচ্চারণ লইয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছেন ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীরা ততদূর না হউক কিন্তু তদ্রূপ এক গোলযোগে যে পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীবি—



প্রেততত্ত্ব।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব

আমরা এই প্রস্তাবে মধ্যস্থ এবং আয়োজনের কথা বলিব। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, মধ্যস্থে না ডাকিলে প্রেতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠককে ‘ মধ্যস্থ ’ কথা বুঝান বড় দুরূহ। মূল কথা যাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রেতাগমের ব্যাঘাত জন্মে, তিনিই মধ্যস্থ (Medium)। যেখানে দশজনে মিলিয়া প্রেতাহ্বান করিতে থাকেন, সেস্থলে যে সকলকেই মধ্যস্থ হইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। তবে ন্যূনপক্ষে একজনকে ঐ শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে হইবে। তাহার অভাবে প্রেতাবির্ভাব হইবে না। সাধারণতঃ যাহাঁরা দুর্ব্বল, বা অধিক চিন্তাশীল, বা যাহাঁদের প্রেতে অন্ধবিশ্বাস, বা যাহাঁদের স্নায়ু বা ধমনী সকল শীঘ্র উত্তেজিত হয় (Nervous) তাঁহারা মধ্যস্থ হইয়া থাকেন। এই মধ্যস্থের সহিত প্রেতের কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যদি দশজন বাজে লোক প্রেতের জন্য গলবস্ত্র হইয়া

ধ্যান করিতে থাকেন,তথাপি তাহার দেখা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু তিন জনের মধ্যে যদি একজন মধ্যস্থ থাকেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দশজনে যাহা করিতে না পারিয়াছে এই তিনজনে তদধিক করিতে পারিবে। সুতরাং যখন যেরূপ আয়োজন করিয়া প্রেতাহ্বান করিতে থাকি না কেন, সকল সময়েই ন্যূন কল্পে একজন মধ্যস্থ চাই। তাঁহার উপস্থিতি অপরিহার্য্য।

এক্ষণে আয়োজনের কথা—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যেমন তেমন করিয়া ডাকিলে প্রেতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এই কারণে প্রেতাহ্বানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আয়োজনের প্রচলন আছে। আমরা তাহার কতকগুলি উল্লেখ করিতেছি।

১ম। তিন চারিজন একটি চৌপায়ার চতুর্দ্দিকে বসিয়া তদুপরে এরূপভাবে হস্ত রক্ষা করে যেন পরস্পরের হস্তের সহিত যোগ থাকে, এবং সকলেই কোন বিশেষ প্রেতের কথা মনে মনে স্মরণ করিতে থাকে। আর একজন হয়ত প্রেতাহ্বানকারীদিগের মনের স্থৈর্য্য সম্পাদনার্থ দুঃখরসাত্মক কোন পুস্তক পড়িতে থাকে বা কোন গান গাহিতে থাকে। অল্পক্ষণপরেই একজনের অঙ্গ শিথিল হইতে থাকে এবং সে ক্রমে অজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে প্রেত আসিয়াছে স্থির করিতে হইবে। এবং এই অজ্ঞানাবস্থকে যাহা প্রশ্ন করা যায় প্রায় তাহার সকলগুলিরই সে যথাবিধি উত্তর দিয়া থাকে। প্রেততত্ত্ববাদীমতে ইহাই প্রেতের উত্তর। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান জন্মে এবং সে স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়; চেতনা হইলে তখন আর অজ্ঞানাবস্থার কথা কিছুই স্মরণ থাকেনা।

আমি স্বয়ং একবার এইরূপ প্রেতাগম দেখিতে গিয়াছিলাম। যথাসময়ে একজন অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তাহাকে এইরূপ প্রশ্ন করা হয়।

প্র। তুমি কাহার আত্মা?

উত্তর নাই।

প্র। আপনি যদি কাহারও আত্মা হন, অনুগ্রহ করিয়া উত্তর দেন, আমরা আপনার অপেক্ষা করিতেছি।

উ। মহাত্মা রামমোহন রায়ের।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অজ্ঞান ব্যক্তি এক উপদেশপূর্ণ বাচনিক বক্তৃতা দিল; তাহাতে বাস্তবিক আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এইরূপ বক্তৃতা শিক্ষিতব্যক্তিও আয়োজন ব্যতীত দিতে পারে কিনা সন্দেহস্থল। এতদ্ব্যতীত আমরা জীবনে তাহার নিকট কোনরূপ বক্তৃতা শুনি নাই।

আর একবার এইরূপ সভায় গিয়া দেখিলাম, যে অজ্ঞানব্যক্তি একজনকে ক্রমাগত প্রহার করিতেছে, দশ বার জনে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। অবশেষে সে ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ হইতে এক খানা পালঙ্ক বাহিরে আনিয়া ফেলিল। পর দিবস সে পালঙ্ক গৃহে লইয়া যাইতে পাঁচজন লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল।

২। প্রেতাহ্বানের আরও একরূপ আয়োজন হইয়া থাকে; তাহাতে সকলই পূর্ব্বমত; কেবল প্রেতমহাশয় স্কন্ধে চাপিয়া কাহাকেও অজ্ঞান করেন না; চৌপায়ার পদাঘাতে উত্তর দিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্তরূপ কিয়ৎক্ষণ বসিলেই টুল নড়িতে থাকে। তখন প্রশ্ন করা হয় ‘আপনি যদি কোন প্রেত আসিয়া থাকেন, কাষ্ঠপাদ একবার আঘাত করুন’। কাষ্ঠপাদে একবার আঘাত পড়িল। তখন প্রেতের উপস্থিতি স্থির হইল। তৎপরে কিরূপে কথোপকথন চলিবে তাহারই উপায় স্থির হইতে থাকে। হয়ত আহ্বানকারীরা বলেন ‘হাঁ হইলে যেন একবার শব্দ হয়, না হইলে দুইবার, এবং সংশয়যুক্ত হইলে তিন বার’ তার পর প্রশ্ন হইতে থাকে, এবং এই নিয়মমতে প্রেত মহাশয় উত্তর দেন। তখন বলা হয় যে, ‘আপনার যে অক্ষরে লিখিবার ইচ্ছা, আমরা অক্ষর পড়িয়া যাইব, আপনি আপনার মনস্থ অক্ষরে আঘাত দিবেন, আমরা আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিব, আপনি আবার বক্তব্য অক্ষরে আঘাত দিবেন’ এইরূপ। ইহাতে উত্তমরূপ কথোপকথন চলিতে পারে। আহ্বানকারীরা জিজ্ঞাসা করিবেন, রাম শ্যামের কত টাকা ধারে? এই বলিয়া অ হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর পড়িতে আরম্ভ করিল, ‘শ’এ এক আঘাত পড়িল। আবার গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ করিল ‘ত’এ এক আঘাত পড়িল,—হইল শত টাকা।

৩য়। আর একরূপ কথোপকথনের উপায় প্ল্যাঞ্চেট (Planchette)। এই অভিনব দ্রব্য কি তাহা সাধারণকে বুঝান অনাবশ্যক। কিছু দিবস হইল একজন সাহেব এই অদ্ভুত জিনিষ কলিকাতায় আমদানী করিয়া বড় মন্দ লাভ করিয়া যান নাই। ইহা একখানি ছোট তক্তা। তিনটি পায়া আছে। পায়াতে সূক্ষ্ম চক্র দেওয়া আছে। তাহা এত মসৃণ যে হাত দিলেই সে চাকাগুলি ঘুরিতে থাকে এবং তক্তা গড়াইয়া যায়। এই তক্তার মধ্যস্থলে একটি পেন্সিল বসান আছে। যেমন চাকা ঘুরিয়া এই তক্তাকে সরাইতে থাকে সেই সঙ্গে সঙ্গে এই পেন্সিলও সরে এবং কাগজের উপর হইলে সেই পেন্সিলে প্রশ্নের উত্তর অতি সুন্দর অক্ষরে লিখিত হয়। এই প্ল্যাঞ্চেটে একবার আমি কএকটি বন্ধু * লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই প্ল্যাঞ্চেট্ ঘুরিতে আরম্ভ হইল। তখন তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। যে সকল উত্তর পাইলাম তাহার প্রায় সকল গুলিই ঠিক। পাঠকগণকে তাহার নমুনা দেখাইতেছি।

প্র। মহারাণী কোন্‌বর্ষে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

প্ল্যাঞ্চেট্ প্রশ্ন শুনিয়াই ঘুরিয়া ঘুরিয়া

* তাহাদিগের অন্যতম বাবু রাজকৃষ্ণ রায়। (অবসর সরোজিনী রচয়িতা)।

কিয়ৎক্ষণ পরে '১' অক্ষরটি লিখিয়া পরে ৮; ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার দুইটি অক্ষর বাহির হইল, পড়িলাম ১৮৩৭। পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলাম।

কোন্ বৎসরে বায়রণের মৃত্যু হয়? উত্তর। ১৮২৪।

প্র। বায়রণ বড় কবি না সেলী?

উ। দুইজন দুই প্রকার কবি; তুলনা অসম্ভব।

পাঠকগণকে বলা বাহুল্য, যে আমাদিগের কেহই উত্তর সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক লিখি নাই। এমন কি যে সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা জানিতাম সেরূপ একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই; অথচ প্রায় অধিকাংশ উত্তর গুলিই ঠিক২ লিখিত হইয়া ছিল।

একটি বেঠিক উত্তরের কথাও বলি। সেই স্থানে আমাদিগের আর একটি বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমি মরিব কবে?

প্ল্যাঞ্চেট্ স্বভাব মত ঘুরিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া২—প্রায় আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময়ে একটি ১অক্ষর লিখিত হইল। আবার পূর্ব্বমত ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু আমরা নাছোড়বন্দা, প্লেঞ্চেট্ ধরিয়াই আছি। বহুক্ষণ পরে '৮' অক্ষর লিখিত হইল। পুনর্ব্বার ঐ রূপ উৎপাৎ। চারিটি অক্ষর শেষে সমাপ্ত হইলে পড়িলাম ১৮৭৫। আমরা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই পরীক্ষা করিতে ছিলাম। পাঠকগণকে ইহাও জানান আবশ্যক যে আমাদিগের বন্ধু এখনও জীবিত আছেন।

আমাদিগের একটি প্রেততত্ত্ববাদী বন্ধু এইরূপ প্লেঞ্চেট্ ধরিয়া প্রেতাহ্বান করিতে ছিলেন। তিনি প্ল্যাঞ্চেট্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তুমি কি পরকালের সমস্ত কথা জান? যে হেতু তুমি প্রেত।

উ। জানি।

প্র। আমাদিগকে বলিয়া দেওনা কেন?

উ। তা হইলে সব গোল মিটিয়া যাইবে।

এই শেষ উত্তরটিতে আমাদিগের উক্ত বন্ধু একেবারে গলিয়া গেলেন। তিনি বলেন প্রেত ব্যতীত এরূপ উত্তর দেওয়া আর কাহারও কি সম্ভবে? ফল কথা কথাটি তাহাকে বড় মধুর লাগিয়াছে কাজেই প্রেতে তাঁহার বিশ্বাস এক ডিগ্রী উচুঁ হইয়াছে।

৪র্থ। তৃতীয় আয়োজনে যে যে উপকরণ আবশ্যক, ইহাতেও তাই, কেবল প্ল্যাঞ্চেটের মধ্যস্থলে পেন্সিল না থাকিয়া একটি দণ্ড প্রোথিত থাকে। এবং টেবিলের উপর ক, খ, প্রভৃতি অক্ষর লিখিয়া প্ল্যাঞ্চেট ধরিলে, ঐ দণ্ডটি এক অক্ষরের পর আর এক অক্ষরের নিকট গিয়া আপন অভিমত প্রকাশ করিয়া দেয়।

উপযুক্ত আয়োজন ও মধ্যস্থ ব্যতীত অনেকরূপে প্রেতাগম জানিতে পারা যায়। কখন কখন প্রেতাক্রান্ত মধ্যস্থ ছবি আঁকে। কখন কখন বা পীড়িতের জন্য

ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেয়। ওরূপ চিকিৎসায় অনেকেই আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

প্রেতাহ্বান সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ আয়োজনের কথাও বলিয়া রাখি।

যে গৃহে প্রেতাহ্বানের জন্য আয়োজন করা হইবে, সেটি নির্জ্জন হওয়া চাই। অধিক উষ্ণ হইবে না, কারণ তাহাতে মনের স্থৈর্য্য রক্ষিত হয় না। তীক্ষ্ণ শীত বায়ুও বহিবে না। চারি পাঁচ ছয় যত জনে ইচ্ছা চৌপায়ের (টুল বা টেবিলের) চতুর্দ্দিকে বসিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে একমন হইয়া ধ্যানলগ্ন হইবে যেন মাঝে কেহ বিরক্ত না করে। দুই শত্রুতে একত্রে আহ্বান করিবেনা। প্রেতে যাঁহারা অবিশ্বাসী গৃহ মধ্যে তাহাদের উপস্থিতিও প্রেতাগমের ব্যাঘাতকারী। *

এক্ষণে দেশীয় ও বিদেশীয় প্রেত সম্বন্ধীয় কএকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব।

১। প্রায় দশ বার বৎসর হইল, হুসেন খাঁ নামক জনৈক মুসলমান দৈবশক্তি বিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত ছিলেন। যিনি যাহা চাহিতেন তিনি তাঁহাকে তাহাই দিতে পারিতেন *। তাঁহাকে অনেকেই দেখিয়াছেন। তন্মধ্যে একজনের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি একবার হুঁসেনখাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এবং হুঁসেনখাঁ আসিলে তিনি আঙ্গুরের রস খাইতে প্রার্থনা করেন। কিছু পরেই হুঁসেনখাঁ সত্য সত্যই আঙ্গুরের রস আনিয়াছিলেন। এজন্য তিনি একবার বাহিরেও যান নাই। আমাদিগের বন্ধুটি সেবন করিয়া দেখিলেন যে, উহা বাস্তবিকই আঙ্গুরের রস। বন্ধুটিকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না।

২। আর একটি ঘটনা পাঠকগণের সমীপে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। এটিও প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয়। একবার ত্রিবাঙ্কুররাজার কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, উক্ত রাজবংশের এইরূপ বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তি দগ্ধ হইলে তাহার কিয়দংশ ভস্ম কোন পবিত্র (হিন্দুমতে) নদীজলে ভাষাইয়া দিলে উক্ত মৃত ব্যক্তির পরকালে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। তদনুসারে ত্রিবাঙ্কুররাজ জনৈক সন্ন্যাসী দিয়া তাঁহার মৃত আত্মীয়ের ভস্ম গঙ্গাজলে নিক্ষেপ জন্য পাঠান। সন্ন্যাসী যথাসময়ে কাশীধামে উপস্থিত হন এবং ত্রিবাঙ্কুর-রাজদত্তপত্রসহায়ে কাশীরাজের বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সময়ে একজন ফরাসীও কাশীরাজের

* এই কথাটিতে প্রেততত্ত্ববাদীরা সাধারণকে অত্যন্ত কায়দায় রাখিয়াছেন। কেহ প্রেত সম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপের পরীক্ষা করিতে যাইলেই প্রায় সেবারে প্রেত মহাশয় নিয়মমত দেখা দেন না। প্রেততত্ত্ববাদীরা অমনি বলেন, আপনি প্রেতে বিশ্বাস করেন না, আপনার উপস্থিতিই আমাদিগের সফলতার প্রতিরোধক।

* দুঃখের বিষয় এই, প্রস্তাবলেখক তাঁহাকে দেখেন নাই।

বাটীতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কাজেই উক্ত সন্ন্যাসীর (ফকির) সহিত ফরাসীর কিঞ্চিৎ সৌহার্দ্দ জন্মে। ক্রমে ফরাসী শুনিলেন যে, ফকির দৈব-শক্তি-বিশিষ্ট। তখন তাহার ক্ষমতার কিছু নিদর্শন দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ফকির স্বীকার পাইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে একটি জলপূর্ণ বৃহৎ ধাতু-নির্ম্মিত পাত্রাধারের পার্শ্বে উভয়ে দাঁড়াইয়াছিলেন, ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কি আছে? ফরাসীর হস্তে একটি উডেন্ পেন্সিল ছিল, তিনি তাহাই ফকিরকে দিলেন। ' ফকির পেন্সিল লইয়া অপরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ' বলুন দেখি এ পেন্সিল জলে ফেলিলে ভাসিবে না ডুবিবে ? '

ফরাসী বলিলেন—ভাসিবে।

পেন্সিল জলে ফেলিবা মাত্র ডুবিয়া গেল।

ফকির পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, এবারে ভাসিবে না ডুবিবে ?

ফ। ডুবিবে।

এবারে পেন্সিল ভাসিল।

ফরাসী দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে সন্ন্যাসী সেই পেন্সিল দিয়া উক্ত জলধার স্পর্শ করিলেন, অমনি তাহার একদিক ঊর্দ্ধে উঠিয়া, অপরদিক পূর্ব্বমত রহিল। পাত্র ঠিক থাকিল, জলের এক দিক উঠিয়া রহিল অপর দিক নিচু রহিল। এইরূপ সেই জল লইয়া অনেকরূপ রহস্য দেখাইতে লাগিলেন।

ফরাসী বলিলেন "আপনি যখন প্রেত সহায়ে এত অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম্ম সমাধা করিতে পারেন, তখন প্রেত আপনার একান্ত বাধ্য বলিতে হইবে। যদাপি প্রেতকে আমাকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার প্রেতে বিশ্বাস হয়। ফকির উত্তর করিলেন, প্রেতের দেখা পাওয়া না পাওয়া প্রেতের ইচ্ছাধীন। কিন্তু আপনি তাহার উপস্থিতি অনুভব করিতে পারিবেন।

ফরাসী। কিরূপে ?

ফকির। তাহার কার্য্যকলাপে ; এরূপ অমানুষিক কার্য্য দেখিবেন যে প্রেত ব্যতিত অন্য কাহার দ্বারা সে কর্ম্ম অসম্ভব।

প্রেত দেখাইবার নির্দ্দিষ্ট দিবস স্থির হইল।

সেই দিবস ফরাসী এক চতুস্তল বাটির ঊর্দ্ধতম গৃহে গিয়া রাত্রি কাটাইবেন স্থির করিলেন। যাহারা কাশীধামে গিয়াছেন তাঁহারা হয়ত জানেন যে তথাকার ঊর্দ্ধতম গৃহের যে দ্বার, তাহা নামাইয়া দিলেই ত্রিতলের সহিত সিঁড়ির কার্য্য করে। আবার উঠাইয়া লইলেই দ্বার হইয়া যায়, এবং নিম্নের সহিত সকল সম্বন্ধ ও যোগাযোগ বন্ধ হয়। ফরাসী যে গৃহে আশ্রয় লইলেন, তাহা এইরূপ। প্রথমতঃ বাটিতে প্রবেশ করিয়াই তিনি চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, কেহ কোথাও লুকাইয়া নাই। পরিশেষে সর্ব্বো-

পরিস্থ গৃহে উঠিলেন এবং সিঁড়ি তুলিয়া লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। গৃহে পিস্তল বন্দুক প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল যথা- কালে রক্ষিত হইল।

সন্ধ্যা হইল। ফরাসী শয্যার উপর ব- সিয়া রহিলেন, রাত্রি গাঢ় না হইতে হই- তেই ছাদের উপরে মনুষ্যের পদশব্দ হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে তিনি ছাদ ও উত্তমরূপ পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি- লেন। পরে জানালার আঘাত হইতে লাগিল। ফরাসীর বন্দুক প্রস্তুত ছিল। সহসা জানালা খুলিয়াই বন্দুক ছুঁড়িলেন, কিন্তু কোথাও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে সকল জানালাতেই ' ধুপ ' ' ধাপ ' করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। ব- ন্দুক পিস্তল সকলই ছুঁড়িলেন, কাহাকেও দেখিলেন না। অবশেষে দ্বার খুলিয়া ছাদে উঠিলেন। সেখানেও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল দূরে চা- হিয়া দেখিতে পাইলেন, সেই ফকির গ- ঙ্গাতীরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন *।

* এই ঘটনাটি ' The Spiritualist ' নামক পত্রে দৃষ্ট হয়। এক্ষণে উহা নি- কটে না থাকায় যথাযথ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। এবং কোন্ সংখ্যায় আছে তাহাও বলিতে পারিলাম না। যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত প- ত্রের ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৫ সনের সংখ্যা- গুলির সূচিপত্র দেখিয়া বাহির করিয়া লইবেন।

একটি বিদেশীয় প্রৈতিক ঘটনারও উ- ল্লেখ করিতেছি। সেটিও বড় কম বিস্ময়- জনক নহে।

রুসিয়ার কাউন্‌টেস্ ব্ল্যাভা- স্কী (Countess Blavatsky) সাধার- ণতঃ একজন ক্ষমতাশালিনী মধ্যস্থ ব- লিয়া পরিচিতা। তাঁহার সম্পাদিত দু- ইটি প্রৈতিক কার্য্য বড় বিস্ময়াবহ। প্র- থম, রুমালের সূচিকার্য্যে লিখিত একটি নামের পরিবর্ত্তে আর একটি নাম স্থাপন। ঘটনাটি অতি অল্প সময় মধ্যে এবং অ- নেকগুলি পণ্ডিত লোকের সমক্ষে সম্পা- দিত হয়। তন্মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কালেক্টর সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয়টি এইরূপ। যখন উক্ত মধ্যস্থ লণ্ডন হইতে বোম্বাই নগরে আসিতেছি- লেন, তখন একজন ব্যারিষ্টার তাহার পিতার (সুপরিচিত পার্লিয়ামেণ্টের মে- ম্বার) অঙ্গত্ব আরোগ্য করিতে অনুরোধ করেন। ব্ল্যাভাস্কী তাহাতে স্বীকৃতা হই- লেন, এবং বলিলেন যে, ' ভারতবর্ষে গিয়া আমি এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে থাকিয়া উভয়ের কথো- পকথনের জন্য একটি উপায় আবশ্যক। রোগীর কোন দ্রব্য পাইলেই আমি সং- বাদ চালাইতে পারি।' ইহাতে রোগীর হস্তাবরণ (Gloves) দেওয়া হইবে। ব্ল্যা- ভাস্কী দস্তানা লইয়া ভারতবর্ষে আসি- লেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কর্ণেল অ- ল্‌কট্ (Col, Olcott) সাহেবের সমক্ষে

তিনি উক্ত দুইটি দস্তানাই একটি গৃহ মধ্যে টেবিলে রাখিয়া গৃহে বারি দিলেন। কিছু দিবস পরে বিলাত হইতে ১৮ই ফেব্রুয়ারির এক পত্র আসিয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্যারিষ্টার লিখিয়াছেন, যে তিনি একটি হস্তাবরণ পাইয়াছেন। ইহাতে যে সকল স্বাক্ষীর উল্লেখ আছে তাহা কোন ক্রমেই অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

আর্য্যায়ুর্ব্বেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বোধ হয় ভাবপ্রকাশরচয়িতা একদিকে ধন্বন্তরিকে কাশীরাজগোত্রী ও অপরত্র বিষ্ণুপুরাণে কাশীপুত্র ধন্বন্তরির উল্লেখ দর্শনে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন; এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ ভিন্নজাতীয় হইয়াও যে সূর্য্য চন্দ্রাদি বংশীয় ও শাণ্ডিল্য ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রান্তর্ভূত হইতে পারেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ধন্বন্তরি ক্ষত্রিয় হইলে, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র সুশ্রুত তাঁহার পাদগ্রহণ করিয়া প্রণাম করিতেন না। যদি আমরা এরূপ কল্পনা করি যে ধন্বন্তরি দুই বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আদৌ বৈদ্যবংশ প্রবর্ত্তকরূপে, দ্বিতীয়তঃ ক্ষত্রিয়নৃপতিরূপে আয়ুর্ব্বেদে উপদেশ দিয়াছেন, এরূপ হইলে ভাবপ্রকাশ ও পুরাণের মিমাংসা হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে আপত্তি উপস্থিত হয়। কুত্রাপিও ধন্বন্তরির দ্বিতীয় অবতারের উল্লেখ নাই। সুশ্রুতে ও পুরাণে একবাক্যে স্বর্গবৈদ্য ধন্বন্তরিরই উল্লেখ আছে। সুশ্রুতের নানা স্থান হইতে আমরা নিম্নলিখিত বাক্য সংগ্রহ করিলাম।

ধন্বন্তরিং ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠং অমৃতোদ্ভবং চরণাবুপসংগৃহ্য সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি ॥

নিদানস্থান

চিকিৎসিতাং পুণ্যতমং ন কিঞ্চিদপি শুশ্রুমঃ

ঋষেরিন্দ্রপ্রভাবস্যামৃতযোনের্ভিষক্‌গুরোঃ ॥

কল্পস্থান।

যেনামৃতমপাং মধ্যাদুদ্ধৃতং পূর্ব্বজন্মনি।

যতোঽমরত্বং সংপ্রাপ্তাস্ত্রিদশাস্ত্রিদেবেশ্বরাৎ ॥ উত্তরতন্ত্র।

সুতরাং সুশ্রুত, চরক, গারুর ও মার্কণ্ডেয় একই ধন্বন্তরির উল্লেখ করিতেছেন। ভাবপ্রকাশকার অন্যান্য সমুদয় বিবরণই প্রাগুক্ত গ্রন্থকারদিগের অনুরূপ লিখিয়াছেন, কেবল মাত্র কাশীরাজ পুত্র ধন্বন্তরির সহিত গোল করিয়া তাঁহাকে বাহুজ মনে করিয়াছেন। বোধ হয় পুরা-

গোল্লিখিত অলৌকিকাংশে অনাস্থা হওয়াতেই এরূপ গোলে পতিত হইয়াছিলেন।

এই সমস্ত অনুসন্ধানের পর আমরা এই মহাত্মার জীবনী সম্পর্কে এই মাত্র জানিলাম যে তিনি মহর্ষি গালবের পুত্র, বৈশ্যবংশ ললামভূতা বীরভদ্রা ইঁহার জননী। ইনি অম্বষ্ঠ বংশের আদি পুরুষ। অলৌকিক প্রতিভাবলে শরীর বিজ্ঞানের বহুবিধ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া মানব জাতির মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ইহার তিন পরিগ্রহ; একের নাম সিদ্ধবিদ্যা, দ্বিতীয়া সাধ্যবিদ্যা ও তৃতীয়া কষ্টসাধ্য বিদ্যা; ইহাদের গর্ভে সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, ধর, কর, দেব, রক্ষিত, প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পুত্র জন্মে। ভরদ্বাজ, গালব, আত্রেয় প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিবর্গ তৎপ্রতি অতীব ভক্তিমান্ হইয়া তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায় সম্প্রদান করেন। তাঁহার সহজ বৈরাগ্য সন্দর্শন করিয়া মুনিসমাজ তাঁহাকে কাশীরাজ্যে অভিষিক্ত করেন; তদবধি তাহার বিষয়বৈরাগ্য কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল। তথাপি তিনি নামতঃ রাজা থাকিয়া সমস্ত জীবন কার্য্যতঃ আয়ুর্ব্বেদানুশীলনে অতিবাহিত করেন। তিনি বারাণসীর আশ্রমে বসিয়া ঔপধেনব, পৌষ্কলবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত ও সুশ্রুত প্রভৃতি ১০০ শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দেন। যদিচ তৎপ্রণীত সংহিতা আজ কাল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, তথাচ চতুর্দ্দশ খৃঃঅব্দে তাহা বঙ্গদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল।

আত্রেয় ও ভরদ্বাজ।

বর্ত্তমান কালে আয়ুর্ব্বেদীয় যত সংহিতা বর্ত্তমান আছে তন্মধ্যে আত্রেয় সংহিতাই প্রাচীনতম। আত্রেয়, ভরদ্বাজ, গালব ও ধন্বন্তরি প্রায় সমসাময়িক। সুতরাং ধন্বন্তরিসংহিতা ও আত্রেয়সংহিতা এক সময়ের গ্রন্থ। এই প্রস্তাবে আমরা এই প্রাচীনতম সংহিতার বিষয়সকল সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভরদ্বাজ ও আত্রেয়ঘটিত একটি সাধারণ প্রচলিত সন্দেহের আলোচনা করিতে চাই। পাঠক কিয়ৎকাল অবহিত চিত্তে দেখিবেন যে মুদ্রাযন্ত্রাভাবে এদেশের কত অনিষ্ট ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পণ্ডিতবর শিবদাস নানাবিধ গ্রন্থের টিকাকার। তৎপ্রণীত চক্রপাণিকৃত সংগ্রহের টিকা অতীব উপাদেয় গ্রন্থ; এবংবিধ ব্যাখ্যান মূল পুস্তক হইতেও অধিক মূল্যবান, পাঠকের সমধিক উপকারী। তৎপ্রণীত চরকসংহিতার টিকাতে দৃষ্ট হয় যে পুনর্ব্বসু ও ভরদ্বাজ একই* ব্যক্তি। চরকসংহিতাতে উল্লিখিত আছে যে পুনর্ব্বসু অগ্নিবেশ প্রভৃতির উপদেষ্টা, এবং কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে পুনর্ব্বসু

* পুনর্ব্বসুঃ ভরদ্বাজঃ অনেক শিষ্যদ্বারা পুনর্বিদ্যার কারিতত্বা দস্য পুনর্ব্বসুসংজ্ঞা। ইতি শিবদাস গুপ্তঃ।

আত্রেয় মুনির উপাধি মাত্র। আমাদের বিবেচনায় পরোক্ত মতই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কারণ, চরকসংহিতায় স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে ভগবান্ ভরদ্বাজই আদৌ ইন্দ্রসমীপে গমন করেন ও ত্রিস্কন্ধ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আত্রেয়প্রমুখ ঋষিদিগকে উপদেশ দেন। তদনন্তর আত্রেয়, অগ্নিবেশ, ভোগ জাতূকর্ণ,পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি নামক ছয়জন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদে উপনীত করেন। সুতরাং আত্রেয়কেই অনেক শিষ্যদ্বারা পুনর্ব্বিস্তারক বলা যাইতে পারে। অতএব পুনর্ব্বিস্তারক হেতু পুনর্ব্বসু সংজ্ঞা ভরদ্বাজ অপেক্ষা আত্রেয় প্রতিই সমধিক প্রয়োজ্য। পুনর্ব্বসু ও ভরদ্বাজ যদি একই ব্যক্তি হইবেন, তবে চরকসংহিতাতে 'হেতুগর্ভস্য নির্ব্বৃত্তৌ রক্ষৌ জন্মনি চৈবযঃ। পুনর্ব্বসু মতির্যাচ ভরদ্বাজমতিশ্চ যা।' এরূপ শ্লোক কোন মতেই সম্ভবিতে পারে না। পক্ষান্তরে পুনর্ব্বসু ও ভগবান্ আত্রেয় যে একই ব্যক্তির উপাধি ও নাম তাহা চরকের নানা শ্লোকে প্রতিপন্ন হইতেছে। চরক প্রথমতঃই 'ইতিহস্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ' বলিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি পাঠ করিলে কোনরূপেই পুনর্ব্বসু সংজ্ঞা আত্রেয়তে প্রয়োজ্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারা যায় না; 'তমেবমুক্তবন্তমগ্নিবেশং ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয় উবাচ।' চরকে—শারীরস্থানে 'ইত্যগ্নিবেশস্য বচঃশ্রুত্বা মতিমতাংবরঃ। সর্ব্বং যথাবৎ প্রোবাচ প্রশান্তাত্মা পুনর্ব্বসুঃ।'

'যাবন্তঃ পুরুষাস্তাবন্তো লোকা ইতি এবংবাদিনং ভগবন্তং আত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ।' 'সর্ব্বশরীর সংখ্যানপ্রমাণজ্ঞান হেতোর্ভগবন্তমাত্রেয়ং অগ্নিবেশঃ পপ্রচ্ছ। তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ শৃণুমত্তোঽগ্নিবেশ **' চরকে।

এবংবিধ বহুপ্রয়োগ চরকসংহিতায় ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সুতরাং পুনর্ব্বসু ও আত্রেয়ের একত্ব ও ভরদ্বাজের বিভিন্নত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় তিষ্ঠিতে পারেনা। তবে আয়ুর্ব্বেদপারদৃশ্বা শিবদাস যে কেন প্রাগুক্তরূপ ভ্রমাত্মক টীকা লিখিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় বড় কঠিন হইবে না। যিনি আমাদের দেশের হস্তলিখিত প্রাচীনগ্রন্থ পাঁচ সাত খানা পড়িয়াছেন তাঁহাকে এবিষয়ে আর বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবেকনা। 'তিন নকলে আসল খাস্তা' একথা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন; আমাদের বোধ হয় কোন প্রাচীন লেখক লিখিতে লিখিতে ত্যক্ত বা উন্মনস্ক হইয়া 'পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ' স্থানে 'পুনর্ব্বসুঃ ভরদ্বাজ' লিখিয়া ফেলিয়াছেন; অথবা যিনি বক্তা তিনিই আত্রেয় স্থলে ভরদ্বাজ বলিয়া লেখককে ভ্রমপ্রণোদিত করিয়াছেন। কেহ মনে করিতে পারেন যে ইহা শিবদাসের ভুল না বলিয়া কেন আমরা এরূপ কষ্টকল্পনা করিতেছি; তদুত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে

সত্য বটে ' মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' ; তথাপি এস্থলে শিবদাসের ভ্রম হওয়া অপেক্ষা লিপিকরদিগের ভ্রম হওয়াই অধিক সম্ভবপর।

ভগবান্ আত্রেয় ও ধন্বন্তরির ন্যায় এ-কখানা সংহিতা প্রণয়ন করেন। কিন্তু বাঙ্গালাতে এই গ্রন্থ অতীব দুষ্প্রাপ্য। পশ্চিম ভারতবর্ষে বোম্বাই অঞ্চলের সেনেউ * দিগের এই পুস্তকই চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বন। এই গ্রন্থ ছয় পুস্তকে বিভক্ত ও পনর শত শ্লোকাত্মক। প্রত্যেক পুস্তক আবার কএক অধ্যায়ে বিভক্ত ; অধ্যায়সংখ্যা সকলপুস্তকে সমান নহে। ভগবান আত্রেয়, এই গ্রন্থে জল, বায়ু, ঋতু, বয়স ও প্রকৃতির সহিত মানব শরীরের সম্বন্ধ ও ক্রিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জল, দুগ্ধ, ইক্ষুরস প্রভৃতি দ্রবদ্রব্যের গুণাগুণ ও নানা প্রকার ওষধিতরুর ধর্ম্ম ও বহুবিধ অরিষ্টের ক্রিয়া ও উপযোগিতা অতিসংক্ষেপে অথচ সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপরে চিকিৎসা প্রণালীর উপদেশ দিয়া সর্ব্বশেষে ওষধি বিশেষের প্রতিক্রিয়ার উপায় (Antidotes) নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহাকে 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার ' নাম দেওয়া যাইতে পারে।

ভরদ্বাজকৃত কোন সংহিতা ছিল কি না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, থাকিলেও সম্প্রতি লুপ্ত হইয়াছে। ভরদ্বাজ ইন্দ্র হইতে আয়ুর্ব্বেদ লাভ করেন এরূপ প্রথিত আছে। তিনিই আত্রেয়কে এই শাস্ত্রে উপদেশ দিয়া ব্রাহ্মণসমাজে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের মূল কারণ হয়েন। এই ভরদ্বাজ, এবং কাব্য ও নাট্যশাস্ত্রসংহিতাকার ভরদ্বাজ, একই ব্যক্তি কি না নিশ্চয় করিবার কোনও উপকরণ নাই। যদি নাটকাভিনয়ের উপদেষ্টা ভরদ্বাজ বাল্মীকির সমসাময়িক হন, তবে ইহাদিগকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ আয়ুর্ব্বেদোপদেষ্টা ভরদ্বাজ মনুর সুতরাং বাল্মীকির অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।

* ' সেনেউ বোম্বাই অঞ্চলের বৈদ্যদিগের উপাধি আচার ব্যবহার প্রায়ই ব্রাহ্মণবৎ ' । কিন্তু তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ ইহাদের সহিত আদান প্রদান করেন না, অথচ এক পঙ্ক্তিতে আহারাদি করেন। বোধ হয়, ইহারা সেনবংশীয় বৈদ্য হইবেন।

ভালমানুষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গতবারে দেখান হইয়াছে যে, স্বার্থ-ত্যাগ ও প্রলোভন-জয় যে 'ভাল-মানুষের' ব্রত, সেরূপ ভাল-মানুষ সংসারে থাকিয়া হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেই এরূপ বলা হইল না যে সংসার-ত্যাগে ভাল-মানুষ হওয়া যায়। সংসার-ত্যাগে ভাল-মানুষ হওয়া যায় কিনা তাহা একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। আমরা নিম্নে এই প্রশ্নের যথাসাধ্য মীমাংসা করিব।

এই প্রশ্নের মীমাংসা কালে, আমরা শুদ্ধ যুক্তির উপর নির্ভর না করিয়া প্রধানতঃ ইতিহাসের সাহায্য অবলম্বন করিব। পৃথিবীর অতি আদিম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্যেরা 'ভাল-মানুষ' হইবার আশায় কখন বা একক, কখন বা দলে দলে সংসার-ত্যাগ করিয়াছে। গ্রীসের সিনিক (Cynics) রোমের ষ্টোইক্ (Stoics) ইউরোপের ভিক্ষুক পাদ্রী এবং সর্ব্বশেষে ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী, যতী, ভিক্ষু প্রভৃতি এইরূপ সংসারত্যাগীর দৃষ্টান্ত। ইহাদের সংসার-ত্যাগে কি ফল হইয়াছিল বা হইতেছে আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিব।

১ মতঃ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় একরূপ সংসার-ত্যাগী। ইহকালের সুখ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। এসকল বিস্মৃত হইয়া পরকালের উপায় কর, ইহাই ভারতবর্ষের প্রধানতম শিক্ষা। আজি যে এই পাশ্চাত্য স্রোত এত প্রবল হইয়া বহমান হইতেছে, আজি যে এই ধর্ম্ম-সংস্কার নব-বাঙ্গলায় এক প্রকার বিলুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিতেছে, ইহার মধ্যেও সাংসারিক সুখ দুঃখে অবহেলা দেখিতে পাওয়া যায়। সাংসারিক সুখ দুঃখ ক্ষণ-বিধ্বংশী। এই উপদেশ ভারত-বর্ষের আবাল বৃদ্ধের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিয়াছে। সুতরাং সংসার-ত্যাগীর অনুসন্ধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু ভারত-বর্ষের ইতিহাস নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত কেহ শুনিবে না। নতুবা দেখাইতাম যে, তপশ্চরণশীল, গলিতপত্রভোজী, গ্রীষ্মে 'পঞ্চতপকারী' শীতে তরাগ-বাসী মুনি ঋষিরাও স্বর্গবেশ্যার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত তপ যপ ত্যাগ করিতেন। নতুবা দেখাইতাম যে,

ভরত-রাজা রাজ্যস্বজন ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে করিতে এক মৃগ-শিশুতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। নতুবা দেখাইতাম যে দুর্ব্বাসা, বিশ্বামিত্র, অস্টাবক্র প্রভৃতি ঋষিরা সর্ব্বত্যাগী হইয়াও রিপুজয়ে অসমর্থ ছিলেন। নতুবা দেখাইতাম যে, ' রক্তমাংসের ' শরীর বনে গেলেও অল্প বা অধিক পরিমাণে ' রক্তমাংসের ' প্রভাব দেখাইয়া থাকে।

কিন্তু আমরা ইউরোপের দাস। ইউরোপের পোষাক না হইলে পরিধান করিতে ইচ্ছা করে না, ইউরোপের খাদ্য না হইলে খাইতে ইচ্ছা করে না, লেখার মধ্যেও ইউরোপের ঢং(Idioms)না থাকিলে পড়িতে ইচ্ছা করে না। আর, ইউরোপ সভ্যতার আকর, জ্ঞান বুদ্ধির রঙ্গভূমি। ইউরোপ উন্নতি-স্রোতের নিয়ন্তা। ইউরোপ ছাড়িয়া দরিদ্র, পদানত, অর্দ্ধসভ্য ভারতবর্ষের কথা শুনিবে কে ?

ইউরোপে সর্ব্ব প্রথম গ্রীসদেশে সভ্যতার আলোক প্রভাসিত হয়। বহুদিন ধরিয়া জগতের আদি অন্ত প্রভৃতি তত্ত্ব গ্রীসে পর্য্যালোচিত হয়। পরে সক্রেতিসের সময় হইতেই গ্রীসের অবনতির ও সূত্রপাত আরম্ভ হয়। গ্রীস ক্রমশঃই হতবল হইয়া এক শত্রুর পর অন্য শত্রুদ্বারা পদদলিত হইতে থাকে। গ্রীসের বলহানির সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক ও নৈতিক অবনতি দেখিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে আলেক্জাণ্ডারের আবির্ভাবের প্রায় বিংশতি বর্ষের পূর্ব্বে গ্রীসের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে। ধর্ম্ম বিশ্বাস গুণানুলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মন হইতে দূরীভূত হইতেছিল ; নৈতিক শাসন প্রায় কিছুই ছিল না। এই সময়েই আবার এপিকিউরিয়ানেরা (Epicureans) শিক্ষা দিল ' Eat, drink & be merry ' 'হেঁসে খেলে কাল কাটাও, মন, মনের সুখে। বহুদিন হইতেই গ্রীসবাসীরা ভোগবিলাসী হইতেছিল। এপিকিউরিয়ানদের নীতি-উপদেশে ভোগ-বিলাসের শিখা আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। গ্রীসবাসীরা বিমুক্তরজ্জু বলীবর্দ্দের ন্যায় পাপের পথে অপ্রতিহত বেগে চলিতে লাগিল।

এই সময়ে জিনো (Zeno) নামে এক মহাত্মা গ্রীসে আবির্ভূত হয়েন। তিনি গ্রীসকে পুনরায় নীতির পথে ও ধর্ম্মের পথে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংসারে থাকিয়া নীতিশিক্ষা হয় না। সুতরাং জিনো শিক্ষা দিলেন—' সাংসারিক বিপদে অভিভূত হইও না ; সাংসারিক সম্পদে অভিমান করিও না ; এই যে সমস্ত সাংসারিক ঐশ্বর্য্য দেখিতেছ এ সমস্ত বাজিকরের খেলা, সমস্ত নাট্যশালার অভিনয়। এ সমস্তে চিত্ত নিয়োজিত করিও না। নৈতিক উন্নতি মনুষ্য জীবনের প্রধান লক্ষ। যাহাতে সেই লক্ষ্য সুচারুরূপে সংসাধিত হয় সেই চেষ্টা কর ; সংসারে থাকিতে চাও থাক কিন্তু সংসারী হইও না ; কারণ

সংসারী হইলে রিপু-জয় করিতে পারিবে না।' গ্রীস এ উপদেশ শুনিল। (কারণ উপদেশ-দাতার অভাব কোথায়? এই যে ভারতবর্ষ এত অবনত,ইহাতেই কি উপদেশ-দাতার অভাব আছে? প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচক জানেন যে এ অভাব ভারতবর্ষে—বাঙ্গালার—অতি অল্প) কিন্তু গ্রীসের তখন উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলালের ন্যায় গ্রীসবাসীরা ক্রমশঃই পাপের পথে অগ্রসর হইতেছিল। পাপী কবে ধর্ম্মের কাহিনী শুনিয়াছে? সুতরাং জিনোর মত গ্রীস ছাড়িয়া রোমে যাইয়া আশ্রয় লইল। তখন রোম উন্নতির অভিমুখে নব অনুরাগের সহিত ধাবমান। রোম শুনিবা মাত্রই, জিনোর মতকে আদরের সহিত স্বদেশে স্থান দিল। ক্রমে রোমীয় প্রধান লোকেরা সকলেই জিনোর মত অবলম্বন করিল।

জিনোর মত রোমে কিছুকাল রাজত্ব করিল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা মনুষ্যের উন্নতি অতি অল্পমাত্রই সংসাধিত হইল। মনুষ্য তাহার মনুষ্যত্ব ছাড়িতে পারিল না। দেবতা হইবার আশয়ে কিছুকাল অসাধারণ পরিশ্রম ও মনঃকষ্ট স্বীকার করিয়া মনুষ্য পূর্ব্বের ন্যায় রিপুর অধীন হইতে লাগিল। সয়তান ও তাঁহার চিরবিশ্বস্ত পরিচারকেরা পুনরায় মনুষ্য-মনে স্বরাজ্য সংস্থাপন করিল। বামন কিছুকাল প্রাংশুলভ্য ফলের আশয়ে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া পুনরায় যষ্টি অবলম্বনে সাধারণ ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল।

মনুষ্য ভাল মানুষ হইতে পারিল না বটে, কিন্তু ভাল মানুষ হইবার আশা তাহার হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল না। মনুষ্য বুঝিল যে শুদ্ধ সংসার-ত্যাগে ভাল মানুষ হওয়া যায় না। ভাল মানুষ হইবার আশায় মনুষ্য আর একবার সংসার ত্যাগ করিল। কিন্তু এবার শুদ্ধ সংসার ত্যাগের উপর নির্ভর না করিয়া মনুষ্য জগদীশ্বরের সাহায্য অবলম্বন করিল। সংসার ত্যাগ করিব এবং সংসার ত্যাগ করিয়া মহান্ প্রেমপূর্ণ ঈশ্বরের পদাবলুণ্ঠিত হইব, ভাল-মানুষত্ব-লোভীরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইল।

ইউরোপে যাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসার হইতে বিদায় লন, খ্রীষ্টীয় ভিক্ষুক পাদ্রী (Pater) তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সাংসারিক চিন্তা-সমূহের মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম অন্নচিন্তা, দ্বিতীয় পরিবার-প্রতিপালন। খ্রীষ্টীয় পাদ্রী, ধর্ম্মশাসনের দোহাই দিয়া, সমাজ হইতে অন্নের যোগাড় করিয়া লইলেন। দ্বিতীয় চিন্তাও খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর ছিল না। কারণ খ্রীষ্টীয় পাদ্রী দারশূন্য। বিষয় স্পৃহা একবারে ত্যাগ করিবার জন্য খ্রীষ্টীয় পাদ্রী আর এক উপায় অবলম্বন করিল। সে শিক্ষা দিল যে একজনের পাপ অন্যে হরণ করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ পাপ হরণের ক্ষমতা সকলের নাই। যাঁহারা সংসারত্যাগী ও অলোভী, শুদ্ধ তাঁহারাই

এই ক্ষমতা লইতে পারিতেন। সুতরাং সংসারত্যাগী খ্রীষ্টীয় পাত্রীর দুই মহৎ উদ্দেশ্য ছিল।

১ম। ভাল মানুষ হইয়া নিজের মুক্তি সাধন। অলোভী হইবার জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা আমাদের উচিত, খ্রীষ্টীয় পাত্রীর সে সমস্ত ছিল। তিনি অন্যের অন্নে প্রতিপালিত। তিনি গৃহশূন্য, জ্ঞাতিশূন্য ও সমাজশূন্য। সংসারত্যাগে বিতৃষ্ণতা উৎপাদন করিবার জন্য খ্রীষ্টীয় পাত্রী অন্য অন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিল।

কিন্তু এ সকল করিয়াও খ্রীষ্টীয় পাত্রী ভাল মানুষ হইতে পারিয়াছিল কি? উদ্দেশ্য মহৎ, উপায় অমোঘ, কিন্তু কার্য্য উদ্দেশ্য ও উপায়ের অনুযায়ি হইয়াছিল কি? যাঁহারা Froude's History of England পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে অনেকস্থলেই খ্রীষ্টীয়পাত্রীর নৈতিক উন্নতি অতি সৎসামান্য হইয়াছিল। যাঁহারা Confessions of Maria Monk পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন মঠধারী খ্রীষ্টীয় পাত্রীরা তাড়কেশ্বরের মোহন্ত ও তাঁহার অনুচরবর্গ হইতে পাপাচরণে অধিক বড় ছিলেন না।

যদি সংসার ত্যাগ করিয়া কাহারও ভাল-মানুষ হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাহা এ পাত্রীদের ছিল। বাহির হইতে দেখিতে খ্রীষ্টীয় পাত্রীর জীবন অতীব রমণীয়। মাসে মাসে, দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে, খ্রীষ্টীয় পাত্রীরা নব নব ধর্ম্মালোচনা আবিষ্কার করিত। জন্ম, মৃত্যু, সমাধি প্রভৃতি নিত্য কার্য্য সমূহে নব নব ধর্ম্মপ্রণালী প্রদর্শিত হইত। এতদ্ভিন্ন, রোগীর শুশ্রূষা, আর্ত্তের সহায়তা, দরিদ্রের অর্থানুকূল্য, মুমূর্ষুর সান্ত্বনা, পীড়িতের সেবা প্রভৃতি কার্য্য কাথলিক পাত্রীর নিত্যব্রত ছিল। কিন্তু এ সকল উদ্দেশ্য, এবং এ সকল উপায় এত মহৎ ও এত প্রবল হইলেও পাত্রীরা নৈতিক উন্নতির পথে অতি অল্পদূর মাত্রই অগ্রসর হইয়াছিল। Burns(বারন্‌স) এক প্রকার আহ্লাদের সহিত বলিয়াছেন 'A man is a man for all that' আমরা আক্ষেপের সহিত বলি—'A man is a man for all that'*.

পূর্ব্বে এক প্রকার দেখান হইল যে সংসার ছাড়িলেও ভাল-মানুষ হওয়া যায় না। তবে কি স্থির করিতে হইবে যে মনুষ্য কোন অবস্থাতেই ভাল-মানুষ হইতে পারে না। এই মহামূল্য তত্ত্ব দেখাইবার জন্যই কি হাবড়হাটি লিখিয়া নিজের ও পাঠকের শিরঃপীড়া উৎপাদন করিতেছিলাম? যদি শুদ্ধ এই মাত্রই আমার উদ্দেশ্য হয়, যদি বীভৎস মানব-চরিত্রে আর একটি কলঙ্ক দেখান আমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এ প্রস্তাব না লিখিলেই ভাল হইত। 'আমরা কখন ভাল মানুষ হইতে পারি না,' ইহা সত্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু ইহা কাহাকেও

* সমস্ত (সম্পদ, বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য) সত্ত্বেও মনুষ্য মনুষ্য-মাত্র

যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া শিখাইবার প্রয়োজন নাই। তবে আমার উদ্দেশ্য এই মনুষ্য যদি ভাল-মানুষত্ব রূপ আকাশকুসুমের অনুসন্ধান না করিয়া যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে মানসিক প্রকৃতি, ও তদনুযায়ি চরিত্র গঠনের আলোচনায় চিত্ত নিয়োজিত করে, যদি সকলেই এক প্রকারের ভাল-মানুষ হইবার চেষ্টা না করিয়া নিজ২ প্রকৃতি অনুসারে ভাল-মানুষত্ব অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করে,তাহাহইলেও অনেক মনস্তাপ, অনেক মর্ম্মভেদী যাতনা, অনেক সাংসারিক অকুশল পৃথিবীহইতে দূরীভূত হয়।

প্রাণিজগতের ইতিহাস।

প্রাণিবৃত্তান্ত প্রকৃতি জগতের এক অত্যাশ্চর্য্য উপন্যাস, এবং বিজ্ঞানভাণ্ডারের এক অতুল সম্পত্তি। প্রকৃতির আদি নাই, অন্ত নাই, এবং চিন্তার অতি প্রশস্ত ক্ষেত্রেও ইহার যথেষ্ঠ স্থান নাই। এই যে অনন্ত সমুদ্র, অনন্তের তুলনার জন্য কবি-কল্পনার এক মাত্র উপমান, ইহাও প্রকৃতি-জগতের একটি যৎসামান্য অংশ মাত্র; কে তবে ইহার ইয়ত্তা করিবে, অথচ এই বিশাল দৃশ্য সম্মুখে রাখিয়া কেই বা অন্ধের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া রহিবে? মনুষ্যের গবেষণার জন্য ইহা হইতে প্রশস্ততর ক্ষেত্র আর নাই—মনুষ্যের তৃপ্তির জন্য ইহা হইতে অধিকতর উপাদেয় সামগ্রীও কুত্রাপি সম্ভবে না। যাঁহারা নিভৃতকক্ষের অপবিত্র বায়ু সেবনে হৃৎপীড়ায় কাতর হইয়া নৈসর্গিক বায়ু সেবন করিতে অভিলাষী হয়েন, যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন শান্তিনিকুঞ্জে ভ্রমণ করিতে করিতে সুখক্লিষ্ট হইয়া স্বভাবের বৈচিত্র দেখিতে চাহেন, এবং যাঁহারা কবিকল্পনার তরল আমোদে পরিতৃপ্তি উপভোগ না করিয়া প্রকৃতির রম্য উপবনে ভ্রমণ করিতে সুখানুভব করেন, উল্লিখিত প্রকৃতিতত্ত্বের পর্য্যালোচনা অপেক্ষা তাঁহাদের সুখের ও আশার মহত্তর কোন সামগ্রী থাকিতে পারেনা। এ তত্ত্ব সহজ নহে ও সামান্য নহে এবং মনুষ্যের ক্ষণব্যাপি জীবনও ইহার গবেষণার জন্য পর্য্যাপ্ত নহে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির বিভাগানুসারে আপনাদের কার্য্যেরও বিভাগ করিয়া নিয়াছেন। প্রকৃতি দুইভাগে বিভক্ত, চেতন ও অচেতন। এই চেতন আবার প্রাণী ও উদ্ভিদ এই শ্রেণীদ্বয়ে অংশীকৃত। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর সৃষ্টি ও স্থিতির মূলানুসন্ধানের নামই প্রাণিতত্ত্ব। যাঁহারা জড় জগতের নির্জ্জীবতায় কোনরূপ আমোদ অনুভব করেন না, উড্ডীয়মান ও উৎপ্লবমান প্রাণিবৃন্দের প্রকৃতি অবগত হইতে তাঁহাদেরও কৌতূহল জন্মে। এই বিস্তীর্ণ জগত অসংখ্য প্রাণিমণ্ডলের আবাস-স্থল। এমন সুচাগ্র পরিমিত ভূমি স্পর্শ করিতে

পাইবে না, এমন জলবিন্দু দৃষ্টিগোচর হইবে না, যাহাতে বৃহৎ কি ক্ষুদ্র কোনরূপ প্রাণী বিদ্যমান নাই। আবার ইহার প্রত্যেকটি প্রাণী এক একটি স্বতন্ত্র প্রাণীজগত,—প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে শত শত প্রাণী, আবার তাহার শরীরে অসংখ্য প্রাণী, এবং এই অভ্যন্তরের অভ্যন্তরস্থিত প্রাণীর শরীরে আবার প্রাণী! অনুবীক্ষণ দ্বারা তোমার লোমকূপ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে, শত শত প্রাণী উহাতে বিচরণ করিতেছে। অগ্নি যে সর্ব্বভুক, এবং প্রাণিসংহারের সাক্ষাৎ অবতার, তথাচ ইহা প্রাণিশূন্য নহে। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, জল ও স্থলের জন্য যেরূপ বিশেষ বিশেষ জাতির প্রাণী রহিয়াছে, অগ্নির জন্যও সেইরূপ এক বিশেষ জাতীয় প্রাণী আছে। কোন স্থানে অধিকক্ষণ অগ্নি জ্বালিয়া রাখিলেই এই প্রাণীর সৃষ্টি হয়, এবং ইতস্ততঃ ইহাদিগকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। স্থূলাদপি স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এই অসংখ্য জীবমণ্ডলের শ্রেণীবিভাগপূর্ব্বক ইহাদিগকে বৈজ্ঞানিকসূত্রে গ্রথিত করাই প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এইক্ষণে পাঠকবর্গের সমীপে যাহা উপহার প্রেরণ করিতেছি, তৎসম্পর্কে কএকটি কথা বলিয়া আমরা এই অনুক্রমণিকার উপসংহার করিব। বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান লিখিতে যাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার। আত্মতত্ত্বদর্শী এবং অধ্যাত্মসুখবিলাসী আর্য্যঋষিগণ অন্তর্জ্জগতের অভ্যান্তর নিহিত নিগূঢ়তত্ত্ব ছাড়িয়া বহির্জ্জগতের রঙ্গভূমিতে কখনও প্রবেশ করেন নাই; সুতরাং ভারতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রচলন ছিল না। এবং ভারতে ছিলনা বলিয়াই বাঙ্গালায়ও এপর্য্যন্ত ইহার অভ্যুদয় হয় নাই। অন্যান্য বিজ্ঞান সম্পর্কে যে কথা, প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধেও সেই কথা। যদিও এই বিষয়ে দুই এক খানি সামান্য আকারের গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সকলই ইংরাজি হইতে অনুবাদিত এবং আমাদিগের বিবেচনায় পাঠশালার বালকদিগের জন্য লিখিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লিখিতে হইলে, বিশেষ কোন পুস্তক অধ্যয়ন না করিয়া বিজ্ঞানের মূল প্রস্রবণ অধ্যয়ন করিতে হয়। আমি যথাসাধ্য এই পন্থা অবলম্বন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। কিন্তু প্রাণিতত্ত্ব যেরূপ অনন্ত সমুদ্র, তাহাতে ইহা সন্তরণ করিতে যাইয়া কতদূর কৃতকার্য্য হই বলিতে পারি না। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকসূত্র অবলম্বন না করিয়া কেবল কতকগুলি প্রাণীর ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা সফল হইলে, ইহাদের শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিবেশিত করিয়া, বিজ্ঞানের শৃঙ্খলার সহিত ইহাদিগকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল



ভূমণ্ডলে হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জন্তু, এবং বহুকাল হইতে মানবজগতে বিশিষ্টরূপে পরিচিত। যদি শতসহস্র বৎসরের পুরাতন হিন্দুশাস্ত্র পাঠ কর, তবে সেখানেও প্রমাণ পাইবে যে এই জন্তু দীর্ঘকাল হইতেই মনুষ্যের ব্যবহারে আনীত হইয়াছে। দ্বাপরযুগে কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধাদির সময়ও হস্তীর ব্যবহারের সবিশেষ প্রমাণ পরিলক্ষিত হইবে। ত্রেতাযুগের রামায়ণাদি গ্রন্থেও অনেক স্থানে হস্তীর বিষয় উল্লিখিত রহিয়াছে। এবং এতদপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদাদিতেও হস্তী সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। অতএব আমরা এই সমস্ত কারণে, এই প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড জন্তুর ইতিহাস সর্ব্বপ্রথমে লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

ইহাদের বন্যস্বভাব, গৃহাগত হইলে স্বভাবের বৈপরীত্য এবং আধুনিক যে যে প্রণালীতে উহাদিগকে আবদ্ধ করা যায়, তাহার সমস্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল।

হস্তী-শরীরের উচ্চতা সাধারণতঃ ৭ ফিট হইতে ১২ ফিট পর্য্যন্ত, কিন্তু ৯।১০ ফিটের অধিক উচ্চ হস্তী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের ৪টি পাই স্থূল এবং স্তম্ভের ন্যায় গোল। সম্মুখের পা হইতে পাছের পাগুলি কিছু খর্ব্ব। সম্মুখের পায়ে পাঁচ পাঁচটি করিয়া দশটি নখ এবং পাছের দুই পায়ে ৪টি করিয়া ৮টি নখ। কিন্তু সমুদয় নখগুলি সমান অবয়ববিশিষ্ট নহে। মধ্যের গুলি কিছু বড় এবং অন্যান্যগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া গিয়াছে।

ইংরাজী বহুবিধ প্রাণিবৃত্তান্তে দেখা যায় হস্তীর চারিটি পায়ের প্রত্যেক পায়ে পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি থাকে। বাঙ্গলাভাষায় যে কএকখানি সামান্য আকারের প্রাণি-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও ঐরূপ লিখিত। কিন্তু আমরা বহু হস্তী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কোন হস্তীরই ১৮টি নখের অধিক পাইলাম না। সুতরাং অন্যের কথার উপর নির্ভর না করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই যথাযথ বিবৃত করিলাম। আমি শুনিয়াছি, কদাচিত কোন হস্তীর বিশটি নখ দেখা যায়।

হস্তীর শরীরের বর্ণ গাঢ় ধূসর; যতই ইহাদিগের বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই কপালের এবং কর্ণের অপর পৃষ্ঠের চর্ম্মগুলি বিন্দু বিন্দু করিয়া শুভ্র বর্ণ হইয়া যায়। এবং কোন কোন হস্তীর এই সমস্ত

স্থান এত অধিক ধবলবর্ণ হয় যে, যখন তাহার উপর কোনরূপ ময়লা পড়িয়া না থাকে, তখন সেই চর্ম্ম হস্তীর এক শরীরের চর্ম্ম বলিয়াই অনুমিত হয় না। দূর হইতে এইরূপ হস্তিগুলিকে বড় সুন্দর দেখায়।

হস্তীর লাঙ্গুল প্রায় ৩ফিট দীর্ঘ ও নিম্নগামী; উহার অগ্রভাগে একগোছা মোটা চুল সন্নিবিষ্ট আছে, কিন্তু তাহা লাঙ্গুলের চতুর্দ্দিক জড়াইয়া নহে, দুই পার্শ্বে। এই কারণেই স্থুলদৃষ্টিতে লাঙ্গুলের অগ্রভাগটি চেপ্টা বলিয়া বোধ হয়। শরীরের অন্যান্য স্থানও মোটা মোটা লোম দ্বারা আবৃত। কিন্তু সেইগুলি এত দূর-সন্নিবিষ্ট যে, নিকট হইতে না দেখিলে ভাল করিয়া দেখা যায় না। ইহাদের শরীরের বর্ণের সঙ্গে চুলের বর্ণ একেবারে মিশিয়া গিয়াছে, সুতরাং বোধ করি চুলগুলি লক্ষিত না হইবার ইহাও একটি কারণ। মাথার উপরে যে সমস্ত চুল আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত ঘন ও দীর্ঘ এবং স্থুল-দৃষ্টিতেই দৃশ্যমান।

হস্তীর মস্তকের গঠন অতি আশ্চর্য্য। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। দুইটি কুম্ভ একত্র করিয়া উল্টাইয়া রাখিলে উহাদের উপরিভাগ যেরূপ দেখা যায়, হস্তীর মাথার উপরও ঠিক সেইরূপ। এইজন্য প্রাচীন কবিরা উহাদিগকে করিকুম্ভ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে দুইটি সুগোল বস্তুর উপরে কাপড় দিয়া কসিয়া ধরিলে, উহার উপরিভাগ যেরূপ দেখায়, হস্তীর মাথার উপরিভাগও ঠিক সেইরূপ।

কপালের মধ্যস্থানে গোল একটি উচ্চ স্থান আছে, উহাকে ইদানীন্তন হস্তীরক্ষকেরা ' পিত্তোয়াম ' কহে। (বাঙ্গলায় ইহার আর কোন প্রতিশব্দ নাই, এই শব্দটিই বেশ্ প্রচলিত)। এই স্থান হইতে শুণ্ডনামক হস্তীশরীরের একটি আশ্চর্য্য প্রত্যঙ্গ বাহির হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন উহা হস্তীর অস্বাভাবিক অতিরিক্ত একটি প্রত্যঙ্গ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ শুণ্ড মুখের উপরিস্থ ঠোঁট এবং নাসিকার অত্যাশ্চর্য্য অপরিমিত বর্দ্ধিতাংশ। হস্তীর স্কন্ধদেশ অত্যন্ত খর্ব্ব; সুতরাং সম্মুখ ব্যতিরেকে অন্য কোন দিকে একেবারে সর্ব্বশরীর না ফিরাইয়া কিছুই অবলোকন করিতে পারে না। এবং ঐকারণে অন্যান্য পশুর ন্যায় ঘাড় নোয়াইয়া মৃত্তিকা হইতে আহার্য্য বস্তু তুলিয়া লইতেও ইহারা অক্ষম। কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধা উহার একমাত্র শুণ্ডই নিবারণ করিতেছে। হস্তী যখন শ্লথভাবে শুণ্ড ছাড়িয়া দেয়, তখন শুণ্ডের অগ্রভাগ মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াও অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ ভূমিতে গড়াইয়া রহে, কিন্তু আবার বক্র করিয়া সংকোচন করিলে মৃত্তিকা হইতে প্রায় দুই হস্ত থাকে।

শুণ্ড ইহাদের পক্ষে যে কত উপকারী তাহা বলিয়া শেষ করাযায় না, এমন কি উহা না থাকিলে কোন প্রকারে উহারা

যে জীবনধারণ করিতে পারিত এমন সম্ভাবনা ছিল না। হস্তী ইচ্ছামত শুণ্ডকে এদিক সেদিক ঘুরাইতে পারে। এবং ইহা দ্বারা বৃক্ষাদির শাখা ভাঙ্গিতে, মৃত্তিকা হইতে ঘাস তুলিয়া খাইতে এবং প্রয়োজন হইলে শত্রু বিতাড়িত করিতে অক্লেশে সমর্থ হয়। শুণ্ডের অগ্রভাগে বাহিরের দিকের মধ্যস্থলে, অঙ্গুলির ন্যায় প্রয়োজনসাধক একটি সূক্ষ্মাগ্রভাগবিশিষ্ট বর্দ্ধিত চর্ম্ম আছে। উহা দ্বারা অতি সূক্ষ্ম বস্তু, এমন কি সিকি আধুলি প্রভৃতি ও অতি সহজে উঠাইয়া লইতে পারে। শুণ্ড যখন নাসিকা ও উপরিস্থ ওষ্ঠের বৃদ্ধিতাংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তখন নাসারন্ধ্র ও যে উহার মধ্য দিয়া মস্তিষ্ক স্পর্শ করিয়াছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। জলপান করিবার সময়েও ইহারা শুণ্ডদ্বারা জলপান করিয়া থাকে। জলের মধ্যে শুণ্ডের অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া দিয়া জল আকর্ষণ পূর্ব্বক শুণ্ডকে বাঁকাইয়া নিয়া মুখের মধ্যে জল ছাড়িয়া দেয়, এবং যে পর্য্যন্ত পিপাসার নিবৃত্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত এইরূপে জল আকর্ষণ করিয়া নিয়া মুখের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যবীজ (ধান চিনা প্রভৃতি) খাইতে হইলেও ঐরূপ শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণ করিয়া মুখের ভিতরে ছাড়িয়া দেয়। শরীরের কোন স্থান চুলকাইলেও শুণ্ড দ্বারা একখণ্ড কাষ্ঠধরিয়া শরীর চুলকাইয়া লয়। বলিতে কি মনুষ্যেরা শরীর সম্পর্কে যে যে কার্য্য হস্তদ্বারা সম্পাদন করে, হস্তী শুণ্ড দ্বারাই সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রাচীন কালের শব্দস্রষ্টা পণ্ডিত মহাশয়েরা বোধ হয় করিশুণ্ডের এই রূপ ব্যবহার দেখিয়াই উহার নাম 'কর' রাখিয়াছিলেন ; ইদানীং ও মাহুতেরা শুণ্ডকে হস্তীর হাত বলিয়া থাকে। হস্তীর শরীরের আকার যেরূপ প্রকাণ্ড, চক্ষুর অবয়ব তেমনি আবার ক্ষুদ্র। ইহারা সর্ব্বদাই চক্ষুর জন্য ব্যতিব্যস্ত। কোনপ্রকারে চক্ষুর মধ্যে ক্ষুদ্র কাটাদি প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য ইহারা সর্ব্বদা কর্ণকে বিলোড়ন করিয়া চক্ষু রক্ষা করিয়া থাকে।

হস্তীর কর্ণদ্বয় অত্যন্ত বৃহৎ, আকারে প্রায় আমাদের দেশীয় শূর্পের ন্যায়। ইহারা ইচ্ছামত ইহাকে সম্মুখে ও পশ্চাদ্দিকে সঞ্চালন করিতে পারে।

হস্তীর নিম্নের ঠোঁট অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ইহা শুণ্ডের শতাংশের একাংশ ও কার্য্যোপযোগী নহে। উহার আকৃতি ইংরাজী, V অক্ষরের ন্যায়। অর্থাৎ মাঢ়ির অর্দ্ধহস্ত পরিমিত প্রশস্ত স্থান হইতে দীর্ঘেও অর্দ্ধহস্ত পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সরু হইয়া নামিয়াছে। আহার্য্য বস্তু মৃত্তিকায় পড়িতে না দেওয়াই নিম্নঠোঁটের প্রধান কার্য্য। হস্তীর জিহ্বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও স্থূল। মুখহইতে উহা বাহির হইতে পারে না এবং অন্যান্য পশুর ন্যায় কোন বস্তু লেহন করিতে সক্ষম হয় না। হস্তীর সম্মুখের কোন পাটিতেই দন্ত নাই, কেবল মাত্র মাঢ়ীতে

দুই দিকের উপরে ও নীচে ছয়টা করিয়া পেষক দন্ত আছে। এই দন্ত ব্যতীতও পুং হস্তী গুলির শুণ্ডের দুইপার্শ্ব দিয়া অতি প্রকাণ্ড দুইটি দন্তের ন্যায় দুইটি গোল অস্থি নির্গত হয়। কোন কোন হস্তীর এই অস্থিগুলি ৭।৮ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও দেড় ফিট পর্য্যন্ত পরিধি বিশিষ্ট দেখা গিয়াছে। এই দুইটি হাড়কেই আমরা গজদন্ত বলিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দুইটির সঙ্গে হস্তীর যথার্থ দন্তের কোন সম্পর্কই নাই। ইহা দন্ত হইলে অবশ্য মাঢ়ি হইতে নির্গত হইত, কিন্তু ইহার নির্গমন স্থল মাঢ়ি নহে। হস্তীর কপালের হাড় হইতে চক্ষুর নিম্নে এই অস্থি উৎপন্ন হয়; এবং শুণ্ডের ভিতর দিয়া একটি ছিদ্র দ্বারা উহা বাহির হইয়া পড়ে। যদি কেহ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চাহেন, তবে একটি হাতীকে মুখ ব্যাদন করিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে। এই বার আমরা হস্তীর করোটির আকৃতি প্রকাশ করিতে পারিলাম না, সময়ান্তরে পাঠকসমীপে উপস্থিত হইলে, তখন হস্তীর দন্ত সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব। যাহা হউক এক্ষণ আমরা উহাকে গজদন্ত বলিয়াই উল্লেখ করিব। এই গজদন্তের বহির্ভাগ নিরেট এবং যে খানি চর্ম্ম ও মাংসাবৃত সেই খানিই শূন্যগর্ভ।

হস্তিনী গুলিরও মধ্যে মধ্যে এইরূপ দন্ত নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু উহা হস্তীর দন্তের এক দশমাংশও স্থূল ও দীর্ঘ নহে। এবং সর্ব্বদাই নিম্নমুখী।

হস্তিনী আঠার মাস গর্ভ ধারণ করিয়া এক কালে একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে। হস্তিনীর বক্ষস্থলে দুইটি স্তন আছে, যে পর্য্যন্ত উহারা গর্ভবতী না হয়, সেই পর্য্যন্ত উহাদের স্তনদ্বয় ভালরূপ দেখা যায় না। প্রসবকাল যতই নিকটবর্ত্তী হয় স্তনযুগল ততই স্ফীত হইতে থাকে। হাতীর দুগ্ধ অতিশয় পাতল; কলেবরের সহিত তুলনায় স্তন যুগলও অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

আমাদের আর্য্য ভাষায় হস্তিশাবকে করভ কহে। করভের শরীরের বর্ণ—ধূসরের উপরে একটুকু রক্তিমাভ; মুখের মধ্যে এবং শুণ্ডের অগ্রভাগে জন্মকালের কিছুদিন পর পর্য্যন্ত মেটে সিন্দুরের ন্যায় লাল থাকে। প্রসবের অব্যবহিত পরেই করভেরা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে, এবং মুখ দিয়া মাতৃদুগ্ধ চুষিয়া খায়। পূর্ণায়তন হস্তী যেমন শুণ্ডদ্বারা পানীয় আকর্ষণ করিয়া লয়, করভেরা সেইরূপ করে না; তাহারা তাহাদের মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময় শুণ্ডটি ঊর্দ্ধে উঠাইয়া অন্যান্য পশুর মত মাতৃস্তন মুখে লয়, এবং চুষিয়া চুষিয়া দুগ্ধ পান করে। করভগুলি সর্ব্বদা উহাদের মাতার নিকটে নিকটে থাকে, মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যত্র গমন করে না। বৃন্দগুলি জলে নামিবার সময়ও উহারা সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া সন্তরণ করে, এবং পরিশ্রান্ত হইলে মাতৃপৃষ্ঠে ভর করিয়া বিশ্রাম করে।

হস্তিজাতি অপরিসীম বলশালী। বহুতর লোক একত্র হইয়া যে বস্তু একটুকুও নাড়িতে না পারে, হস্তী অবলীলাক্রমে সেই বস্তু লইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে এই জগতে হস্তীর ন্যায় বলশালী অন্য কোন জন্তু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহারা অত্যন্ত বলশালী হইলেও স্বভাবতঃ ভীরু এবং মৃদুল। এমন কি, কোন ক্ষুদ্র প্রাণীর শব্দ শুনিলেই অমনি ভয়ে জড়সড় হইয়া পলায়ন করে, এবং পলাইবার সময়ে সম্মুখে প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি থাকিলেও ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া যায়।

হস্তী সর্ব্বদা দলবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে। হস্তীর দলের মধ্যে কখন কখন একশত হস্তীর অধিক ও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে একটির অধিক দুইটি পুংহস্তী সচরাচর দেখা যায়না। পুংহস্তীগুলিকে সাধারণ ভাষায় ' গুণ্ডা ' বলিয়া থাকে। যদি অকস্মাৎ সেই দলে অন্য একটি গুণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধারম্ভ হইয়া থাকে, এবং সেই যুদ্ধে যে জয়লাভ করে, সেই ঐ দলের দলপতি হইয়া পড়ে, এবং অপরটি পলাইয়া যায়। দলের মধ্যে আরও অল্পবয়স্ক পুংহস্তী থাকে বটে, কিন্তু সেই গুলির সঙ্গে বড়টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। এইরূপ অল্পবয়স্ক পুংহস্তীগুলিকে, ইদানীং মাহুতেরা পাঠ্‌ঠা কহে। গুণ্ডাগুলির প্রকাণ্ড দুইটি দন্ত আছে বলিয়াই হস্তীর তথাবিধ বৃহৎ দল হইতে, প্রথম দৃষ্টিতেই উহাদিগকে হস্তিনী হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি উহাদিগের এইরূপ দন্ত না থাকিত, তবে স্থূলদৃষ্টিতে গুণ্ডাগুলিকে পৃথক করিয়া লওয়া যাইতনা। পুংহস্তীর মধ্যে কোন কোন গুলির ঐরূপ বৃহৎ দন্ত নির্গত হয় না, এই প্রকার পুংহস্তীগুলিকে ' মখ্‌না ' কহে। যে কারণে কোন কোন পুরুষের দাড়ি গোপ হয় না, সেই কারণে কোন কোন পুংহস্তীরও দন্ত বাহিরে আইসে না। এই প্রকার পুংহস্তীগুলিও পূর্ব্বোক্ত দলের মধ্যেই যাতায়াত করে।

কোনরূপ ভয়ের কারণ হইলে অল্পবয়স্ক এবং দুর্ব্বল হস্তীগুলিকে মধ্যে রাখিয়া সবলগুলি চতুর্দ্দিক বেস্টন করিয়া থাকে। স্থানান্তরে যাইবার সময়ও সবল গুলি অগ্রপশ্চাৎ থাকিয়া দুর্ব্বলগুলিকে মধ্যে রাখে। হস্তীর গতি অতি মনোহর এবং মৃদু। যখন স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্তমনে গমন করিতে থাকে, তখন প্রকৃতই বড় সুন্দর দেখায়। প্রাচীন কবিরা হস্তীর মন্থর গমনের সঙ্গে রূপসী কুলকামিনীগণের পাদচালনার তুলনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। হস্তীর গমনের দুই তিনটি বড় আশ্চর্য্য রীতি আছে। প্রথমতঃ, একদল একস্থান দিয়া চলিয়া গেলেও পায়ের বিশেষ কোন শব্দ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অগ্রবর্ত্তী হস্তীটি যেস্থানে পদ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইবে, পশ্চাদ্বর্ত্তীগুলিও ঠিক সেই স্থানে পা ফেলিয়া চলিবে। সুতরাং

বহুসংখ্যক হস্তী এক স্থান দিয়া চলিয়া গেলেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না দেখিলে একটি হস্তী ভিন্ন দুইটি হস্তীর পদচিহ্ন বলিয়া অনুমান করা যায় না। তৃতীয়তঃ, ইহারা কোন জঙ্গলাবৃত স্থান দিয়া চলিয়া যাইবার সময় শুণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা পদনিক্ষেপোপযোগী স্থান স্পর্শ করিয়া লয়; যদি জানিতে পারে যে এই স্থানে পা ফেলিলে, পায়ে কোনরূপ আঘাত লাগিবে,কিংবা স্থান অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত হইলে পা গাড়িয়া পড়িবে,তাহা হইলে আর কোন ক্রমেই সেই পথ দিয়া যাইবে না। হস্তীগুলি যখন স্বাভাবিক গতিতে চলিয়া যায় তখন তাহাদের সম্মুখের পা যেস্থানে পড়ে, পাছের পাও ঠিক সেই স্থানেই নিক্ষিপ্ত হয়।

হস্তীর ভীরুতার কথা পুর্ব্বে বলিয়াছি, এবং উহারা সামান্যভয়েই যে পলাইয়া যায়, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি; আর একান্তই যদি পলাইবার কোন পথ না দেখে, তবে তাহারা সেই ভয়দর্শকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। উহাদিগের আঘাত করিবার প্রধানতম অস্ত্রই দন্ত, এবং দন্তীগুলিই প্রথমে আসিয়া আক্রমণ করে। যদিও পা এবং শুঁড়ের দ্বারা হস্তিনীগুলি আঘাত করে,কিন্তু তাহা গুণ্ডাদন্তের আঘাতের ন্যায় তত ভয়ানক নহে। দুইটি গুণ্ডার যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন দন্তই উহাদের প্রধান শস্ত্র। এতদ্ব্যতিত অন্য কোন সময়ে উহাদিগকে দন্ত ব্যবহার করিতে দেখা যায় না।

হস্তী-জাতির শরীরাভ্যন্তরে স্বভাবতঃ অধিক মাত্রায় বসা আছে, এই জন্যই উহারা অধিক ক্ষণ রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। একটু উত্তপ্ত হইলেই জলে গিয়া সর্ব্বশরীর ডুবাইয়া রাখে। হস্তিজাতি অত্যন্ত সন্তরণ-পটু। ক্রমাগত ২।৩ প্রহর কাল তেমন স্রোতস্বতী নদীতেও সন্তরণ করিতে পারে। সন্তরণের সময় উহাদের প্রায় সমস্ত শরীরই জলে ডুবিয়া রহে। কেবল পৃষ্ঠের উচ্চভাগ ও মস্তকের একটু অংশ জলের উপরে থাকে। আবার কখন কখন তাহাও দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতে হইলে এক এক বার শুণ্ডটিকে জলের উপর উঠাইয়া লয়।

হস্তীর সর্ব্বাঙ্গে কখনও স্বেদ জল নির্গত হয় না, যদি কখনও অতিরিক্ত মাত্রায় পরিশ্রম করে, ও জলে নামিতে না পায়, তাহা হইলে উহাদিগের পায়ের নখের গোড়া হইতে এক প্রকার জল নির্গত হইতে থাকে। হস্তী-শরীরের ঘর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিতে হইলে উহাকেই বলা উচিত।

উদ্ভিদই হস্তিদিগের একমাত্র আহার্য্য। এবং ইহারা প্রত্যেকেই প্রতিদিন ৪।৫ মণ করিয়া আহার করিতে পারে। যে কোন স্থানে যাইয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই স্থানেই উদরপুরণ অপেক্ষা পদমর্দ্দনাদি হইতে অধিকতর অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহারা কিছুই না দেখিয়া খায় না। আ-

হার্য্য বস্তু কোনরূপ দুর্গন্ধ যুক্ত হইলে,তাহা অমনি ফেলিয়া দেয় । শুণ্ডের দ্বারা আহারের জন্য এক বোঝা ঘাস ধরিয়া লইলে তাহা পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে পায়ের মধ্যে এমন করিয়া ঝাড়িতে থাকে যে, উহার অর্দ্ধেক ঘাসও মুখে তুলিয়া দিতে পারে না, সকল গুলিই পড়িয়া যায় । কিন্তু তথাপিও অপরিষ্কার খায় না । কদলী বৃক্ষ, ঘাস, বাঁশপাতা, এবং ধান্যই ইহাদিগের প্রধান খাদ্য । শীতকালে যখন ঘাস ইত্যাদি অন্যান্য দ্রব্য খাইতে না পায়, তখন কেবল কদলীবৃক্ষ আহার করিয়া থাকে । কখন কখন বট অশ্বত্থ ও ডুমর গাছের ডাল ও আহার করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে যে কি সুখ তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা । আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যদি ইহার কেহ কিছু জানেন, তবে জানাইলে বাধিত হইব ।

হস্তীর শরীরাভ্যন্তরে পানীয় জল সঞ্চিত রাখিবার জন্য, পাকস্থলী ভিন্ন অন্য একটি স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে । শুণ্ড দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া ঐ যন্ত্রটি পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, এবং আবশ্যক মত তথা হইতে আবার শুণ্ড দ্বারাই জল বাহির করিয়া লইতে পারে । যদি উহারা রৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া জলে নামিতে না পায়, অথবা পালিত হস্তীকে কার্য্যানুরোধে যথাসময়ে স্নান করিতে না দেওয়া হয়, তবে সেই যন্ত্র হইতে জল আনিয়া সর্ব্ব শরীরে সিঞ্চন করিয়া দিতে থাকে । হস্তিজাতির অত্যাশ্চর্য্য অপত্যস্নেহ । উহাদের বংশপরম্পরা অবচ্ছিন্ন ভাবে একত্র থাকিলে একে অন্যকে চিনিতে পারে ।

হস্তীর বয়ঃকাল ১০০ শত বৎসর । কিন্তু এত দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকিতে আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই । শুনিতে পাই ইহা অপেক্ষাও নাকি আরও অধিক দিন ইহারাবাচিয়া থাকে । পৃথিবীর দুইটি মাত্র মহাদেশ ইহাদের বাসস্থান, এসিয়া এবং আফ্রিকা । প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে হস্তীর প্রতিমুর্ত্তিটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমাদের এসিয়ার হস্তী । ভবিষ্যতে আফ্রিকার হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি সহ উহাদের বিবরণ যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা বিবৃত করিতে যত্নবান থাকিব ।

হস্তীর সাধারণ স্বভাব সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত কথা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা এক প্রকার পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের অপরিসীম বুদ্ধি কৌশলে ও অসাধারণ চাতুর্য্যে যে কি প্রকারে এই ভয়ঙ্কর বলশালী প্রকাণ্ডায়তন জন্তু ধৃত হইয়া সহস্র প্রকারের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার বিস্তীর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল । কি প্রণালীতে এই জন্তু অতি প্রথমে মনুষ্যের করায়ত্ত হইয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আজি পর্য্যন্তও জানিতে পারিনাই । আমরা অনুসন্ধানে থাকিলাম, যখনই জানিতে পারিব তখনই সাধারণ সমীপে প্র-

কাশ করিব। ইদানীং ইহাদিগকে যে প্রণালীতে আবদ্ধ করা হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

হস্তী ধরিবার নিমিত্ত এক্ষণ তিনটি প্রণালী প্রচলিত আছে। ইহার একটির নাম পরতালা শিকার, অন্যটির নাম ফাঁসি এবং তৃতীয়টির নাম খেদা শিকার।

১ম। পরতালা শিকার—এই শিকারে কেবল গুণ্ডা হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। ইহাতে কেবল ৩ টি পালিতা কুন্‌কীর আবশ্যক। কুন্‌কী দেখিলে বন্যগুণ্ডা হস্তী দৌড়িয়া পলায়ন করে না, বরং দাঁড়াইয়া থাকে। এই সময় মাহুতেরা দুইটি কুন্‌কীকে গুণ্ডার দুই পার্শ্বে এমন ভাবে চাপাইয়া রাখে, যেন গুণ্ডা কোন মতেই মাহুতদিগকে দেখিতে না পায়; অর্থাৎ পার্শ্বস্থ কুন্‌কী দুইটির মুখ, গুণ্ডার মুখের বিপরীতদিক করিয়া রাখে। গুণ্ডা যদি কিছু কিছু করিয়া অগ্রসর হয়, তবে পার্শ্বস্থ কুন্‌কী দুইটির মুখ না ফিরাইয়া উহাদিগকে পিছেরদিকে হটাইয়া নিয়া যায়। কিন্তু কোন মতেই পার্শ্বের চাপা ছাড়িয়া দেয় না। এই সময়ে তৃতীয় পালিতা হস্তিনীটি একেবারে গুণ্ডার পিছনে আনিয়া রাখে, এবং উহার উপরেই দাইদার (হস্তী বন্ধনকারী) দড়ি কাছি প্রভৃতি লইয়া প্রস্তুত রহে, গুণ্ডাটি একটুকু স্থির হইয়া দাঁড়াইলে, অমনি সে হস্তী হইতে নামিয়া গুণ্ডার পাছের দুই পা একত্র করিয়া কাছি জড়াইতে থাকে। হতভাগা গুণ্ডা ঐ কুন্‌কী দেখিয়া এমনি মোহিত হইয়া যায় যে, উহার পাদদেশে কি ঘটনা হইতেছে তাহার অণুমাত্রও অনুসন্ধান করে না। পায়ের নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত কাছি জড়াইয়া ফেলিতে পারিলেই উহাকে আবদ্ধ করা হইল। ইহার পরে যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে উহার গলা ও বক্ষ জড়াইয়া দড়ী লাগাইতে থাকে ও একটি বৃহৎ বৃক্ষের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে।

২য়। ফাঁসি শিকার—এই শিকারে কেবল কুন্‌কী হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। বন্যকুন্‌কীগুলি পালিতা কুন্‌কীর পৃষ্ঠদেশে লোক দেখিতে পাইলেই প্রাণপণ করিয়া দৌড়িতে থাকে, তখন মাহুতেরাও উহার পিছে পিছে পালিতা কুন্‌কী ধাবিত করিয়া দেয়; এবংপালিতা কুন্‌কীটি দৌড়িয়া গিয়া বন্য কুন্‌কীর পাশাপাশি হইলে, অমনি একজন মাহুত বন্য হস্তিনীটির মস্তক এবং শুণ্ডের উপর দিয়া মোটা রজ্জু নির্ম্মিত ফাঁসি ফেলিয়া দেয়। আর ফাঁসিটি ক্রমশঃ টান লাগিয়া গলায় কসিয়া ধরে। ফাঁসি গলায় লাগাইবার সময়ে যদি বন্যহস্তিনীটি উহা শুঁড়দিয়া ফেলিয়া দেয়, তবে অনায়াসেই রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিহীনা হস্তিনী তাহা না করিয়া ভয়ে শুণ্ড সংকোচন করে, আর অমনি ফাঁসিও গলায় লাগিয়া যায়। এই প্রকার শিকারে প্রত্যেক হাতীতে দুইটি লোকের আবশ্যক। একটি চালক ও এ-

কটি বন্ধনকারী। যদি বন্য হস্তিনীটি দুর্ব্বল হয়, তবে একটি পালিতা হস্তিনী দিয়াই উহাকে ধরা যায়, কিন্তু বলিষ্ঠ হইলে দুইটি পালিতা হস্তিনীর আবশ্যক।

এই প্রকারে গলায় ফাঁসি লাগাইয়া পূর্ব্বোক্ত শিকারের ন্যায় ইহাদিগকেও বড় বড় গাছের সঙ্গে আনিয়া বান্ধিয়া রাখে।

পরভালা এবং ফাঁসি শিকারে একবারে একটি হস্তীর অধিক আবদ্ধ করা যায় না। বোধ হয় পাঠক মহাশয়েরা এই শিকারের প্রণালী পাঠ করিয়াই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

৩য়। খেদা শিকার;—এই শিকার পূর্ব্বোক্ত শিকারদ্বয় হইতে একবারে স্বতন্ত্র, এবং ইহাতে এক সময়ে অনেকগুলি হস্তী ধরা যাইতে পারে। যে স্থানে হস্তীগুলিকে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখা যায়, শিকারীরা সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে বহু পরিমাণ ভূমি বেষ্টন করিয়া অন্তরঃ ৭।৮ হাত অন্তর এক একজন প্রহরী রাখিয়া দেয়, ঐ প্রহরীরা প্রত্যেকে স্ব স্ব নিকটবর্ত্তী স্থানে দুই একখানা করিয়া থাম গাড়িয়া রাখে, এবং সেই থামে লতা পাতা জড়াইয়া একটা বেড়া প্রস্তুত করে। এই বেড়াকে পাতবেড় কহে। হস্তীগুলি 'আবদ্ধ হইতেছি' ইহা যেন বুঝিতে না পারে, তজ্জন্য প্রহরীরা এই সময় নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। যদি কোন হস্তী এই সময় এই বেড়ার বাহির হইতে চায়, তবে যাহার নিকট দিয়া বাহির হওয়ার চেষ্টা করে, সে হয় বন্দুকের শব্দ করিয়া, না হয় অন্য কোন প্রকারে ভয় দেখাইয়া হস্তীটিকে বেড়ার কেন্দ্রাভিমুখে তাড়াইয়া দেয়। ইহার পরে এই পাতবেড়ের মধ্যে কোন স্থানে একটি সুদৃঢ় খোরাড় প্রস্তুত করা হয়, এই খোঁয়াড় হস্তী শীঘ্র ভাঙ্গিতে পারে না। খোঁয়াড়ের একদিকে একটি দরজা থাকে, এবং একটি কবাট উহার উপরে এমন কৌশলে স্থাপিত করা হয়, যেন উহা ছাড়িয়া দিবামাত্র দরজা একবারে বদ্ধ হইয়া যায়। অতঃপর কৌশলে আবার ঐ পাতবেড় হইতে সমগ্র হস্তীগুলি এই খোঁয়াড়ে আনিত হয় এবং আনিয়াই কবাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পরে পালিতা কুন্‌কী ঐ খোঁয়ারে নিয়া বন্য হস্তীগুলিকে ইচ্ছামত পায়ে কি গলায় দড়ী লাগাইয়া বড় বড় গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হয়।

বন হইতে ধরিয়া আনিলে ইহারা সহজেই মনুষ্যের বশ্যতা স্বীকার করে, কখনও বা সদ্ব্যবহারে এবং কখনও বা কঠিন শাসনে উহাদিগকে সন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট করিতে হয়। প্রথমতঃ, ধৃত হস্তীর গলার সঙ্গে পালিত হস্তীর বক্ষ একত্র বন্ধন পূর্ব্বক মনুষ্যালয়ে আনয়ন করা হয় এবং কিছুদিন কেবল উহাদিগের আহার যোগাইয়া পরে একটি বংশখণ্ডের অগ্রভাগ ৯।১০ ভাগে চিরিয়া দূর হইতে উহাদের

গা ঘর্ষণ পূর্ব্বক শুড়শুড়ি নিবারণ করা আবশ্যক। এইরূপে শুড়শুড়ি কিছু ভাঙ্গিলে পালিতা কুন্‌কীর পৃষ্ঠে বসিয়া ক্রমে ক্রমে উহার পৃষ্ঠে চড়িতে যত্ন করিতে হয়, এবং পালিতা কুন্‌কীর সঙ্গে বাঁধিয়া উহার সহিত এদিক ওদিক ফিরাইতে হয়। এইরূপ ফিরাইবার সময় উহার অগ্রে অগ্রে একজন মানুষ দৌড়াইয়া যায় ও উহার পৃষ্ঠদেশেও একজন মানুষ উপবিষ্ট থাকে। এই সময় মানুষের ইচ্ছার বহির্ভূত কোনরূপ আচরণ করিতে চাহিলে উহাদিগকে অঙ্কুশ বা বল্লম দ্বারা আঘাত করিতে হয়। এইরূপ কয়েক দিন অভ্যাস করিলেই বন্য হস্তীরা মানুষের সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়া পড়ে। পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উহাদিগকে বসিবার প্রথা শিক্ষা দিতে হয়। কএক দিন ভাল করিয়া স্নানাদি না করাইয়া প্রায়শঃই রৌদ্রে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, পরে একদিন জলে লইয়া গেলে, উহারা আপনা হইতেই জলে বসিবার উপক্রম করে, আর অমনি মাহুতেরা 'বট, বট,' করিতে থাকে। এবং কিছু দিন এইরূপ করিলে উহারা জলে ও শুষ্কস্থানে 'বট্' বলিলেই বসিয়া পড়ে। যদি কোন হস্তী বসিতে না চায়, তবে বল্লমদ্বারা উহার পৃষ্ঠ এত জোরে জাঁতিয়া ধরিতে হয়, যে উহারা আর না বসিয়া থাকিতে পারেনা। কোন কোন হস্তীর স্বভাব আবার এমনি দুষ্ট যে উহারা অনাহারে মরিয়া যাইবে, তথাপি মানুষের বশ্যতা স্বীকার করিবে না। এবং কোনটি বশ্যতা স্বীকার করিলেও মনের কুটিলতা ছাড়িবে না। কিন্তু এই প্রকার অসরল এবং দুষ্টমতি হস্তী একশতের মধ্যে একটি হয় কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, হস্তী বসিবার সময় সমুখের পা সম্মুখের দিকে ও পিছনের পা পিছের দিকে প্রসারণ করিয়া দেয়। এবং ভালরূপ বসিলে উহাদের উদরের চর্ম্ম মৃত্তিকা স্পর্শ করে।

হস্তীকে ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিলে উহারা প্রয়োজনোপযোগী বহুবিধ কার্য্য করিতে পারে। বৃক্ষাদি ভাঙ্গা, দ্বারোদ্ঘাটন করা ও শুণ্ডদ্বারা মশাল ধরা প্রভৃতি কার্য্য ইহারা অনায়াসে করিতে পারে।

কুন্‌কী এবং গুণ্ডা এতদুভয়ের মধ্যে কুন্‌কীগুলি পালিতেই অত্যন্ত সুবিধা। ইহারা শীঘ্রই বশ্যতা স্বীকার করে ও নানা রূপ কার্য্য করিতে পারগ হয়, এবং একবার বাধ্য করিতে পারিলে আর অবাধ্য হয় না, বরং ক্রমশঃ অধিকতর বশীভূত হইতে থাকে। গুণ্ডাগুলি যদিও মনুষ্যের কঠোর শাসনে বাধ্য না থাকিয়া পারে না, তথাপি বৎসরের মধ্যে বিশেষতঃ শীতকালে উহাদিগের শরীরের এতদূর তেজ বৃদ্ধি হয় যে, তখন আর কোনরূপেই শাসনের অধীনেআসিতে চাহে না। যাহাকে সম্মুখে দেখে তাহাকেই মারিতে উদ্যত হয়।

হস্তীর কপাটির উভয় পার্শ্বে দুইটি

ছিদ্র আছে। গুণ্ডাগুলি যখন তথাবিধ উত্তেজিত হয়, তখন সেই ছিদ্রদ্বয়দ্বারা অনবরত এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হইতে থাকে *; কিন্তু উত্তেজিত না হইলে উহা হইতে কিছুই নির্গত হয় না। কেবল ছিদ্রের চিহ্নমাত্র থাকে। কুন্কী হস্তীরও কপাটিতে এইরূপ দুইটি ছিদ্র আছে বটে, কিন্তু উহাদিগকে কখনও উত্তেজিত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ঐ ছিদ্র দ্বারা কোনরূপ পদার্থেরও নির্গমন দৃষ্টিগোচর হয় না। গুণ্ডাগুলি যখন মনুষ্যালয়ে এইরূপ ভীষণ আকার ধারণ করে, তখন উহাদিগকে ‘কেতিলা’ প্রভৃতি শীতল দ্রব্যাদি আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক; শরীর শীতল হইলেই মৃদুভাবে আবার মনুষ্যের বশ্যতা স্বীকার করে।

প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তারাও উত্তেজিত হস্তীতে আরোহণ করা নিষেধ লিখিয়াছেন, যথা—

‘নারোহেৎ কামুকোন্মত্তম্ গজং রাজা কদাচন,
আরুহ্য কামুকং তন্তু পরত্রেহ বিষিদতি।’

মখ্না জাতীয় অন্য একপ্রকার পুংহস্তীর কথা যে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, উহারাও উত্তেজিত হইলে ভয়ানক রূপধারণ করে। উহারা দন্ত না থাকা প্রযুক্ত যদিও গুণ্ডা অপেক্ষা অনেকাংশে হীনপ্রভ, তথাপি মনুষ্যাদি বিনাশ করিবার জন্য করপদসঞ্চালনে বিশেষ পটু। আমরা দেখিয়াছি, একটি উত্তেজিত মখ্না হাতী পৃষ্ঠস্থিত মাহুতকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া পদাঘাতে উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিল।

অন্যান্য পশুর ন্যায় হস্তীর মুষ্ক বাহ্যিক দৃষ্টিগোচর হয় না, উহা পিছের পায়ের উভয় পার্শ্বে মাংসের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট।

মনুষ্যেরা হস্তীর শরীরের গঠনকে ত্রিবিধরূপে বর্ণন করিয়াছেন। উহাদিগের নাম—‘কুমারিয়া’ ‘মৃগা’ ‘দোনসলা’। ইহার প্রথম নামটি বোধ হয় ‘কুম্ভীর’ হইতে নেওয়া হইয়াছে। কুম্ভীরের চর্ম্ম যেমন বন্ধুর, ‘কুমারিয়া’ জাতীয় হস্তীরও শরীর সেইরূপ দৃঢ় ও বন্ধুর। হস্ত পদাদির গঠনও অতি বলিষ্ঠ ও স্থূল। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলেই এই জাতীয় হস্তীকে অসাধারণ বলশালী বলিয়া অনুমিত হইবে।

‘মৃগা’—আমরা অনুমান করি মৃগ শরীরের গঠনাদি দেখিয়াই এই জাতীয় হস্তীর ‘মৃগা’ নাম দেওয়া হইয়াছে। ‘মৃগা’ হস্তীর শরীরের চর্ম্ম অপেক্ষাকৃত পাতল; পাগুলি দীর্ঘ ও তত মাংসল নহে, শরীরের বর্ণ ঈষৎ রক্তিমাবিশিষ্ট, কিন্তু উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া উঠিতে পারা যায় না। এইগুলির সামর্থও অনেক কম এবং ইহারা তত শ্রমসহিষ্ণুও নহে।

‘দোনস্‌লা,—ইহাদের শরীরের গঠন পূর্ব্বোক্ত দুইজাতীয় হস্তিগঠনের মি-

* আমাদের প্রাচীন কালের কবিরাও ইহা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন,—

“ত্যক্তং মত্তকরীন্দ্র গণ্ডযুগলং ভূয়শ্চলৎ কর্ণয়োঃ বিদ্বেষান্নিকটেপি—”

শ্রণে উৎপন্ন। ইহারা 'মৃগা' জাতি হইতে অধিকতর বলশালী ও শ্রমসহিষ্ণু। হস্তী ধরিবার কালে 'কুমারিয়া' ও 'দোনস্‌লাই' অধিক কার্য্য করিতে সক্ষম ও মনুষ্যালয়ে ইহারাই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। ইদানীং মাহুতেরা হস্তীর কোন কোন লক্ষণকে নিতান্ত দূষিত বলিয়া মনে করে। এবং উহাদের মনের এই ধারণা যে এবংবিধ লক্ষণাক্রান্ত হস্তী পোষণ করিলে পোষ্টার কোন না কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এইগুলি কোন অংশেও যে পূর্ণলক্ষণাক্রান্ত হস্তী হইতে বলবিক্রমাদিতে ন্যূন, এমত নহে। তবে কেন যে এই সংস্কার তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। নিম্নে উক্ত লক্ষণগুলির নাম লিখিত হইল।

১ সতরখাম, ২ ষোলনখী, ৩ সেহাতালু, ৪ ঝাব্দোম্, ৫ বালখণ্ডী।

১। যে গুলির মেরুদণ্ডাস্থি অস্বাভাবিক উচ্চ ও বক্র,সেইগুলিকে 'সতরখাম' কহে।

২। যে হস্তীর পায়ে ১৮টি নখ না থাকিয়া ১৬টি নখ থাকে, তাহাকে ষোলনখী বলে।

৩। যে গুলির তালুতে কাল কাল দাগ কিংবা তালু একেবারে কাল সেই গুলিকে 'সেহাতালু' কহে।

৪। যে হস্তীর লাঙ্গুল চলিবার সময় মৃত্তিকা স্পর্শ করে, এবং বোধ হয় যেন এদিক ওদিক দুলিয়া ঝাড়ু দিতেছে সেই গুলিকে 'ঝাব্দোম্' কহে।

৫। যে গুলির লাঙ্গুলের উভয়পার্শ্বে লোম না থাকিয়া কেবলমাত্র একপার্শ্বেই লোম থাকে,সেইগুলিকে 'বালখণ্ডী' কহে।

হস্তীর মূল্য অত্যন্ত অধিক। অত্যুৎকৃষ্ট একটি হস্তী পঁচিশ, ত্রিশ হাজার টাকায় পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হস্তী অতি সুশ্রী হইলেও তাহাদের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। হস্তীর দন্ত এবং অস্থিও বহুমূল্যে বিক্রীত হয়, এবং উহা দ্বারা মনুষ্যের বহুবিধ কার্য্যোপযোগী বস্তু নির্ম্মিত হইয়া থাকে। হস্তীদন্তে অত্যুৎকৃষ্ট সিংহাসন, পাটী, কৌটা, হেশুল, চিরুণী, খেলনা প্রভৃতি অতি সুন্দর সুন্দর বস্তু প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বকালে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধাদি করা হইত,কিন্তু এক্ষণ ইহাদিগকে কেবল যুদ্ধসামগ্রী বহন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। কোন হিংস্র জন্তু হত্যা করিতে যাইতে হইলে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। হস্তী আরোহণ করিতে হইলে উহার পৃষ্ঠে গদি কিংবা চারজামা অথবা হাওদা বাঁধিয়া লইতে হয়। ব্যাঘ্রাদি শিকার করিবার সময় হাওদাতেই কিছু কম বিপদের সম্ভাবনা। হস্তিজাতি অত্যন্ত ভীরু, সুতরাং কোন বন্য পশুর সম্মুখে পড়িলে ভয়ে এত জড়সড় হয় যে, কোন দিকে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে পারিলেই নিতান্ত শ্লাঘা মনে করে। কিন্তু মাহুতের অঙ্কুশ তাড়নে তাহা করিতে পারে না, অবশেষে ফোঁস ফোঁস করিয়া শুণ্ড-

দ্বারা ভূমিতে এমন জোরে আঘাত করিয়া থাকে যে সেখানকার মাটি একেবারে উঠিয়া যায়। কোন কোন হস্তী উপযুক্ত রূপ শিক্ষা পাইলে একেবারে নির্ভয় হয়। যদি প্রথম প্রথম শিকারের সময় পলাইবার উপক্রম করিলে মাহুতেরা কোন রূপেই পলাইতে যাইতে না দিয়া দৃঢ়শাসনে শিকারের সম্মুখেই দাঁড় করাইয়া রাখে, তবে দুই চারি বার এইরূপ করিলেই পরে অন্য পশু দেখিয়া আর ভয় পায় না।

হস্তীর স্বর অত্যন্ত কর্কশ, কিন্তু সচরাচর উহারা শব্দ করে না। কোন রূপ ভয় পাইলে অথবা তাহাদের দল হইতে বিচ্যুত হইলে, ভয়ানক এক প্রকার চীৎকার করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া লয়। আবার আহ্লাদের সময়ও গুড় গুড় করিয়া এক অব্যক্ত শব্দ দ্বারা উহাদিগের আনন্দ প্রকাশ করে। আর মনুষ্যের নিজের কার্য্যসাধনের জন্য ডাকাইতে হইলে মাহুতেরা উহাদের কর্ণের মধ্যে একটু অল্প জোরে অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করিলেই চীৎকার করিয়া উঠে। হস্তীর বুদ্ধিশক্তি অত্যন্ত প্রবল; প্রতিপালককে (মাহুতকে) বিপদের সময় রক্ষা করিবার জন্য অনেক হস্তীকে অনেক প্রকার যত্ন করিতে দেখা গিয়াছে। আমরা নিম্নে উহার একটি অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

পূর্ব্ববঙ্গে কোন এক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর বাটিতে পবন নামক * একটি বৃহদাকারের হস্তিনী আছে, উহা এক সময়ে বন্য হস্তী ধরিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। মাহুত যেমনি শিকারের সময় ঐ হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া একটি বন্য হস্তীর পায়ে দড়ী বাঁধিতেছিল, অমনি পশ্চাৎ হইতে আর একটি বন্য হস্তী আসিয়া উহাকে মারিবার উপক্রম করে, মাহুত ইহা দেখিতে পাইয়া ছিলনা,—কিন্তু পালিতা হস্তিনী এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া মাহুতকে শুণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা আপন পৃষ্ঠে আরোহন করাইয়া লইল। পালিতা হস্তিনীটি এইরূপ না করিলে মাহুতের আর বাচিবার সম্ভাবনা ছিলনা।

হস্তী মনুষ্যালয়ে গর্ভবতী হইয়া সচরাচর সন্তান প্রসব করে না। আমরা একটি মাত্র হস্তিনীর মনুষ্যালয়ে গর্ভবতী হইয়া সন্তান প্রসবের বিষয় অবগত হইয়াছি। কিন্তু উহাদের ও বন্দী অবস্থায় সন্তান হয় নাই। পালিতা হস্তিনীর স-

* এই স্থানে উল্লেখ করিয়া রাখা আবশ্যক যে বন্যহস্তী ধরিয়া মনুষ্যালয়ে আনিলে প্রত্যেকটির এক একটি নাম রাখা হয়। উহাদের নাম রাখিবার পদ্ধতি এইরূপ, কুন্‌কীর নাম,—যথা মহেশ্বরী, দৌলতভরি, রতনহার, আনর মালা, মনমতী, নাচভরি, ইত্যাদি। গুণ্ডা হস্তীর নাম যথা—জঙ্গবাহাদুর, গোলকুমার, রূপসুন্দর, ইত্যাদি।

ন্তান হয় কিনা উহা পরীক্ষা করিবার জন্য একটি হস্তী ও একটি হস্তিনী দেশীয় সামান্য বনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল,এবং সেই অবস্থায় উহাদের গর্ভসঞ্চার হইলে, পরে মনুষ্যালয়ে আনিলে সন্তান প্রসব হয়। গর্ভবতী হস্তিনী বন হইতে ধরিয়া আনিলে উহাদের প্রসবক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে মনুষ্যালয়ে সম্পাদিত হয়। প্রসবের সময় উহারা দাড়াইয়া প্রসব করিয়া থাকে।

লোকালয়ে হস্তিনীর যে সন্তান হয়, তাহার কখনও বন্য বুদ্ধি হয় না, শিশুকাল হইতেই নিঃশঙ্ক চিত্তে মনুষ্যের সঙ্গে খেলা করিয়া থাকে। শিশুকাল হইতে মনুষ্য দেখিতে দেখিতে কোন কোনটী এমনি বেআদব হয়, যে সময় সময় কাহারও কথা না শুনিয়া মনুষ্যের অনেক অনিষ্ট করে। রাস্তাদিয়া যাইবার সময় কদলী প্রভৃতি উহাদের কোন খাদ্য বস্তু পাইলে অলক্ষিত ভাবে উহা চুরি করিয়া লইয়া আসিবে এবং মাতার বক্ষতলে আসিয়া অতি আহ্লাদে উহার একটী২ করিয়া খাইতে থাকিবে; আবার মনে করুন, একটী মনুষ্য যেন নিঃশঙ্ক চিত্তে হাটিয়া যাইতেছে, এমন সময় হস্তিশাবকটী চুপে২ উহার পিছের দিকে যাইয়া মস্তক দ্বারা উহাকে এমন আঘাত করিবে, যে তৎক্ষণাৎ সে ভূতলশায়ী হইবে। কিন্তু দুষ্টমতি করভ ইহাতে অত্যান্ত তুষ্ট হইয়া মায়ের বক্ষতলে গিয়া লুকাইয়া রহিবে। করভেরা যে ক্রুদ্ধ কিংবা কুটিল হইয়া মনুষ্যের এই রূপ অনিষ্ট করে এমত নহে, উহারা মনে করে মনুষ্যালয়েই উহাদের আলয় এবং শিশুরা যেরূপ স্বস্ব আলয়ে আবদার করিয়া কখন কখন পরিবারস্থ সকলকেই বিরক্ত করিয়া তুলে, ইহারাও সেইরূপ আপন গৃহ ভাবিয়া লোকের সঙ্গে খেলিতে যাইয়া অনিষ্ট করিয়া বসে। এইরূপ অনিষ্টকারীদের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। ছয় বৎসর পরেই ইহাদিগকে মনুষ্যের প্রয়োজনোপযোগী কার্য্যাদি করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, ইহারা অপেক্ষাকৃত সহজেই কার্য্যাদি শিখিতে পারে। (ক্রমশঃ)



প্রতি সমালেচনা।

সুপ্রসিদ্ধ এডিসন সাহেব লিখিয়াছেন যে, পাঠকদিগের হাতে কোন গ্রন্থ পড়িলেই লেখক কৃষ্ণ কি শুভ্রবর্ণ, শান্ত কি উদ্ধত, অমূঢ় কি বিবাহিত ইত্যাদি অনেক বিষয় তাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক হন, এবং যে পর্য্যন্ত জানিতে না পান, সে পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থ পড়িতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। পাছে বা তীরে আসিয়া তরী ডুবিয়া

যায়, এই ভয়ে গ্রন্থের ভূমিকাতেই তিনি তাঁহার আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। বাঙ্গালী অনুকরণপ্রিয়; আমি তাহার অনুকরণ করিয়া পূর্ব্বেই সাহিত্যসমাজে আমার পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু প্রথমতঃ এডিসন তাঁহার প্রকৃত নামটি গোপন রাখিয়াছিলেন, অনাবশ্যক বিবেচনায় আমি আমার নামটি পর্য্যন্ত সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছি। যাহা হউক এই গুরুতর বিষয়টি অন্যত্র বিস্তৃতরূপে সমালোচিত হইবে। সম্প্রতি যে প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে কিছু আত্মপরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে। প্রবন্ধলেখকমহাশয়েরা মাপ করিবেন, কিন্তু আপনাদের একটি গুরুতর অপরাধ, অথচ একটি সাধারণ রোগ আছে। আপনারা পত্রিকা প্রভৃতিতে যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেন, তাহার অধিকাংশেরই নিম্নে বিঃ শ্রীঃ, ছাঃ, ইঃ, মঃ, টিঃ প্রভৃতি লিখিয়া আত্মনাম গোপন করিয়া রাখেন; আমি যদি সাহিত্যডিপার্টমেণ্টের পোলিষ দারোগা হইতাম, তাহা হইলে আপনাদিগকে এই উদারতার উচিত শিক্ষা দিতে পারিতাম; অর্থাৎ এই সমুদয় প্রবন্ধ নিজের নামে ছাপাইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে পুস্তক বাহির করিতাম। যাহা হউক আপনারা ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন।

আমি সাহিত্যসমাজে বিশেষ পরিচিত, অর্থাৎ অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছি। আমি প্রথম কতকগুলি পুস্তক লিখিয়া সমালোচনার জন্য তদানীন্তন প্রায় প্রত্যেক সম্পাদকের নিকট এক একখানা পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু কেহই তাহার সমাদর করিল না। যাহা হউক তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই; বঙ্গভাষা আজিও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং সমুদয় রস আজিও ইহাতে প্রবেশলাভ করিতে পায় নাই এবং লোকের রুচিও এক্ষণ পর্য্যন্ত সম্যক্ পরিপক্ক হইতে পারে নাই। দেশেরও দোষ বলি না; কারণ ইংলণ্ডেরও এক সময় এইরূপ অবস্থা ছিল; কবিগুরু সেক্ষপিয়র যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন তাহার মহীয়সী শক্তির কেহই অবধারণা করিতে সক্ষম হইল না, এমন কি তাহাকে কবি বলিয়াই কেহ গ্রাহ্য করিল না। আমারও ভরসা ভবিষ্য বংশীয়ের, অন্ততঃ আমার উত্তরাধিকারীগণের হস্তে।

যাহা হউক, সম্পাদকদিগের এইরূপ ঔদাসীন্য দেখিয়া দুঃখিত, বিরক্ত ও আংশিক ক্রুদ্ধ হইলাম, এবং তাঁহারা কোন মতে নিরস্ত থাকিতে না পারেন, ইহা মনে করিয়া পুনরায় গ্রন্থ লিখিতে বসিলাম। এবার আমার উদ্দেশ্য সফল হইল, প্রায় প্রত্যেক পত্রিকাতেই উহার সমালোচনা বাহির হইল; সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি একবাক্যে ইহার প্রশংসাধ্বনি করিয়াছিল বটে, কিন্তু বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, ভারতী, বান্ধব এবং ঐধরাণের কএকখানা মাসিক পত্রিকাতে উহার যেরূপ নিকৃষ্টরূপে সমালোচনা হইয়াছিল, তা-

ছার প্রতিসমালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বান্ধব সম্পাদক মহাশয়, উল্লিখিত পত্রিকাচতুষ্টয়ের সর্ব্বশেষে বান্ধব নাম উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। ইহার কারণ আছে। প্রথমতঃ আপনার পত্রিকাতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি ছাপাইবার মনস্থ করিয়া উহাকেই সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না। দ্বিতীয়তঃ আপনি আমার অত্যন্ত অনিষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং আপনাকে সন্তুষ্ট করাও আমার ইচ্ছা নহে। তথাপি আপনার বান্ধব নামে আকৃষ্ট হইয়া এই সামান্য পত্রখানিকে প্রকাশ করিতে আপনাকে অনুরোধ করি।

পূর্ব্বে যে আত্মপরিচয়ের কথা বলিয়াছি, তৎসম্পর্কে এক সম্পাদক লিখিয়াছেন "গ্রন্থকার তাঁহার নাম গোপন রাখিলেই ভাল হইত।" নাম প্রকাশ করিবার ভয় লোকসমাজে তিরস্কৃত হওয়া। কিন্তু যখন লোকে অপদস্থ হইয়াও সমাজে খ্যাতিলাভ করিতেছে, তখন নাম গোপন করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু খুলিয়া বলিতে গেলে আমার যশোলাভের আর এক সুপ্রশস্ত পথ আছে। আমি গ্রন্থ লিখিয়াছি বলিয়া জগতের শত্রু হই নাই, আমার অনেক মিত্র রহিয়াছে; যাঁহারা আমার মিত্র, স্নেহবশতঃই হউক, কি লজ্জায় পড়িয়াই হউক, তাঁহারা আমাকে অবশ্য প্রশংসা করিবেন, আমি যদি শত্রুদিগের ঢক্কানিনাদ বন্ধুগণের প্রশংসাধ্বনিতে ডুবাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইল, তাহা হইলেই আমার নাম সাহিত্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আমাদের দেশে এ পদ্ধতি ত নূতন নহে, তবে আমার একার নিন্দা কেন?

আর এক কথা, মনে করুন দেশে যেন আমি এত করিয়াও সম্মান লাভ করিতে পারিলাম না। কিন্তু বিদেশীয়দিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাধারণতঃ উদারপ্রকৃতি, এবং যাহারা স্বদেশে ভাষাতত্ত্ববিৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে ইচ্ছুক, সুতরাং যাহারা বঙ্গভাষার কোন পুস্তক পাইলে ন্যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ হন, অথচ বঙ্গভাষা বুঝেন না, এইরূপ ব্যক্তি আমার এই যথাশক্তিপ্রসূত গ্রন্থও মহাসমাদরে গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই। যদি ছলে কৌশলে, ইহাদের নিকট কোন সম্মানিত উপাধিলাভ করিতে পারি, তবে জম্বুকস্বভাব এই বঙ্গবাসীকে কে ভয় করে? আমার যখন এতগুলি আশা সম্মুখে বর্ত্তমান, তখন আত্মপরিচয় দিতে ভয় করিব কেন?

আর এক সম্পাদক লিখিয়াছেন 'গ্রন্থখানি ইংরাজির অনুকরণ, এবং ইহার ভাষা অতি কদর্য্য।' আমি এইরূপ সমালোচনা শুনিয়া অবাক হইয়াছি। বান্ধব সম্পাদক মহাশয় শেষোক্ত বাক্যটি প্রয়োগ করিলে কতক খাটিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহা অপরের মুখে শুনিতে

হইল। যাঁহারা কর্ত্তাকর্ম্ম ঠিক করিয়া লিখিতে জানেন না, এবং বাঙ্গালাভাষার অন্বয়ের সহিত ইংরাজির অন্বয় মিলাইয়া দিতে চান, তাঁহাদের ভাষাবিষয়ে কাহারও নিন্দা না করিয়া আপনাদিগের কলমের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি থাকিলেই ভাল হয়। আর অনুকরণের কথা, যে দেশের লোকেরা ভাষা ছাড়িয়া রুচি, রুচি ছাড়িয়া প্রকৃতি,এবং প্রকৃতি ছাড়িয়া অঙ্গের গঠন পর্য্যন্ত বিলাতি ছাচে ঢালিয়া লইয়াছেন,সেদেশে একে আবার অন্যকে অনুকরণপ্রিয় বলিয়া নিন্দা করে কেন? বঙ্গভাষার অক্ষরের সহিত সংস্কৃত অক্ষরের যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার ভাবের সহিত ইংরাজি ভাবের সেই সম্পর্ক। কিন্তু উল্লিখিত দোষারোপটি আপাতবিষাক্ত হইলেও পরিণামমধুর। ইংরাজির অনুকরণ করিয়াছি, এ কথাতে অবমাননা না বুঝাইয়া প্রশংসা বুঝায়, অর্থাৎ যাঁহারা কালিকার বঙ্গভাষার দুই তিন খানা বহি পড়িয়াই পুস্তক ও সংবাদপত্র ছাপাইতে বসেন, তাহাদের হইতে অন্ততঃ উচ্চতর আসন লাভ করা হইল।

কিন্তু আমি এক সমালোচকের নিনিকট প্রকৃত প্রস্তাবে জব্দ হইয়াছি। অর্থাৎ আমার স্বকপোল কল্পিত একটি মতের সত্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য নিচে এক ইংরাজি গ্রন্থকারের নামে একটি টীকা লিখিয়া দিয়াছিলাম, মনে ভরসা ছিল যে, ইনি সাহিত্যসমাজে বড় পরিচিত নহেন, এবং বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষে বোধ হয় ইহার অন্যতর পুস্তক আর নাই, সুতরাং অল্প লোকেই উহা পড়িয়াছে, অতএব তাঁহার নামে কিছু একটা লিখিয়া দিলে লোকে না পড়িয়াই প্রত্যয় করিবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ উল্লিখিত সমালোচক ঐ পুস্তক খানি সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং আমার চাতুরি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমি এবিষয়ে ইংরাজি পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া বঙ্গীয় নব্যলেখকদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলাম।

এক সম্পাদক বলেন গ্রন্থকার অল্পবয়স্ক। মহাশয়, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমার বয়স এই বিংশতি বৎসর, আমি ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হই। জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গে কয়জন লেখক খুজিয়া পাওয়া যায় যাহারা ষোড়শবৎসর বয়সে বঙ্গীয় সাহিত্যরঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতে আরম্ভ করে নাই?

আর এক আপত্তি এই যে, বঙ্গে আজি কালি অনেকেই কেবল নাটক ও উপন্যাস লিখিয়া বেড়ান। বিজ্ঞান প্রভৃতি কঠোর বিষয়ে কেহই সাহস করিয়া হস্তক্ষেপ করেন না। ইহা হইতে অধিকতর প্রলাপোক্তি আর শুনি নাই। সাহসের কথা বুঝিনা; কিন্তু বিজ্ঞান লিখিতে যাওয়া এক ভণ্ড পরিশ্রম। বোধ হয় যাঁহারা এবিষয়ে মনোযোগ করেন না,তাঁহারা ইহাকে বিফলপ্রয়াস এবং সময়ের অপব্যয় বলি-

য়াই চেষ্টায় বিরত রহেন। উদ্যানের একটি পুষ্প দেখিয়া উহাতে কয়টি পাপড়ি আছে, গণিয়া সকলেই বলিতে পারেন, কিন্তু কয়জন লোক যুবতী কামিনীর আবেশময়ী মোহন মূরতির সহিত জ্যোৎস্না-বিধৌত রজনীর ফুল্লকুসুমদামের তুলনা কল্পনায় আনিতে পারিয়াছেন। আর পৃথিবীতে কাহার সমধিক আদর; কবির না বৈজ্ঞানিকের; কয়জনে কালিদাস ও সেক্ষপিয়র অধ্যয়ন করে, আর কত জনেই বা শঙ্করাচার্য্যের অধ্যাত্মতত্ত্ব ও নিউটনের আবিষ্কৃতি লইয়া মস্তিষ্ক বিলোড়িত করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতে কবি যত পটু, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অপহরণ করিতে বৈজ্ঞানিক তত নিপুণ। কবি যাহা গড়ে, বৈজ্ঞানিক তাহা ভাঙ্গে, কবি যাহার প্রশংসা করে বৈজ্ঞানিক তাহার নিন্দা করে, এবং কবি যাহা ভালবাসে, বৈজ্ঞানিক তাহা ঘৃণা করে। কবি স্তুতিবাদক বৈজ্ঞানিক নিন্দুক; কবি বাগ্মী, বৈজ্ঞানিক মূক; কবি সহৃদয়, বৈজ্ঞানিক পামর।

আর আমাদের দেশে বিজ্ঞান আলোচনার প্রয়োজন কি? বিজ্ঞানের যেটুকু আবশ্যকতা, ইংরাজদ্বারা তাহা সম্পাদিত হইতেছে। সে সকল জঞ্জালের কার্য্য অন্যের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, স্বাস্থ্যরক্ষণপ্রিয় ভদ্রলোকের তাহাতে যোগদান করা কোনরূপই সঙ্গত নহে। এক-ব্যক্তি কৃষিকার্য্য করিবে সহস্রলোকে তাহার ফলভোগ করিবে, এক ব্যক্তি বস্ত্রবয়ন করিবে, শতলোকে সেই বস্ত্র পরিধান করিবে, ইহাই সমাজের নিয়ম; সেইরূপ, কতিপয় জাতি বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া জগতে তাহার উপকার বিকীর্ণ করুক, অবশিষ্ট জাতি সমূহ কাব্যনিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া মধুসংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগের ক্লান্ত দেহের শ্রান্তি বিদূরিত করিতে থাকুক। ফলতঃ, যাহারা কাব্য ও কবিতা লিখাকে সময়ের অপব্যয় মনে করিয়া বিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিতে চাহেন, আমাদের বিবেচনায় তাঁহারা দেশের সর্ব্বথা শুভবিদ্বেষী, প্রবঞ্চক এবং মিথ্যাপবাদী।

উপসংহারে বক্তব্য এই সম্পাদকগণ মনে রাখিবেন যে গ্রন্থ সমালোচনা করা যত সহজ, গ্রন্থ রচনা করা তত সহজ নহে, এবং মুখের বায়ু দ্বারা নিমেষে যাহা উড়াইয়া দেওয়া যায়, হস্তের লেখনীদ্বারা তাহা শীঘ্র গঠিত করা যায় না।

মহম্মদের উত্তরাধিকারীগণ

যাঁহারা ইতিহাসশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ভাল বাসেন, মুসলমানদিগের ইতিহাস তাঁহাদের অতিশয় আদরের বস্তু। পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি মুসলমানদিগের ন্যায় এত অল্প সময়ে অধিকার, ধর্ম্ম ও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে নাই। মহম্মদের জন্ম হইতে আজি পর্য্যন্ত ১৩০৮ বৎসরের অধিক হয় নাই, কিন্তু এই কাল মধ্যে মুসলমানদিগের উন্নতি,অবনতি এবং পরিবর্ত্তন কত একবার ভাবিয়া দেখ। বালুকাময় প্রদেশের নদী অপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তনশীল মুসলমান জাতির ইতিহাস এক্ষণে সভ্যসমাজের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। ৬২২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের তিরোভাব হইতে ৭১০খৃষ্টাব্দ মধ্যে মাত্র ৮৮ বৎসর সময়; একজন দীর্ঘজীবী মনুষ্যকেও এই সময় অপেক্ষা অধিককাল জীবিত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু এই অল্প সময় মধ্যেই মহম্মদের বংশধরগণ ইব্রো হইতে গঙ্গা নদী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন; পরাক্রান্ত খসরুদিগের সুদৃঢ় সিংহাসন মুসলমানের পদাঘাতে রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল; আসিয়া ও আফ্রিকায় বিস্তীর্ণ অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল; ভূমধ্যস্থসাগর মুসলমানদিগের সুসজ্জিত অর্ণবযানে সুশোভিত হইয়াছিল; ফলতঃ ইশমেল্গণের বলবীর্য্যে সমস্ত মেদিনী প্রকম্পিত ছিল। যে সময় এইরূপ অভাবনীয় পরাক্রম প্রদর্শিত হয়, তখন বিজ্ঞানের নিতান্ত শৈশব সময়। আরবীয়গণ শারীরিক বল এবং মানসিক অধ্যবসায় ব্যতীত কোন বাহ্যিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে অথবা তদ্দ্বারা পরিশ্রমের লাঘব সম্পাদন করিতে পারে এরূপ তাহাদের কিছুই ছিল না। তখন কামানাদি আগ্নেয় অস্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, ভল্লতরবারী প্রভৃতিই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল। তখন তাহারা একমাত্র ধর্ম্মের নামে পতাকা উড্ডীন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিত। ধর্ম্ম রক্ষার যুদ্ধ, ধর্ম্মবিস্তারে 'কাফের' বিনাশ ও ধর্ম্মসাহায্যে পরকালে ঈশ্বরসমীপে সমাদর এবং কজ্জললনয়না অপ্সরীগণের সহবাসলাভ মুশলমানগণের মোহমন্ত্র ও জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা প্রাণের জন্য মমতা করিত না; তাহারা ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত ছিল, এবং ধর্ম্মার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমবেগে ধাবিত হইত। এই ধর্ম্মপ্রাণ ভীষণজাতি কিরূপে অভ্যুত্থিত হইয়া আপনাদের শক্তি, সাহস ও প্রতাপবলে সমস্ত

পৃথিবীতে কিরূপ মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু সম্প্রতি কএকটি প্রবন্ধে মহম্মদের পরবর্ত্তী প্রধান পদস্থ কএক জনের জীবনবৃত্ত সঙ্কলন পূর্ব্বক আমরা এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

প্রথম অধ্যায়।

মহম্মদের তিরোভাব হইলে নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং প্রজাগণের রাজা উভয়েরই অভাব হইল। মুশলমানরাজ্য নিতান্ত বিশৃঙ্খল, সুতরাং অচিরে বিনাশ প্রাপ্তির উপক্রম হইয়া উঠিল। আরবরাজ্যে শান্তি রহিল না। মহম্মদের প্রিয়নিকেতন মদিনা নগরীতে ভয়ঙ্কর গোলযোগ হইবার উপক্রম হইলে ওসামাইবিন্‌যেইদ মহম্মদের গৃহসমক্ষে জাতীয় পতাকা স্থাপন করিলেন, এবং স্থানে স্থানে সৈন্যসংস্থাপনপূর্ব্বক প্রজাগণের বিদ্রোহ ও কোলাহল নিবারণে কৃতকার্য্য হইলেন। কে রাজা হইবে এই প্রথম প্রশ্ন। মহম্মদের স্বগণমধ্যে চারি ব্যক্তি ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। আবুবেকার, ওমার, ওথমান্ এবং আলী এই চারিজনের স্বত্ব সর্ব্বাগ্রগণ্য বোধ হইল। মহম্মদের প্রিয়তমা পত্নী আয়েশার পিতা আবুবেকার, সুতরাং সেই সম্বন্ধে তাঁহার অনেক সহায় হইল। হাফ্‌সা নাম্নী মহম্মদের অন্য এক স্ত্রীর পিতা ওমারের হস্তে মহম্মদ পবিত্র গ্রন্থ কোরাণ বিশ্বাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং অনেকে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। ওথমান্ মহম্মদের দুইটি তনয়ার পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উভয় এবং তাঁহাদের সন্তানগণ পরলোক গমন করাতে ওথমানের স্বত্ব অনেক লঘু হইলেও কেহ কেহ তাঁহার পক্ষে দাঁড়াইল। মহম্মদের খুল্লতাত-পুত্র আলী মহম্মদের একমাত্র তনয়া ফতেমাকে বিবাহ করেন ; সম্পর্ক বিবেচনা করিলে আলীর স্বত্ব সর্ব্বাগ্রগণ্য হয় সংশয় নাই ; সুতরাং বহুসংখ্যক লোক তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। এইরূপে চারিজন সৈন্যাধ্যক্ষ চারি বিভিন্ন স্বত্বে মুসলমানদিগের প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যশাসন করিতে লোলুপ হইলেন। একেত সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, তাহাতে আবার ধর্ম্মবুদ্ধি, ন্যায়পরতা এবং মনঃপ্রাণে মহম্মদের সাহায্য করা প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে আলীকেই মনোনীত করা কর্ত্তব্য হয়। যখন মুশলমানধর্ম্ম ধর্ম্মপ্রচারকের উন্নতির প্রত্যূষসময়ে নিতান্ত অবজ্ঞিত এবং অনাদৃত হইতেছিল, যখন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপদ্রবে মহম্মদ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তখন আলী তাঁহার সহায় হন। মহম্মদ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার প্রতিনিধি এবং ভ্রাতা বলিয়া ঘোষণা করেন। আলী কথায় এবং কার্য্যে যে পর্য্যন্ত মহত্ব প্রদর্শন করিতেন, তরবারি হস্তে রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার উপযুক্ত পরাক্রমই দেখাই-

তেন। তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী, সদালাপী এবং সর্ব্বসাধারণের উপকারী ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহম্মদ-তনয়া ফতেমার সজলনয়ন নিরীক্ষণে অনেকের হৃদয় আলীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। সুতরাং কিরূপে নির্ব্বিবাদে আলী সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন, তাহা অবধারণার্থ ফতেমার গৃহে আলীর হিতৈষী এবং বন্ধুবর্গ সমবেত হইলেন।

অন্যান্য পক্ষও নীরবে বসিয়াছিলেন না। আবুবেকার আয়েশার পিতা ছিলেন। মহম্মদের শিষ্যগণমধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রধান ও অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন। মহম্মদ তাঁহার ভক্তি ও বন্ধুতাতে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া, মৃত্যুকালীন তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া যান। এক্ষণে আয়েশা আপন পিতার সাহায্যার্থ সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এই অনুরোধের আরও অর্থ ছিল। যাহাতে আলী মহম্মদের উত্তরাধিকারী না-হন আয়েশার এই প্রধান কামনা ছিল। মহম্মদের প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি অবিশ্বাস উৎপাদনের আলীই প্রধান কারণ ছিলেন। রূপবতী আয়েশা মহম্মদের পবিত্র প্রণয়ের অবমাননা করিয়া অন্যের প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছেন এইরূপ অপবাদ আলীই প্রথমতঃ মহম্মদের কর্ণগোচর করেন। তদবধি আলীর প্রতি আয়েশার নিদারুণ বিদ্বেষ জন্মে। এক্ষণে সেই বিদ্বেষ-পরতা প্রযুক্ত যাহাতে আলী সিংহাসন নাপান তদ্বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

জনসাধারণ মধ্যে অনেকে ওমারের পক্ষপাতী ছিল তাঁহার গৌরবপূর্ণ মুখশ্রী, সিংহের ন্যায় পরাক্রম, অসাধারণ রণকৌশল, বালকের ন্যায় সারল্য এবং অপরিসীম সাহসাদি দৃষ্টে সকলে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহার কন্যা হাফ্সা ও তাঁহার হিত সাধনে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

একদিকে ফতেমার গৃহে আলী ও তাঁহার বন্ধুগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা-নিরত ছিলেন; অন্যদিকে প্রধানপদস্থ মুসলমানগণ আবুবেকার এবং ওমারের জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা আরম্ভ করিল। তাহারা প্রথমতঃ উত্তরাধিকারের নিয়মমত সিংহাসনে অধিরূঢ় না হইয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক শাসনকর্ত্তা মনোনীত হইবেন এইরূপ বিধান করিলেন। এতদ্দারা আলীর স্বত্ব একদা ধ্বংশ করা হইল। এক বংশ অন্য বংশ হইতে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিবে, এই ভয়ে অনেকে আলীর বিপক্ষ হইয়াছিল, তাহাতে আবার ধূর্ত্ত-প্রকৃতি আয়েশার মন্ত্রণা ও চাতুর্য্য আলীর বিপক্ষে যুগপৎ কার্য্য করিতে লাগিল।

অনন্তর যাহারা মক্কা হইতে মহম্মদের সপক্ষ হইয়া পলায়ন করে এবং যাহারা মদীনায় তাঁহার সাহায্য করে এই দুই দলের মধ্যে কোন দল শাসন কর্ত্তা মনোনীত করিবে এবিষয়ে বিষমবিতর্ক উপস্থিত

হইল। প্রথমোক্তগণ বলিতে লাগিল মক্কা মহম্মদের জন্মস্থান, মক্কাতে প্রথমতঃ তাঁহার মত প্রচার হয়; বিশেষতঃ তাহারা মহম্মদের স্বগণ, প্রতিবেশী এবং তাহারা মহম্মদের নির্ব্বাসন সময়ে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াছে, সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনে তাঁহাদেরই অধিকার। শেষোক্তগণ বলিতে লাগিল, মদীনা মহম্মদের আশ্রয়স্থান এবং মনোনীত বাসস্থান; তাহারা তাঁহার পলায়ন সময়ে সাহায্যদান করিয়াছে, প্রতিপক্ষগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া সেই সকল অত্যাচারী শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়াছে এবং তাহাদের সাহায্যে সনাতন ধর্ম্ম বিস্তার হইয়াছে। সুতরাং রাজানির্ব্বাচনে তাহাদেরই অধিকার।

এই বিবাদ ভীষণাকার ধারণ করিল। উভয়পক্ষ অসি নিষ্কোষ করিয়া স্বপক্ষের প্রতি পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। মদীনাবাসীগণ বলিল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইজন শাসনকর্ত্তা মনোনীত করা হইবে। ওমার এই প্রস্তাব হাস্য করিয়া উড়াইলেন, এবং বলিলেন "এক কোষে দুইখানা অসির স্থান হয় না।" আবুবেকারও রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "রাজ্যের এখন নিতান্ত শৈশব কাল, দুইভাগে বিভক্ত হইলে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।" তিনি বলিলেন একজন শাসনকর্ত্তা মনোনীত করা কর্ত্তব্য, ওমার এবং আবু অবিদা এই দুই জনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা নির্ব্বাচন করা হউক। প্রথমতঃ যে কয়জন মহম্মদের শিষ্য হয় আবু অবিদা তাহার মধ্যে একজন ছিলেন। মক্কা হইতে পলায়ন সময়ে তিনি মহম্মদের সঙ্গে ছিলেন, এবং চিরদিন নিতান্ত অনুগত ও বিশ্বস্তভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ আবুবেকারের উপদেশে কিয়ৎকাল শান্তিরক্ষা হইল। কিন্তু আরবজাতি স্থির থাকিতে পারে না, আরব সাগরের ন্যায় সর্ব্বদা টলমল করে, পুনরায় দুইদল ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন ওমার সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি বলিলেন 'আবুবেকার সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানী; মহম্মদের অনুচরগণ মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা অনুগত ছিলেন, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই মনোনীত করা কর্ত্তব্য।' এই বলিয়া আবুবেকারের আনুগত্য স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ হস্ত চুম্বন করিলেন এবং তাঁহাকে রাজা বলিয়া আজ্ঞা পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

ওমার আপন স্বার্থ প্রতিপক্ষের অনুকূলে উৎসর্গ করিলেন দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইল, এবং প্রকৃত পক্ষে আবুবেকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। আবুবেকার কিরূপ সর্ব্বদা মহম্মদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহার উপদেশে কিরূপে মুসলমানদিগের

শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত হয়; তাঁহার স্বার্থোৎসর্গ, জ্ঞান, শুক্লকেশ সকল বিষয় একবার মনে হইল। সুতরাং তিনি যে শাসনভার গ্রহণে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। সকলে ওমারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। আবুবেকার শাসনকর্ত্তা হইলেন। তখন ওমার দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন 'অতঃপর যে ব্যক্তি সাধারণের সম্মতি ব্যতিত রাজ্য হইতে লোলুপ হইবে তাহার শিরশ্ছেদ হইবে, এবং যাহারা তাহাকে মনোনীত অথবা তাহাকে সাহায্য করিবে তাহাদিগের ও প্রাণদণ্ড হইবে।' একথা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিল; সুতরাং অন্যান্য রাজপদাকাঙ্খীগণের পক্ষে কোন গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা রহিল না।

'উল্লিখিত কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে ওমারকে নিতান্ত নিঃস্বার্থ ও সদাশয় বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাইবে' এইরূপ কোন কোন মুসলমান-গ্রন্থকার বলিয়া গিয়াছেন। উহাদের মত এই যে, আবুবেকার অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া ছিলেন, তাঁহার বয়স মহম্মদের সমান ছিল। আবুবেকার অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিবেন তাহার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং অল্পদিন মধ্যে তিনি স্বয়ং সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন ওমারের এই আশা ছিল। তাঁহার শেষোক্ত কার্য্যে আলীর আশা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আলী ফতেমার গৃহে বন্ধুগণ সহ অবস্থান করিতে ছিলেন, এই সমস্ত ঘটনাবলী ঘুণাক্ষরে জানিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার আশা চিরদিনের জন্য উচ্ছিন্ন হইল। ইতিহাসপাঠে যে পর্য্যন্ত জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাতে ঐ সকল গ্রন্থকারগণের লিখিত গ্রন্থে ও ওমারের চরিত্রে স্বার্থপরতার চিহ্ন মাত্রও লক্ষিত হয় না। তিনি অতিশয় ন্যায়পরায়ণ সরল-প্রকৃতি মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি মুসলমানধর্ম্ম রক্ষা এবং বিস্তারের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে ভ্রমেও কোনরূপ কৌটিল্য বা কপটতা প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার প্রকৃতি আরবীয় অনেকের প্রকৃতি অপেক্ষা উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং তাঁহার উদার চরিত্রে দোষারোপ করা সহৃদয় লেখকের কর্ত্তব্য হয় না।

আলী এবং তাঁহার বন্ধুগণ আবুবেকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া কোন প্রকার গোলযোগ ঘটাইবেন, এই ভয়ে আবুবেকার অতিশয় ভীত ছিলেন। তিনি একদল সৈন্যসহ আলীর বাসস্থানে পৌঁছিয়া সমস্ত নিরাকরণ করিতে ওমারকে অনুরোধ করিলেন। ওমার তাঁহার দলবল সহ ফতেমার বাটী অবরোধ করিয়া আবুবেকারের অভিষেকবৃত্তান্ত আলীকে জ্ঞাপন করেন, আলী আপনার স্বত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক আপত্তি করিলে ওমার তাঁহাকে বলেন যে আপত্তি পরিত্যাগ নাকরিলে তাঁ-

হার প্রাণদণ্ড হইবে, তাঁহার অনুচর বর্গের ও সেই দশা ঘটিবে, এবং জনসাধারণের ক্রোধবহ্নিতে তাঁহাদের গৃহ ভস্মসাৎ হইবে। তখন ফতেমা নিতান্ত আর্ত্তস্বরে মিষ্ট ভৎর্সনার সহিত বলিলেন 'আপনি কি এইরূপ কার্য্য করিবেন ? আমার বিশ্বাস হয় না।' তখন ওমার বলিলেন যদি আপনারা জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত না হন এবং তাহাদের মতের প্রতিপক্ষতা করেন, তবে আমি সত্য সত্যই ঐরূপ করিব সন্দেহ নাই।' আলীর বন্ধুগণ অগত্যা নত হইল এবং আবুবেকারকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। আলী নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া বিরলে ফতেমার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ফতেমার মৃত্যু হইল। অনন্তর নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত আবুবেকারের প্রতি রাজসম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি আবুবেকারকে এই বলিয়া মিষ্টভৎর্সনা করিতেন যে তাঁহাকে না জানাইয়া নিতান্ত কপট এবং অসরলভাবে রাজপদ গ্রহণ করা কদাচ কর্ত্তব্য ছিল না। এই ভৎর্সনা অমূলক নহে। আলীর সম্মতি লইয়া কার্য্য করিলে তিনি এত দুঃখিত হইতেন না। তাঁহার যেরূপ মহৎ অন্তঃকরণ ছিল তিনি স্বচ্ছন্দে সম্মতি দিতেন। আবুবেকার বলিলেন, তিনি কেবল জনসাধারণের গোলযোগ নিবারণার্থ সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার চক্রান্ত কিছুই নাই, কোন উপযুক্ত এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তি জনসাধারণের বাসনানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকার করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন।

আলি এইরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইলেন, এইরূপ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ ব্যাখ্যা হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিলেন, এবং আপন পুত্র মহম্মদের দৌহিত্রদ্বয় হাসেন ও হোসেনকে সঙ্গে লইয়া আরবদেশের মধ্যস্থলবর্ত্তী কোন নিভৃত প্রদেশে গমন করিলেন। হাসেন এবং হোসেন হইতে অনেক বংশ উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছেন। বংশমর্য্যাদার চিহ্নস্বরূপ তাঁহারা সবুজ বর্ণের শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া থাকেন।

আবুবেকার শাসনভার গ্রহণ করিলে সকলে তাঁহাকে রাজা উপাধি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল, তাহাতে তিনি অসম্মত হইলেন। অনেকে তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া আহ্বান করিত, কিন্তু তাহাও তিনি স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিতেন তিনি ঈশ্বরের প্রতিভূ নহেন, মহম্মদের প্রতিভূ মাত্র। "আমি মহম্মদের উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিব, তাহাতে সকল কুসংস্কার এবং পক্ষপাত হইতে বিরত থাকিব। যতদিন আমি ঈশ্বর ও তাঁহার মহম্মদের আজ্ঞা পালন করিব, ততদিন তোমরা আমাকে মান্য করিও, যখন তাহা না করি কেহ আমার

কথাটিও শুনিও না ! যদি আমি ভ্রমে পতিত হই আমাকে সংশোধন করিও, তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইব না।"

তিনি খলিফা উপাধি (উত্তরাধিকারি) গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তীগণ এই উপাধির সহিত ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং পৃথিবীতে তাঁহার ছায়াস্বরূপ ইত্যাদি গর্ব্বদ্যোতক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ যেমন বিষয় এবং ধর্ম্ম উভয়ের রাজা ছিলেন, খলিফাগণও সেইরূপ রহিলেন।

আবুবেকারের অনেক নাম ছিল। কেহ সত্যধর্ম্মপ্রচারক, কেহ অন্যান্য অভিধানও প্রদান করিত। আবুবেকার শব্দের অর্থ কুমারীর জনক। মহম্মদের স্ত্রীগণমধ্যে মাত্র আয়েশাকে কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেন, অন্যান্য সকল বিধবাবিবাহমাত্র। অন্যান্য হইতে প্রভেদ করার জন্য সকলে আয়েশার পিতাকে আবুবেকার বলিত, এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন।

আবুবেকারের বয়স সিংহাসন গ্রহণসময়ে দ্বিষষ্টি বৎসর ছিল। তিনি দীর্ঘকায় এবং ক্ষীণাঙ্গ ছিলেন। তাঁহার মুখশ্রী উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল ছিল। পূর্ব্বদেশীয় অনেক মুসলমান যেমন শ্মশ্রুরঞ্জিত করে, তিনিও সেইরূপ করিতেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। প্রত্যেক কার্য্য সম্পাদন সময়ে এতদূর সতর্ক হইতেন যে, সহসা তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে কেহ তাঁহাকে ধূর্ত্ত মনে করিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ নিঃস্বার্থ সাধুপ্রকৃতি শাসনকর্ত্তা মুসলমানদিগের মধ্যে অতি বিরল ছিল। নীচপ্রকৃতি সংসারীর ন্যায় তাঁহার একটি কার্য্যও ছিল না। তিনি ঐশ্বর্য্য, জাঁকজমক, বিলাসবাসনা প্রভৃতি কিছুরই জন্য ব্যস্ত ছিলেন না, কার্য্য করিয়া কোন অর্থও সাধারণের ধনাগার হইতে গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার একটি ক্রীতদাস এবং একটি উষ্ট্রমাত্র ছিল। তাহাতে যে কিঞ্চিৎ ব্যয় লাগিত এবং নিজের যৎসামান্যরূপ ভরণপোষণে যাহা আবশ্যক হইত, মাত্র তাহাই রাজকোষ হইতে গ্রহণ করিতেন। রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চিত হইত তাহা পণ্ডিত, গুণবানব্যক্তি এবং দরিদ্রদিগকে প্রতি শুক্রবার বিতরণ করিতেন। তদ্ভিন্ন স্বকীয় পরিশ্রমে যে কিছু আয় হইত তাহা সর্ব্বদা দুঃখীগণকে দিতেন। যাহাতে দরিদ্রদিগকে যথানিয়মে দান করা হয়, অনর্থক তাঁহার শাসন সময়ে কোন অর্থ ধনাগারে বসিয়া না থাকে, তাহা অবহিত হইয়া দেখিবার জন্য আপন দুহিতা আয়েশাকে উপদেশ করিলেন।

উল্লিখিত গুণগ্রাম সত্ত্বেও আরবীয়দিগকে শাসনাধীন রাখা আবুবেকারের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। যাহাদিগকে তরবারির সাহায্যে মুসলমান করা হইয়াছিল, জয়ীসেনাপতির শাণিত খড়্গ এবং ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদের ধর্ম্মোপদেশ ব্যতীত তাহারা স্থির থাকিবে কেন ? মহম্মদের

তিরোভাবের পর তাঁহার স্থলবর্ত্তীকে কেহই ধর্ম্মরাজ বলিয়া মানিল না, চারিদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অবশেষে মক্কা, মদিনা এবং তায়েফ্ ব্যতীত অন্য সকল স্থান স্বাধীন হইল।

মালেকইবিন্ নাওইরা নামক একব্যক্তি আপন দলবলসহ মদীনা নগরীর বিরুদ্ধে ধাবমান হইলেন। তিনি যেমন উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী, সদ্বংশজাত এবং বীরপুরুষ ছিলেন, তেমনই সুকবি এবং সুপুরুষ বলিয়া আরববাসীগণ তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিত। তাঁহার স্ত্রী সমস্ত আরবললনা অপেক্ষা রূপবতী ছিলেন।

আবুবেকার এই বিষয় অবগত হইয়া দুর্ব্বল, বৃদ্ধ এবং রমণীগণকে দুরাক্রম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রেরণ করিলেন, এবং নগরী দুর্গপরিবেষ্টিত করিতে লাগিলেন। মহম্মদ বর্ত্তমান ছিলেন না সত্য, কিন্তু মুসলমানতরবারি তাঁহার সহিত অস্তমিত হইয়াছিল না। ওয়ালেদ নামক বীরপুরুষ পূর্ব্বপরাক্রমের পুনরভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনসার্দ্ধ চারিসহস্র সৈন্যসহ বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজাও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি কৌশলপূর্ব্বক বিপক্ষকে হস্তগত করিয়া জয়লাভ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। খালেদইবিন্ ওয়াজেদকে বলিয়াছিলেন, মালেককে কোন প্রকারে হস্তগত করিতে পারিলে তাঁহার প্রতি যেন যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করা হয়; কিন্তু খালেদ সে প্রকৃতির ছিলেন না। তিনি বিপক্ষকে পরাজয় করিয়া তাহাদের দেশ লুণ্ঠনার্থ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন। মালেক এবং তাঁহার সুন্দরী পত্নী অন্যান্য অনেকের সঙ্গে বন্দী হইলেন।

খালেদ ইবিন্ ওয়ালেদ মালেক পত্নীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন, কোন প্রকার মালেককে বিনাশ করা তাঁহার সঙ্কল্প হইল। মালেক অতিশয় তেজস্বী ছিলেন, কথাবার্ত্তায় রাজার ক্ষমতা স্বীকার করিলেন না, খালেদের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল।

আবুবেকার এই কার্য্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, ওয়াকস নামক ইথিয়োপীয়োবাসী এক ব্যক্তি মহম্মদের পিতৃব্যকে হত্যা করে কিন্তু মহম্মদ তাহাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ক্ষমা করিয়াছিলেন। কোরাণের উপদেশানুসারে এক্ষণে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া ব্যভিচার জন্য অথবা একজন মুসলমানের জীবন হনন জন্য অপরাধীর প্রাণদণ্ড করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এব্যক্তি ভ্রমান্ধতা প্রযুক্ত এই পাপ কার্য্য করিয়াছে। অতএব ঈশ্বরের কার্য্যে যে তরবারি নিষ্কোষিত হইয়াছে তাহা বন্ধ করা কর্ত্তব্য হয় না।

মহম্মদ যখন পীড়িত ছিলেন তখন মোসিলমা নামক এক ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া ঘোষণা করে। অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়া লোহিত সাগর হইতে পারস্য সাগর পর্য্যন্ত সকল ভূভাগ

অধিকার করিয়া লয়। এক্ষণে এই ব্যক্তির দমনার্থ তরবারির প্রয়োজন হইল।

কথিত আছে যে মোসিলমার শিষ্য-গণ মধ্যে আবুকাদলার রূপবতী ও গুণবতী পত্নী সেজ্জা প্রধানা ছিলেন। তিনি কবিত্ব সম্পন্না এবং তামিমজাতীয় লোক মধ্যে অতিশয় প্রিয়া ছিলেন। হিব্রুদিগের রাজা সালমনের তাঁহার জ্ঞান গৌরবে বিমুগ্ধা হইয়া শিবার রাজ্ঞী তাহাকে দেখিবার জন্য যেমন গমন করিয়াছিলেন, সেজ্জাও মোসিলমাকে সেইরূপ দেখিতে গেলেন। ধর্ম্মের পবিত্র আকর্ষণে না হইলেও রূপজ্জা স্নেহে উভয়ের নয়ন ও মন উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরস্পর পরস্পরের সহবাস ভাল বোধ করিল; অধিকাংশ সময় এ-কত্র অতিবাহিত হয়। সেজ্জা তাঁহার নবীন প্রণয়ীর নিকট ভবিষ্যদ্বাণী ক্ষমতা লাভ করেন, মোসিলমা ও প্রণয়িণী হ-ইতে কবিত্ব শক্তি প্রাপ্ত হন।

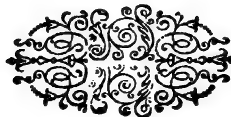
ধর্ম্মের পবিত্র আবরণে আবৃত থাকিয়া প্রণয়ি যুগল যখন কবিতা ও ভবিষ্যদ্বাণীর সুখময় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন খালেদ ও তাঁহার অগণ্য সৈন্য সেই সুখের অবিরাম স্রোতে প্রতিরোধ জন্মাইল। মোসিলমা ততোধিক সৈন্যসহ প্রত্যাগমন করিলেন। যামামার রাজধানীর সমীপে আক্রেবায় একটি ঘোরতর যুদ্ধ হইল; প্রথমতঃ বি-দ্রোহীর পক্ষেই বিজয়-চিহ্ন লক্ষিত হইল, বার শত মুসলমান ভূতলে শয়ন করিল। কিন্তু খালেদ তাঁহার সৈন্যগণকে পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করিলেন, বিপক্ষগণ সম্পূর্ণ প-রাভূত হইল, তাহাদের দশ সহস্র সৈন্য খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। মোশিলমা প্রাণপণ যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অস্ত্রাঘাতে অবসন্ন হইয়া ভূতলে পড়িলেন। কথিত আছে ইথিপিওপিয়াবাসী ওয়াক্সা মহম্মদের পি-তৃব্যকে ওহদের যুদ্ধে যে অস্ত্রে নিপাত করে, ঠিক সেই অস্ত্রদ্বারা মোসিলমাকে হত্যা করিল। মহম্মদের পিতৃব্য হাম-জাকে বধ করা সত্বেও মহম্মদ ওয়াক্সাকে ক্ষমা করেন, ওয়াক্সা তদবধি গোঁড়া মুসলমান হয়।

মোসিলমার অবশিষ্ট সৈন্যগণ ও শিবা সমুদয় আগ্রহের সহিত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। খালেদের নিষ্ঠুর প্রকৃতিতে ও অসত্যভাবে মালেককে হত্যা করাতে তাঁহার প্রতি সাধারণের যে ঘৃণারভাব হ-ইয়াছিল, এক্ষণে এই যুদ্ধে জয়লাভ ক-রিলে সেকথা সকলে ভুলিয়া গেল। তিনি আরও অনেক জয়লাভ করিলেন। যখন যেখানে যাহাকে সৈন্যাধ্যক্ষ স্বরূপ প্রেরণ করা হইত, খালেদ হয় তাহার সহিত মি-লিত হইতেন না হয় সৈন্য দ্বারা বা অন্য প্রকার সাহায্য প্রদান পুর্ব্বক জয়লাভ ক-রিতেন। এইরূপে খলিকাদিগের রাজ্য স্থাপনাবধি এক বৎসর কাল মধ্যে যেখানে যে উচ্ছৃঙ্খলভাব ছিল সে সমস্ত প্রশমিত হইয়া সমস্ত আরবদেশে খলিফাক্ষমতা অব্যাহতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

মোসিলমাকে পরাজয় করার অব্য-

বহিত পরেই আবুবেকার বাচনিক, লিখিত উপদেশ এবং দৈববাণী প্রভৃতি হইতে কোরাণের মূলতত্ত্ব সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তৎপূর্ব্বে কোরাণের কতকাংশ খণ্ড খণ্ড কাগজে লিখিত এবং অপরাংশ মহম্মদের শিষ্য ও সঙ্গীগণের স্মৃতিফলকে অঙ্কিত ছিল। পরমধার্ম্মিক ওমার এই কার্য্য সাধনে তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করেন। আক্রেরার যুদ্ধে মহম্মদের প্রাচীন সঙ্গীয়গণ মধ্যে অনেকে হত হয় দেখিয়া ওমার নিতান্ত ভীত ও দুঃখিত হন। অনন্তর তিনি বলেন "এক্ষণে যাঁহারা জীবিত আছেন, যাঁহাদের স্মৃতিক্ষেত্রে মহম্মদের দৈবাদেশ, কার্য্যকলাপ এবং উপদেশ সকল লিখিত রহিয়াছে, সেই সকল সনাতন ধর্ম্মের সারতত্ত্বের সাক্ষীগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে চলিয়া যাইতে পারে এবং তৎসঙ্গে ইসলেম ধর্ম্মের মূলগ্রন্থ বিলোপ হইতে পারে।" সুতরাং ওমার নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে আবুবেকারকে অনুরোধ করেন, যে সকল জ্ঞাতসার ব্যক্তি জীবিত আছেন তাহাদিগহইতে এবং যে সকল অংশ লিখিত আছে তাহা হইতে কোরাণ সংগ্রহ হউক। তদনুসারে কোরাণ সংগ্রহ আরম্ভ হয়। বৃদ্ধ আবুবেকার এই কার্য্য সমাপন করিতে পারেন না। তাঁহার উত্তরাধিকারী খলিফা এই আরব্ধ সাধু কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ।)



শিশুশিক্ষা। *

বাঙ্গালীর প্রধান দোষ এই যে তাহারা শিখিতে জানে না এবং শিখাইতে জানে না। কিরূপ শিখিলে সংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায়, এবং সুখে দিন নির্ব্বাহ করিয়া থাকিতে পারা যায়, তাহা তাহাদিগের বুদ্ধির অগম্য। এক অনুকরণে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ হইল। মহাপুরুষেরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগের ও সেই পন্থানুবর্ত্তী হওয়া বিধেয়, এই মুলমন্ত্র তাহাদিগের হৃদয়ের চালক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং ইহারই বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে "যাহা হইয়াছে তাহা হইবেই, কিন্তু যাহা হয় নাই তাহা হইবারও নহে।"

মহাপুরুষদিগের অনুবর্ত্তী হওয়াকে আমরা নিন্দা করিতেছি না। বরং অনেক সময়ে ইহাই একমাত্র শ্লাঘনীয় কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল সময়েই তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট উচ্চারণ করিয়া আপনাদিগের পক্ষ সমর্থন করা কোন প্রকারে যুক্তি সংগত নয়। দেশ-কাল, পাত্রভেদে নিয়মের এবং কার্য্যের প্রভেদ হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে কন্যাহরণই বিবাহের উৎকৃষ্ট আদর্শ স্থল ছিল। কিন্তু সেই কন্যাহরণ এক্ষণে দণ্ডবিধি অনুসারে গর্হিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব কবিতালহরী পাঠ করিয়া নাসিকায় বস্ত্রদিয়া 'অশ্লীল' 'অশ্লীল' বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, তাহারা বুঝেন না যে, ভারতচন্দ্রের সময় আমাদিগের সময় নহে। এবং এই কথা নাবুঝিয়া অশ্লীলতানিবারিণী সভায় কবিবরের অতুল্য যশস্তম্ভস্বরূপ বিদ্যাসুন্দর দগ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন। ধন্য কুশাগ্র বুদ্ধি! যাহারা আবার ভাবেন, যে মৎসামাংস ত্যাগ করিয়া প্রাচীন যোগীঋষিদিগের অনুকরণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। প্রাণিহিংসা পরম অধর্ম্ম এই মহামন্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল মহাপুরুষেরা পরকালের জন্য ধ্যান নিমগ্ন ছিলেন তাহাদিগের কার্য্যের উপর বাক্য ব্যয় করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য। যাহারা এরূপ বিবেচনা করেন তাহারা বঙ্গদেশের আধুনিক অবস্থা এক বার ভাবিয়া দেখেন না। বাঙ্গালী দুর্ব্বল, বাঙ্গালী ক্ষীণ, বাঙ্গালী ভয়শীল সুতরাং এ অবস্থায় বঙ্গে মাংস

* এই প্রবন্ধের সারাংশ, দৃষ্টান্ত সমেত, হর্ব্বটস্পেন্সর প্রণীত 'Education' নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইল।

ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজনীয়। এইজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, সকল কার্য্যে মহাপুরুষদিগের অনুকরণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

এই অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালী আপন অবস্থাকে উন্নত করিতে শিখে নাই। আদালত উকীলে পরিপূর্ণ, তথাপি বাঙ্গালী উকীল হইবে; কেননা তাহাদিগের পিতা মহাশয়েরা ওকালতী করিয়া দিন কাটাইয়াছেন। বিলাতে থাকিলেই যেন সিবিলিয়ান ও বারিষ্টার হওয়া বাঙ্গালীর প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আজি কালি ইংরাজপ্রিয় বাবুরা এরূপ ব্যবসায়ের যেরূপ নিন্দা করিয়া থাকেন এবং বাঙ্গালী অধঃপাতে গেল বলিয়া সংবাদ পত্রে ঘোর গর্জ্জন করিতে থাকেন, আমরা ইহাতে সে পরিমাণে দোষ দেখি না। বাঙ্গালীর আধুনিক অবস্থা অনেকটা রাজপ্রসাদাৎ। কার্য্যকরী বিদ্যায় রাজার দৃষ্টি নাই। যিনি সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া শিল্পি বা কৃষি শিখিলেন, তিনি হয়ত পরে মানসম্ভ্রম রাখিয়া দিনপাত করিতে অক্ষম হয়েন, এবং কাজেই এখন ভাবেন যে তিনি আপনার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। যেখানে এত বিপদ এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্খের করতালি, সেখানে কে অগ্রসর হইবে? * কিন্তু কথাটা এই যে এমনি পোড়া দেশ যে বাঙ্গালী ক্রোড়পতিরা অর্থের সদ্ব্যয় এখনও শিখিল না?

সুতরাং বাঙ্গালী যে শিখিতে জানে না তাহা একপ্রকার স্থির। যাহারা শিখিতে জানে না তাহারা অন্যকে কিরূপে শিখাইবে? বাঙ্গালী নিজে যেরূপ শিখে পুত্র পৌত্রকেও সেইরূপ শিখাইতে যত্ন করে। সুতরাং পিপীলিকাশ্রেণীর মত তাহারা সংসারে লীলা খেলা করিয়া চলিয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক বা বৃদ্ধ হইতে বাঙ্গালার যে কোন উপকার হইবে না তাহা এক প্রকার আমাদিগের বিশ্বাস। যদি বাঙ্গালার কিছুমাত্র উন্নতি হয় তবে সে ভবিষ্যৎ বংশ হইতে। আমরা ত নিজ দেশের কিছুই করিলাম না, যদি পুত্র পৌত্রাদি হইতে কিছু হয় তবে তজ্জন্য কেন চেষ্টা না করিব? কিন্তু এউন্নতি শিক্ষা সাপেক্ষ। প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য যে তাহার শিশুদিগকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দেয়। এই শিশুশিক্ষা সম্বন্ধেই আমাদিগের দুই চারিটী বক্তব্য আছে।

প্রথমতঃ কিরূপ শিক্ষা বঙ্গে আবশ্যক? সর্ব্বাগ্রে বঙ্গে শিশুদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এইটি বা-

* এস্থলে বক্তব্য যে কৃষি বিদ্যা পারদর্শী বাবু শ্রীনাথ দত্ত (যিনি তিন বৎসর কবিয়াতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছেন। তৎকর্তৃক সম্পাদিত একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিতে হয়। কি আশ্চর্য্য বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি হইতেছে তথাপি প্রয়োজনীয় একখানি সাময়িক পত্রের গ্রাহক জুটে না।

জ্বালার কোথাও দৃষ্ট হয় না। শিশু চারি পাঁচবৎসর বয়সের হইলেই তাহাকে অমনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বা স্কুল পণ্ডিতের অধীনে সমর্পণ করা হয়। গুরুমহাশয়ের এবং পণ্ডিত মহাশয়ের অধীনে থাকিয়া তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, স্মরণশক্তি ম্লান হয় এবং এই কোমল বয়সে গুরুতর মানসিকপরিশ্রমে শরীর দুর্ব্বল হয় এবং আনুষঙ্গিক যত অকল্যান আসিয়া জুটে। সেই অল্পবয়সে তাহাদিগের শিক্ষিত বিষয়ে রসবোধ হয় না। শিখিলে আনন্দ বোধ হয় না। সুতরাং তাহারা পণ্ডিত মহাশয়দিগকে ফাঁকি দিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া থাকে। পণ্ডিত মহাশয় জানিতে পারিলে আর রক্ষা রাখেন না। বেত্রধারীরূপী হইয়া সেই কোমল পৃষ্ঠে নির্দ্দয় রূপে প্রহার আরম্ভ করেন। শিশুদিগের কাজেই বিদ্যায় অশ্রদ্ধা জন্মে, শিক্ষকের প্রতি অভক্তি জন্মে। এবং যে পিতা মাতারা সন্তানের এইরূপ কষ্টের কারণ হন, তাহাদের উপরেই বা অভক্তি না জন্মিবে কেন? এই সকল শিশুরা বয়প্রাপ্ত হইলে মূর্খ, ধূর্ত্ত, এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া বংশে কালি দিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগের পিতা মাতারা বুঝেনা যে, তাহাদিগের দোষেই সন্তান ধনুর্দ্ধর হইয়া দাড়াইয়াছে। একজন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, সাত আট বৎসরের পুর্ব্বে সন্তানকে কখন স্কুলে পাঠান উচিত নয়, কারণ ইহার পুর্ব্বে মানসিক পরিশ্রম করিলে সন্তান ক্ষীণ, দুর্ব্বল এবং অল্পজীবী হয়।

কেবল তাহাই নয়। বঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষতঃ শিশুদিগের কোন উপায় অবলম্বিত হয় না। শৈশবে স্বাস্থ্য রক্ষার যেরূপ প্রয়োজন এরূপ আর কখন নহে। মৃত্যু সংখ্যার তালিকা লইলে দেখা যায় যে, তাহাদিগের অধিকাংশই শৈশবে এবং বার্দ্ধক্যে ঘটিয়াছে। পিতা মাতারা শিশুদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন না, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নয়। শিশু প্রাতঃকালেই শয্যা হইতে উঠিলে হিম লাগিবে বলিয়া তাহাদিগের পিতা মাতা পুনরায় শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। এবং সেকথা প্রতিপালিত না হইলে প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং শিশু আর প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করে না। শিশু পরিশ্রমজনক ক্রীড়া করিতেছে দেখিলে হয়ত বঙ্গীয় পিতা বলিবেন "বসিয়া খেলা নাই কেবল উৎপাত", এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়ত দুই চারি চপটাঘাত পড়িল, অমনি শিশু পরিশ্রম হইতে ক্ষান্ত হইল। এইরূপে তাহাদিগের মনের সুখ এবং শরীরের সুখ একবারে নষ্ট করা হয়। যদি তাহারা জীবিত থাকে তাহা হইলে অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়ারই সম্ভাবনা। নহিলে পিতা মাতাকে কাঁদাইবার হইলে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

কেবল তাহাই নয়। খাদ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশুরা প্রায় অ-

পরিমিত ভোজন করে না, কিন্তু তাহাদিগকে নিয়মিত ভোজনে বাধা দিলেই তাহারা সুবিধা পাইলে অপরিমিত ভোজন করিয়া থাকে। এইজন্য শিশুদিগের খাদ্য সম্বন্ধে কোন বাধা দেওয়া উচিত নহে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশে মাংস ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে বলিবেন বঙ্গদেশে উত্তাপ প্রধান; এখানে মাংস ব্যবহারে বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। যাহারা এরূপ ভাবিবেন,তাহারা ডাক্তারদিগের পরামর্শ লইলেই তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। তবে সকল প্রকার মাংস এখানে উপকারী না হইতে পারে। কিন্তু ছাগ প্রভৃতি লঘুমাংস বঙ্গের যেউপযোগী তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মাংস যে সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকারক তাহা বুদ্ধিমানকে বুঝান নিষ্প্রয়োজনীয় ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, জগতে জিত জাতিরা প্রায় সকলেই মাংসভোজী। ইংলণ্ডীয় রুসিয় প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা ইহার শত শত দৃষ্টান্ত স্থল। মাংসে যে কেবল শারিরীক বল বৃদ্ধি করে তাহাই নহে, ইহাতে শরীরের আয়তন বৃদ্ধিকরে এবং সঙ্গেসঙ্গে অস্থি ও ধমনীগণকে পরিপুষ্ট করে। ডার্বিন একজাতির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে তাহাদিগের আয়তনও শরীরের উচ্চতা সাধারণ মনুষ্যের অর্দ্ধেক। তাহারা নিরামিষাশী। অনেকে দেখিবেন যে, ইংরাজ এবং কাবেলীর তুলনায় বাঙ্গালীর শরীরে আয়তন অনেক কম। দেশভেদে এবং ঋতুভেদে শরীরের অনেক পার্থক্য জন্মে,স্বীকার করি। কিন্তু খাদ্যানুসারেও যে পার্থক্য জন্মে তাহাও নিশ্চয়। এতব্যতীত মাংস ভোজনে সাহস ও বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বী হয়। অক্ষয়কুমার বাবু লিখিয়াছেন যে * কোন ব্যাঘ্রকে শিশুকালেই আনিয়া তৃণভোজন করিতে শিখান গিয়াছিল, তাহাতে দেখা গেল যে, সে বড় হইলে আর কাহাকেও দংশন করিতনা এবং তাহার সাহস একেবারে নষ্ট হইয়া গৃহপালিত পশুর মত হইয়া দাড়াইয়াছিল। মাংসে যে বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হয় তাহা মাংস ভোজীমাত্রকেই পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন। একবার বিলাতে কোন ব্যক্তিকে ছয়মাস কাল ফল মূল তণ্ডুল খাইয়া রাখাগিয়াছিল। তাহাতে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষীণ, ও স্মরণ শক্তি ম্লান হয়। পরে আবার মাংস ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া ছয়মাস মধ্যেই আপনার সেইপুর্ব্ব শক্তি গুলিকে পুর্ব্বাবস্থায় পাইল। সুতরাং ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গে মাংস ব্যবহার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু শৈশবে সেই মাংস ব্যবহার করিলে যে পরিমাণে উপকার হইবার সম্ভাবনা, এমত আর কোন সময়ে নহে। কারণ শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বল, মানসিক বৃত্তিনিচয়ের কথা বল, প্রথম হইতে যত্ন করিলে

* বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিবার সম্ভাবনা এমত আর কোন রূপে নহে। অনেকে জানেন, যে সন্তান শিশুকালে দুর্ব্বল থাকে, সে আর কখন বলবান হইতে পারে না। কিন্তু যে শৈশবে বলবান থাকে সে মাঝে দুর্ব্বল হইলেও যত্ন করিলে পুনরায় আপনার স্বাভাবিক বললাভ করিতে পারে। ইহাও অনেকে জানেন যে, একবার রোগ হইলে শরীর কখন ঠিক পূর্ব্বের মত হয় না। এইজন্য শৈশবাবস্থা হইতেই সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

এই সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। এই কথা শিশুদিগের সম্বন্ধে এবং লব্ধবয়ঃ যুবক সম্বন্ধেও প্রযোয্য। অতিরিক্ত মানসিকপরিশ্রমে আধুনিক ছাত্রেরা শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাহারা শরীরকে এরূপ কষ্ট দিয়া থাকে যে, হয় পরীক্ষার সময়েই নয়পরীক্ষার পরেই তাহাদিগকে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। 'মন্ত্রং বা সাধয়েম শরীরংবা পাতয়েম' এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সমাজের কি পরিমাণ অনিষ্ট করে তাহা একবার চাহিয়াও দেখে না। শিশুদিগের সম্বন্ধে এতদ্বিষয়ে পিতা মাতার দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। (*)

* এই দোষের কিয়দংশ শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের উপর অর্শে না কি? তাঁহারা একটু অনুগ্রহ করিলেই ত ছাত্রেরা এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পায়।

দ্বিতীয়তঃ বঙ্গে এক্ষণে কিরূপ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। বিলাতেও এই বিষয়ে তর্ক হইতেছে। তাহারা বলিতেছে যে বিলাতে এক্ষণে কাব্যের কিছু উন্নতি আবশ্যক। আমরা বলিতেছি কাব্যে আমাদিগের হাড় জ্বালাতন হইয়াছে, আমরা কাব্য আর চাহি না। মূল কথায় সকলেরই সীমা আছে। কাব্যের যতদূর সীমা, বিলাতে ততদূর যায় নাই। আমাদিগের কাব্য সীমা ছাড়াইয়া এতদূর চলিয়া গিয়াছে যে কাব্যের জ্বালায় আমরা অস্থির। সেই যে জয়দেব 'ললিত লবঙ্গলতা' বলিয়া প্রেমের বাঁশরী বাজাইয়াছিলেন অমনি রসিক বাঙ্গালী কবি 'প্রেম' 'প্রেম' 'প্রেম' করিয়া পাগল। বিরহ বর্ণনা বসন্ত বর্ণনা বাঙ্গালীর লেখনীর অগ্রে বর্ত্তমান (*) কিছু দিনের জন্য আমাদিগের উচিত গভীর বিষয় আলোচনা করা। বঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি চাই। সেই তপস্যায় এক্ষণে নিমগ্ন হওয়া কর্ত্তব্য। কেবল যে আমরা কবিদিগের জ্বালায় জ্বালাতন তাহা নহে, কাব্যপাঠকদিগের জ্বালায়ও কিয়ৎ পরিমাণে অস্থির। চতুর্দ্দশবর্ষীয় রসিক নাটক হাতে করিয়া দ্বারবদ্ধ করতঃ 'হা প্রেয়সী' 'হা প্রেয়সী' বলিয়া ভবিষ্যৎ প্রণয়িনীর সহিত আলাপ করে এবং তাহার বিরহে কাঁদিতে থাকে, ইহা কি কম হাস্য-

* সুকবিরা ক্ষমা করিবেন। তাঁহাদের কথা আমরা বলিতেছিনা। তাঁহারা বঙ্গের কুলতিলক।

জনক এবং শোচনীয় ব্যাপার ? সুতরাং যাহাতে শিশুরা কাব্য পড়িয়া এইরূপ ‘ কবিত্ব ’ না পান তদ্বিষয়ে পিতা মাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শৈশব হইতেই তাহাদিগকে বিজ্ঞানে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সাত আট বৎসরের পূর্ব্বে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠান কর্ত্তব্য নয়। ইহাতে অনেকে বলিবেন, যে ‘ ক ’ ‘ খ ’ শিখিবার উপযুক্ত নয় সে বিজ্ঞান শিখিবে কিরূপে ? আমরা তাহাদিগকে উপায় বলিয়া দিতেছি। বিদ্যালয়ে পাঠাইবার পূর্ব্বে যে শিশুর কোনরূপ শিক্ষা হইবে না তাহা নহে। মুখে মুখে সন্তানকে যত শিখান যায় ততই ভাল। মুখে মুখে শিখিতে মস্তিষ্কের পরিশ্রম হয় না এবং শিখিতেও আমোদ হয়। সুতরাং সে সময়ে যাহা শিখে তাহা আর জন্মে ভুলেনা। শিশু ঠাকুরমার নিকট কত আগ্রহের সহিত রাজা ও রাণীর গল্প শুনে। যাহারা শিখাইতে জানেন, তাহাদিগের শিশুরাও তাহাদিগের নিকট হইতে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শিক্ষা গ্রহণ করে। আমরা উদাহরণ দিতেছি। মনে কর তোমার শিশুকে তুমি বাগানে লইয়া গিয়াছ। একটি বৃক্ষের পত্র ছিড়িয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলে এইরূপ পাতা বাগানে যদি আর থাকে লইয়া আইস। শিশু অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত একার্য্য করিবে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই পাতার সহিত অন্য পাতার সাদৃশ্য পাইলেই তুলিয়া আনিবে। অতি সামান্য মাত্র বিভিন্নতা থাকিলে সে বুঝিতে পারিবে না। তখন দুইটি পাতার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিবে। প্রথমে হয়ত সে বলিবে কিছুই নাই। পুনরায় তুমি ভাল করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিবে, তখন সে বহুকষ্টে একটি বিভিন্নতা দেখাইতে সমর্থ হইবে। তখন তুমি বলিবে আর কিছু আছে কি না ? এইরূপে শিশু যতক্ষণ আপনি বলিতে পারে ততক্ষণ বলাইবে, পরে বলিয়া দিবে। এইরূপে শিশুর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জন্মিবে। এক প্রকার পাতার বিষয় শিখাইলে অন্যরূপ পত্রের বিষয় শিখাইবে। এইরূপে সে শীঘ্রই উদ্ভিজ্জ বিদ্যার মূলমন্ত্র হৃদয়ে গ্রাথিত করিয়া ফেলিতে পারিবে। এইরূপে তাহাকে ক্ষেত্রতত্ব, রসায়ণবিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতি সকলেরই কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ নীতিশিক্ষা। এসম্বন্ধেও শিশুদিগের উপর পিতা মাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সন্তান বড় হইলে যাহাতে গুরুজনের অবাধ্য না হয়, সেইজন্য শৈশব হইতেই কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু সে শিক্ষা কিরূপ ? স্পেন্সর বলেন স্বভাবের শিক্ষা। অনেক পিতা মনে করেন যে, প্রহারে সকল শাসন হয়। যে সন্তান পিতার অবাধ্য তাহাকে প্রহার কর, ইহাই তাহাদিগের উপদেশ। এটি যে ঘোরতর ভ্রম তাহা বলা বাহুল্য। সন্তানকে কখন

প্রহার করিবে না। স্বভাবের শিক্ষায় শিশুকে শাসন করিবে। আমরা একটি উদাহরণ দিতেছি। মনেকর তোমার শিশু-সন্তান প্রদীপের নিকটগিয়া কাগজ পুড়িতেছে। যদি সে সময়ে তুমি তাহাকে প্রহার কর, তাহা হইলে সে ভাবিবে যে আমি কোন দোষ করিনাই তথাপি মার খাইলাম। কাজেই পিতার উপর তাহার অভক্তি জন্মিবে। এরূপ আর দুই চারিটি ঘটনা হইলেই পিতার উপর ক্রমেই অশ্রদ্ধা দৃঢ় হইয়া যাইবে। এবং তখন পিতার একান্ত অবাধ্য হইয়া উঠিবে। এবং সেই অবাধ্যতা শাসন করা পিতার সাধ্যাতীত। সুতরাং সন্তান যখন এইরূপ প্রদীপ লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকিবে, তখন পিতার উচিত যে তাহাকে মুখে বারণ করিয়া দেয়। পিতা বলিবে, 'দেখ এরূপ করিও না হাত পুড়িয়া যাইবে' শিশু হয়ত শুনিবে না। কিছু পরেই হাত পুড়িবে, এবং তখন পিতা যে ঠিক কথাটি বলিয়াছিল, এই জন্য পিতার প্রতি ভক্তি হইবে। এবং পিতার কেন অবাধ্য হইয়াছিল তজ্জন্য দুঃখ করিবে। এবং সেই স্বভাবের শিক্ষা পাইয়া সে আর কখন অগ্নির নিকট যাইবে না। এইরূপে তিন চারি বার পিতার কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিয়া, এবং যখনই পিতার কথা অমান্য করিয়াছে তখনই বিপদ ঘটিয়াছে, এটি দেখিয়া পিতার প্রতি তাহার অচলা ভক্তি জন্মিবে।

মানসিক শিক্ষা ও নীতি শিক্ষা পরস্পর দুইটি ভগিনী। যেখানে মানসিক শিক্ষা সেই খানেই নীতি শিক্ষার আবির্ভাব, এবং যেখানে নীতি শিক্ষা সেই খানেই মানসিক শিক্ষার উন্নতি। জ্ঞানী হইলেই সৎ হয় এবং সৎ হইলেই জ্ঞানী হয়। সুতরাং পিতা মাতাদিগের কর্ত্তব্য যে, যাহাতে তাহাদিগের সন্তান দিগের মানসিক ও নৈতিকবৃত্তি সকল যুগপৎ উন্নতিলাভ করে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া। নৈতিক বৃত্তি ব্যতিত মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ হয় না। মানসিক বৃত্তি ব্যতিত নৈতিক বৃত্তির স্ফুরণ হয় না।

কিরূপে শিশুদিগকে শিক্ষাদান করিতে হয় আমরা সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম। যাহারা ইংরেজী জানেন না তাহাদিগের জন্যই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। যাহারা ইংরেজী জানেন, তাহাদিগের প্রতি আমাদের অনুরোধ যেন তাঁহারা একবার স্পেন্সর কৃত মূলপুস্তক পাঠ করেন।

উপসংহার কালে আমাদিগের এইমাত্র বক্তব্য যে এতদূর আসিয়া চিত্রটি ঔপন্যাসিক হইয়াছে বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিবেন। তাঁহারা বলিবেন যে, শিশুকে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা দেওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। ইহাতে যে যে উপকরণ আবশ্যক করে তাহার সকলগুলি একজনের ভাগ্যে ঘটা অসম্ভব। যে পিতার অর্থ আছে, তাহার হয়ত নিজের ভাল শিক্ষা নাই সে সন্তানকে কিরূপে

শিখাইবে ? যাহার শিক্ষা আছে তাহার সময় নাই ইত্যাদি শত শত বিঘ্ন যে ঘটে তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যতদূর সম্ভব ততদূর শিক্ষা কেন না দেই ? যাহাদের উপর বঙ্গের সমস্ত আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে, তাহাদিগের উন্নতির জন্য যে যত্ন না করিল সেকি মানুষ ? শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার রহিল।

শ্রীম, ঠ—

জয়পুর।

৪র্থ খণ্ডের ৭ম সংখ্যার ৩৩৯ পৃষ্ঠার পর।

কুন্তলদেবের পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র পুজন সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। রাজপুত-কবিকুল-চূড়ামণি চাঁদ পুজন-চরিত্র যেরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে পুজনকে বীরকুলপুজনীয় বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। পুজনের সমগ্র বীরকীর্ত্তির অবতারণা করিতে হইলে সাময়িক পত্রের পত্র পৃষ্ঠার অবলম্বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রচার আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং তাহাতে আমাদের নিরস্ত হইতে হইয়াছে, অতএব পুজনের পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণন করিতে হইল বলিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।

চোলরায় হইতে পুজন ষষ্ঠ পুরুষ। এই অসাধারণ বীরপুরুষের বীরকীর্ত্তির প্রতিভা এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে রাজকুলমাননীয় দিল্লীশ্বর চৌহান বংশীয় বিখ্যাতনামা পৃথ্বীরায় পুজনের সহিত স্বীয় সহোদরার বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং সভাস্থ একশত আটজন প্রধান কুলীন সেনানায়কের মধ্যে তাঁহাকে প্রধান পদ প্রদান করিয়াছিলেন। পুজন এবম্প্রকার গৌরবাস্পদ পদের যথার্থ যোগ্য পাত্র ছিলেন। তিনি দুইবার মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-সীমা-সংলগ্ন পার্ব্বত্য প্রদেশের খাইবার নামক বিখ্যাত গিরি-সঙ্কটে পুজন এক ঘোরতর যুদ্ধে যবন সেনাপতি প্রসিদ্ধ সাহাবুদ্দিনকে পরাভূত করিয়া গিজনী নগর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ২ ধাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই অস্ত্রশিক্ষা প্রভাবে চণ্ডালাধিকৃত মাহোবা দেশ পৃথ্বী রায়ের করতলস্থ হয়। পৃথ্বীরায় যে কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের পরম রূপ লাবণ্যবতী দুহিতাকে হরণ করেন, তদভিনয়ে পুজন শৌর্য্যবীর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়ের এই অযথা ব্যবহারে কোপান্বিত হইয়া তাঁহার সহিত পাঁচদিন ঘোরতর যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধব্যাপারে

চতুঃষষ্টি বীরপুরুষ স্বগণসমভিব্যাহারে পৃথ্বীরায়ের সহকারিতার জন্য নিযুক্ত থাকেন। পুজ্জন এই যুদ্ধেই প্রাণ পরিত্যাগ করেন। রাজকবি চাঁদ এই যুদ্ধের যেরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশ করা গেল;

" মিরার বংশীয় গোবিন্দ গেহ্‌লোট পুজ্জনসহ সমবেত হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। গোবিন্দের পতনে শত্রুদল আনন্দে নৃত্য করিতেছে দেখিয়া বীরাগ্রগণ্য পুজ্জন কুলিশপাতের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। উভয় করে ভীষণ খড়্গ ধারণ করিয়া অবিরত শত্রুমুণ্ড নিপাত করিতে লাগিলেন। চারি শত যোদ্ধা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাঁহার সাহায্যার্থে কেবলমাত্র কেহুরি, পীপা, বোহো, নরসিংহ এবং কচ্‌রা এই ভ্রাতৃপঞ্চ সশস্ত্রে উপস্থিত ছিলেন। নিরন্তর বল্লম ও খড়্গ চালিত হইতে লাগিল, অনবরত নরমুণ্ড বর্ষণ হইতে লাগিল এবং নরশোণিতে রণভূমি প্লাবিত হইয়া গেল। এমন সময়ে পুজ্জন জয়চন্দ্রের যবন সেনাপতি ইতিমাদকে আক্রমণ করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন, কিন্তু তাহার মস্তক ভূমিতে পতিত হইতে না হইতেই তাহারই পরিত্যক্ত কালরূপী বল্লম পুজ্জনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। কূর্ম্ম * বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। অপ্সরাগণ তাঁহার দেহ লইয়া বিবাদ করিতে লাগিল। রণভূমি মৃতদেহে আচ্ছাদিত হইল, মহাদেবের মালায় অনেক নরমুণ্ড সংযোজিত হইল। পুজ্জন ও গোবিন্দের পতন সময়ে দিবা এক প্রহর মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ভ্রাতৃশবের উদ্ধার সাধনার্থ পল্‌হন্ কুপিত কেশরীর ন্যায় শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কনৌজশ্রেণী স্তম্ভিত হইল, জয়চন্দ্রের ঘোরঘনঘটা সদৃশ নিবিড় সৈন্য পশ্চাদভিমুখ হইল। পুজ্জনের ভ্রাতা ও পুত্র বীরকুলগৌরব কর্ণের ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু উভয়েই রণশয্যায় শয়ন করিলেন। সূর্য্যদেব আপনার রথ প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বলোকে লইয়া গেলেন।

" এই মহাযুদ্ধের ভীমগর্জ্জনে গঙ্গা ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেন, চন্দ্রদেব কম্পিত হইলেন, দিক্‌পালগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন, কনৌজ সম্প্রদায় প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং এই অবকাশে পুজ্জনাত্মজ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। পুজ্জন পৃথ্বীরায়ের বর্ম্মস্বরূপ ছিলেন। কান্যকুব্জের বীরগণকে তিনি অতি ভীব্রতর অস্ত্রসকল দান করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরকীর্ত্তি বর্ণন করা কবিরও সাধ্য নহে। তিনি শেষ নাগোপরি পদস্থাপন করিয়া নরবন নির্মূল করিয়াছিলেন। বীরসন্তান কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে নাই। পুজ্জন রণশয্যায় শয়ন করিয়া কহিয়াছিলেন,—' মনুষ্যের একশত বৎসর মাত্র

* পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কচ্ছপ হইতে কচ্‌বহ বংশের নাম হওয়ায় পুজ্জনকে কূর্ম্ম বলা হইয়াছে।

পরমায়ু,তাহার অর্দ্ধেক রজনীর অন্ধকারে বিনষ্ট, তাহারও অর্দ্ধেক বাল্যক্রীড়ায় বৃথা অতিবাহিত হয়, কিন্তু জগদীশ্বর আমাকে খড়্গ ধরিতে ক্ষমবান করিয়াছিলেন।” তিনি এই কথা বলিতে বলিতে যখন কৃতান্তের কবকবলিত হন, সেই সময়ে স্বীয় পুত্রের হস্ত শত্রুমধ্যে বিকসিত দেখিতে পান। তাহাতে তাঁহার আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। মালসী সাতবার অস্ত্রাহত হন, তাঁহার ঘোটক অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হয়। পুজনপুত্র অত্যদ্ভুত বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।”

পুজনের কনিষ্ঠ পুত্র মালসী অম্বররাজ্যে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, রাজকবি চাঁদ “পৃথুরায় রাসু” নামক তদীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মালসীর ভূয়োসী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। মালসী কত্রাহি নামক স্থানে এক ঘোরতর যুদ্ধে মাণ্ডুরাজকে পরাভূত করেন। মালসী হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজগণ কেহই কোন বিশেষ কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। যথাক্রমে তাঁহাদের নাম নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।—বিজল, রাজদেব, কীলন, কুন্তল, জুন্সী, উদয়কর্ণ, নরসিংহ, বনবীর, উদ্ধারণ, ও চন্দ্রসেন। এতন্মধ্যে উদয়কর্ণের এক পুত্র বালোজী কোন কারণ বশতঃ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমুর্ত্তশীর নগর অধিকার করিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার পৌত্র শিখজী ঐ ক্ষুদ্র রাজ্য ক্রমে বিস্তার করিয়া স্বীয় নামানুসারে উহার শিখাবতী নাম প্রদান করেন।

চন্দ্রসেনের পুত্র পৃথ্বীরাজ। পৃথ্বীর সপ্তদশ পুত্র, তন্মধ্যে দ্বাদশজন মাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হন। তিনি জীবদ্দশাতেই ঐ দ্বাদশ পুত্রকে আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যান। তাঁহাদিগের দ্বারাই কচ্‌বহ্‌ বংশের দ্বাদশ শাখা সংস্থাপিত হয়। ঐ দ্বাদশ শাখার নাম কচ্‌বহ্‌ বংশের “দ্বাদশ কোট্‌রী” বলিয়া বিখ্যাত আছে। পৃথ্বীরাজ পুত্রগণের মঙ্গল সাধনে বিশিষ্ট রূপে যত্নবান্‌ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার এক কালরূপী পুত্র ভীমসিংহ তাঁহার বধ সাধন করিয়া সিংহাসন অপহরণ করে। কালের কি বিচিত্র গতি! দুর্বৃত্ত পিতৃহন্তা ভীমসিংহ এই দুষ্কৃতিলব্ধ রাজ্য অধিক কাল ভোগ করিতে পারে নাই। হাতে হাতেই ইহার ফলভোগ করিয়াছিল। তদীয় দুরাচার পুত্র ঐশকর্ণ স্বগণগণের পরামর্শানুসারে পিতৃহন্তা পিতার বধ সাধন করে। * এই দুরাচার পিতৃবধের

* বোধ হয় ঐশকর্ণের এই দুরাচারিতা সম্বন্ধে তৎকালীন সম্রাট বাবর সাহের কিছু পরামর্শ ছিল, কারণ, রাজপুত ইতিহাস বেত্তারা কহেন, ঐশকর্ণ তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্রাট সন্নিধানে উপস্থিত হইলে বাবারসাহ তাঁহাকে ‘নরবারের রাজা’ এই উপাধি প্রদান করিলেন। এই নরবার রাজ্যের বংশ কচ্‌বহ বংশের শাখাস্বরূপ গণনীয় হয়।

PACHYDERMATA OR THICK SKINNED ANIMAL

স্থূলত্বক্ পশু—শূকর।



Though the animal does not display any very great amount of literature, it exhibits a capacity of observation and obedience, which would hardly have been expected from so maligned an animal.—WOOD

পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছিল। অম্বর রাজ্যের কোন কোন রাজাবলীর মধ্যে এই দুই দুরাত্মার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ-হয় ঘৃণাপাত্র বলিয়াই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

প্রেশকর্ণের পুত্র বাহার মল্ল সর্ব্ব প্রথমেই মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করেন। তিনি বাবর সাহের অনেক সহায়তা করেন এবং হুমায়ুন বাদসাহ কর্তৃক "পঞ্চ হাজারী মন্ সব্" অর্থাৎ পাঁচ হাজার অশ্ব সৈন্যের অধিনায়ক এই উপাধি প্রাপ্ত হন। বাহার মল্লের পুত্র ভগবান দাস মোগল সম্রাটদিগের সহিত অত্যন্ত সম্প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আকবর অত্যন্ত কৌশলী ছিলেন। প্রতাপশালী ব্যক্তিগণের সহিত সম্প্রীতি করিতে তাঁহার কোন চেষ্টারই ত্রুটি হইত না। জানি না, তিনি ভগবান দাসকে কি কুহকে ভুলাইয়া ছিলেন। কচ্‌বহ্ রাজ মোগল রাজবংশের এরূপ অনুরাগী হইয়াছিলেন যে, আকবর পুত্র জাহাঙ্গীরের সহিত আপন দুহিতার বিবাহ দিয়া সূর্য্যকুল কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই পরিণয়ের ফল স্বরূপ রঘুবংশীয় কুলকামিনীর গর্ব্ভে খসরু নামা দুর্ভাগা রাজকুমারের জন্ম হয়।

(ক্রমশঃ।)

কখন রাজার অপুত্রতা নিবন্ধন কচ্‌বহ সিংহাসন শূন্য হইলে এই বংশ হইতে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হয়। যখন অম্বরের শেষ রাজা জগৎসিংহ গতাসু হন, তখন তাঁহার অপুত্রতা নিবন্ধন নরবার বংশ হইতে এক পুত্র আসিয়া উত্তরাধিকারী হয়।

শূকর

বিগত বারের বান্ধবে আসিয়া এবং আফ্রিকা এই উভয় ভূখণ্ডের হস্তীর বিষয় উল্লেখ করিয়া কেবল আসিয়ার হস্তীরই বিবরণ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আফ্রিকার হস্তীর জীবনবৃত্তান্ত উপযুক্তরূপে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলাম, এই বারের বান্ধবে তাহা প্রকাশ করিব। কিন্তু এবারও আফ্রিকার হস্তীর বিবরণ উপযুক্তরূপ সংগৃহীত হয় নাই, সুতরাং স্থূলচর্ম্মজাতীয় আর একটি পশুর জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠকের সমীপে উপস্থিত করিলাম, ইহার শীর্ষক দেখিলেই পাঠক ইহাকে চিনিতে পারিবেন; এই জন্তুকে বিশেষরূপে চিনিবার কারণ এই, আমাদিগের দেশে মনুষ্যনিবাসের নিকটে এই জাতীয় ভিন্ন অন্য কোন স্থূলচর্ম্মজাতীয় জন্তু বাস করিতে দেখা যায় না। ইহারা যেমন বলশালী তেমনি ভ-

য়াথছ। শরীর যেমন বলিষ্ঠ, স্বভাবও তেমনি কর্কশ এবং আকৃতিও তদনুরূপই হাস্যাস্পদ। অন্যান্য জন্তুর যেমন দূর হইতেই শরীর ও মস্তক পৃথক্‌রূপে দেখা গিয়া থাকে, শুকরের সেরূপ নহে। ইহাদিগের মস্তক ও শরীরের সংলগ্ন স্থান অতি খর্ব্ব ও স্থূল। শরীরের অন্যান্য স্থান কঠিন এবং মাংসল। শূকরের সর্ব্বাঙ্গ মোটা মোটা রোমাবলী দ্বারা আবৃত,কিন্তু উহা ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। ঘাড়ের রোমগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, মোটা ও দৃঢ়। সাধারণ ভাষায় এই রোমগুলিকে 'কুঁচি' বলে, আমরাও এখানে উহাকে শূকরের রোম না বলিয়া কুঁচি বলিব। এই কুঁচিগুলি মনুষ্যের অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, এদেশীয় প্রাচীনা স্ত্রীলোকদিগকে ইহা দ্বারা শাঁখা ও গহনা পরিস্কার করিতে দেখিয়াছি।

যখন শূকরের ক্রোধ হয়, তখন ঘাড়ের কুঁচিগুলি খাড়া হয়, কিন্তু শরীরের অন্যান্য স্থানের রোম ঐরূপ খাড়া হইতে পারে না। ইহাদের চক্ষু নিতান্ত ক্ষুদ্র ও নিস্তেজ। মাথা হইতে নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ১৬।১৭ ইঞ্চ দীর্ঘ। শরীর এবং মাথার সংলগ্ন স্থল অর্থাৎ গলা প্রায় মুখের সমানই পরিসর; এই স্থান হইতে মুখের অগ্রভাগ এমন সরু হইয়া আসিয়াছে যে, উহা দুই ইঞ্চের অধিক হইবে না। উপরের ওষ্ঠের মধ্য দিয়াই ইহাদের নাসারন্ধ্র মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ওষ্ঠের অগ্রভাগটি চেপ্টা, দৃঢ় এবং কার্য্যোপযোগী। শূকরের মাথা হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত এমন সমভাবে মাংসপেশীসকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে যে, এক দিক হইতে অন্যদিকে হাত বুলাইয়া নিলে অস্থির অনুসন্ধান পাওয়া ভার।

উহাদের চারি পায়ে প্রত্যেকটিতে দ্বিখণ্ডিত ক্ষুর। এবং ক্ষুরের বিপরীতদিগের উপরিভাগে প্রত্যেক পায়ে দুইটি করিয়া উপক্ষুর আছে। এই উভয় প্রকার ক্ষুরই একই উপকরণে নির্ম্মিত,এবং বেশ একটুকু ধারাল। উহাদের শরীরের সহিত তুলনা করিলে ক্ষুরগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। তথাপি চলিবার কিংবা দৌড়িবার সময় কোনরূপ অসুবিধা হয় বলিয়া অনুমিত হয় না।

শূকরের দৈর্ঘ নাসিকার অগ্রভাগ হইতে লাঙ্গুলের শেষ পর্য্যন্ত ৪ হাতের বড় বেশী হইতে দেখা যায় না। উচ্চতাও ২।২॥ ফিটের অধিক নহে। সচরাচর ইহাদিগের দৈর্ঘ্যতা ও উচ্চতা ইহা অপেক্ষা কিছু কম আজি তিন বৎসর হইল, আমরা যে একটি শূকর শিকার করিয়াছিলাম, উহা হইতে বৃহৎ শূকর অনেকেই দেখে নাই বলিয়াছিল। উহারই শরীরের মাপ প্রথমে লিখিত হইয়াছে।

ইহাদের লাঙ্গুল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। লাঙ্গুলের অগ্রভাগটি অল্প কএক গাছি কুঁচি সন্নিবিষ্ট। উহারা সর্ব্বদাই ঐ ক্ষুদ্র লাঙ্গুলটি এদিক ওদিক ঘুরায়, কিন্তু আমরা

বুঝিতে পারি না যে উহাদ্বারা শূকরের কি উপকার হয়। এদেশীয় পূর্ণায়তন বন্য শূকরের বর্ণ গাঢ় ধুসর। কিন্তু শিশুগুলির বর্ণ বৃদ্ধ গুলির বর্ণের সহিত যার পর নাই অনৈক্য। শিশু গুলির লোম কোমল ও ঘন সন্নিবিষ্ট। এবং লোমের বর্ণ পিঙ্গল ও তাহার উপরে অর্দ্ধ ইঞ্চ পরিমাণ পরিসর ব্যাপিয়া হরিদ্রা রঙ্গের ডোরা দৈর্ঘ ভাবে শরীরের সমস্ত অঙ্গেই বিস্তৃত থাকে। উহারা যতই বড় হইতে থাকে, ততই শরীরের বর্ণ ধুসরে পরিণত হইয়া যায়। জন্মিবার ২। ৩ মাস পরে উহাদের গর্ভ পশমগুলি পড়িয়া গিয়া ধুসর কুঁচি দ্বারা আবৃত হয়।

পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্ত শূকর অনেক গুলি একত্র থাকিতে পারে না; যদিও কখন কখন একদলে ২০। ২৫টা শূকর একত্র দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা একটিরই সন্তান সন্ততি। শূকরী ৬ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া এক কালে কতকগুলি সন্তান প্রসব করে। এমন কি আমি নিতান্ত বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, একটি মৃতা শূকরীর গর্ভ হইতে ২০টি সন্তান বাহির করা হইয়াছিল। কোন কোন শূকরীর প্রসব কালের কিছুদিন পূর্ব্বে উদর এবং স্তন এমন ঝুলিয়া পড়ে যে, উহা ২। ৩ ইঞ্চের জন্য মৃত্তিকা স্পর্শ করে না। বৃদ্ধ শূকরী গুলিরই এইরূপ উদর ঝুলিয়া পড়ে। গিলবার্ট্ হোয়াইট্ নামক জনৈক ব্যক্তি একটি শূকরের বিষয় এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঐ শূকরীটি মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে অনূ্যন ৩০০শত সন্তানের গর্ভধারিণী হইয়াছিল। শূকরী প্রসব কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে শুষ্ক পত্র, ঘাস ও অন্যান্য ডাল পালা দিয়া একটি কুটির নির্ম্মাণ করিয়া লয়, এবং উহা এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে প্রস্তুত যে বৃষ্টির জল কিম্বা রৌদ্রের তেজ উহাতে কোন মতেই প্রবেশ করিতে পায় না। এতদ্দেশীয় ছোট লোকেরা এই প্রকার কুটিরকে 'শূকরের ডেরা' কহে। এই কুটির দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যে কতগুলি ঘাস পাতা একত্র রাখিয়াছে, প্রকৃত কুটিরের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। এদেশীয় শূকরেরা প্রায়ই বর্ষাকালে হৈমন্তিক ধান্য ক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ জঙ্গলে এবং শীত ঋতুতে কাঁটা ঝোপার নীচে এইরূপ ডেরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রসব কালে উহারা দাড়াইয়া ঐ কুটিরের নিকটে প্রসব করে, প্রসব বেদনার সময় কোন ভয় পাইয়া যদি শূকরীকে স্থানান্তর যাইতে হয়, তবে তাহাতেও শূকরীর প্রসব কার্য্যের কোন প্রতিবন্ধক জন্মায় না। উহারা যেমনি অগ্রসর হইতে থাকে, অমনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তান গুলি ভূমিতে নিপতিত হয়। আবার সন্তান গুলি এমনি সবল যে, মাটিতে পড়িয়া দুই মিনিট কাল নড়িয়া চড়িয়াই তাহাদের প্রসূতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে থাকে। এই রূপ আশ্চর্য্য কথা শুনিলে, সহসা যে পাঠক ইহাকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া হাসিয়া উড়া-

ইবেন, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই, কিন্তু এই অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত কার্য্যকলাপ যতই পর্য্যালোচনা করিতে থাকিবেন, ততই ইহা হইতে অনেক নূতন ও আশ্চর্য্য বিষয়ের আবিষ্কার হইতে থাকিবে। সুতরাং সামান্য বিষয়ের একটি আশ্চর্য্য বিষয়ের কথা শুনিয়া কেহই ইহাকে প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া উপহাস করিবেন না। শূকরীর বুক হইতে পেট পর্য্যন্ত ২ পংক্তিতে ৬টি করিয়া ১২টি স্তন। পশ্চাৎ দিকস্থ শেষ দুইটি স্তনে একেবারেই দুগ্ধ হয় না। অন্য গুলিতে সমভাবেই দুগ্ধ সঞ্চার হইয়া থাকে।

শূকর শাবকেরা ৩। ৪মাসের অধিক মাতৃস্তন্য পান করে না। কিন্তু বহু সন্তানবতী বলিয়া শুকরী এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

শূকরীর সন্তানের জন্য অত্যন্ত মমতা। যদি অন্য কোন বৃহত্তর জন্তু শূকরীর শাবক দিগকে আক্রমণ করিতে যায়, তখন সে অবশ্যই তাহাকে প্রত্যাক্রমণ করিবে। শুকরীর সামান্য দন্ত ভিন্ন যদিও আর কোনরূপ প্রতিযোগিতা করিবার অস্ত্র নাই, কিন্তু তথাপি সেই অস্ত্রই উহারা এমন দ্রুতগতিতে চালাইতে পারে যে, মুহূর্ত্তের মধ্যে একজনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

যে পর্য্যন্ত শূকরীর পুনরায় গর্ভসঞ্চার না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ ছাগুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। এই ছাগুলি বড় হইলে একদলে অনেকটি শূকর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহাদের মাতা পুনরায় প্রসব করিলে ইহাদের সহিত আর কোন সম্পর্ক রাখে না। তখন উহারা আপনারাই সন্তানের মা বাপ হইতে আরম্ভ করে।

মৃত্তিকা খনন করিবার জন্য শূকরজাতি নিতান্তই উৎসুক। ইহাদের আহার্য্য বস্তুর অন্বেষণ করিতে অনেক সময় মৃত্তিকা খননের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ইহারা অনর্থকও ঐরূপ মৃত্তিকা খনন করিয়া রাখে। ইহাদের মৃত্তিকা খননের অস্ত্র উপরের ওষ্ঠ বা নাসিকার অগ্রভাগ। তেমন কঠিন মৃত্তিকার মধ্যেও উহা প্রবেশ করাইয়া বল প্রয়োগ করিলে উহা উঠিয়া আইসে। নাসার ফুৎকারও এমনি প্রবল যে, খোদিত মৃত্তিকা একবার ফুৎকার করিলেই উহা দূরে সরিয়া যায়। শূকরের নিম্ন ওষ্ঠ অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব এবং উপরি ওষ্ঠের মধ্যেই উহা রক্ষিত হয়, সুতরাং মৃত্তিকা খনন করিবার সময় উহাতে কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয় না।

পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে পুংশূকরের কোনরূপ কথারই উল্লেখ করি নাই, নিম্নে উহাদের স্বভাবে এবং আকৃতিতে শূকরী হইতে যাহা কিছু অনৈক্য আছে, তাহা লিখিত হইল।

পুংশূকরের উপরের এবং নীচের মাড়ির উভয় পার্শ্ব হইতে প্রত্যেক দিকে দুইটি অতি বৃহৎ দন্ত নির্গত হইয়া উপরের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। ঐ দন্তগুলি সম্পূর্ণ গোল নহে, ত্রিকোণ এবং উহার

প্রত্যেকটি কোণ অত্যন্ত ধারাল। দন্তের যে ভাগ বাহিরে থাকে, উহা নিরেট এবং যাহা মাংস ও মাড়্যাস্থির মধ্যে থাকে, তাহা শূন্যগর্ভ। হস্তীদন্তের ন্যায় এগুলিও উৎকৃষ্ট রদ *। উহাদের আত্মরক্ষার জন্য এই দন্ত চারিটি প্রধানতম অস্ত্র। এই চারিটির মধ্যে নীচের দুইটি অধিক কার্য্যকারী। যে কোন পশুই কেন হউক না, যদি একবার উহার শরীরে দন্তবিদ্ধ করিতে পারে, তবে উহার শরীর ৮। ১০ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিতে পারে। পরে ইহার যে দুই একটি দৃষ্টান্ত লিখিত হইবে, পাঠক তাহা পড়িয়া বিস্মিত হইবেন। এদেশীয় ছোট লোকেরা এইরূপ দন্তবিশিষ্ট বড় বড় শূকরগুলিকে "বয়রা" কহে। ইহাদিগের বিশ্বাস যে এই নর শূকর গুলির শ্রবণ শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু ইহা নিতান্তই একটি ভ্রম মুলক সংস্কার। এইরূপ সংস্কার হইবার একটি কারণ আছে, তাহা এই,—আমি দেখিয়াছি অত্যন্ত বলবান শূকর গুলি কোন প্রকার শব্দ পাইলেও বড় কিছু একটা মনে করে না। যখন উহারা ক্ষেত্র চাষ করিতে আসে, তখন কোন রূপ সামান্য শব্দে উহারা ভয় পায় না, বরং অহঙ্কার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, এজন্য কৃষকেরা মনে করে ইহারা কানে শোনে না।

শূকরের যুদ্ধ বড় ভয়ানক। ইহাদিগের দুইটি পুং শূকরের অন্য কোন সময়ে যুদ্ধ হউক আর না হউক, যখন একটি শূকরীর গর্ভ সঞ্চারের সময় উপস্থিত হয়, তখন দুইটি সমবলশালী শূকর একত্রে উপস্থিত হইলে আর রক্ষা থাকে না। যুদ্ধের অপরিহার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া উহার একটি না একটি হত হয় বটে, কিন্তু অক্ষত শরীরে বিজয়ী হইবার সাধ্য নাই। এতদ্ব্যতীত যখনই ইহারা কাহারও উপরে ক্রুদ্ধ হয়, তখনই ইহারা ভয়ানক রূপ ধারণ করে। নিজ হইতে দশগুণ বড় জন্তু হইলেও আক্রমণ করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। আমি অত্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, একটি চিতা ব্যাঘ্র আহারের জন্য একটি শূকরকে ধরিয়াছিল, এবং শূকর ও ব্যাঘ্রকে ফিরিয়া এমন ভয়ানক আঘাত করে যে উভয়েরই এক স্থানে মৃত্যু হয়।

শূকরেরা সময় সময় এমনি কুৎসিত শব্দ করে, যে তাহা শুনিলে কর্ণ কপাটি ধরিয়া যায়। ঘটনাক্রমে যদি কোন শুকরের সম্মুখে ছোট ছোট বাঘ উপস্থিত হয়, তবে শুকরের চীৎকারে দৌড়িয়া পলায়, অথবা নিকটস্থ বৃক্ষে আরোহণ করে।

* ইংরাজিতে আইভরি শব্দে যে প্রকার অস্থিকে বুঝা যায়, বাঙ্গলাতে সেইরূপ অস্থিবোধক কোন শব্দ নাই; আমি বঙ্গসাহিত্যজগতের একটি সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি আমাকে আইভরি শব্দের অর্থ রদ লিখিতে বলিলেন। আমি ভরসা করি, তাঁহার এই উপদেশ বাঙ্গলাতে উপেক্ষিত হইবে না।

পুংশূকরের শরীরের গঠনে অধিক কিছু প্রভেদ নাই বটে, কিন্তু তথাপি প্রকৃতিতে, পুরুষ এবং স্ত্রীর গঠনে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা ইহাদিগের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। পুংশূকরের বক্ষ অধিকতর প্রশস্ত এবং কটিদেশ একটুকু সরু। ইহাদের মুষ্ক অতি বিচিত্রভাবে গুহ্যদ্বারের নিম্নে মাংসের সহিত লাগিয়া রহিয়াছে, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে না দেখিলে হঠাৎ ঐ স্থানের অত্যল্প উচ্চতা অনুভব করা যায় না। শূকরের মুষ্ক, শুনিয়াছি দুর্ব্বল গোরুর অতি বলকারক ঔষধ। আমি উহা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, যাহারা পরীক্ষা করিয়াছে, তাহাদের নিকটে শুনিয়াছি।

শূকরের শরীরে স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ অধিক বসা আছে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে যখন শস্য পরিপক্ক হয় এবং উহারা উপযুক্তরূপ আহার পায়, তখন ইহাদিগের বসা আরও অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মাংসও নাকি অপেক্ষাকৃত তখন সুস্বাদু হয়। এদেশীয় চণ্ডাল এবং ফিরিঙ্গিরা আমাকে এবিষয় অবগত করাইয়াছে। উহারা ইহাও বলে যে, যখনি পেয়ারা পাকিয়া উঠিলে শূকর উহা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে, তখন উহাদের বসা কমিয়া যায়, মাংসও সুস্বাদু রহেনা।

এদেশীয় শস্যের পক্ষে বন্যশূকর এক ভয়ানক শত্রু। ইহারা বহুসংখ্যক এক সময়ে একত্র হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, এবং যত না আহার করে, তাহার দশগুণ অনিষ্ট করিয়া যায়। শূকরেরা সচরাচর রাত্রিতেই আহারাদি করে, দিবসে কাঁটা ঝোপার নীচে শুইয়া থাকে।

শস্য রোপণের পুর্ব্বে শূকরগুলি কোন কোন ক্ষেত্র এমনভাবে খুঁড়িয়া রাখে যে প্রথম দৃষ্টিতে উহা কর্ষিত ভুমি বলিয়া বোধ হয়। এদেশীয় কৃষকেরা শুকরের দৌরাত্ম্য হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য সুন্দর একটি উপায় অবলম্বন করে। ক্ষেত্রের কোন এক স্থানে উচ্চ করিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া লয়। কৃষকেরা উহাকে "টং" বলে। সমস্ত রাত্রি 'টং' এ বসিয়া বন্দুক কি অন্য কিছুদ্বারা ভয় দেখাইয়া শূকরদিগকে ক্ষেত্রে আসিতে দেয় না। যদি একটি রাত্রি কৃষকেরা এইরূপ সতর্কতার সহিত না থাকে, তবে পরদিবস জমীদারের নিকটে বৎসরের খাজানা মাপ পাওয়ার জন্য তাহাদিগকে করজোড় করিয়া কাঁদিতে হয়। কোন কোন দাঁতাল শূকর এমন ভয়ানক ক্রোধী যে, যে দিক হইতে উহাদিগের প্রতি বন্দুক ছোড়া যায়, ধূঁয়া দেখিয়া সেই দিকেই আক্রমণ করিতে দৌড়িয়া আইসে। শিকারীরা যদি শূকরের এই প্রকার স্বভাব অবগত না থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে ইহা নিতান্ত বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। পদব্রজে শিকার করিতে হইলে, শূকরের নিকট হইতে অব্যাহতি পাইবার একটিমাত্র সামান্য উপায় আছে;—শূকর যখন সোজাভাবে শিকারীকে আক্রমণ করিতে

দৌড়িয়া আইসে, তখন যদি শিকারীও কেবল সোজাভাবে না দৌড়াইয়া একবার এদিক ওদিক বক্রগমনে দৌড়িতে থাকে, তবে অনেকটা রক্ষা পাইবার আশা থাকে। শূকর সোজা দৌড়িয়া মনুষ্যকে ধরিতে পারে বটে, কিন্তু মনুষ্য বক্রগমনে একদিকে সরিয়া গেলে, শূকর তাহার প্রকাণ্ড শরীরের সম্মুখগতি রোধ করিয়া হঠাৎ মনুষ্যের দিকে ফিরিতে পারে না। সুতরাং এই নিয়ম জানা থাকিলে সময় সময় অনেকটা উপকারের সম্ভব। প্রকৃত পক্ষে মাটিতে দাঁড়াইয়া শূকর শিকার করা নিতান্তই অন্যায়। হস্তীর উপরে থাকিলে শূকর শিকারে একেবারেই আশঙ্কা নাই। শূকরীরা মনুষ্যদিগকে এরূপ ভয়ানকভাবে আক্রমণ করে না; কোন রূপ শব্দ শুনিলেই দৌড়িয়া পলায়।

ইদানীং সাহেবেরা অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া বল্লমদ্বারা শূকর হত্যা করিয়া থাকে, (শূকর শিকারের বল্লমগুলি মুঙ্গের প্রদেশে প্রস্তুত হয়, ইহার ফলকের সহিত ৪।৫ ফিট একটি বংশদণ্ড লাগান থাকে ঐ দণ্ডের অপর প্রান্তে কতকগুলি সীসক গলাইয়া ভারি করিয়া দেয়।) হস্তী দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে বন হইতে শূকরগুলিকে তাড়াইলে যেমন উহারা মাঠে বাহির হয়, অমনি উহার পিছে পিছে অশ্ব চালাইয়া পৃষ্ঠে বল্লম বসাইয়া দেয় এবং সময় সময় এইরূপ শিকারীরা এমন বিপদে পড়ে যে, তাহার গল্প শুনিলে বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

এদেশের একজন মৃগয়াপ্রিয় প্রসিদ্ধ ভূস্বামীর বল্লমশিকার করিবার অভ্যাস ছিল। তিনি এক দিবস এইরূপে একটি শূকরকে আহত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে শূকরও মরিল না, দুর্বিপাক বশতঃ হাত হইতে বল্লমও পড়িয়া গেল। এমন সময় শূকর ভয়ানকরূপে আক্রমণ করাতে তিনি ঘোড়া লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, শূকরও তাঁহার পিছে পিছে ছুটিল। তিনি যাইতে যাইতে একটি কর্দ্দমময় স্থানে ঘোড়া সহিত একেবারে গাড়িয়া পড়িলেন, শূকরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সেই কর্দ্দমাক্ত স্থানে গাড়িয়া পড়িল। সুতরাং শূকর আর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না, ইত্যবসরে সঙ্গীয় একটি লোক গিয়া শূকরকে সংহার করিল।

১৮৭৬ সনে শিকার সময়ে একটি আহত শূকরে ক্রমান্বয়ে ৭।৮টি হস্তীকে পরাস্ত করে। শূকরটি আহত হইয়া একটি জঙ্গলে ছিল, উহাকে বাহির করিবার জন্য যেমন একটি হস্তী ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করে, অমনি উহার পায়ে দাঁত বিঁধাইয়া উহাকে তাড়াইয়া দেয়। অতঃপর সকল গুলি হস্তী একেবারে জঙ্গলে প্রবেশ করাইয়া উহাকে বাহির করিয়া হত্যা করা হয়।

শূকরের প্রধান আহার্য্য কচু, ধান,

কেশুর ইত্যাদি। কখন কখন বা মৃতদেহ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে আহার করিতে দেখা গিয়াছে। পালিত শূকরেরা এতদ্ভিন্ন এত অপরিষ্কার বস্তু আহার করে যে, তাহা মনে হইলেও ঘৃণা উপস্থিত হয়।

শূকরের প্রাণ অত্যন্ত কঠিন। ফুস ফুস ভিন্ন শরীরের অন্য স্থানে ৭। ৮টি গুলি লাগিলেও শীঘ্র প্রাণে বিনষ্ট হয় না। আমি একটি শুকরকে বারটি গুলি মারিয়াছিলাম। শূকরের শিশুগুলিও অত্যন্ত কঠিনপ্রাণ। একটি অল্পবয়স্ক শূকর-শিশুকে গুলি মারিলে উহার সমস্ত নীচের ওষ্ঠ ও গলার কতক অংশ ছিঁড়িয়া গেল; তবুও প্রাণে মরিল না। আমার সঙ্গে বেড্‌ফোর্ড নামে বলশালী জনৈক ইংরেজ ছিল, তিনি বলিলেন, "যখন শূকরটি বাঁচিবে না, তখন শীঘ্র মারিয়া ফেলাই ভাল।" এই বলিয়া তিনি একটি লাঠী দ্বারা উহার মস্তকে সজোরে ১০। ১২ টী আঘাত করিলেন, তথাপি উহার প্রাণ বিয়োগ হইল না।

শূকরকে শিশুকাল হইতে যত্ন করিয়া পুষিলে বেশ পোষ মানে। এদেশে মাঝে মাঝে অনেককেই শূকর পুষিতে দেখাযায় এবং উহাদের মধ্যে শূকরের বর্ণেরও নানা বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ শূকরের রঙ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার এবং ইহাদের শঙ্কর জাতিরও বিভিন্ন প্রকার বর্ণ হইয়া যায়। এই শঙ্কর শাবক গুলির বর্ণ পূর্ব্বোল্লিখিত শূকর শাবকের বর্ণের ন্যায় নহে। উহাদিগের শরীরের যে বর্ণ (সাদা কালা প্রভৃতি) জন্মিবার সময়ই তাহা পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ উহারা বড় হইলেও বর্ণের আর পরিবর্ত্তন হয় না। এতদ্দেশে এই জাতীয় শূকর গুলিই অনেকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। একদলে ৫০০ শূকরের অধিক প্রতিপালিত হইতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এইরূপ বৃহৎ পালের মধ্যে যে শূকরী গুলির শাবক নিতান্ত শিশু, তাহারা রাত্রিতে শয়নের সময় পাল হইতে ১০। ১২ হাত দূরে গিয়া সন্তান গুলিকে স্তন্য পান করায়। বৃদ্ধগুলি ঘুমাইয়া রহে, ও ছা গুলি তাহার দুধ খায়। সময় সময় শাবকগুলি ইহাদের মাতাকে ভুলিয়া অন্য শূকরীরও স্তন্য পান করে, কিন্তু ইহাতে সেই শূকরী শাবককে কিছু বলে না।

বন্য শূকরের ন্যায় ইহারা প্রসবের জন্য ডেরা প্রস্তুত করে না। রাখালেরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময়, যেখানে প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, সেইখানেই প্রসব করে।

প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, শূকরের বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে; কেবল ইহাদের বিশ্রী আকৃতি দেখিয়া, এবং আহারাদি সম্বন্ধে ইহাদের নিতান্ত জঘন্য প্রবৃত্তি অবলোকন করিয়া,মনুষ্যেরা ইহাদের মানসিক বৃত্তির পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক ইহাকে নানারূপ কার্য্যশিক্ষা দিতে আলস্য করে, কিন্তু চেষ্টা করিলে ইহাদের দ্বারা অনেক প্রকার কার্য্য সংসাধিত করা যাইতে

পারে। কখন কখন ইহাদের পৃষ্ঠে জিন্ কসিয়া উপরে আরোহণ করা যায়, কখন কখন বা শকটাদিতে ২টী বা ৪টী যোজনা করিয়া শকট চালান যায়।

একটি কৃষক তাহার শকটে ৪ টী শূকর যুড়িয়া, সেণ্ট এল্‌বিন্সের বাজারে যাইত, এবং ২।৩ বার সেই বাজারে পরিভ্রমণ করিয়া শূকরদিগকে কিছুকাল বিশ্রাম করাইত। এবং পুনরায় সমস্ত জিনিস পত্র পুর্ণ শকটে উহাদিগকে যোজনা করিয়া, অবলীলাক্রমে ২।৩ মাইলের পথ উহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত।

নর্ফোক দেশীয় আর একটী কৃষক, ৪ চারিক্রোশ দূরবর্ত্তী উইচ্‌বেইচ স্থানে এক ঘণ্টায় উপস্থিত হইবে এই বাজি রাখিয়া, তাহার শূকরে আরোহণ করিত, কিন্তু তাহার শূকর নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে তাহাকে তথায় পৌঁহুছাইয়া বাজি জিতাইয়া দিত। শিক্ষা দিলে শূকরেরা অশ্বের ন্যায় ৪ চারি ফিট উচ্চ দেয়াল লাফাইয়া পার হইতে পারে।

শূকরের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। কোন কোন শূকরকে শিক্ষা দিলে কুকুরের ন্যায় বন হইতে বিবিধ শিকার বাহির করিতে পারে। এক ব্যক্তির স্লাট্ নামে একটি শূকরী ছিল, সে শিকারে নিতান্ত পারদর্শিতা দেখাইত। ৪০ গজ দূরে কোন রূপ শিকার থাকিলে তাহা যাইয়া বাহির করিয়া দিত, কিন্তু উহার এরূপ আশ্চর্য্য স্বভাব ছিল যে, সম্মুখে কোন শশক থাকিলে তাহার সে তল্লাসও নিতনা।

শূকরের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। কিন্তু য়ীহুদি ও মুসলমানেরা ইহাকে অশুদ্ধ বলিয়া স্পর্শও করে না। এতদ্দেশীয় আদিম অসভ্য জাতিদিগের ইহা একটি প্রধান জীবিকা। সুসভ্য ইংরেজেরাও শূকরের মাংস নিতান্ত সুখাদ্য বলিয়া মনে করেন। ইহারা বন্যশূকর কিংবা সাধারণ পালিত শূকর ভক্ষণ করেন না। তাহাদের জন্য যে শূকরের মাংস মনোনীত করা হয়, সেই গুলিকে শিশুকাল হইতে ছোট কামরাতে বদ্ধ রাখিয়া অন্য কোনরূপে অপরিষ্কার বস্তু খাইতে দেওয়া হয় না। সিদ্ধ আলু ও সিদ্ধ যব খাওয়াইতে খাওয়াইতে উহাদিগের শরীরে যখন ২ইঞ্চ পরিমাণ বসা সঞ্চয় হইয়া থাকে, এবং আপন শরীরের ভারে যখন উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে না, তখন উহাদিগকে হত্যা করিয়া সেই মাংস সাহেবদের ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করা হয়।

শূকরেরা সন্তরণে বিলক্ষণ পটু। সন্তানবতী শূকরী সাঁতার দিলে ছা গুলিও পিছে পিছে সাঁতারিয়া যায় এবং ক্লান্ত হইলে সম্মুখের পা দিয়া উহাদের মায়ের পৃষ্ঠে ভর দিয়া রহে।

শূকরের তৈল অনেক প্রকারে ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের কুঁচিতে সুন্দর সুন্দর বিলাতী ব্রাস প্রস্তুত হয় এবং চর্ম্মে অশ্বারোহণের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট জিন্ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। সাধারণ জিন্ হইতে এই জিনের মুল্য ও স্থায়িত্ব উভয়ই অধিক।

শূকর সম্বন্ধে আমরা আজি পর্য্যন্ত যে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, তাহা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, আমার শূকরে যদি তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য একটু সুখী করিতে পারে, তবে ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা একটি ভাল পশু আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিব।

স্প্যানিস সভ্যতা।

আজি কালি ইউরোপের সকল জাতিই শ্রীমান্। ফ্রান্স বর্ষণোন্মুখ মেঘরাশির ন্যায় নিষ্কম্পভাবে নিজ সময় প্রতীক্ষা করিতেছে। ইংলণ্ড ও রুসিয়া ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী দেশ সকল স্বায়ত্ত করিতেছে। জর্ম্মাণেরা প্রভূতবল যথেচ্ছাচার রাজগণের নিকট হইতে আপনাদের স্বত্ব সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু স্পেন, হতবল, নিরুপায়, নির্জ্জীব ; স্পেন, ধীরে ধীরে ইতিহাস ও মনুষ্য হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতেছে।

কিন্তু স্পেন কি চিরকাল এইরূপ ছিল ? না এমন একসময় ছিল, যখন স্পেনের জয়পতাকা দেশে বিদেশে উড্ডীন হইত, যখন হলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশ হইতে স্পেনের ধনাগার পরিপূরিত হইত, যখন স্পেনের নামে মহারাজ্ঞী এলিজেবেথও কম্পিতা হইতেন ? কি কারণে স্পেনের আধুনিক উচ্ছেদদশা উপস্থিত হইল সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে স্পেনের সহিত ভারতবর্ষের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহার উত্তরে হিমালয়ের ন্যায় পিরিনিস “স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মেরুদণ্ডঃ” রূপে অবস্থিত। দেশের মধ্যভাগ বিন্ধ্য প্রভৃতির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বতমালায় বিভক্ত। ভারতবর্ষে যেমন গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি দীর্ঘব্যাপিনী নদী, স্পেনেও সেইরূপ ইব্রো, টেগাস প্রভৃতি বিশাল স্রোতস্বতী। স্পেনের তিন দিক্ ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য মহান্ ও বিস্ময়কর হইলে মনুষ্যের মনে যে সকল ভাব সঞ্চারিত হয়, স্পেনীয়দের মনেও সেই সকল ভাব আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। যে দেশের লোকেরা নিত্য নিত্য অভ্রভেদী পর্ব্বত ও বিশাল সমুদ্র দেখিতে পায়, তাহাদের মনে স্বভাবতঃই পর্ব্বত ও সমুদ্রের সৃষ্টি কর্ত্তার সত্বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। তাহারা এই সকল দৃশ্য দেখিয়া আপনাদের অসারত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব বু-

ঝিতে পারে এবং একান্ত মনে অবসন্ন-চিত্তে সেই বৃহৎ হইতেও বৃহৎ দেবাদিদেব পরমেশ্বরের নিকট আশ্রয় লয়। ঈশ্বর-ভক্তি ও নিজের প্রতি অনাদর তাহাদের হৃদয়ের প্রধান প্রবৃত্তি হইয়া উঠে। প্রথম হইতেই ভারতবর্ষীয় ও স্পেনীয়দের মনে এই দুইটি প্রবৃত্তির আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মনুষ্য আপনার প্রতি হতাদর হইলে, অন্য একজন প্রভুর আশ্রয়াকাঙ্খী হয়। সুতরাং প্রভুভক্তি ঐরূপ মনুষ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে; এবং নিজে প্রভূত ক্ষমতাশালী হইলেও তিনি অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে, স্পেনীয়দের মনে তিনটি প্রবৃত্তি সংরোপিত হয়—ঈশ্বর ভক্তি, নিজের প্রতি অনাদর, এবং প্রভু ভক্তি। যাঁহারা ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে প্রাচীন কালে ভারতবাসীদের মনেও এই তিনটি প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। ভারতে তেত্রিশ কোটি দেবতার সৃষ্টি, ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য এবং দুর্ব্বল ভারতবাসীদের ভৃত্যোচিত সন্তোষ এই কয়টি প্রবৃত্তির পরিচায়ক।

নানা কারণে স্পেনীয়দের মনে এই কয়টি প্রবৃত্তি ক্রমশঃ পরিপুষ্টই হইয়াছিল। স্পেনীয়েরা প্রথমতঃ রোম কর্ত্তৃক বিজিত হয়। বহুকাল পর্য্যন্ত দেশের স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে রোমের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহারা প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকটে জয় প্রার্থনা করিয়া যাইত। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিত, এবং যুদ্ধে পরাজিত হইলে হত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত। যুদ্ধ কালে, তাহারা প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিত, কারণ প্রভুর শাসনাধীন হওয়াই যুদ্ধে জয় লাভ করার প্রধান উপায়। এই রূপে স্পেনীয়দের মনে প্রভুভক্তি ও ঈশ্বর ভক্তি অধিকতর রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

রোমের ক্ষমতার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে ভিসিগথেরা স্পেন অধিকার করে। স্পেনীয়দিগকে পুনরায় দেশ রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হয়। সুতরাং তাহাদের মনে, পূর্ব্বের ন্যায়, ঈশ্বর ভক্তি ও প্রভুভক্তি আরও অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া গেল।

ভিসিগথেরা (Visigoth) দেশে লব্ধাধিকার না হইতে হইতেই আরবীয় মুসলমানেরা স্পেন অধিকার করিল। সুতরাং স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য স্পেনীয়দিগকে পুনরায় বদ্ধপরিকর হইতে হইল। রোমীয় ও ভিসিগথদিগের সহিত যুদ্ধে স্পেনীয়দের প্রভুভক্তি ও ঈশ্বর ভক্তি পূর্ব্বেই অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এক্ষণে বিধর্ম্মী, ভিন্ন বর্ণধারী, অসভ্য আসিয়াবাসী মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে ঐ দুই প্রবৃত্তি আরও অধিকতর রূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

যুদ্ধ কালে অন্য অন্য অনেকগুলি হৃদয় বৃত্তি পরিপোষিত হয়, তন্মধ্যে সাহস ও কর্মক্ষমতা সর্ব্বপ্রধান। প্রভু ভক্তির সহিত এই শেষোক্ত দুইটি গুণ যোগ দেওয়াতে স্পেনীয়েরা তাৎকালিক জাতিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ হইয়া উঠিল। এক দেশের পর অন্য দেশ তাহাদের করকবলিত হইতে লাগিল। ইউরোপীয় সমস্ত জাতিগণের মধ্যে স্পেন সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

কিন্তু একদোষে স্পেনের এই সম্পদ্ চিরস্থায়ী হইল না। স্পেনীয়েরা অন্য অন্য অনেক গুণে বিভূষিত হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বে তাহারা যেরূপ অন্যের মুখাপেক্ষী ছিল এখন ও সেইরূপ রহিল। সাংসারিক উন্নতি সম্বন্ধে স্পেনীয়েরা রাজার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিত। রাজা তাহাদিগকে যে পথে চালাইতেন, তাহারা সেই পথে অকুতোভয়ে অমিত সাহসের সহিত চলিত, কখন দ্বিরুক্তি করিত না। আবার পারলৌকিক উন্নতি সম্বন্ধে স্পেনীয়েরা স্বদেশস্থ ধর্ম্ম যাজকের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত। ধর্ম্ম যাজক যে কিছু উপদেশ দিতেন, স্পেনীয়েরা অক্ষুণ্ণ চিত্তে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত সেই সকল প্রতিপালন করিত। এই রূপে, স্পেনীয়েরা কখন বা রাজার কখন বা ধর্ম্মযাজকের অনুবর্ত্তী হইয়া নানা রূপ সৎকর্ম্ম করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা স্বাধীন চিন্তা বা স্বানুবর্ত্তিতা একেবারে পরিত্যাগ করিল। যতদিন স্পেনের রাজা ও ধর্ম্মযাজক নিজ২ কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহিত ছিলেন, ততদিন স্পেনের উন্নতিও অপ্রতিহত ছিল। কিন্তু যখন রাশি রাশি অর্থদ্বারা স্পেনের ধনাগার স্ফীত হইতে লাগিল, যখন ইতঃস্তত রাজ্যবিস্তার দ্বারা স্পেনের ক্ষমতা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল, তখন রাজা ও ধর্ম্মযাজক উভয়েই গর্ব্বিত, স্বার্থপর ও সুখবিলাসী হইয়া উঠিলেন। সেই দিন হইতে স্পেনের অধঃপতন আরম্ভ হইল। যতক্ষণ সেনাপতি জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যেরা বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া বিপক্ষ দলের ভীতি বিধান করিতেছিল। কিন্তু যে দণ্ডে সেনাপতি হত হইলেন, অমনি সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া, যে যেদিকে পারিল সে সেইদিকে পলায়ন করিয়া নিজের প্রাণরক্ষা করিতে লাগিল।

এস্থলে ইংলণ্ডের সহিত স্পেনের তুলনা করিলে, স্পেনের অবস্থা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। ইংলণ্ডে যখন কোন গর্ব্বিত অত্যাচারী, বা স্বার্থপর রাজা সিংহাসনারোহণ করিতেন, তখন ইংলণ্ডের প্রজারা স্পেনীয়দের ন্যায় সমস্ত আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া, নিরুদ্যম নির্জীব ভাবে আপনাদের অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইত না। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া যাহাতে সেই রাজা সিংহাসন হইতে দূরীকৃত হন সেই চেষ্টা করিত। প্রয়োজন পড়িলে তাহারা ঐরূপ রাজার

প্রাণবিনাশে পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হইত না। প্রথম চার্লস্. এইরূপে প্রজাদের কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন। দ্বিতীয় জেম্‌স যদি সময়ে ইংলণ্ড হইতে পলায়ন না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনিও প্রথম চালসের "রক্তস্রোত * বৃদ্ধি করাইতেন।" ইংলণ্ডীয়েরা শুদ্ধ এইরূপ রাজাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করাইয়া সন্তুষ্ট হইতেন না। যাহাতে ঐ সকল অত্যাচারী রাজার পরিবর্ত্তে দেশহিতৈষী, প্রজাবৎসল, সত্যপ্রিয় রাজা সিংহাসনারূঢ় হয়েন তাঁহারা সেই চেষ্টা করিতেন। এক্ষণে ইংলণ্ড ও স্পেনের অবস্থাগত বৈষম্য বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। ইংলণ্ড স্বানুবর্ত্তী। সুতরাং ইংলণ্ডের রাজার অধঃপতন হইলে ইংলণ্ডের সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিছুকাল বিদ্রোহ বিপ্লব সহ্য করিয়া ইংলণ্ড শান্তির পথে, উন্নতির পথে পুনরায় ধাবমান হইত। স্পেন পরানুবর্ত্তী সুতরাং রাজার অধঃপতন হইলে সমস্ত দেশ বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত।

এই রূপে স্পেনীয়দের অধঃপতন আরম্ভ হইলে, তাহারা সহজেই অন্য জাতি কর্ত্তৃক বিজিত হইতে লাগিল। সম্মিলিত ফ্রান্সরাজ সহজেই স্পেন অধিকার করিলেন। যত দিন অন্য কোন ইউরোপীয় জাতি স্পেনের সহিত যোগ দিত ততদিন স্পেন অমিত সাহসের সহিত ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করিত। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সেই জাতি স্পেন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই স্পেন পূর্ব্বের ন্যায় শত্রুর পদ দলিত হইত। কিছু কাল এই রূপে অতিবাহিত হইলে ফ্রান্সরাজ দৃঢ়রূপে স্বকীয় ক্ষমতা স্পেনে সংস্থাপিত করিলেন।

তখন বিজিত জাতিদের যে সকল দোষ ঘটে, এক একটি করিয়া সেই সকল গুলি স্পেনীয়দের মনে অধিকার লাভ করিতে লাগিল। সে দিকে ফ্রেঞ্চরাও যাহাতে স্পেনীয়দের সকল দিকে উন্নতি হয় সর্ব্বান্তঃকরণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং এক্ষণে ভারতবর্ষের যে অবস্থা স্পেনের অবস্থাও তৎকালে অবিকল সেইরূপ হইয়া উঠিল। জেতারা উভয়েই ভিন্ন দেশী। উভয় স্থলেই জেতারা বিজিতদের মঙ্গল প্রার্থী। উভয় স্থলেই জেতারা স্বদেশস্থ মঙ্গলকর নিয়মাবলী বিজিতদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সচেষ্ট। উভয়েরই একদল লোক জেতাদের পক্ষপাতী; তাঁহাদের পক্ষে জেতাদের সমস্তই (ভাষা, পরিচ্ছদ, প্রভৃতি) সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। উভয় এই অন্য একদল লোক স্বদেশ প্রচলিত পূর্ব্ব প্রথা ও পূর্ব্ব নিয়মের পক্ষপাতী; তাঁহাদের চক্ষে দেশে পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল তৎ সমস্তই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। উভয় এই জেতাদের পক্ষই, সকল প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি সত্তেও বহুসংখ্য ও ক্রমশঃ লব্ধপ্রসর।

---

* জগৎসিংহ ওসমানকে বলিয়াছিলেন, "না হয় বীরেন্দ্রসিংহের রক্তস্রোত বৃদ্ধি করাইব।"

তখন স্পেনে ফ্রান্সের কাপড় না হইলে বস্ত্র পরিধান করা হইত না, ফ্রান্সের রাজমন্ত্রী না হইলে গৃহ প্রস্তুত হইত না। ফ্রান্সের রীতিতে না হইলে গৃহ সজ্জায় মনস্তুষ্টি হইত-না। অল্প কথায় এখন যেমন ইংরাজ ভারতবাসীদের প্রধান অবলম্বন, ফ্রেঞ্চরাও স্পেনীয়দের পক্ষে প্রায় সেইরূপ ছিল।

যতদিন ফ্রান্স ক্ষমতাশালী রহিল, ততদিন স্পেনের অবস্থা একরূপ চলিল। কিন্তু যখন ফ্রান্স নিজে হতবল হইল, যখন ওয়েলিংটন স্পেনে তাহাদের ক্ষমতা খর্ব্বীকৃত করিলেন তখন স্পেনে আবার এক ভয়ানক বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। যে সকল ফ্রেঞ্চ প্রথা স্পেনে রোপিত হইয়াছিল, স্পেনীয়েরা, একে২ সেই গুলিকে সমূলে উন্মূলিত করিতে লাগিল, এবং তৎপরিবর্ত্তে ও তৎস্থলে স্বদেশের প্রাচীন প্রথা সমস্ত প্রচলিত করিতে লাগিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসন, গৃহ কর্ম্ম প্রভৃতি যে খানে যে টুকু ফ্রেঞ্চদের অনুযায়ীছিল, স্পেনীয়েরা সেই খানে সেই টুকু পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া তদ্বিপরীতে স্বদেশ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। আজি ও স্পেনে এই রূপ পরিবর্ত্তন ও প্রবর্ত্তন চলিতেছে। ফ্রেঞ্চেরা যে গৃহটি অতি যত্নে, অতি পরিশ্রমে পরিপাটী রূপে নির্ম্মান করিয়াছিল, স্পেনীয়েরা আজি তাহার ছাদটি, কালি তাহার কড়িটি পরদিন তাহার দরজাটি একে২ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। সুতরাং পুরাতন বাটির সংস্কার কালে যেরূপ দৃশ্য হয়, আজি কালি স্পেনের দৃশ্যও অবিকল সেইরূপ। এখানে কতক গুলি লোক সুরকি প্রস্তুত করিতেছে। ওখানে কতক গুলি লোক ইটের বোঝা লইয়া গোলমাল করিতে২ উপরে উঠিতেছে। ওখানে ভগ্ন ইষ্টক পতনের শব্দ, ওখানে ভৃত্যদের কলরব, ওখানে মিস্ত্রীদের কলরব, এখানে ইঞ্জিনিয়রের তাড়না প্রভৃতি নানা বিরক্তিকর দৃশ্যে দেশ পরিপূরিত হইতেছে। স্পেন আপন লইয়া ব্যস্ত, সুতরাং পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, তাহা তাহার দেখিবার অবকাশ নাই।

শুদ্ধ ইতিহাসে বিদ্যার পরিচয় দিবার জন্য এ প্রস্তাব লিখিত হইল না। স্পেনের এই অবস্থা ভারতবর্ষের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী কি না, এবং ইংরেজেরা এদেশ হইতে বিদায় লইলে ভারতীয়েরা স্পেনবাসীদের ন্যায় আকুল হইবে কিনা এই তত্ত্বটি প্রশ্নাকারে পাঠকের নিকট উপস্থিত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

লুক্রিসিয়া।

"অইত দিবসনাথ, উঠিল পূরবে,
ছড়াইয়া কণকের তরল কিরণ,—
"এনিওর" শ্যাম জলে; নেহারি উষায়
অইত মধুরে মরি! কুঞ্জনিল বনে
বিহঙ্গম বিহঙ্গীর চুম্বিয়া অধর;
অইত কুটিল ফুল, ফুটিলা সরোজি
সরোবরে বৃন্তাসনে জলজ সুন্দরী;
অইত প্রকৃতি দেবী ধরিলা সোহাগে
বিশ্ববিনোদিনী বেশ নয়নরঞ্জিনী;
কেন আজি কোন দুঃখে কেমনে বলিব,
প্রভাতের চারুবেশ সহেনা নয়নে,
তরুণ অরুণ অই তরল অম্বরে,
এনিও-লহরী লীলা, অনিল চঞ্চল,
বিহঙ্গের কলকণ্ঠ, কুসুম কানন;
কিম্বা অই সুহাসিনি সরোজীর পাশে,
সমীরের ভ্রমরের প্রণয় মিনতি,
হলাহলে মাখা যেন, নয়নে আমার,
ইচ্ছাকরে এইক্ষণে, কি বলিব আর
অনন্ত তিমিরজালে লুকাই বদন।
এখনো এল না কেন প্রাণেশ আমার!
রাখিতে পারি না আর, কলঙ্কিত প্রাণ,
ত্যজিব কি কলঙ্কিত জীবন এক্ষণে?
ত্যজিব না ত্যজিব না আসুক প্রাণেশ
চরণকমলে তাঁর করি নিবেদন।
অকলঙ্ক মরমের অসহ্য বেদনা।
তার পরে জন্মশোধ, দেখি একবার,
মিটায়ে মনের সাধ, ভরিয়ে নয়ন
প্রাণেশের প্রেমময় বদন মণ্ডল!!
অবশেষে, অরপিয়া নাথের চরণে,
কলুষিত কলেবর, প্রফুল্ল হৃদয়ে,
ছিঁড়িব প্রাণের লতা, জীবন কাননে!
আর কেন প্রাণনাথ, এস একবার!
করুণ বিকল কণ্ঠে ডাকে অভাগিনী;
কত দিন, যদি নাথ ডাকিত কিঙ্করী,
শিবিরে, প্রান্তরে, কিম্বা আহব অঙ্গনে,
যথায় থাকিতে তুমি, মুহূর্ত্ত ভিতরে,
কি বলিব, প্রণয়ের বিজলী সঞ্চারে,
অমনি হৃদয়-তার, বাজিত তোমার,
অমনি প্রাণেশ তুমি, আসিতে সত্বরে,
তুষিতে, বদন মম করিয়া চুম্বন!
আজি কেন, ডাকি নাথ, ডাকি শতবার,
নাহি পাই দরশন, অভাগীর প্রতি
কেন এত অকরুণ, জীবন জীবন!
এস নাথ ত্বরা করি, আর কতক্ষণ,
বহিবেন বসুমতী, পাপীনীর ভার!
যত উঠিছেন রবি, তরঙ্গি অম্বর,
ততই বাড়িছে মম হৃদয়বেদনা;
ও কি ও তুরঙ্গ অই হ্রেসিল দুয়ারে,
অই বুঝি আসিলেন হৃদয়রঞ্জন!
এই যে প্রাণেশ মম, নয়ন উপরে,

নিরখি নাথের মুখ, শোক-পারাবার
উচ্ছ্বাসিত হল প্রাণে, জ্বলিল অনল,
রাখিতে পারি না আর নয়নের নীর!
নয়নের বারি আজি, অনন্ত যতনে,
অভাগিনী সম্বরণ করিতে অক্ষম!
ঝরুক ঝরুক তবে, নয়নধারায়
প্রক্ষালিব প্রাণেশের যুগল চরণ!
এস নাথ দুঃখিনীর নয়নের তারা!
দূরে থাক, স্পর্শিও না মিনতি আমার!
স্পর্শিও না কলঙ্কিত কলেবর মম!
এস তুমি স্নেহময়, জনক আমার!
আজি তাত! অভাগিনী নন্দিনী তোমার,
অনন্ত বিদায় চায় চরণকমলে;
দাঁড়াও দাঁড়াও তাত! নয়ন উপরে,
বিদীর্ণ হৃদয়ে আজি, সকরুণ স্বরে,
নিবেদিবে অভাগিনী, হৃদয়বেদনা,
শুন নাথ দয়া করি, অনন্যশ্রবণে!
কালি সেই আহারান্তে, কক্ষে আপনার,
সঙ্গিনী সমাজে বসি, নীরব বদনে,
তুলিতেছিলাম হায়! চারু 'কার্পেট'
চম্পকের কলি, যথা মন্দ সমীরণে,
নিরবে নাচিতে ছিল, অঙ্গুলি নিচয়;
ভাবিতেছিলাম কভু, প্রাণেশমূরতি,
সাজিয়া গেলেন যবে, আর্জিয়া সমরে,
সজ্জিত সমরসাজে, কক্ষে অভাগীর!
হেনকালে দেখিলাম, জীবন জীবনে,
দেখিলাম হায়! সেই নির্দ্দয় বর্ব্বরে,
দেখিলাম আর কত, সঙ্গী প্রাণেশের!
পুজিলাম প্রেম ভরে, নাথের চরণ,
পুজিলাম সঙ্গীগণে, কতই যতনে,

কতক্ষণ পরে নাথ! সহ সঙ্গীগণ,
গেলা চলি পুনরায়, 'আর্টিয়া' নগরে!
সজল নয়নে আমি, উন্মাদিনী প্রায়,
দাঁড়াইনু একাকিনী অলিন্দ উপরে,
চাহিলাম একমনে, রাজপথপানে,
দেখিলাম আশুগতি তুরঙ্গমগণ
মিলাইল ক্রমে ক্রমে, মুহূর্ত্ত ভিতরে,
অভাগি নয়ন পথ অতিক্রম করি
অমনি নিষাদবিদ্ধ কপোতিনী প্রায়,
ফিরিনু মনের দুঃখে, আপন মন্দিরে!
সঙ্গিনী কুলের সেই আমোদ সাগরে,
ঢালিয়া দিলাম প্রাণ, জুড়াতে হৃদয়,
অলিন্দ উপরে বসি নিরানন্দ মনে!
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে, দিবস রতন,
নীরবে পড়িল খসি, পশ্চিম গগনে,
দেখিলাম দিনমণি, ক্রমে পুনরায়,
লুকাইল সম্বরিয়া, সহস্র কিরণ!
দেখিনু হাসিল সন্ধ্যা, কুসুমবদনে,
তুলিয়া বিনোদহাসি, চিরসৌরভিনী,
শুনিনু গাহিল দূর নিকুঞ্জ কাননে,
বিহঙ্গিনী-মালা মিলি সন্ধ্যার সংগীত।
দেখিলাম স্থির নেত্রে, ক্রমে পুনরায়,
আলোকমালিনি মহী, তিমির বসনে,
আবিরল শ্যাম তনু, সন্ধ্যার মিলনে;
তারাময়ী সুহাসিনী যামিনী সুন্দরী!
ক্রমে ক্রমে দেখাদিল, কুসুম সান্দনে,
নবমীর চারুশশী, হাসিল অম্বরে,
চঞ্চলিল চারুশশী, 'এনিওর' জলে।
ত্যজিয়া অলিন্দ পুনঃ, কক্ষে বসিলাম!
শুইলাম সুরঞ্জিত কোমল শয্যায়,

গাইলাম মৃদুস্বরে, ব্যথিত হৃদয়ে,
খুলিয়া কুসুম কণ্ঠ, সঙ্গীত লহরী।
দেখিনু মর্ম্মর মঞ্চে, বিনোদ মন্দিরে,
জ্বলিছে মৃদুলে দীপ, স্ফটিক আধারে,
প্রদীপ হইতে ঝরি, আলোক তরল,
দেখিলাম থরে থরে নাচিছে চঞ্চলে!
শুনিলাম সমীরণ, মধুর নিঃস্বনি,
বিকচিত মধুময়, কোমল কপোলে,
নাচাইছে ধীরে, নব অলকার দাম।
শুনিলাম দূরে কল সঙ্গীত কোমল,
কামিনীর কলকণ্ঠে ঝরিছে মধুরে,
কোমল শয্যায় শুয়ে, দেখিনু উল্লাসে,
কাদম্বিনী মাঝে শশী, সুদূরগগণে।
দেখিনু কার্পেট পরে কক্ষের দুয়ারে,
অচঞ্চলা চন্দ্রমার, কোমল মালতী,
মিলিয়া পলকহীন; অচল নয়ন,
দেখিতেছি সেই জ্যোতি, কতই ভাবনা,
ভাবিতেছি একমনে; হেনকালে হায়!
সহসা চরণধ্বনি, শুনিনু সোপানে।
শুনি সে চরণধ্বনি, ফুটিল অমনি,
শত সাধে অভাগীর হৃদয় কমল;
উজ্জ্বল হইল পদ্ম, নয়নের তারা!
চঞ্চলে বহিল রক্ত, ধমনী ভিতরে,
ত্যজিয়ে শয়ন আমি, উঠিনু সত্বরে,
চমকিয়া চলিলাম চঞ্চল চরণে,
ভাবিয়া অন্তরে বুঝি, প্রাণেশ আমার,
আসিলেন তুষিবারে এই অভাগীরে!
কিন্তু কি বলিব হায়! মুহূর্ত্ত ভিতরে,
শুকাইল আশালতা হৃদয় কাননে,
দেখিলাম ক্ষীণালোকে, সোপান উপরে,
সজ্জিত সমর সাজে প্রাণেশ বান্ধবে!
তখন জানিনি মনে, অমৃত জলদ
বরশিবে হলাহল; কোমল মুরতি,
কে জানে কণ্টকময়; জানে কি কখনো,
কুরঙ্গিনী, মরীচিকা, তরঙ্গিনীরূপে
শোভে যবে মরুভূমে, জানিনা অন্তরে!
দেববেশে এল সেই, কৃতান্ত আমার।
প্রবেশিয়া নিজ কক্ষে হায়! তার সনে,
বসাইনু সমাদরে, কাষ্ঠাসনপরে,
আপনি বসিনু পাশে, পবিত্র অন্তরে!
শুনিবারে প্রাণেশের! মঙ্গল বারতা,
শুনিবারে সমরের অপূর্ব্ব কাহিনী,
কণ্টকিত কলেবরে শুনিনু শিহরী,
মনোহরা শোভাময়ী আর্ডিয়া নগরী
বেষ্টিয়াছে চারিদিকে, রোম অনীকিনী।
কহিলা বর্ব্বর পুনঃ, কতক্ষণ পরে,
"সমরের পরিশ্রমে ক্লান্ত কলেবর,
তোমার মন্দিরে আমি, অতিথি সুন্দরি,
বঞ্চিব যামিনী দেবি, মন্দিরে তোমার!
অনুমতি দাও তুমি, ভুবনমোহিনী।"
কি বলিব পতিপ্রাণা, সতী সাধ্বী প্রায়,
তখনি সম্মতি দিনু, কহিনু আবার
ভাগ্যবতী আজি আমি, ধরণী মণ্ডলে!
রাখিলাম অতিথিরে, অমৃত প্রদানে
পোষিলাম আশীবিষে; কিছুক্ষণ পরে,
অই কক্ষে নিদারুণ করিল শয়ন।
বসিলাম গিয়ে আমি, অলিন্দ উপরে,
দেখিলাম সুখময়ী নিদ্রা পরশনে,
অচল জীবনস্রোত, ক্ষণেকের তরে
ঘুমাইছে জীবকুল, কেবল কাননে

নিঃস্বনিছে সমীরণ, আর নীলাম্বরে
ছুটিতেছে কাদম্বিনী, আবরি সলাজে,
সলজ্জ চন্দ্রমা ছবি, নয়ন নন্দন!
দেখিনু অলিন্দে বসি, নয়ন অদূরে,
ভুবন সুন্দরী রোম নিদ্রায় বিহ্বলা।
ক্রমে নবমীর শশী চলিল পশ্চিমে,
সম্বরি মধুরময় কৌমুদী কোমল।
বসিয়াছি, হেনকালে কতক্ষণ পরে,
ডাকিল 'জুলিয়া' আসি, ভাঙ্গিল চেতন,
চলিলাম দ্রুত পদে শয়ন মন্দিরে,
পশিয়া শয়ন কক্ষে, 'জুলিয়ার' সনে,
খুলিলাম চারুবেশ, রাজেন্দ্রমোহিনী,
পরিনু শয়ন বাস, পর্য্যঙ্ক উপরে,
রাখিলাম কলেবর, কোমল শয্যায়
তুষার শীতল জল, স্ফটিক আধারে,
রাখিয়া নিশীথ-মঞ্চে, 'জুলিয়া' সুন্দরী
আবরিল চারু দীপ, নীল বসনের
সুকোমল আবরণে, বাঁধিল আবার,
প্রফুল্ল কুসুম দাম, মুক্ত বাতায়নে;
বিদায়িনু 'জুলিয়ায়' কতক্ষণ পরে।
তার পরে আসিলেন, বিশ্ববিনোদিনী
চিরসুখময়ী নিদ্রা নিকটে আমার,
পরশিলা কলেবর, চিরমোহময়ী,
মুদিয়া নয়ন দুটি হনু অচেতন
সময়ের চল চক্রে মধুরা যামিনী
নীরবে গম্ভীরা; ক্রমে কোমল শয্যায়,
নিদ্রায় বিহ্বলা প্রাণ, হেনকালে হায়!
বোধ হল কলেবরে কর-পরশন;
অমনি ভাঙ্গিল নিদ্রা উঠিনু শিহরী
হৃদয়ের প্রতিঘাত, হইল চঞ্চল,
সভয় হইল হিয়া, সৌদামিনী সম।
উঠিয়া বসিনু সেই পর্য্যঙ্ক উপরে,
দেখিনু শয়ন কক্ষ পূর্ণিত আলোকে!
ঘুচিয়াছে প্রদীপের, নীল আবরণ,
চঞ্চল প্রদীপালোকে, দেখিনু আবার,
পর্য্যঙ্কের পাশে সেই দুরাত্মা বর্ব্বরে!
নিষ্কোষিত অসি করে, মুহূর্ত্তেক তরে,
ঘুরিলা, নয়ন মম, চমকিল প্রাণ!
সঞ্চারিল সৌদামিনী ধমনী ভিতরে,
তরল অনল স্রোত, বহিল শরীরে,
* * * * * * * * * *
মুহূর্ত্ত ভিতরে পুনঃ, পর্য্যঙ্ক ত্যজিয়া,
ব্যাধ শরে বিদ্ধ মত্তা সিংহিনী যেমতি
পড়িলাম হর্ম্যতলে, আকুল অন্তরে;
ভিজানু নয়নাসারে, চরণ তাহার,
করিনু বিকল কণ্ঠে, সহস্র মিনতি,
ভাগ্যদোষে, কি বলিব, নয়নের জলে,
দ্রবীভূত হইল না, নির্ম্মম পাষাণ!
কি বলিব প্রাণনাথ! সেই দণ্ডে হায়!
আলিঙ্গন করিতাম উলঙ্গ কৃপাণে,
ত্যজিতাম এই প্রাণ, অম্লান বদনে!
কিন্তু শুধু ভাবিলাম, কলঙ্ক বেদনা,
ব্যথিবে প্রাণেশ প্রাণ, ভাবিতে ভাবিতে
অবশ হইল প্রাণ, ঘুরিল আবার,
নয়ন মস্তক মম, চেতনা প্রবাহ,
অচল হইল ক্রমে ধীরে ধীরে হায়!
খসিল ভূতলে নব বসন্ত বল্লরী
অচেতন হর্ম্যতলে রহিনু পড়িয়া।
* * * * * * * * *
বল তবে প্রাণনাথ! ধরিবে কেমনে,

কলঙ্কিত তনু পুনঃ হৃদয়ে তোমার !
সতীত্ব বিহনে নাথ ! যুবতী জীবন,
রাখিয়া কি ফল আর সমক্ষে সবার !
এখনি ত্যজিব প্রাণ, অম্লান বদনে ;
প্রাণেশ্বর প্রাণনাথ ! জনক আমার,
অনন্ত বিদায় দাও, চিরঅভাগীরে,
ধরিতে পারি না আর, কলঙ্কিত প্রাণ।
আর কি বলিব নাথ ! শিরায় তোমার,
প্রবাহিত হয় যদি, রক্তের লহরী,
প্রতিফল পায় যেন, পাষণ্ড বর্ব্বর,
বিদায়ের কালে এই, মিনতি আমার !
এই দেখ, করে নাথ ! কৃপাণ উজ্জ্বল,
পবিত্র অন্তর মম, পবিত্র হৃদয়,
কলঙ্কিত কলেবর, শুধু অভাগীর
বর্ব্বরের পরশনে, সেই কলেবর
প্রক্ষালিত করি এই, পবিত্র শোণিতে !
বিদায় মা বসুমতী ! দাও অভাগীরে,
বহিতে হবে না আর পাপিনীর ভার।
যাই তবে প্রাণনাথ ;--ওকি ? প্রাণেশ্বর !
স্পর্শিওনা কলঙ্কিত কলেবর মম !
বিদায় বিদায় তাতঃ ! প্রাণেশ বিদায়,
এই বিদারিনু বক্ষ ! এই দেখ নাথ !
উছলিল বক্ষঃস্থলে, লোহ-নির্ঝরিণী,
সম্বরিয়া নর লীলা, নারীকুলেশ্বরী,
পশিলা পবিত্রপুরে, নবীন যৌবনে,
রূপের আকাশে মরি, বাসন্তি পুর্ণিমা,
আবরিল অন্ধকারে, অনন্ত জলদে,
শুকাল বসন্ত ফুল, প্রফুল্ল কাননে,
মিলাইল ক্ষণপ্রভা, অনন্ত অম্বরে,
সম্বরিয়া চলজ্যোতি, চির অন্ধকারে ;
উষার চুম্বনে চারু, নব প্রমোদিনী,
সৌরভিনী কমলিনী জলজ সুন্দরী
ডুবিল অতল জলে, ফুটিবে না আর।

শ্রীহঃ—

স্ত্রীকবি ও তদনুযায়ী উপদেশ।

পীঠিকা।

সম্প্রতি স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ অবস্থা তাহাতে যাহা পুরুষের শিক্ষণীয়, স্ত্রীলোকেরা প্রায় তাহাই শিক্ষা করিতেছেন। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের উভয়জাতীয় শিক্ষা না হইলে সংসারের কখনই উন্নতি হইবে না। গৃহস্থালি, গার্হস্থ্যশিল্প, পাকবিদ্যা, এই সকলই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ও অবশ্য শিক্ষিতব্য। বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাতে এ সকলের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হইতেছে।

পুর্ব্বকালের স্ত্রীলোকেরা পুস্তক পড়িতে পারিতেন না, অক্ষর আঁকিতেও জানিতেন না, কিন্তু তাঁহারা গৃহস্থালি, গার্হস্থ্যধর্ম্মোপযোগী শিল্প, বিনয়, সদাচার, ধর্ম্মপ্রবলতা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয়

শিক্ষিতব্য বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণা ছিলেন। তাঁহারা বালিকাদিগকে যে সকল খেলা রচনা করিয়া নিবিষ্ট রাখিতেন, তদ্দ্বারা বালিকাদিগের বালিকা অবস্থাতেই গৃহস্থালি শিক্ষায় অনুরাগ সঞ্চার হইত। রাঁধাবাড়ি খেলায় রন্ধন বিষয়ে অনুরাগ উৎপাদন করিত, পুতুল খেলায় পুত্র কন্যার লালন ও তাহাদের বিবাহ, আত্মীয় কুটম্বের আদর আহ্বান, দাম্পত্য ধর্ম্মের মর্যাদা, লৌকিকতা রক্ষা, প্রতিবেশীপ্রেম, পুত্রবধু ও কন্যাদিগকে শিক্ষা প্রদান, তাহাদের কলহ ভঞ্জন ইত্যাদি সমস্ত গৃহস্থালীর ব্যাপার অভ্যাস পাইত। ঐ সকল ক্রীড়াতে স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ও অমৃত স্বরূপ লজ্জা, ভয়, বিনয়, কোমলতা প্রভৃতি জন্মিত। এক্ষণ ক্রমে সে সকল উঠিয়া যাইতেছে, কেবল অক্ষর শিক্ষাই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচীনকালের গৃহিনীরা কি প্রকারে শিক্ষা দিতেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব লিখিত হইল। প্রাচীনা স্ত্রীগণের যে সকল সারগর্ভ উপদেশাত্মক বাক্য আছে, তাহাকে আমরা স্ত্রী কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। পুরুষেরা ভাবায় পণ্ডিত, তাঁহাদের ভাবা সুশ্রাব্য, স্ত্রীদিগের ভাবায় তত অধিকার ছিল না, এজন্য তাঁহাদের কবিতা তত সুশ্রাব্য নহে ; স্ত্রীভাবা স্বতন্ত্র। স্ত্রীভাবায় গ্রথিত খণ্ডখণ্ড কবিতার মত বাক্যকে আমরা স্ত্রীকবি বলিলাম। ইহার ভাবা এখন শ্রবণ-সুখকর না হইলেও সারগর্ভ বলিয়া প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিক্ষার আবশ্যকতা ও সময়।

বিধাতা স্ত্রী পুরুষ সৃজন করিয়া আপন সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সংসারে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া চলিবে এবং পরস্পরকে সুখী করিবে ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। স্ত্রী পুরুষ যদি যথাযোগ্য রূপ সুশিক্ষিত হইয়া একযোগে সংসারসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া সামঞ্জস্যে জীবনাতিপাত করেন, তাহা হইলে এই মানব ধাম স্বর্গতুল্য সুখধাম হয়।

প্রধানতঃ পুরুষেরা গৃহস্থ জাতি, নারীগণ গৃহিণীজাতি। স্ত্রী পুরুষের শিক্ষাবিভাগ এই যে, পুরুষেরা অর্জ্জন শিক্ষা করিবেন এবং গৃহিণীরা গৃহস্থালী শিক্ষা করিবেন ; ধর্ম্ম, জ্ঞান, নীতি সাধারণে থাকিবেক। উহা পুরুষেরাও শিক্ষা করিবেন, স্ত্রীরাও করিবেন। যেমন এক যোগে গৃহস্থালি করিলে তাহা সুচারু ও সুখের হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মও একযোগে করিলে ভাল হয়। নারীজাতি ধর্ম্মানুষ্ঠান, গার্হস্থ্যবিদ্যা, শিক্ষা প্রভৃতি স্বতন্ত্র হইয়া করুণ, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ঐ সকলের অনুষ্ঠান একযোগে হওয়া উচিত, একযোগে হইলে বিনাক্লেশে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়।

কি প্রকারে গৃহস্তালি করিতে হয়, কি উপায়ে ধর্ম্মোপার্জ্জন হয়, নারী এ সকল শিক্ষা করিবেন এবং সুশিক্ষিতা হইয়া ধর্ম্ম ও ন্যায় পথে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। পুরুষদিগের প্রতি এইরূপ নিয়ম যে, গৃহস্তালি ও ধর্ম্মোপার্জ্জন এই দুইটি সংসার বৃক্ষের শাখা; ধর্ম্মসুখ সম্ভোগ তাহার ফল। স্ত্রীজাতির গৃহস্তালি না জানা বিড়ম্বনার বিষয়, পুরুষেরও ধনোপার্জ্জনের অক্ষমতা অসীম দুঃখের কারণ। ধর্ম্মমতির অভাব উভয়েরই অনিষ্টকর। যিনি যাহাই শিক্ষা করুন, তদানুষঙ্গিক ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়। অনুষ্ঠানকালেও ধর্ম্ম ও নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যকরা কর্ত্তব্য; যিনি তাহা না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কার্য্য করেন, তিনিই বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন।

বিনা শিক্ষায় কিছুই হয় না, ইহা স্থির-সিদ্ধান্ত। অতএব কি গৃহস্তালি, কি ধনোপার্জ্জন সমস্তই শিক্ষা করিতে হয়। যাহা শিক্ষিতব্য, তাহা শৈশবাবস্থায়ই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কেন না বাল্যকালে যাহা শিক্ষা করা যায়, তাহাতেই উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে। বয়োবৃদ্ধিসহকারে নানা বিষয়ে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হওয়ায় স্মরণশক্তির হ্রাস হয়, সুতরাং কোন বিষয়ই ভাল শিক্ষা হয় না। তখন ভোগের সময়, সুখভোগে মন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, সুতরাং কষ্টসাধ্য শিক্ষাসকল ঘটিয়া উঠে না। তখন বুদ্ধি প্রশস্ত হয় বটে, কিন্তু সংসারের চিন্তায় ব্যাকুল হইতে হয় ও ঈদৃশ কষ্ট সহ্য হয় না। এই সকল কারণে শিশুকালেই শিক্ষা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা বলিয়া থাকেন—

"কচিতে না নোয়া'লে বাঁশ।
পাকলে করে টাঁশ টাঁশ॥" (স্ত্রীকবি)

পূর্ব্বে বাঁশের ছ'ড় ব্যবহৃত হইত, "চৌপালী" নামক এক প্রকার ডুল ছিল; তাহার ডাণ্ডি বাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত হইত, ঐ বাঁশ কচি অবস্থায় চৌপালীর উপযুক্ত করিবার জন্য বাঁকাইয়া দিতে হইত। কেন না পাকা বাঁশ নোয়াইতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায়। উপরোক্ত শ্লোকটি তদ্দৃষ্টে কোন গৃহিণী কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। পল্লীবাসিনী বৃদ্ধা গৃহিনীরা কোন বুদ্ধিমতী বালিকা দেখিলে আহ্লাদিতচিত্তে তাহার মাতাকে উপদেশ দিতেন 'তোমার এই মেয়েটিকে এই বেলা গৃহস্তালি শিখাও নচেৎ ইহার পর আর শিখিতে পারিবেনা' এবং আপনার কথা সপ্রমাণ জন্য উপরোক্ত পুরাতন স্ত্রী-কবিকৃত শ্লোকটির আবৃত্তি করিতেন। অতএব যাহা শিক্ষিতব্য তাহা সংসারভার স্কন্ধে না পড়িতে পড়িতে বাল্যকালেই শিখিতে হইবে। যাহারা প্রথমকালে শিক্ষা না করেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারী হইলে তাঁহাদিগের দুর্গতির সীমা থাকে না।

অশিক্ষিতা নারী কোন ক্রমেই গৃহস্তালির সুব্যবস্থা করিতে পারেন না। সোনার সংসারও অশিক্ষিতার হস্তে প-

ড়িলে ছারখার হয়। কি করিলে সকল দিক্ রক্ষা পাইবে, কিরূপ করিলে সাংসারিক কার্য্য সহজ সাধ্য হইবে, কি কার্য্য করিলে সংসারের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে, কি উপায় অবলম্বন করিলে সংসারের অনিবৃত্তি বা অপ্রতুল ঘুচিবে এবং শ্রীবৃদ্ধি হইবে, অশিক্ষিতা রমণীরা এ সকল বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অজ্ঞতা ও অনভ্যাস নিবন্ধন তাহারা সংসারকে ভার জ্ঞান করে এবং কার্য্য কালে তাহাদের ক্লেশ বোধ হয়, ক্রমে আলস্য প্রশ্রয় পাওয়াতে সংসার শ্রীহীন হইতে থাকে; সুতরাং তাহারা জীবনের সারধর্ম্ম ও সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয়। দুরবস্থা ও ক্লেশসহিষ্ণুতা বশতঃ ক্রমে তাহাদের রুচি কলুষিত হয়। অধর্ম্ম স্পর্শ করে, সুতরাং তাহাদিগের পারলৌকিক সুখেও জলাঞ্জলি দিতে হয়।

পুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে। পুরুষেরাও যদি প্রথম বয়সে উপার্জ্জন, নীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষা না করেন, তাঁহারাও সংসার-দশায় অশেষবিধ ক্লেশ পান। সংসার তাঁহাদিগের ভার বোধ হয় এবং তাঁহারা সংসার চালাইতে ব্যাকুল হন। অবশেষে হয় ত অধর্ম্ম ও অন্যায় উপায়ে ধনার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহপর উভয় কালই নষ্ট করেন।

বাহির হইতে আনয়ন করা বা উপার্জ্জন করা আর গৃহস্থালি কার্য্য করা এই উভয় ভার যদি এক ব্যক্তির স্কন্ধে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাহার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হয় এবং কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। এজন্য গৃহস্থ ও গৃহিণীর উহা অংশ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। গৃহস্থ বাহির হইতে ধনাদি আহরণ করিবেন এবং গৃহিণীরা তাহা সামঞ্জস্য করিয়া ব্যয় ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তাহা হইলে উভয়েরই ভারের লাঘব হয় এবং উভয়েই সুখী হইতে পারেন। যদি গৃহিণীর আহরণের চিন্তা না থাকিল এবং যদি রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তাও গৃহস্থের না থাকে, তাহা হইলে উভয়েই আপনাপন কর্ত্তব্যের উন্নতি করিতে পারেন ও সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়েন। এইরূপ হইলে অতি সুন্দররূপে সংসার নির্ব্বাহ হয়। নচেৎ একজন দাস হইয়া সমস্ত করিবেন, আর একজন যোগীর ন্যায়, উদাসীনের ন্যায়, পরের ন্যায়, নিঃসম্পর্কিত থাকিবেন ইহা অতীব অন্যায়। ইহাতে উভয়েরই অত্যন্ত কষ্টের বিষয় তাহা প্রাচীন কালের স্ত্রী কবিরা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

'গাছে পাড়া তলায় কুড়ান এ
সামান্যি নয়।
নাকের জলে চোকের জলে একাকার
হয়॥' (স্ত্রীকবি)

কোন বৃহৎ বৃক্ষের ফল পাড়িতে হইলে দুই জনের আবশ্যক হয়। একজন পাড়িবে ও একজন কুড়াইবে। এরূপ না হইলে কষ্ট এবং ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আম্র পাড়িয়া তলায় ফেলিলে যদি রক্ষক না থাকে, তাহা হইলে অন্যা-

স্বার্থে তাহা দুষ্টলোক কর্ত্তৃক অপহৃত অথবা বন্যপশু দ্বারা ভক্ষিত হইতে পারে। অতএব পাড়িতে গেলে কুড়ান এবং কুড়াইতে গেলে পাড়া হয় না। এই দৃষ্টান্ত শিক্ষা ও অভ্যাস করিলে সংসারকে ভারজ্ঞান হয় না এবং অনায়াসে সংসার-কার্য্য-নিচয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যায়। মুটেরা শিক্ষা কৌশল ও অভ্যাস বলে লোকের কত বহুভার দ্রব্য বহন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারের অঙ্গ ও তাহার প্রণালী।

সংসারে সকলেই অজ্ঞানাবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে নানা প্রকার শিক্ষালাভ হয়। কিছু না কিছু শিক্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক। জ্ঞানসঞ্চার আরম্ভ হইলে কিছু না কিছু শিক্ষা হইবেই হইবে। যখন কোন প্রকার ঘটনা আপনা হইতেই হইবে, তখন ভাল বিষয় শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। যে শিক্ষা দ্বারা ইহকালে সুখসাচ্ছন্দ্য ও পরকালে শুভ হয়, তাহা শিক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সে বিষয়ে আলস্য করিলে মন্দ শিক্ষার ফল—কষ্টভোগ করিতে হয়। মনুষ্য যদি ধর্ম্ম, নীতি, সংসার-নির্ব্বহন-প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা না করে, এবং কেবল আহার ভয় ও ইন্দ্রিয়বলিাশ লইয়া থাকে তাহা হইলে সে পশু হইতেও অপকৃষ্ট হয়। পশুরা কোন ভাল বিষয় অর্থাৎ জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, গৃহস্থালী ইত্যাদি শিখে না। মনুষ্যেরা ইহা শিখে বলিয়া পশু অপেক্ষা সুখী ও শ্রেষ্ঠ। যে মনুষ্য এসকল শিক্ষা না করে সে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে, কারণ পশুদের কোন বিশেষ প্রকার পাপ শিক্ষা ঘটেনা। মনুষ্য অশিক্ষিত হইলে সে দুর্নিবার ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া কেবল পাপ শিক্ষা করে, সুতরাং অধঃপাতে যায়। এবিষয়ে পুরাতন একটি স্ত্রীগাথা এই—

"বসে বসে খুটি নুটি।
অভাগী যেন পাপের কুটি॥"

যে নারী কোন আত্মহিতকর কার্য্য করিতে ভাল বাসেন না, তাঁহাকে 'খুটি নুটি' অর্থাৎ বৃথা বা নিষ্ফল কার্য্য করিতে হয়; যেহেতু কাহারও চুপ করিয়া থাকিবার যো নাই। একজন বহুদর্শী পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'মনুষ্য কার্য্যের অভাবে অকার্য্য করে' অর্থাৎ কোন ভাল কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলে মন্দ কার্য্য আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। বৃথা কার্য্যে আসক্ত হইলে তাহাকে ক্রমে পাপ আশ্রয় করে, সুতরাং অভাগ্যবতী হইতে হয়।

অনেকে মনে করেন, পুস্তক পড়িতে পারিলেই জীবনের সমস্ত শিক্ষা সমাধা হইল। এটি বড় ভ্রম। পুস্তক পড়িতে শিখা আর গুটি কত অক্ষর পড়িতে শিখা একই কথা। কএকটা অক্ষর জানা কোন ক্রমেই জীবনের প্রধান শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অনেক বালক বালিকা কেবল অক্ষর পড়িয়া বাবু অর্থাৎ অক-

র্ষণ্য হইয়া পড়েন ; অলস, দুর্ব্বল, অহঙ্কারী, বিদ্যাভিমানী, কার্য্যাক্ষম, বিলাসপ্রিয় হন। নিরবচ্ছিন্ন অক্ষর-শিক্ষা অনর্থের হেতু ; অতএব অক্ষর-শিক্ষা অপেক্ষা কার্য্য শিক্ষাই ভাল। এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাহারা লিখিতে বা পড়িতে পারে না অথচ তাহাদের হৃদয় লেখা পড়ার পরিণাম-ফলস্বরূপ—ধর্ম্ম,জ্ঞান,নীতি, কার্য্যদক্ষতা, সদাচার প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। এই সকল গুণই লেখা পড়ার ফল, নচেৎ উহা পাখীর মতন পড়া ও আঞ্চোড়নের ন্যায় লিখা।

লেখা পড়ার এত সম্মান কেন এবং তাহার সৃষ্টি কেন হইয়াছে, ইহা যিনি অনুধাবন করেন তিনিই উহার যথার্থ মাহাত্ম্য বুঝেন এবং শিক্ষার উন্নতি করিতে পারেন। যেমন কার্য্যের সুবিধা ও শ্রমলাঘবার্থ নানা প্রকার যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ সহজে শিক্ষার নিমিত্ত লেখা পড়ার সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব লেখা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি শিক্ষার যন্ত্র স্বরূপ। অভিজ্ঞদিগের উপদেশই শিক্ষণীয় ; লেখা পড়া উপকরণ মাত্র।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে বালক বালিকারা অনেক প্রকার শিক্ষা করিয়া থাকে তৎসমস্তই যে লিপি অবলম্বন করিয়া লাভ হয়, তাহা নহে। গুরুপদেশ ও অন্যান্য নানাবিধ উপায়েই অধিক শিক্ষা হয়। এসম্বন্ধে একটি স্ত্রী-গাথা আছে—

"যে শেখে সে শেখে
ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে॥"

যাহার শিখিবার ইচ্ছা থাকে, সে কোননা কোন প্রকার শিখিবেই শিখিবে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বজন, গুরু এই সকলের উপদেশ অনুসারে শিক্ষালাভ হয়। কখন কখন এবং কোন কোন বিষয় বিনা উপদেশেও শিক্ষা হইয়া থাকে। বিনা উপদেশে যাহা শিক্ষা হয়, তাহার দুই প্রণালী আছে ; এক ঠেকিয়া শিক্ষা আর দেখিয়া শিক্ষা। বুদ্ধিমতী বালিকারা অন্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেক কার্য্য শিখিয়া থাকে। ইহসংসারে সময়ে সময়ে নানাবিধ আপদগ্রস্ত হইতে হয়। বিপৎপাতে সর্ব্বদাই ক্লেশ ও ক্ষতি ঘটে, তৎকালে অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব বহুবিষয় শিক্ষা করা যায়। অন্যায় কার্য্যের ফল উপস্থিত হইলে অনুতাপ জন্মে, তাহা হইতে শিক্ষা হয়, ইহাই ঠেকিয়া শিখা।

(ক্রমশঃ।)

রসিকতা ও রসের কথা।

এই বঙ্গদেশ রসিকতার সমুদ্রবিশেষ। পৌরাণিকেরা ক্ষীরলবণ প্রভৃতি সপ্তসমুদ্রের বিবরণ লিখিয়াছেন। যদি তাঁহারা বঙ্গভূমির আধুনিক ইতিহাস দিব্যনেত্রে পাঠ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহাকে রস-সমুদ্র নাম দিয়া পুরাণ-প্রসিদ্ধ ভূগোল-শাস্ত্রে সমুদ্রের সংখ্যা সাত না লিখিয়া আট লিখিতেন। জ্ঞানানন্দের অভিধানে বঙ্গের এক নাম দাসনিবাস, আর এক নাম রস-বিলাস। কেন না, এদেশের সকলেরই ললাটপটে দাসত্বের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-রেখা এবং অধরে ও নয়নপ্রান্তে রসিকতার মধুরলাঞ্ছন, সকল সময়ে সমানরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পুত্রকন্যা কি ভ্রাতাভগিনীর নাম রাখিতে হইবে,—বাঙ্গালি তখনও রসিক। কারণ, পুত্রের নাম রসিকচন্দ্র, কন্যার নাম রসময়ী চৌধুরাণী। ভ্রাতার নাম প্রাণনাথ দত্ত, কি রতিকান্ত রায়; ভগিনীর নাম অনঙ্গমঞ্জরী। নামে এইরূপ অসাধারণ রসিকতা পৃথিবীর আর কোন্ দেশে দৃষ্ট হইয়াছে?

দেশবিশেষের নামাবলী পাঠ এক হিসাবে সেই দেশের প্রকৃতি-পাঠ। বৃটনেরা জ্ঞানে গুণে, বৈজ্ঞানিকবলে এবং রাজনীতির কৌশলে আজি কালি সমস্ত সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিলেও তাঁহারা কোন এক দিন যে গর্ত্তে বাস করিতেন ও আম-মাংস ভাল বাসিতেন, এবং এইক্ষণও তাঁহাদিগের বাস্তুরাজ্যে ডারউইনের ক্রীড়াময়ী কল্পনা যে বিরাজ করিতে পারিতেছে, তাঁহাদিগের নামেই তাহার নিদর্শন। কারণ, যদিও তাঁহাদিগের মিল মেকলে প্রভৃতি ঐতিহাসিকবর্গ, পরকীয় জাতি-চরিত ও সাহিত্যাদির সমালোচনায় ক্ষুরধারতীক্ষ্ণতা অবলম্বন করিয়া, পৃথিবীর পুরাণতম জাতিকেও অকুণ্ঠিতকণ্ঠে অসভ্য বলিয়া গালি দিতেছেন, এবং ভাষাতত্ত্বের ভাষ্যস্বরূপ দেবজনস্পৃহনীয় সংস্কৃত ভাষাকেও বিকটবুলি জ্ঞান করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে Fox (শৃগাল), Wolf (বৃক), Savage (বন্যবর্ব্বর), Hogg (শূকর) ও Badcock (মন্দকুক্কুট) প্রভৃতি শ্রুতিমধুর ও মধুরার্থক নামসমূহ সাহিত্যে গ্রথিত ও সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে এবং লোকে অদ্যাপি এই সকল নাম সাদরে গ্রহণ ও সসম্মানে ব্যবহার করিতেছে। স্বামী, দিবসের পরিশ্রমের পর ক্লান্তকলেবরে গৃহে আসিতেছেন, গৃহলক্ষ্মী প্রেমভরে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন,—'হে শৃগাল, হে শৃগাল!' অথবা—'হে বৃক

হে বৃক ! ' পুনরপি বলিতেছি, কি মোহনধ্বনি, কি মধুর ! বঙ্গীয় কুলকামিনীরা ক্লান্তকলেবর কান্তকে ' হে শৃগাল', অথবা 'হে বৃক ' বলিয়া সম্ভাষণ করেন না বটে, কেন না বাঙ্গালি রসিক। কিন্তু রসিকতার অনুরোধে বাঙ্গালির নামাবলী যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা পুরুষের শোভা পায় কি না এবং পুরুষের তাহাতে তৃপ্তিলাভ সম্ভব কি না, ইহা গভীর সন্দেহের বিষয়। অথবা ইহাতে সংশয় ও বিস্ময়ের কথা কি ? যাঁহারা ভারতউদ্ধারের জন্য আদ্ধার তালে গীত গাইতে পারেন, তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া নাচনিচ্ছন্দের অশ্রাব্যকবিতায় জাতীয় হৃদয়ের মর্ম্মনিহিত শোকবহ্নি উদ্গীরণ করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ বীরেন্দ্র-কেশরী, সুরসিক ধুরন্ধর পুরুষদিগের নাম কামিনীকান্ত, যামিনীকান্ত, কুমুদিনীকান্ত ও বিনোদিনীকান্ত এবং রমণীমোহন ও ' দলিতাঞ্জন পুঞ্জগঞ্জন ' ভামিনীরঞ্জন ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

কবিসমাজের কীর্ত্তিস্তম্ভ শেক্ষপীর কহিয়াছেন—

'নামে কি করে;
গোলাপ, যে নামে ডাক, মধু বিতরে।'

আমরা অকবি, সুতরাং একথা আমরা মানিতে পারি না। আমাদিগের এই বিশ্বাস যে, নামে আর কিছু না করুক, উহা দেশীয় রুচি এবং সাময়িক প্রকৃতির অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রদর্শন করে। প্রাচীন আর্য্যবীরদিগের নাম, ভরত, শত্রুঘ্ন, ভীষ্মার্জ্জুন, বলদেব, বাসুদেব, দুর্য্যোধন, ভীম ;—ঋষিদিগের নাম ব্যাস, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ ;—শাস্ত্রকারদিগের নাম, পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, কণাদ ;—এবং দেশস্থ সাধারণ ভদ্রলোকদিগের নাম শতানন্দ, শাকটায়ন। যখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি মাননীয় আর্য্যগণ, বঙ্গে প্রথম সমাগত ও উপনিবিষ্ট হইলেন, তখন এই বঙ্গেরই বাঙ্গালিদিগের নাম শূরসেন ও বীরসেন, বিজয় ও বল্লাল, এবং সেই সমাগত মহানুভাবদিগের নাম দক্ষ, বেদগর্ভ, মকরন্দ ও বিরাট্। তাহার পর, যবন অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব সময়ে বঙ্গভূমি যখন অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন এবং সর্ব্বথা অধোগতিপ্রাপ্ত হইল, শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোতে ভাটা লাগিল, বিদ্যাবুদ্ধি ও মহত্ত্বের গৌরব পর-পাদুকা-লেহন জন্য নূতন গৌরবের নিকট হীনপ্রভ হইয়া পড়িল, তখন তাঁহাদিগের নাম হইল, আই, চাই, কচু, ঘেচু, বিক, কোক ইত্যাদি। এইক্ষণ বহুদিনের পর, বহুযুগের তপস্যার পর, বিলাসসমুদ্রে ভাসমান, সুশিক্ষিত সুসভ্য, সুরুচিসম্পন্ন বাঙ্গালি-বীরদিগের নাম হইয়াছে,—রমণী, কামিনী, মানিনী, ভামিনী, কুমুদিনী, বিনোদিনী, রাই, কিশোরী। ইহার পর, কোন দিন হয়ত, কোন এক সুরসিক বাঙ্গালি, ব্রজবিলাস যাত্রায় জয়দেবের গীত শুনিয়া, আত্মজের নাম রাখিবেন,—"ললিতলবঙ্গলতাবল্লভ"

—এবং অনুজের নাম রাখিবেন, 'প্রেমময়ী-পদ-পঙ্কজ'। তিনকালের ত্রিবিধ রুচি, সুতরাং ত্রিবিধ নাম।

নামে যেমন বাঙ্গালির রসিকতা, সাহিত্য এবং সামাজিকতাতেও বাঙ্গালির সেইরূপ কি ততোধিক রসিকতা, 'দেদীপ্যমান, দোদুল্যমান ও ঢলঢলায়মান' রহিয়াছে। আদৌ গ্রাম্যরসিক। গ্রাম্যরসিকদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন, তাঁহাদিগের বেদ দাশরথির পাঁচালী, ভাষ্য আধুনিক কবিওয়ালাদিগের টপ্পা এবং টীকা গোবিন্দের দুই একটি গীত। তাঁহারা সভাস্থলে ইহার কোন না কোন ব্যক্তির নাম লইতে পারিলেই, আপনাদিগকে সায়নাচার্য্য কি কল্লুকভট্টের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র জ্ঞান করিয়া অভিমানে ফুলিয়া উঠেন; এবং আলাপে কাহারও মাতা, শ্বশ্রুমাতা, দুহিতা কি ভগিনীকে যদি ভঙ্গিক্রমে কুলকলঙ্কিনী, অথবা সন্তানতুল্য ঘনিষ্ঠ-জন-সম্পর্কে কলুষচারিণী বলিতে পারেন, তাহা হইলে, কি রসিকতা প্রদর্শন করিলেন, আর কি রসের কথাই বা বলিলেন, ইহা ভাবিয়া আহ্লাদে অবশ হন।

গ্রাম্যদিগের মধ্যে যাঁহারা নব্য রসিক,—হয়ত কোন দিন কোন এক গ্রাম্য পাঠশালায়, বাঙ্গালার দুচারি পংক্তি পড়িয়াছেন,—হয়ত কোন দিন কোন এক ভদ্র লোকের মুখে বায়রণের নাম শুনিয়াছেন,—যাঁহারা এইরূপ রসিক, তাঁহারা সাধারণতঃ বাসর ঘরের বিনোদচন্দ্র,—নাটক নবেল রূপ কমলবনের নবীন ভ্রমর, এবং প্রেমসরোবরের ভেক। দুই একটি কদর্থ কবিতা কণ্ঠস্থ আছে।—বিদ্যার এই পর্য্যন্তই দৌড়—অবসর পাইলেই সেই কবিতা পড়িতে হইবে। বিধুর একটি গীত কোনকালে শিখিয়াছিলেন, তাহাও সুযোগ মতে গাইতে হইবে। আর, মধ্যে মধ্যে মাইকেল নামক কাব্য-রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্রের কথা, এবং বিষবৃক্ষ নামক উদ্ভিদ-তত্ত্ব রচয়িতা বিদ্যাপতির কথা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকারের নিন্দা কি প্রশংসা করিতে হইবে। নহিলে, লোকে তাঁহাদিগকে রসিক বলিবে কেন? যদি দেশে এইরূপ রসিকতারই আদর না থাকিত, তাহা হইলে কবির আসরের এক পার্শ্বে পিতা আর এক পার্শ্বে দুহিতা যুগপৎ উপবিষ্ট থাকিয়া কাব্য-রস-পিপাসার চরিতার্থতা সাধনে সমর্থ হইতেন না,—যাত্রার আসরে কৌশল্যা রাম-শোকে খেমটা নাচিতেন না, এবং অর্দ্ধ শিক্ষিত কুল কামিনীরা, অর্দ্ধ শিক্ষিত নব্য রসিকদিগের ন্যায়, শিক্ষার নামে অবলার স্বভাব-সুন্দর শালীনতায় জলাঞ্জলি দিতে উৎসাহ পাইতেন না।

নগরবাসী রসিকদিগকে পুরাকালে নাগর কহিত;—এখনও তাঁহারা সেই নাগরই রহিয়াছেন;—বেশে নাগর, বিভূষণে নাগর, এবং রসিকতা ও রসের কথাতেও ষোড়শ কলায় সুশোভিত দুর্নিবার

নাগর। মুখে সতত অর্থশূন্য অট্টহাস্য, মনুষ্যের মর্মান্তিক দুঃখ এবং শোকের অন্তর্ভেদি আর্ত্তনাদ লইয়াও হাস্য পরিহাস, সকল কথায়ই মুখভঙ্গি এবং মুখভঙ্গিতেই বিশ্ব বিজয়;—ভগবানের চিড়িয়া খানায় এই এক শ্রেণীর জীব। যেমন আগমবাদী তান্ত্রিকের নিকট মদিরা-গন্ধ-শূন্য মনুষ্য মাত্রই পশু, ইহাদিগের নিকটও ধীর, গভীর, চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই ভণ্ডতাপস ও অকর্ম্মণ্য লোক। ইহাদিগের রসিকতার প্রথম লক্ষণ পরনিন্দা। যিনি মুক্তকণ্ঠে ও মুক্ত হৃদয়ে, প্রাণের সহিত পরনিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন,—সহৃৎসাহশীল কৃতী পুরুষকে পাগল কি পাষণ্ড বলিয়া করতালি দিতে এবং কি দেশের হিতকর, কি সমাজের মঙ্গলকর সমস্ত প্রকারের সৎকর্ম্মকেই সময়ের অপব্যয় অথবা বাল-চাপল্য বলিয়া ভ্রূক্ষেপে উড়াইয়া দিতে লজ্জা অনুভব করিবেন, ইহাঁদিগের নিকট তাঁহার আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইহাঁদিগের রসিকতার দ্বিতীয় লক্ষণ ইতর-জনসেব্য অশ্লীল ভাষা। যে সকল শব্দ, অভিধান কর্ত্তৃক ঘৃণায় পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং সমাজের ভদ্র বিভাগ কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া পাপনিবাসের পঙ্কিল হ্রদে লুকাইয়া রহিয়াছে, সেই সকল অকথ্য শব্দই ইহাঁদিগের কথ্য ভাষা এবং আদরের ধন। যিনি জিহ্বাকে তাদৃশ শব্দের দ্বারা কলুষিত করিতে সঙ্কুচিত হন, ইহাঁদিগের নিকট তাঁহার আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইহাঁদিগের রসিকতার তৃতীয় লক্ষণ নিজ নিজ ভার্য্যা প্রসঙ্গে প্রেমালাপ। যিনি সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী, জীবনের সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মপরিগৃহীতা ভার্য্যাকে গণিকা হইতেও ঘৃণিত রূপে বর্ণনা করিতে ম্লান ও পরিম্লান রহেন, ইহাঁদিগের নিকট তাঁহারও আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। হায়! এইরূপ রসিকদিগের হস্তেই বঙ্গভূমির ভবিষ্যৎ ন্যস্ত রহিয়াছে।

যখন ক্ষণ-জন্মা মধুসূদন মনোমদ-মধুর নিঃস্বনে কবিতায় বঙ্গ-ভারতীর স্তুতিগীত গাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং বঙ্গের কতিপয় উচ্চ শিক্ষান্বিত ও প্রতিভা সমন্বিত ক্ষমতাশালী পুরুষ বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিশোধন ও পরিবর্দ্ধন এবং উন্নতি ও বিকাশের জন্য প্রথম লেখনী ধারণ করিলেন, তখন লোকের এইরূপ আশা হইয়াছিল যে, এতদিনে বাঙ্গালি, পঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া, পদ্ম-মধুর জন্য মানস সরোবরে সন্তরণ করিতে শিক্ষা করিবে। কিন্তু এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, লোকের সে আশাও মৃগ-তৃষ্ণিকায় পরিণতি পাইতেছে। কারণ, অনুকরণের পর অনুকরণে, তার আবার অনুকরণে, বাঙ্গালায় ইদানীং যাহা কিছু লিখিত হইতেছে, তাহার সাধারণ নাম—রসের কথা; এবং যে কেহ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহার সাধারণ নাম,—রসিক।

পূর্ব্বে যেমন আমরা বাঙ্গালার ভারত-

উদ্ধার-রত বীরভদ্রদিগের নামাবলী পাঠ করিয়াছি, যে সকল অমূল্য গ্রন্থের দ্বারা সেই ভারত-উদ্ধার লাভ করিবে, পাঠক-বর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা এ-স্থলে তাহারও দুচারিটি নাম উল্লেখ করিতে পারি। বাঙ্গালির মস্তিষ্কসম্ভূত বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থমালার নাম অনুমানদীধিতি, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, শব্দতত্ত্বকৌমুদী। এইক্ষণকার গ্রন্থ সমূহের নাম,—'তুমি কি আমার', 'আমি কি তোমার', 'হায় কি মজার শনিবার', 'হায় কি রসের নূতন বাহার' ইত্যাদি। বঙ্গদেশ কাব্যের প্রিয়নিবাস, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই রস-সমুদ্রের আকালিক উচ্ছ্বাসে এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একবারে এক সঙ্গে কবি হইয়া বসিয়াছে, এবং দুর্ভিক্ষ-দুঃখ-কাতরা ক্ষীণকলেবরা বঙ্গভূমি কাব্যের তটাভিঘাতি তরঙ্গ-তাড়নে এবং রসের কথার উৎপীড়নে অহোরাত্র থর থর কাঁপিতেছে। গ্রন্থকার চতুর্দ্দশ বৎসরের বালক, শিক্ষকের গল-গর্জ্জনে বিদ্যালয়ে তাঁহার স্থান হইল না—গৃহিণী একাদশবর্ষীয়া বালিকা, শ্বশ্রুজনের নিষ্ঠুর গঞ্জনায় গার্হস্থ্যজীবনে তাঁহার চিত্ত রহিল না। অতএব উভয়ে মিলিয়া কবিতা লিখিলেন, 'হায় বৃথা আছি'—অথবা 'হায় বৃথা কাঁদি'। অনুসন্ধান করিলে সপ্রমাণ হইবে যে, আধুনিক কবিতাপুঞ্জের অনেক কবিতাই এইরূপ রস-লিপ্সু বালক বালিকার রসিকতার বিজৃম্ভণ।

কেবল বালক বালিকারাই যে এই দোষে দোষী, এমন নহে। বৃদ্ধ এবং পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত তরুণদিগের মধ্যেও অনেকে এই রস-বিকারের প্রবলস্রোতে পড়িয়া ইদানীং হাবু ডুবু খাইতেছেন। এদেশের একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন নবীন কবি আদিরসের কবিতা লিখিতে বড় ভাল বাসেন। আদিরসের কবিতা লিখিতে তাঁহার ক্ষমতাও আছে। ঐ প্রকার আদিরসের কবিতা নীতিবিগর্হিত বলিয়া অনেক সময়ে যার পর নাই অনিষ্টকর হইলেও, ভাবের আবেগে এবং ভাষার পারিপাট্যে প্রায়শঃ পাঠকসমাজের একান্ত প্রীতিকর হইয়া থাকে। তিনি কবিতা লিখিয়াছেন,—'কেন দেখিলাম'। কবিতাটি সুন্দর ও সুখপাঠ্য। তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তনে ন্যূনতঃ একশত মস্তিষ্কশূন্য এবং শতাধিক রস-পরিচয়শূন্য অকর্ম্মণ্য যুবা কবিতা লিখিয়াছেন,—'কেন চাহিলাম', 'কেন চাহিলে', 'কেন নাচিল নয়ন', 'কেন কাঁপিলে বদন'। এইভাবে, যেন তেন প্রকারে অদ্যাপি অনন্তকোটি 'কেন' বাঙ্গালায় লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচলিত হইতেছে। এই 'কেন' এইরূপ রসিকতার রাজ্য ছাড়িয়া আর যে যায়, এমন ভরসা কি?

যে সময়ে যুবরাজ এদেশে পদার্পণ করিলেন,—প্রফুল্ল শরচ্চন্দ্রের ন্যায়, আ-

নন্দলহরী বিকীরণ করিয়া ভারতে ভারত-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের জন্য উপনীত হইলেন, তখন এদেশের কাব্যকণ্ঠে ভয়ানক এক কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইল। যেই দুই তিনটি প্রকৃত কবি জাতীয়-সম্মান রক্ষার অভিলাসে কবিতায় যুবরাজকে সম্ভাষণ করিলেন, অমনি কবিতার ককার-বোধ-বিরহিত সহস্র যুবা, যেন কি এক রসাবেশে আবিষ্ট হইয়া, যুবরাজকে কবিতায় অঞ্চলের ধন, শ্বেতরতন বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। লোকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিল,—ইহা কি ? বঙ্গভূমির বাৎসল্যরস সহসা এইরূপ উছলিয়া উঠিল কেন ?—কিন্তু যেহেতু শুধু এক বাৎসল্যরসেই কবিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন হয় না, এই নিমিত্ত বঙ্গের এক বয়োবৃদ্ধ পরিচিত কবি রঙ্গভূমিতে দর্পসহকারে প্রবেশ করিয়া, কবিতায় বর্ণনা করিলেন যে, ভারতমাতা জরতী হইলেও আজি রস-ভাবের উচ্ছলিত প্রবাহে পুনরায় যুবতী হইয়াছেন, এবং যৌবনের শোভা দেখাইয়া, কেশে ফুল, কর্ণে দুল এবং কপোলে চূর্ণকুন্তল দুলাইয়া, মদনমোহন নৃপনন্দনকে প্রেমভরে আহ্বান করিতেছেন,—অতএব যুবরাজ সানন্দে আসিয়া সমাগত হউন। এই কবিতা আমাদিগের কল্পিত প্রলাপ নহে। ইহা লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং সহৃদয় পাঠকবর্গ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—ইহা রসের কথা। পঞ্চবিংশতি কোটি মনুষ্যের দগ্ধপ্রাণ ভারতমাতা বলিয়া যাঁহার নাম করিতেছে—দেশে বিদেশে শাস্ত্রার্থদর্শী সুধীপুরুষেরা যাঁহাকে সভ্যতা ও সামাজিক নীতির আদি জননী, পরমার্থতত্ত্বের রত্ন-খনি এবং সকল ভাষার ভাষাপ্রসবিনী বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই আর্য্যাশ্রুপ্রবাহরূপা নর্ম্মদা ও ভাগীরথীর পবিত্রবারিধৌতা ভারতভূমিকে চটুলনয়না নবীননায়িকা সাজাইয়া, তাঁহাকে রাজবেশে বিভূষিত নবীননায়কের সঙ্গে সম্মিলিত করা সামান্য কবিত্ব-শক্তি এবং সামান্য রসিকতার পরিচায়ক নহে!

আর একজন অভিনব কবি রূপজীবিনী পণ্যবিলাসিনীদিগের রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া কবিতা লিখিতেই বড় সুখী হইয়া থাকেন। মনুষ্য মনুষ্যের নিকট যাহা বলিতে পারে না, মনুষ্য মনুষ্যের নিকট যাহা শুনিতে চাহে না,—শুনিতে পারে না, তিনি কবিতায় সেই সকল অশ্রাব্য কথা অতি মনোহর ভাষায় প্রকটন করিতেছেন এবং সংপ্রতি ঐরূপ একখানি কাব্য লিখিয়া তাঁহার ভার্য্যার নামে তাহা উৎসর্গ করিয়াছেন। এই কাব্য তাঁহার ইতিহাস, এই কাব্য তাঁহার উপন্যাস। ইহার অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার আত্মকথা। তিনি কোন একটি সরলহৃদয়া কুলবালাকে কিরূপ কৌশলে ও কুহকে বশ করিয়া কুলপিঞ্জরের বাহিরে আনিয়া-

ছেন, আর একটিকে বাহিরে আনিয়া পরিশেষে কেন ত্যাগ করিয়াছেন, তৃতীয় একটিকে প্রণয়কলহে একবার পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কি উপায়ে নগরের উপকণ্ঠে স্বকীয় উদ্যানে লইয়া গিয়াছেন, চতুর্থ একটিকে নর্ত্তকী বানাইয়া সেরী সাম্পেন প্রভৃতি সামগ্রী সহকারে পাঁচ ইয়ারের মজলিসে কিরূপে সভায় আনিয়া দেখিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয়ও উল্লিখিত কাব্যখানিতে বিবিধ মধুরচ্ছন্দে বিন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে ইহা বলিয়া অবশ্যই এইক্ষণ আশ্বাস দিতেছে যে,—'হে কবিবর! হে বঙ্গীয় বীণাপাণির কাব্যবনের নূতন ভ্রমর! তুমি আর অকারণ করুণস্বরে রোদন করিও না। তুমি যাঁহার জন্য এই কাব্য রচনা করিয়াছ, রচনা করিয়া যাঁহাকে ইহা উপহার দিয়াছ, তিনি অতঃপর নিঃসংশয় তোমাকে রসিক বলিয়া সাদরে সম্ভাষণ করিবেন, এবং বঙ্গদেশের গ্রামস্থ ও নগরস্থ উভয় শ্রেণীস্থ রসিক পাঠকই ইহার অভ্যন্তরীণ রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়া তোমার ক্ষমতা ও গুণবত্তা, তোমার ভাবুকতা ও রসশাস্ত্রে প্রবীণতার কথা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।'

যদি উদাহরণের বাহুল্য প্রদর্শন আবশ্যক হইত, তাহা হইলে আমরা এইরূপ কাব্যগত রসিকতার বহু সংখ্যক উদাহরণ পাঠকবর্গের নিকটে অনায়াসে উপস্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু বোধ হয়, আমাদিগকে সে আয়াস পাইতে হইবে না। যাঁহারা বাঙ্গালা কাব্যের অনুশীলন কি সমালোচন করেন, আমাদিগের ভরসা আছে যে, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে আমাদিগের কথায় সায় দিবেন এবং উল্লিখিতরূপ রসের লহরীতে ভাসিয়া যে বাঙ্গালি ও বাঙ্গলা সাহিত্য প্রাণে মরিতেছে, ইহা হৃদয়ের সহিত স্বীকার করিবেন।

তবে কি রসিকতা ও রসের কথা পাপ? প্রকৃতির এই রসপূর্ণ অমৃত-নিকেতনে উপবেশন করিয়া, এমন কথা মুখে আনিতেও আমাদিগের সাহস হয় না। আমরা যখন জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর সেই অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়, ঔদাস্যব্যঞ্জক শোভাদর্শনে বিমোহিত হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাই, তখন আত্ম-স্মৃতির প্রথমস্ফুরণেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এইরূপ বলিতে থাকি যে, ইহা দেখিলেও যাঁহার হৃদয়ে রস-সঞ্চার হয় না, তিনি চক্ষুঃসত্ত্বে অন্ধ, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়। আমরা যখন সহসা কোন অটবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অটবীর শ্যামকান্তিতে প্রতিবিম্বিত সায়ন্তন সূর্য্যের অপরূপ কান্তি অবলোকন করি—সূর্য্যের আলোক বৃক্ষের পত্রে পত্রে ও পত্রান্তরালে এলায়িত ভাবে জড়িত হইয়া কিরূপ হাসিতে থাকে ও খেলিতে থাকে, যখন আমরা স্তিমিত নেত্রে তাহা দর্শন করি, তখন ইহাই প্রথম মনে হয় যে, এই

মাধুরী, এই তরুরাজি, এই লতাবিতান, এই নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শনেও যাঁহার হৃদয়ে রস-সঞ্চার হয় না, তিনি চক্ষুঃস্বত্বে অন্ধ, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়। আমরা যখন কোন প্রশস্ত-হৃদয়া ও প্রসন্ন-সলিলা স্রোতস্বিনীর পুলিনপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া উহার তরঙ্গরাজির সহিত পূর্ণ-চন্দ্রের প্রভা-তরঙ্গের লীলানৃত্য নিরীক্ষণ করি, স্রোতস্বিনী চন্দ্র-কিরণ-স্পর্শে প্রমত্ত হইয়া, বক্ষে চন্দ্রহার পরিয়া, চন্দ্র-মালা পুষিয়া, কুলু কুলু ধ্বনিতে কতই কি কহিতে থাকে, আমরা যখন কর্ণ ভরিয়া তাহা শ্রবণ করি,তখন মুখে কথা না কুটিলেও মনে ইহা বুলি যে,প্রকৃতির এই চারু দৃশ্য দর্শনে, এই অপরিস্ফুট রসলাপ শ্রবণেও যাঁহার হৃদয় রসসঞ্চারে আর্দ্র হয় না, তিনি চক্ষুঃস্বত্বে অন্ধ,তিনিশ্রুতি-স্বত্বে বধির, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়।

কাব্যে নবরস, প্রকৃতির এই অনন্ত বিস্তারিত মায়াকাননে,—অনন্ত রস। তুষার-সমাবৃত দুর্নিরীক্ষ্য পর্ব্বতের কাছে রসের এক কাহিনী, তরুশাখাবিলম্বিত পুষ্প স্তবকের কাছে রসের আর এক কাহিনী। সমুদ্রের ফেণায়মান ধু ধু বিস্তারে রসের এক কথা, সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে রসের আর এক কথা। যাঁহারা যথার্থ রসলিপ্সু, যথার্থ রসিক, তাঁহারা এই রসই পান করিতেছেন এবং চিরকাল এই রসই পান করিয়া কৃতার্থ হইবেন। বিজ্ঞানের গম্ভীরা মূর্ত্তি এই রসের সংস্পর্শ পাইয়াই সাধকের নিকট সুধাময়ী বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং প্রকৃত কবিতাও এই রসের কণিকা লইয়াই, কোকিলার ন্যায় কলকণ্ঠে গাইয়া গাইয়া সর্ব্বত্র সুধা বিতরণ করে।

পাঠক, তুমি কি প্রকৃতির এই রসোপহারে উপেক্ষা করিয়া,—বিজ্ঞান ও কবিতা চিরপ্রীতিবদ্ধ দম্পতীর মত সম্মিলিত-স্বরে যে গম্ভীর গীত গাইতেছে তাহাতে কর্ণ পাত না করিয়া, শুধু ভ্রমরগুঞ্জন সদৃশ তরল রসের তরল কথা শুনিতেই ভালবাস? যদি তাহাতেই তোমার হৃদয়ের তৃষ্ণা ও লালসা থাকে, তবে এস,—যেখানে কল্পনার কুঞ্জবনে শকুন্তলা মাধবী ও সহকারের সহিত স্নেহকণ্টকণ্ঠে কথোপকথন করিতেছেন, রামচন্দ্র রমণী কুলের মুকুটমণি জনকনন্দিনীকে বাহুলতা উপরে রাখিয়া, চারি চক্ষে চিত্রপট দেখিতেছেন, অথবা রোমিও জুলিয়েটের গবাক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রবাহ অপূর্ণ মানুষীভাষায় ঢালিয়া দিতেছেন, সেই স্থলে গমন করি। কি গম্ভীর, কি তরল, রসের কথা শুনিতে চাও ত কোকিল ও ভ্রমরের নিকট যাও। কাক ও ভেকের নিকট কে কবে রসের কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছে?

সমালোচন।

১। "নিভৃত-নিবাস। কাব্য। প্রথমখণ্ড। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।" —আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর গুণপক্ষপাতী। তাঁহার কবিতায় সৃষ্টি নৈপুণ্য নাই, উদ্দীপনা নাই। কিন্তু আমরা তথাপি তাঁহার তরল ও প্রাঞ্জল পদাবলী পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। ঘনসন্নিবিষ্ট সুবর্ণরাশি এবং সুবর্ণের সূক্ষ্মায়ত বিতত পত্রে যে প্রভেদ, প্রগাঢ় রচনার সম্পূর্ণ কবিতার সহিত রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিতারও সেই প্রভেদ। ইংলণ্ডীয় গ্রের শোক-গীত নামক প্রসিদ্ধ কবিতায় বনকুসুমের অলোক-দৃষ্ট, অনাঘ্রাত সৌন্দর্য্যের একটি আশ্চর্য্য বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনাটি অল্পাক্ষর-গ্রথিত তত্ত্ব-সূত্রের ন্যায় যার পর নাই সংক্ষিপ্ত, সুতরাং যার পর নাই গাঢ়। পাঠ মাত্রেই সেই শব্দ কয়টি পাঠকের হৃদয়ে গিয়া চিরজীবনের জন্য মুদ্রিত হয়, এবং সেই শব্দগম্য নিগূঢ়ভাব থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়ে ও মনে এই সংসার-সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, —এই অনন্ত জগতের অনন্ত সুন্দরচ্ছবি স্মৃতি ও কল্পনার সান্নিধ্যে অর্দ্ধপরিচ্ছন্ন ভাবে ধীরে ধীরে প্রদর্শনের জন্য লইয়া আইসে। রাজকৃষ্ণ বাবু নিভৃত নিবাসের একটি কবিতায় সেই ভাবটিকে তরল বাঙ্গালায় ছড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এমুন কৌশলে এই অনুবাদও একান্ত মনোহর হইয়াছে। আমরা কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম। বাঙ্গালি কবি, বাগানের ফুলে মালা গাঁথিয়াও, তাহাতে বনফুলের শোভা কিরূপ ফলাইতে পারিয়াছেন, পাঠক তাহা দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন।

—"প্রিয়তমে, হৃদয়েশি! এপোড়াকপালে
তোমা হেন সুরভিত সুললিতফুল
সরস থাকিবে কেন? হায়রে, অকালে
নীরস, বিশীর্ণ মোর কুসুম অতুল!
বনের কুসুম বনে আপনিই ফুটে,
নিজে হাসে, নিজেদোলে, নিজেই খেলায়;
অযত্নে সৌরভ তার আপনিই ছুটে,
বনের কুসুম বনে আপনি শুখায়।
কেহ নাহি করে তারে আদর যতন,
কাজেই না হয় মায়া নাহি কাঁদে মন।"

যদি নিভৃত-নিবাস শুধু এইরূপ ভাবানুবাদেই পূর্ণ থাকিত, তথাপি আমরা ইহার প্রশংসা করিতাম। কারণ, কবিতায় কবিতার অনুবাদ নিতান্ত অনায়াসসাধ্য নহে। এদেশের একজন যশস্বী কবি বাঙ্গালায় সংস্কৃতের অনুবাদ করিতে গিয়াও উপহসিত হইয়াছেন। যদি বাঙ্গালায় সংস্কৃতের অনুবাদই এত কঠিন, তাহা হইলে ইংরেজীর অনুবাদ কত কঠিন, তাহা লিপিক্ষম ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু নিভৃত নিবাসের সমস্ত বা অধিকাং-

শই যে অনুবাদ কিংবা অনুকৃর্ত্তি, এমন নহে। ইহার অনেক কবিতা নূতন এবং নিতান্ত মধুর, কিন্তু কোন কবিতাই তাড়িত-তরঙ্গময়ী নহে। যাঁহারা রাজকৃষ্ণ বাবুকে কবি নামের অযোগ্য বলেন, তাহারা হয় পরিহাস-রসিক, না হয় ভ্রমান্ধ। অবসর সরোজিনী ও নিভৃত নিবাসের মত উপাদেয় কাব্য, উচ্চতর শক্তির পরিচায়ক না হইলেও উপেক্ষা কি অবজ্ঞার বস্তু নহে।

২। "উপদেশ মঞ্জরী। শ্রীশিবচন্দ্র বিশারদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত"।—গ্রন্থের কলেবর চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠা, গ্রন্থোক্ত বিষয় বিদ্যাশিক্ষা, ধনোপার্জ্জন, অহঙ্কার, ইত্যাদি প্রসঙ্গে চিন্তাশূন্য প্রচলিত উপদেশ। যথা "অভিমানের প্রধান সহচর দ্বেষ, অতএব যিনি অভিমানের বশবর্ত্তী, তিনি দ্বেষেরও দাস হইয়াছেন, সংশয় নাই"। যাঁহারা মানবজগতের ইতিহাস শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়াছেন এবং মহত্ত্বের অবতার-স্বরূপ প্রকৃত মহানুভাব পুরুষদিগের জীবনচরিত সমালোচনা করিয়া জীবনের নীতিসূত্র শিখিয়াছেন, তাঁহারা এসকল অর্থশূন্য কথায় তৃপ্ত হইবেন কি না, জানিনা। গ্রন্থকার একজন প্রাচীন শ্রেণীস্থ পণ্ডিত; অতএব বাঙ্গালার অনুশীলনে তাঁহাকে উৎসাহ দেওয়া আমরা উচিত জ্ঞান করি।

৩। "শোকাঞ্জলি। ১৮৭৮ সনের ৯ই মার্চ্চ তারিখে শ্রীলশ্রীযুক্ত অনরেবল এস্লী ইডেন বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কে, সি, এস্, আই, সাহেব মহোদয়ের চট্টগ্রামে শুভাগমনোপলক্ষে শ্রীকালীকমল দত্ত প্রণীত"। ইহা একখানি ক্ষুদ্র পদ্যপ্রবন্ধ। লেখকের শব্দবোধ আছে, এবং শব্দের সহিত শব্দগ্রন্থনের ক্ষমতা আছে। অভ্যাস করিলে, তিনি পদ্যরচনায় পটু হইবেন বলিয়া ভরসা হয়। আমরা তাঁহার একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। গ্রন্থকার বিগত কার্ত্তিকের সেই ভয়াবহ ঝটিকাবর্ত্তের বর্ণনায় লিখিতেছেন,

"সেইদিন ডুবিলাম লবণাম্বু জলে,
যেন মজাইতে সৃষ্টি ভীষণ নিস্বনে
বহিল উত্তাল স্রোত কল কল কলে,
ভাসিল সকলদেশ সে ঘোর প্লাবনে।
স্মরিলে সে দুঃখরাশি ফেটেযায় বুক
চিরতল কেন নাহি করিল সে জল ?
তবে আর কে সহিত এ বিষম দুঃখ!
কে খণ্ডাবে ভবিতব্য লিখা কর্ম্মফল!"

৪। "সাহিত্য-বিন্দু। শ্রীজানকীনাথ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত"।—ইহাতে স্বভাব দর্শন, শূন্যস্থোদ্যান, রাজা প্রতাপসিংহ ইত্যাদি শিরোনামে নীতিবিষয়ক ও ঐতিহাসিক কথামূলক কতকগুলি গদ্যপ্রবন্ধ আছে। এই গ্রন্থখানি বালক-শিক্ষার উপযোগী। লেখা স্থানে স্থানে অপরিপক্ব এবং কোন কোন স্থলে ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ ও অশুদ্ধ হইলেও সাধারণতঃ প্রাঞ্জল। আমরা একটি অশুদ্ধি এস্থলে দেখাইয়া দিতেছি, ভরসা করি গ্রন্থকার গ্রন্থের পুনঃসংস্করণে এইরূপ ভ্রমপ্রমাদ

পরিশুদ্ধ করিয়া দিবেন। যথা, পিরামিডের বর্ণনায় ৩২ পৃষ্ঠায়,—" ইহা অল্প সময়ের মধ্যে বিলয় হইতে পারে।,, ব্যাকরণ ও ভাষার চিরপ্রতিষ্ঠিত রীত্যানুসারে " বিলয় পাইতে পারে,, কি " বিলীন হইতে পারে " লেখা যায়, " বিলয় হইতে পারে " কখনই এইরূপ লেখা যায় না। কারণ লয় শব্দের অর্থ সংশ্লেষ ও বিনাশ; সংশ্লিষ্ট ও বিনষ্ট নহে।

৫। " আক্ষেপ। কলিকাতা ভবানীপুর, ওরিএন্টাল প্রেসে শ্রীবরদাকান্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত "। গ্রন্থকর্ত্রীর নাম কমলকামিনী। তিনি যে একটি সুশিক্ষিতা কুলকামিনী তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার এই প্রণয়-বিচ্ছেদের কবিতাগুলি মিষ্ট ও মধুর। আমরা মিষ্টতার অনুরোধে দুই তিনটি কবিতা নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

সখীরে! —

চেয়ে দেখ, দিনমণি যায়, যায়, যায়;
প্রদোষ-অম্বরতলে, কাদম্বিনী ছুটেচলে,
ঝলসিছে মৃদু মৃদু সরসীর গায়;
বিষাদিনী কমলিনী সলিলশয্যায়।

*　　*　　*

সখীরে!—

কমল কমল-আঁখি ওই দেখ মুদিল;
কুমুদিনী হাসি,হাসি,আনন্দ-সাগরে ভাসি,
ধীরি ধীরি আখিমেলি নাথপানে চাইল;
রজত-কিরণ, মরি, সে বদনে খেলিল।

সখীরে! —

কেন লো সহসা আজি হৃদিমন কাঁপিল?
প্রাণেশ আসিবে যদি,দুর দুরে কেন হৃদি
হুতাশ-হুতাশে কেন পোড়া দেহ পুড়িল?
না জানি কপালে সখি আজি কিবা ঘটিল।

*　　*　　*

সখীরে!—

মনে হয় যেন সেই এ হৃদয়ে পশিয়া,
লইয়া হৃদয়-যন্ত্রী, সলয়ে মিশায়ে তন্ত্রী,
ডাকিছে মোহনরবে,সে যন্ত্রেতে খেলিয়া;
রাধাকুঞ্জে বাঁকা যেন বেণু বাঁশী ধরিয়া।

যদি সকলগুলি কবিতা এইরূপ হইত, তাহা হইলে আমরা শুধু প্রশংসা করিয়াই গ্রন্থখানি পরিত্যাগ করিতে পারিতাম। কিন্তু 'আক্ষেপের' বিষয় এই গ্রন্থকর্ত্রী আমাদিগকে এইরূপ সহজে বিদায় লইতে দিলেন না। তিনি প্রিয়-বিরহের প্রীতিকর প্রসঙ্গে হৃদয়ের উচ্ছ্বলিতবেগে কয়েকটি ভাল কবিতা লিখিয়া পরিশেষে, কি ভাবে, কি হেতুতে জানি না, কয়েকটি অতিকদর্য্য কবিতা এই গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়াছেন। উহার একটি কবিতায় স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলেও ভাবতঃ তিনি ব্রজের রাধা হইয়া বসিয়াছেন এবং তাঁহার 'মনচোর' মদনমোহনকে চন্দ্রাবলীর চারুবল্লভ এবং কুব্জার কেলিনায়করূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অবশ্যই মনে করিয়াছেন যে, ইহাতে লোকে তাঁহাকে রসিকা বলিবে; কিন্তু আমরা তাঁহাকে অতি কাতরবচনে এই কথা সহস্রবার বলিতে পারি যে, কি বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত ভদ্রসমাজ, কি এই চিরঅনুগত বিনীত বা-

ন্ধব, কেহই এই কদর্য্য রসিকতার উৎসাহ-দাতা নহে।

৬। "নীতিরত্নাহার। শ্রীকালীকিশোর চক্রবর্ত্তী প্রণীত"।—ইহা নীতিবিষয়ক একখানি পদ্যগ্রন্থ। ইহার দুই একটি পদ্যরচনা অংশতঃ প্রীতিপ্রদ হইয়াছে।

৭। "স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান (দার্শনিক) কাব্য। বেনারস নিবাসিনী শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী প্রণীত ও শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত"। দর্শনশাস্ত্রের গূঢ়াদপিগূঢ় অগম্যতত্ত্ব লইয়া কাব্য রচনা করা অনেকেরই শোভা পায় না। দেবী ভুবনমোহিনী আমাদিগের বিবেচনায় এইরূপ আয়াস-সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া ভাল করেন নাই। তবে ইহা অবশ্যই বলিতে পারি যে, তাঁহার রচনাশক্তি আছে এবং স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া এই গ্রন্থ আদরযোগ্য।

৮। "মনুসংহিতা ও কুল্লূকভট্ট। অর্থাৎ মহর্ষি মনুর মতের সহিত কুল্লূকভট্টের মতের তুলনায় সমালোচন। ভূতপূর্ব্ব 'আর্য্যপ্রতিভা' সম্পাদক শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ প্রণীত"। এই প্রবন্ধটি প্রশংসার্হ হইয়াছে;—লেখা উৎকৃষ্ট, লেখকের বিদ্যাবত্তা ও চিন্তাশক্তিও সম্মানার্হ। প্রাচীন তত্ত্ব লইয়া এইরূপ আন্দোলন করিলে,যেমন ইতিহাসের পথ খুলিবে, বাঙ্গালা ভাষারও তেমনই উপকার দর্শিবে।

৯। "সাহিত্যরত্নাবলী। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত"।—হরিমোহন বাবুর এই পুস্তকখানি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার বিশেষ উপযোগী। ইহাতে উৎকৃষ্ট কবিতা আছে, উৎকৃষ্ট গদ্য প্রবন্ধ আছে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের অনতিসংক্ষিপ্ত একটি ইতিবৃত্ত আছে।

১০। "বিশ্ব-বিষ চিকিৎসা। শ্রীহরিমোহন সেনগুপ্ত প্রকাশিত"।—এই গ্রন্থখানি লেখকের যারপর নাই অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রন্থকার নকলনবিশ নহেন। পদার্থশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে এবং তিনি লিপিক্ষম।

১১। "জীমুতবাহন। (পূজাপদ্ধতি) শ্রীঅনুকুল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত"।—নারায়ণ সেবার পুরাতন পুথির মত ইহা একখানি নূতন পুথি। ইহার কলেবর ১৬ পৃষ্ঠা, মুদ্রণে পারিপাট্য আছে। ইন্দ্রের এক নাম জিমুতবাহন। এই জিমুতবাহন ইন্দ্র নহেন, ইনি এক নূতন দেব। গ্রন্থকারের ইচ্ছা যে, জগতে ইহাঁর পূজা প্রতিষ্ঠিত হউক।

১২। 'সুলোচনা বিনাসম্। শ্রীশরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীতম্। প্রথম সংস্করণম্।'—বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্রে যেরূপ জঘন্য আদিরসের উপকথা এবং উপকথার অবসানে নীতি কথা আছে, এই গ্রন্থখানিতেও সেইরূপ উপকথা ও নীতিকথার অদ্ভুত মিশ্রণ দৃষ্ট হইল। প্রভেদ এই, বিষ্ণুশর্ম্মার সংস্কৃত যেমন পরিপক্ক ও প্রীতিপ্রদ, ইহার সংস্কৃত সেইরূপ পরিপক্ক ও প্রীতি-

প্রদ নহে। তবে গ্রন্থকারের এই এক প্রশংসা, তিনি সংস্কৃতে ইহা রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

১৩। "কবিতাবলী। লক্ষ্ণৌ-সংস্কৃতপাঠশালা-সংস্কৃতাধ্যাপকানাতম শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রিণা বিরচিতা।"—এখানিও সংস্কৃতে রচিত, কিন্তু ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত মধুর। পণ্ডিতবর হৃষীকেশ শাস্ত্রী আধুনিক সংস্কৃত লেখকদিগের মধ্যে সম্মানের আসন পাইবার যোগ্য। তাঁহার রস বোধ আছে, ছন্দোবোধ আছে, এবং লিখিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে।

১৪। "কামিনী কলঙ্ক। ইদিলপুর নিবাসী শ্রীহরমোহন ঘোষ প্রণীত। উজিরপুর নিবাসী শ্রীআনন্দচন্দ্র গুহের প্রযত্নে সংকলিত।"—এই চৌদ্দ পোনর পৃষ্ঠার চটি, কামিনী কলঙ্ক নামে অভিহিত না হইয়া, কলমের কলঙ্ক বলিয়া অভিহিত হইলেই ভাল ছিল। জল-প্লাবন-বিপন্না একটি ভদ্র মহিলা দস্যু হস্তে নিপতিতা হন, দস্যুরা তাঁহার ধর্ম্ম নাশ করে, একথায় কামিনী-কলঙ্ক কিসে আসিল? লেখা পড়িয়া বোধ হইল গ্রন্থকার কখনও কখনও বাঙ্গালা বই পড়িয়া থাকেন। "শোক একপ্রকার নহে" এই নীতি অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার কএকটি পংক্তি লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে সেই পংক্তি কয়টিই আমাদিগের নিকট ভাল লাগিল। অন্যান্য স্থান পাঠে বোধ হইল, যেন ভাষা তাঁহার নিকট নিতান্ত নিপীড়িত, নিগৃহীত অবস্থায় অবস্থান করিতেছে;—তিনিও তাহাকে ভালবাসেন না, সেও তাঁহার নিকট পার্শ্বমানে যাইতে চাহে না।

১৫। "ভারত নলিনী। নাট্যগীতি। শ্রীঅপুর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত বিরচিত।" এই নাট্যগীতি অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনুকৃতি। কিন্তু ইহাতে প্রশংসা করিবার কিছুই নাই। কালিদাসের সেই লীলাময়ী লেখা পড়িয়া, তার পর ইহা পাঠ করা সময়ের অপব্যয় মাত্র। ভারতনলিনীর একটি গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আমাদিগের বোধ হয়, বাঙ্গালা গীত সাধারণতঃ ইহা অপেক্ষা অধিকতর ললিত, মধুর ও মনোহর হইয়া থাকে।

"কেনরে অবোধ চিত, প্রবোধ কথানা শুন?
জান ত দুরাশা শুধু, মিলিবে না সে রতন।
হে বিধাতঃ, লওহে হরি, হৃদি হতে প্রাণেশ্বরী,
না না না বিনয় করি যায় যাক এজীবন।
এই কি কুসুম-বাণ, কহ মার! মোর স্থান,
বজ্রহতে খরশাণ, বিঁধিছে যে এ পরাণ।
এই কি সুধার অংশু, বিতর ওহে সুধাংশু
তব ও সুধার অংশু দহিছে পাবক যেন।

১৬। "বিজয়া, উপহার। শ্রীকৃষ্ণলাল সরকার প্রণীত।" গিরিরাজ-বালা উমা বিজয়া দশমীতে জনক নিবাস পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসে যাইতেছেন,—এই কথা অবলম্বনে এই পদ্যময় ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে। ইহার মুদ্রণ-পারিপাট্য মনোহর, রচনাও স্থানে স্থানে সুন্দর। আমরা এস্থলে ইহার আটটিপংক্তি উদ্ধৃত ক-

রিলাম। বোধ হয়, এই আটটি পংক্তি পাঠক-বর্গের নিকট পূর্ব্বোদ্ধৃত গীত-কবিতা অপেক্ষা অধিকতর মিষ্ট বলিয়া প্রতীত হইবে।

"প্রাণের প্রতিমা পাঠাতে উমারে,
কাঁদে গিরিরাণী অধীর স্বরে,
কাঁদে গিরি-রাণী পাগলিনী প্রায়,
বাজে প্রতিধ্বনি গিরি গহ্বরে।

* * *

"বায়ু স্তরে স্তরে, গতি শূন্য প্রায়,
শিহরি মার্ত্তণ্ড হরিল কর,
ঘন তমাবৃত হইল জগৎ।
মায়া আবরণে ছাইল অম্বর।

১৭। "শ্যালক বিয়োগ কাব্য। প্রথমখণ্ড।"—ইন্দ্রনাথ বাবুর রামদাস শর্ম্মা ভারত উদ্ধার নামক ব্যঙ্গ কাব্য লিখিয়া বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই বিয়োগ কাব্যের রচয়িতা রামদাস শর্ম্মার বাক্সে সেরেস্তার নকলনবিশ। রামদাসের প্রতি ইহাঁর অচলা ভক্তি আছে, কিন্তু রাম দাসের লেখা নকল করিবার উপযোগিনী ক্ষমতা আজও ইহাঁর জন্মে নাই। যাঁহারা রামদাসের 'জলে ফুল ভাসান' পড়িয়াছেন, তাঁহারা বিয়োগ কাব্যের নদী-তট-দর্শন-জন্য চিন্তার এই কবিতাটি পাঠ করুন।

নদী তটে।

কোথা যাও নদি, আজি ধীরি ধীরি বলনা?
কার অন্বেষণতরে
কুলু কুলু কুলু স্বরে
যাইতেছ একমনে কারে করে ছলনা
নদি তুমি বল না?
আজকে তোমার তটে আসিয়াছি কাঁদিতে
কি কান্না কাঁদিব বল
নয়নে নাহিক জল
গৃহিনীর তাড়া খেয়ে আসিয়াছি কাঁদিতে
নদি আসিয়াছি কুদিতে।
আমার মনের জ্বালা আর কারে কহিব!
জানিতে বাসনা যদি
হয়ে থাকে তোর নদী
আমার মনের কথা তবে তোরে বলিব
নদি তোরে বলিব।

* * *

কথা কও কথা কও
গুমরেতে কোথা যাও
তুমিও কি শিখিয়াছ মানিনী মান?
এযে নেকো অভিমান।
হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনাবৃত অনল
নব বিধবার ন্যায়
জ্বলিতেছে হায় হায়
গ্রন্থকারভয়ে শুধু রাখিয়াছি লুকায়ে,
নদি দিও নাকো জ্বালায়ে।
সন্ধান পাইলে কত অভিনব লেখক,
নববিরহিনী সনে
তুল নিয়া মনে মনে
রচিবে মধুর গ্রন্থ হৃদি-পিত্ত-নাশক,
অভিনব লেখক।
তাইতে মনের কথা মনোমাঝে রেখেছি
এক্ষণে গৃহেতে গিয়া
কেমনে বুঝাব প্রিয়া
বলে দেও শৈবলিনি গৃহপানে যেতেছি
শৈবলিনি গৃহপানে চলেছি।